লাখ লাখ যুগ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটা সাধারণ জায়গায় মেলাটা বসে। নামটা কি ছিল জানা নাই, সাধারণ লোকে উপস্থিত "কুলকুলির মেলা" নাম দিয়েছে এবং সেই নামেই চলে যাচ্ছে।

মেলায় আসে দেশ বিদেশের জিনিসপত্র, পুরুষেরা যেমন কেনে, মেয়েরা তার চেয়ে আরও বেশী কেনে কারণ বেশীর ভাগ জিনিসই তাদের দরকারে লাগে। প্রতি বৎসর এই মাঘ মাসটা আশপাশের একশোখানা গ্রামের লোকের কাছে পরম লোভনীয় ও প্রীতিপ্রদ মনে হয়। এখানে চলে যাত্রা, পাঁচালি, কথকথা, কীর্তন,—এর মধ্যে এই গ্রামবাসীদের কাছে কথকথাটাই লাগে ভালো।

এমনই মাঘ মাসের একদিন এই গ্রামের পথে এসে দাঁড়ালো শঙ্কর। কালো চকচকে তার গায়ের রং, মাথাভরা কালো কোঁকড়া চুল, সুদীর্ঘ টানা চেহারা।—

বিস্মিত গ্রামবাসী আশ্চর্য হয়ে ছেলেটির পানে নির্বাকে চেয়ে রইলো। তারা তথাকথিত অন্ত্যজ, সসঙ্কোচে তাই সরে দাঁড়ালো। শঙ্করের বার্নিস করা কালো বুকে সাদা পৈতার গোছা তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিলে।

শঙ্কর চাইলো এই অস্পৃশ্যদের কাছে আহার্য, এতটুকু মাথা গুঁজবার স্থান।

কিন্তু সে যে ব্রাহ্মণ—অন্ত্যজেরা শিউরে ওঠে। ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করতে চাইলেও তারা দান করতে পারে না, তাদের বাধে। মহাপাপের ভয়ে তারা শিউরে ওঠে, ব্রাহ্মণের ধর্ম ও নিজেদের পুণ্য তারা নষ্ট করতে পারে না।

মহা ভাবনার কথা—ব্রাহ্মণকে তারা আশ্রয় বা আহার্য দেয় কি করে।

গ্রামের মধ্যে প্রবীণ হরলাল শেষে সবিনয়ে বললে, "ঠাকুরমশাই, অনুগ্রহ করে ঠাকুর পুজোর ভারটা নিন, আমাদের দানের আর আপনার গ্রহণের পাতক হতে রক্ষা করুন। আমরা ছোটলোক নমঃশূদ্র, আর আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আপনাকে দান করা কি আমাদের চলে?"

শঙ্কর দারুণ চটে উঠলো—"না না, ওসব পুজো-টুজো—মানে জোচ্চুরী করা আমার দ্বারা পোষাবে না বাপু। ঠাকুর পুজোর কাজ, মন্তর মুখস্ত করা—সব কি এই বাউণ্ডুলের পোষায় বাপু? আর যাই করি—দেবতাকে ফাঁকি দিতে আমি পারব না।"

মাথা চুলকিয়ে হরলাল বললে, "কিন্তু বামুন যে দেবতা ঠাকুর"—

বাধা দিয়ে অধৈর্যভাবে শঙ্কর বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ দেবতা। শুনেছো কোনদিন—'দেবতা কিছু নিয়ে ফিরিয়ে দেয়? আমায় যদি দেবতাই জেনে থাকো তবে শুধু দিয়ে যাও।"

হরলাল নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

শঙ্কর গলা খাটো করে বললে, "ওসব কাজ থাক, বরং অন্য কাজ আমায় দাও। এই তোমাদের জমিতে চাষ করা, গাছে উঠে ফল পাড়া, মাছ ধরা—এসব কাজ বরং অভ্যাস আছে, তবু মিছেমিছি পুজো করা আমার দ্বারা চলবে না।"

হরলাল একটু ভেবে বললে, "ওসব কাজ বামুনের ছেলেকে দিয়ে আমরা করাব না। কথকতা পারবেন ঠাকুরমশাই—তা হলে আমরা বেঁচে যাই।"

শঙ্কর সোৎসাহে বললে, "বহুৎ আচ্ছা, কথকতাই সই, ফাঁকি দিলেও ফাঁসি নেই। কিন্তু বাপু, ওটাও একটু শিখিয়ে দিতে হবে, কথা বলার কসরত তো মন্দ নয়।"

এসব আজ পাঁচ বৎসর আগেকার কথা।

হরলালের কাছে কায়দাটা শিখে প্রথম বৎসরেই এই নূতন কথক বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে।

গ্রামের লোক সগর্বে বললে, "তা আর হবে না? উনি যে বামুন—দেবতা, বামুনের দ্বারা সবই হতে পারে।"

শহর হতে বহুদূরে নাগরিক আবহাওয়ার বাইরে গ্রামের লোকেরা আজও ব্রাহ্মণকে দেবতার মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

(২)

প্রতি বৎসর পৌষ প্রায় শেষ হয়, কেদারের কুটিরের বাইরে মস্ত বড় উঠানটা সামিয়ানা দিয়ে ঘেরা হয়। বাঁশের খুঁটিতে রংবেরংএর কাগজ আঁটা হয়, কাগজের মালা করে দুলিয়ে দেওয়া হয়, নিশান তৈরী করে উড়িয়ে দেওয়া হয়। মকর সংক্রান্তির দিন অষ্টম প্রহর শুরু হয়, নানা দিক হতে লোক এসে জোটে, খোল ও করতালের শব্দে কানে তালা ধরে। কেদারের উঁচু বারাণ্ডায় মেয়েরা বসে, উঠান পুরুষে ভরে যায়।

অষ্টম প্রহর ফুরিয়ে গেলে কথকতা আরম্ভ হয় বৈকাল হতে। উঁচু বেদীর পরে কথক ঠাকুর বসেন—গলায় গাঁদা ফুলের মালা, মাথায় গাঁদা ফুলের মুকুট, পরনে পট্ট বস্ত্র। চারিদিকে শত শত লোক উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে, উৎকর্ণে কথামৃত শোনে—পান করে। কথকতা শুনে কখনও তারা হাসে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, কখনও কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

আবেগ মেয়েদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। সেদিন রাম বনবাস পালা শুনতে শুনতে রামদুরির মা এমনভাবে কেঁদে ছিল যাতে কথক ঠাকুরকে পর্যন্ত থেমে যেতে হয়েছিল।

শঙ্করের দরাজ গলা বহুদূরে পর্যন্ত পৌঁছায়, লোকে খুব খুশী হয়। রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় তারা বলাবলি করে—সত্যি কি সৌভাগ্যবশেই নতুন কথক ঠাকুর এসেছেন, একেই বলে ভগবানের দয়া। বুড়ো কথক ঠাকুর যেদিন মারা যান, সেদিন গ্রামের সবাই একেবারে শোকের মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। তাঁর শূন্য স্থান তিন বৎসর পড়ে ছিল,—কাউকেই পাওয়া যায় নি, শঙ্কর সে স্থান পূর্ণ করলে।

ঈশানি ছিল কথক ঠাকুরের পরম ভক্ত।

গ্রামেরই বধূ সে। স্বামী অনন্ত চাষবাস করে, কীর্তন গাইলে শ্রীখোল বাজায়, মনের আনন্দে থাকে; স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তার শুধু খাওয়ার সময়, অন্য কোন সময় নয়। চিরদিনই সে সংসারে অনাসক্ত, স্ত্রীর প্রতিও তার আসক্তি কোনদিন বুঝা যায় নি।

ঈশানির দিনও কাটে অনাসক্তভাবে।

সংসারের বাঁধাধরা কাজ শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়, দীর্ঘ দিন তার আর কাটে না। দুটি মানুষের রন্ধন—কখন শেষ হয়ে যায়, ধান সিদ্ধ বা চিঁড়া কোটা ধানভানা সব দিন থাকে না, দিন আর যায় না। বাধ্য হয়ে ঈশানি কতকগুলো জীবজন্তু পুষেছে,—কতকগুলো পায়রা, বিড়াল ও কুকুর দিনরাত বাড়িটাকে সরগরম করে রাখে।

অনন্ত ত্যক্ত হয়ে ওঠে। বাড়িতে পা দিয়েই শুনতে পায় পায়রার অশ্রান্ত বকম্ বকম্ শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বিড়ালের মিউ মিউ ডাক ও গরুর চীৎকার, এর মধ্যে প্রায়ই কুকুর বিড়ালে মারামারি, বাড়িতে যেন কান পাতার যো নাই। অনন্ত ক্ষেপে ওঠে, লাঠি নিয়ে পাগলের মত বাড়িময় ছুটোছুটি করে—ব্যাপার দেখে জীবজন্তুরা কে কোন দিকে ছুটে পালায়, কারও সন্ধান মেলে না।

ঈশানির মুখ কঠিন হয়ে ওঠে মাত্র, একটি কথাও সে বলে না; নিঃশব্দে নিজের কাজই করে যায়।

সময়ে সন্তান যদি আসতো—

আরাম প্রয়াসী অনন্ত হয় তো লোটাকম্বল নিয়ে হিমালয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতো। সন্তান না হওয়ার জন্য লোকে দুঃখ করে, স্বার্থপর অনন্তের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অবশেষে ঈশানি ধর্মে মন দিয়েছে।

একদিন আর পাঁচজনের মত তারও সংসার গড়ার ইচ্ছা ছিল, তা যখন হল না, ধর্মে মন না দেওয়া ছাড়া উপায় কি? সংসারের উপর আসক্তি তার একেবারে কমে গেছে। সময় সময় এখন অনন্ত দেখতে পায় ঈশানি ভারি অন্যমনস্ক, যে সংসারকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে আঁকড়ে ধরেছিল, সেই সংসারের কথাই তার মনে নাই।

মাঘ মাসের কথকতা শুনতে ঈশানি কোনদিনই যায় নি—লোকে তাকে ডেকে পায় নি। এবার কেউ না ডাকতেই ঈশানি প্রথম দিন হতে কথকতা শুনতে গেছে, মোহমুগ্ধভাবে কথা শুনেছে।

আর কারও মত সে কাঁদে না, হাসে না, স্তব্ধ হয়ে থাকে। মেয়েরা চোখ মুছতে মুছতে অবাক্ হয়ে তার পানে চায়, মনে ভাবে ঈশানি কাঁদুক, তাদের মত হাসুক, কিন্তু সে যেন সব হতে স্বতন্ত্র, তার নাগাল পাওয়া দুষ্কর।

শঙ্করও তাকে লক্ষ্য করেছিল।

তার মনে হয় এ তাকে অবহেলা করা মাত্র। নিজের কৃতিত্বে উৎসাহিত হয়ে সে যখন সকলের মুখের পানে তাকায় তখনই চোখে পড়ে—এই একটি মেয়েই মাত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে বসে থাকে, কাঁদা বা হাসা যেন তার প্রকৃতির অতীত।

শঙ্করের আত্মঅহঙ্কারে আঘাত লাগে।—

একটি প্রাণী তাকে এড়িয়ে গেছে,—সে কঠোর প্রকৃতি পুরুষ নয়, কোমল হৃদয়া নারী, যার অন্তরে এতটুকু আঘাত লাগলে চোখের জল ঝরে।

ওরে জ[illegible] চাই—

শঙ্কর দারুণ অস্বস্তি বোধ করে।

(৩)

একা পথ চলে ঈশানি—

কথকতা ভেঙে গেছে, লোকজন অনেক আগেই চলে গেছে, বিহ্বলা ঈশানি তখনও বসেছিল।

হঠাৎ যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো, সে চেয়ে দেখলে সবাই চলে গেছে, আলো নিভে গেছে, কথক ঠাকুরের উদাত্ত কণ্ঠস্বর আর কানে আসছে না। জমাট বাঁধা অন্ধকার বারাণ্ডার [illegible] কোণে সে একা বসে আছে, কেউ তাকে ডাকেও নি।

ঈশানি আস্তে আস্তে পথে নেমে পড়লো।

পঞ্চমির চাঁদ অনেক আগে ডুবে গেছে, আকাশ কালো হয়ে গেছে, ঈশানি সেই অন্ধকারে একা পথ চলে।

এমনই একটা অন্ধকার রাতে—

ঈশানি অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকে, কালো অন্ধকারে চোখের সামনে সাদা সাদা অসংখ্য বিন্দু ভেসে বেড়ায়। ঈশানি ভাবে এমনই একটা অন্ধকার রাতে নদের নিমাই ঘর ছেড়েছিল। কোথায় বাঁশি বেজেছিল—যার ডাক তাকে আকুল করে তুলেছিল, —মনে না বাইরে? সেই বাঁশির সুর নদের নিমাইকে করেছিল ঘর ছাড়া—দিকহারা, সে চলেছিল সে চলার শেষ ছিল না। আজ। ঈশানিও বার হয়েছে পথে, বাঁশি যেন কোথায় বাজে।

বাঁশি ডাকছে—এসো, ওগো এসো। ঈশানি যাচ্ছে কোথায়, কোথায় তার লক্ষ্য?

তার গতি যেখানে ব্যাহত হল, সেখানে চমকে উঠে সে চাইলে—

শঙ্করের কুটির; বারাণ্ডায় কে বসে গুণ গুণ করে গাইছে—

বায়ু মন্দ মধুর বহল,

অতি শীতল মলয়ানিল

মলয়ার বাতাস ভালো লাগে না।

ঈশানির চোখের সামনে সহস্র আলো জ্বলে উঠে নিমেষে অন্ধকার হয়ে যায়, তার সারা অন্তর যেন অসাড় হয়ে যায়,—সে ফিরতে যায়, সামনে বাধা পায়—এসে দাঁড়ায় শঙ্কর—

"তুমি এসেছো"—

কণ্ঠে তার উদ্বেলিত সুর,—"আমি জানতুম তুমি আসবে।"

মুহূর্তে ঈশানির চমক ভাঙে,—সে ফেটে পড়লো "তুমি জানতে কথক ঠাকুর, জানতে আমি আসব? আজ কতখানি গাঁজা পুড়িয়েছো জিজ্ঞাসা করি?"

মর্মাহত শঙ্কর কেবলমাত্র বললে, "গাঁজা আমি খাই নে ঈশানি।"—

কঠোর কণ্ঠে ঈশানি বললে, "খাও কথক ঠাকুর, হয় গাঁজা, নয় আফিং—অথবা ওই রকমই কোন কিছু—যা খেলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। নইলে কেউ কোনদিন তার সহজ বুদ্ধিতে ধারণা করতে পারে না কারও বিবাহিতা স্ত্রী এই রকম রাত দুপুরে তার কাছে আসবে।"

সে ফিরলো—তীরবেগে চললো।

"ঈশানি"

জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুকে অনন্তের কণ্ঠস্বর—তার পাশেই ঈশানি হাঁপিয়ে ওঠে—"তুমি এসেছো, ওগো তুমি এসেছো? আমি এসেছিলুম এখানে, কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে আমি অবিশ্বাসের কাজ করি নি।"

সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, অনন্ত তাকে তার দুইটি বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেললে, শান্তকণ্ঠে বললে, "তা আমি জানি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি ঈশানি তোমায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে,—ঘরে চল।"

ঈশানি থর থর করে কাঁপছিল। অনন্ত তাকে একটি হাল্কা পাখীর মতই বহন করে নিয়ে চললো।

(৪)

শঙ্কর ভারি অন্যমনস্ক—

গ্রামের লোক তার বিমর্ষতার কারণ ভেবে পায় না। সকলেই তাকে খুশী করবার চেষ্টায় ফেরে, কিসের জন্য সে বিমর্ষ হয়েছে জানতে চায়।

এখানকার কাজ যেন ফুরিয়ে গেছে, শঙ্কর এখান হতে ছুটি চায়। চিরকালের পথিক সে, মন তার বন্ধ হতে চায় না, পথ তাকে ডাকছে, দূর তাকে আলো দেখাচ্ছে, শঙ্কর পথের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে।

সেদিনে কথকতার বিষয় ছিল নিমাই সন্ন্যাস।

নিমাই গৃহত্যাগ করছে, শচিমাতা ঘরে নিদ্রাগতা, বালিকা স্ত্রী ঘুমে অচেতন, নিমাই সন্তর্পণে শয্যা ত্যাগ করলেন, নিদ্রিতা মায়ের কাছে, পত্নীর কাছে বিদায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে নিমাই অগ্রসর হয়েছেন, জনশূন্য পথে একা পথিক—

কথক ভাবাবেশে স্তব্ধ হয়ে রইলো; চারিদিকে চাপা কান্নার শব্দ শোনা যায়, আজ কোনদিকে কথকের মন আকর্ষিত হয় নি। নিজেকে সে ভাবছিল, সেই অজানা পথের একা পথিক।

সতী বিষ্ণুপ্রিয়া, মাতা শচী দেবী কাঁদেন—

বাতাসের বুকে কান্নার সুর ভেসে যায়, সবাই ডাকে—ওগো এসো, তুমি ফিরে এসো।

কিন্তু নিমাই ফিরলো না; যে যায় সে কি ফেরে?

নিয়মিত সময়ে কথকতা শেষ হয়ে গেল,—ক্লান্ত পদে অবসন্ন মনে শঙ্কর পথে বার হয়; তার মুখে গানের সুর গুনগুনিয়ে ওঠে, অন্যমনস্কভাবে সে গাইছে—

আমার মুখের হাসিতে এসো হে—
আমার চোখের সলিলে এসো,
আমার জীবনে আমার মরণে
আমার শয়নে স্বপনে এসো।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে কে? এক পা পেছিয়ে গিয়ে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে,—"কে?" ঈশানি এক পা এগিয়ে এলো—"আমি, আমি এসেছি। তুমি আমাকে ডাকছিলে তাই—"

"আমি ডাকছি,—তোমায়?"

শঙ্কর মুহূর্তমাত্র স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর বললে, "আজ তো তোমায় আমি ডাকি নি ঈশানি, একদিন হয়তো ডেকেছিলুম, সে ডাক আজ আমার ফুরিয়ে গেছে।"

ঈশানি তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো, ব্যাকুলভাবে হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আজ আমাকে ফিরিয়ে দিলে চলবে না কথক ঠাকুর, আমি অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে তোমার কাছে এসেছি, আমায় আশ্রয় দাও, আমায় এখান হতে নিয়ে চলো।"

শঙ্কর নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে রইলো।

একদিন সে চেয়েছিল এই নারীকে জয় করতে, জয় করা তার হয় নি, পরাজিত হয়ে সে ফিরেছিল; কিন্তু সে পরাজয়ে ছিল আনন্দ, ছিল তার তৃপ্তি। সেদিন সে যা চেয়েছিল সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে; অনাসক্ত মন বাঁশির সুর শুনেছে, সে ঘর ছেড়ে বাইরের পথে পা বাড়িয়েছে।

ঈশানির কথা সে সবই জানে, সংসারে চিরাসক্ত মন তাঁর অনাসক্ত হয়ে উঠেছে, সংসারের প্রতি কর্তব্য সে পালন করতে পারছে না, তাই সে চায় মুক্তি, একেবারেই মুক্তি।

শঙ্কর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লে—"হতে পারে না ঈশানি, আর হতে পারে না। আমি এখান হতে চ'লে যাচ্ছি, এখানে থাকা আর পোষাবে না।"

ঈশানি বললে, "আমিও যাব।"

শঙ্কর হেসে উঠলো—"ক্ষেপেছো—তাই কখনও হয়? আমি পথের লোক, পথ বেয়ে চলাই আমার কাজ, গাছতলায় দশদিন কাটাতে পারি, না খেয়ে দুদিন কাটাতে পারি, তুমি তো তা পারবে না ঈশানি।"

নিরুপায় ঈশানির দুই চোখ দিয়ে নিঃশব্দে কেবল জল ঝরে পড়ে।

শঙ্কর কেবল বলে—"ছিঃ"—

সে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে—দূর হতে তার গান শোনা যায়—

ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন,
ভুজবন্ধনে ফিরে এসো
চিরবাঞ্ছিত ফিরে এসো।

কান্নাভরা সুর কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে আসে। দুই হাত মুখে চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঈশানি ফেরে তার পিছনে ফেলে আসা ঘরের পানে।

(৫)

কুটিরের মধ্যে একা শঙ্কর—

এক কোণে মাটির প্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলে, কুটিরের পাশে তারই স্বহস্ত রোপিত গাছ হতে হাসনুহেনা ফুলের গন্ধ ভিতরে ভেসে আসে।

ঘর ছেড়ে শঙ্কর বাইরে এসে দাঁড়ায়।

আকাশে পাতলা মেঘের আড়ালে শুক্লা একাদশীর চাঁদখানা জেগে থাকে, মলিন আলোয় পথঘাট চেনা যায়।

যাত্রার সময় উপস্থিত।

গ্রামবাসীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, জেগে উঠলে শঙ্করের যাওয়া হবে না, হাজার বাহুর বাঁধনে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়বে, হাজার চোখের জলে তার দৃঢ়সংকল্প ভেসে যাবে।

গভীর রাতে ঈশানির গভীর ঘুম ভেঙে যায়, ধড়ফড় করে সে বিছানায় উঠে বসে, ঘুমন্ত অনন্তের গায়ে হাত দিয়ে সে ডাকে—"ওগো, শোন শোন, কে যেন গান গেয়ে যাচ্ছে।"

গানের সুরই শুধু নয়, কথাও বুঝা যায়; সামনের পথ দিয়ে শঙ্কর গান গেয়ে চলে—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

দূর হতে দূরে—বহুদূরে বাঁশির সুরে গান ভেসে যায়। উৎকর্ণে ঈশানি শোনে—

কত মধুযামিনী রভসে পোহাইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

ঈশানীর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো; অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে স্বামীকে ডাকছিল—"ওগো শুনছো, কথক ঠাকুর চলে গেলেন, বলেছেন আর আমাদের এ গাঁয়ে থাকবেন না।"

অনন্ত নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কেবল একটা হুংকার ছাড়লে—"হুঁ—"

নিশ্চিন্তভাবে পাশ ফিরে শুয়ে সে বললে, "যাক্, তুমি ঘুমাও ঈশানি"—

অভিভূতের মত ঈশানি বসেই রইলো—

দূরে—অতিদূরে বেদনার্ত সুরের একটি লাইন ভেসে আসছিল—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

ঈশানির চোখের সামনে কল্পনায় জেগে উঠলো কথকঠাকুরের কথামৃত নিমাইয়ের সংসার ত্যাগের ছবি।—নিমাই আর সংসারে ফেরে নি, আজ যে চলে গেল, সে কি আর কোনদিন ফিরে আসবে?

মণিকার দিন-পঞ্জি

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

প্রত্যহ শেষরাত্রে ঠিক সাড়ে চারটা হইতে পাঁচটার মধ্যে মণিকার ঘুম ভাঙিয়া যায়। শরতের লঘু মেঘখণ্ডের মতই লঘুতর গতিতে সে আসিয়া গলির উপরের বারান্দাটায় দাঁড়ায়। ঝাপ্‌সা দৃষ্টি দিয়া সম্মুখের মাঠের ওপারে মারোয়াড়ি বাড়িটার দিকে চাহিয়া দেখে, চরতলার মারোয়াড়ি বৌটি জাগিয়াছে কিনা। মণিকার মনে রোজই কিন্তু কেমন একটা অহেতুক আশঙ্কা জাগে যে, বৌটি বুঝি তাহার আগেই জাগিয়া তাহার জন্য একটু অপেক্ষা করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন বৌটি আস্তে আস্তে জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন দুইজনেই হাসিয়া ফেলে। আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার পর উহারা পরস্পরের কাছে বিদায় লয়।

মিনিট পনর বাদে দেখা যাইবে মণিকা উনান ধরাইতেছে। অত ভোরে রান্নার সরঞ্জাম লইয়া কাহাকেও রাঁধিতে দেখিলে আপনি হয়ত একটু বিস্ময়, একটু কৌতূহল বোধ করিবেন। কিন্তু মণিকার ইহা প্রাত্যহিক অভ্যাস। মণিকাদের বাসা হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল দূরে কলিকাতার উপকণ্ঠে তাহার দাদার অফিস—পাটের গুদাম। মহানগরীর যান-বাহন মণিকার দাদার মত হতভাগ্যদের জন্য নহে। মাস মাহিনা যাহা সে পায়, তাহাতে কোনরকমে দুইবেলা আধপেটা খাইয়া থাকা চলে, যান-বাহনের বিলাস চলে না। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে মণিকা তাহার নিপুণ হস্তে দাদার মত একপ্রস্থ আহার্য প্রস্তুত করে। ততক্ষণে দাদা তাহার স্নান সারিয়া দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতে উঠিতে জোর গলায় ডাকে, "রেডি, মণি?" থালার উপর আহার্য সাজাইতে সাজাইতে মণিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, "ইয়েস্, দাদা।" তারপর স্নেহময়ী ভগ্নী পরম যত্নে দাদার খাওয়ার তত্বাবধান করে। সকালবেলাটায় দাদার খাওয়া কিন্তু বড়ই তাড়াতাড়ি, কোনরূপে দুই-চারিটা নাকে-মুখে গুঁজিয়া যাওয়া অভ্যাস। ইহার জন্য মণিকা প্রায়ই অভিমানের সুরে অনুযোগ করে। ফল কিন্তু কিছুই হয় না। হন্তদন্ত হইয়া উঠিতে উঠিতে দাদা বলে, "একি তোর শ্বশুর-বাড়ি রে, এ হচ্চে অফিস, একটু দেরি হলে—হুঁ-হুঁ বাবা!" দাদার আচাইয়া আসিতে আসিতে মণিকা একটা পান সাজিয়া ফেলে। পান মুখে দিয়া জামা পরিতে পরিতে দাদা বলে, "কী চমৎকার পানই সেজেছিস মণি। বিয়ে হলে বলবে তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে হ্যাঁ......।" বাইশ বৎসরের অনূঢ়া তরুণী মণিকা দাদার অলক্ষ্যে একটু রাঙা হইয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই ছাতা হাতে লইয়া ব্যস্তভাবে দাদা বাহির হইয়া যায়; আর 'দুর্গা, দুর্গা' বলিতে বলিতে মণিকা বাহিরের বারান্দায় দাদা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া থাকে।

ছোট ভাই-বোন দুটি এবার কোথা হইতে আসিয়া দিদির কাছে খাওয়ার জন্য আবদার ধরে। মণিকার কিন্তু সেদিকে যথেষ্ট খেয়াল থাকে। দাদার জন্য রাঁধিবার সময় একফাঁকে সে কয়েকখানি রুটি করিয়া রাখে। ভাই-বোন দুটির কাছে রুটি-গুড় আগাইয়া দিতে দিতে সে প্রত্যহের মতই তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে থাকে "হ্যাঁরে, এত বেলা পর্যন্ত তোরা কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়াস, বল্ দিকি? লেখাপড়া করতে হবে না, না কি!" ভাই-বোন দুজনেই একত্রে উত্তর দিয়া ফেলে, "বা রে, বাবার সঙ্গে যে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।" "বেড়াতে বেরিয়েছিলি কি এখন," মণিকা একটু রাগিয়া যায়, "আগাগোড়া এতক্ষণ বাবার সঙ্গেই বুঝি ছিলি? আসুক তো বাবা, জিজ্ঞেস করব'খন।" ভাই-বোন দুটি এবার চুপ করিয়া থাকে। মণিকা বুঝিতে পারে, উহারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ গলিতে অথবা মাঠে খেলিয়া বেড়াইয়াছে।

বৃদ্ধ পিতা ততক্ষণে বাজার লইয়া আসিয়া পড়েন। মণিকা দুই-একখানা রুটি মুখে দিয়া আবার রান্নার জন্য প্রস্তুত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পিতার কাছে একবার অভিযোগ করিয়া যাইতে ভোলে না, "বাবা, রেখা-সন্তুর তো লেখাপড়ায় দেখছি একেবারে মন নেই। একটি সাত বছরের, আর একটি পাঁচ বছরের ধিঙ্গী, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়াতেই ভালো লাগে ওদের। বাজার করে এসে সকাল বেলাটায় তো ওদের একটু পড়াতে পার।" পিতা নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিকা বাহির হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরে বসিয়া মণিকা হঠাৎ শুনিতে পায়, রেখা-সন্তুর ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছে। মণিকার বুঝিতে বাকি থাকে না যে বাবা একফাঁকে চায়ের দোকানের আড্ডার উদ্দেশ্যে পলাইয়া গিয়াছেন। সে তাড়াতাড়ি এঘরে ছুটিয়া আসিয়া ঝগড়ার কারণটা শুনিয়া লইয়া বলে, "ছি সন্তু, তুমি না বড় ভাই, ছোট বোনের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে? একটা শ্লেটে কি এক সঙ্গে দুজনের লেখা হয়? রেখার লেখা হোক, তারপরে তুমি লিখো, কেমন?" অনিচ্ছাসত্বেও সন্তু চুপ করিয়া থাকে। মণিকা রান্নাঘরে চলিয়া যায়। রান্নায় ব্যস্ত থাকিলে কি হইবে, মণিকার কিন্তু ভাই-বোনের পড়ার দিকেও মন থাকে। সে হাঁকিয়া বলে, "র‍্যাম্ মানে পারা নাকি রে সন্তু, রোজ একই ভুল? র‍্যাম্ মানে ভেড়া।......এই রেখা, গিয়ে বড্ড মারব কিন্তু মুখপুড়ী, এগার বুড়ি তিন পণ বুঝি! বই দেখে লিখছ, তাও ভুল, এ্যাঁ?" আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় তিন-চারবার আসিয়া ভাইবোনে জ্বালাতন করিবে পড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া। শেষে বিরক্ত হইয়াও মণিকা হাসিয়া ফেলে, বলে "আচ্ছা যাও, বইপত্তর ঠিক করে রেখে নেয়ে এস। তার আগে কোথাও না কিন্তু, বলে দিচ্ছি।" রেখা-সন্তু আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া যায়।

মধ্যাহ্নের খাওয়ার পর্ব শেষ করিতে করিতে বেলা প্রায় একটা-দেড়টা বাজিয়া যায়। এতটা দেরি হয় একমাত্র পিতার জন্য। নহিলে, রান্নাবাড়া শেষ হওয়ার পর ভাই-বোন দুটিকে ডাকিয়া খুঁজিয়া আনিয়া বহুক্ষণ পূর্বেই সে তাহাদের স্নানাহারের পালা সমাপন করিয়া ফেলে। কিন্তু বাঙালী নারীর স্বভাবধর্মবশতই বুঝি সে পিতা আসিবার পূর্বে নিজে

আহার করিতে পারে না। পিতা আসিয়া স্নেহ-তিরস্কার করেন, "তোকে রোজ বলি মণি, তুই খেয়ে নিস......এত অবাধ্য কেন বল্ তো তুই।" ভাত বাড়িতে বাড়িতে মণিকা বলে, "চাকরি যাবার পর থেকে তুমি যেন কী হয়ে গেছ বাবা। কিছুরই ঠিক নেই, এত অনিয়ম, মা-ও নেই যে বকে-ঝকে...।" ভাতের থালাটা কাছে টানিয়া লইতে লইতে পিতা হাসিয়া বলেন, "তুই-ই তো আমার মা রে বেটি, তুই-ই বা আমায় কী কম বকছিস।"

খাইয়া উঠিয়া মণিকা বাসন কয়টা আর ফেলিয়া রাখে না, তখন-তখনই মাজিয়া ফেলে। ইহার পর প্রায় তিন-চার ঘণ্টা সমানে নিরবচ্ছিন্ন অবসর। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা, বাহিরের উদাস বাতাস, মাঝে মাঝে দুই-একটা ফিরিওয়ালার ডাক—সবগুলি মিলিয়া এই সময়টায় মণিকাকে যেন কি রকম করিয়া ফেলে। আত্মগতভাবে মণিকা কখন আসিয়া বাহিরের বারান্দাটায় দাঁড়ায়, তাহা সে বুঝিতেও পারে না। এক সময় হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখে, সেই মারোয়াড়ি বৌটি হাসিমুখে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। ঘরের মধ্যে নিদ্রিত ভাইবোন দুটির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া মণিকা হিন্দী-বাঙলায় মিশাইয়া কোনরকমে বলে, "আমি কি করে যাব, ওরা উঠে কান্নাকাটি করবে যে। তুমিই এস না।"

বৌটিও বলে, "আমি বৌমানুষ, আমি কি যেতে পারি। চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি, এস না ভাই, লক্ষ্মীটি।" তার ভঙ্গীতে মিনতি যেন ঝরিয়া পড়ে। মণিকা তাহাকে কোনরকমে বুঝায়—আচ্ছা, একদিন সে যাইবে। প্রায়ই দ্বিপ্রহরে মণিকাকে সেলাইয়ের কাজ করিতে দেখে বৌটি। তাই, কোন কোন দিন সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে সেলাইয়ের হাত-কলটি আনিয়া মণিকাকে লোভ দেখায়, যাহাতে মণিকা তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে যায়। মণিকা কিন্তু ঐ এক কথাই বলে যে, আর একদিন নিশ্চয়ই যাইবে সে। সমানে জোর গলায় কথাবার্তা বলিতে তাদের ভয় ও লজ্জা করে। তাই, কখনও বা ইসারায়, কখনও বা অর্ধোচ্চকণ্ঠে তাহাদের গল্প চলে। মণিকার যে বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছে, বৌটি তাহা জানে। ভাবী বরপক্ষেরা তাহাকে যে মাঝে মাঝে দেখিতে আসে, লুকাইয়া লুকাইয়া সকলই সে লক্ষ্য করে। খবর জানিবার জন্য এ সম্বন্ধে সে মণিকাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে। মণিকার স্বাস্থ্য যাহাও বা একটু আছে, রূপসী তাহাকে একেবারেই বলা চলে না। এ জন্যও বটে, বিশেষ করিয়া তাহার বয়সাধিক্যের জন্যও বটে, এ পর্যন্ত তাহাকে কাহারই পছন্দ হইল না। তাই, সমবয়স্কা মারোয়াড়ি তরুণীর অপূর্ব রূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মুখে হাসি টানিয়া সে ইসারায় বলে যে, বন্ধুর মত রূপ থাকিলে তাহার আজ ভাবনা কি ছিল। একটু নীরব থাকে বৌটি। তারপরই হাসিয়া খাইবার ভঙ্গী দেখাইয়া ইসারায় জিজ্ঞাসা করে, বিবাহে সে নিমন্ত্রণ পাইবে তো। এ কথার কোন জবাব দিতে পারে না মণিকা। হঠাৎ কেমন একটা সলজ্জ শিহরণ তাহার সর্বাঙ্গে বহিয়া যায়। সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে পলাইয়া যায়। ইহার পর মণিকার সময় যেন আর কাটিতে চাহে না। সেলাইয়ের কাজ কিছু আছে কি-না, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে সে। সেরকম কোন কাজ পাইলে, তাহা লইয়াই সে বসিয়া পড়ে। তাহা না হইলেই হয় মুশকিল। অগত্যা সে উপরে তেতলার উকীল-বৌয়ের কাছে চলিয়া যায়, লাইব্রেরির কোন বই পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য। কিন্তু বই সে প্রায়ই পায় না, কারণ উকীল-বৌ নিজে তখন একমনে বই পড়িতে থাকে। তখন কি আর করিবে মণিকা। উকীল-বৌয়ের সর্বশেষ দেখা সিনেমার বইটা লইয়া চলিয়া আসে সে। একটুখানি বই—পড়িতে তাহার বেশিক্ষণ লাগে না। পড়া শেষ হইলে কোন কোন দিন হঠাৎ তাহার মায়ের ফটোটার দিকে চোখ পড়িয়া যায়। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল মা তাহার মারা গিয়াছেন। কিন্তু মণিকার মনে হয়, এ যেন সেদিনকার কথা। মার চলাফেরা, মার সেই কণ্ঠস্বর, মার সেই হাসি—সব যেন উজ্জ্বল হইয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মণিকার লেখাপড়া শেষ হইল, সেই হইতে সংসারের জোয়াল সে কাঁধে করিয়া টানিয়া চলিয়াছে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এক সময় অজ্ঞাতসারে মণিকার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। কেন যেন সে নিদ্রিত পিতা এবং ভাইবোনের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। তারপর সহসা সে রেখা-সন্তুর মুখে পরম স্নেহে দুটা চুমা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

সকাল বেলাটায় জল তুলিবার জন্য কোন অসুবিধা হয় না, কারণ প্রায়ই অন্য সকলের আগেই মণিকা গিয়া কল অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু বিকাল বেলায় মণিকা নীচে নামিয়া দেখে, জল তুলিবার লোক অনেক, ভিড় বড় কম নহে। একে একে সকলের কাজ শেষ হইলে, তবে মণিকা কল পায়। জল তুলিতে তুলিতে মণিকা ভাবে, বাড়ির সকলে তাহাকে যেন একটু অনুকম্পার চোখে দেখে। খোলাখুলিভাবে কথা-বার্তা অবশ্য সকলেই তাহার সহিত বলে, তথাপি মণিকার যেন কেমন-কেমন মনে হয়। কলের কাজ অনেকেই হয়ত একটু তাড়াতাড়ি শেষ করিতে পারে, কিন্তু মণিকাকে দেখিলেই তাহাদের যেন আর কাজ ফুরাইতে চাহে না। নিজেদের দারিদ্র্যের কথা ভাবিয়া এবং এত বয়স পর্যন্ত নিজের বিবাহ না হওয়ার কথাটা স্মরণ করিয়া মণিকা মনে মনে বেশ একটু সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া পড়ে।

ভাইবোন দুটিকে ডাকিয়া তাহাদিগকে বিকালের মত সামান্য কিছু খাওয়াইয়া দেয় মণিকা। তাহার পর নিজেও একটু কিছু মুখে দিয়া সে ছাদে বেড়াইতে যায়। সন্ধ্যার দিকে এইটুকু সময় তাহার বড় ভাল লাগে। ঘরের মধ্যে তো সে চব্বিশ ঘণ্টাই আবদ্ধ থাকে। ছাদের উন্মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইয়া বাহিরের জগতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার যেন আর আশ মিটে না। ছাদে তখন বাড়ির সকল মহিলাই থাকে। মণিকা নিজে হইতে তাহাদের সহিত বড় সাবধানে কথা বলে। কারণ, মণিকা আসিলেই তাহারা কথায় কথায় আজকালকার মেয়েদের অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার কুফল কি

হইতেছে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিতে সুরু করিয়া দেয়। বাড়িতে বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া বলিতে একমাত্র মণিকাই আছে। সেইজন্য, তাহারা সকলে যেন মণিকাকে পাইয়া বসে। মণিকা উঠিয়া যাইতেও পারে না, অথচ বসিয়া বসিয়া সমস্ত অপ্রীতিকর ও লজ্জাকর ইঙ্গিত শুনিয়া তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ছাদে গিয়া মাঝে মাঝে সে কাহারও সহিত কথা বলে না। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, পরোক্ষ-ভাবে বহু কটূক্তি তাহাকে শুনিতে হয়। যাহা হউক, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলে নামিয়া গেলেও, মণিকা আলিসে ভর দিয়া আত্মগতভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। ভাইবোন দুটি কোথায় কি করিতেছে, সে কথা তখন তাহার মনেও থাকে না। এই সময়টায় নিজেকে একলা পাইয়া সে পরম তৃপ্তি অনুভব করে। সম্মুখের অসীমের মধ্যে কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয় সে। কিন্তু বহু কথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ যেন সে মানস-চক্ষে দেখিতে পায়,—দাদা তাহার অফিসের কাজ শেষ করিয়া উঠিল, তারপর ছাতাটা হাতে করিয়া ক্লান্তদেহে রাস্তায় আসিয়াই সুদীর্ঘ পথের কথা চিন্তা করিয়া একটু যেন থামিল সে, কিন্তু পরক্ষণেই অবাধ্য পা দুটাকে জোর করিয়া চালাইয়া দিল। কথাটা মনে পড়িতেই মণিকা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসে। ঘরে ধুনো-গঙ্গাজল দিয়া সে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইতে জ্বালাইতে রেখা-সন্তু আসিয়া পড়ে। তাহাদিগকে হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া পড়িতে বসিবার আদেশ দিয়া মণিকা গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করে।

আটটা, সাড়ে আটটার সময় দাদা আসিয়া ডাক দেয়, "মণি কই রে।"

"এই যে যাই দাদা," মণিকা তৎক্ষণাৎ রান্নাঘর হইতে জবাব দেয়, "এই রেখা দাদার হাতমুখ ধোবার জল দে।" একটু পরেই মণিকা আসিয়া দাদার কাছে বসে। দাদা রোজই একটা-না-একটা গল্প জুড়িয়া দিবে। কিন্তু রান্না চাপাইয়া আসিয়া বসিয়া বসিয়া গল্প শুনিবার সময় মণিকার থাকে না। সে তখনই উঠিয়া পড়ে, যাইবার সময় বলিয়া যায়, "আবার পালিও না যেন দাদা, খেয়ে বেরোও। অত রাত করে ফিরবে দাবার আড্ডা থেকে, কে হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে বল তো তোমার জন্যে।"

দাদা উত্তর দেয়, "দূর পাগলী, এই সন্ধ্যে রাত্তিরেই কি কেউ খেয়ে নেয় রে। তার চেয়ে কিছু থাকে তো বার করে দে, খেয়ে যাই।"

মণিকা কিন্তু দাদার জলযোগের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে। সে আসিয়া মুড়ি, রুটি অথবা সুজি, যেদিন যাহা থাকে, বাহির করিয়া দেয়। দাদা তাহা খাইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

রান্নাঘরের পাট শেষ করিয়া আসিতে আসিতে মণিকার রাত্রি বারটা বাজিয়া যায়। ততক্ষণে বাড়ির সকলেই প্রায় ঘুমাইয়া পড়ে। নিজের ঘরে আসিয়াও মণিকা দেখে, বাবা, দাদা, রেখা, সন্তু সকলেই ঘুমাইয়া আছে। দরজায় খিল দিয়া আলোটা নিভাইয়া শুইয়া পড়ে মণিকা। তারপর প্রত্যহের মত জানালার ভিতর দিয়া সে আকুল দৃষ্টিতে মারোয়াড়ি বৌটির ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যহই তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের পালা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিতে করিতে কখন্ একসময় তাহার চোখ দুটি ধীরে ধীরে মুদিয়া আসে।

জীব ও জীবন

(১০৫ পৃষ্ঠার পর)

প্রাণের সমাবেশ নিয়েই প্রাণী বা উদ্ভিদ। এরা সহযোগী; তাই সমস্ত কোষের সঙ্গেই এরা মিলেমিশে বিরাট্ প্রাণের সৃষ্টি করে। কিন্তু এক-কোষি জীবও আছে। ডিম, স্পার্মাটোজোয়া, পুষ্প-রেণু এরা সবাই এক-কোষি। মানুষের ক্ষেত্রে নারীর ডিম আর পুরুষের স্পার্ম মিলিয়ে আবার একটি নূতন কোষ—তারপর তা থেকে অগণিত অসংখ্য কোষ; যাদের সুশৃঙ্খল সমাবেশে হয় মানুষ বা গাছ।

জীব বা জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে মনোবাদী দার্শনিকেরা যাই বলুন, আপাতত আমরা যা পাচ্ছি তা নিতান্ত ব্যবহারিক—পদার্থ ও রসায়নের মধ্যে তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে। ঐ গুরুতর তর্ক আরও ঘনীভূত হয় জীবনের কথা তুল্লে। কিন্তু সে স্বতন্ত্র অধ্যায়।

দার্দেনেলিস ও সাম্রাজ্যবাদ

রেজাউল করীম, এম. এ., বি. এল

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে নিকট প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে তাহার করুণ কাহিনী পাঠ করিলে প্রত্যেক এসিয়াবাসীর হৃদয় শিহরিয়া উঠিবে। "কোন রাষ্ট্রকেই সবল হইতে দিব না, স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিব না," দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইহাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের অভিসন্ধি। তাঁহারা নানা অছিলায় নিকট প্রাচ্যের প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এবং বহু ক্ষেত্রে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বিরাট তুর্কি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য তাঁহারা দার্দেনেলিস ও বসফোরাসের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন তাহার করুণ কাহিনী আজ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব।

বসফোরাস ও দার্দেনেলিস এই দুইটি প্রণালী (Straits) আন্তর্জাতিক জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বসফোরাস প্রণালী কৃষ্ণসাগরকে মর্মরসাগরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। আর দার্দেনেলিস প্রণালী ইজিয়ানসাগরের সহিত সংযুক্ত, এবং ইহার মধ্যবর্তিতায় ভূমধ্যসাগরের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই দুইটি প্রণালীর সহিত প্রাচীন জগতের নানা ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। ইহাদের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব এত অধিক যে, এই দুইটিকে বাদ দিলে ইউরোপ ও এসিয়ার অর্ধেক কাহিনী অলিখিত থাকিয়া যাইবে। কারণ এই দুইটি প্রণালী এসিয়া ও ইউরোপ এই দুইটি প্রাচীন মহাদেশের একদিকের সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেছে। এবং এই স্থান আফ্রিকা হইতেও বেশী দূরে অবস্থিত নহে। জেরুজালেম এখান হইতে অতি নিকটেই অবস্থিত। পারস্যের সম্রাট কাইরাস ও জেরেক্সেস এই প্রণালীদ্বয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের বিরাট বাহিনী গ্রীসের বিরুদ্ধে লইয়া গিয়াছিলেন। যখন মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাঁহার এসিয়া অভিযানে বহির্গত হন তখন তিনি এই প্রণালী অতিক্রম করিয়াই গিয়াছিলেন। রোম যখন এসিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে তখন এই প্রণালীদ্বয় বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলা খেলিয়াছিল। বর্তমান তুর্কি জাতির পূর্বপুরুষগণ এই প্রণালী পার হইয়া ইউরোপ জয় করিয়াছিলেন। তুর্কিরাই কালক্রমে সমগ্র বলকান উপদ্বীপে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের এই অঞ্চলে একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিয়াছিল। সুতরাং বিভিন্ন জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে এই প্রণালী দুইটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

রাশিয়ার ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে সমুদ্র পথে বহির্জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প। সেই জন্য রাশিয়া বহু পূর্ব হইতে একটা সমুদ্রপথ অনুসন্ধান করিতেছিল। অতি সহজেই তুর্কির এই দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। এই প্রণালী দুইটি, তাহার নিকট সকল কামনার সার হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রণালী দুইটি ছিল তুরস্কের কর্তৃত্বাধীনে, কিন্তু কেমন করিয়া এ দুইটিকে হাত করা যায়? এই সময় তুরস্ক ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাপে ক্রমশ হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। রাশিয়া দেখিল এই সুযোগ হারাইলে চলিবে না। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ছল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কথায় বলে খলের ছলের অভাব হয় না; রাশিয়ারও হইল না। সে ছলটা মাইনরিটি সমস্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুরস্কের সুলতান তাঁহার অধীনস্থ মাইনরিটি খৃষ্টানদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতেছেন এই অজুহাতে রাশিয়া এই সব মাইনরিটিদের স্বার্থরক্ষার জন্য তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। রাশিয়া খৃষ্টানধর্মের যে দলভুক্ত ছিল (Greeco Roman Church) তুরস্কের অধিকাংশ খৃষ্টানগণ সেই দলভুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া ইহারা শ্লাভোনিয়া জাতির শাখাভুক্ত ছিল। রাশিয়ার সহিত ইহাদের রক্তের সংমিশ্রণ ছিল। সুতরাং রাশিয়া হঠাৎ ইহাদের মুরুব্বি সাজিয়া গেল। এই সময় ইউরোপ ও এসিয়ার বহু অঞ্চলে রাশিয়া নানা ছল তুলিয়া রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। রাশিয়া দেখিল যে যদি এই প্রণালী দুইটি অধিকার করা যায় তাহা হইলে ইউরোপের মধ্যে সে একটা নেতৃস্থানীয় আসন পাইতে পারে। সমুদ্রপথে একটা চিরস্থায়ী পথ পাইবে। আর কনস্টানটিনোপল তাহার একটা প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত হইবে। কিন্তু যদি রাশিয়ার কোন শত্রু স্থানীয় শক্তি এই প্রণালী দুইটির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে তাহা হইলে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবে। রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের এক প্রান্তে আবদ্ধ হইয়া রহিবে। তাহার ব্যবসায় বাণিজ্য অপরে নিয়ন্ত্রিত করিবে। সেই জন্য রাশিয়ার বহু ধুরন্ধর 'ডিপ্লোম্যাট' বা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রণালীদ্বয়কে আয়ত্বে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এইভাবে জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধীরে ধীরে রাজ্য প্রসার নীতি অবলম্বন করিল। বহুযুগ পর্যন্ত সংগ্রাম করার পর রাশিয়া ১৭৮৭ সালে কৃষ্ণসাগরের উত্তর সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। এই সময় পর্যন্ত তুরস্কই কৃষ্ণসাগরের একমাত্র প্রভু ছিল। কিন্তু রাশিয়ার চক্রান্তে তুরস্ককে এ প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল। রাশিয়া ১৭৯২ সালে য়াডেশান (Yadesan) জয় করিয়া লয়। এবং অগ্রসর হইতে হইতে ডিনেস্টর পর্যন্ত অধিকার করিয়া লয়। অতঃপর ১৮১২ সালে তুরস্কের নিকট হইতে বেসারাবিয়া কাড়িয়া লয়। এইভাবে তাহারা সীমান্তকে বিস্তৃত করিয়া প্রুথ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। রাশিয়ার এই সকল বিজয়ে ইউরোপের কতকগুলি শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু

অনেক বাদানুবাদের পর ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস রাশিয়ার এই সকল অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। এই সময় গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই গ্রীক বিদ্রোহের সুবিধা লইতে রাশিয়া কোন কসুর করিল না। তুরস্ক তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছে এই অজুহাতে যখন গ্রীস যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং জয় করিতে করিতে কনস্টানটিনোপলের দ্বার দেশ পর্যন্ত আসিয়া পড়িল, তখন তুরস্ক সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ১৮২৯ সালে আড্রিয়া-নোপলের সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। এই সন্ধি অনুসারে ড্যানুব নদীর দুই তীরে তুরস্কের অধীনে দুইটি স্বায়ত্বশাসনমূলক রাষ্ট্র গঠিত হয়—ম্যালডাভিয়া, এবং ওয়ালাচা। বর্তমান রুমানিয়া রাজ্যের ইহাই গোড়ার পত্তন। এইগুলি নামে মাত্র তুরস্কের অধীনে ছিল। কিন্তু কার্যত রাশিয়াই ইহার উপর কর্তৃত্ব করিত। উপরোক্ত সন্ধির দ্বারা তুরস্ক ককেসাস ও কৃষ্ণসাগর এবং ক্যাসপিয়ান হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চল হইতে তাহার অধিকার পরিত্যাগ করে। কিন্তু এই সন্ধির বহু পূর্ব হইতেই রাশিয়া এই অঞ্চলের দেশগুলিকে একে একে জয় করিতেছিল। ১৭৮৪ সালে জর্জিয়া প্রদেশের উপর রাশিয়া 'প্রটেকটোরেট' স্থাপনকরে। ১৮০১ সালে ও তৎপরবর্তী কয়েক বৎসরে মিনগ্রেলিয়া, বাকু, ইমারটিয়া, দাগস্থান, শিরভান এবং উত্তর টালিশ—এই কয়েকটি প্রদেশের উপর রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হয়। অতঃপর ১৮২৫ সালে পারস্যের নিকট হইতে এরিভান ও নাখিচিভান কাড়িয়া লয়। ইহার পর কুবান রাশিয়ার করতলগত হয়। ১৮৭৮ সালে বাটুম এবং কারস্ অঞ্চল রাশিয়ার অধীনে আসিতে বাধ্য হয়। বহু বৎসর পরে ১৯২৩ সালে সোভিয়েট রাশিয়া এই শেষোক্ত প্রদেশ দুইটি তুর্কিকে ফেরৎ দেয়। উপরোক্ত প্রদেশগুলি জয় করিয়া রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্বতীরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়—তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এইভাবে কিঞ্চিৎ ফললাভ করে। এখন পর্যন্ত ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয় নাই—তবে তাহারা অপলক চোখে রাশিয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

কিন্তু এত করিয়াও রাশিয়া প্রণালীদ্বয়ের কোন কিনারা করিতে পারিল না। কারণ এ দুটি এখনও তুর্কির কবলিত। এ বিষয়ে রাশিয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বহু বিঘ্ন ছিল। সব চেয়ে প্রবল ও কার্যকরী বাধা আসিল ইংলন্ডের দিক হইতে। ইংরেজ চাহিয়াছিল ভূমধ্যসাগরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে। কারণ তাহার বহু নৌঘাঁটি ভূমধ্যসাগরেই ছিল। কিন্তু রাশিয়া যদি প্রণালী দুইটি অধিকার করে, অথবা তাহাদের উপর কোনও রূপ কর্তৃত্ব করে তবে তাহাতে ইংলন্ডের ষোল আনা ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। তাই ইংরেজ চাহিয়াছিল যেন কনস্টানটিনোপল ও প্রণালী-দ্বয় কোন দুর্বল, ক্ষীণ ও অধীনস্থ রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকে। তাই রাশিয়াকে দাবাইবার জন্য সে তুর্কিকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং সে জন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত রহিল। অতঃপর সে তুরস্কের সহিত এই মর্মে সন্ধি করিল যে, তুরস্ক তাহার প্রণালী দুইটি সর্বজাতির যুদ্ধ-জাহাজের পথ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ফ্রান্সও ইংলন্ডের এই কার্য সমর্থন করিল। কারণ বহু যুগ হইতে ফ্রান্সের সহিত তুরস্কের একটা বাণিজ্যিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছিল। তুরস্ক ফ্রান্সকেই খৃস্টানধর্ম তীর্থগুলির তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছিল। এই সময় তুরস্ক অস্ট্রোহাঙ্গারীর মিত্রতা লাভ করিল। অস্ট্রিয়া বহুদিন হইতে বলকান হইতে রাশিয়ার প্রভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অস্ট্রিয়া প্রণালীর প্রশ্নকে ইউরোপের অন্যান্য কঠিন প্রশ্নের সহিত অবিচ্ছেদে বিজড়িত বলিয়া মনে করিল। কারণ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির শক্তির ভারসাম্য অনেকটা এই প্রশ্নের উপর নির্ভর করিতেছিল। যে শক্তি প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে সেই প্রবলতম হইয়া উঠিবে। সুতরাং অস্ট্রিয়া তুরস্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইল। আর অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপ প্রণালীর সমস্যাকে সমগ্র বল্কান ও ইউরোপের সমস্যার সহিত অন্তর্ভূত করিয়া ফেলিল। রাশিয়া দেখিল ব্যাপার ত মন্দ নয়! কোথায় সে একাকী তুরস্ককে উদরাসাৎ করিয়া লইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া ইউরোপের বড় বড় মস্তিষ্ক তাহাদের সমস্ত শক্তি এই দিকে নিয়োজিত করিতেছে। রাশিয়া প্রমাদ গণিল। নির্বিবাদে প্রণালী দুইটিকে হাত করিবার আশা তাহার সফল হইল না। বল্কানের বিভিন্ন জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে এত ঝগড়া বিবাদ ছিল যে তাহারা এক সঙ্গে রাশিয়ার কর্তৃত্বে আসিতে চাহিল না, বরং তুর্কি ভাল, কিন্তু রাশিয়ার প্রভাব তাহাদের মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিবে এইরূপ ছিল তাহাদের মনোভাব। এই সব কারণে রাশিয়ার অসুবিধা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

ইউরোপের অন্যান্য শক্তি বল্কানের দিকে রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব দেখিয়া আতঙ্কিত হইল। কারণ বল্কানে তাহাদের নানা স্বার্থ নিহিত ছিল। বিভিন্ন শক্তির এই সব বিরোধ শেষ পর্যন্ত ক্রিমিয়ান যুদ্ধ ঘটাইল (১৮৫৩-৫৬)। এই যুদ্ধের কারণ অতি সামান্য। সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় স্বার্থের জন্য অপরের হইয়া কেমন করিয়া কপট দরদ দেখাইতে পারে, এবং সেই দরদ কেমন করিয়া সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, ক্রিমিয়ান যুদ্ধ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফরাসী সর-কার বহু পূর্ব হইতে জেরুজালেমের খৃস্টান তীর্থসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইয়াছিল; ইহা দেখিয়া রাশিয়া তুর্কীর অধীনস্থ গ্রীকো-রাশিয়ান সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের দাবী করিয়া বসিল। তুর্কি সুলতান তাঁহাকে এ অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া রাশিয়া হঠাৎ দাবী করিয়া বসিল যে তাহাকে তুর্কিস্থিত সমগ্র গ্রীক খৃস্টানদের একমাত্র ভারপ্রাপ্ত রক্ষাকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তুর্কি সুলতান রাশিয়ার এই দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই সময় রাশিয়ার জার ব্রিটিশ-রাজদূত স্যার হামিলটন সিমুরের নিকট গোপনে প্রস্তাব

করিলেন যে তাঁহারা উভয়ে তুর্কি সাম্রাজ্য ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লইবেন। হয়ত এইখানেই তুরস্কের শেষ হইয়া যাইত যদি রাশিয়া দার্দেনেলিস ও কনস্টানটিনোপলের জন্য কোন দাবী না করিতেন। কিন্তু বৃটেন প্রাণ থাকিতে রাশিয়াকে প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব দিতে পারে না। তাই বৃটেন রাশিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সুতরাং রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সাহায্য না লইয়াই একাকী তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়াকে বাধা দিবার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স, তুরস্কের স্বপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল। এবং শেষে রাশিয়া পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে (১৮৫৬ সালে) উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। প্রণালীদ্বয় সম্বন্ধে রাশিয়া ১৮৪২ সালের লন্ডন বৈঠকের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিল। কৃষ্ণসাগর নিরপেক্ষ সমুদ্র বলিয়া ঘোষিত হইল। রাশিয়া বা তুরস্ক কেহই কৃষ্ণসাগরের বন্দর সুরক্ষিত করিতে পাইবে না, অথবা যুদ্ধজাহাজ রাখিতে পাইবে না। কিন্তু রাশিয়া এই চুক্তিপত্রের সর্তগুলি ভাঙিবার জন্য ছল অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই সময় (১৮৭০-৭২) ফ্রাঙ্কো-প্রোশিয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সুযোগে রাশিয়া ঘোষণা করিল যে, সে প্যারিসের শান্তি বৈঠকের সর্তাবলী অস্বীকার করিবে, কারণ সেগুলি তাহার জন্য হীনতাজনক সর্ত ছিল। সুতরাং আবার ১৮৭৭ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংলন্ডের মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধ শান্ত হইল। অতঃপর লন্ডনে একটি নূতন সন্ধি হইল। তদনুসারে কৃষ্ণসাগরে রাশিয়া ও তুরস্কের অধিকার স্বীকৃত হইল, উভয় জাতি তথায় যুদ্ধ জাহাজ রাখিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু এত করিয়াও রাশিয়া দার্দেনেলিস অধিকার করিতে পারিল না। অতঃপর ১৮৭৪ সালে বার্লিনের সন্ধিতে তুর্কির বহু অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। তাহার কয়েকটি প্রদেশকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল। যথা—রুমানিয়া, মারভিয়া ও মনটিনেগ্রো। রুমানিয়া ও হার... গোভিনাকে অস্ট্রিয়ার হাতে দেওয়া হইল। ক্রিমিয়ান যু... রাশিয়া যে কয়েকটি স্থান হারাইয়াছিল সেগুলি ত... দেওয়া হইল। একটা স্বতন্ত্র সন্ধির দ্বারা ইংলন্ড স... দ্বীপ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু দার্দেনেলিস সম্বন্ধে ... দাবী স্বীকৃত হয় নাই। এইভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ... রাশিয়া এই প্রণালীদ্বয়ের উপর হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় নাই। ১৮৮১ সালে রাশিয়া আ... ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। মধ্য ইউরোপের অ... জার্মানিকে লইয়া রাশিয়া একটি ত্রি-সম্রাটের ল... করিতে মনস্থ করিল। তাঁহারা গোপনে গোপনে ... একটি গোপন চুক্তি করিলেন; তাহাতে একটি ... ছিল এইরূপঃ—এই তিনটি সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ ... যুদ্ধজাহাজ সম্বন্ধে নিষেধের সর্ত স্বীকার করি... খুব সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিবেন, যেন তুর্ক...

...লে, ...ক ও ...চায়, ...ধারণ, ...করে ...সত্যি। ...মসঙ্গতি ...বাড়িতে ...দহ নেই। ...প্রত্যেক ...বদল ক'রে ...পারে না। ...?"

জাতিকে গোপনে এই সুবিধা না দেয়, যদি দেয়, তাঁহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। ১৮৯৬ সালে রাশিয়ার রাজদূত জার দ্বিতীয় নিকোলাসের নি... করিলেন যে, রাশিয়া হঠাৎ অজস্র সৈন্য লইয়া প্রণ... অধিকার করিয়া লইবে। জার সহজেই এই প্ল্যান ... করিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা সভার অনেকেই ই... আমি করিলেন, মাত্র দুইজন মন্ত্রী এরূপ কার্যের বিরে... বলা দরকার হয়ত এই প্ল্যান অনুসারেই প্রণালী দুইটি অধি... দুই পরেই চেষ্টা হইত। কিন্তু কতকগুলি বাস্তব অসুবি... তাঁরা এসে পরিত্যক্ত হইল। ১৮৯৭ সালে যখন রাশিয়া... মূর্তি ধারণ নিয়োজিত ছিল, সেই সময় আবার প্রণা... তুলিয়া দাঁড়াইল। এই সময় রাশিয়া... ক করবে না। সেই সম্মত হইলেন যে, বল্কানের অবস্থা... সুলেখাকে একটু সচেতন তদ্রূপ অবস্থায় রাখিতে হইবে...

ইহার পর কিছুদিন সব ... নিয়াম সহযোগে সুলেখা ও প্রণালীর উপর হইতে তাহার ... আসিয়াছিল। প্রশান্ত নাই। রাশিয়া দেখিল, এই ... চল আমরা নীচে যাই।" সুতরাং বৃটেনের বিরুদ্ধে ... ঘরে দীপালিকে লইয়া সুলেখা মনস্থ করিল। ১৯০... গোপন চুক্তি করিল, ... দাবী সমর্থন ক... দ্বয়ের উপর ... স্বীকার ... দাবী...

দশ এগারো,
লাফ দাও যে পারো।
বার তের চোদ্দ,
কাল নয়, অদ্য
এক্ষণি লাফিয়ে
এস পড়ি ঝাঁপিয়ে!

...মন সময়ে প্রশান্ত ও লাবণ্য কক্ষে প্রবেশ করিল। ...গান থামিয়া গিয়াছিল। প্রশান্ত বলিল, "কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়বে সুলেখা?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "বিঘ্ন-নদীর মধ্যে।"

প্রশান্ত বলিল, "এটা বিঘ্ন-নদীর গান না-কি?"

সুলেখা বলিল, "হাঁ। এ গানের নাম বিঘ্নতরণ গীতি।"

গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "তাই না-কি? তবে ত' যে-রকম ক'রে পারি এ গানটা তোমার কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। নিত্যকার চলার পথে পদে পদে যে-রকম বাধা-বিঘ্ন খোঁচা হ'য়ে থাকে, তাতে একটা বিঘ্নতরণ মন্ত্রের বিশেষ দরকার।"

লাবণ্য বলিল, "সমস্ত গানটা তুই গা সুলেখা, ভারি চমৎকার লাগছিল।"

সুলেখা বলিল, "গান ত' ঠিক নয় দিদি ওটা। ...শ্লোক। তবে সুর আর তাল দেওয়া আছে।"

প্রশান্ত বলিল, "তবে আর গানের বাকি ... সুলেখা? মাটিতে যদি গড়ন আর রঙ ... তাকে পুতুল বললে খুব বেশি অপরাধ ..."

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "না ... এ গান আপনাদের ভাল লাগবে জা...

প্রশান্ত বলিল, "নিশ্চয়ই লাগবে। অন্যান্য গান আরও ভাল লাগবে।"

...১ কো... ...জমি আ... ...। অর্থাৎ যে...

সমরে সমগ্র ইউরোপ লিপ্ত না হইলে প্রণালী একটা সর্ববিধাজনক ব্যবস্থা হয়ত রাশিয়া করিয়া মহাসমর যখন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন রাশিয়ার মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, এইবার প্রণালী দুইটি হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাঁহার র্ণ হইল না। কারণ মহাসমরের গতি সম্পূর্ণ রিয়া গেল। রাশিয়ায় এমন এক বিপ্লব ঘটিয়া ফলে রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিত্যাগ করিল। হইবার পূর্বেই জার ও তাঁহার স্বৈরাচারী হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বহু- প্নসৌধ ভাঙিগয়া গেল। নূতন আদর্শ, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আরম্ভ হইল। নার অপেক্ষা জনসাধারণের আর্থিক করিল। প্রণালীদ্বয়ের প্রশ্ন র। বল্কান হইতে রাশিয়ার য়েট রাশিয়া তাহার নিকটস্থ ভূতপূর্ব জারের দ্বারা যেসব পকে সন্তুষ্ট করিতে মনস্থ কে কারস ও আরদাহান এই নীতি অনুসরণ স্বাধীন করিয়া । মহাসমরের নী দখল বিশাল

এবং এসিয়া মাইনর আক্রমণ করিতে উৎসাহ দিল। ১৯১৯ সালের ১৯শে মে গ্রীক সৈন্য এসিয়া মাইনর অধিকার করিল। এইখানেই হয়ত সব ব্যাপার চুকিয়া যাইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের মধ্যে যে একতা ও সংহতি ছিল, যুদ্ধশেষের পর তাহা অনেকটা শিথিল হইয়া গেল। শক্তির ভাবসাম্যরক্ষার জন্যই বোধ হয় ফ্রান্স আর বৃটেনের প্রত্যেক ব্যাপারে সায় দিতে চাহিল না। ফ্রান্স বিভিন্ন দৃষ্টিতে তুর্কির বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। সে তুর্কির সহিত পৃথকভাবে সন্ধি করিল এবং আড়েলিয়া ও সাইলেসিয়া হইতে তাহার সমুদয় সৈন্য উঠাইয়া লইল। এই সময় কামালপাশার অভ্যুদয় হয়। কামালকে বৃটেন ধ্বংস করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফরাসী ও রাশিয়ার কারণে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। কামালের বীর বিক্রমে গ্রীক সৈন্য থ্রেস ও এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তারপর মুদানিয়াতে যুদ্ধ স্থগিত হইল (১১ই অক্টোবর ১৯২২ সাল)। পর বৎসর জুলাই মাসে লুজান সন্ধির দ্বারা তুর্কির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ইস্তাম্বুল ও প্রণালী দুইটি তুরস্ক ফিরিয়া পাইল। তুর্কি সমস্যাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই বলিয়া লয়েড জর্জকে পদত্যাগ করিতে হইল। এইভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া সংগ্রামের পরও প্রণালী দুইটি তুর্কির হাতেই রহিল। এ দুইটিকে লইয়া কত রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, কত সন্ধি ও চুক্তি হইয়াছে, কত সংগ্রাম ও বিপ্লব হইয়াছে। কিন্তু এসব অতিক্রম করিয়া ভাগ্যবলে তুরস্ক আজিও এই দুইটিকে নিজের অধিকারে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। বর্তমান মহাসমরে আবার প্রণালীর প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে। আবার কূটনীতিজ্ঞগণ চাল চালিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কাহার ভাগ্যে কি আছে, তাহা বলিবার দিন এখনও আসে নাই।

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৫

সন্ধ্যার পর লাবণ্য পাচককে রন্ধন সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মা, আপনাকে বাবুজী ডাকছেন।"

"কোথায় ?"

"দোমহলায় শোবার ঘরে।"

এ সময়ে সাধারণত প্রশান্ত শয়ন কক্ষে থাকে না, ঈষৎ কৌতূহলের সহিত দোতলায় প্রশান্তর নিকট উপস্থিত হইয়া লাবণ্য বলিল, "আমাকে ডাকছিলে ?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, বোস। কথা আছে।"

একটা ছোট কৌচে উপবেশন করিয়া উৎসুক কণ্ঠে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

"আজ সকালে খসরুবাগে গিয়ে সুলেখা আর গৌরহরি একসঙ্গে গান করেছিল, এ তুমি জান ?"

লাবণ্য বলিল, "জানি। তুমি কি ক'রে শুনলে ?—দীপু বলেছে বুঝি ?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, একটু আগে দীপু বলছিল। এ বিষয়ে সুলেখার সঙ্গে তোমার কোনও কথা হয়েছে ?"

লাবণ্য বলিল, "হয়েছে।" বলিয়া দ্বিপ্রহরে সুলেখার সহিত যে-সকল কথা হইয়াছিল, আনুপূর্বিক প্রশান্তর নিকট বিবৃত করিল।

শুনিয়া প্রশান্ত বলিল, "এর জন্যে সুলেখাকে তুমি বেশি কড়া ক'রে কিছু বল নি ত ?"

লাবণ্য বলিল, "যতটা বলতে পারা যায় তা বলেছি। দুদিনের জন্যে আমোদ আহ্লাদ করতে এসেছে, বেশি কড়া ক'রে কিছু বলতেও মুখে বাধে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "না, না, কড়া ক'রে নিশ্চয় কিছু বোলো না, যা বলবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে বোলো।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া লাবণ্য বলিল, "বুঝিয়েই ত' বলি, কিন্তু কেন জানি নে, এ ব্যাপারটাকে ও একেবারেই গুরুতরভাবে নিতে চায় না। ও বলতে চায়, কলকাতার বাড়িতে যে ব্যাপার নিতান্ত সহজ এবং সাধারণ, আমরা সে ব্যাপারকে অন্যায়ভাবে বিকৃত আর গুরুতর ক'রে দেখছি।"

প্রশান্ত বলিল, "হয় ত সে কথা খানিকটা সত্যি। গৌরহরির সঙ্গে সুলেখার এই মেলামেশার সঙ্গতি-অসঙ্গতি অনেকটা যে নির্ভর করছে তোমাদের কলকাতার বাড়িতে তার ঘনিষ্ঠতার পরিমাণের ওপর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি যে কথা বলছ সে কথাও সত্যি। প্রত্যেক জিনিসকে বিভিন্ন আবহাওয়ার সঙ্গে একটু রদবদল ক'রে খাপ খাইয়ে না নিলে অন্যায় হয়।"

লাবণ্য বলিল, "এই কথাটাই সুলেখা বুঝতে পারে না। তুমি ওকে একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পার ?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রশান্ত বলিল, "না। আমি কিছু বললে ও ভারি ক্ষুণ্ণ হবে। যদি কিছু বলা দরকার মনে কর, তুমিই বোলো। তা ছাড়া, আর দিন দুই পরেই ত অবনীশ আর তোমার দাদা আসবেন। তাঁরা এসে পড়লে সমস্ত ব্যাপারটা, আমার মনে হয়, অন্য মূর্তি ধারণ করবে।"

লাবণ্য বলিল, "কি জানি করবে, কি করবে না। সেই জন্যে অবনীশ আসবার আগে আমি সুলেখাকে একটু সচেতন ক'রে দিতে চাই।"

নীচের তলা হইতে হারমোনিয়াম সহযোগে সুলেখা ও দীপালির গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রশান্ত বলিল, "সুলেখা একা রয়েছে, চল আমরা নীচে যাই।"

ড্রয়িং রুমের পাশের ঘরে দীপালিকে লইয়া সুলেখা গান করিতেছিল,

নয় দশ এগারো,
লাফ দাও যে পারো।
বার তের চোদ্দ,
কাল নয়, অদ্য
এক্ষণি লাফিয়ে
এস পড়ি ঝাঁপিয়ে!

এমন সময়ে প্রশান্ত ও লাবণ্য কক্ষে প্রবেশ করিল। গান থামিয়া গিয়াছিল। প্রশান্ত বলিল, "কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়বে সুলেখা ?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "বিঘ্ন-নদীর মধ্যে।"

প্রশান্ত বলিল, "এটা বিঘ্ন-নদীর গান না-কি ?"

সুলেখা বলিল, "হ্যাঁ। এ গানের নাম বিঘ্নতরণ গীতি।"

গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "তাই না-কি ? তবে ত' যে-রকম ক'রে পারি এ গানটা তোমার কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। নিত্যকার চলার পথে পদে পদে যে-রকম বাধা-বিঘ্ন খোঁচা হ'য়ে থাকে, তাতে একটা বিঘ্নতরণ মন্ত্রের বিশেষ দরকার।"

লাবণ্য বলিল, "সমস্ত গানটা তুই গা সুলেখা, ভারি চমৎকার লাগছিল।"

সুলেখা বলিল, "গান ত' ঠিক নয় দিদি ওটা। ও[illegible] শোলোক। তবে সুর আর তাল দেওয়া আছে।"

প্রশান্ত বলিল, "তবে আর গানের বা[illegible] সুলেখা ? মাটিতে যদি গড়ন আর রঙ [illegible] তাকে পুতুল বললে খুব বেশি অপরাধ[illegible]

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "না[illegible] এ গান আপনাদের ভাল লাগবে জা[illegible]

প্রশান্ত বলিল, "নিশ্চয়ই লাগবে। অন্যান্য গান আরও ভাল লাগবে।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া সুলেখা ও লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

হারমোনিয়ামে সুর দিয়া সুলেখা বলিল, "এস দীপু, তোমাতে আমাতে দুজনে একসঙ্গে গাই।"

লাবণ্য বলিল, "না, না, এখন দীপু গাইবে না। সে তুই দীপুকে পরে যখন হয় শেখাস। এখন নিজেই গা।"

সুলেখা গাহিতে লাগিল,

এক দুই তিন চার,
এস হই নদী পার।
দুই এক চার তিন,
আঁধারিয়া আসে দিন।
পাঁচ ছয় সাত আট,
ওই দেখ বাঁধা-ঘাট।
সাত আট পাঁচ ছয়,
আর দেরি করা নয়!
ছয় পাঁচ আট সাত,
গেলে দিন হবে রাত।
নয় দশ এগারো,
লাফ দাও যে পারো।
বারো তের চোদ্দ,
কাল নয়, অদ্য
এক্ষণি লাফিয়ে
এস পড়ি ঝাঁপিয়ে।
সাঁতারিয়া হই পার,
এক দুই তিন চার!

গান শেষ হইলে গায়িকা এবং শ্রোতা তিনজনেই সমস্বরে হাসিয়া উঠিল।

প্রশান্ত বলিল, "চমৎকার! তোমার শ্লোকের শেষের দিকটা এমন উৎসাহোদ্দীপক যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুণি লাফিয়ে উঠে দু হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "কি সর্বনাশ! কিসের ওপর? আমার ওপর নয় ত'?"

প্রবল উৎসুক্যের সুরে প্রশান্ত বলিল, "কেন বল দেখি? তোমার ওপর কেন মনে করছ?"

লাবণ্য বলিল, "তুমি যে বল, স্ত্রী স্বামীর পক্ষে অনেক সময়েই বাধা। কি জানি আমাকে যদি এখন বিঘ্ন-নদী ব'লেই মনে ক'রে থাক।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া প্রশান্ত এবং সুলেখা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

প্রশান্ত বলিল, "বিঘ্ন-নদী কি-না তা ঠিক বলতে পারিনে লাবণ্য, কিন্তু তুমি যে নদী, তা নিশ্চয় বলতে পারি। স্ত্রী মাত্রেই নদী-ধর্মিনী। কোনও কোনও স্বামী এই নদীতে স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হয়, কোনও কোনও স্বামী ডুবে ম'রে ভূত হয়।"

লাবণ্য সতর্জনে বলিল, "তোমার স্ত্রী-তত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত বন্ধ রাখ। এখন গান হোক্। গা সুলেখা, সেই গানটা প্রথমে গা—আসিয়ো, যদি তব আসার মাঝে"—

প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু তোমার বিঘ্নতরণ গানটি তুমি দীপুকে শিখিয়ে দিয়ো সুলেখা। ছোট ছেলেদের পক্ষে ওটি চমৎকার গান।"

সুলেখা বলিল, "আপনাদের একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম জামাইবাবু। আজ দিদিকে বলেছি। আপনাদের ড্রাইভার গৌরহরিবাবু একজন খুব ভাল গাইয়ে। ওঁকে দিয়ে আপনি দীপুকে গান শেখাবেন।"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, গৌরহরি যে গান গাইতে পারে সে কথা আজ দীপুর মুখেই প্রথম শুনলাম। তোমার দিদির সঙ্গেও পরে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। আচ্ছা, তোমাদের দাদা ত' দিন দুই তিন পরে আসছেন, তিনি এলে এ বিষয়ে স্থির করলেই হবে।"

কিন্তু কথাটা এইখানেই শেষ হইল না, ধীরেধীরে মুখে মুখে বিস্তার লাভ করিল। খসরুবাগে সুলেখার সহিত অবনীশের গান গাওয়ার কথাও বাকি রহিল না।

প্রশান্ত বলিল, "তুমি যে-কথা বলছ সুলেখা, তার মধ্যে নিশ্চয় যুক্তি আছে। কিন্তু তোমার দিদি যে-কথা বলছেন তাও একেবারে যুক্তিহীন নয়। স্থান, কাল এবং পাত্র বিচার ক'রে অনেক জিনিসকেই অল্প-স্বল্প পরিবর্তিত ক'রে নিতে হয়। এখানে স্থান হচ্ছে এলাহাবাদ, কাল হচ্ছে তোমার দাদা আর অবনীশ আসবার পূর্ববর্তী সময়, আর পাত্র হচ্ছেন তোমার দিদি।" বলিয়া প্রশান্ত হাসিতে লাগিল।

সুলেখা বলিল, "আপনি পাত্র নন্?"

প্রশান্ত বলিল, "আমি অপাত্র। তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পার, তিনি একথা আমাদের বিয়ের দিন থেকেই জানেন।"

লাবণ্য বলিল, "বিয়ের আগে থেকে যে জানিনে, এ কথা তোমাকে কে বললে? কিন্তু এসব কথা অনেক হয়েছে, আর থাক্। এখন সুলেখা তুই গান গা।"

প্রশান্ত বলিল, "তোমার দিদি যেটা বলছিলেন, সেইটাই না-হয় প্রথমে ধর।"

সুলেখা গাহিতে আরম্ভ করিল,

আসিয়ো, যদি তব আসার মাঝে
নব আশার ধ্বনি মম হৃদয়ে বাজে!

* * * *

সেইদিন রাত্রি এগারোটার সময়ে অবনীশ দ্বিতলে সুলেখার শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া দেখিল দ্বার খোলা আছে।

সুলেখা জাগিয়া বসিয়াছিল। অস্ফুট ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "শীগ্‌গির ঢুকে প'ড়ে দোর বন্ধ ক'রে দাও!"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অবনীশ বলিল, "বাপ্ রে! পৃথিবী আরম্ভ হ'য়ে পর্যন্ত কোনও স্বামী বোধ হয় নিজের ধর্মপত্নীর ঘরে এমন অপরাধীর মতো কোনও দিন প্রবেশ করে নি!"

সুলেখা বলিল, "আঃ! চেঁচিয়ো না। আস্তে আস্তে কথা কও!"

অবনীশ বলিল, "বা রে! না চেঁচালে জানাজানি হবে কেমন ক'রে?"

(ক্রমশ)

শিল্প ও শ্রমিক

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

(১)

দুঃসহ শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে কি না

যন্ত্রযুগে শারীরিক পরিশ্রমের যে অতিশয় লাঘব হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চতুর্দিকে তাকাইলেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা সকলে পাই। এখন আর দাঁড় টানিয়া বিলাত যাইতে হয় না, কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালাইতে হয় না, হাঁটিয়া কাশী কি মক্কা যাইতে হয় না, এমন কি হাঁটিয়া দোতলায় উঠিতে হয় না। অবশ্য আমাদের দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন লোক গ্রামে বাস করে। ইহাদের পরিশ্রমের বিশেষ লাঘব হয় নাই। এখনও আমাদের দেশে পুরাতন প্রণালীতেই জলটানা হয়। অধিকাংশ গ্রাম্য লোকের পক্ষে পরিশ্রমের লাঘবের মধ্যে এই হইয়াছে যে, যাহারা কাশী কিংবা বৃন্দাবন যাইতে চায় তাহারা রেলে চড়িয়া বসিয়া বসিয়াই যাইতে পারে। অন্যান্য দেশে যে সমস্ত আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি বহু বৎসর ধরিয়া গ্রামের লোকের পরিশ্রমের লাঘব করিতেছে সেই সমস্ত যন্ত্রাদি আমাদের দেশে এখনও ব্যবহৃত হয় না কেন তাহার জবাব বৈজ্ঞানিক দিবেন না। তাহার জবাব দিতে হইবে আমাকে, আপনাকে, আর দিতে হইবে সেইসব লোককে যাহারা প্রচুর জমি থাকা সত্ত্বেও জমির অপব্যবহার করিয়াছে। অনেকে বলিবেন আমাদের দেশে জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার দরুণ যন্ত্রাদির সাহায্যে চাষবাস করা কষ্টসাধ্য। এই কথা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়, আংশিকভাবে সত্য। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, আমি নিজে বাঙলাদেশের অনেক স্থান দেখিয়াছি এবং জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, প্রত্যেক জিলাতেই এমন বহু জোৎদার এবং তালুকদার আছে যাহারা একসঙ্গে শত শত বিঘা জমির মালিক। এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করাও অসম্ভব কারণ আমরা এমনই হতভাগা এবং বর্বর যে আমাদের দেশের কত জমি কতজন লোক কিভাবে ভোগ করে তাহা আমরা জানি না। প্রতি বৎসর বারো তেরো কোটি টাকা বাঙলা সরকার খরচ করেন। কি বাবদ কত খরচ হয় এবং তাহা ন্যায্য খরচ কি না তাহা লইয়া রাজনীতি-বিশারদগণ মামলা করিবেন কিন্তু আমার মত সাধারণ লোক এই কথা জানিতে চায় যে, আমাদের মোটের উপর কত সম্পত্তি কিভাবে আছে তাহা জানাইবার জন্য বাঙলা সরকার কি বারো বৎসরে একবার বারো লক্ষ টাকাও খরচ করিতে পারেন না? আমাদের কি আছে এবং কি নাই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি না করিতে পারিলে উপার্জন বৃদ্ধি করিবার উপায় কি করিয়া নির্ধারণ করিব? এই বিষয়ে সরকার কিংবা জনসাধারণের পক্ষে কোনও চেষ্টা দেখি না। খালি শুনি বাগাড়ম্বর, এটা কর, ওটা কর। যে দেশের বুদ্ধিমান লোক এইরূপ ফাঁকা কথা বলে সেই দেশের মত হতভাগ্য আর কেহ নাই।

যাহাদের দেশের সম্পত্তির পোণে ষোল আনাই হইল জমি, যাহাদের অতি সামান্যই কারখানা শিল্প আছে, যাহাদের ততোধিক সামান্য কুটীর শিল্প আছে, তাহারা তাহাদের জমির খবর রাখে না। অথচ কোথায় কামস্কাট্‌কা এবং কোথায় বিসুবিয়স্ তাহা শিখিয়া উপাধি অর্জন করে ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আছে কি? আমরা চাষীদের পরকালের উপকারার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কৃষি বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত পুষিতেছি। তাঁহারা কি করিয়া বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি বানাইবেন তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহাদিগকে শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়—'তুমি কি রকম চাষী? তোমার কত জ কোথায় কিভাবে আছে তাহা জান কি? কোন্ কো জমিতে কি কি আবাদ হইতে পারে তাহা জান কি? এই প্রশ্নে জবাব দিবে কে?

কেহ কেহ বলিবেন আমাদের দেশে আজকাল শিল্প সম্পা কম নয়। এক হিসাবে তাহাদের কথা সত্য। পাটকলে এ চা-বাগানে মোট যাহা আয় হয় তাহা সমগ্র বাঙলাদেশের সমু ধানের দাম অপেক্ষা খুব কম নয়। একশত টাকা টন হিসাবে বাঙ দেশের মোট উৎপন্ন ধানের দাম প্রায় একশত কোটি টাকা। মো উৎপন্ন চা এবং চটের দাম প্রায় নব্বই কোটি টাকা হইবে। কি এই নব্বই কোটি চা এবং চটের টাকা কে এবং কাহারা ভো করে? শতকরা নব্বই জনের বেশী মালিক সাহেব অথ অবাঙালী, শতকরা নব্বইজন মজুর অবাঙালী। যাহা লাভ হ তাহার উপর আয়কর আদায় করেন ভারত গভর্নমেণ্ট, বাঙ গভর্নমেণ্ট নয়। রপ্তানির শুল্ক আদায় করেন ভারত গভর্নমে যন্ত্রপাতি বিক্রী করে সাহেব, যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর শু আদায় করেন ভারত গভর্নমেণ্ট, এমন কি লোহালক্কর এবং বানাইবার টিন বিক্রী করে অবাঙালী। সম্প্রতি চাল ডাল মাড়োয়ারী বিক্রী করিতে সুরু করিয়াছে। এই সকল কারখা শিল্প হইতে বাঙলার সরকার এবং বাঙলার জনসাধারণ যাঁহা প তাহার সমষ্টি আর কিছুই নয়, খালি ঝগড়া আর বিবাদ, কথ কথায়, স্ট্রাইক এবং তদ্দরুণ মারপিট আর জেল এবং এই বিদেশীয় এবং বিজাতীয় স্বার্থের রক্ষার জন্য আমাদের রাষ্ট্র পরিষদে বিশ পঁচিশটি বিজাতীয় ভোট। তদুপরি এইসব লক্ষ বিদেশীয় কুলি সামলাইবার জন্য পুলিশের খরচ আ ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরের মাইনে আছে এবং কুলির মন্ত্রীর আছে। এক একটা অনুষ্ঠানে দুই চারিটি কেরাণীগিরি যা বাঙালীর ভাগ্যে জোটে তাহার মোট আয় অতি তুচ্ছ। সঠিক খ লইয়া দেখিলেই তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। মোটের উপ এই সকল শিল্প আমাদের দেশের বাহিরে হইলেই আমাদ মঙ্গল হইত। এই সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলিব। এইখা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, আমাদের নিজস্ব শিল্প সম্পা খুবই সামান্য। এখনও কৃষি সম্পত্তিই আমাদের প্রধান সম্পা এবং সেই জন্যই সর্বাগ্রে কৃষিসম্পত্তি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এ সংবাদ আমরা চাই।

বাঙলাদেশের জমির পরিমাণ মোটামুটিভাবে নীচে দেওয় গেল। বলা বাহুল্য সংখ্যাগুলি সরকারী রিপোর্ট হইতে সংকলি হইয়াছে। সরকারী রিপোর্ট কি করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া তাহা আমি জানি না।

মোট জমি	১৫ কোটি	০ লক্ষ	বিঘ
পাহাড় ইত্যাদি	৩ ,,	০ ,,	,
জঙ্গল	১ ,,	৩০ ,,	
ধানের চাষ	৬ ,,	০ ,,	
পাটের চাষ	০ ,,	৮০ ,,	
অনাবাদী	১ ,,	৪০ ,,	
আবাদের উপযুক্ত কিন্তু আবাদ হয় না	১ ,,	৮০ ,,	

আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, অনাবাদী ১ কোটি ৪০ লক্ষ বিঘা জমি ছাড়াও ১ কোটি ৮০ লক্ষ বিঘা জমি আছে যাহা আবাদের উপযুক্ত হইলেও আবাদ হয় না অর্থাৎ মো

যত জমিতে চায হয়, পরিমাণে তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভাল জমি খালি পড়িয়া আছে। কেন? সেই জমি কোথায় কিভাবে আছে? বাঙলাদেশে কি এতই জমির প্রাচুর্য যে, পাঁচ ভাগের একভাগ চাষের জমিতে চাষ না হইলেও দেশের কোনও ক্ষতি নাই? যে জমি চাষের উপযুক্ত তাহাতে কোন না কোনও ফসল অবশ্যই জন্মিবে। বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকা মূল্যের ফসল হইলেও ১ কোটি ৮০ লক্ষ বিঘাতে প্রায় ২৭ কোটি টাকা মূল্যের ফসল জন্মিতে পারে। সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, যে দেশের গভর্নমেন্টের মোট আয় মাত্র ১২।১৩ কোটি টাকা সেই দেশ কি প্রতি বৎসর ২৭ কোটি টাকা ফেলিয়া দিতে পারে? আমাদের দেশে যে ধরণের গভর্নমেণ্ট তাহাতে এইসব জমি গভর্নমেন্টের পক্ষে নিজ হাতে লইয়া আধিবন্দোবস্তে চাষ করা অসম্ভব, কিন্তু যদি সম্ভব হইত তবে সরকারের আয় ১২।১৩ কোটি টাকা বাড়িত অর্থাৎ ডবল হইত। এই টাকায় দেশের চেহারা বদলাইয়া দেওয়া যাইত। সামান্য ২।৩ কোটি টাকার অভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত আমরা করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হইত তবে এই জমি পড়িয়া থাকিত না। আমাদের দেশেই বা এই জমি চাষ করা হইবে না কেন? মালিকদিগকে চাষ করিতে বাধ্য করা হইবে না কেন? তাহারা যদি চাষ না করে তাহা হইলে সেইসব জমি গভর্নমেন্টের হাতে ফিরাইয়া দিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা উচিত এবং সরকারের উচিত এইসব জমিতে আধিবন্দোবস্তে চাষ করা, অন্তত একটি জেলাতে চেষ্টা করা।

আমি সৌখীন চাষী। কয়েক বৎসর শাক, সব্জী, আলু, কপি ইত্যাদি জন্মাইয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, আনুমানিক এক বিঘা জমিতে আলু, কপি ইত্যাদি চাষ করিলে বৎসর ব্যাপিয়া স্বামী, স্ত্রী এবং দুই পুত্র কন্যা এইরূপ চারিজন ...র পরিবারের উপযোগী সমুদয় তরকারী অপর্যাপ্তরূপে ...ন্ন হইতে পারে। দশ বিঘা জমিতে রকমারি ফসল করিলে ...ন পরিবারের ভদ্রভাবে সংসার চলিতে পারে ইহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। কি কি সব্জী অথবা কি কি ফল অথবা কি কি ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে তাহা স্থানকাল-পাত্র হিসাবে ঠিক করিতে হইবে। নিজের আবশ্যকীয় ধান, ডাল, সর্ষা, শাক, সব্জী ও ফল জন্মাইবার জন্য জমি এবং ষাঁড় ও গাভীর জন্য জমি বাদ দিয়া যে জমি থাকিবে তাহাতে অনেক রকম দামী ফসল এবং ফল জন্মানো যায়। এক বিঘা জমিতে চারিশত সুপারি গাছ, একশত নারিকেল গাছ, দেড় হাজার আনারস গাছ, চার হাজার কপি, চার হাজার মূলো, পাঁচ সাত মণ তামাক ইত্যাদি বহুবিধ দামী ফসল জন্মে। ইহাদের যে কোন একটাতে বিঘা প্রতি একশত টাকা আয় হয়। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারেন। সরকারের কৃষি বিভাগে হাজার হাজার টাকা মাইনের অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন। তাহাদের উচিত এই বিষয়ে অবহিত হওয়া। আমি দশ বিঘা বলিয়াছি, তাহারাই বলুন কত বিঘা লাগে। আপনারা মনে রাখিবেন যে, অধিকাংশ জমিতেই বৎসরে দুইবার ফসল হইবে। বুদ্ধি খাটাইতে হইবে। হয় বুদ্ধিমান্ ভদ্রলোকের ছেলেকে চাষী হইতে হইবে নতুবা চাষীকে বুদ্ধিমান্ বানাইয়া ভদ্র করিতে হইবে, অন্যথা দেশের উন্নতি করা দুঃসাধ্য। সকলেই জানেন বৎসরের অনেক সময়েই চাষীদের কোনও কাজ থাকে না। অবসর সময়ে শিক্ষিত চাষী নানাপ্রকার কুটীর শিল্পের চর্চা করিয়া দুই পয়সা রোজগার করিতে পারে। বস্তুত এইরূপ শিক্ষিত চাষী না হইলে কুটীর শিল্পের উন্নতি হওয়াও দুষ্কর। কুটীর শিল্প করিতে হইলে প্রাণ থাকা চাই, কল্পনাশক্তি থাকা চাই, সৌন্দর্যবোধ থাকা চাই। নিরক্ষর নিষ্প্রাণ লোকের সৌন্দর্যবোধ নাই। এই প্রকার চাষী সৃষ্টি করিতে হইলে কলেজ চাই না, ঢাকার মণিপুরের মত কৃষি শিক্ষার স্থানও চাই না। হাজার টাকার মাইনের যে শিক্ষক দশ টাকা খরচ করিয়া একটি দুই হাত লম্বা রাঙা মূলা সৃষ্টি করেন তাহাকে লেবেল মারিয়া শিকায় তুলিয়া রাখিলেই দেখিতে ভাল লাগে। তাঁহার কাজ তিনি করুন কিন্তু চাষীকে চাষ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্র তিনি নহেন।

আমাদের দেশে সকল কাজই এখানে এক খামচি, ওখানে এক খামচি এইরূপ অসংলগ্ন এবং অনির্দিষ্টভাবে করা হইয়া থাকে। একটি একটি করিয়া দেখাইতে গেলে অনেকেই চটিবেন। আপনারা নিজেরাই খবর লইয়া দেখুন। বৃহৎ বৃহৎ নামধারী অনেক সমিতি এবং তাহাদের স্কীম আমরা দেখিতে পাই কিন্তু কোনও ফল দেখিতে পাই না। যেখানে জীবনমরণ সমস্যা সেখানে প্রণালীবিদ্ধভাবে কাজ না করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সুতরাং আজ লাউ সম্বন্ধে, কাল কুমড়া সম্বন্ধে বক্তৃতা না করিয়া আনুমানিক দশ বিঘা কি পনর বিঘা জমিতে কি করিয়া সম্পূর্ণরূপে জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদি জন্মানো যায় সেইটি আমাকে এবং আমার ছেলেকে শিখাইতে হইবে। সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, সেইটি শিখাইবার সহজ এবং সরল উপায় উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আমাকে দশ কি পনর বিঘা জমি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে দেওয়া। তিন বৎসর কি চার বৎসরের শিক্ষা যথেষ্ট। পুঁথি আমি চাই না। খালি দৈনিক এক আধ ঘণ্টা করিয়া শিক্ষকের কাছে শুনিতে চাই কোন্ জমির উৎপাদন শক্তি কি প্রকার, উৎপাদন শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি পায়, কি করিয়া দৈবদুর্ঘটনার হাত হইতে ফসলকে রক্ষা করা যায়। এইপ্রকার শিক্ষা বিনা পয়সায় দেওয়া যায় এবং নেওয়া যায়। পাঁচশত বিঘা জমি পঞ্চাশজন ছাত্রকে বাঁটিয়া দিয়া তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে আত্মনির্ভর চাষী হইতে এবং অবসর সময়ে কুটীর শিল্পের চর্চা করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। চাষের আয় হইতে যদি এইরূপ শিক্ষার সকল খরচ আমরা না চালাইতে পারি তবে আমাদের গলায় দড়ি দেওয়াই শ্রেয়; এবং যদি বেকার ভদ্রলোকের ছেলে এইরূপ শিক্ষা লইতে অগ্রসর না হয় তবে তাহাকে বলিব "তুমি জাহান্নমে যাও"।

এইরূপ কৃষি বিদ্যালয় প্রত্যেক জেলাতে একটি করিয়া হইতে পারে। যাহারা বলিবেন সামান্য সাধারণ গৃহস্থ হইয়া থাকাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের আকাঙ্ক্ষা নয় তাহাদিগকে এই কথা বুঝানো শক্ত নয় যে, এইরূপ চাষ ব্যবসায়ে উন্নতির আশা অপরিসীম। আজ যাহার দশ বিঘা আছে কাল তাহার বিশ বিঘা হইবে, পরশু দুইশত কি দুই হাজার বিঘা হইবে। জমির অভাব এখনও হয় নাই। আগেই বলিয়াছি ১ কোটি ৮০ লক্ষ বিঘা জমি খালি পড়িয়া আছে। এইসব জমি চাষের উপযুক্ত তবু চাষ হয় না, আমরা বর্বর বলিয়াই হয় না।

আগে এই জাতীয় চাষী সৃষ্টি করা দরকার। কি করিয়া দুই হাত লম্বা লাউ সৃষ্টি করা যায় সেটা পরে দেখানো উচিত, আগে নয়। আমাদের জাতীয় বিষয়বুদ্ধি কি এতই নিরেট যে আমরা গবেষণা করিয়া কত বিঘা জমিতে চাষ করিলে একটি সাধারণ পরিবারের খাওয়া বাদে বৎসরে দুই শত কি তিন শত টাকা নগদ আয় হইতে পারে তাহা জানিতে পারি না? যেইসব চাষ শিক্ষার কলেজ হইয়াছে তাহাতে কি করিয়া চাষ করিতে হয় তাহা শেখানো হইতেছে না, কি করিয়া চাষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করা যায় তাহা শেখানো হইতেছে। আমি আবার বলিতেছি আমাদের

ছেলেদিগকে কি করিয়া দশ বিঘা কি পনর বিঘা জমিতে চাষ করিয়া ছোট সংসার চালানো সম্ভবপর হয় তাহা শেখানো হউক। কি করিয়া গাই পালিতে হয় তাহা শেখানো হউক, কি করিয়া মাখন কিংবা ঘি কিংবা পনীর বানাইতে হয় তাহা শেখানো হউক। আমার কয়েকটা গাই আছে। পঁচিশ টাকা মূল্যের একটা গাই তিন সের দুধ দেয়, পঁয়তাল্লিশ টাকা মূল্যের একটা গাই ছয় সের দুধ দেয়। এইরূপ দুই তিনটি গাইয়ের খাদ্য জন্মাইতে কত জমি লাগে তাহা আমাদের ছেলেরা শিখুক। আমাদের মেয়েরা মাখন ঘি বানাইতে শিখুক। তাহারা গাই দোহাইতে শিখুক। ইউরোপের বহু দেশে মেয়েরা এইরূপ কাজ করিয়া থাকে, যাহারা বড়লোক তাহাদের কথা আলাদা। আমাদের দেশের চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানীর মেয়েও হারমনিয়াম বাজাইয়া গান করিতে শিখে। এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করিলে লোকে আমাকে মারিতে আসিবে এবং হয়ত জবাব দিবে যে, আমাদের দেশে পুরাকালে নৃত্যগীতাদির চর্চা বহুল পরিমাণে ছিল। এই সকল মাথামোটা লোকের দুর্বুদ্ধি এবং দুঃসাহস দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। যাহার পেটে ভাত নাই সে নাচিবে কেন? নাচ দেখাইয়া দুটো ভাত যদি জোটে সে কথা আলাদা। পুরাকালে আমাদের দেশে অতিশয় বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়েরাই নৃত্যগীতাদির চর্চা করিতেন। আজকাল যে ব্যক্তি দুই শত কিংবা চার শত টাকা মাইনে পায় সেই ভাবে যে, সে একজন মোড়ল বনিয়া গিয়াছে, পুরাকালের রাজা-বাদশা বনিয়া গিয়াছে। সরকারী কৃপায় একটা খেতাব মিলিলে ত কথাই নাই। পাগড়ি বাঁধিয়া তরোয়াল ঝুলাইয়া সঙ্ সাজেন, যেন সত্যি সত্যি রাজা কি নবাব। আমাদের দেশের পুরাতন গৌরবময় যুগে আমার মত আপনার মত মধ্যবিত্ত লোকের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল না। বিশিষ্ট পণ্ডিত ছাড়া আমার মত আপনার মত কথা ব্যবসায়ী এবং কলমপেশীকে ফাজলামো করিয়া খাইতে হইত। সর্বাপেক্ষা বড় চাকুরি ছিল রাজার মোসাহেব বা বয়স্য হওয়া।

শিল্পযুগে দুঃসহ শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে কি না সেই কথা আলোচনা করিতে গিয়া চাষ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। ইহা অবান্তর নয়। যাহারা কল চালায় তাহাদিগকে যে খুব বেশী শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, সুতরাং সেই বিষয়ে বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু সমগ্র জাতির ভিত্তিস্বরূপ যে চাষী তাহার পরিশ্রমের লাঘব কেন হয় নাই বা হইতেছে না তাহাই সম্প্রতি আলোচনা করিতে চাই।

আমি বলিয়াছি আনুমানিক দশ বিঘা জমিতে চাষ করিলে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের চলিতে পারে। ভবিষ্যৎ উন্নতি তাহার হাতে। যে পারিবেনা সে অক্ষম, তাহাকে জোর করিয়া ভাত গিলানো অসম্ভব। আমাদের দেশে বিঘা প্রতি পাঁচ মণ হইতে দশ বারো মণ ধান হয়। ইতালি, স্পেইন এমন কি জাপান এবং কোরিয়াতে ইহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চারগুণ পর্যন্ত হয়। আমাদের দেশে কেন হইবে না? শুধু ধান কিম্বা পাট কেন? অন্যান্য দামী ফসলও কিছু কিছু হইবে না কেন? অপর্যাপ্ত দুধ হইবে না কেন? এইসব বিষয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা নিরূপিত করা যাইতে পারে। বর্তমানে যেইসকল কৃষিবিদ্যালয় আছে সেইগুলিরই কর্মপ্রণালীর ধারা রূপান্তরিত করিয়া এই বিষয়ে নিয়োজিত করা যাইতে পারে কিন্তু এইসকল গবেষণার ফল কার্যে পরিণত করিতে পারে এইরূপ চাষীর প্রয়োজন সকলের আগে। নেংটিপরা চাষীকে বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া তাহার কর্মপ্রণালী পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করা বালিতে জল ঢালার মত। অনেক নদীর জল নিঃশেষ করিলে হয়ত ভবিষ্যতে সেই বালিও উর্বর হইবে। কিন্তু ততদিনে প্রাণ আর বাঁচিবে না, ততদিনে আমরা মরিয়া ভূত হইয়া যাইব। এই সকল নিরক্ষর লোকদিগের চোখের সম্মুখে নূতন ধরণের চাষী সৃষ্টি করাই উৎকৃষ্ট পন্থা। শিক্ষিত পরিবারের লোকদিগকে চাষ শিক্ষা দিয়া দশ পনর বিঘা জমি লইয়া চাষ করিতে উৎসাহ দেওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য। বর্তমা ভদ্রঘরে যেইরকম বেকার সমস্যা এবং অন্ন সমস্যা হইয়াছে ই সুযোগে নূতন ধরণের চাষী সৃষ্টি করিতে সমগ্র জাতির আপ্র চেষ্টা করা উচিত। আমার যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে [illegible] রাঙাইয়া এইপ্রকার ব্যবস্থা করিতাম। এইপ্রকার নূতন ধরণের চাষী না হইলে চাষের সম্যক্ উন্নতি করা অসম্ভব। এই ধরণের চাষী ক্রমশ যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া আয় বৃদ্ধি করিবে ইহা স্বপ্ন নয়, ইহাই একমাত্র উপায়। (ক্রমশ)

মেঘ ক'রে আছে

কানাই সামন্ত

সারাদিন মেঘ ক'রে আছে।
দূরে গেল কাছের জিনিস,
দূর এল কাছে।
প্রিয়বিরহিত ঘরে প্রেমের স্বপন
আচ্ছন্ন করেছে প্রাণমন--
আবিষ্ট করেছে দু'নয়ন ঃ
সে স্বপ্নে কি--
চেয়ে চেয়ে দেখি
দীঘির সীমায় তাল-খেজুরের বন
ক্ষণে ক্ষণে তোলে শিহরণ।

কৃষ্ণচূড়া ভিজে রক্তরাগে
স্নানশূচি সুন্দরীরে পরাল সোহাগে
সীমন্তসিঁদূর ঃ
দূরে-চাওয়া পথ-মাঝে
সর্ব অঙ্গে সুমধুর
সোনাল ফুলের সাজে
আজ এ
শ্যামা মেয়ে লাবণ্যেতে
ছলোছলো করে;
বুঝি মনোহরে--
ডাকে তারে মৌনের ভাষায়।

পথ চেয়ে আশায় আশায়---
গেল দিন।--
সারাদিন মেঘ ক'রে আছে।
দূরে গেল কাছের জিনিস,
দূর কই এল না তো কাছে।

হিসাব
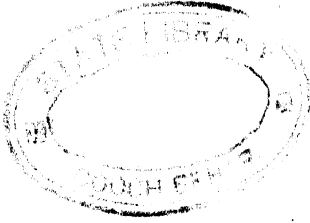
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একদা তাহারে লাগিয়াছে ভালো এই কথাটাই বড়ো।
সে-দিন স্মরিয়া ধন্য
যেমন নিভৃতারণ্য
সারা বসন্ত অন্তরে করে জড়ো শীতসঙ্কেত ভোলে
মদির স্বপ্নে পাত্রি প্রান্তে শিশির দোলে।

রক্ত-সবুজ উল্কা-পিন্ড খসে
পৃথিবীর বুকে; সুদূর কালের শেষে
ধূলো পড়ে থাকে পথে
পাথরের নীল ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় অন্তঃশীলার স্রোতে।
প্রতিধ্বনিত গিরিপথ—
আবীর আকাশ কম্প্রতারার ফুল
উপত্যকার সবুজ জোয়ার নদীর ধারালো বাঁকে
বন্য সাগর কলকল্লোল সীমাহীন কৌতুক
ছেঁড়া মেঘে আলো নরম ঘাসের কুল
এই পৃথিবীর ক্ষণ-বিলসিত বুক
লেখা-পড়া নেই; যে দেখে সে রাখে
মিলিয়ে নেয়না খত্।
প্রণয়ী লেখেনা আকুল রাতের সুখ
জমাখরচের অঙ্কখাতিরে ভরে না কথার ডালা
উষ্ণ দিনের তীক্ষ্ন-মধুর জ্বালা
সে যে স্মরণের ভোগেতে মুখর; লেখনী তখনি মূকে।

সিটি সিনেমায়—"আজাদ"

বম্বে টকীজের সামাজিক হিন্দী চিত্র; কাহিনী—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; পরিচালনা—এন আর আচার্য; সুরযোজনা—রামচন্দ্র পাল ও সরস্বতী দেবী; ভূমিকা: অশোককুমার, মমতাজ নজীর, রামসুকুল, জগন্নাথ, লীলা চিৎনীশ, হন্সা প্রভৃতি। ...হইতেছে। ...তু দুঃখের

বম্বে টকিজের ছবির একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য ...ক সমাগমও
করিবার বিষয় যে, জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি ...গ মাঠে অনুষ্ঠিত
রাখিয়াই ইহারা চিত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন ...লতেছেন, "এই বৎসর
অথচ জনসাধারণের রুচির প্রতি ইঁহা...দিবার ফলেই দর্শকগণের
কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। ঠিক ...কহ কেহ বলিতেছেন, "খেলা
কারণেই 'বন্ধন' আজ কলিকাতার ব...ও উচ্চাঙ্গের না হওয়ায়
উপর আসর জমাইয়া বসিয়াছে, ...পাইতেছেন না।" উক্ত দুইটি
কারণেই 'পুনর্মিলন' দেখিবার জন্য ...ুটবল লীগের খেলার উত্তেজনা ও
আজ এত ভিড়। "আজাদ" ...। মনে হয় না। বর্তমান আর্থিক
গল্পাংশ সমস্যামূলক বলিয়া...বে দায়ী। ইউরোপের বর্তমান মহা-
গুরুগম্ভীর ও মামুলি ...ধারর প্রধান কারণ। এই মহাসমরের যতদিন
রচিত। তথাপি ইহার বি...দিন কেবল বাঙলার কেন সারা ভারতের
অনাড়ম্বর সারল্যে চিত্রখা...অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইবে। হয়ত এমন
...। যখন ফুটবল খেলা দেখা জনসাধারণের পক্ষে
হিন্দু সমাজের এক ...ইয়া পড়িবে। এই অবস্থা এখনও আসিতে
এক সমাজ-পরিত্যক্ত ...ং বর্তমানে ইহা চিন্তা করিয়া বিচলিত হইবার
লইয়া 'আজাদে'র কা...
পিতৃমাতৃহীন, ভগ্নীপ...
নানা অত্যাচারের মা...য় উঠা নামা না থাকায় কোন দলেরই খেলোয়াড়গণ
পতির এক দুশ্চরি... পাইতেছেন না এবং সেইজন্য কোন খেলায় তীব্র
স্বপ্নে যমুনা ... পরিলক্ষিত হইতেছে না। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার
দুর্বৃত্তের স্বরু...ায় দর্শকগণও খেলা দেখিয়া আনন্দ না পাইয়া ক্রমশই
আশ্রয় ত্যাগ ক...া ছাড়িয়া দিতেছেন। ইহাই যদি দর্শক সমাগমের
...। কারণ হইয়া থাকে তবে আমরা খেলোয়াড়গণকে
সময়ে অব...াবে দোষ দিব। কারণ তাঁহারা এই কথা কেন ভুলিয়া
সাক্ষাৎ হয়...ন যে, চ্যাম্পিয়ানশিপ বর্তমান আছে। তাঁহাদের অবহেলা
বিজয় অ...রাশ্যজনক খেলা দলের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে ইহা কি
ক্ষমা ক...রা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না? তাঁহারা যদি
বন্ধু ...ম্পিয়ানশিপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খেলায় অবতীর্ণ হন তবে
...বেড়ায়। ...মাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে লীগ খেলা বর্তমানে যে অবস্থায়
যুক্তপ্রদে...ছ তাহার শীঘ্রই অভাবনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে।
পরে বিজ...ণ তীব্রতা বাড়িবে, খেলার উন্নতি হইবে ও দর্শকগণও খেলা
আনন্দ বড় হ... আনন্দ পাইবেন। মাঠে দর্শক সমাগমও বৃদ্ধি পাইবে।
পথে ট্রেনে এব...া বেশ জমিয়া উঠিবে। ইহার দ্বারা যে কেবল দর্শকগণ
তরুণীর পিত...ইবেন তাহা নহে খেলোয়াড়গণও নিজেদের ভবিষ্যৎ
পরিবারের সহি...রবেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়গণের
কন্যা সীতার প্র...্র পাইবে। আর তাঁহারা যদি বর্তমানে যেরূপ
ঘনিষ্ঠতাকে হৃষ্টা...ব খেলিতেছেন সেইরূপ খেলেন, তাহা হইলে দলের
অন্যায়ের অনুশো... হইবে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যতে কুঠারাঘাত
হউক আনন্দের স...কারণ দলের পরিচালকগণ এই বৎসর হয়ত তাঁহাদের
পূর্বে বিজয়ের সহি...খেলা বরদাস্ত করিতে পারেন পরবর্তী বৎসর তাহা
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক... তখন পরিচালকগণ বাধ্য হইবেন বাঙলার বাহির
গিয়া জগদীশ অসু...ড় আনাইয়া দলের সম্মান বৃদ্ধি করিতে। ফলে
পুনরায় সুস্থ হয়। ...সংখ্যক বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড় বিভিন্ন দলে
যমুনার আচার ব... ...। পাইয়াছে তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন।

বাঙলার মাঠে অবাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণ প্রাধান্য লাভ করিবেন। আর বর্তমানে যে সকল খেলোয়াড়গণ খেলায় অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন তাহারাই তখন আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিবেন, "আমাদের বঞ্চিত করিয়া অবাঙালী খেলোয়াড়গণকে প্রাধান্য দান করিয়া দলের পরিচালকগণ ভীষণ অবিচার করিয়াছেন।"

আমরা জানি আমাদের উক্তি বর্তমানের খেলোয়াড়গণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিবে না কিন্তু তথাপিও বলিতেছি এইজন্য যদি কিছু হয়, যদি খেলোয়াড়গণের জ্ঞানসঞ্চার হয়।

বিভিন্ন দলের খেলা

লীগের যোগদানকারী বিভিন্ন দলের ক্রীড়ানৈপুণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান, কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়ান্স প্রভৃতি কয়েকটি দল ব্যতীত অপর সকল দলের খেলা খুবই নিম্নস্তরের হইতেছে। ইহারা যেরূপ খেলিতেছেন তাহাতে ইহাদের স্থান প্রথম বিভাগে না হইয়া চতুর্থ বিভাগে হওয়া উচিত ছিল। কি আক্রমণ বিভাগে, কি রক্ষণ বিভাগে, কোন বিভাগেই শৃঙ্খলা, বোঝাপড়া বা সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এলোপাথাড়ি ভাবে বল মারিয়া অগ্রসর হওয়া ও আত্মরক্ষা করা ইহাই এই সকল দলের বৈশিষ্ট্য। এইরূপ খেলিলে যাহা ফল হওয়া উচিত তাহাই হইতেছে। কিন্তু এইরূপ ফল হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। দল হিসাবে ইহাদের সকলেরই একদিন খ্যাতি ছিল। সুতরাং সেই খ্যাতি যা... বজায় থাকে ইহা কি তাহাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত না। উপরোক্ত দলসমূহও যে খুব উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন তাহা নহে। তাহাদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। বাঙলার ফুটবল খেলার অভাবনীয় উন্নতি হউক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা এবং সেই উদ্দেশ্য লইয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা; কোন দল বিশেষকে হীন প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যাহাতে সুপরিচালিত হয় ও কোন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ভার হইতে বঞ্চিত হইল বলিয়া দুঃখ করিতে না পারে তাহার জন্য নিখিল ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার নিম্নরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কাহারা কোন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবেঃ—মাদ্রাজ—টেনিস, আলীগড়—হকি, কলিকাতা ফুটবল, বোম্বাই—ক্রিকেট, পাঞ্জাব—এ্যাথলেটিকস্, এলাহাবাদ—সন্তরণ।

জোন বা বিভাগীয় প্রতিযোগিতা কাহারা কোনটি পরিচালনা করিবেঃ—পূর্ব বিভাগেঃ—টেনিস—এলাহাবাদ, হকি—পাটনা, ফুটবল—কলিকাতা, ক্রিকেট—কাশী।

উত্তর বিভাগেঃ—টেনিস—~~দিল্লী~~, হকি—আলীগড়, ফুটবল—দিল্লী, ক্রিকেট—পাঞ্জাব।

মধ্য বিভাগেঃ— টেনিস—নাগপুর, হকি—ওসমানিয়া, ফুটবল ও ক্রিকেট—বোম্বাই।

দক্ষিণ বিভাগেঃ—টেনিস—মাদ্রাজ, হকি—ত্রিবাঙ্কুর, ফুটবল—আন্নামালিয়া, ক্রিকেট—মহীশূর।

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। ফাইনাল

খেলায় যে দুইটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া ধারণা করা গিয়াছিল ফলত তাহাই হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, ফাইনাল খেলায় জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় নাই। ভগবন্ত ক্লাব ও ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স দল উভয় দলই একটি করিয়া গোল করায় শেষ পর্যন্ত খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অতিরিক্ত সময় খেলান হইলেও কোন ফল হয় না। ফুটবল মরসুম আরম্ভ হওয়ায় কোন মাঠ না পাওয়ায় বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের নূতন বিধান অনুযায়ী ফল ঘোষণা করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলকেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। উভয় দল পর্যায়ক্রমে ছয়মাস করিয়া নিজেদের দখলে উক্ত বেটন কাপটি রাখিতে পারিবে। তবে কোন দল প্রথম কাপটি পাইবে সেই বিষয়ে 'টস্' করা হয় ও ভগবন্ত ক্লাব দল তাহাতে বিজয়ী হয়। বেটন কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ফাইনাল খেলার এইরূপ মীমাংসা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। এই বৎসরে বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় ইহাই যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহা নহে। ভগবন্ত ক্লাব দলের ফাইনাল খেলায় যোগ্যতা লাভও ইহার মধ্যে অন্যতম। ভগবন্ত ক্লাব সেমি-ফাইনাল খেলায় দিল্লী ইয়ংস দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলা দুইদিন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে ভগবন্ত ক্লাব তিন গোলে পরাজিত হয়। খেলা শেষ হইলে পরাজিত ভগবন্ত ক্লাব বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের নিকট এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করে। ঐ প্রতিবাদপত্রে তাহারা জানায় যে, দিল্লী ইয়ংস দলে তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল খেলোয়াড় খেলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন এই বৎসর বোম্বাইর আগা খাঁ হকি কাপ প্রতিযোগিতায় বারিয়া স্টেটের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। একই বৎসরে নিখিল ভারত হকি ফেডারেশনের বিনা অনুমতিতে দুই দলে খেলিয়া উক্ত দুইজন খেলোয়াড় ফেডারেশনের নিয়মবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন। দিল্লী ইয়ংস ক্লাবও তাঁহাদের খেলাইয়া আইনবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন। সুতরাং দিল্লী ইয়ংস দল বিজয়ী হইলেও তাঁহারা প্রতিবাদ করিতেছেন। এই প্রতিবাদপত্র পাইয়া বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হন। তাঁহারা নির্দেশের জন্য ভারতীয় হকি ফেডারেশনের নিকট অনুরোধ করেন। হকি ফেডারেশনের সম্পাদক প্রথমে কোন নির্দেশ দিতে রাজী হন না। পরে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন বিশেষ অনুরোধ করিলে ও বোম্বাই হকি এসোসিয়েশন ভগবন্ত ক্লাবের অভিযোগ সমর্থন করিলে, ফেডারেশনের সম্পাদক বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনকে দিল্লী ইয়ংস দলকে সাস্পেণ্ড করিতে নির্দেশ দেন। ইহাতে খুব গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে ভাবিয়া বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পুনরায় ফেডারেশনের সম্পাদককে নির্দেশের পরিবর্তন করিতে অনুরোধ করে। ফলে ফেডারেশন ঐ সেমি-ফাইনাল খেলা পুনরায় অনুষ্ঠিত করিবার জন্য বলেন। তবে সেই সঙ্গে ইহা জানাইয়া দেন যে, ঐ দুইজন খেলোয়াড় দিল্লী ইয়ংস দলে খেলিতে পারিবেন না। পুনরায় খেলা হয়। দিল্লী ইয়ংস দল তিন গোলে পরাজিত হন। ভগবন্ত ক্লাব দল ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয়

ভগবন্ত ক্লাব ও দিল্লী ইয়ংস দলের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ও ফাইনালে ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স ও ভগবন্ত দলের খেলায়, খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন যেরূপ অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, ইতিপূর্বে বেটন কাপ প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল বা ফাইনাল খেলায় এইরূপ কখনও দৃষ্ট হয় নাই। খেলা পরিচালকদের দুর্বলতা যে এই বিষয়ের প্রশ্রয় দিয়াছিল ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। ফাইনাল খেলায় ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স দলের জহুর যেরূপ অহেতুক এবং নির্দয়ভাবে ভূতলশায়ী মান্না সিংহকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা ভারতের কোন বিশিষ্ট খেলায় দেখা যায় নাই। পরিচালকগণ তাঁহাকে ঐ আচরণের জন্য মাঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অতিরিক্ত সময় খেলিতে অনুমতি দিয়া নিজেদের দুর্বলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ একজন খেলোয়াড়কে খেলার মাঠে নামিতে দেওয়া কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা যাহাতে না ঘটে তাহার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। এইরূপ পরিচালকগণের নির্দেশ বাঙলাদেশের হকি পরিচালকগণের দুর্নামের কারণ হইবে—ইহা উপলব্ধি করিতে আমরা অনুরোধ করি। নিম্নে পূর্ববর্তী বেটন কাপ প্রতিযোগিতা বিজয়ীগণের নাম প্রদত্ত হইল:—

১৮৯৫-৯৬ নেভ্যাল এ সি, ১৮৯৭-৯৮ এস পি জি মিশন (রাঁচী), ১৮৯৯ রেঞ্জার্স ক্লাব, ১৯০০ সেণ্ট জেমস স্কুল, ১৯০১-২ রয়াল আইরিশ, ১৯০৩ এস পি জি মিশন (রাঁচী), ১৯০৪ হর্নেট, ১৯০৫ বি ই কলেজ শিবপুর, ১৯০৬-৭ এস পি জি মিশন (রাঁচী), ১৯০৮-১০ কাস্টমস, ১৯১১ রেঞ্জার্স, ১৯১২ কাস্টমস, ১৯১৩ রেঞ্জার্স, ১৯১৪ এম কলেজ (আলীগড়), ১৯১৫ রেঞ্জার্স, ১৯১৬ বি ওয়াই এসোঃ (লক্ষ্ণৌ), ১৯১৭ রেঞ্জার্স, ১৯১৮ বি ওয়াই এসোঃ (লক্ষ্ণৌ), ১৯১৯ জেভেরিয়ান্স, ১৯২০ আসানসোল, ১৯২১ বি ই কলেজ (শিবপুর), ১৯২২ ই বি আর, ১৯২৩ ওয়াই এম এ (লক্ষ্ণৌ), ১৯২৪ ক্যালকাটা ১৯২৫-২৬ কাস্টমস, ১৯২৭ জেভেরিয়ান্স, ১৯২৮ টেলিগ্রাফ, ১৯২৯ ই বি আর, ১৯৩০-৩২ কাস্টমস, ১৯৩৩ ঝান্সী হিরোজ, ১৯৩৪ রেঞ্জার্স, ১৯৩৫ বোম্বাই কাস্টমস, ১৯৩৭ বি এন আর, ১৯৩৮ কাস্টমস, ১৯৩৯ বি এন আর, ১৯৪০ ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স।

আই এফ এর নূতন ব্যবস্থা

কলিকাতা ফুটবল লীগ খেলা বিষয়ে সম্প্রতি আই এফ এ এক নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইবার পূর্বে দেখা যায় যে, আই এফ এর নিয়মানুযায়ী প্রথম ডিভিসনে ১৩টি ও দ্বিতীয় ডিভিসনে ১১টি দল খেলিতে পারিবে। সেই মত লীগ খেলার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া সকলে ধরিয়া লয়। সম্প্রতি আই এফ এর যে সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে এই নিয়মের পরিবর্তন করা হইয়াছে। তাঁহারা এই সভায় স্থির করিয়াছেন যে, এই বৎসর প্রথম ডিভিসনে ১৪টি ও দ্বিতীয় ডিভিসনে ১২টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে। ফলে প্রথম ডিভিসনে ক্যালকাটা দল থাকিবে বা স্পোর্টিং ইউনিয়ন থাকিবে এই লইয়া যে গোলমালের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে। উক্ত দুইটি দলই নূতন ব্যবস্থানুযায়ী প্রথম ডিভিসনে খেলিবে। দ্বিতীয় ডিভিসনে যে একটি অতিরিক্ত দলের স্থান হইয়াছে তাহা পূরণ করা হইয়াছে গত বৎসরের লীগ তালিকায় তৃতীয় ডিভিসনে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সালখিয়া ফ্রেণ্ডস দল দ্বারা। তৃতীয় ডিভিসন হইতে সালখিয়া ফ্রেণ্ডস দল উপরে উঠায় তাহার স্থান চতুর্থ ডিভিসনের তৃতীয় স্থান অধিকারী মহমেডান এ্যাথলেটিক ক্লব দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। বেঙ্গল সকার লীগ প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থান অধিকারী বেঙ্গল এ্যাথলেটিক ক্লাবকে চতুর্থ ডিভিসনে খেলিবার অধিকার দিয়া চতুর্থ ডিভিসনের নিয়মিত ক্লাবের সংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে।

উক্ত আই এফ এর সভায় একটি প্রস্তাবে স্থির করা হইয়াছে যে, আগামী বৎসরের বিভিন্ন ডিভিসনের দলের "উঠা, নামা" সাধারণ সভায় বিবেচনা করা হইবে।

আই এফ এর উক্ত নূতন ব্যবস্থা যে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের সন্তুষ্টির কারণ হইবে সে বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

খবর আজব হলেও তার উপর সকলেরই একটা আকর্ষণ আছে। বিলাতী সংবাদপত্র, মাসিক পত্র এবং ছোটদের মাসিক পত্রিকাগুলিতে 'আজব খবর' সংগ্রহ ক'রে দেবার একটা পৃথক ব্যবস্থা আছে। পাঠকদের এসব আজব সংবাদের উপর আগ্রহ এত বেশী বাড়তে আরম্ভ করেছে যে,

পাঁচ বছরের বালিকা লীনা জ্যাডিনার সংসার

ঐ দেশের সংবাদপত্রের কর্তারা বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করেন না। আমরা এইসব আজব খবর যখন বিলাতী পত্রিকায় প্রথম পড়তে সুরু করি, তখন এ খবরগুলিকে আজব বলেই ধরে নিই। সংবাদের মধ্যে যে এতটুকু সত্য থাকা সম্ভব, তা আমরা ছেলেবেলাতেও বিশ্বাস করতে রাজী হতাম না।

অনেকে হয়ত সংবাদ সংগ্রহে অনেক উদ্ভট আজবের আশ্রয় নিতেন, যার হয়ত কোন অর্থ থাকত না; ফলে সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করতে কেউ রাজী হ'ত না। তবে একথা ঠিক, আমাদের অজ্ঞাতে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, যার প্রথম পরিচয়ে আমরা নির্বিবাদে তাকে আজব খবর অর্থাৎ যার ভিত্তি মিথ্যার উপর স্থাপিত বলে বিশ্বাস করে নিই। অপরিচিত আজব সংবাদ ছাপার অক্ষরেও আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে সহজে পারে নি। তবে এসব সংবাদে আমাদের আগ্রহ বেড়েছে বই কমে নি। দেখতে দেখতে আমাদের দেশের পত্রিকাগুলিও আজব খবরের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অনুভব করতে লাগল। কিন্তু তাদিকে বিলাতী আজব সংবাদ সংগ্রহের উপরই নির্ভর ক'রতে হয়েছে। আমাদের দেশের যা কিছু আজব খবর, তা তুলনায় মোটেই আকর্ষণীয় নয়। কোন পল্লীগ্রাম অঞ্চলে প্রকৃতির রহস্যে হয়ত চারটি আমের একত্র সমাবেশ চিত্র, গোশাবকের অস্বাভাবিক মুখমণ্ডল, অদৃশ্য মানবের বৃহৎ পদচিহ্ন, এমনি আরও কিছু কিছু। কিন্তু এসব আজব সংবাদে আকর্ষণ কম। প্রথমে আজব মনে হলেও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এমনি অদ্ভুত ঘটনার অভাব আমাদের দেশে নেই এমন নয়। উৎসাহী লোকের অভাবে তারা প্রকাশ পায় নি, আমাদের পরিচয়ে আসে নি। বিলাতী আজ[illegible] সংবাদগুলি নানাভাবে ছবি দিয়ে সাজিয়ে কাগজে প্রক[illegible] হয়। এইধরণের আজব খবর সংগ্রহের খেয়ালও সে দেশে বহু লোককে যেন পেয়ে বসেছে। এ খেয়ালটা খুব [illegible] পেয়ে বসেছে রিপলি সাহেবকে। দেশ বিদেশ থেকে অদ্ভুত খবর সংগ্রহ করা, ছবি তোলা এবং ছবি আঁকা তাঁর পেশা। তাঁর সংগৃহীত সংবাদ এতই অদ্ভুত যে, তা বিশ্বাস করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর তাঁর খেয়ালের নেশা নির্ভর করে না। 'Believe it or not' এই শিরোনামায় রিপলি সাহেবের বিচিত্র সংবাদগুলি সংবাদপত্রে সাদরে ছাপা হয়। রিপলি সাহেবের নাম এবং তাঁর সংগ্রহীত আজব খবর কেবল একস্থানেই সীমাবদ্ধ নেই; পৃথিবীর সর্বত্রই ছেলেবুড়ো সকলেই আগ্রহসহকারে তাঁর খবর সংগ্রহ করে আনন্দ পায়। সংবাদ সংগ্রহ নিয়ে তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, দেশবিদেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও অদ্ভুত। পৃথিবীর বহু সংবাদপত্র রিপলি সাহেবের 'Believe it or not' সংবাদ পরিবেশন করে পাঠক সমাজের সহযোগিতা লাভ করেছে। তাঁর লেখা 'আজব খবরে'র বই পাঠক সমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

* * * *

প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে নিরস্ত হয় নি। ১৯৩৯ সালের ১৪ই মে তারিখের ঘটনা। পেরুর লিমাস্থ মহিলাদের হাসপাতালে ৩৫ জন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ চিকিৎসক

তাঁদের দুজন সহকর্মীর অস্ত্রোপচার কার্য অশেষ আগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। অস্ত্রোপচার করা হচ্ছিল পাঁচ বছরের বালিকা লিনা ম্যাডিনাকে। অস্ত্রোপচার করে লীনার শরীর থেকে ছ'পাউন্ড ওজনের একটি বলিষ্ঠ মানব শিশুকে উদ্ধার করা হ'ল। উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকের দল বিস্ময়ে ক্রন্দনরত মানবশিশুর দিকে চেয়ে রইলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্রই বেতারযোগে সেই নবাগত অতিথির আগমন ঘোষণা করা হ'ল। অধীর আগ্রহে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক বিস্তারিত সংবাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অতিথির আগমন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল—চিকিৎসকেরা এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে গবেষণা সুরু করলেন। এতদিন মেয়েদের সন্তানধারণের যে একটা সুনির্দিষ্ট বয়স গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত করা হয়েছিল, তা বালকের আবির্ভাবে এক মুহূর্তে ওলটপালট হয়ে গেল। বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে এ খবর বিস্তারিত ছাপা হ'ল। বালিকা লীনার বাপ-মা ছিল গরীব আধা ভারতীয়। তাদের সংসার জীবনের বহু খুঁটিনাটি খবরও ছাপা হ'ল, কিন্তু শিশুর জন্মদাতার সন্ধান মিলল না। লীনা যে সত্যিই শিশুটিকে গর্ভে ধারণ করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ডাক্তারদের ছিল না। লীনার বয়স সম্বন্ধেই তাঁদের সন্দেহ হ'ল। তার বয়স যে ৫ বছর, এ বিষয়ে নানা মতবিরোধ উত্থিত হলে লীনার মা স্থানীয় অফিসের স্বাক্ষরিত একটি জন্ম-পত্র দাখিল করলেন। ঐ থেকে হিসেব নিয়ে দেখা গেল লীনার বয়স সে সময়ে ৪ বছর ৮ মাস হয়েছে। এছাড়া ঐ সময়ে লীনার চোয়ালে বেশীরভাগই দুধে দাঁত রয়েছে। সাধারণত ৬।৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের তা থাকে না। লীনার বয়স যে সত্যই পাঁচ বছর, এটা কয়েকজন ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। আমেরিকার মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের খ্যাতনামা ডাঃ মরিস ফিসবেইনের মতে লীনার বয়স নয়, পাঁচ নয়। তাঁর মতের সঙ্গে একমত হয়ে আরও কয়েকজন ডাক্তার বললেন, দুধ দাঁত দিয়ে অনেক সময় বয়স নির্দ্ধারণ হয় না। লীনার বয়স পাঁচ না নয় এনিয়ে গবেষণা করার মূল্য লীনার কাছে কিন্তু কিছুই ছিল না। সে বহুদিনের অভ্যাস মত তার খেলার পুতুলটিকে তেমনিই আদর যত্ন করত কিন্তু মানব শিশুর উপর এতটুকুও তার ত্রুটি ছিল না। নবজাত অতিথি পুতুলটির আর এক ভাই এ ভেবেই সে সমানভাবে মাতৃস্নেহে লালনপালন করছে। লীনার ছোট্ট সংসারের বহু বিচিত্র ছবি বহু সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছে। খেলাশালার মত সে বহুবার ঘর বেঁধেছে আবার ভেঙেছে কিন্তু তাদের উপর স্নেহ দিন দিন বেড়েছে বই কমেনি। বিজ্ঞান সমাজ লীনার উপর বহু সতর্ক দৃষ্টি রেখেও আজ পর্যন্ত রহস্যের কোন কিনারা পায় নি।

* * * *

প্রাণীজগতের কোন কোন জীবের দেহের অস্বাভাবিক স্থানে অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবির্ভাব হতে দেখা গেছে। এই অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেমন বলিষ্ঠ হয় না কাজের পক্ষে কোন সুবিধা আসে না, সময়ে সময়ে অসুবিধা সৃষ্টি করে। আমাদের শুনা কথা যে, সে যুগের কোন কোন দেবদেবীদের নাকি কপালেও একটি অতিরিক্ত চক্ষু বিরাজ করত। এ যুগের মানুষের কপালে এইরকম অতিরিক্ত চক্ষুর খোঁজ মিলবে কি না জানি না। আজ পর্যন্ত মানব শিশুর দেহেও যেসব অস্বাভাবিক বস্তুর আবির্ভাব দেখা গেছে তাতে অতিরিক্ত চক্ষুর খবর পাওয়া যায় নি। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাট মারকুইসের কপালে সত্যিকারের কোন অতিরিক্ত চক্ষু না থাকলেও এক অদ্ভুত ক্ষমতাবলে তিনি কপালের অনাবৃত স্থান থেকে মানুষের গতিবিধি, লেখাপড়া বেশ বলতে পারেন। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে বলেছেন, যাদুবিদ্যায় যে কৌশলে চক্ষু আবৃত অবস্থায় লেখাপড়া করে দর্শকদের চমৎকৃত করা হয় প্যাট মারকুইস সে কৌশল অবলম্বন করেন না। তাঁর ক্ষমতাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে বহুলোক অভিমত দিয়েছেন। চোখের উপর সিমেন্ট দিয়ে যেমন খুশি তেমনি করে আবৃত করে কপালের একটু অংশ অনাবৃত করে দিলেই প্যাট স্বচ্ছন্দে সেই অবস্থায় আবৃত চোখের সামনে কি ঘটছে তা বলে দিতে পারেন। খবরের কাগজ পড়ে শুনান এমনি আরও অনেক পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়। আশ্চর্য! আজ পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হননি। ম্যাজিকেও এমনি খেলা দেখিয়ে লোককে তাক লাগান হয় কিন্তু সেখানের অপকৌশল এখানে তিনি অবলম্বন করেন না। একটু চেষ্টা করলেই যাদুকরের অপকৌশল ধরা পড়ে কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কেউ তাঁর কৌশলের খবর পায়নি।

প্যাট জাতিস্মর বিশ্বাস করে বলেন,—"আমি পারসে নাপিজি নামে পরিচিত ছিলাম; সে কথা আজের নয় এগারশ খৃষ্টাব্দের।" একদিন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পূর্বজন্মের ঘটনা পারসী ভাষায় বলে যান। সে জন্মে নাপিজি কি করত তার ঘটনা তিনি বলে যাচ্ছেন অনর্গল কিন্তু আশ্চর্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁকে তাঁর পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তাঁকে নিরুত্তর দেখা যায়—আশ্চর্য হয়ে বলেন আমি পারসী ভাষা একেবারে জানি না ত অচৈতন্য অবস্থায় সেই ভাষায় বক্তৃতা দেব কিভাবে? চোখ বাঁধা অবস্থায় প্যাট যেসব শক্ত শক্ত কাজ করেন তাতে তিনি যে কোন একটা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী তা সকলেই স্বীকার করেন। চোখ বাঁধা অবস্থায় পিং-পং খেলায় যোগদান করে বিভিন্ন মারে প্রতিদ্বন্দ্বিকে তিনি বিপর্যস্ত করে তুলেন। খেলায় নির্ভুল মার, বিচার বুদ্ধি এ সবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্যাটের এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনে কালিফার্নিয়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কিন্তু প্যাটকে ভয়ানক ভয় করে। হঠাৎ রাস্তার উপর প্যাটকে আসতে দেখলে ছেলের দল ভয়ে ঘরের মধ্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়।

কলকাতার রাস্তায় প্যাটের আবির্ভাব যে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। হুজুগের দেশ পয়সা মন্দ পড়বে না।

পুস্তক পরিচয়
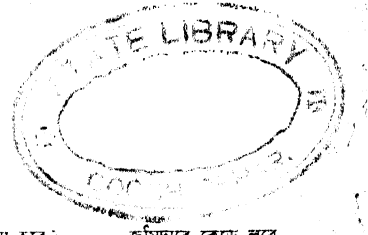
বৈকালী *

রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙলা কাব্যসাহিত্যে যে কয়েকজন কবি সত্যকার কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পর্ণপুট, বল্লরী, ব্রজবেণু, ক্ষুদকুড়া, ঋতুমঙ্গল, রসকদম্ব, লাজাঞ্জলি, হৈমন্তী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ভিতর দিয়া রস-পিপাসু বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে তিনি যে আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 'বৈকালী' সেই আসন আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আলোচ্য কবিতার বইখানিতে বিভিন্ন বিষয়ের ১১২টি কবিতা গ্রথিত করা হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই বর্তমান কালে লিখিত হইলেও যৌবনে রচিত কতকগুলি কবিতাও ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে।

কালিদাসবাবুর কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করিতে বসিলেই কাব্য-বিচার সম্বন্ধে যে কথাটা সর্বপ্রথমে এবং সর্বপ্রধানরূপে মনে জাগিয়া ওঠে, তাহা এই যে সারল্য এবং সহৃদয়তাই উত্তম কাব্যের প্রাণ-বস্তু। সাধারণ জনপ্রবাহ হইতে একজন কবির বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তিনি বিরাট সৃষ্টিপ্রবাহের ভিতরে বহিঃপ্রকৃতি এবং জীবনধারাকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন এবং তাঁহার সেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বহিঃপ্রকৃতি এবং জীবনধারা তাঁহার নিকটে একটা বিশেষ রূপ এবং বিশেষ সত্য লইয়া আবির্ভূত হয়। বিশ্বজগৎ এবং বিশ্ব-জীবনের সেই বিশেষ রূপটিকে অকপটে যথাযথভাবে পাঠকের নিকটে পরিবেশন করাই কবির কাজ। বিশ্বের যে রূপটি গভীর রসালোকে অন্তরের ভিতরে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে নাই, রসানুভূতির ভিতর দিয়া যে সত্যের উপলব্ধি হয় নাই, কল্পনায় তাহাকে গড়িয়া লইয়া ছন্দোবন্দের ভিতর দিয়া বিবিধরূপে চাতুর্যমণ্ডিত করিয়া তাহার যে প্রকাশের চেষ্টা উহা সাহিত্যের ব্যাভিচার। যে রূপ, সে সত্যকে অন্তরের স্পন্দনের ভিতর দিয়া লাভ করা যায়, তাহা যত ক্ষুদ্র হোক, তুচ্ছ হোক—অন্তরের সমস্ত সম্পদ দিয়া তাহাকে পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করাই সত্যকার কাব্য রচনা। একদিকে অন্তরের ধ্যান এবং উপলব্ধি, আর অন্যদিকে ভাষা ও ছন্দের ভিতর দিয়া বাহিরে তাহার প্রকাশ—এই উভয়ের ভিতরে যেখানে থাকে অন্বয়যোগ, সে কাব্য শুধু কলা-সৃষ্টি নহে, সেখানে সে কবিচিত্ত বিশ্বমানবের চিত্তের ভিতরে নিগূঢ় রসময় যোগসূত্র।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের কবিতাগুলি ঠিক এই জাতীয় কবিতা, এবং বিশেষ করিয়া এই গুণেই কবিতাগুলি আমাদের হৃদয় এইরূপ আকৃষ্ট করে। কালিদাস বাবু বাঙালীর কবি—বাঙলার জল-বায়ু, আকাশ-বাতাস, মাঠঘাট—বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা—বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁহার কবিচিত্তকে নিরন্তর মুগ্ধ করিয়াছে—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন বাঙলা দেশের প্রতিটি ধূলিরেণু, বাঙালীর সুখদুঃখ-ভরা জীবন। বাঙলার ঘরে ঘরে জাগিয়া রহিয়াছে যে, মেনকার অতন্দ্র স্নেহদৃষ্টি,—আদরিণী উমার রক্তাম্বরে নববধূবেশ—বাঙলার সেই প্রপিতামহীগণ—যাঁহারা—

> "হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত",
> নব জামাতার কাছে জুড়ি দুই হাত,
> জননী একথা বলি সঁপিত কন্যায়
> প্রসাদী কুসুম সম অশ্রুর বন্যায়।
> এ কাহারা? আমাদেরই দূর পিতামহী,
> বাঙলার ঘরে ঘরে দুঃখ দৈন্য সহি'
> কত ক্লেশে কত দিন র'য়ে অনশনে
> অঙ্গ ঢাকি' শত গ্রন্থি মলিন বসনে
> মানুষ করিয়াছিল আপন দুলালে,
> মোদের প্রপিতামহে।

বাঙলার সেই পাটনী, যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার নিকটে করজোড়ে বলিতেছে—

> "সোনা নিয়ে কি মা হবে? জমিদারে কেড়ে লবে,
> লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে।
> বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেন
> চিরদিন থাকে দুধে ভাতে।"

ইহারা সকলেই কবির চিত্তকে উন্মথিত করিয়াছে—কবি ইঁহাদিগকেই দিয়াছেন তাহার অন্তরের প্রীতির অর্ঘ। ইহার ভিতরে ভাষা ও ছন্দ লইয়া হঠাৎ একটা তাক লাগাইবার আপ্রাণ কসরৎ নাই,—বুদ্ধিবৃত্তির প্যাঁচ কসিবার চেষ্টা নাই,—আছে সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও প্রীতি—আছে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জীবনের প্রতি অসীম দরদ। মনের রুদ্ধ দুয়ারটি যেমন করিয়া অকপটে একান্ত আপনজনের নিকটে উদ্ঘাটিত করিতে হয়, কবি তাঁহার কবিতাগুলির ভিতর দিয়া তাহাই করিয়াছেন। এই যে দরদী কবিচিত্তের প্রীতিপূর্ণ স্পর্শ তাহাই সমগ্র কবিতাগুলিকে একটা অপূর্ব রমণীয়তা দান করিয়াছে। কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

> আমি বাঙালীর কবি, বাঙালীর অন্তরের কথা
> বাঙলার আশা-তৃষ্ণা, স্মৃতি-স্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
> ছন্দে গেয়ে যাই আমি। অভ্রভেদী নহে তার তান,
> দেশ-দেশান্তর লাগি নহে মোর ক্ষীণ কণ্ঠে গান।
> যুগ-যুগান্তের পথে যাত্রা তার নহে কোন দিন।
> কুলায় কুণ্ঠিত সে যে, বক্ষ ভীরু, পক্ষ তার ক্ষীণ।

কবি বলিতেছেন,—

> পশ্চিমের ঝঞ্ঝার মাঝারে
> যাহারা বাঙালী মর্ম রাখিয়াছে অঞ্চলের আড়ে
> তুলসীর দীপ সম, তাহাদেরি তরে গাই গান
> বিম্বিত আমার গানে তাহাদেরি অমার্জিত প্রাণ।

কিন্তু অন্তরের এই অসীম দরদ—এই সহজ সারল্যই কালিদাস-বাবুর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য হইলেও এবং তাঁহার কবিতায় বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে অকারণ প্যাঁচ কসিবার আধুনিক রীতি অনুসৃত না হইলেও বুদ্ধির খোরাকও যে তাঁহার কবিতায় নাই একথা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আদিত্য', 'বেদ', 'গঙ্গা' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কবিতাগুলির ভিতরে কবির চিন্তার পরিধি—কল্পনার বিরাটত্ব—ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাহারই সহিত একটি অন্তর্নিহিত লিরিকের সুর আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তথ্যের প্রাচুর্য এবং তৎসহ অন্তরের দরদে কালিদাসবাবুর এই কবিতাগুলি একটা স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করিয়াছে। অনেক কবিতার ভিতরে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অনেক বিষয়কে কোনও একটা গভীর সত্যের প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা (interpretation) করিবার সফল প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে কবি নিজেই 'পরিচায়িকা'র ভিতরে বলিয়াছেন,—"এই পুস্তকখানিতে ছন্দের বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষিত হইবে। অধিকাংশ কবিতা দীর্ঘ ত্রিপদী ও আয়ত পয়ারে লিখিত। আগেকার গ্রন্থ-গুলিতে ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির ত্রুটি করি নাই। সে বৈচিত্র্যে আর লাভ নাই। বৈকালীর অধিকাংশ কবিতায় প্রেরণা আমার অন্তর হইতেই পাইয়াছি—স্বপ্নের দিন গিয়াছে—এখন স্মৃতিই সম্বল। এই স্মৃতিই বহু কবিতার উপজীব্য।"

---

* কবিতার বই—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। রসচক্র সাহিত্য সংসদ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশ—শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সারস্বত মন্দির, ১নং রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১০+২০০। মূল্য দুই টকা মাত্র। ছাপা ও বাঁধাই অতি উত্তম।

নিজের কবিতা সম্বন্ধে কবি নিজে বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান সাহিত্যিক সমাজে এ সকল কবিতার সমাদর নাই তাহা আমি জানি। যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসাদর্শের পরিবর্তন হইয়াছে। সাহিত্যিক সমাজের ভরসায় এ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না।

'আদিত্য' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে কবির বক্তব্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। কবি সূর্যকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"বিশ্বযাগের তুমি হোমাগ্নি, স্থণ্ডিল তব বিরাট ব্যোম,
সপ্তর্ষিরা হোতা এ যজ্ঞে সোমরসধারা যোগায় সোম।
গ্রহগণ গাহে সামগান তাহে, উদ্গাতা তারা সমস্বরে,
ব্রহ্মাস্বয়ং 'ব্রহ্মা' ও যাগে, মহাকাল ঘৃতে চমস ভরে।
প্রেতলোক লভে ওদন কব্য, দেবতা হব্য, সোমাঞ্জলি,
ভূতনাথ লভে ভস্মভূষণ, ভূতগণ লভে বিকির বলি।
তরু পুরোডাশ লভিছে মানব ওষধি তরুর প্রসবরূপে,
তামস পশুর রুধির গড়ায় প্রাচীদিগন্তে বলির যূপে।"

সাহিত্যিক সমাজের বাহিরে বিরাট একটা পাঠক সমাজ আছে—সে সমাজে সংস্কারযুক্ত মনের অভাব নাই।......এই পাঠক সমাজের পক্ষ হইতে বিচার করিলে আমার হতাশ হইবার কোন কারণ আজিও ঘটে নাই।" আমাদের মনে হয়, কবির বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভুল। বাঙলাকে এবং বাঙালীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এমন লোকের অভাব বাঙলা দেশে এখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, আর অন্তরের সহজ সারল্যকে সমগ্র অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবার লোকও আজ পর্যন্ত বাঙলা দেশে বিরল বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং কবির কাব্যকে বাঙলার একটা বিরাট পাঠকসমাজ প্রীতি-বিগলিতচিত্তে গ্রহণ করিবে ইহাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি আর, এস

পল্লীসেবক উপেন্দ্রনাথ—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু; ৬৪।২, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা হইতে বসিরহাট যাইবার পথে মরুভূমির মাঝে মরূদ্যানের মত ডান দিকে একটি সুন্দর গ্রাম অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই গ্রামটির নাম ধান্যকুড়িয়া। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয় এই পল্লীর উন্নতি সাধনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ করিয়া লিখিয়াছেন—'পল্লীর উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পুণ্যস্মৃতি সেই উপেন্দ্রনাথ সাউ; জীবন চরিত রচনায় তোমার অধ্যবসায় পল্লীহিতৈষী মাত্রেরই আনন্দের বিষয়।' উপেন্দ্রনাথের পুণ্যচরিত বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচার হউক। গ্রন্থকারের ন্যায় আমরাও কামনা করি, বাঙালী জাতি ব্যবসা কার্যে উদ্যত হউক এবং বাঙলার কেন্দ্রস্থল যে পল্লীগ্রাম তাহাকে ভালবাসিয়া সমুন্নত করুক।

তত্ত্ব কৌমুদী, পাক্ষিক পত্রিকা—সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু। বৈশাখ। কার্য্যালয়—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ; ২১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

'তত্ত্ব কৌমুদী'র ঐতিহ্য আধুনিক বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাঙলা দেশের অনেক শক্তিশালী নেতা, চিন্তাশীল নেতা এবং সাধক ও ভাবুকদের সাধনায় 'তত্ত্ব কৌমুদী' সমৃদ্ধিলাভ করে। গত বৎসর হইতে নবভাবে এবং নবীন উৎসাহে এই পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে এবং আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ইতিমধ্যে এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। 'তত্ত্ব কৌমুদী'র নববর্ষ সংখ্যা সারগর্ভ প্রবন্ধ নিচয়ে সমৃদ্ধ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 'নববর্ষের চিন্তা', হীরেন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মের স্বরূপ', শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বন্দে মাতরম্ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত', পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের 'সংকীর্তন ও আরাধনা' কোনটি বাদ দিয়া কোনটির কথা বলিব, প্রবন্ধগুলি সবই পড়িবার, ভাবিবার এবং বুঝিবার বিষয়ে পরিপূর্ণ। বাঙলার ঘরে ঘরে আমরা এই পত্রিকার প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—শ্রীঅমল হোম সম্পাদিত। স্বাস্থ্য সংখ্যা। মূল্য আট আনা।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যাগুলি সম্পাদনকৃতিত্বে এতই সুযশ অর্জন করিয়াছে যে, এইগুলির পরিচয় দেওয়ার আর কোন প্রয়োজন হয় না। ৮ শতের অধিক পৃষ্ঠাপূর্ণ বর্তমান সংখ্যা প্রবন্ধ গৌরবে, চিত্র সৌন্দর্যে, ছাপায় কাগজে সকল দিক হইতে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। নারী এবং শিশুচর্চা ও খাদ্য নির্বাচন সম্পর্কিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত এবং শুধু লিখিত নয়, সুলিখিত। স্বাস্থ্যতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় কণ্টকিত নয়, লেখাগুলি সরস এবং আকর্ষণীয়। নারী এবং শিশুচর্চা ও খাদ্য নির্বাচন সম্পর্কিত লেখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ এমন মূল্যবান সংখ্যাটি পৌরবাসীদের প্রত্যেকের পড়া উচিত এবং পড়ান ও বুঝান উচিত।

৮ম বর্ষ] ১০ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 24th May, 1941. [২৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

লীগ ও হক সাহেব—

মোসলেম লীগের কলিকাতার শাখা বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবের উপর রুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে,- "লীগের অনুমতি না লইয়া যিনি যে কথাই দিন, তিনি স্যার সেকেন্দারই হউন, আর মৌলবী ফজলুল হকই হউন, লীগ সে কথার দ্বারা বাঙলার তথা ভারতের মুসলমানদিগকে বাধ্য হইতে দিবেন না।" হক সাহেব লীগের এই বিবৃতির জবাব দিয়াছেন। তিনি কলিকাতার লীগওয়ালাদিগকে কতকটা শাসাইয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা মুসলিম সম্প্রদায়কে ভালবাসার বা দেশ-হিতৈষণার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে আমার সতর্ক করিয়া দেওয়ার সময় আসিয়াছে। তাঁহারা যদি কোন রাজনীতিক প্রশ্ন লইয়া আমার সহিত লড়িতে চাহেন, তবে সে লড়াই হইতে হটিয়া যাইবার লোক আমি নহি। আমার অভিমত এই যে, ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনতন্ত্র অনৈক্যের উপর গঠিত হইবে না, তজ্জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক ভালবাসা। এই উদ্দেশ্য লইয়া আমি বিবদমান সম্প্রদায়গুলির নিকট আবেদন করিতেছি,—তাঁহারা যেন নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান সমস্যার সমাধানের জন্য সমবেত হন এবং এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করেন যাহা ভারত এবং ভারতবাসীর যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।"

বড়লাট জিন্না সাহেবকে বাদ দিয়া বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক এবং পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁকে পরামর্শে ডাকাতে জিন্না সাহেব নিশ্চয়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। হক সাহেবের এই বিবৃতির পর তিনি কি মূর্তি ধারণ করিবেন বলিতে পারি না। তিনি যে মূর্তিই ধারণ করুন, সেজন্য আমাদের ভয় নাই, আমাদের ভয় হইল তাঁহার বিবৃতি লইয়া এবং সে বিবৃতির ভয় যুক্তি বা সঙ্গতির জন্য নয়, কতকগুলি দুর্বল প্রকৃতির তথাকথিত নেতাদের জন্য। ইঁহারা জিন্না সাহেবের কোন বিবৃতি দেখিলেই চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে তোয়াজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই দলের মাতব্বরদের চেয়েও বেশী ভয় আমাদের হয়—ভারত সচিবের জন্য। আমরা ইহা বিশেষভাবেই জানি, একদিকে জিন্না সাহেবের তোয়াজে ব্যগ্র ভারতীয় একশ্রেণীর নেতার দল, অন্যদিকে স্বয়ং ভারতসচিব; এই দুই নৌকায় ভর করিয়া জিন্না সাহেব চলিতেছেন। এই দুই নৌকা যদি তফাৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে জিন্না সাহেবকে অতলতলে ডুবিতে হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অনৈক্য এবং অসম্মতির ধুয়া ধরিয়া ভারতসচিব এতকাল যে ভারতবাসীদিগকে শাসনাধিকার দানের অক্ষমতার কারসাজি খেলিতে পারিতেছেন, সে কেবল জিন্না সাহেবেরই কৃপায়। ভারতের যে কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্ত্র চলিতেছে, সেই কয়টি প্রদেশের মধ্যে সিন্ধু জিন্না সাহেবের দলে নাই, আসামও নাই, পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থানী প্রস্তাবকে অস্বীকার করিয়াছেন; এখন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকও যদি ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবী সমর্থন করেন, তাহা হইলে ভারতসচিবের মুরুব্বিয়ানা ফলাইবার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতি কৌশলের প্রয়োগক্ষেত্রে এ সমস্যা সামান্য নহে, আমরা শুধু তাহাই ভাবিতেছি।

হক সাহেবের সঙ্কল্প—

হক সাহেব বলিয়াছেন, শান্তি স্থাপনের জন্য আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি, আমি শেষ পর্যন্ত উহার অনুসরণ করিব। হক সাহেবের প্রস্তাবের খুটিনাটি লইয়া আমরা আলোচনা করিতে চাহি না, সে প্রস্তাব যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং ভারতের সংহতি ধ্বংসপ্রয়াসী লীগওয়ালাদের মনঃপূত হয় নাই, ইহাতেই আমরা কিঞ্চিৎ শুভের সূচনা পাইতেছি; কারণ এই লীগওয়ালার দল হক সাহেবের উক্তি এবং বিবৃতি

প্রভৃতি ভাঙ্গাইয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতে এ পর্যন্ত কসুর কিছুই করেন নাই। স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খানের দ্বারা এতটা সুবিধা হয় নাই, তাঁহাদের যতটা সুবিধা হইয়াছে হক সাহেবকে দিয়া। সেই হক সাহেব এত দিনে যদি ভারতের সকল দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে দৃঢ়ব্রত হন এবং লীগের চেলা-চামুণ্ডাদের বিরুদ্ধতা এই ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে বাঙলা দেশে লীগের নামটা পর্যন্ত লুপ্ত হইবে। লীগের ঘাড়ে ভর করিয়া যে কয়েকজন অবাঙালী বাঙলা দেশের মুসলমান সমাজের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতেছে, তাহাদের মাতব্বরী খসিয়া যাইবে। হক সাহেব আজ এইদিক হইতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন। আমরা আশা করি, এইরূপ ব্যাপারে অতীতের দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি দৃঢ়তা দেখাইবেন এবং বাঙলা কুগ্রহের ফের হইতে উদ্ধার পাইবে।

বেতারে বাঙলা গান—

নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু কিছু বাঙলা গান এবং বাঙলা বক্তৃতা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কেন্দ্রগুলি হইতে প্রচার করিবার জন্য প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জামসেদপুরের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব করা হয়। পরে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বেতার কর্তৃপক্ষকে ঐ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ এই অনুরোধের যে জবাব দিয়াছেন, আমরা তাহাকে একান্তই অযৌক্তিক মনে করি। তাঁহারা বলেন, প্রোগ্রামের মধ্যে বাঙলা কোন কিছু থাকিলে অন্য ভাষাভাষীরাও অনুরূপ দাবী করিবে। যুক্তি চমৎকার! ঢাকা ও কলিকাতার কেন্দ্রে হিন্দুস্থানী প্রোগ্রাম চালাইতে কর্তাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, বোম্বাই এসব স্থানেও বাঙলা প্রোগ্রাম চালাইতে তাঁহাদের আপত্তি করা উচিত নহে। এই কথার উত্তরে যদি তাঁহারা বলেন যে, বিশেষ ভাষার প্রোগ্রামের প্রতি গ্রাহকদের আগ্রহ বুঝিয়াই প্রোগ্রাম চালান উচিত, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঢাকা এবং কলিকাতায় যদি হিন্দুস্থানী প্রোগ্রাম শুনিবার জন্য আগ্রহশীল গ্রাহক থাকে, বাঙলার বাহিরেও বাঙলা ভাষার প্রোগ্রামগুলির জন্য আগ্রহশীল গ্রাহক যে থাকিতে পারে না, ইহাই বা তাঁহারা ধরিয়া লইলেন কেমন করিয়া? কেবল বাঙালীই যে বাঙলা প্রোগ্রাম শুনিবার জন্য আগ্রহশীল হইবে, এমন যদি তাঁহাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে সে ধারণা ভুল। রবীন্দ্রনাথের গান এবং আবৃত্তি শুনিবার জন্য আগ্রহ বাঙলার বাহিরে ভারতের সর্বত্র তো আছেই, এমন কি, ভারতের বাহিরেও আছে। ভরতের অন্য কোন ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষার তুলনা হয় না। বাঙলা ভাষার যে রস-সমৃদ্ধি আছে, ভারতের অন্য কোন ভাষায় তাহা নাই। রসের পরিবেশন করাই যদি বেতার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বাঙলা ভাষার দাবীকে কিছুতেই তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

বঙ্গ আদালতের এক পৃষ্ঠা—

কুলটীর গুলী চালানর ব্যাপারের কথা পাঠকদের মনে পড়ে কি? না পড়িবারই কথা। শান্তিভঙ্গের একটা মামলা দায়ের হয় এই সম্পর্কে। ছয় মাস ধরিয়া এই মামলা ক্রমাগত মুলতুবীর পর মুলতুবীর পাক খাইতে খাইতে ৫ই মার্চ তারিখে একেবারে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী থাকে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, এই পর্যন্তই বুঝি শেষ; কিন্তু হাইকোর্ট নিজেরা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। প্রধান বিচারপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি এইরূপ বিচার বিভ্রাট আর দেখেন নাই। এই বিচার বিভ্রাটের মূলে ছিলেন কাহারা? বলা বাহুল্য, এই মামলা মুলতুবী ও স্থগিত রাখা সমস্তই গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অনুসারে হইয়াছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই কর্তাদের রায়ে সায় দিয়াছেন; উপরওয়ালাদের হুকুমে চালিত হইয়া বিচারকের কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন। হাইকোর্ট গভর্নমেণ্ট ও ছোট বড় হাকিমদের আচরণের সমালোচনা করিয়া বলেন,—'যাঁহারা এইরূপ আদেশ দিয়াছেন, যাঁহারা সেই আদেশ চালান করিয়াছেন এবং যাঁহারা তদনুসারে কার্য করিয়াছেন, সকলেই আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন।' তাঁহারা আরও বলেন,—'যখন বিচারকারী ডেপুটিকে বলা হইল যে, গভর্নমেণ্টের ইহাই অভিপ্রায় এবং সেই অভিপ্রায় তাঁহার উপরওয়ালাদের মারফতে বিজ্ঞাপিত হইল, তখন বিশেষ দৃঢ়চিত্ত না হইলে আইন অনুসারে কার্যনির্বাহ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য।' শাসন বিভাগের মর্জির দ্বারা এদেশের বিচারকেরা প্রভাবিত হইয়া থাকেন কুলটীর এই বিচার বিভ্রাটই তাহার প্রমাণ। হাইকোর্ট এই প্রভাব হইতে মুক্ত, কিন্তু হাইকোর্ট পর্যন্ত পোঁছে কয়টা মামলা? শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ করিবার জন্য দাবী এদেশের রাজনীতিকরা বহুবার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। না হওয়াতে যাঁহারা বিচারক, তাঁহাদের দ্বারা ন্যায়ের মর্যাদা সরকারী মর্জিতে লঙ্ঘিত হইবার সম্ভাবনা কতটা থাকে, ইহা হইতেই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কর্তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার করিবার দৃঢ়চিত্ততা দেখান, যেখানে আদালতের বিচারকারীদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে, সেখানে দণ্ডবিধান, বিশেষত রাজনীতিক মামলা প্রভৃতি বিশেষ ক্ষেত্রে যে ন্যায়ের নীতি লঙ্ঘিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, কোথায়ও লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড, বিনা অপরাধে দণ্ড, এবং গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড—এমন কি, বিনা দণ্ড, আইনের এমন অপব্যবহারের আশঙ্কা ঘটিতে পারে, কিছুই আশ্চর্য নহে। আমরা আশা করি, কুলটীর মামলা সম্বন্ধে হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত বাঙলা সরকারের জ্ঞাননেত্র উন্মীলনে সাহায্য করিবে।
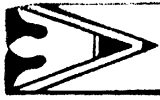
'ভারত ভাস্কর' রবীন্দ্রনাথ—

রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর একটি বিশেষ দরবার আহ্বান করিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কোন উপাধির প্রয়োজন নাই; তিনি স্বয়ং পুণ্য প্রতিভায় এবং সুবিমল যশোরাজীর বিস্তারে বিশ্বের ভাস্কর। বিশ্বকবির চরণে মহারাজার এই সশ্রদ্ধ অবনতির মাঝে একটি পরম মাধুর্য এবং সৌন্দর্য আছে, তাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মানবতার কবি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বমানবতার প্রতি শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে মহারাজার আর একটি কার্যে। রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে সে কথাটা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে, বর্তমান মহারাজা অত্যাচারপীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে যে রকম অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন, তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম, তাঁর বংশগত রাজা উপাধি আজ বাঙলা দেশকে সর্বজনের মনে সার্থক হয়ে মুদ্রিত হলো। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে। এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠলো এবং সেইদিনে রাজ হস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ পেলেম, তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্বাদ করি এই মহা পুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে।" কবির আশীর্বাদের সঙ্গে বিপন্ন বাঙলার দুর্গত নরনারীর সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন ত্রিপুরার রাজ পরিবারকে বাঙলার ইতিহাসে উত্তরোত্তর অমর মহিমায় মণ্ডিত করিবে।

পরলোকে দীনেশরঞ্জন দাশ—

'কল্লোল' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ গত ১২ই মে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্র একদিন বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। কল্লোল'কে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যিক দল বাঙলার সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন, তাঁহাদের সাধনা বাঙলার গদ্য সাহিত্যে, বিশেষভাবে গল্প সাহিত্যে একটা নূতন ধারার প্রবর্তন করে। ইঁহারা বাঙলা সাহিত্যের গতি বেগ বাড়াইয়া দেন। এই দিক হইতে দীনেশরঞ্জনের নাম বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী হইয়া থাকিবে। দীনেশরঞ্জন নিজে একজন সুলেখক ছিলেন। সর্বশেষে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়িয়া চিত্রাভিনয় এবং চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং এই ক্ষেত্রেও বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। চিত্রাঙ্কণেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। দীনেশরঞ্জন একাধারে ছিলেন সাহিত্য এবং শিল্পানুরাগী এবং সমস্ত জীবন তিনি সেই সাধনাই করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলার শিল্পী এবং সাহিত্যিক সমাজের গুরুতর ক্ষতি ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিলাতে ভারত কথা—

লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে কিছুদিন পূর্বে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ভারতের সমরপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ভারতের ভূতপূর্ব অর্থসচিব লর্ড হেলী, স্যার জর্জ সুস্টার, স্যার স্ট্যানলী রীড এবং 'স্টেটস্‌-ম্যান' পত্রের সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর এই আলোচনায় যোগদান করেন। সকলেই সমস্বরে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, ভারতে সমরপ্রচেষ্টা যেমন হওয়া উচিত ছিল, তেমন হইতেছে না। উঁহারা সকলেই বলেন,—ভারতীয় প্রতিনিধিগণ গভর্নমেণ্টে যোগদান না করিলে সমরপ্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় যে সব ব্যক্তি—তাঁহাদের অনেকেই এখন কারাগারে। তাঁহাদের গভর্নমেণ্টে যোগদান করাইতে হইলে শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং ততোধিক প্রয়োজন ভারতের সম্বন্ধে বৃটিশ রাজনীতির কর্ণধারদের মনোভাবের পরিবর্তনের; কিন্তু তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। মাঝে মাঝে আমরা বড়লাটের সঙ্গে নেতাদের আলাপ-আলোচনার কথা শুনিতে পাই; কিন্তু এই সব আলাপ-আলোচনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে শাসননীতির পরিবর্তনের ইচ্ছা যদি কার্যত না থাকে, তবে আমরা উহা নিরর্থক বলিয়াই মনে করি। বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডল, তাঁহাদের এমন সঙ্কটকালেও ভারতের সম্বন্ধে যখন এতটা উদাসীন, তখন স্পষ্টই ইহা বুঝা যায় যে, ভারতের সমরপ্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন করিবার জন্য তাঁহারা ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের মতামতকে কোনরূপ মূল্য দেওয়া প্রয়োজন বোধই করেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জল টানা এবং কাঠ বহিবার জন্য ভারত তো আছেই; সুতরাং ভারতের যত কর্ম, আমরা ভারতের কর্তা, কল টিপিলে আমাদের ইচ্ছাতেই হইবে—ইহাই হইল তাঁহাদের মনের ভাব। স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার, গণতান্ত্রিকতা—এসব যত কিছু শ্বেতাঙ্গদের জন্যই—ভারতবাসীদের জন্য নয়। নূতন যুগের হাওয়া জগতের সর্বত্র সাড়া দিতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষ যে জগৎ ছাড়া। কর্তাদিগকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে নিশ্চয়ই ঠেকিয়া শিখিতে হইবে যে, ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের এই মধ্যযুগীয় ধারণা কতটা অসত্য এবং তখন সেই শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদিগকে এই আপশোষ করিতে হইবে যে, সময় থাকিতে শিক্ষাটা পাইলে ভাল হইত। বৃটিশ রাজনীতিকের এমন অদূরদর্শিতা অভিনব নহে।

বিপিনচন্দ্রের স্মৃতি তর্পণ—

গত মঙ্গলবার কলিকাতার একটি জনসভায় স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতি পূজা করা হইয়াছে। বাঙলা দেশ হইতে নব জাতীয়তার যে আগুন ভারতের সর্বত্র একদিন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বিপিনচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা সাধনা বিশেষ-

রবেন এবং তিনি তুরস্কের ভিতর দিয়া সেনা লইতে চাহিবেন। বর্তমানে বিমানযোগে বা অন্যভাবে সিরিয়ায় সেনা অবতরণ ানেই হইবে, তাঁহার লক্ষ্য। ইংরেজ অবশ্য চুপ করিয়া বসিয়া কিবে না। ইতিমধ্যেই ইংরেজের বিমান বহর সিরিয়ার বিমান রের ঘাটিগুলির উপর বোমা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। সাই-স এবং ক্রীট হইতেও এই বাধাদানের চেষ্টা চলিবে, তখন ক্রীট বং সাইপ্রাসের উপর হিটলার হয়ত জোর দিবেন এবং এই দুইটি ীপ দখল করিতে চেষ্টা করিবেন। জার্মানেরা সাইপ্রাস ীপের উপর দিয়া উড়োজাহাজে ঘোরাফেরা করিতেছে; ন্তু ইতিমধ্যেই তাহারা চরম দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ক্রীট ীপে পনেরো শত সৈন্য প্যারাসুট এবং গ্লাইডারযোগে মায়। পার্লামেন্টের কমন্স সভায় ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ীট দ্বীপে জার্মান সেনাদের অবতরণের পূর্বে সুদা বে নামক ঞ্চলের উপর প্রচন্ডভাবে বোমা বৃষ্টি চলিয়াছিল। ইহার পর র্মান সৈন্যেরা ঐ দ্বীপের ডাঙ্গায় নামে। এইসব জার্মান

সিরিয়ায় তিনি যেমন নিজের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন এবং মোসুলের তেলের খনি অঞ্চলে পর্যন্ত জার্মান বিমান পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন; স্পেনের উপর চাপ দিয়াও তিনি সেইরূপ জিব্রাল্টারের দিক হইতে সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন; ইতিমধ্যে তুরস্ককে তোয়াজ করাও দস্তুরমত চলিতেছে। তুরস্ক ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি সর্তে আবদ্ধ এবং ভূমধ্যসাগরের জার্মানীর প্রাধান্য রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে তাহার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা-জনক নয়, এ সকলও তার চোখে পড়িতেছে না এমন নয়; তথাপি চারিদিক হইতে সে এমন পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রত্যক্ষভাবে রুশিয়া তাহার পিছনে না দাঁড়ান পর্যন্ত সে আগাইয়া গিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধতা করিতে পারিতেছে না। রুশিয়া ইতিমধ্যে ইরাকের গভর্নমেন্টকে মান্য করিয়া লইয়াছে; রশীদ আলির গভর্নমেন্টের সম্বন্ধে রুশিয়ার কি মন্তব্য, এ ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্ব ততটা নাই, রশীদ আলির গভর্নমেন্টকে স্বীকার করিয়া লওয়ার মধ্যে গুরুত্ব যতটা রহিয়াছে। রুশিয়ার সঙ্গে ইরাকের এই সন্ধির ফলাফল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা
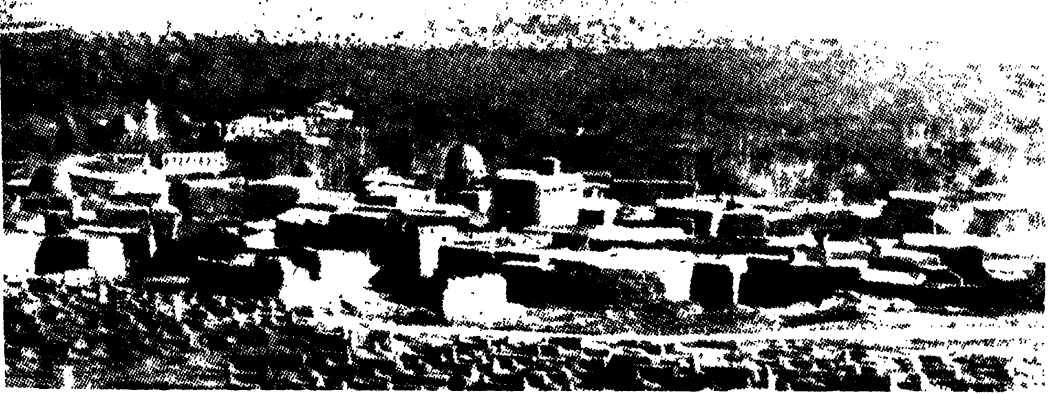
সিরিয়ার ঐতিহাসিক নগরী দামাস্কাশের দৃশ্য

নিউজীল্যান্ডের সেনাদের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। জার্মান সৈন্যেরা সেনিয়া এবং মালেমীর মধ্যবর্তী সামরিক হাসপাতালটা দখল করিয়া ফেলে। ইংরেজ সেনারা পুনরায় ঐ দখল করে। সেনিয়া এবং মালেমী রোডের দক্ষিণ দিকে একদল জার্মান সেনা রহিয়াছে। ইহার দলকে এখনও ধ্বংস করা যায় নাই; কিন্তু অন্যান্য দলকে ধ্বংস করা হইয়াছে। এই খবর হইতেই জার্মানদের লক্ষ্য কোন দিকে বুঝা যাইতেছে। মোটের উপর এই লড়াইতে রীতিমত জোর বাধিবে; কারণ মিশর এবং সমগ্র আরব দেশের উপর প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে এই লড়াইয়ের সম্পর্ক রহিয়াছে। মিশরের পশ্চিম সীমান্তে জার্মানেরা একটু ঢিলা দিয়াছে, দেখা যাইতেছে। ছায়ায় যেখানে তাপের মাত্রা ১১৯ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিতেছে, সেখানকার ভীষণ গরমের মধ্যে ইউরোপীয় সেনারা লড়াইতে জোর দিতে পারিতেছে না। ইংরেজ সেনাদল পুনরায় সোল্লুম অধিকার করিয়াছে এবং খবর পাওয়া গিয়াছে তোবরুকের লড়াইও স্থগিত আছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, হিটলার ইরাকের এই নূতন পরিস্থিতির উপর বেশী জোর দিতেছেন, ভিসি গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিয়া

চলিতেছে। কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, জার্মানী এবং রুশিয়া পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে কোন একটা মিলিত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিবার চেষ্টায় আছে। এই সঙ্গে এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে, রুশিয়া জার্মানীকে ইরাক এবং ইরাণে সমরোপকরণ চালান দিবার জন্য তাহার কৃষ্ণসাগরস্থ রণতরীগুলি দিবে, এমন কথাবার্তা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে এখনও কোন কথা বলা যাইতেছে না; তবে একথা ঠিক যে, আরব দেশে এই লড়াই বাধার পর রুশিয়া তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা স্বাভাবিক। ইরাকের তেলের খনির দিকে নজর রহিয়াছে সকলের; ককেসাস অঞ্চলেও তেল রহিয়াছে এবং এই তৈলসম্পর্কিত স্বার্থ রুশিয়ার বড় স্বার্থ। স্ট্যালিন কিছুদিন পূর্বে প্রসিদ্ধা ভূপর্যটনকারিনী ইংরেজ মহিলা রোজিটা ফরবেসের কাছে একথাটা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"আমি তেলের জন্য পাগল। আমাদের দেশের বিস্তৃতি এত বেশী যে, যাতায়াতের দূরত্ব কমাইবার পক্ষে তেলই আমাদের একমাত্র সহায়। তেল আমাদের চাই, যত পাইব, ততই চাই। ইরাকের মত ইরাণেও এই তেলের স্বার্থ রহিয়াছে। মধ্য এশিয়ায় রহিয়াছে

তেলের উৎস। স্ট্যালিন রোজিটাকে আরও বলেন,—"উপনিবেশ স্থাপন করবার যুগ শেষ হইয়াছে, এ কথা, আপনারা ইংরেজ, আপনারা বলিতে পারেন না। অথচ আপনাদের রাজত্ব জগতে সব চেয়ে বেশী বড়। জার্মানী ইউরোপে রাজ্য বিস্তার করিতে চাহিবে এবং আমরাও এশিয়ায় তাহাই করিতে চেষ্টা করিব।" এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের প্রতি রুশিয়ার দৃষ্টি কিরূপ তীক্ষ্ম স্ট্যালিনের ঐসব উক্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে। এখন লড়াই এশিয়ার সেই পশ্চিম অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং রুশিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। এখন রুশিয়াকে নিজের শক্তিকে দৃঢ় করিতে হইবে, ককেসাস অঞ্চলে রুশ সৈন্যের তৎপরতা ইহাই সূচনা করিতেছে। কিন্তু এই সৈন্যসজ্জা কাহার বিরুদ্ধে? আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কোন দিকে ঘুরিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে স্ট্যালিন রোজিটা ফরবেসের কাছে যে উক্তি করেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—"আপনারা ধারণা করিতে না পারেন, কিন্তু আপনাদের সাম্রাজ্য—বিশেষভাবে ভারতবর্ষ, আমাদের পক্ষে প্রকৃত বিপদস্বরূপ; হয়ত ইহাই আমাদের একমাত্র বিপদের বিষয়। আমরা জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি

বর্তমান সিরিয়ার হাইকমিশনার। দেখা যাইতেছে, জার্মানীর চালেই তিনি সায় দিতেছেন, জেনারেল দ্য গলের স্বাধীন ফরাসী দলের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই। প্রকৃতপক্ষে জেনারেল দ্য গলের দল সিরিয়ার ব্যাপারে জার্মানীকে এই সুবিধা দেওয়াটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন।

সিরিয়ার ভিতর দিয়া কিছু কিছু জার্মান সেনা এবং সমরোপকরণ ইরাকে যাইতেছে। ফরাসীদের অসহায়ত্ব ইহাতে বুঝা যাইতেছে। সিরিয়ার নিরপেক্ষতা ইহাতে ভঙ্গ হইয়াছে সুস্পষ্ট; কিন্তু পেতাঁ গভর্নমেণ্ট তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন অবস্থায় ইংরেজ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে বলিতে হইয়াছে যে, সিরিয়ায় জার্মান সমাবেশের বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। সিরিয়ার ফরাসী অধিনায়ক জেনারেল ডেনৎস্ জবাব বলিয়াছেন যে, ইংরেজ যদি সিরিয়ার উপর বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে বলপ্রয়োগের দ্বারা তিনি তাহাতে বাধা দিবেন। যে ফরাসী একদিন ইংরেজের পাশে দাঁড়াইয়া লড়াই করিয়াছিল সেই ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এই দিক হইতে সন্নিকটবর্তী হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসীদের

জার্মানীর দুর্ধর্ষ বোমারু বিমান য়ুঙ্কার বা "স্টুকা"

করিতে পারি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে কখনই নয়।' অবশ্য সোভিয়েটের নীতি কি আকার ধারণ করিবে ইহা এখনও বলা যাইতেছে না, তবে জল্পনাকল্পনা যেভাবে চলিতেছে তাহার মূলে যে কি কারণ থাকিতে পারে, স্ট্যালিনের উদ্ধৃত উক্তি হইতে তাহার কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়। আসল কথা হইল এই যে, রুশিয়া জার্মানীও বুঝে না, ইংরেজও বুঝে না, সে দেখিতেছে নিজের স্বার্থ! সিরিয়ার ভিসি গভর্নমেণ্টের প্রভাব কতটা আছে না আছে ইহারও গুরুত্ব তেমন ধর্তব্যের মধ্যে নয়; কারণ সিরিয়ার অধিবাসীদের মতিগতি যে কোন দিকে ইহার প্রমাণও কিছু পাওয়া যাইতেছে না। এই সিরিয়ার প্রধান শহর বেইরুত এক সময় আরব জাতীয়তাবাদীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। প্যালেস্টাইনের গ্র্যান্ড মুফতী প্যালেস্টাইন হইতে পলাইয়া বেইরুতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জেনারেল ডেনৎস্

নৌবহরের সঙ্গে ইংরেজের লড়াইও বাধিয়া উঠিতে পারে, মার্কিন রাজনৈতিক মহলে এমন কথা অনেকেই বলিতেছেন। মোটের উপর পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার সংগ্রামের মূল ঘাঁটি এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে সিরিয়া এবং এই সিরিয়ার ব্যাপার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অভিনব একটা ওলটপালট সৃষ্টি করিবে, এমন কথা অনেকেই বলিতেছেন। রসিদ আলীর সৈন্যবল বা শস্ত্রবল এমন কিছু নয়, যেজন্য ইংরেজের আতঙ্ক সৃষ্টি হইতে পারে। সিরিয়াতে ফরাসীদের ঔপনিবেশিক সৈন্যবলও গুরুতর নয়; কিন্তু তথাপি কতকগুলি আন্তর্জাতিক কারণে ইরাকের সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণও একথা স্বীকার করিয়াছেন।

হেজাজের রাজা ইবন সউদ ইংরেজের পক্ষই সমর্থন করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। রশীদ আলি সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার

নিকট দূতও পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। ইটালি ইবন সউদকে নিজের দলে টানিবার জন্য বহু দিন চেষ্টা করে। দুই বৎসর পূর্বে ইবন সউদের দূতস্বরূপে খালিদ আলুদ হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু সে দৌত্য সফল হয় নাই। ১৯২৭ সালে জেড্ডায় একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; এই সন্ধিতে ইংরেজ ইবন সউদকে হেজাজের স্বাধীন নৃপতি-স্বরূপে স্বীকার করিয়া লন। তাহার পর ট্রান্সজর্ডিয়ার কথা। ট্রান্স-জর্ডনের এমির আবদুল্লা বরাবর ইংরেজের পক্ষপাতী। রশীদ আলির অভ্যুত্থানের পর ইরাক হইতে যিনি বিতাড়িত হইয়াছেন, সেই ইরাকের নাবালক বাদশাহের অভিভাবক মহম্মদ ইলা আমীর আব্দুল্লার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি রশীদ আলির প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করিতেই চেষ্টা করিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার যুবক পুত্র কিছু ফ্যাসিস্টপন্থী, এজন্য তাঁহাকে লইয়া আমীর আব্দুল্লাকে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছে; কিন্তু এই যুবক পুত্রের দ্বারা বিশেষ কিছু ভয়ের কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

জার্মানদের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইতেছে। এই সব ফ্যাসিস্টপন্থী স্পেনীয় বা 'ফ্যালাঞ্জিস্ট' প্রাচীন স্পেন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। জার্মানরা মূরদিগকে এই কথাও বুঝাইতেছে যে, ইংরেজ যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলে উত্তর আফ্রিকায় পুনরায় বিশাল মূর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। জার্মানদের এই প্রচারকার্যের সঙ্গে সঙ্গে মরক্কোতে নূতন নূতন উড়োজাহাজের ঘাঁটিও নাকি তৈয়ার হইতেছে এবং এই সব কাজ হইতেছে জার্মান ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে। কিং হল নিউজ সোনার এই খবর দিতেছেন যে, স্পেন অধিকৃত মরক্কোর উপকূল-ভাগে বড় বড় কামান নাকি এমনভাবে বসান হইতেছে, যে সব কামানের মুখ ঘুরাইয়া জিব্রল্টারের বৃটিশ নৌবহরের ঘাঁটির উপর গোলা বৃষ্টি করা চলে। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, যুদ্ধ হইতে দূরে থাকেন, কিন্তু ফ্যাসিস্টপন্থী স্পেনীয়েরা মনে করিতেছে যে, এইবার তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার বড় একটা সুযোগ আসিয়াছে। একদিকে জার্মানদের

দূরপাল্লার কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হের হিটলার

এ সব সত্ত্বেও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে। বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্র কায়রো হইতে এই মর্মে খবর পাঠাইয়াছেন যে, সমস্ত আরব দেশে বৃটিশ বিদ্বেষ দেখা যাইতেছে। জার্মানেরা বহু দিন হইতেই এই বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিল, ইটালির চেষ্টা তো ছিলই। শুধু ইরাকে এবং ইরাণেই যে এই প্রচারকার্য চলিতেছিল তাহা নয়, আফ্রিকার মূরদেশে বিশেষভাবে এই প্রচারকার্য চলে। গত ৯ই এপ্রিল ট্যাঞ্জিয়ারে সরকারীভাবে জার্মান দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সময় একটা বড় বৈঠক চলে; এই বৈঠকে জার্মান পক্ষপাতী ফ্যাসিস্ট স্পেনীয়গণ এবং আরবেরা যোগদান করে। জার্মান কর্মচারিগণ আরবদিগকে জার্মানীর প্রতাপ বুঝাইয়া দেন, জার্মানরা কেমন করিয়া তিন দিনের মধ্যে যুগোস্লোভিয়া পাড়ি দিয়া স্যালোনিকায় পেঁৗছিয়াছে, সেকথাও বলা হয়। সেই সঙ্গে জার্মানরা কিভাবে লিবিয়ায় পুনরায় সুবিধা করিয়াছে, সেকথাও বলা হইয়াছিল। সেই হইতে আফ্রিকার আরবদের মধ্যে জার্মানীর প্রচারকার্য জোর চলিতেছে। স্পেনে এবং ট্যাঞ্জিয়ারে এবং মরক্কোতে ফ্যাসিস্টপন্থী যে সব স্পেনীয় আছে তাহারা

উস্কানী অন্যদিকে ফ্যাসিস্টপন্থী ফ্যালাঞ্জিস্টদের প্ররোচনা। জেনারেল ফ্রাঙ্কো এই দুই দিকের চাপের মধ্যে ভবিষ্যৎ কোন্ কার্যক্রম স্থির করিবেন, ইহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। তবে একথা সত্য যে, একদিকে জিব্রল্টারের লোভ দেখাইয়া নাৎসীরা স্পেনীয়-দিগকে হাত করিবার যেমন চেষ্টা করিতেছে, সেইরূপ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিয়া আরবদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় আছে। ইরাকের রশীদ আলির বিদ্রোহ তাহাদের সেই চেষ্টার পরিণতি। এই সব প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জার্মানেরা উভয় দিক হইতে মিশর এবং সুয়েজ অঞ্চল ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরেজ সেনা মিশরের পশ্চিম সীমান্তের দিকে গেলে সুয়েজের পথে মিশরে ঢুকিয়া তাহাদের পশ্চাদভাগ যাহাতে বিপর্যস্ত করা যায়, ইহাই হইতেছে তাহাদের অভিপ্রায়। সুতরাং ইরাকের লড়াই যত সত্বর খতম হইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহা হইবে না; জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটিবে এই দিকেই বলিয়া মনে হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এই সংঘর্ষের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(২৩)

হাওড়া স্টেশনে অমল যোগেশকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, কহিল, "গৌরী কাছে আমার হার হল, আর অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের। সত্যি যোগেশ, এদিকের টানে আবার তুমি ঘরে ফিরে আসবে, তা গৌরী বিশ্বাস করেছিল, আমি করি নি।"

যোগেশ হাসিয়া উত্তর দিল, "টানে আসি নি, টানকে একেবারে চুকিয়ে দিতে এসেছি। কিন্তু সে সব কথা আলোচনা করবার এখন সময়ও নেই, শক্তিও নেই। রক্তমাংসের দেহ এখন একটু বিশ্রাম চাইছে। দয়া করে ট্যাক্সিওয়ালাকে বল তাড়াতাড়ি তোমার বাড়িতে পেঁৗছিয়ে দিতে। সেখানে স্নান, আহার ও বিশ্রামের পর সব কথা হবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া অমল বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রশ্ন করিয়াও সে যেমন কোন উত্তর পাইল না তেমনই তর্ক করিয়াও সে যোগেশের মত বদলাইতে পারিল না এবং অবশেষে বাধ্য হইয়াই সে যোগেশকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল।

গৌরী অভ্যর্থনার ত্রুটি করিল না, কিন্তু যোগেশকে সে কহিল, "হিন্দুর কাছে অতিথি নারায়ণ, নইলে আপনাকে এ বাড়িতে আমরা ঢুকতে দিতাম না। এ খবর শুনলে শোভাদি' কি ভাববেন মনে করুন দেখি!" সে যে কেবলই রহস্য করিতেছে না তাহা তাহার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পাইল।

বৈকালে যোগেশের প্রশ্নের উত্তরে অমল সব কথাই খুলিয়া বলিল, যাহা জানিত তাহার কিছুই সে গোপন করিল না। কিন্তু উপসংহারে ইংরাজ প্রবন্ধ লেখকের উক্তি যোগেশকে শুনাইয়া দিয়া সে কহিল, "সত্য কি সে সম্বন্ধে মনে কেবল জিজ্ঞাসাই জাগতে পারে, কিন্তু তার সঠিক উত্তর কারও কাছ থেকে পাওয়া যায় না। আমার কাছ থেকেও তুমি তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাবে না যোগেশ,—কারও কাছ থেকেও না। কাজেই এ সম্বন্ধে তোমার মন থেকে তুমি যে প্রেরণা পেয়েছ তাকেই সত্য মেনে নাও। এতদিন যা হয়েছে স্বীকার কর যে তার সবই মিথ্যা—তোমার দিক থেকেও মিথ্যা, বৌদি'র দিক থেকেও।"

যোগেশ একটি সিগারেট ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া সিলিংএর দিকে ছাড়িয়া দিয়া পরে উত্তর দিল, "বাঁচা গেল! মিথ্যার ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়ে আজ বহুদিন পর আমি এই প্রথম মনে মনে একটা সত্যিকারের স্বস্তি বোধ করছি। দেনাপাওনার হিসাব মনের খাতায় চুকিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, বাইরের যেটুকু বাকি আছে তা আজ রাত্রে শেষ করব।"

যোগেশ বাহিরে যাইবার প্রাক্কালে গৌরী রহস্য করিয়া কহিল, "এখানে এসে যখন উঠেছেন যোগেশবাবু, তখন আপনাদের পুনর্মিলনের ফুলশয্যা হবে এই বাড়িতেই। নিজে সেখানে না থেকে শোভাদি'কে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমি মালা, চন্দন, শাঁখ সব কিছুর আয়োজন এখানেই করে রাখব।"

যোগেশ যখন নিজের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। তাহার আগমন অপ্রত্যাশিত না হইলেও অদ্ভুত; নিতান্ত বাড়ির লোকও হাজার মাইল দূর হইতে কোন আসবাবপত্র না লইয়া দেহে ও বসনে সদ্যস্নাতের পরিচ্ছন্নতা লইয়া ঘরে আসিয়া উঠে না। কিন্তু মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসে এই ঘটনার অমন সুস্পষ্ট বৈষম্যটুকুও কাহারও চোখে পড়িল না। কামিনীর মা চোখের জলে ভাসিয়া সন্তানোপম প্রভুকে অভ্যর্থনা করিল, পুরাতন দারোয়ান সুদীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া প্রভুভক্তি নিবেদন করিল, ঠাকুর এবং চাকর দুইজন নূতন হইলেও সকলের বড় মনিবের আগমন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। কেবল শোভাই যোগেশের সম্মুখে আসিল না, অর্ধ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া দ্বারের পার্শ্বে সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

একসময়ে তাহাই লক্ষ্য করিয়া কামিনীর মা বোধ করি বা এ সংসারে তাহার স্বোপার্জিত অভিভাবকত্বের দাবী খাটাইয়া হাত ধরিয়া শোভাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল এবং নিজের হাতে শোভার অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তোমার ঘরের লক্ষ্মী তুমি নাও যোগেশ; আমি বুড়ো হয়েছি, এইবার আমায় ছুটি দাও বাবা।" শোভাকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, "ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও বউমা, রান্না ঘরের কাজ আমিই দেখব'খন।"

স্বামীকে নিজের শয়ন গৃহে একান্তে পাইয়া শোভা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাক্স বিছানা কোথায়?"

প্রশ্নটি যেন সে শুনিতেই পায় নাই এমনইভাবে যোগেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, নিজের সুসজ্জিত ছবিখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে অনেকক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে উহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর শোভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একে সাজিয়েছে কে? তুমি?"

লজ্জিত হাসিমুখ নত করিয়া শোভা কহিল, "হ্যাঁ," কিন্তু পরক্ষণেই মুখ তুলিয়া সে নিজের পূর্ব প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করিল, "তোমার বাক্স বিছানা কোথায়? তোমার আসার কথা ছিল সকালে; আসতে এত দেরীই বা হল কেন?"

যোগেশ সত্য উত্তর দিল। শুনিয়া শোভার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না; সে বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

যেন প্রশ্নটা এড়াইবার জন্যই যোগেশ হাসিয়া উত্তর দিল, "সব কথা ও সব কাজের মানে থাকে না, আর থাকলেও, তা বলা যায় না।"

শোভা বিহ্বলের মত চাহিয়াই রহিল।

সেই মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া যোগেশ ক্ষণকাল পরে কহিল, "ভেবেছিলাম এ বাড়িতে একেবারেই আসব না। কিন্তু পরে মনে হল যে তোমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা আমার কর্তব্য; যা তুমি করেছ তার জন্য তোমাকে যদি আমি নিজে অভিনন্দন জানাতে না পারি, তবে আমি আমার বিশ্বাসেরই অমর্যাদা করব, আমার অক্ষমতার ভিতর দিয়ে আমার ইতরতাই প্রকাশ পাবে। তাই তোমার কাছে আজ আমি নিজে এসেছি, আর কেবল সেটুকুরই জন্যই।"

শোভার বিহ্বলতা বৃদ্ধি পাইল, সে হতবুদ্ধির মত কহিল, "তুমি বলছ কি গো?"

যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না; হাবভাব ও গতির ভিতর দিয়া কেমন একটা লঘুতা ফুটাইয়া তুলিয়া সে ধীরে সুস্থে আসন গ্রহণ করিল।

শোভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। কি বলছ তুমি?"

যোগেশ আরও ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর শোভার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কতদিন থেকে চলছে, শোভা দেবী?"

"কি সব?" শোভা জিজ্ঞাসা করিল।

"এই অতীশবাবুর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব, ভালবাসা বা রোমান্স—যা বল।" যোগেশ উত্তর দিল।

শোভার মুখমণ্ডল ছাই'এর মত বিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে যোগেশের কাছাকাছি আসিয়া তীক্ষ্মকণ্ঠে কহিল, "এ সব কি বলছ তুমি? বল, কার কাছে কি তুমি শুনেছ। বল, চুপ করে থাকলে চলবে না—সব কথা তোমাকে বলতে হবে।"

যোগেশ পূর্বের মতই মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, "আজ বলবার পালা আমার নয় শোভা, তোমার। আমার নির্বাসিত জীবনে কাহিনী একটাও ছিল না; কাহিনীর উপাদান জমে উঠেছে তোমার জীবনে। কাজেই বলবার যদি কিছু থাকে তা তোমার, আমার নয়।"

শোভা শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "কার কাছে কি শুনে আজ তুমি আমাকে এতবড় অপবাদ দিতে এসেছ?"

যোগেশ মুখ ফিরাইয়া লইল, অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে কহিল, "তুমি গোপনে কিছুই করনি, কাজেই আমার জানতে পারার মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আর আমি তোমাকে অপবাদ দিতেও আসি নি। 'অপবাদ' কথাটার মধ্যে দুটি অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকে—একটি এই যে, যে অভিযোগ করা হয় তা মিথ্যা, আর একটি দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিবার প্রবৃত্তি। আমার কথার মধ্যে এর একটি অর্থও নেই।"

শোভার মুখে উত্তর ফুটিল না, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশের মুখে অদ্ভুত একরকমের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে সহসা শোভার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই অতীশবাবুটি কে, বলত।"

এবার শোভার মুখ প্রথমে লাল হইয়া পরে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে সম্মুখের চৌকিখানির পিঠের একটি অংশ দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ও, ঐ কথা!". তারপর সশব্দে চৌকিখানা সরাইয়া উহারই উপর বসিয়া পড়িয়া সে তীক্ষ্মকণ্ঠে কহিল, "অতীশবাবু নয়, অতীশ। সে আমাদের দেশের ছেলে। আমার বয়স যখন পাঁচ তখন তার জন্ম। সে গ্রাম সম্পর্কে আমার ভাই। এই কলকাতা সহরে তুমি আমাকে একা ফেলে যাবার পর আমার দেখাশুনার জন্য জ্যাঠামশায় নিজে তাকে এ বাড়িতে এনে দিয়ে গিয়েছিলেন।"

যোগেশের কণ্ঠে কঠিন বিদ্রূপ বাজিয়া উঠিল, সে কহিল, "তবে আর কি! সম্প্রদান যখন শাস্ত্রসম্মতরূপেই হয়েছে, তখন ওর দ্বিতীয়টা উপেক্ষা করা যেতে পাতে—বিশেষত, একালে।"

শোভা বিবর্ণ মুখের নির্নিমেষ দৃষ্টি যোগেশের মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "ইস্—তুমি এমন!—অথচ"—

যোগেশ বাধা দিয়া কহিল, "যাক্ একথা। এ আলোচনায় কোন পক্ষেরই কোন লাভ নেই।"

শোভা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "আমার আছে। এ আমার চরম সর্বনাশ। এ সর্বনাশ করার আগে আমার বিরুদ্ধে কি তোমার অভিযোগ তা আমাকে তোমায় বলতে হবে, আমার উত্তরও তোমায় শুনতে হবে।"

যোগেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "এ আলোচনা না হলেই ভাল হত। তবে তোমার অনুরোধ অযৌক্তিক নয়, ন্যায় বিচারের পদ্ধতিও তাই। তোমার কি বলবার আছে তাও আমি শুনব।"

যোগেশ শুনিয়াছিল যে, অতীশের সঙ্গে শোভার রক্তের সম্পর্ক নাই। তাহাদের ভাইভগ্নী সম্পর্ক নিতান্তই পাতানো গ্রাম সম্পর্কের। তথাপি এই অতীশের সঙ্গেই শোভা সকালসন্ধ্যা দিনরাত নির্বিশেষে বাহিরে যাইত, গঙ্গার ধারে, চিড়িয়াখানায়, লেক্এ বেড়াইত, বাজার করিতে বাহির হইত, বায়স্কোপ দেখিতে এবং বাড়িতে কেবল পড়িবার ঘরেই নহে, শুইবার ঘরেও দ্বারবন্ধ করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প করিত, গান গাহিতে এবং উভয়ের আলাপ আলোচনা ও রঙ্গরহস্যে সমস্ত বাড়িখানি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। অতীশ একদিন না আসিলে শোভা ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিত এবং প্রায়ই নিজের হাতে রন্ধন করিয়া স্বয়ং কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইত। উভয়ের এই অন্তরঙ্গতা লইয়া বাহিরে যে আলাপ আলোচনা নিতান্ত কম হয় নাই, সে কথাও যোগেশ শুনিয়া আসিয়াছিল এবং কেবল কামিনীর মা'র তিরস্কার ও উপদেশই নহে, গৌরীর সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরেও লজ্জিত না হইয়া তাহার মুখের উপর শোভা কি উত্তর দিয়া আসিয়াছিল, তাহা শুনিতেও যোগেশের বাকি ছিল না।

এখন যোগেশ ইহার প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে খুঁটিয়া খুঁটিয়া শোভাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। শোভা উত্তর দিল সকল প্রশ্নেরই এবং একটি অভিযোগও সে অস্বীকার করিল না।

সমস্ত শুনিয়া সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও শোভা যে, অতীশ তোমার ভাই ছাড়া কিছুই নয়?"

শোভা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "সত্যই আর কিছু নয়।"

যোগেশের ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসির কয়েকটি ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "যে নিঃসম্পর্কীয় যুবকের আকর্ষণ যুবতী নারীকে কেবল দিন রাত্রি, শালীনতা অশালীনতার প্রভেদই নয়, নারীর চরমসম্পদ সম্ভ্রমবোধকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়, তা সৌভ্রাত্র ছাড়া আর কিছু নয়, একথা সত্য হলেও এযুগে একেবারে অচল।"

শোভা বিভ্রান্তের মত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পর আবার একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যোগেশই কহিল, "কিন্তু এ আলোচনা নিরর্থক। আমি তোমাকে দোষী বলতে আসি নি, সাজা দিতেও আসি নি। আমি এসেছি তোমাকে অভিনন্দন জানাতে আর দীর্ঘকালের একটা মিথ্যাকে ভেঙে যা সত্য তাকে মিথ্যাচারের মুখোস ছাড়িয়ে তার উপযুক্ত আসনে প্রতিষ্ঠা করতে।"

শোভা খপ্ করিয়া যোগেশের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সনির্বন্ধকণ্ঠে কহিল, "আমায় বিশ্বাস কর। কোন অন্যায় আমি করি নি।"

যোগেশ ধীরে ধীরে নিজের হাত টানিয়া লইল, তারপর শোভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ন্যায় অন্যায়ের কোন কথা এতে নেই। তবে অতীশবাবুকে তুমি ভালবাস না একথা আমি বিশ্বাস করব না। তোমার চরিত্র, তোমার আকৈশোরের অপরিতৃপ্ত বুভুক্ষা, তোমার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা, তোমার রক্তমাংসের দেহ, তোমার অশান্ত যৌবন, তোমার এই শোবার ঘরের ঐশ্বর্য, তোমার আজিকার এই দেহসজ্জা, মায় তোমার ঐ সুসজ্জিত ছবি—ঐসব তোমার মুখের কথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তোমার মামলা টিকবে না।"

নৈরাশ্য ও বেদনায় শোভার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, সে আর্তনাদের মত করিয়া কহিল, "মিথ্যা, সব মিথ্যা। আমি যে এতদিন কেবল তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছি, কেবল তোমাকেই চেয়ে

এসেছি। আর তার প্রতিদানে তুমি কিনা এতবড় অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে করছ?"

"অভিযোগ!" যোগেশ হাসিবার চেষ্টায় মুখখানি বিকৃত করিয়া কহিল, "যে জোর থাকলে এই কথা নিয়ে আজ আমি অভিযোগ করতে পারতাম সে জোরই যে আমার নেই। আমি জানি যে আমার কাছ থেকে যা তুমি চেয়েছ তা কোনদিনই তোমায় আমি দিতে পারি নি; আর যা আমি তোমায় দিতে পেরেছি তা তুমি চাও নি, তা পেয়ে তোমার তৃপ্তি হয় নি। তোমার অতৃপ্তির কথা আমার চাইতে বেশী কেউ জানে না বলেই যা আমি শুনেছি, যে প্রমাণ আমি পেয়েছি তা অবিশ্বাস করতে পারি নি।"

শোভা কথা বলিতে পারিল না, কেবল তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

একটু পরে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে যোগেশই পুনরায় কহিল, "তুমি একজনকে ভালবেসেছ তাতে আমার দুঃখ নেই। তোমার স্বাধীন ইচ্ছাতে কোনদিনই আমি বাধা দিই নি, দিতামও না, দিবও না। তবু জিজ্ঞাসা করছি, আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ কেন?"

শোভা সহসা যোগেশের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্তনাদের মত করিয়া কহিল, "ওগো, প্রতারণা আমি করি নি —তুমি সব মিথ্যা কথা শুনেছ। ঈশ্বর জানেন, এই দীর্ঘকাল কেবল তোমারই জন্য এই দেহটিকে আমি জিইয়ে রেখেছি।"

যোগেশের ওষ্ঠপ্রান্তে কুটিল একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "ও, দেহটি? আর তাও তোমার এই দেহ? এই পলসম্পদটিকে তুমি রেখেছ আমার জন্য? আর তোমার মনটা? সেটা দিয়েছ অতীশবাবুকে? নয়?"

শোভা [illegible]ভুজংগপুচ্ছের মত মুখ তুলিয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিল, তারপর সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, না, না; আমার দেহ, মন, আত্মা সব কিছুই তোমার। অতীশ আমার কেউ নয়।"

"ভাইও নয়?" যোগেশ কুটিল কটাক্ষে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল।

"মা গো মা," বলিয়া শোভা আবার যোগেশের পায়ের কাছে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল।

যেন এ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়াই যোগেশ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে ক্ষণকাল পায়চারি করিয়া বেড়াইল, তারপর ফিরিয়া শোভার কাছে আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "শোভা।"

শোভা মুখ তুলিয়া প্রত্যাশার দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যোগেশ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "উঠে বস"।

শোভা কাতরকণ্ঠে কহিল, "আগে বল যে আমায় বিশ্বাস করেছ।"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "তা হয় না। তোমাকে বিশ্বাস করবার পথ তুমি খোলা রাখ নি।" একটু থামিয়া সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে কহিল, "জান শোভা যে পাছে তোমার উপর অবিচার হয় সেই আশঙ্কায় নারীর সাহচর্য চিরদিন আমি সযত্নে বর্জন করে এসেছি?"

শোভা প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিন্তু তিক্তকণ্ঠে কহিল, "এত ভাল তুমি যদি না হতে তবে হয়ত বুঝতে যে যাকে অন্যায় বলে তা আমি করি নি।"

যোগেশ সহসা সশব্দে হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ঠিক ধরেছ শোভা। আমাদের দুইজনের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য যদি না থাকত তবে এতবড় ট্র্যাজিডি আজ হত না। আদর্শের গোরস্থানের উপর সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে গড়ে উঠত আমাদের ঘর; একই সুখদুঃখের অবিরাম চর্বিতচর্বণে নর্দমার জলকেও লজ্জা দিয়ে জীবনের রস আমাদের গাঢ় হয়ে জমে উঠত। নির্মম স্বার্থপরতায় পরস্পরের আনন্দকে শোষণ করে আমরা অভিনয় করতাম মহানন্দের বিকট প্রহসন। তুমি হতে আমার সম্পত্তি, আমি হতাম তোমার বিধিনির্দিষ্ট যন্ত্র। দিনের আলোকে আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণা উভয়ের মাঝখানে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে জমে উঠত, আর রাত্রির অন্ধকারে তাকেই সরিয়ে দিয়ে একই শয্যায় দুজনে দুজনকে জড়িয়ে শুয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করতাম। অনাকাঙ্ক্ষিত ছেলেমেয়ের মধুগুঞ্জনে, মাঝে চেঁচামেচিতে বাড়িখানি আমাদের মুখর হয়ে উঠত। দশজনে বাহবা দিত, বলত—কি আদর্শ দম্পতি, কি সুখের সংসার।"

শোভা উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। একটু পরে যোগেশ যেন একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "এ আলোচনা এখন থাক্‌, শোভা।"

শোভার মুখ আবার প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি যেন বুঝিয়া সে উৎফুল্লকণ্ঠে কহিল, "তাই ভাল। তুমি এখন কাপড় ছাড়, মুখ হাত ধোও।"

যোগেশ নির্বাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ শোভার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর গম্ভীরস্বরে কহিল, "জান শোভা, আমি কেন কলকাতায় এসেছি?"

শোভা পূর্ণদৃষ্টিতে যোগেশের মুখের দিকে চাহিল, তারপর সহসা ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "জানি, চুরির খবর পেয়ে তুমি এসেছ চোরাই মাল উদ্ধার করতে, আর পারলে চোরকে সাজা দিতে।"

অপরিসীম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যোগেশ শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শোভা হাসিমুখে যোগেশের আরও একটু নিকটে সরিয়া গিয়া স্বচ্ছ পরিহাসের কণ্ঠে কহিল, "ছিঃ লক্ষ্মীটি, বাজে কথা ভেবে অনর্থক মন খারাপ করো না। এখন একটু চা খাও। অ্যাঁ?—নিয়ে আসি চা?"

যোগেশ আরও ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "আমি এখন যাই।"

যোগেশ সত্য কথা বলিতেছে কি না তাহা শোভা ঠিক বুঝিতে না পারিয়াই যেন ক্ষণকাল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং সে মুখের ভাবে অবিশ্বাস করিবার কিছু না পাইয়াই যেন তাহার নিজের প্রত্যাশায় উজ্জ্বল মুখ আবার ধীরে ধীরে বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "তুমি এখানে থাকবে না?"

যোগেশ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "না।"

শোভার দুই চক্ষু আবার জলে ভরিয়া উঠিল। সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি আজ এখান থেকে চলে গেলে ঝি, ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান—এরা কি মনে করবে?"

যোগেশ ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "এতদিন যা মনে করেছে তার চাইতে বেশী কিছু নয়।" বলিয়াই সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

শোভা একপদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "দাঁড়াও, এখানে খেতেও কি তোমার আপত্তি আছে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া যোগেশ উত্তর দিল, "আপত্তি না থাকলেও দরকার নেই।"

দন্তে অধর দংশন করিয়া শোভা কহিল, "তবু একটু অপেক্ষা কর। যাকে তোমার অত সন্দেহ সেই অতীশ, এখনই হ[illegible] আসবে।"

"অতীশ? এখানে আসবে? আজও?" যোগেশ রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল।

শোভা দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "হ্যাঁ, তুমি আসবে, তাই তাকে আমি খেতে বলেছিলাম।"

যোগেশ অনেকক্ষণ নির্নিমেষদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখখানি হাসিবার মত করিয়া কহিল, "বেশ, তাকে খাইও। আর, ভয় নেই; আজ রাত্রে আমি আর আসব না।" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

(২৪)

যোগেশ চলিয়া যাইতেছিল, রান্নাঘর হইতে তাহাই লক্ষ্য করিয়া কামিনীর মা শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "এরই মধ্যে আবার কোথায় বেরুচ্ছ খোকাবাবু? জলখাবারও খেলে না যে।"

যোগেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, ঝির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "আর একদিন এসে খাব বুড়ীমা। আজ আমার কাজের তাড়া আছে। তাই চলে যাচ্ছি।"

"চলে যাচ্ছ? এখানে থাকবে না?" কামিনীর মা মহা-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না।"

কামিনীর মা অবাক বিস্ময়ে ক্ষণকাল যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া নতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি হয়েছে?"

"কিছুই হয়নি ত!" যোগেশ মুখখানি হাসিবার মত করিয়া উত্তর দিল, তারপর বিদায় অভিনন্দনের ভঙ্গিতে গ্রীবা সহ মাথাটি একবার ঝি'র দিকে ঝুঁকাইয়া পরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কামিনীর মা ছুটিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, সনির্বন্ধকণ্ঠে কহিল, "যা হবার তা ত হয়েছেই বাবা, কিন্তু এখনও সব পথ একেবারে বন্ধ হয় নি। বৌমাকে আর এভাবে একলা ফেলে রেখো না। এতদিন পর যখন এসেছ, তখন ঘরসংসার কর—সব দোষ শুধরে যাবে।"

যোগেশ হাসিমুখেই উত্তর দিল, "আঃ, কি যে তুমি বুড়ীমা; আমার হাতে, কাপড়ে হলুদ মশলার দাগ লাগিয়ে দিলে।"

কামিনীর মা কিন্তু ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "আমার চোখে তুমি ধূলো দিতে পারবে না খোকাবাবু—আমি যে তোমার জন্ম থেকে তোমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।"

একটু থামিয়া অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মার্জনা করিয়া সে পুনরায় কহিল, "স্বর্গ থেকে তোমার মা বাবা সবই দেখছেন খোকাবাবু! তোমার এত বড় বংশ,—তার নামে তুমি কলঙ্ক লাগতে দিও না। আমার মাথা খাও বাবা, এখানে যদি তুমি নাও থাক, বৌমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও।"

যোগেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "বাবার বংশধর সন্তান আমি বুড়ীমা, আর কেউ তার বংশধর নয়। এ নিষ্কলঙ্ক বংশে আমার থেকে কোন কলঙ্কের স্পর্শ লাগবে না, তা তুমি ঠিক জেনো।"

কিন্তু পরক্ষণেই সে শিশুর মত হাসিয়া উঠিয়া বৃদ্ধার দুই কন্ধের উপর দুই হাত রাখিয়া লঘু পরিহাসের কণ্ঠে কহিল, আঃ, বড্ড দেরী করিয়ে দিলে বুড়ীমা। আজ যাই। আর একদিন এসে খাব—তোমার হাতের সেই চচ্চড়ি; মনে থাকে যেন,—কেমন?" বলিয়াই সে কামিনীর মাকে সরাইয়া দিয়া একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া সে ট্রামে বা বাসে চাপিল না, হাঁটিয়াই চলিল। তখন রাজপথে অবিরাম জনস্রোত চলিয়াছে। নর নারী, বালক বৃদ্ধ, ভদ্র অভদ্র, বাঙালী অবাঙালী নানা বয়সের নানা শ্রেণীর লোক কাজে অকাজে ছুটিয়া চলিয়াছে। যানবাহনেরও গণনা হয় না। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র এবং তাহাকেও নিষ্প্রভ করিয়া পথে ও দোকানে দোকানে উজ্জ্বল দীপমালা। চারিদিকে অসংখ্য দৃশ্য—মানুষের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে সচেতন করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিবার চেতন ও অচেতন কত শত উপাদান। পথের ধারের বারবণিতার মতই মহানগরী তাহার সম্মোহিনী শক্তি রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের ভিতর দিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়াছে।

চোখের সম্মুখে রাত্রির কলিকাতার নগ্ন সৌন্দর্য—বিদ্যুতালোকের মতই তাহার দীপ্তি—বিশেষ একজাতীয় অজগরের চোখের দৃষ্টির মতই তাহার সম্মোহিনী শক্তি।

কিন্তু ইহাদের কিছুই যোগেশকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে আপনমনে যন্ত্রচালিতের মতই পথ বাহিয়া চলিল।

ঊর্দ্দিপরা পুলিশ কনেষ্টবলের হস্ত সংকেতে অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া ও অগণিত নরনারীর সঙ্গে যোগেশকে সর্বপ্রথম যে জায়গায় চলা বন্ধ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল সেটা চৌরঙ্গী। নিজের প্রতিবেশ সম্বন্ধে সচকিতে সচেতন হইয়া প্রথমেই সে হাতঘড়িটির দিকে চাহিয়া দেখিল—রাত্রি তখন প্রায় দশটা।

যোগেশ ফিরিয়া পিছনের দিকে চাহিল,—ও, কতটা পথই না সে পায়ে হাঁটিয়াই চলিয়া আসিয়াছে।

ডানদিকে একটি কাফে। ভিতরে স্ত্রীপুরুষ অনেকেই খাইতেছে, গল্প করিতেছে বা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে—মুক্ত দ্বারপথে তাহাদের অনেককেই দেখা যায়। যোগেশ চাহিয়া দেখিল।

এতক্ষণ পর তাহার মনে হইল, তাহার গলাটা যেন শুখাইয়া উঠিয়াছে।

অসহিষ্ণুর মত দৃষ্টি ফিরাইয়া সে সম্মুখের দিকে চাহিল—পুলিশ কনেষ্টবলটি হাত তুলিয়া স্ট্যাচুর মত দাঁড়াইয়াই রহিয়াছে। ঐ হাত যে তাহাকে নামাইতে হইবে সে সম্বন্ধে যেন তাহার খেয়ালই নাই।

আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া যোগেশ কাফের দিকে চাহিল, তারপর জোরে জোরে পা ফেলিয়া রাজপথ অতিক্রম করিয়া সে উহার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

'বয়' আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই সাহেব—হুইস্কি সোডা, না ভার্মুথ?"

যোগেশ উত্তেজিত উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "চোপরাও, চা।"

প্রায় ডজনখানিক জোড়া চক্ষু একসঙ্গে আসিয়া যোগেশের মুখের উপর বিনাস্ত হইল। সংকুচিত হইয়া যোগেশ মেনুকার্ড-খানি হাতে তুলিয়া লইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে উহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সে চা খাইল—এক পেয়ালা নয়, পর পর তিন পেয়ালা। 'বয়' বিল লইয়া আসিলে একটি টাকা রেকাবির উপর ফেলিয়া দিয়া চেঞ্জ লইবার জন্য আর অপেক্ষা না করিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িল।

অতঃপর সে একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া ড্রাইভারকে অমলের বাড়ির ঠিকানাটা বলিয়া দিয়াই ভিতরে গিয়া প্রায় লম্বা হইয়াই শুইয়া পড়িল।

অমলের বাড়িতে সকলে তখন শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, অত রাত্রে যোগেশকে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। অমল বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি যোগেশ?"

"ভারি আশ্চর্য ঠেকছে, না?" যোগেশ সশব্দে হাসিয়া

উঠিয়া কহিল, তারপর সে সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল, "এসেছি করে হিসাব নিকাশ যাহার যত পাওনা দেনা।"

গৌরী স্তব্ধ হইয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়াছিল; অনেকক্ষণ পর সে যেন একটা ধাক্কা সামলাইয়া কহিল, "আচ্ছা আচ্ছা; এখন মুখ হাত ধুয়ে সুস্থ হয়ে বসুন দেখি। তারপর,—খেয়ে এসেছেন ত?"

"খেয়ে!" বলিতে বলিতে যোগেশ ঢোক গিলিল; কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বরে একটা সচেষ্ট সজীব চপলতা ফুটাইয়া তুলিয়া কহিল, "খেয়ে এসেছি বই কি। এত রাত্রে কারও বাড়ি থেকে কেউ না খেয়ে আসে না কি?"

কি যে ঘটিয়াছে যোগেশ তাহা কিছুতেই ভাঙিয়া বলিল না। গৌরীর একাধিক প্রশ্ন সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং যোগেশের প্রশ্নের উত্তরে সে গা ভাঙিয়া, হাই তুলিয়া, আঙুলের তুড়ি দিয়া ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, "আঃ, বড্ড ঘুম পেয়েছে ভাই। দয়া করে এখন একটু ঘুমোতে দেবে?"

পরদিন সকালে স্নান ও প্রাতরাশের পর যোগেশ অমলের সঙ্গে একত্র বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের সেই বন্ধু রমেশ—ঐ যে আলিপুরে ওকালতি করত—সে আগের বাড়িতেই আছে ত?"

"আছে," অমল উত্তর দিল, "কিন্তু তাকে কেন?"

যোগেশ কহিল, "একটা দানপত্র তৈরী করাতে হবে। কলকাতায় ও দেশে আমার যা কিছু আছে সব আমি শোভাকে লিখে দেব।"

অমল বিহ্বলের মত যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "দেরী করা আর চলবে না অমল। মানুষের মনকে বিশ্বাস করতে নেই। ও বড় হিংস্র—তার জিঘাংসাপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল।"

অমল বসিবার চৌকিখানি যোগেশের আরও একটু নিকটে আনিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, "দোহাই তোমার—তোমার হেঁয়ালি এখন রাখ। কি হয়েছে তাই আগে খুলে বল।"

যোগেশ তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, "বিশেষ কিছুই নয়। বিবাহের নিগড় থেকে শোভাকে মুক্তি দিচ্ছি একেবারে পাকাপাকি। খালি মন্ত্রের দাসত্ব থেকেই নয়, আর্থিক দাসত্ব থেকেও। সে বুঝুক যে সে তার অন্তরের ডাকে সাড়া দিলে তার কিছুই হারাবার আশঙ্কা নেই।"

"আঃ, রাখ তোমার পাগলামি," অমল অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল, "বৌদি'র ওখান থেকে তুমি চলে এলে কেন, সেই কথাটা আগে বুঝিয়ে বল।"

"তবে কি করব?" যোগেশ উত্তর দিল, "এক যুগ আগে কটা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম তারই জোরে খানিকটা নারীমাংসের উপর যাব কুকুরের মত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে?"

অমল বিহ্বলের মত যোগেশের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পরে ঈষৎ সংশয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদি' কি তোমার সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করেছেন?"

যোগেশ সবেগে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "ঠিক তার উলটো। একসঙ্গে থাকতে অস্বীকার করছি আমি।"

অমল যোগেশের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সনির্বন্ধকণ্ঠে কহিল, "পাগলামি করো না যোগেশ। যা হবার তা হয়ে গেছে, হয়ত আসলে কিছুই হয়নি। তোমরা দুজনে একত্র থাকলেই দুদিকেরই ভুল ভেঙে যাবে। ঝোঁকের মাথায় তার পথ একেবারে বন্ধ করো না।"

যোগেশ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "ওতে ভুল ভাঙবে না, সত্য ধামাচাপা পড়বে মাত্র। আমার সঙ্গে শোভার বিয়েটা মিথ্যা, অতীশ আর তার ভালবাসা সত্য। বিয়ের মিথ্যাটাকে রঙ ফলিয়ে ওকে বাড়িয়ে তুলে আসল সত্যটিকে আমি সংহার করতে চাই না।"

অমল কহিল, "তোমার এসব কথা আমি বুঝি না যোগেশ,—বুঝবার দরকারও আমার নেই। তোমার কাছে আমার অনুরোধ শুধু এইটুকু যে অতীতকে একেবারেই অতীত করে দিয়ে বৌদি'কে নিয়ে আমাদের মত ঘরসংসার কর। অনর্থক একটা নিদারুণ দুঃখকে তুমি মাথায় তুলে নিও না।"

"দুঃখ!" যোগেশ কথাটার উপর বেশ একটু জোর দিয়া কহিল; একটুকরা হাসিও তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। "দুঃখ আমার হতে যাবে কেন বলত?" সে জিজ্ঞাসার মত করিয়া কহিল, "দুঃখ আসে যাকে প্রাণপণে চাওয়া যায় তাকে হারাবার অনুভূতি থেকে। শোভাকে কোনদিনইত আমি চাই নি, তাই আজ তাকে হারাবার কথাও উঠে না, হারিয়ে দুঃখ পাবার কথাও নয়।"

অমল চটিয়া উঠিয়া কহিল, "নিজেকে তুমি ভুলাতে পার যোগেশ, কিন্তু আমাকে পারবে না। ইবসেন আর বারট্রাণ্ড রাসেল আওড়ালেই মানুষ পাথর হয়ে যায় না। মানুষ ওথেলোর যুগেও যে মানুষ ছিল, এখনও সে তাই আছে, আর তুমিও সেই মানুষ। সেই বর্বর হিংসুটে মানুষের মতই বৌদি'কে তুমি সাজা দিচ্ছ।"

"সাজা!" যোগেশ চমকিয়া উঠিয়া কহিল।

"আলবৎ সাজা," অমল দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "অথচ তাকে ঢাকতে চেষ্টা করছ বড় বড় কথার আড়ালে। নিজেকেও ভুলাচ্ছ, সংসারকেও ভুলাতে চাইছ।"

যোগেশ একটি সিগারেট ধরাইয়া নিঃশব্দেই সেটিকে টানিয়া শেষ করিল। তারপর দগ্ধ অংশটিকে ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "না অমল, শোভাকে আমি সাজা দিচ্ছি না, দিবও না। সাজা দিবার মত জোরই বা আমার কোথায়? তাকে আমি ভালবাসলে তার উপর আমি জোর করতে পারতাম, সাজাও দিতে পারতাম। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ ভাই। যার তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল দিবার সাধ্য আমার নেই, তার ওষ্ঠের কাছ থেকে সুশীতল পানীয়ের গ্রাস কেড়ে নেব, তেমন বর্বর আমি নই। পাছে কোনদিন সেই বর্বরতা আমায় পেয়ে বসে, পাছে কোনদিন শোভাকে আমি সাজা দিই, সেই আশঙ্কায় আজ আমি আমার সব অধিকার মিটিয়ে দিতে চাইছি।"

অমল আবার যোগেশের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "কথা রাখ ভাই। সব দিক ভেবে দেখ। একটি মেয়ে—না হয় পদস্খলন তার হয়েছেই। কিন্তু উঠবার আকাঙ্ক্ষাও তার আজও রয়েছে। তবু তাকে হাত ধরে টেনে না তুলে বরং এই যে নীচের দিকে তাকে ঠেলে দিচ্ছ এতে বাহাদুরিটা কি আছে শুনি?"

এইবার যোগেশ চটিয়া উঠিল। সে চৌকির উপর সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, "কি সব বাজে বকছ অমল! উঁচু নীচু, পতন উত্থান—এই সব বাঁধা বুলির মোহ কোনদিনই কি তোমরা কাটিয়ে উঠতে পারবে না? ভালবাসাকে পদস্খলন আখ্যা দিয়ে তোমাদের সংস্কারক বীরপুরুষেরা যখন তাকে ক্ষমা করার ভাণ করে পদস্খলিতা বেচারীকে ঘরে নিয়ে আসে আর তোমরা তাকে বাহবা দাও তখন তোমরা ভুলে যাও নাকি যে, যার প্রশংসায় তোমরা পঞ্চমুখ হয়ে ওঠ তা মুখোস পরা হলেও আসলে সেই সনাতন অধিকারের প্রতিষ্ঠা, সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসাকে গলা টিপে মারবার সেই চিরন্তন জিঘাংসা প্রবৃত্তি? না অমল, বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি আমার সম্পত্তি মনে করি না,

তাই প্রবল পরাক্রমে তার উপর আমার অধিকারও আমি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না—আইনের জোরে না, গায়ের জোরে না, আধুনিক সংস্কারকের অর্থহীন ধুঁয়া ধরেও না। আমি বীর সংস্কারক বলে নাম কিনতে চাই না, সত্যকেই কেবল স্বীকার করতে চাই।"

অমল অসহায়ের মত কহিল, "কি মুস্কিল! না হয় তোমার কথা আমি মেনেই নিলাম। কিন্তু যে ভালবাসাটা তুমি গোড়ায় মেনে নিয়ে তার উপর তোমার যুক্তির প্রাসাদ রচনা করছ সেটা বৌদি'র বেলায় সত্য নাও ত হতে পারে। হতেও ত পারে যে এ একটি ক্ষণিকের মোহ বা অমনই একটা টান যাকে দার্শনিকেরা বলেন দেহাতীত ভালবাসা—মানে প্লেটনিক লভ্।"

যোগেশ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, কহিল, "একালের স্বপ্নবিলাসীদের এই আর একটি মিথ্যা আবিষ্কার—ক্লৈব্যকে রামধনুর রঙে রাঙিয়ে, বীরপুরুষের পোষাক পরিয়ে, সুন্দর করে, মহৎ করে খাড়া করবার রোমাণ্টিক প্রচেষ্টা।" একটু থামিয়া সে দৃঢ়স্বরে কহিল, "না, অমল, ক্লীবের অক্ষমতায় যে যৌন নীতির উদ্ভব তা আমি সত্য বলে স্বীকার করি না। নরনারীর পরস্পরের প্রতি টান যখনই তাদের অন্তরকে রাঙিয়ে তোলে তখনই তা হয়ে উঠে আদিম। নরনারীর সহজ কাপুরুষতাকে নয়।"

অমল একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তর্কে কোনদিন আমি পারি নি, আজও পারব না।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "কিন্তু আমার সঙ্গে রমেশের বাড়িতে যেতে পারবে, না পারলেও যেতে হবে। আমার দলিলখানা আজই তৈরী হওয়া চাই।"

অমলকে যোগেশ একরকম টানিয়াই রমেশের বাড়িতে লইয়া গেল। নিজের সমস্ত সম্পত্তি শোভার নামে লিখিয়া দিয়া সাক্ষীর কোঠায় একরকম জোর করিয়া অমলকে দিয়া তাহার নাম সই করাইয়া ঐ দলিল সেই দিনই সে যথাবিধি রেজেষ্টারী করিয়া ফেলিল। সমস্ত কাজ শেষ করিয়া উভয়ে যখন বাড়িতে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা আর বড় বেশী ছিল না। কিন্তু গৌরীর উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে যোগেশ হাসিয়া লঘু পরিহাসের স্বরে কহিল, "এতদিন পর আজ একটা কাজের মত কাজ করতে পেরেছি বৌদি'; তারই আনন্দে ক্ষুধা তৃষ্ণা আজ আমার একেবারেই মিটে গেছে।"

আহারাদির পর বিশ্রামের অবসরে ঐ কথাটিরই সূত্র ধরিয়া অমল কিন্তু গম্ভীরস্বরে যোগেশকে কহিল, "মিথ্যা নিজেকে ভুলাবার চেষ্টা করছ যোগেশ। হাসি দিয়ে চোখের জল ঢাকবার তোমার এই চেষ্টা প্রতি মুহূর্তেই ব্যর্থ হচ্ছে।"

অমল আরামচৌকির হাতলের উপর পা দুইটি ছড়াইয়া দিয়া উত্তর দিল, "জল আমার চোখে নয়, তোমার কল্পনায়। শোভাকে আমি কোন দিনই চাই নি, কাজেই আজ তাকে হারিয়ে আমার দুঃখও নেই।"

"মিথ্যা কথা," অমল জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "চিরদিনই তুমি শোভাবৌদি'কে চেয়ে এসেছ। না চাইলে তার সম্বন্ধে একটা বিরাট প্রত্যাশা তুমি তোমার বুকের মধ্যে বহন করতে না, না চাইলে এতদিন স্বেচ্ছাগৃহীত সন্ন্যাসের কৃচ্ছসাধনা করতে না, না চাইলে সে আর একজনকে ভালবেসেছে শুনে হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসতে না।"

যোগেশ স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি বড্ড বেশী রোমাণ্টিক হয়ে উঠেছ অমল—তোমার কল্পনাশক্তির তারিফ করতে হয়।"

অমল তিক্তকণ্ঠে কহিল, "এ যে আমার কল্পনা নয় তা তুমি নিজেও জান—এখন না জানলেও দু'দিন পরেই জানবে।"

যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, পরে কি জানব সে আলোচনা আপাততঃ থাক্। এখন আমাকে একবার ও বাড়ীতে যেতে হবে দলিলখানা শোভাকে বুঝিয়ে দিতে। যাবে আমার সঙ্গে?"

অমল ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না ভাই; এ ব্যাপারে আমাকে তুমি আর টেনো না। তুমি একাই যাও।"

(ক্রমশ)
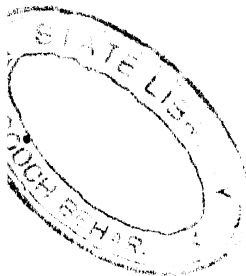
বাঙলা নাটকের আদি যুগ

শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায় এম-এ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নাটকের অভাব ছিল না। কাব্যের মত নাটকেরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। নাটকের উৎপত্তি, বোধ হয় বৈদিক যুগে; ঋগ্‌বেদের কয়েকটি সূক্ত, যেমন সারমেয়োপাখ্যান, সপর্ণাধ্যায়, বিশেষরূপে নাট্য-ধর্মী। ভরতমুনি প্রণীত "নাট্যশাস্ত্র" সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, ইহা খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকোৎপত্তির ইতিহাস, নাটকের অঙ্গ, দোষ-গুণ, রস-ভাব, রঙ্গমঞ্চ-নির্মাণের রীতি, অভিনয়ের হাব-ভাব প্রভৃতি নাটক-রচনা ও নাটকাভিনয় সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভরতের মতে নাটক পঞ্চম বেদ। নাটক সম্বন্ধে সে যুগের পণ্ডিতগণের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। "পঞ্চম বেদ" নাটক সৃষ্টি করিবার পর ব্রহ্মা সমবেত দেব ও মানবগণকে বলিতেছেনঃ—

নানাভাবোপসংপন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুসরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥

(নানা প্রকার ভাব দ্বারা সমৃদ্ধ, জীবনের নানাবিধ অবস্থার চিত্রসংবলিত, লোকচরিত্রানুসারী এই নাটক আমি সৃষ্টি করিলাম।)

দুঃখার্তানাং সমর্থানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাং
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতন্ময়ো কৃতম্॥

(আমি যে নাটক সৃষ্টি করিলাম, তাহা দুঃখার্ত, সমর্থ, শোকার্ত ও তপস্বীদিগকে সকল সময়ে বিশ্রাম দান করিবে।)

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্‌যন্ন দৃশ্যতে॥

(এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা বা যোগ নাই, যাহা এই নাটকে দেখান যাইতে পারে না।)

ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে সহজেই বোঝা যায়, খৃঃ পূঃ যুগে সংস্কৃত নাট্যকলা বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু সে-কালের কোন নাট্যকার বা নাটকের নাম পাওয়া যায় না। খৃঃ পূঃ যুগে রচিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে রাজা শূদ্রক প্রণীত মৃচ্ছকটিক প্রসিদ্ধ। আনুমানিক খৃঃ তৃতীয় শতকে ভাসের অভ্যুদয়, ভাস-রচিত তেরখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে। ভাসের পর কালিদাস (খৃঃ ৪র্থ—৫ম শতক)। কালিদাস তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন—মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা। কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। শকুন্তলা বিশ্বসাহিত্যের একটি অপূর্ব সম্পদ্। কালিদাসের পর সংস্কৃতে নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন ভবভূতি। ভবভূতি রচিত মহাবীর নাটক, মালতীমাধব ও উত্তররামচরিত; এই তিনখানি নাটকের মধ্যে শেষোক্ত নাটকটি জগদ্বিখ্যাত। শ্রীহর্ষ প্রণীত নাটকগুলির মধ্যে রত্নাবলী সুপ্রসিদ্ধ। শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাতেও নাটক রচিত হইয়াছিল। কবি রাজশেখর প্রণীত প্রাকৃত নাটক কর্পূরমঞ্জরী সাহিত্যের অতি উপাদেয় সৃষ্টি। খৃঃ দ্বাদশ—ত্রয়োদশ শতকে তুর্ক-বিজয়ের পর ভারতে নাটকের চর্চা কমিয়া যায়, পরে একেবারে বিলুপ্ত হয়।

বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে ভট্টনারায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভট্টনারায়ণ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম (অষ্টম শতক)। ভট্টনারায়ণ রচিত বেণীসংহার সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সুপরিচিত নাটক। ভট্টনারায়ণের পর সাত শত বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশে আর কোন নাটক রচিত হয় নাই। হিন্দুর স্বাধীনতা লোপই ইহার একমাত্র কারণ। মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রে নাটকাভিনয় এবং গীতিবাদ্য প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ একেবারে নিষিদ্ধ। আরবী সাহিত্যে নাটক নাই। মুসলমান বাদশাহ ও নবাবগণ নাটকের সমাদর করিতেন না এবং তাঁহাদেরই ধর্মান্ধতার ফলে হিন্দুর বহু শতাব্দীব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন একটি সংস্কৃতির ধারা ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর (খৃঃ পঞ্চদশ শতক) বাঙলাদেশে নাট্যচর্চার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত শ্রীবাসের আঙিনায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটকাভিনয় করিতেন। এরূপ একটি অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডে পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য রূপ গোস্বামী সংস্কৃতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে বিদগ্ধমাধব ও ললিত-মাধবই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। চৈতন্যদেবের আর একজন শিষ্য কবি কর্ণপুর সংস্কৃতে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। চৈতন্যদেবের প্রভাবের ফলে বাঙলা সাহিত্যে প্রাণের নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। গীতিকাব্য, জীবনচরিত ও বৈষ্ণবদর্শনের চর্চা প্রবল উদ্যমে চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে নাটকেরও অভ্যুদয় হইল। কিন্তু এ জাতীয় নাটক প্রাচীন সংস্কৃত নাটক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ইহাতে রঙ্গমঞ্চ, বেশভূষা, নাটকীয় কলাকৌশলের ব্যাপার বিশেষ কিছু ছিল না। ইহারা সাধারণের মধ্যে যাত্রা নামে সুপরিচিত। যাত্রা অর্থে উৎসব, ধর্ম-সম্বন্ধীয় উৎসব উপলক্ষ্যে ইহাদের অভিনয় হইত বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে যাত্রা। যাত্রা মোটামুটি চার রকমেরঃ—কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ও সখের যাত্রা। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কালিয়দমন যাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রাই সবচেয়ে প্রাচীন। কৃষ্ণযাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮—১৮৭০), স্বপ্নবিলাস, বিচিত্রবিলাস, রাই উন্মাদিনী, নিমাইসন্ন্যাস রচয়িতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০—১৮৮৮), ব্রজনাথ ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ-যাত্রার অনুকরণে রামযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার উৎপত্তি হয়। ইংরেজ অধিকারের পর নবজাগ্রত থিয়েটারের সহিত পাল্লা দিবার জন্য সখের যাত্রা মাথা তুলিয়া উঠে। বাঙলা দেশে ধর্মপ্রচার, লোকশিক্ষা বিস্তার, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্রগঠনে যাত্রার প্রভাব অসামান্য।

(শেষাংশ ১৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রতারণা

শ্রীশঙ্কর বাগচে

কলকাতায় যাবার কমলের বড় সাধ—কিন্তু অচেনা অত বড় শহরে যাবে কার কাছে আর থাকবেই বা কোথায় এই সমস্যাই তাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে।

যাবার তোড়জোড় সে অনেকদিন ধরেই করে রেখেছিল। বীমা কোম্পানীর দালালী করে সে, সেই সূত্রে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে সুপারিশপত্রও খানকয়েক জোগাড় করে রেখেছে, বেড়ান হবে, সেই সঙ্গে রোজগারেরও একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ধর্মশালার অতিথি হয়ে উঠতে হবে এই চিন্তায় তার আনন্দ অনেকখানি কমে গেল। কিন্তু তবুও উপায় যখন নেই—এই ব্যবস্থাই মেনে নেওয়া ছাড়া তার আর উপায়ই বা কি! হোটেলে গিয়ে ওঠার প্রশ্নতো উঠতেই পারে না, কারণ, সে হিসেব করে দেখেছে যে, টিকিটের দাম দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা একুণে দশ টাকার বেশী হতেই পারে না; এ টাকা কলকাতার মত শহরে যে কত অপ্রচুর তার গ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই সে তা অনুমান করে নিতে পারে। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত কমল ধর্মশালাতে ওঠাই স্থির করলে।

কোথায় আস্তানা বাঁধবে সে সমস্যার সমাধান একরকম না হয় হ'ল, কিন্তু স্টেশনে এসে আর এক সমস্যা দাঁড়াল ট্রেনে ওঠা নিয়ে। যে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ভিতর থেকে অমনি সমস্বরে চিৎকার বেরিয়ে আসে, "এখানে জায়গা নেই মশাই, অন্য কামরা দেখুন!" কিন্তু ট্রেনে তো তাকে উঠতেই হবে, লোকের কথাকে গ্রাহ্য করতে গেলে তার আর তাহ'লে কোনকালে কলকাতা যাওয়া ঘটে উঠবে না। কোনদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে কমল ধাক্কা মেরে একটা কামরায় গিয়ে উঠল। কয়েকজন রুখে দাঁড়াল, "শুনতে পান না কানে?—বলছি জায়গা নেই, না সেই ঠেলে উঠবেন! যান, অন্য কামরা দেখুন, এখানে জায়গা হবে না!"

"দেখুন না, একজনের জায়গা ঠিক হয়ে যাবে'খন।" কমল সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর হাতের ব্যাগটা বাঙ্কে রেখে সামনের এক ভদ্রলোককে বললে, "পা-টা যদি নামিয়ে বসেন তো বড় ভাল হয়!"

লোকটি বিরক্ত চোখে ওর দিকে ফিরে দেখলে তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামনের বেঞ্চ থেকে পা-টা নামিয়ে নিলে। কমল সেখানে বসবার আসন করে নিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে জানলার বাইরে মাথাটি বের করে সজোরে টান দিলে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

সিগারেট শেষ করে গাড়ির মধ্যে মুখটা টেনে এনে কমল আর একবার ভাল করে চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। একপাশে কয়েকজন যুবক কথাবার্তার নামে ভীষণ হট্টগোলে আর হাসি তামাসায় গাড়িটা মশগুল করে তুলেছে। আর এক কোণে বসে এক মারোয়াড়ী দম্পতি—দুজনের মধ্যে দেহ-স্ফীতি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার কে পেতে পারে বিচার করে বলা একটু মুস্কিল। আর এক কোণে বসে—কমলের দৃষ্টে আরও প্রখর হয়ে উঠল, সোজা হয়ে সামনের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকে বসল—কমল দেখলে বসে রয়েছে একটি তরুণী! কেমন একটি চকমকি সৌন্দর্য, একটা নয়নমনোরম রুক্ষতা মেয়েটির সর্বাঙ্গে যেন পরিস্ফুট ছিল; তাকে সুন্দরীই বলা যায়, বয়েস ঊনিশ কুড়ির বেশী নয়। সাজ-পোষাক হাবভাব সাধারণ নয়। কমলের দৃঢ়বিশ্বাস হ'ল, মেয়েটি শহরেরই বাসিন্দা, হয়ত কলকাতারই। মেয়েটির পাশে বসে আধাবয়সী এক ভদ্রলোক, বোধ হয় ওরই অভিভাবক।

একদৃষ্টে কমল তার দিকে চেয়ে রইল, হঠাৎ যুবকমহল থেকে একটা হৈচৈ উঠে ওর নিবিষ্টতায় বাধা দিলে। তর্ক উঠেছে, সিনেমার সর্বশ্রেষ্ঠ তারকা কে? কথার ফাঁকে তাদেরই মধ্যে একজন হঠাৎ উৎসুক হয়ে কমলের ব্যাগটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—তারপর দৃষ্টিটা নামাল কমলের ওপর, আবার ব্যাগটা দেখলে, আবার কমলকে। সঙ্গীদের ডেকে অনুচ্চস্বরে কি যেন সে বললে; একসঙ্গে সবাই চাইলে কমলের দিকে, ব্যাগটারও দিকে। শেষে কমলের ওপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তারা পরস্পর কি যেন বলাবলি করতে লাগল।

কমল একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল; আভাসে একবার নিজের সর্বাঙ্গের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। কোথাও কোন গোলমাল নেই—এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, না সবই তো ঠিক আছে, তবে ওরা ওভাবে—

কমল তাদের দৃষ্টির সামনে বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দেখতে দেখতে সে রীতিমত ঘেমে উঠল। একটু পরে ওদের একজন তার সামনে এসে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত সমীহ করেই প্রশ্ন করলে, "এ—এ ব্যাগটি কি আপনার?"

বিস্মিত হ'ল কমল, ভীতও হ'ল—ব্যাগের মালিকানা নিয়ে সন্দেহ! ওরা কি তাকে চোর মনে করেছে নাকি?

বিস্ময়ের সুরে কমল উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যাগ ত আমারই!"

"আপনিই তাহ'লে পূর্ণিয়ার কমল চট্টোপাধ্যায়?"

ব্যাগের ওপর স্পষ্টাক্ষরে লেখা "কমল চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণিয়া" তা সত্ত্বেও লোকটির প্রশ্ন করার কারণ ভেবে কিছুই সে ঠিক করতে পারলে না।

কমল দেখলে কোণের সেই তরুণীটি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।

"আপনিই পূর্ণিয়ার কমলবাবু! দেখুন তো, অথচ এই একটু আগে আপনাকে উঠতেই দিচ্ছিলুম না! কি কেলেঙ্কারী বলুন তো?" দলের অপর একটি ছোকরা এবারে এগিয়ে এসে বললে। "তখন থেকে দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল; অনেকদিন আগে একবার চকিতের জন্যে দেখেছিলুম, ঠিক চিনতে পারিনি মাপ করবেন!"

ততক্ষণে গাড়িশুদ্ধ লোকের দৃষ্টি কমলের ওপর এসে পড়েছে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বত্র একসঙ্গে

অসংখ্য চাহনী চলাচল করতে লাগল—ছুঁচের মত সেগুলো কমলের সর্বশরীরে যেন প্যাঁট প্যাঁট করে বিঁধতে লাগল।

এসবের মানে? এদের মতলবই বা কি?—কমল ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চেহারা দেখে এদের কাউকেই ডাকাত-গুণ্ডা বলে মনে হয় না; আর তাছাড়া কামরায় এত লোকের সামনে ওদের সে সাহসই বা হবে কোত্থেকে। কিন্তু তবে...

ইতিমধ্যে পাশের যাত্রীরা সরে বসে তার আসনটি প্রশস্ত করে দিয়েছে। কমল হাত পা ছড়িয়ে বসলে, কিন্তু হতভম্ব ভাব কিছুতেই কাটিয়ে তুলতে পারলে না।

আর একটি ছোকরা এগিয়ে এল, বললে, "আপনার মত একজন গুণীকে সহযাত্রী পেয়েছি, আমাদের কি যে আজ সৌভাগ্য!"

গুণী! গুণী মানে? কমল হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল। কোণের সেই তরুণীটির অভিভাবক উৎসাহ দেখিয়ে এবারে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, "আপনিই তা'হলে কমল চাটুজ্যে? অথচ কি মজা দেখুন—'প্রতিভা'র প্রতিভাবান লেখক আমাদের সঙ্গে চলেছেন, আর তাঁকে আমরা বসতেই দিতে চাইছিলুম না! যাকগে, আপনি কিছু মনে করবেন না, এঁরা সব ছেলেমানুষ, এদের আর দোষ নেবেন না! সত্যিই ওঁরা আপনাকে চিনতে পারেন নি।"

ছোকরার দলটি বৃদ্ধের কথা সমর্থন করলে। তিনি এগিয়ে আসতে তাঁকেও ওরা একটা বসবার জায়গা করে দিলে।

"আমায় বোধ হয় চিনতে পারছেন না?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসন পরিগ্রহ করে বললেন, "আর তা চিনবেনই বা কি করে? আপনারা আধুনিক লেখক, আমাদের মত সেকেলেদের সঙ্গে পরিচয় আর হল কি করে বলুন! অতুলানন্দ চ্যাটার্জীর নাম বোধ হয় শুনে থাকবেন? গুরুজনেরা একদিন বলেছিলেন বটে, অতুল, কেন আর কলম ধরা বল?—এদেশে কিচ্ছু হবে না, না নাম, না পয়সা! এখন চল্লিশ বছর সাহিত্য করে দেখছি সত্যিই তাই!"

অতুলানন্দের কথাগুলি কমল নিঃসাড়ে শুনে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে নিজের আসল পরিচয়টি দেবার জন্য হাঁফিয়ে উঠেছিল সত্য, কিন্তু বৃদ্ধের অনর্গল আত্ম-ইতিহাস বর্ণনের মাঝে এমন কোন ফাঁক পেল না যাতে সে সুযোগটা করে নেয়। সত্যি কথা বলতে কি, সাহিত্য জগতের সঙ্গে তার পরিচয় মোটেই ঘনিষ্ঠ ছিল না; সাহিত্য চর্চাও কোনদিনই সে করেনি। দু পাঁচখানা বই সে পড়েছে, সেটা পড়ার সখেই, সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে তো নয়ই। সুতরাং অতুলানন্দ চ্যাটার্জীর নাম তার পক্ষে মনে করা মুস্কিল। এমন কি 'কমল চাটুজ্যের'ও নাম কস্মিনকালেও সে শোনেনি। তবে এতক্ষণে সে এদের কথা ও ব্যবহার থেকে এইমাত্র বুঝেছে যে কমল চাটুজ্যে নামক যে ব্যক্তির সঙ্গে তাকে ভুল করা হয়েছে আধুনিককালের তিনি একজন নামকরা লেখক এবং তিনিও পূর্ণিয়াতেই কোথাও থাকেন।

কমলের হঠাৎ মনে হল কোণের সেই তরুণীটি তার দিকে চেয়ে একটু যেন মুচকী হেসে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেললে। কমলের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কমল বুঝলে যে মেয়েটি লেখক কমল চাটুজ্যে সম্পর্কে সমস্ত কথাই মন দিয়ে শুনছে এবং আর সবাইয়ের মত আগ্রহান্বিতাও হয়ে উঠেছে। কমল মনে মনে ভাবলে যে এরপর নিজের প্রকৃত পরিচয়টা আর জানিয়ে দেওয়া যায় না। তাতে জায়গাত যাবেই এবং সেই সঙ্গে মেয়েটির মনে সে যে ছাপ আস্তে আস্তে আঁকতে আরম্ভ করেছে সেটাও মুছে যাবে। এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব হল। সাহিত্যিক কমল চাটুজ্যের বকলমে নিজের প্রতিষ্ঠা করে নেবার লোভ সামলান তার পক্ষে মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল।

"একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না," একজন বললে, "প্রথমেই আপনি অমন চমৎকার উপন্যাসখানা লিখলেন কি করে বলুন তো?"

কমল মনস্থির করে নিয়েছে। গম্ভীরভাবে সে বললে, "ওটা হচ্ছে কি জানেন......আমি বেশী লিখিটিখি না...... তবে......"

"বিনে অভ্যেসেই তো আর ওরকম লেখা যায় না!" আর একজন সাহস করে কথাটা বলে ফেললে।

এবারে কমলের হয়ে প্রবীণ সাহিত্যিক অতুলানন্দ জবাব দিলেন, "দেখুন, সত্যিকারের প্রতিভা যাদের থাকে তাদের অভ্যাসের কি দরকার হয়? বুঝলেন, আমি কিন্তু আপনার উপন্যাস পড়বামাত্রই পুণিকে বলেছিলুম, দেখিস, কালে এ বড় লেখক হবে—সাহিত্য জগতে এর নাম অমর হ'য়ে থাকবে।"

পুণি! মেয়েটির নাম তা'হলে পূর্ণিমা বোধ হয়—কমল মনে মনে ঠিক করে নিলে। ভারী সুন্দর মিলে গিয়েছে নামটা চেহারার সঙ্গে।

"এরপর আর কি লিখছেন?"

কমলের স্বপ্নে ব্যাঘাত পড়ল। "নাম এখনও কিছু ঠিক করিনি, একটা কিছু তবে লিখছি ঠিকই।" বেশ বিজ্ঞের মত কথাটি বললে।

"উপন্যাসই তো?"

প্রশ্নটি করেই বৃদ্ধ অতুলানন্দের মনে হল তিনি যেন ভদ্রতার বাইরে চলে যাচ্ছেন। একটু লজ্জিতভাব প্রকাশ করে বললেন, "আপনাকে এমনিভাবে বিরক্ত করা আমার বোধ হয় অন্যায়ই হচ্ছে। কিন্তু আপনার 'প্রতিমা' উপন্যাসখানা পাঠকদের, বিশেষ করে তরুণদের যে রকম........."

মাঝপথেই কমল বাধা দিয়ে বলে উঠল, "অন্যায় মোটেই নয়। আপনার মত একজন খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাওয়ায় আমি নিজেই ধন্য হয়েছি।"

এরপর কি বলা যায় কমল ভেবে পেলে না। কে একজন প্রশ্ন করলে, "আপনার নতুন উপন্যাসের বিষয়বস্তুটি কি হবে?"

এসব কথা এড়িয়ে যেতে পারলেই কমলের পক্ষে নিরাপদ, কিন্তু তা আর হবার নয়। প্রশ্ন যখন এসেছে তখন উত্তরও

তাকে দিতে হবে। কমল যথাসম্ভব গাম্ভীর্য টেনে এনে বললে, "বিষয়বস্তু যা নিয়েছি, বাঙলার সাহিত্য জগতে তা যে অভিনব হবে, একথা বলতে পারি।"

কথাটা বলেই কমল সমস্ত কামরাখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। দেখলে কামরা শুদ্ধ লোকের কৌতূহল মেশানো দৃষ্টি তারই ওপরে নিবদ্ধ রয়েছে। মনে মনে সে একটু খুশীই হল, স্বরটাকে যথাসম্ভব নাটকীয় করে বললে, "আমার উপন্যাসের চরিত্রগুলির সবাই হবে ভিখিরী।"

"ভিখিরী! মানে হরিজন, কুলীমজুর এইসব তো?"

"না, ভিখিরী মানে সত্যিকারের ভিখীরি। প্রতিদিন চোখের সামনে যাদের দেখি দোরে দোরে হাত পেতে ঘুরে বেড়াতে তারাই হবে আমার উপন্যাসের চরিত্র, তাদেরই জীবন-কথা হবে আমার উপন্যাসের কাহিনী।"

"চমৎকার! মিঃ চ্যাটার্জী, আপনার সত্যিই কল্পনাশক্তি আছে।"

কমলের কেমন যেন একটা নেশা চেপে গেল। এতগুলি লোকের কৌতূহল, সশ্রদ্ধভাব কমলকে মোহবিহ্বল করে তুলল।

কমল থামতে পারলে না, অনেকগুলি বড় বড় প্রাণস্পর্শী কথা বলে গেল, নিজেই ভেবে পেলে না তার এই বাক্‌চাতুর্যের উৎস কোথা থেকে এল। শেষ হতে মনে মনে এই ভেবে আক্ষেপ করতে লাগল যে আজ সে সত্যিই সাহিত্যিক না হয়ে, হয়ে রয়েছে বীমার দালাল মাত্র! আবার দেখলে চারিদিকে চেয়ে, সবাই যেন তাকে অভিবাদন জানাবার জন্যে ঝুঁকে আসছে এবং সেই তরুণীটিও—তার সহাস্যমুখ সবায়ের চেয়ে স্পষ্ট করে একথা যেন ঘোষণা করে দিচ্ছিল।

কমলের বুকের ভেতরটা স্পন্দিত হয়ে উঠল। তরুণীর সেই হাসি তার মনকে বড় দোলা দিয়েছে।

* * * *

এদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ভালই হল, রাস্তাটা কেটে গেল বেশ আনন্দেই। কথায় কথায় যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল যে কমল কলকাতাতেই যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার আস্তানা বাঁধবার জায়গা কোন নির্দিষ্ট নেই তখন অতুলানন্দ তাঁর অতিথি হবার জন্য কমলকে অনুরোধ করলেন। কমলের সুবিধা বৈ অসুবিধা ছিল না কিছু তাতে, সুতরাং আমন্ত্রণ সে সানন্দেই গ্রহণ করলে।

ট্যাক্সীতে বাড়ি যাবার পথে অতুলানন্দ তরুণীটির সঙ্গে কমলের আলাপ করিয়ে দিলেন; "এটি আমার মেয়ে, পূর্ণিমা। সংসার বলতে আমাদের আর কেউ নেই। আমার সাহিত্যের নেশাটা ও কিছু কিছু পেয়েছে। মাঝে মাঝে লেখেও, তবে সে আর পাতে দেবার মত নয়। তাছাড়া আপনার মত প্রথিত-যশার তুলনায় ওতো ছেলেমানুষ—কি বলিস মা, পূর্ণি?"

পূর্ণিমার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠল। কমলের সহাস্য দৃষ্টির সামনে মাথাটা সে নীচু করলে।

"আপনিও লেখেন তাহলে?" কমলই প্রথমে কথা বললে।

"হ্যাঁ।" মাথা না তুলেই পূর্ণিমা উত্তর দিলে।

"কি লেখেন, গল্প না কবিতা?"

"দুই-ই।"

"বেশ তো! আমাকে কিন্তু আপনার লেখা দেখাতে হবে!"

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে হেসে বললেন, "আপনি ও ছেলেমানুষি কি দেখবেন বলুন? ওর আবার লেখা! আপনারা হলেন নামকরা সাহিত্যিক!"

কমলের হঠাৎ একবার মনে হল, বৃদ্ধ তার সঙ্গে পরিহাস করছেন; পূর্ণিমাও যেন মুখ ফিরিয়ে হাসছে। তার মনে একটা আশংকা জমে উঠল। বাড়িতে নেমেই কমল অতুলানন্দ ও তাঁর কন্যাকে এই এক সর্তে আবদ্ধ করলে যে সে ঔপন্যাসিক একথা যেন প্রচার করা না হয়, কারণ তা জানাজানি হয়ে গেলে লোকে তাকে যেমন বিরক্ত করতে আসবে, সেই সঙ্গে ওঁদেরও আর শান্তি বলে কিছু থাকবে না। মনে হল অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে অতুলানন্দ কমলের সর্তে রাজী হলেন।

বীমার আফিসে ও এখানে সেখানে কমলের যা কিছু কাজ ছিল কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সপ্তাহ দুয়েক কেটেও গেল, দেশে ফিরে যেতে তবুও মন চায় না।

ইতিমধ্যে পূর্ণিমার সঙ্গে পরিচয় অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন বেড়াতে যাওয়া, কোন কোনদিন সিনেমায় যাওয়া, খাওয়া, বসা এযেন একসঙ্গে নাহলে তারা বড় অস্বস্তি বোধ করত। থেকে থেকে একদিন পূর্ণিমা কমলকে প্রশ্ন করলেঃ "আচ্ছা, এতদিনের মধ্যে আপনাকে একদিনও তো কৈ লিখতে দেখলুম না? এখেনে আপনার বড় অসুবিধে হচ্ছে বোধ হয়!"

প্রশ্নটা কমলকে বড় বিচলিত করে তুললে। "না...... হ্যাঁ......মানে......অসুবিধে কিছু নয়......আসল কথা হচ্ছে আজকাল কেমন যেন ভেতর থেকে কোন সাড়া পাই না।" কতদিন এ অভিনয় করে চলতে হবে, কে জানে!

কয়েকদিন পর সকালে কাগজখানা খুলেই অতুলানন্দ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "কমলবাবু খবরটা শুনেছেন?"

"কোন খবর বলুন তো?"

"সাহিত্যিক প্রভাস দত্তের মৃত্যুসংবাদ?"

"প্রভাস দত্ত! কোন প্রভাস বলুন তো?"

অতুলানন্দ কমলের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন; পূর্ণিমা হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিলে। কমল বুঝলে, নিজেকে তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে উঠল, "ও, প্রভাসবাবু? সে-কি! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না! এই সেদিনে পাটনায় দেখা হল! বড় দুঃসংবাদ তো—বাঙলা সাহিত্যের সত্যিই ক্ষতি হয়ে গেল।"

দিন দিন কমলের মনে অস্বস্তি বেড়ে চলল। এদের কাউকেই সত্যি কথাটা বলার মত মনের সাহস তার নেই, পূর্ণিমাকে তো নয়ই। সে বুঝেছিল এই আগাগোড়া অভিনয়ের মাঝে যেটা খাঁটি সত্য, পূর্ণিমার প্রতি তার প্রেম

সেটাকে ব্যক্ত করার সুযোগ মুখোস বজায় রেখে করে নেওয়া যাবে না। প্রতিদিনই সে চেষ্টা করে পর্দার অন্তরাল থেকে স্বরূপটাকে সামনে এনে দাঁড় করাবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না।

একদিন আর সে থাকতে পারলে না, মনকে শক্ত করে বেঁধে পূর্ণিমার ঘরে গিয়ে ঢুকল, সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে ডাকলে, "পূর্ণিমা!"

"অ্যাঁ......ও, আপনি?" টেবিলের উপর ঝুঁকে কি যেন সে লিখছিল, ডাক শুনে প্রথমটা চমকে উঠে তারপর পিছন ফিরে দেখলে।

"তোমা......আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, বিশেষ দরকারী।"

"কি কথা, বলুন না?"

"আগে বলুন আপনি ক্ষমা করবেন?"

"ক্ষমা? কি আপনি করলেন যে এরকম অপরাধীর মত এসে দাঁড়িয়েছেন?" কমলের ভাবভঙ্গীতে পূর্ণিমা যেন না হেসে পারলে না।

"এখন আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার কথা শুনলে, আমাকে অতি নীচ জুয়াচোর না মনে করে পারবেন না! আপনাদের সঙ্গে আমি প্রতারণা করেছি। পূর্ণিমা—আমি ঔপন্যাসিক কমল চ্যাটার্জী নই—জীবনে কোনদিন সাহিত্যের ধারও মাড়াই নি।"

"আপনি সাহিত্যিক একথা বলছে কে?"

"ম্যাক......তুমি তাহলে জান নাকি সব?"

"সব না হলেও, কিছু তো জানি।"

"কি করে জানলে তুমি?"

আসল কমল চ্যাটার্জী আমার খুবই পরিচিত বলে।"

"একথা এতদিন বলনি কেন?"

"কমল চ্যাটার্জীর ঐরকম নির্দেশ ছিল।"

কিন্তু এর মধ্যে তাকে পেলে কোথায়? কমলের বিস্ময় ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগল।

"কেন, এই বাড়িতেই!" পূর্ণিমা আবার হেসে ফেললে।

"পূর্ণিমা, আমার সঙ্গে এখনও ঠাট্টা করছ।"

"ঠাট্টা মোটেই করিনি। সত্যিই কমল চ্যাটার্জী এখানেই থাকেন। এমন কি এই মুহূর্তেই আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বাবা কিন্তু একথা জানেন না তাঁকে লুকিয়েই বইখানা আমি বের করেছি। দেখেছেন তো কি রকম ভোলা মন ওঁর আজও তিনি সন্দেহও করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা সত্যিই আপনি ঔপন্যাসিক কমল চাটুজ্যে। তারপর একটু থেমে হেসে বললে, "পূর্ণিয়াতে আমাদেরও বাড়ি। অল্প কয়েক মাস হল, কলকাতায় বাসা করে আছি। সেদিন গিয়েছিলাম—ফেরবার পথেই ত আপনার সঙ্গে দেখা হল। তারপর—তারপর তো আপনিই জানেন।"

"তুমি—তুমিই ঐ উপন্যাস লিখেছ নাম ভাঁড়িয়ে।" কমলের মাথাটি ভীষণ জোরে ঘুরতে লাগল। দেখতে দেখতে সমস্ত অন্ধকারে ঢেকে গেল, দেহ শিথিল হয়ে পড়ল—পূর্ণিমা তাকে ধরে ফেললে।

বাঙলা নাটকের আদি যুগ

(১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণযাত্রার উৎপত্তি চৈতন্যদেবের পর, কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, এক জাতীয় যাত্রা বা লোক নাট্য (popular drama) চৈতন্যদেবের আগেও বাঙলাদেশে বর্তমান ছিল। লাসেনের (Lassen) মতে জয়দেবের (খৃঃ ১২শ শতক) গীতগোবিন্দ একপ্রকার গীতিনাট্য। বাস্তবিক, গীতগোবিন্দ কাব্যটি নাটকীয় ধরণে কৃষ্ণ, রাধা এবং সখীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে লিখিত। J. L. Klein বলেন, গীতগোবিন্দ একপ্রকার divine idyll বা Mystery play of the Hindus. গীতগোবিন্দ কাব্য প্রাকৃত ছন্দে রচিত, ইহার ভাষাও অনেকটা প্রাকৃতগন্ধী, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লৌকিক উপাখ্যান ইহার মূল উপাদান, সুতরাং গীতগোবিন্দ জাতীয় গীতিনাট্য ১২শ শতকের প্রাচীন বাঙলায় বর্তমান ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। ভাষাতত্ত্ব বিশারদ সুনীতিবাবু অনুমান করেন, গীতগোবিন্দের ভাষা অনেকস্থলে প্রাকৃতের অনুবাদ। গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইহাও উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপে রচিত। হয়তো, গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হইয়াছে, যদিও আখ্যানবস্তু, ভাব এবং চরিত্র সৃষ্টিতে এই দুইটি কাব্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য। মনে হয় এক শ্রেণীর গীতিনাট্য পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, ইহার রীতি ও উপাদান অবলম্বন করিয়া গীতগোবিন্দের কবি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন।

সম্প্রতি নেপাল হইতে চারিটি বাঙলা নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাটকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধরণে খৃঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে রচিত। নাটকগুলির নাম—কাশীরামের বিদ্যাবিলাপ, কৃষ্ণদেবের মহাভারত, গণেশ রচিত রাম-চরিত এবং ধনপতি-রচিত মাধবানল কামকন্দলা। প্রাচীন সংস্কৃত রীতিতে রচিত হইলেও নাটকগুলি আধুনিক, ভারতচন্দ্র ও বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাব যথেষ্ট আছে। ইহাদের রচনারীতি ও আকৃতি অনেকটা ভারতচন্দ্র রচিত চণ্ডীনাটকের মত। নাটকগুলি নেপালরাজ ভূপতীন্দ্র ও তাঁহার পুত্র রণজিৎ মল্লের রাজত্বকালে রচিত। ইঁহাদের প্রশস্তিসূচক গান প্রত্যেক নাটকেই আছে। ভূপতীন্দ্র ও রণজিৎ মল্লের রাজসভায় বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর ও প্রতিপত্তি ছিল; নাটকগুলি তাঁহারাই রচনা করিয়াছেন। বাঙলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে এই নাটকগুলির কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে বাঙলার বাহিরে বাঙালী সংস্কৃতির বহুল প্রচারের ইহারা যে গৌরবময় নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কফন

মুন্সী প্রেমচাঁদ

ঝুপড়ির মত কুঁড়ে ঘরটার দোরের সুমুখে আগুনের ধুনিটা প্রায় নিভে এসেছে। তারই সামনে বাপ বেটা দু'জনে চুপচাপ বসেছিল। ঘরের ভেতর ছেলের বৌ প্রসব বেদনায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছিল—হাত-পা ছুঁড়ছিল। ছেলের বৌ বুধিয়া—যুবতী। থেকে থেকে তার মুখ থেকে এমন করুণ আর্তস্বর ডুকরে উঠছিল যে, শুনে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থমকে যাচ্ছিল। শীতের রাত, প্রকৃতি স্তব্ধতায় ডুবে রয়েছে. সমস্ত গাঁ-টা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

ঘিসু বলল—মনে হচ্ছে, ও আর বাঁচবে না। সমস্ত দিনটা তো দৌড়তেই শেষ হ'ল। যা এবার একবার দেখে আয়।

মাধব রেগে গিয়ে বলল—যদি মরবার হয়, তবে তাড়াতাড়ি মরে না কেন? দেখে এসে কি আর হবে?

—তুই তো বড় নির্মম রে! সমস্ত বছর যার সঙ্গে এত সুখে আরামে সংসার করলি, তারি সঙ্গে এত অকৃতজ্ঞতা?

—কিন্তু, ওর এই লাফঝাঁপ, আর হাত-পা ছোঁড়া, ও আর আমার চক্ষে সহ্য হয় না।

এরা জাতে চামার। গাঁ-জুড়ে এদের বদনাম। ঘিসু একদিন কাজ করে তো তিন দিন আরামে কুঁড়ে মেরে বসে থাকে। মাধব এত বড় ফাঁকিবাজ কাজের কুঁড়ে ছিল যে, আধ ঘণ্টা কাজ করতো তো এক ঘণ্টা কাবার ক'রে দিত কল্কে ফুঁকে। এজন্যেই এদের কেউ কাজ দিত না। ঘরে একমুঠো খাবার দানা কণা যদি রইল তো সেদিন তাদের পায় কে? তাদের যেন সেদিন কেউ দিব্যি দিয়ে কাজ করা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। দুচার দিন অনাহারের জ্বালায় পেটে যখন আগুন লাগতো, তখনই তারা একবার বের হ'ত অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায়। ঘিসু গাছে চ'ড়ে শুকনো ডালপালা ভেঙে আনতো, মাধব সেগুলি বেচে আসতো বাজারে গিয়ে। এর পর যতদিন একটা পয়সাও ঘরে থাকত, ততদিন দু'জনে এদিক ওদিক চষে বেড়াতো ভবঘুরের মত। আবার যখন নিরন্নতা বুভুক্ষা সামনে এসে দাঁড়াতো, তখন আবার লকড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা হ'ত, কাজ-কর্মের ফিকির পড়তো।

গাঁয়ে কাজের অভাব ছিল না। কিষাণদের গাঁ—খাটিয়ে লোকের জন্যে সেখানে পঞ্চাশ রকমের কাজ রয়েছে। কিন্তু এদের লোকে কাজের জন্যে ডাকতো কখন? দু'জনের মজুরীতে একজনের মত কাজ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মত মন-মেজাজ যখন থাকতো, আর এ ছাড়া যখন উপায়ান্তর থাকতো না, তখনই শুধু এদের দু'জনকে কাজে আহ্বান করা হ'ত, নইলে নয়।

এরা দু'জন যদি সাধু-সন্ন্যাসী হ'ত, তাহলে আর এদের চেষ্টা করে সন্তোষ, ধৈর্য অর সংযম লাভের সাধনা করবার কোন প্রয়োজনই হ'ত না। এটা তো এদের প্রকৃতির মধ্যেই ছিল। বিচিত্র এদের দু'জনের জীবন। ঘরে দু'চারটে মেটে বাসনপত্র ছাড়া সম্পত্তি বলে আর কিছু ছিল না। ছেঁড়া ন্যাতা ন্যাকড়া দিয়ে দেহের নগ্নতাটুকু চাপা দিয়ে এরা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। সংসারের সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত। মাথায় ধার-কর্জের বোঝা। গাল খেতো, মারও খেতো, কিন্তু তাতে কিছুই আক্কেল ফুটতো না এদের। দেনা শোধের কোন আশাই ছিল না এদের; লোকে এ সত্য জেনে শুনেও কিছু না কিছু ধার দিয়েও দিত। মটর আলুর ফসলের সময় পরের ক্ষেত থেকে মটর আলু ছিঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে এসে এরা ভেজে পুড়িয়ে খেয়ে নিত। কখনও কখনও পাঁচ দশটা আখ উপড়ে এনে রাত্রিবেলা বসে বসে চুষে শেষ করতো।

বুড়ো ঘিসু এই আকাশবৃত্তি করেই পরমায়ুর ষাটটি বৎসর পার ক'রে দিয়েছে। মাধবও সুপুত্রের মত বাপেরই পদচিহ্ন ধরে চলছে। বলতে গেলে, সে বাপের নাম আরও উজ্জ্বল করছে।

এখন পর্যন্ত এরা ধুনির সামনে বসে আলু পোড়াচ্ছিল। কারু ক্ষেত থেকে খুঁড়ে নিয়ে আসা হয়েছে আলুগুলি। ঘিসুর স্ত্রীর দেহান্ত হয়েছে, সে আজ অনেক দিনের কথা। গেল বছর বিয়ে হয়েছে মাধবের।

মাধবের বৌ—যেদিন থেকে এই মেয়েটি এদের সংসারে এসেছে, সেদিন থেকে এদের জীবনযাত্রার চেহারা—পারিবারিক রূপ ফিরে গেছে।

যাঁতা পিষে বা ঘাস কেটে বুধিয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একসের আটার মত পয়সার ব্যবস্থা ক'রেই নিত। এই দুই হতভাগার পেটের নরক ভরণের ব্যবস্থাটা সেই করতো। যেদিন থেকে সে এসেছে, এ দু'জন হ'য়ে উঠেছে আরও কুঁড়ে, আরও আয়েশী। এমন কি, যাকে বলে এদের বেশ পায়া ভারি হ'য়ে উঠতে লাগলো। কেউ কোন কাজের জন্য ডাকলে বেশ নির্ব্যাজ ভাব দেখিয়ে দুগুণ মজুরী হেঁকে বসতো।

এই মেয়েটিই আজ প্রসব বেদনায় মরতে বসেছে। আর এরা দু'জন বোধ হয় এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, মরেই যাক্ এখনি। একটু আরামে শোয়া যায় তাহলে।

ঘিসু একটা পোড়া আলু বের ক'রে খোসা ছাড়িয়ে বললো—কি দশা হ'ল ওর? যা একবার দেখে তো আয়। শাকচুন্নী ভর করেছে, তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? এখানে তো ওঝারাও এক টাকা হেঁকে বসে।

মাধবের মনে মনে আশঙ্কা ছিল, ঘরের ভেতর সে গেছে কি ঘিসু আলুগুলোর প্রায় সবটা সাফ ক'রে দেবে। সে বললো—আমার ভেতরে যেতে ভয় করছে।

—আরে ভয় কিসের, আমি তো এখানেই রয়েছি।

—তবে তুমিই গিয়ে দেখ না।

—আমার বউ যখন মারা গেল, আমি তিন দিন ওর কাছ থেকে নড়ি নি। আর এক কথা, আমি ভেতরে গেলে বউ কি

লজ্জা পাবে না? যার কখন মুখ দেখি নি, আজ তার আদুড় শরীর দেখবো? ওর তো এখন নিজের শরীরের হুঁস পর্যন্ত নেই। আমাকে দেখলে ইচ্ছেমত হাত-পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে বাধা পাবে।

—আমি ভাবছি, ছেলেপিলে যদি একটা কিছু হয়েই যায়, তাহলে উপায়? সোঁঠ, গুড়, তেল—কিছুই যে ঘরে নেই।

—সব এসে যাবে ভগবান যদি দেন। আজ যারা একটি পয়সা দিচ্ছে না, কাল তারা ডেকে নিয়ে টাকা দেবে। আমার ন'টি ছেলে হয়েছিল। কোন দিনই ঘরে কিছু ছিল না। কিন্তু ভগবান কোন না কোন রকমে দায় উদ্ধার করেই দিলেন।

যে সমাজে দিনরাত খাটিয়ে লোকের অবস্থা এদের দশা থেকে বড় কিছু উন্নত নয়, যে সমাজে তাদেরই অবস্থা কিষাণদের তুলনায় অনেক সম্পন্ন, যারা কিষাণদের দুর্বলতাকে ভাঙিয়ে লাভ করবার কায়দা জানে, সে সমাজ থেকে এই ধরণের মনোবৃত্তিই সৃষ্টি হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তো একথা বলবো যে, ঘিসু কিষাণদের চেয়ে আরও বিচারবান ছিল। এই কারণেই সে বিচারবিহীন গবেট কিষাণদের সহকর্মী না হয়ে ইতর আড্ডাবাজদের দলে ভিড়েছিল। তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে এমন শক্তি ছিল না যে, সে আড্ডাধারীদেরও নিয়ম আর নীতি পালন ক'রে চলতে পারে। এজন্যেই এই আড্ডাবাজমণ্ডলীর অন্য সকলে গাঁয়ের হোমরা চোমরা বা মোড়ল হ'য়ে বসেছিল, কিন্তু এদের দু'জনের কপালে জুটতো সমস্ত গাঁয়ের লোকের চোখ রাঙানি। তবু মনে মনে ওদের একটা সন্তোষ অবশ্য ছিল। চাষা হ'লেই বা খারাপ, কিষাণদের মত তো আর গতরভাঙা মেহনত করতে হয় না। আর এই চাষাগুলোর সরলতা আর নিরীহতার সুযোগ ভাঙিয়ে তাদের মতন তো কেউ আর বাগিয়ে নিতে পারে না।

দু'জনেই ঝলসানো আলুগুলি বের ক'রে গরম গরম খেতে সুরু ক'রে দিল। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি। এতটুকু সবুর ছিল না যে আলুগুলিকে ঠাণ্ডা হ'তে দেয়। বার কয়েক দু'জনের জিভ পুড়ে গেল। খোসা ছাড়াবার পর আলুগুলো বাইরে থেকে ছুঁয়ে তেমন গরম মনে হচ্ছিল না। কিন্তু দাঁতের কামড় পড়েছে কি ভেতরের গরম শাঁস জিভ, তালু ও গলা প্রায় পুড়িয়ে দিচ্ছিল। এমন জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে রাখার চেয়ে স্রেফ গিলে ভেতরে চালিয়ে দেওয়াই মঙ্গল। কেননা, সেখানে একে ঠাণ্ডা করবার মত সুপ্রচুর উপকরণ মজুত আছে। এই জন্যেই দু'জনে চটপট গিলে যাচ্ছিল; যদিও এই চেষ্টার ফলে তাদের দু'চোখ বেয়ে ঝরছিল অশ্রুর নির্ঝর।

ঘিসুর মনে পড়লো, ঠাকুর মশায়ের বিয়েতে বরযাত্রী হ'য়ে যাবার ঘটনাটা। কুড়ি বছর আগে সে এই বরযাত্রীর সঙ্গে গিয়েছিল। সেই নেমন্তন্নে যে তৃপ্তি সে পেয়েছিল, সেটা তার জীবনের একটি স্মরণীয় কাহিনী। এখনও সে স্মৃতি সজীব হ'য়ে রয়েছে। ঘিসু বললে—সে ভোজনের কথা ভুলতে পারি না। তার পর ও-রকমের পেটপুরে খাওয়া আর পাই নি কখনও। কনে পক্ষ সকলকেই পেটভরে লুচি খাইয়েছিল—সব্বাইকে! ছেলে, বুড়ো সকলেই লুচি খেয়েছিল—খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি। চাটনী, রায়তা, তিন রকমের শাক, একটা ঝোলভরা তরকারী, দই মেঠাই—কী স্বাদ যে পেয়েছিলাম সে ভোজনে, সে কি আর বলবো! সে এক ঢালাও ব্যাপার—তার মধ্যে নেই ফেই কিছু ছিল না। যে যা চাও, যতখানি চাও! সকলে এমন খাওয়া খেল যে, শেষে জল খেতে আর কেউ পারে নি। পরিবেশনকারীরা পাতে ঢেলে দিচ্ছে গরম গরম গোলগাল সুগন্ধি কচুড়ী। বারণ করছি—আর চাই না, চাই না, হাত দিয়ে পাত ঢেকে আছি; কিন্তু তারা দিয়েই চলেছে। এর পর সবাই যখন আচমন সেরে উঠেছি, তখন পান এলাচও দেওয়া হ'ল। কিন্তু পান নেবার মত কি অবস্থা আমার ছিল তখন? সোজা দাঁড়াতেই পারছিলাম না। চটপট গিয়ে নিজের কম্বল পেতে গড়িয়ে পড়লাম। এমনই দরাজ দিল্ ছিল ঠাকুর মশায়ের।

মাধব মনে মনেই এই পদার্থগুলোর আস্বাদ উপভোগ ক'রে বললে—এখন আর আমাদের কেউ এমন ভোজ খাওয়ায় না।

—এখন কে আর খাওয়াবে? সে যুগই ছিল অন্য রকমের। এখন তো সবাই সস্তা খোঁজে। সাদি বিয়েতে খরচ করে না, ক্রিয়াকর্মে খরচ করে না! এই তো ব্যাপার। তাইতো বলি, গরীবের মাল মেরে মেরে জমা ক'রে রাখবি কোথায়? জমা করতে তো কামাই নেই কারু! হাঁ, যত সস্তা ঐ খরচের বেলায়!

—তুমি কুড়িটা লুচি নিশ্চয়ই খেয়েছিলে?

—কুড়ির চেয়ে বেশী খেয়েছিলাম।

—আমি পঞ্চাশটা খেয়ে ফেলতে পারি।

—পঞ্চাশের কম আমিও খাই নি। তেমনি হট্টাকট্টা ছিলাম তো! তুই তো আমার আধেকও ন'স।

আলু খাওয়ার পর দু'জনে জল খেল। তার পর সেখানেই, ধুনীর সামনে পেটে পা গুঁজে ধুতির কোঁচা গায়ে লেপটে দু'জনে শুয়ে পড়লো। বড় বড় দুটো অজগর যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল।

বুধিয়া এখনও কাতরাচ্ছে।

(২)

সকালে মাধব ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে, বুধিয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। তার মুখের ওপর মাছি ভন্ ভন্ করছে। পাথরের মত নিশ্চল চোখের তারা দুটো উল্টে গেছে। সমস্ত শরীর ধুলোমাখা, বুধিয়ার পেটের ছেলে পেটেই মরে গেছে।

মাধব ঘিসুর কাছে ফিরে এল। দু'জনে বুকে ঘুসি মেরে চীৎকার করে সুরু করলো—হায়, হায়! প্রতিবেশীরা কান্নাকাটি শুনে দৌড়ে এল। সনাতন নিয়মে তারা এ অভাগা দু'জনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

কিন্তু বেশী কান্নাকাটির অবসর নেই। কফন আর লকড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরের মধ্যে পয়সাকড়ির বালাই

তো তেমনই নিশ্চিহ্ন, চিলের বাসায় যেমন মাংসের কুচি।

কাঁদতে কাঁদতে বাপ বেটায় গাঁয়ের জমিদারের কাছে এল। জমিদার মশায় এদের দু'জনের চেহারা দেখলেই জ্বলে যেতেন। নিজের হাতে পিটিও দিয়েছিলেন দু'একবার—চুরি করার জন্যে, আর কাজে না আসার জন্যেও। জমিদার মশায় বললেন—কি রে ঘিসুয়া, কাঁদছিস কেন? তোর যে আজকাল টিকিটিরও দেখা নেই। মনে হচ্ছে, এ গাঁয়ে আর থাকবার ইচ্ছে নেই তোদের।

ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, জলভরা চোখে বললে—সরকার, বড় বিপদে পড়েছি। মাধবের ঘরণী রাত্রে শেষ হ'য়ে গেছে। সমস্ত রাত ছটফট করেছে সরকার! আমরা দু'জনে ওর শিয়রে বসে রইলাম। যা সাধ্যি ওষুধপত্র করলাম। তবু সে আমাদের দাগা দিয়ে চলে গেল। খাবার সময় একটা রুটি এগিয়ে দেবে এমন কেউ আর সংসারে রইল না মালিক। একেবারে ফতুর হ'য়ে গেছি সরকার, সংসার উজাড় হ'য়ে গেছে। আপনার গোলাম আমরা; এখন আপনি ছাড়া ওর শেষ কাজের ব্যবস্থা আর কে ক'রে দেবে সরকার। আমার হাতে যা কিছু ছিল, সবই ওষুধপত্রে শেষ হ'য়ে গেছে। এখন হুজুরের যদি দয়া হয়, তবে ওর চিতার খরচের ব্যবস্থাটা হয়। আপনি ছাড়া কার দরজায় যাই?

জমিদার মশায় দু' টাকা সাহায্য দিয়েছেন। গাঁয়ের অর্থ কালো কম্বলকে রং করা। মনে এল, বলে দেন—যা দূর হ। ডাকলেও যেখানে আসা হয় না, সেখানে গরজে পড়ে আজ খোসামোদ করতে এসেছে। হারামখোর কোথাকার! বদমাস!

কিন্তু এটা রাগ করার বা শাস্তি দেবার উপযুক্ত সময় নয়। মনের ভেতর গজগজ ক'রে দুটো টাকা বের ক'রে জমিদার মশায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু সান্ত্বনার একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে বের হ'ল না। ওদের দিকে তাকিয়েও একবার দেখলেন না, যেন মাথার একটা বোঝা নেমে গেল।

জমিদার সাহেব দুই টাকা সাহায্য দিয়েছেন। গাঁয়ের বেনিয়া মহাজনেরা আর কোন্ সাহসে আপত্তি করে? ঘিসু জমিদার মশায়ের নাম ক'রে ঢোল পেটাতে জানে। কেউ দু' আনা, কেউ চার আনা। এক ঘণ্টার মধ্যে ঘিসু পাঁচটি টাকা জমা ক'রে ফেললো। কেউ কিছু নাজ দিয়ে দিল, কেউ লকড়ি। ঠিক দুপুরের সময় ঘিসু আর মাধব চললো বাজারে—কফন কেনবার জন্যে। এদিকে অন্য সকলে বাঁশ কাটতে লেগে গেল।

(৩)

বাজারে পেঁছে ঘিসু বললো—ওকে পোড়াবার মত লকড়ি তো হ'য়ে গেছে, কি বলিস্ মাধব?

—হাঁ, লকড়ি অনেক হয়েছে। এখন কফন চাই।

—তবে চল, একটা বাজে হালকা রকমের কফন কিনে নিই।

—হাঁ, আর কি? লাস উঠতে উঠতে রাত হ'য়ে যাবে। রাত্রিবেলা আর কে কফন দেখছে!

—কি বিদঘুটে নিয়ম রে বাবা। বে'চে থাকতে গায়ে দিতে ন্যাকড়াও জোটে নি যার, আজ মরে যাবার পর তার জন্যে কফন চাই!

—লাসের সংগে কফন তো পুড়েই যায়।

—আর কি থাকে? এই পাঁচটি টাকাই যদি আগে পাওয়া যেত তবে ওষুধপত্র কিছু হতো।

এরা পরস্পরের মনের কথাটি আঁচ করছিল। বাজারে ঘুরে বেড়ালো এদিক ওদিক। কখনো ওমুক বাজাজের দোকানে যায়, কখনো ওমুক শেঠের দোকানে। রকমারি কাপড় দেখে, রেশমী অথবা সুতী; কিন্তু কোনটিই পছন্দসই হয় না। এই ভাবেই সন্ধ্যা হয়ে গেল।

তারপর কে জানে কোন্ দৈবী প্রেরণার টানে এরা পেঁছে গেল এক শুঁড়িখানার কাছে। যেন একটা অবধার্য ব্যবস্থা-মত এরা সোজা গিয়ে ঢুকলো সেই মধুশালার—সেই শুঁড়িখানার অন্দরে। দুজনে কিছুক্ষণ একটু বেখাপ্পা অস্বস্তিকর অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর। ঘিসু শুঁড়িখানার গদির সামনে গিয়ে হাঁকলো—সাহুজী, আমাকেও এক বোতল দাও তো।

এর পর কিছু চাট আনা হলো। মাছ ভাজা আনানো হলো। দুজনে বারান্দায় বসে পরম শান্তিতে বোতল ঢেলে মদ খেয়ে চললো।

প্রথমে দু'এক গেলাস ঢক ঢক করে তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করলো দুজনে। পাতলা নেশার আমেজ ধরলো শুধু।

ঘিসু বললো,—লাসে কফন দিলে কি ফল হয়? শেষে পুড়েই তো যায়। কিছু সংগে আর যায় না।

যেন সে নিজের নিষ্পাপতার জন্য দেবতাদের সাক্ষী মানছে। মাধব আকাশের দিকে চোখ দুটো তুলে বললো,—এটা দুনিয়ার রীতি, নইলে লোকে ব্রাহ্মণকে হাজার হাজার টাকা দান করে ফেলে কেন? কে দেখতে গেছে, পরলোকে সেগুলি ফিরে পাওয়া যায় কি না?

—বড়লোকের টাকা আছে, তারা ফুঁকে উড়িয়ে দেয়। আমার ফুঁকে উড়িয়ে দেবার কি আছে?

—কিন্তু লোককে উত্তর কি দেবে? লোকে জিজ্ঞাসা করবে না, কফন কোথায়?

ঘিসু হাসলো—ওরে, বলে দেব কোমরের ট্যাঁক থেকে টাকা খসে পড়ে গেছে। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাওয়া যায় নি। লোকে তো বিশ্বাস করবে না জানি; কিন্তু ওরাই আবার কফন কেনার টাকা দেবে।

এই অভাবিত সৌভাগ্যের আবির্ভাবে মাধবও হেসে ফেললো। বললো,—বড় ভাল ছিল বেচারী। মরেছে, মরেও খুব খাইয়ে দাইয়ে গেল!

আধ বোতলের বেশী পার হয়ে গেছে। ঘিসু দুসের লুচি আনালো। আরও এল—চাটনী, আচার, মেটলি ভাজা। চাটের দোকানটা সরাবখানার সামনেই। মাধব এক লাফে উঠে গিয়ে ঠোঙায় ভরে সমস্ত সামগ্রী বয়ে নিয়ে এল। পুরো দেড়টি টাকা খরচ হয়ে গেল। এখন রইল শুধু কয়েকটি পয়সা।

এইবার দুজনে এক সুমহিম দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসে বসে লুচি খেতে আরম্ভ করলো। দেখে মনে হচ্ছে, জঙ্গলে বসে যেন দুটো বাঘ তার শিকার-করা প্রাণীকে উদরসাৎ করছে। না আছে কোন জবাবদিহির দুর্ভাবনা, না আছে দুর্নামের ভয়। এই সব চিন্তা দ্বিধাকে তারা অনেকদিন আগেই জয় করেছিল।

দার্শনিকের মত ভাবময় ঘিসুর মুখ। বললো,—আমার আত্মা প্রসন্ন হচ্ছে। ওর কি এতে পুণ্যলাভ হবে না?

পরম শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে মাধব কথাটা সমর্থন করলো—নিশ্চয়, নিশ্চয়ই হবে। ভগবান্, তুমি অন্তর্যামী, ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেও, আমরা দুজনে হৃদয় ভরে আশীর্বাদ করছি। আজ যা ভোজ খেলাম, সারা জীবনে তা' আর খাই নি।

কিছুক্ষণ পরেই মাধবের মনে যেন একটা শঙ্কা জাগলো। —বাবা, আমরাও তো একদিন না একদিন ওখানে যাব?

ঘিসু এই বোকার মত প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। পরলোকের চিন্তা এনে আজকের আনন্দে বাধা সৃষ্টি করতে তার ইচ্ছা ছিল না।

মাধব বললো,—সেখানে সে যখন জিজ্ঞাসা করবে, কফন দাও নি কেন; তখন তাকে কি বলবে?

—বলবো, তোমার মাথা!

—কিন্তু জিজ্ঞাসা তো করবে নিশ্চয়!

—তুই কেমন করে জানলি যে ওকে কফন দেওয়া হবে না? তুই কি আমাকে তেমনই গাধা পেয়েছিস? ষাট বৎসর কি পৃথিবীতে ঘাস কেটে বেড়িয়েছি? ওর কফন দেওয়া হবে; ভাল কফনই দেওয়া হবে।

মাধবের বিশ্বাস হলো না।—কে দেবে? তুমি তো টাকাগুলো চেটে মেরে দিয়েছ? সে তো আমাকেই জিজ্ঞাসা করবে? ওর সিঁথিতে আমিই সিঁদুর দিয়েছিলাম।

ঘিসু গরম হয়ে বললো,—আমি বলছি, কফন দেওয়া হবে। তুই কথা মানছিস না কেন?

—কে দেবে, বলছো না কেন?

—যারা এখন দিয়েছিল, তারাই আবার দেবে। তবে, টাকাটা এবার আর আমার হাতে আসবে না।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারার চমকও আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছিল। মধুশালার জলুস আরও জেঁকে উঠছিল। কেউ গান ধরেছে, কেউ লম্বা চওড়া বুলি ঝাড়ছে, কেউ বা সঙ্গীর গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ছে। আবার কেউ দোস্তের ঠোঁটে তুলে ধরছে মাটির পানপাত্রটি।

মধুশালার কক্ষ মাদকতার আমেজে থম থম করছে, বাতাসে নেশা ধরেছে। কতজন এসে এখানে এক চুমুকেই মেতে ওঠে। এখানের হাওয়াতে সরাবের চেয়ে বেশী নেশার তেজ। জীবনের বন্ধন তাদের এখানে টেনে আনে আর তারা এসে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যায়—বেঁচে আছে না মরে আছে কিম্বা বেঁচে নেই বা মরে নেই।

আর এখনও এইখানে বাপবেটা দুজনে বসে পানপাত্রে সুখে চুমুক দিয়ে চলেছিল। সকলের দৃষ্টি এদেরই দুজনের ওপর নিবন্ধ ছিল। কী ভাগ্যবলে বলীয়ান্ এরা দুজন! এখনও সামনে পুরো একটি বোতল।

পেটভরে খেয়ে নিয়ে মাধব বাকী এঁটো লুচিগুলোকে ঠোঙায় ভরে একটা ভিখিরীকে দিয়ে দিল। ভিখিরীটা ওর ক্ষুধার্ত চোখ দুটো নিয়ে নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। মাধব জীবনে এই প্রথমে অনুভব করলো দানের আনন্দ। সে আজ নিজেই দাতা।

ঘিসু ভিখিরীটাকে বললো,—নিয়ে যা, খুব খা আর আশীর্বাদ কর। যার রোজগারের দান খাচ্ছিস, সে আজ মরেছে। কিন্তু তোর আশীর্বাদ তার কাছে নিশ্চয় পৌঁছবে। মন ভরে আশীর্বাদ কর। এ বড় কঠিন রোজগারের, বড় মেহনতের পয়সা রে!

মাধব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো,—বাবা, ও বৈকুণ্ঠেই যাবে। বৈকুণ্ঠের রাণী হবে।

ঘিসু উঠে দাঁড়ালো। উল্লাসের লহরীমালার মধ্যে যেন গা ভাসিয়ে দিয়ে সে বলছে—হাঁ বেটা, ও বৈকুণ্ঠে যাবে। কাউকে কষ্ট দেয় নি, কারুর ক্ষতি করে নি। মরতে মরতেও আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাকে সে পূর্ণ করে দিয়ে গেছে। ও বৈকুণ্ঠে যাবে না তো যাবে কে? গরীবের ধন লুঠে ঐ পেটমোটারা যাবে? পেটমোটারা—যারা নিজের পাপ ধুতে গঙ্গাস্নান করে, মন্দিরে দেবতার মাথায় জল ঢালে।

দুজনের হৃদয়ের এই শ্রদ্ধালুতার রং হঠাৎ আবার বদলে গেল। নেশার রীতিই এই অস্থিরতা—তার ভাঁজে ভাঁজে দুঃখ আর নিরাশা সাজানো।

মাধব বললো,—কিন্তু বাবা, বেচারী জীবনে বড় দুঃখ ভুগে গেল। কত দুঃখে পুড়ে সে মরেছে।

দুচোখ হাতে ঢেকে মাধব চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

ঘিসু বুঝিয়ে বললো,—কাঁদিস কেন বেটা? খুশী হ, সে মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। জঞ্জালের বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়েছে। বড় ভাগ্যবতী ছিল। এত জল্‌দি মায়া-মোহের শিকল ভেঙে চলে গেল।

এইবার দুজনে দাঁড়ালো। শুরু হলো গান—

'ঠগিনী কেঁও নয়না ঝম্‌কাওয়ে'

—'ঠগিনী!'

যত নেশাড়ে তাকিয়ে আছে এদের দিকে স্থিরদৃষ্টি দিয়ে। আপন মনের উল্লাসে মত্ত হ'য়ে এরা বেপরোয়া গেয়ে চলেছে গান। এর পর সুরু হ'ল নাচ। দৌড়ে, লাফিয়ে নাচ চলেছে। কখনও মুসড়ে পড়ে, কখনও আছাড় খায়। অভিনয় ক'রে, আবার বাইজীর মত ঢং ক'রে হাবভাব দেখায়।

নেশায় বেহুঁস হ'য়ে সেখানেই তারা পড়ে যায়। *

*** মূল হিন্দী হইতে শ্রীসুবোধ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।**

শিল্প ও শ্রমিক

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

(২)

প্রথমে দশ পনের বিঘার প্রত্যেকটি কৃষিক্ষেত্রকে স্থানকালপাত্র হিসাবে পরিকল্পনা করিতে হইবে। কতখানি জমিতে শুপারী, কতখানিতে তামাক, কতখানিতে ধান, কতখানিতে সব্জি, কতখানিতে গরুর খাদ্য জন্মাইতে হইবে ইত্যাদি বিষয় প্রত্যেক জিলার কৃষিবিদ্যালয়ে সম্যক্‌ভাবে আলোচিত এবং নিরূপিত হইবে। যে সকল জমি চাষের উপযুক্ত কিন্তু খালি পড়িয়া আছে প্রথমে সেই সকল জমিতে এই প্রকারের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা যাইতে পারে। আগেই বলিয়াছি এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি খালি পড়িয়া আছে। পরস্পর সংলগ্ন এইপ্রকার কয়েকটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইলে সকল প্রকার যন্ত্রাদির সাহায্য পাওয়া ক্রমশ সুগম হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রাম্য সাধারণ চাষীও ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে—ইহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

আমার পরিকল্পিত কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্র চাষী ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে কয়েকটি করিয়া কৃষিক্ষেত্র খুলিবে। প্রয়োজন হয় অন্য চাষীর জমি ক্রয় করিয়াই খুলিবে। যাঁহারা প্রশ্ন করিবেন, এইরূপ করিলে যে সব চাষী জমি বিক্রয় করিবে তাহাদের উপায় কি হইবে, তাঁহাদের দূরদৃষ্টি নাই। বর্তমান অবস্থায় চাষীরা সকলেই একান্ত নিরুপায়, অসহায়। তাহাদের সকলের স্বার্থের জন্য, সমগ্র জাতির স্বার্থের জন্য, প্রত্যেক গ্রামে কয়েকজন চাষীকে, বিশেষত যে সব চাষী নিজের ক্ষমতায় চাষ করিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে এই সকল উন্নতধরণের কৃষিক্ষেত্রে মজুর হইতে হইবে। এই কথা শুনিয়া হতাশ হইবেন না। জমিবিহীন এই প্রকারের মজুর-কৃষক বাঙলা দেশে লক্ষ লক্ষ আছে। প্রায় প্রত্যেক চাষী-গৃহস্থের বাড়িতে এই প্রকারের কয়েকটি মজুর-চাষী আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রত্যেক গ্রামে এই প্রকারের দুই একটি কৃষিক্ষেত্র হইলে সকল চাষীরাই আত্মরক্ষার জন্য এইপ্রকারের কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে বিশেষ অবহিত হইবে। তাহাদের ছেলেরাই ক্রমে ক্রমে এই সব কৃষিবিদ্যালয়ে দলে দলে ভর্তি হইবে; বর্তমানে সখের ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িবার মত সৌখীনভাবে পড়িবে না, আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। যাঁহারা গ্রামের কথা জানেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বর্তমানে বড় বড় চাষী-গৃহস্থের ছেলেরা ইংরেজী স্কুলে পড়িয়া বাবু হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেকের উচিত এই সুযোগে একশ্রেণী দৃঢ় শক্তিশালী কৃষিকর্মী সৃষ্টি করা, একটি নয়, দুইটি নয়, লক্ষ লক্ষ কৃষিকর্মী। ইহারা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সমগ্র জাতির প্রাণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহারা প্রত্যেকে এমন শক্তিসম্পন্ন হইবে যে, ইহারা সমগ্র জাতিকে বহন করিতে সমর্থ হইবে। আজ কোনও শত্রুর আঘাতে কলিকাতা প্রমুখ কয়েকটি শহর এবং শহরতলীতে অবস্থিত কলকারখানা ধ্বংস হইলে সমগ্র দেশের অস্তিত্ব লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমরা চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি যে, জাপান সমস্ত বড় বড় শহর, রেল লাইন এবং রাস্তাঘাট ধ্বংস করা কিংবা দখল করা সত্ত্বেও চীন এখন পর্যন্ত শত্রুকে বাধা দিতে সক্ষম। ইহার একমাত্র কারণ চীন দেশের অভ্যন্তর অর্থাৎ পল্লীসমাজ এখনও সমগ্র জাতিকে বহন করিতে সমর্থ। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমাদের দেশেও পল্লীসমাজকে দৃঢ় করা আমাদের উচিত। বাঙলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস চিন্তা করিলেও আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিবেন। সামান্য প্রতাপ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁও এই পল্লীসমাজের সাহায্যেই দুর্ধর্ষ মুঘল ও রাজপুত সৈন্যকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সকল বিষয়েই সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত নয়। অনির্দিষ্টকাল আশায় আশায় বসিয়া থাকিলে লাভ হইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু সময় যে চলিয়া যাইবে এই বিষয়ে ভুল নাই।

আমি হিন্দু, কাজেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে এবং সেই স্বার্থ যদি জাতীয় স্বার্থের বিরোধী না হয়, তবে সেই স্বার্থ সম্বন্ধে দুইচার কথা বলিতে বাধা। আজকাল বাঙলা দেশে যেইরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে ভদ্রঘরের হিন্দুর ছেলের পক্ষে সরকারী চাকুরি পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক যে এখনও বাঙলার অন্যান্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কৃষ্টিগত গুণে অতিশয় উচ্চে এই কথা ঢাক পিটাইয়া লোককে শুনাইবার প্রয়োজন নাই। সুবুদ্ধি সম্পন্ন এই জাতীয় লোকদের চাকুরি স্পৃহাকে দুর্বুদ্ধিই বলিতে হয়। বরং বলিব যে বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের সর্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক এই চাকুরি। যাঁহারা বিদেশের কিছু খবর রাখেন তাঁহারাই বলিতে পারিবেন যে সেই সব দেশের যে কোনও কৃতী ছাত্র সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করা হেয় বলিয়াই মনে করে। যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহারা খবরের কাগজ পড়িলেই দেখিতে পাইবেন যে ভারতীয় আই সি এস-এর মত লোভনীয় চাকুরিতেও যোগদান করিতে ছাত্রদিগকে বক্তৃতা দিয়া প্ররোচনা দিতে হয়। বৃটিশের মত সর্বপ্রকারে উন্নত জাতির যুবকরা সরকারী চাকুরি সম্বন্ধে উদাসীন; কিন্তু আমরা সেই চাকুরিকে লোভনীয় মনে করি; শুধু তাই নয়, চাকুরিকে আমরা মর্যাদার মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করি। ইহাকেই মহাত্মা গান্ধী বলেন ক্রীতদাসের মনোবৃত্তি। জন্তু জানোয়ারও খাঁচায় আবদ্ধ হইলে ছট্‌ফট্‌ করে, কিন্তু আমরা খাঁচার বাহিরে থাকিলেই ছট্‌ফট্‌ করি। ইহাকে ইংরেজী শিক্ষার কুফল বলিয়া এককথায় উড়াইয়া দেওয়াও অর্বাচীনতার পরিচায়ক। ইংরেজী পুস্তকে ইংরেজের দেশের খবরাখবর লইতে নিষেধ করিয়া মাথার দিব্য দেওয়া হয় নাই। পাটিগণিত কিংবা ভূগোল কিংবা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনও পুস্তকেও এইরূপ নিষেধ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিতে বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু আসল পার্থক্য এই যে এই দুই স্থানের ছাত্রেরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ মনোবৃত্তি লইয়া অধ্যয়ন করিতে আসে।

বাঙালীর জাতীয় জীবনের ভিত্তি কৃষি। সেই ভিত্তির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী উদ্দেশ্যবিহীন নিঃসহায়ের মত হাহাকার করে। ইহা মর্মন্তুদ দৃশ্য। ইহাদিগকে পুনরায় সেই কৃষিতে ফিরাইয়া নিতে হইবে কিন্তু একবেলা শাকান্ন খাইয়া জীবন ধারণ করে এই রকম চাষী নহে, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের সর্বপ্রধান ভাণ্ডারী সুস্থ সবল চাষী, সৌন্দর্যজ্ঞানে জ্ঞানী এবং সমগ্র জাতির ভারবহন করিতে সমর্থ চাষী; ভারবাহী নয়, সমগ্র জাতির পালয়িতা ও মেরুদণ্ডস্বরূপে শক্তিমান পুরুষ। সমগ্র ভোজ্যের অধিকারী সে। চাষী বলিয়া উপেক্ষার পাত্র সে নহে। সহস্র সহস্র এই প্রকারের মালিক চাষী সৃষ্টি করিতে হইবে। সহস্র সহস্র বেকার হিন্দু যুবক চোখের সামনেই আছে। বাঙালী হিন্দু কি এতই নিঃস্ব যে প্রত্যেক জিলাতে দুই একশত বিঘা জমি এবং সাধারণ ঘরবাড়ী করিবার মত টাকা দিতে পারে না? এই রকম জমিতে দশবিশজন ছাত্রকে হাতে কলমে চাষ শিক্ষা দেওয়া যায়। আমি জোর করিয়াই বলিতেছি—বিনা পয়সায় দেওয়া যায়। আপনারা হিসাব করিয়া দেখুন।

(শেষাংশ ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিয়ের কনে

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

যেসব মেয়ে আমাদের গৃহস্থঘরেই চলাফেরা করে—বিশেষ কোনও সময়ে তারাই হয় বিয়ের কনে। অর্থাৎ "বিয়ের কনে" বলে আলাদা কোনও জীব নেই। অথচ যখন রাস্তা দিয়ে কোনও শোভাযাত্রা বেরিয়ে যায়, তখন নব-বধূ দেখবার জন্যে আমাদের কৌতুহলের অবধি নেই! তার কারণ, নব-বধূর নিজস্ব একটা রূপ আছে। আমাদের বাড়ির পাশে খেঁদী কি বুচি যারা আছে, তারাই যখন বিয়ের কনে হয়, তখন তাদের রূপ যায় অন্যরকম হয়ে। তাদের বাইরের সাজসজ্জা আর অন্তরের কল্পনা এই দুটোর ছবি একসঙ্গে ফুটে ওঠে তাদের মুখে।

আমাদের দেশে কনে দেখার পালা সাঙ্গ হলে হয় পাত্রী আশীর্বাদ, তারপর বিবাহ। বিবাহে সুসজ্জিতা এবং সালঙ্করা কন্যা দান করবার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুদের মধ্যে নব-বধূর সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার প্রথা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। এর ঐতিহাসিক কারণ যাই থাক্, বর্তমানে শাঁখা-সিঁদুর এয়োস্ত্রীর অপরিত্যাজ্য শুভ-লক্ষণ। বিয়ের পর যখন কনে সর্বপ্রথম পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেয় তখন সেখানে হয় এক করুণ দৃশ্য! বনবাসী স্বয়ং কণ্ব মুনিরও সে দৃশ্যে

ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডাদের নববধূ—বরের মাথায় কাপড় জড়ানো, নববধূ কোলে উঠিয়াছে

কণ্ঠরোধ হয়েছে এবং তাঁর চক্ষু হয়েছে বাষ্পাকুল। স্বামীগৃহে শুভলগ্নে এই কন্যাকে বরণ ক'রে তাকে শুভ-আহ্বান জানান হয়। তারপর এই গৃহলক্ষ্মীকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপ "স্ত্রী-আচার" ক'রে ঘরে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শ্বশুরবাড়ির লোকের, বিশেষত ননদের কথাগুলো "বাক্য-বাণ" না মনে ক'রে নববধূ যাতে "মধুর মত" শোনে এইজন্য কোন কোন স্থলে তার কানে মধু দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কোথায়ও কোথায়ও নব বধূর হাতে মাছের খালুই দেওয়া হয়। খালুইতে থাকে রয়না কি কাতলা মাছ। চ্যাং মাছ কি চেতল মাছ থাকে না তার কারণ এই মাছগুলির বড় বেশী প্রতাপ। নব বধূ যাতে প্রতাপবতী না হয় সেদিকে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি।

আমাদের সমাজে পূর্বে অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থা ছিল; কাজেই তখনকার যেসব রীতি তা যে আজও চলবে এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—নব বধূকে কোলে করে ঘরে নেওয়ার প্রথা ছিল আগে। তাই বলে এখনকার নব বধূকে কোলে করে ঘরে নিতে যাওয়া খুব নিরাপদ হবে বলে মনে হয় না। সাজসজ্জার দিক থেকেও ও বিচার আসে।

নরওয়ে কৃষক নববধূ

হাঙ্গেরী দেশীয় নববধূ

অষ্টমবর্ষীয়া একজন নব বধূ পায়ে তোড়া দিয়ে এবং নাকে নোলক দিয়ে ডুরে কাপড় পরে ঘরের মধ্যে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়ালে বোধ হয় মন্দ লাগে না। তাই বলে এখনকার নব বধূকে তোড়া পরিয়ে, নাকে নোলক দিয়ে এবং একহাত ঘোমটা দিয়ে সভার মাঝে আনলে সভাস্থ লোকেই লজ্জা পাবে বেশী।

অবশ্য সব জাতির বিবাহ প্রথা এক না হলেও বিয়ের কনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। কোন কোন জাতির মধ্যে দস্তুর মত যুদ্ধ ক'রে তবে মেয়ে আনতে হয়। সভ্যদের মধ্যে শারীরিক বলের বা নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিয়ে কন্যা গ্রহণ করার প্রথা ছিল আগে। এখন অবশ্য সুসভ্যেরা টাকার জোরেই বিয়ে করেন বেশীর ভাগ।

প্রাচীন যুগের গ্রীকদেশীয় কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নব বধূর মৃণালসহ পদ্ম, শস্যের শিষ প্রভৃতি ধারণ করবার প্রথা ছিল। প্রাচীন ইহুদের সুবর্ণখচিত মুকুট পরাত নব বধূকে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী নব বধূ কপালের উপর পরত সাদা ফুলের অথবা মুক্তার মুকুট, কাঁধের উপর দিয়ে কুঞ্চিত চিকুর পড়ত আলুলায়িত হ'য়ে।

আধুনিক কালেও আমেরিকায় ঘোমটা পরতে হয় নব বধূকে। অবশ্য সে ঘোমটা এতই পাতলা এবং সেটাকে দেহের দুই পাশ দিয়ে এমন সুসজ্জিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে,

তাতে দেহের সৌন্দর্য বেশী করে ফুটে ওঠে। চীনে হরিদ্রা রংয়ের ঘোমটা প্রচলিত। তিব্বতের মেয়েরা শুনেছি "লক্ষ্মীকে" আটকে রাখবার জন্যে কোনও জন্মে মুখে জল দেয় না!

আধুনিক নরওয়ে বধূ আমেরিকার পদানুসরণ করেনি বলতে হবে। বিয়ের দিন নরওয়ে দেশের নব বধূ খুব জমকালো রকম সোনারূপার গহনা পরে। তবে মাথার মুকুটে আমাদের দুর্গা ঠাকুরকেও হারিয়ে দেয় এই হাঙ্গেরী দেশীয় নব বধূ!

ফিলিপাইন দ্বীপের নব বধূ পরে পাথরের মালা। তার মাথায় থাকে মুকুট। মালয় বধূর পোষাক আবার এদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আফ্রিকার নব বধূ পরে হাড়ের মালা, হাতেও পরে হাড়ের চুড়ী। প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করে তবে এই নব বধূ লাভ করতে হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হলে কিন্তু মৃত্যু।

অবশ্য অর্ধেক রাজ্য এবং রাজকন্যার লোভে আগেকার দিনে অনেকেই প্রাণ দিয়েছে। প্রায় সব দেশের প্রাচীন ইতিহাসেই স্ত্রীরত্নলাভের কত রকম সব রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে। হয় রাজকন্যা লাভ, না হয় মৃত্যু! বীর পুরুষেরা মৃত্যুকে বরণ করেছে, তবু রাজকন্যার লোভ ছাড়েনি। প্রচলিত কথাই ছিল তখন—"Only the brave can deserve the fair."

মালয় দ্বীপের নববধূ

অসভ্য জাতিদের মধ্যে এখনও এই ধরণের অনেক রকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। এক জাতির মধ্যে নিয়ম এই, কোনও রকমে কোনও মেয়ের কপালে একটা ফোঁটা দিয়ে দিতে পারলেই ব্যস্। কিন্তু এই ফোঁটা দেওয়া বড়ই বিপজ্জনক—অথচ ফোঁটা না দিলে বিয়েও করা যাবে না তাকে!

পার্বত্য চট্টগ্রামের "মুরং" জাতির মধ্যে আবার একটা কু-প্রথা প্রচলিত আছে। যদি কোনও মেয়ে বিবাহের পূর্বে সন্তানের মা হয় তাহলে সমাজে তার মান খুব বেশী। এইরূপ ছেলেকে তারা বলে "আল্লা পোয়া" অর্থাৎ ভগবানের পুত্র। এই শ্রেণীর মেয়েকে বিয়ে করাটা সমাজে মস্ত একটি শ্লাঘার বিষয়।

সাঁওতালদের মধ্যেও বিয়ের আগে কোনও কুমারী চরিত্র ভ্রষ্ট হলে সমাজে সেটা খুব দূষণীয় নয়; কিন্তু বিয়ের পর এরা চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকে। গ্রাম্য ঘটকেই এদের ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করে। তারপর কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে বা মেলায় ঐ ছেলেমেয়েদের পরস্পর মিশবার সুযোগ দেওয়া হয়। উভয়ের মত হলে বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। নিমন্ত্রণ পত্রটা অবশ্য আমাদের মত "স্মারক লিপি" সহ রঙিন কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয় না—তারই আদিম-সংস্করণ কতকগুলি রঙিন সুতো দেওয়া হয় ওদের প্রতিবেশীদের। যে কয়গাছি সুতো, বুঝতে হবে সেই কয়দিন পরে বিয়ে। নির্দিষ্ট দিনে বরের দল যোদ্ধৃবেশে প্রবেশ করে মেয়ের গ্রামে। তারপর গায়ে হলুদ এবং অবশেষে বর মেয়ের কপালে দিয়ে দেয় সিঁদুরের ফোঁটা।

আমাদের দেশে পূর্বে বুনোদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কনেকে তুলে দেওয়া হ'ত কোনও ঘরের মটকার উপর। সেখান থেকে সে ব'লত, "ম'লাম গো—আমি ম'লাম গো!" তখন বর নীচে থেকে ব'লত,—"ম'রো না, ম'রো না—আমি তোমায় কোদালী করে খেটে এনে খাওয়াব" খুব জোরে জোরে তখন মাদল বেজে উঠত—তারপর হ'ত তাদের বিয়ে। কিন্তু মলাম গো, মলাম গো বললে যদি কেউ তার জন্যে এগিয়ে না আসত, তবে সে মেয়ে অচল বলে সমাজে পড়ে থাকত। মেয়েটি মটকায় উঠে "মলাম গো, মলাম গো" বলছে, অথচ কেউ তার হ'য়ে উত্তর দিচ্ছে না, তখন তার কি লজ্জা একবার ভেবে দেখুন!

আফ্রিকার নববধূ

লজ্জা যে সময় সময় আমাদের বোনেরাও কিছু কম পান, তা বলতে পারি নে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র অনেক যায়গায় সে ব্যাপার দেখিয়েছেন। এই বিয়ের প্রসঙ্গেও বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে বোধ হয় একটা পার্থক্য টানা যায়। বঙ্কিম এখানে কবি। ঘোমটার ফাঁকে তাঁর নব-পরিণীতার রূপ প্রেম-নিবিড়। তার ভিতর কখনও আছে তেজস্বিনী প্রতিভা। যেখানে ঘোমটার বালাই নেই, সেখানে আছে শকুন্তলার মত বন-তোষিণী সরলতা। রবীন্দ্রনাথ এখানে কবি, দার্শনিক দুই-ই। তাঁর মিনি আস্তে আস্তে বড় হয়ে যখন বিয়ের কনে হল, তখন তার পরনে লাল চেলী—সেদিন তার অপূর্ব শ্রী। কিন্তু এইখানে কবি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন!—সে মিনিকে বুঝি আর পাওয়া গেল না—মন খুলে রহমতের সঙ্গে

সে আর কথা বলতে পারে না, সে প্রগলভতাও তার আর নেই। বিয়ের পর তাঁর "কুসুম"কে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে তার আবাল্য সাথী গন্ধা নেই,—সেখানে কারা সব নূতন লোক, নূতন ঘর-বাড়ি, নূতন পথঘাট,—জলের পদ্মটিকে যেন ডাঙগায় রোপণ করতে নিয়ে গেল!

শরৎচন্দ্র এখানে তীব্র এবং নিখুঁত সমালোচক। সমাজের জীর্ণ রীতির উপর, কন্যাদায়গ্রস্থ পরিবারের উপর এবং সর্বশেষে অনূঢ়া রয়স্থা কন্যার মন এবং সমাজগন্ডীর পচা অনুশাসনের উপর তাঁর তীব্র খোঁচা!

বিয়ের কনের প্রাচীন ও আধুনিক রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা এই সংক্ষিপ্ত স্থানে সম্ভব নয়। কবি কালিদাস নব বধূ সীতার বর্ণনা করেছেন আবার পার্বতীরও বর্ণনা করেছেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক।

আগেকার দিনে একই পাত্রের সঙ্গে একাধিক কন্যার (সহোদরা ভগিনীর) বিবাহ দেওয়ার রীতি দেখতে পাওয়া যায়। এখন বিয়ের কনের আনুসঙ্গিক পণ বা তত্ত্বপ্রথা যতই খারাপ হ'ক—একই ছেলের সঙ্গে দুই তিনটি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত ঔদাসীন্য আধুনিক কোন বাপ মায়েরই নেই—অথবা কোন ছেলেই এখন দুই তিনটি মেয়ে একসঙ্গে বিয়ে করবার মত ধৃষ্টতা পোষণ করে না।

"বিয়ের কনে" প্রসঙ্গে পণ-প্রথার কথাটাও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই পণ-প্রথার জন্য বাঙলার অনেক পিতাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। এই দেশের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে আবার উল্টো ব্যবস্থা। এই শ্রেণীতে পুরুষেরা বিয়ের টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে হয় নির্বংশ!

শীতলপাটি যারা তৈরী করে চলতি কথায় তাদের "পাত্তে" বলে। এই পাত্তেদের বিয়ের কনে সম্বন্ধে নিয়ম আছে শুনেছি যে, মেয়ে পাটি বুনবার যত রকম "যো" জানবে (মনে রাখতে হবে শীতলপাটির সরঞ্জাম তৈরী করে দেয় পুরুষেরা কিন্তু পাটি মেয়েরাই বোনে) তার দাম হবে তত কুড়ি টাকা বিয়ের সময়। ব্যবস্থাটি খুব ভাল বলে মনে হয়। আমাদের সমাজেও যারা গুণী মেয়ে তাদের জন্য বরপণ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কার্যত তার বিপরীতই ঘটে! যে মেয়ে বেশী লেখাপড়া শিখেছে তার বিয়ের জন্য মাতাপিতাকে যেন বেশী করেই চিন্তাকুল হতে হয়!

অবশ্য বরপক্ষীয়রাও পক্ষান্তরে বলতে পারেন, "গুণী" ছেলের জন্যে তাহলে একটা বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা কি হল?—কথাটা সত্যি। "কিঞ্চিৎ লিখিতং বিবাহেরি কারণম্" বলে একটা কথা আছেও বটে; কিন্তু দেখতে হবে, সে পুরস্কারটা কি একমাত্র মেয়ের পিতাই দিবার জন্য দায়ী?

শিল্প ও শ্রমিক

(১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু উপরে লিখিত সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে যদি আমাদের দেশের উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন করা না হয়। হিন্দুর আইন মতে পিতার মৃত্যুর পর প্রত্যেক পুত্র একভাগ করিয়া পায়, মুসলমানের আইন অনুসারে প্রত্যেক কন্যাও ভাগ বসাইতে পারে। এই অবস্থায় যে-কোনও মালিকের কৃষি সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পর কয়েক ভাগে ভাগ হইয়া যাইতে বাধ্য। ক্রমশ এই প্রকার হইয়া দাঁড়ায় যে, একজন কৃষকের পঞ্চাশ জায়গায় ছিটে-ফোঁটা করিয়া কিছু কিছু সম্পত্তি হয়। এই রকম ছিটেফোঁটা জমিতে কোনও নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে কৃষির পরিকল্পনা করা দুষ্কর, অধিকন্তু চাষীর মৃত্যু হইলেই পুনরায় ভাগ হইবে এবং আবার নূতন করিয়া পরিকল্পনা করিতে হইবে। ইহা দুঃসাধ্য, এমন কি অসম্ভব। সুতরাং সর্বাগ্রে উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করিতে হইবে যাহাতে ভূসম্পত্তি অটুট থাকিতে পারে।

যদি কোনও মালিক একের অধিক কৃষিক্ষেত্র অধিকারে আনিতে পারে তাহা হইলে বরং এমনভাবে তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিতে পারিবে যাহাতে এক একটি কৃষিক্ষেত্র সম্পূর্ণ অটুট থাকিতে পারে। কৃষিক্ষেত্র আমি তাকেই বলি যে জমির পরিমাণ দশ কি পনের বিঘা এবং যাহাতে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়। পৈতৃক জমি ভাগাভাগি করিয়া ছিন্নভিন্ন করার ব্যবস্থা যতদিন থাকিবে ততদিন উন্নতধরণের কৃষিও অসম্ভব, কৃষক সৃষ্টি করাও অসম্ভব। এমন কোনও কর্ম-ধারা আবিষ্কার করা অসম্ভব যাহার গুণে যখন তখন যেমন তেমন ভাগ হওয়া সত্ত্বেও ফলাফলের পরিবর্তন হইবে না। চিত্রগুপ্তের কাছ হইতে কে কতদিন বাঁচিবে, কাহার কয়টি ছেলে মেয়ে হইবে এই সংবাদ পূর্ব হইতে আনিতে পারিলে অঙ্কের মাস্টার হয়ত বা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতেন।
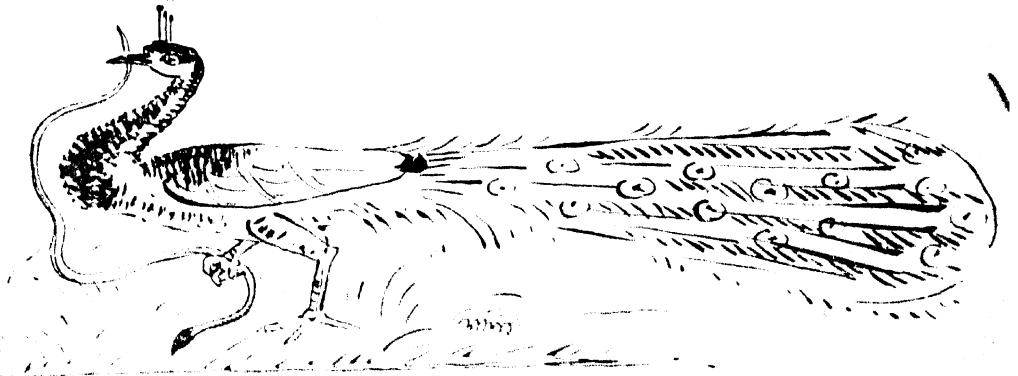
১৬

কয়েকদিন হইতে শীতটা খুব প্রবলভাবে পড়িয়াছিল। সুলেখার শয্যার প্রান্তভাগে পা গুটাইয়া বসিয়া র‍্যাগ্‌খানা টানিয়া লইয়া দেহের নিম্নার্ধ আবৃত করিয়া অবনীশ বলিল, "আঃ, বাঁচা গেল! আরাম আর আনন্দ—দুই-ই প্রচুর পরিমাণে বোধ করছি।"

অবনীশের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তখানা নিজের হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া সুলেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বেশ করছ। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে তুমি এখানে?"

অবনীশ বলিল, "যতক্ষণ না তুমি ছেড়ে দিচ্ছ।"

"ধর, যদি এক্ষণি ছেড়ে দিই? যদি এই মুহূর্তে যেতে বলি?"

অবনীশ বলিল, "তা হ'লে কিন্তু বিদ্রোহী হ'য়ে তোমার আদেশ অমান্য করব।"

"তার মানে?"

"তার মানে, সমস্ত রাত্রি তোমার ঘরে অতিবাহিত ক'রে সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে ভৈরব রাগের লগ্নে তোমাকে ছেড়ে যাব।"

শুনিয়া সুলেখার মুখমণ্ডলে সুগভীর উদ্বেগ দেখা দিল; বলিল, "যা দুঃসাহস তোমার, তুমি সব পার! না, না,—লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়োনা। কেউ দেখে ফেললে কি বিশ্রী হবে বল দেখি? যা তোমার বলবার আছে তাড়াতাড়ি ব'লে আস্তে আস্তে নেমে যাও।"

মুহূর্তকাল কপট বিমূঢ়তার ভঙ্গীতে সুলেখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "এই এগারটা রাত্রে?—এই বেহাগ রাগিণীর লগ্নে?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "হ্যাঁ, এই বেহাগ রাগিণীর লগ্নে।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। অন্তত সোহিনী রাগিণীর লগ্ন উপস্থিত না হ'লে, কক্ষ তোমার পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে সুলেখা বলিল, "সে কতক্ষণে হবে?"

অবনীশ বলিল, "তা খুব বেশী দেরি হবে না; রাত্রি সাড়ে তিনটের কাছ বরাবর।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "না, তা কিছুতেই হতে পারে না! জামাইবাবুর অত্যন্ত সকালে ওঠা অভ্যেস। রোজ শেষ রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই চটি জুতো পায়ে দিয়ে খস্‌খস্‌ ক'রে বারান্দায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।"

অবনীশ বলিল, "লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে তুমি মনে কর সেটা শেষ রাত্রি;—কিন্তু যে ভদ্রলোক চটি জুতো পায়ে দিয়ে খস্‌খস্‌ ক'রে বারান্দায় বেড়িয়ে বেড়ান, তিনি জানেন সেটা প্রত্যূষ সাড়ে ছটা। আমি ত তার অনেক আগে, রাত্রি সাড়ে তিনটেতেই, উধাও হব।"

ব্যগ্র কণ্ঠে সুলেখা বলিল, "ওগো, নাগো, না! তোমার ঘুম ভাঙবে না,—শেষকালে সাড়ে তিনটের জায়গায় সাড়ে ছটাই হয়ে যাবে। তখন লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। আমার কথা শোন। যা তোমার বলবার আছে মিনিট দশেকের মধ্যে শেষ ক'রে ভালয় ভালয় স'রে পড়; নইলে "গৌরহরিবাবু আমার ঘরে ঢুকেছে" ব'লে এমন আমি চীৎকার করব যে, বাড়ির সমস্ত লোক জেগে উঠে এখানে ছুটে আসবে। তখন, হয় তোমার অভিনয়ের একেবারে যবনিকা পাত করতে হবে; নয় তা এমন একটা গুরুতর র‍্যাঁক নেবে যার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালান ভিন্ন আর তোমার অন্য উপায় থাকবে না।"

"তা হ'লে আমার অভিনয় গুরুতর র‍্যাঁকই নিক, যেহেতু অভিনয়ের ভবিষ্যৎ বিস্তারের জন্যে কাল শেষ রাত্রে আমাদের দুজনকে এ বাড়ি ছেড়ে পালাতেই হবে।" বলিয়া অবনীশ র‍্যাগটা আকণ্ঠ টানিয়া লইয়া শয্যার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

"আরে, শুয়ে পড়লে কেন? ওঠ, ওঠ! উঠে ব'স।" বলিয়া সুলেখা ব্যস্ত হইয়া অবনীশকে ঠেলিতে লাগিল।

তড়াক করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া অবনীশ বলিল, "কি বিপদ! শুয়েছিলাম একটু আরাম ক'রে ঘুমিয়ে নোব বলে।"

"কি যে বল তার ঠিক নেই। এখানে তোমার কিছুতেই ঘুমানো হবে না। শোন। কাল শেষ রাত্রে আমাদের দুজনকে এ বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে, বলছ কেন, তা বল।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "নাঃ! তোমাকে দেখছি অভিনয় একেবারে পেয়ে বসেছে সুলেখা! ওগো, আপাতত তুমি একেবারে ভুলে যাও যে, আমি তোমার ভগ্নীপতির ড্রাইভার গৌরহরি বসু, আর তুমি আমার মনিবের শ্যালিকা সুলেখা দেবী। মনের মধ্যে বেশ করে শুধু এই ভাবটা জাগিয়ে তোল যে, আমি তোমার স্বামী অবনীশ, আর তুমি আমার স্ত্রী সুলেখা।"

সুলেখা বলিল, "আচ্ছা, সে কথা পরে ভেবে দেখা যাবে, তার আগে আমার কথার উত্তর দাও। দুজনে পালাব বলছ কেন? পালাবে ত' তুমি। তারপর দাদার আসবার দিন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সকলের সাক্ষাতে রহস্যভেদ হবে।"

অবনীশ বলিল, "সে-সব ব্যবস্থা একেবারে বদলে গেছে। আমাদের আগেকার প্লটের পিছনে বিনয় একটা সম্পূর্ণ নূতন

অধ্যায় যোগ করেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা বললাম না তোমাকে, অভিনয়ে তোমার আর আমার অংশ শেষ হ'য়ে এসেছে?"

সুলেখা বলিল, "শেষ হয়ে এসেছে সে খুবই সুখের কথা,—কিন্তু আমি কিছুতেই এ বাড়ি ছেড়ে পালাব না, তা তোমাকে বলে দিলাম।"

অবনীশ বলিল, "এ বাড়িতে থাকলে কিন্তু তোমাকে একটা অতিশয় কঠিন আর নতুন অভিনয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, যার জন্যে তোমার একটু বিশেষভাবে মহড়া দেওয়ার দরকার।"

"কিসের মহড়া?"

"তোমার দাদার সঙ্গে যে জাল অবনীশ আসছে, তার সঙ্গে যে চালে তোমাকে চলতে হবে, যে ভাবে তোমার কথাবার্তা কইতে হবে, তার মহড়া।"

চকিত হইয়া বিস্মিত কণ্ঠে সুলেখা বলিল, "দাদার সঙ্গে ত' মোগলসরাই থেকে একত্র হয়ে তুমিই আসবে।"

অবনীশ বলিল, "বললাম ত' সে-সব ব্যবস্থা বদলে গেছে। দাদার সঙ্গে জাল অবনীশ হ'য়ে আসচে বিনয়ের এক বন্ধুর ছোট ভাই সুবিমল ঘোষ, কলকাতায় কোন্ কলেজে ফিজিক্সের প্রোফেসার।"

অবনীশের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ রুক্ষ কণ্ঠে সুলেখা বলিল, "আচ্ছা, সেই অজানা অচেনা লোকটাকে তোমার জায়গায় দাঁড় করিয়ে আমাকে তার সঙ্গে অভিনয় করতে বলছ তুমি? এ কথা বলতে তোমার মুখে একটুও বাধল না?"

মৃদু হাসিয়া অবনীশ বলিল, "আমি ত' সে কথা বলছিনে সুলেখা, আমি ত' তোমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাবার কথাই বলছি।"

সুতীব্র উষ্মার সহিত সুলেখা বলিল, "সে কদর্য কাজও বরং করব, কিন্তু সে লোকটার সঙ্গে অভিনয় করা ত দূরের কথা, তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না!"

স্মিতমুখে অবনীশ বলিল, "সে বেচারার অপরাধ কি সুলেখা?—তোমার দাদাই হয় ত' অনেক কষ্টে এ কাজে তাকে রাজি করিয়েছেন।"

সুলেখা বলিল, "কি জানি কেন, তবু তার ওপর আমার ভারি রাগ হচ্ছে।" তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, যথেষ্ট ত' হয়েছে, এ প্রহসনের এখানেই শেষ কর না।"

অবনীশ বলিল, "আমার তাতে বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল না; কিন্তু বিনয় বলে, এখানে শেষ করলে শুধু ফুল ফুটিয়েই শেষ করা হবে, ফল ফলানো আর হবে না। যে ব্যবস্থা সে করেছে তাতে শেষ পর্যন্ত এ থেকে সে একটি বিশেষ রকম সুফল প্রত্যাশা করে।"

"কি সুফল?"

"সেটা ফলেন পরিচীয়তে। আগে থাক্‌তে ব'লে তোমার কৌতূহল নষ্ট করতে চাইনে।"

এ কথা শুনিয়া সুলেখার কৌতূহল চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল; বলিল, "দলের লোকের কাছে তুমি কথা লুকোতে চাও? কালই দিদিকে সব কথা ব'লে দিয়ে তোমাদের প্ল্যান্ পণ্ড করছি!"

ব্যগ্রকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "সর্বনাশ! ও কার্যটি কোরো না! ভাল ক'রে উঠে বোসো, সব বলছি।"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সুলেখা দুই পায়ের উপর লেপ টানিয়া লইল; তাহার পর অবনীশের প্রতি বক্র কটাক্ষে একবার চাহিয়া দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বল।"

তখন অবনীশ সবিস্তারে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। নবর্বর্ধিত উপসংহারের কাহিনী ভাগ বিবৃত করিয়া অভিনয়ের মধ্যে সুলেখার যেটুকু অংশ তখনও বাকি ছিল তদ্বিষয়ে সে সুলেখাকে পরিপূর্ণভাবে উপদেশ প্রদান করিল।

সমস্ত শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মনে মনে কি চিন্তা করিয়া সুলেখা বলিল, "দেখ, মুস্কিল হয়েছে এই যে, এর মধ্যে দাদা রয়েছেন, বিনয়বাবু রয়েছেন; তাই নিজের মনে হঠাৎ একটা গোলযোগও কিছু করতে পারছিনে। তা নইলে কখনও আমি তোমার এ কথায় রাজি হতাম না। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমি চ'লে গেলে এ বাড়ির অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ দেখি। কত প্রচণ্ড আঘাত দিদি আর জামাইবাবু পাবেন! চাকর-চাকরাণী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাঁরা মুখ দেখাতে পারবেন না। চাকরেরা নিজেদের মধ্যে আমাদের কথা ব'লে হাসাহাসি করবে, কুৎসা রটাবে।"

অবনীশ বলিল, "কিন্তু সে ত' মাত্র চার-পাঁচ দিনের জন্যে সুলেখা। তারপর সকলে যখন প্রকৃত কথা জানতে পারবে তখন ত' আর কোন গ্লানি থাকবে না। তখন আঘাত আনন্দের রূপে পরিবর্তিত হবে।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সুলেখা বলিল, "কিন্তু একটা আশার কথা এই যে, এতটা বাড়াবাড়ি টেঁকবে ব'লে মনে হয় না; এবার তোমার ড্রাইভারের খোলস খুব সম্ভব তু খসে পড়বে। সুলেখা যার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারলে সে যে সত্যিসত্যিই গৌরহরি ড্রাইভার, তুমি নও,—এ কথা বিশ্বাস করা অন্ততঃ দিদির পক্ষে খুব কঠিন হবে।"

অবনীশ বলিল, "ধরা পড়বার একটা আশঙ্কা যে নেই সে কথা আমি বলিনে, কিন্তু ধরা না পড়বার সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশী। যাবার সময়ে তুমি যে চিঠিখানা লিখে রেখে যাবে তার মুন্সিয়ানার ওপর এ ব্যাপারটা অনেক পরিমাণে নির্ভর করবে। তাছাড়া, আজ আবার যে নতুন ধুলো চোখে পড়ল তা দুজনের দৃষ্টিশক্তিকে আরও খানিকটা ঝাপসা ক'রে রাখতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই।"

সকৌতূহলে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "কি নতুন ধুলো?"

"কেন, তোমার বাবার চিঠি, যা আজ সকালে তোমার জামাইবাবুর নামে এসেছে।"

সবিস্ময়ে সুলেখা বলিল, "সে চিঠির কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে?"

সুলেখার কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া অবনীশ বলিল, "আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক কলের মত নিপুণভাবে চলছে

সুলেখা। আজ তোমার দাদার চিঠিতে সে কথা আমরা জানতে পেরেছি।"

"বাবাও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন না কি?"

অবনীশ হাসিয়া বলিল, "না, এটুকু তোমার দাদার কারসাজি। শ্বশুরমশায় কয়েকখানা চিঠি লিখছিলেন, সেই সময়ে তোমার দাদা একখানা পোষ্টকার্ড তাঁকে দিয়ে এই খবরটা এলাহাবাদে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তোমার বাবাও সরল বিশ্বাসে যেন নিজের পক্ষ থেকেই খবরটা এখানে দিয়েছেন। শ্বশুর মশায়ের মত লোকের দ্বারা "সার্টিফায়েড" হয়ে খবরটা এখানে এসে আমাদের পক্ষে খুব কার্যকরী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।"

ক্ষণকাল দুইজনেই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মৌন ভঙ্গ করিল সুলেখা; বলিল, "তুমি যে আজ রাত্রে আমার ঘরে এসেছ, তা জামাইবাবুদের জানাবে কি ক'রে?"

অবনীশ বলিল, "যাবার সময়ে বারান্দায় তোমার জামাইবাবুর জন্যে লিপি রেখে যাব।"

উৎসুক কণ্ঠে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "লিপি? কি লিপি?"

অবনীশ পকেট হইতে তাহার লিপি বাহির করিয়া সুলেখার হাতে দিল।

ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সুলেখার মুখে ক্ষীণ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "এই তোমার লিপি?"

"হ্যাঁ, এই আমার লিপি।"

"এতে যদি কাজ না হয়?"

অবনীশ বলিল, "হবার পোনের আনা সম্ভাবনা। একান্ত যদি না হয় তা হ'লে কাল দিনের বেলায়ই তোমার সঙ্গে এমন একটা গোলযোগ বাধাতে হবে যাতে ওঁদের সঙ্গে বিবাদ অনিবার্য হয়।"

"কি জানি বাপু, কি কাণ্ড তুমি ক'রে তুলবে, কিছুই বুঝতে পারছিনে!" বলিয়া সুলেখা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ সাত পরে অবনীশ বলিল, "আর বসতে পারছিনে সুলেখা,—এবার শুলাম।" বলিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

সুলেখা বলিল, "শোও।"

"আর তুমি?"

"আমি জেগে ব'সে থাকব। রাত দুটোর সময়ে তোমাকে তুলে দোবো, সেই সময়ে তুমি নেবে যাবে।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া অবনীশ ভাল করিয়া লেপটা গায়ে টানিয়া লইল।

টেবিলের উপর যে রেডিয়ম-ডায়াল ঘড়িটা সারা রাত্রি টিকটিক করিয়া চলিয়াছে তাহাতে তখন ছয়টা বাজিয়া দশ মিনিট।

লেপ এবং র‍্যাগের অভ্যন্তরে প্রগাঢ় আবেশে নিদ্রাভিভূতা সুলেখাকে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া অবনীশ বলিল, "দোর দাও সুলেখা,—আমি চললাম।"

ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "কটা বেজেছে?"

শান্ত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "বেশি নয়, ছ'টা বেজে দশ মিনিট।"

"কি সর্বনাশ! এখনো যাও নি কেন?"

"তুমি উঠিয়ে দেবে সেই আশায় অপেক্ষা করছিলাম।"

শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া সুলেখা বলিল, "যাও, যাও, আর দেরি কোরো না!"

সুলেখার ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে অবনীশ এক সময়ে তাহার লিপিখানা নিঃশব্দে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া গেল।

ইহার মিনিট দশেক পরে প্রশান্ত দ্বার খুলিয়া ঘর হইতে নির্গত হইল। দূর হইতেই অবনীশের লিপি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিকটে আসিয়া তুলিয়া লইয়া দেখিল একখানা বড় সাইজের রেশমি-রুমাল। সাধারণত স্থূলরুচি-বিশিষ্ট অমার্জিত লোকেরা যে-রকম বহু বর্ণে রঞ্জিত রুমাল ব্যবহার করে সেই রকম রুমাল।

তাহার গৃহে এরূপ রুমাল কে ব্যবহার করিতে পারে তাহা ভাবিয়া প্রশান্ত বিস্মিত হইল। তখনো দিবালোক যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নাই। নিকটবর্তী সুইচটা টিপিয়া আলো জ্বালিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া সহসা প্রশান্তর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

রুমালের এক কোণে সূচীকর্মে বাঙলা অক্ষরে লিখিত 'গো' **(ক্রমশ)**
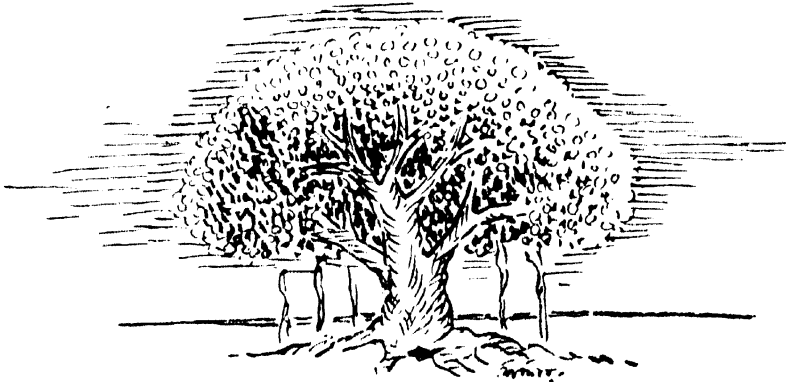
প্রতীক্ষা

শ্রীঅরুণকুমার সেন, এম এ

তোমার উদয়-লগ্ন আজো আসিল না
যুগান্ত সাধনা মোর মৌন আকিঞ্চন
বারে বারে ফিরিয়াছে তব উর্দ্ধলোকে
তোমার স্বর্গের স্বপ্ন ভাঙিলনা তবু।

পরিপূর্ণ জীবনের বাসর-শয্যায়,
কবে তুমি কম্প্রবক্ষে করিবে প্রবেশ
মরম-সুন্দর চক্ষে অপেক্ষা-আকুল
মোর পানে অয়ি, চাহিবে নির্ভর-নেত্রে।
উচ্ছ্বসিত চিত্ত মোর শুধু করিয়াছে
তোমারে কামনা। হে মোর কল্যাণ-লক্ষ্মী
রাত্রি শেষ হ'ল বুঝি কাঁপিছে আঁধার
উৎকণ্ঠ তোমার লাগি আছি প্রতীক্ষিয়া
তোমার আকাশ-লীলা ফুরাবে কখন?

নিঃসঙ্গ

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

কোথায় হারাল চেনা পথখানি,
চেনা মুখগুলি কৈ?
নিবিড় আঁধারে মেলি দুনয়ন
সারারাত বসে রই।

সমুখে পাথার—কে করিবে পার?
কোথা মাঝি, কোথা তরী?
উঠিয়াছে ঝড়, চমকে বিজলী,
ঢেউ নাচে থৈ থৈ।

এখনি ঝরিবে অঝোরে বাদল,
ভাসিবে কুসুমকলি;
ভেসে যাবে সাথে সাধ আশা যত
আমার পরাণ ছলি।

আবার মধুর অরুণ আলোকে
হাসিবে রূপসী ধরা,
আমি তার মাঝে বসিয়া ভাবিব
আমি ত কাহারো নই।
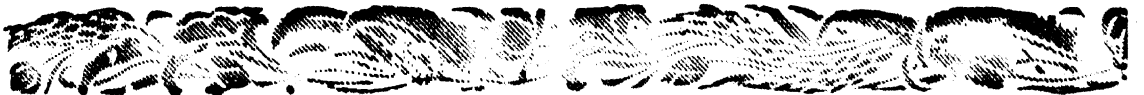
রবীন্দ্রকাব্যে দৃষ্টিতত্ত্ব

ডাঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শনকে আমি বিশেষ অর্থে দৃষ্টি-তত্ত্ব বলতে চাই। অর্থাৎ যে-চোখে তিনি আজ বিশ্বকে দেখছেন তারই মধ্যে তাঁর সৃষ্টির পরিচয় খুঁজব। দেখা তো কেবলমাত্র চোখ দিয়ে নয়, তার পিছনে আছে চৈতন্যের শক্তি; আনন্দ বেদনায় মিশ্রিত মনের সংস্কার এবং তাতে আছে গভীর অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি ও দূর-দর্শিতার একটি যৌগিক পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৭ সনে চারটি কবিতার বই বার করেছেন —**নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়** এবং **আরোগ্য**। এই নূতন বৎসরের বৈশাখ মাসে বেরিয়েছে তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ—জন্মদিনে। এই কাব্যগুলি বিচিত্র এবং ব্যাপক, কিন্তু এর মূল সুতো বোধ হয় দৃষ্টিলোক বিহারী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি দেখবার প্রেরণা। আজ তিনি যেখানে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর এবং সহজ পৃথিবীর মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই—তিনি সবকে দেখছেন এবং স্বচ্ছ আলোয় একান্ত কাছে এনে দেখাচ্ছেন। জীবনের যা রুক্ষ তাকে বাদ দিয়ে দেখেন নি, সংসারের সংগ্রাম এবং শান্তি একই ছবিতে বিধৃত হয়ে তাঁর নয়নে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাঙলার নদী, মাঠ, ধানক্ষেত, মেঘভারানত আকাশ, রৌদ্রভাসিত প্রতিদিনের কর্মের সংসার ছবির পরে ছবি হয়ে তাঁর কবিতায় দেখা দিচ্ছে। 'নবজাতকে'র কাব্যে তিনি দেখছেন প্রাচীন হিন্দুস্থানকে, রাজপুতানাকে, চীন এবং য়ুরোপের মহাদেশকে। মানুষের ক্রুদ্ধ তরঙ্গিত সমরাঙ্গন তাঁর আকাশে দেখা দিয়েচে জাতীয় অমিমোর ভূমিকায়—বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি এরি মধ্যে ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে প্রযুক্ত ক'রে আজকের সমস্যার সমাধান খুঁজচেন। মানচিত্রের মতো মহাজাতির প্রসারিত পট খুলে গেছে তাঁর মানসের সম্মুখে। তা ছাড়া 'নবজাতক'এ দেখেছি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক বাহন রেলগাড়ি, স্টেশন; সংঘবদ্ধ নাগরিক জীবনের ঘরবাড়িও তাঁর কাব্যদৃষ্টির অন্তর্গত। যে-সব প্রসংগ তাঁর কবিতায় সচরাচর স্থান পায় নি, খোলা চোখের কাব্যে তারাও আর বাদ পড়ল না। একেই তিনি 'নবজাতকে'র একটি কবিতায় বলেছেন 'বিশ্বদেখা'।

'সানাই' বইটি তাঁর পূর্বযুগের এবং আধুনিক কাব্যের মধ্যে সেতুর কাজ করেছে—এতে বিচিত্র রঞ্জিত ভাবনা ছন্দে ঝঙ্কারে অবতীর্ণ হয়েছে, যার মিল পাই 'ক্ষণিকায়' বা 'পূরবী'তে এবং তাঁর কিছুদিন পূর্বেকার গদ্য কাব্যে। এর আঙ্গিক অনবদ্য সুন্দর কিন্তু অধুনারচিত কাব্যগুলির বিরল স্বচ্ছ ভঙ্গীর দৃঢ়তা এতে নেই। নূতন কাব্যের একান্ত স্বচ্ছতা এবং অব্যবহিত দৃষ্টি সম্ভব হল কেমন করে?

আপনারা জানেন শেষ বছর হতে গুরুতর রোগসঙ্কটে তিনি একটি কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছেন;—পরম বেদনায় প্রজ্জ্বলিত সেই অগ্নিতে তাঁর বিশ্বদৃষ্টি এমন একান্ত নীলস্বর্ণাভ হয়ে উঠল—যেমন নির্মলতা দেখি প্রভাত গগনে দারুণ ঝড়ের শেষে। 'রোগশয্যায়ের' কবিতায় এই অগ্নি-শুদ্ধির কথা আছে,—যন্ত্রণায় বহ্নিত শুভ্রতায় দিনরাত্রির মুহূর্তগুলি তাঁর চৈতন্যে ভাস্বর হয়ে উঠল। 'আরোগ্যের' কবিতায় সেই ভাস্বরতা স্নিগ্ধতর হয়ে দেখা দিয়েচে; বিশ্ব-লোকাশ্রয়ী পরম দৃষ্টিতে তিনি সমাসীন।

আশ্চর্য এই যে পরম সৃষ্টিকালের রচনায় ভাবের এবং আঙ্গিকের একটি যোগ দেখা দেয় যা আকস্মিক, অথচ অনিবার্য। রোগের আকস্মিকতায় তাঁর শারীরিক শক্তি যখন ক্ষীণ তখন দীর্ঘ রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কম কথায় তাঁকে মনের সমস্ত কথা বলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চরম অভিজ্ঞতায় ঘনীভূত ভাবও তাঁর অতি-সংহত ভাষার বাহন খুঁজেছিল। যে-যোগ ঘটল তাকে দৈবিক ছাড়া কী বলব? সম্পূর্ণ নূতন টেকনিক তাঁর আধুনিকতম রচনায় দেখা দিতে লাগল,—বর্তমান যুগের গদ্য কবিতা তাঁর হাতে অপূর্ব ঋজুতা এবং নিরাভরণ মাধুর্য নিয়ে উদ্ভূত হল। অল্প সময়ের মধ্যে আট দশ লাইনের কবিতায় কখনো মিলও ব্যবহার করেছেন—তাঁর দেখা এক একটি ছবি সমগ্র হয়ে ফুটে উঠছে।

অতি কাছে এসেছেন আজ বাঙলার কবি এই প্রতিদিনের মানুষের সংসারে। সারাজীবনের ঐশ্বর্য তিনি দিচ্ছেন যাদের উদ্দেশে তারা অতি বুদ্ধিমান জ্ঞানের ব্যবসায়ী নয়; তারা শ্যামল দিগন্তে ঘেরা প্রাত্যহিক মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অধিকারী ভেদ নেই; এখানে সকলেরই নিমন্ত্রণ। মাঝি এল তার পাল-তোলা নৌকো নিয়ে, গঞ্জের হাট থেকে লোক এল বিবিধ পসরা হাতে করে, কেউ হালে বলদ জুৎছে, কেউ বা শহরে কাজ করে দোকানে বা আপিসে। কত ঘরের নিভৃত কাহিনী জীবনের ধ্যানমালায় গ্রথিত হল, তাঁর আজকের কবিতায়। অথচ এই সংবেদনশীল দৃষ্টিতে সত্যদর্শিতার সাহস আরো প্রদীপ্ত হয়েছে তার পরিচয় পেয়েছি তার এই নববর্ষের অভিভাষণে। ভয়হীন তাঁর দৃষ্টি কেননা সেখানে প্রেমের অপরাজেয় শক্তি রয়েছে—মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তিনি মানুষের ভ্রষ্টতাকে এমন ক'রে নির্মারিক দৃষ্টিতে দেখাতে পারেন। অপরিসীম শ্রদ্ধার বলে তিনি মানুষকে আত্মঘাতী সংহারের মধ্য হতে প্রাণময় জীবনের অঙ্গনে ডাকছেন; চিরদিনের এই বিশ্বে।

আজ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি; মাটির কাব্যে অনন্তের ধ্যানকে তিনি মূর্ত করছেন। যা সব চেয়ে বড়ো তা সব চেয়ে সহজ হয়ে দেখা দেয়, যখন আমাদের দৃষ্টি খোলে। রবীন্দ্র-নাথের 'জন্মদিনে' বইখানি পড়তে পড়তে আমাদের দৃষ্টি খুলে যাক্ যাতে আমরা নিজেকে এবং চতুর্দিকের এই ধরণীকে একবার সত্য করে দেখতে পাই। আশি বছর বয়সে তিনি আমাদের নূতন দৃষ্টিদান করলেন; আরো বহুকাল ধ'রে তিনি আমাদের কাছে তাঁর দিব্যদৃষ্টি উদ্ঘাটিত করুন।*

---

*চট্টগ্রামে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে ডাক্তার অমিয় চক্রবর্তীর অভিভাষণের সারাংশ।

গণেশ চকাজ—"রাধিকা"

ন্যাশনাল স্টুডিওস্ লিঃ-এর হিন্দী চিত্র: **পরিচালক—বীরেন্দ্র সি দেশাই**; সংগীত-পরিচালক—অশোক ঘোষ; **শিল্প-নির্দেশক—কণু দেশাই**; নৃত্য-পরিকল্পনা—দেবেন্দ্র শঙ্কর, **নটরাজ বশী**; **কাহিনী, সংলাপ ও সংগীত রচনা—কে বি লাল; প্রধান ভূমিকায়—নলিনী জয়বন্ত, হরিশ, জ্যোতি, কানাইলাল, সুনালিনী দেবী, ভুদো আদভাণী প্রভৃতি।**

বিলাসপুরের মোহান্তের পূজা মন্দিরে ষোড়শ বর্ষীয়া এক সুন্দরী দেবদাসীর নৃত্যদৃশ্যে ছবির আরম্ভ এবং সেই একই নৃত্যদৃশ্যে ছবির সমাপ্তি; মাঝখানে দুই ঘণ্টার মধ্যে কতকগুলি ভক্তিরস-মূলক লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা যেখানে যেমন সুবিধা বসাইয়া দিয়া কয়েকটি নরনারীর ইহজন্ম ও পূর্বজন্মের কথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে 'সন্তসাকু' ছবির একটা হিড়িক পড়িয়াছিল। 'সন্ত তুকারাম', 'সন্ত তুলসী দাস', 'সন্ত জ্ঞানেশ্বর', 'সন্ত কবীর' ইত্যাদি ছবিতে রাধাকৃষ্ণ, গিরিধারী আর গোপাল-গোবিন্দের নৃত্যে, গানে আর প্রেমের বন্যায় যখন দেশ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন 'বন্ধন', 'পুনর্মিলন', 'মুসাফির' ইত্যাদি হাল্কা হাসির সামাজিক ছবিগুলি আসিয়া পড়ায় কূল পাইয়া লোকেরা বাঁচিল। কিন্তু নিস্তার নাই, আবার সেই বংশীধারী গিরিধর গোপাল, সেই মন্দির আর নৃত্য, সেই পার্থিব ও ভগবৎ প্রেম আর সেই ভগবৎ প্রেমেরই জয়। 'রাধিকা' চিত্রের কাহিনীর মূল বিষয়বস্তুটি ইহাই, তথাপি কাহিনী আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করি:—

বিলাসপুরের জায়গীরদার জওয়ালা-নাথের জমিদারীতে এক মোহান্তের মন্দির আছে, সেখানকার দেবদাসীর নাম রাধা। মোহান্ত রাধাকে শিশু অবস্থায় মন্দিরের সোপানে কুড়াইয়া পাইয়া দেবতার চরণে নিবেদন করে। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, বাস্তব জগতের আর কিছুই সে জানে না। জায়গীরদারের বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কন্যা শকুন্তলার সহিত বন্ধুপুত্র গোপালের বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে, শকুন্তলা মনে মনে গোপালকে পতিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ধর্ম-উপদেশ লইবার জন্য মোহান্তের কুটীরে গিয়া রাধার সাক্ষাৎ লাভে গোপাল মুগ্ধ হইল এবং তাহাদের পরিচয় ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হইল, কিন্তু পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার দুস্তর বাধা অতিক্রম করিতে পারিল না। রাধার নিকট গোপনে গোপালের প্রেমনিবেদন নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জায়গীরদার ক্রোধান্ধ হইয়া মোহান্তকে নির্দেশ দিলেন হয় রাধাকে অবিলম্বে মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা মঠে আগুনে জ্বালাইয়া দিবে। রাধা গোপনে এ নির্দেশ শুনিল এবং নিজেই এক গভীর রাত্রে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গেল। সেখানে এক দুর্বৃত্তের কবলে পড়িয়া যখন রাধার সতীত্ব যায়-যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামূর্তির আবির্ভাবে রাধা বাঁচিয়া গেল, দুর্বৃত্তের চক্ষু অন্ধ হইল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যপথে চলিতে চলিতে রাধা বাঘের মুখে পড়িয়া অজ্ঞান হইল, একটি সাপ আসিয়া রক্ষা করিল এবং পরে এক সন্ন্যাসিনীর মঠে সে আশ্রয় পাইয়া সন্ন্যাসিনী বনিয়া গেল। এদিকে গোপাল রাধাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই সন্ন্যাসিনীর মঠে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসিনী যোগবলে রাধা ও গোপালের কথা সবই জানিতে পারিলেন, তিনি গোপালকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, রাধা ভগবানের পায়ে নিবেদিতা, সুতরাং সে সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে না। এইখানে পূর্বজন্মের কাহিনী সুরু হইল। পূর্বজন্মে গোপাল

ন্যাশন্যাল স্টুডিওর 'বেহেন্' (ভগ্নী) চিত্রে স্বরূপরাণী

ছিল এক রাজা, আর রাধা ও শকুন্তলা উভয়েই ছিল যথাক্রমে তাহার বড় ও ছোট রাণী, কিন্তু রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা ছিল বলিয়া রাজা ছোটরাণীর দেহ পাইলেও মন পায় নাই। পূর্বজন্মের কাহিনী শুনিবার পর গোপাল মনে শান্তি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া শকুন্তলাকে বিবাহ করিল।

এদিকে রাধাকে মন্দির হইতে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া তাড়াইয়া জায়গীরদার যে পাপ করিয়াছিল, তাহার পরিণামে সে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রাধা অলৌকিক শক্তিতে সে রোগ সারাইয়া দিল। অনুতপ্ত জায়গীরদার রাধার পায়ে পড়িয়া তাহাকে পুনরায় মন্দিরে ফিরাইয়া লইতে আসিলেন। সন্ন্যাসিনীর আদেশে 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' রাধা সেই মন্দিরে পুনরায় ফিরিয়া গিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশ ফেলিয়া নর্তকীর বেশে পুনরায় নৃত্য সুরু করিলেন এবং নাচিতে নাচিতে আকাশে মেঘের অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। এইখানেই গল্প শেষ।

ছবির কাহিনী সম্পর্কে যাহা বলিবার, তাহা পূর্বেই বলা হইয়া গিয়াছে, পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পরিচালকের প্রতিভার কোনো ছাপ ছবির কোথাও পাওয়া গেল না, অধিকাংশ দৃশ্য ও পরিবেশ বোম্বে টকীজের 'কঙ্কণ' চিত্র হইতে ধার করা এবং কতকগুলি জনতার গান গাওয়ার দৃশ্য "সন্ত মার্কা" চিত্রের অবিকল অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। একঘেয়ে অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া ভক্তি ত বাড়েই না, উপরন্তু মন বিগড়াইয়া যায়।

একমাত্র রাধার ভূমিকায় নলিনী জয়বন্ত ছাড়া অভিনয়ের দিক দিয়াও ছবিটি উৎরাইতে পারে নাই। নলিনী জয়বন্ত নবাগতা চিত্রাভিনেত্রী, বয়সও নিতান্তই অল্প। চেহারায় ও মুখাবয়বে একটা নিষ্কলুষ কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছায়া-চিত্রের 'তারকা'দের চোয়াড়ে চেহারা দেখিয়া দেখিয়া যাহাদের চোখ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই নূতন মুখখানি দেখিয়া তাহাদের চোখ জুড়াইবে সন্দেহ নাই। অভিনয় অপেক্ষা নৃত্যে তিনি বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কারণ নৃত্যে তাঁহার স্বাভাবিক দখল আছে, পায় কোনোটাই মনে রাখিবার মতো নহে। সংগীত পরিচালক ভূমিকায় হরিশের 'মেয়েলিপনা' ও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কথা বলা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। গানগুলির প্রায় কোনোটাই মনে রাখিবার মতো নহে। সংগীত পরিচালক বাঙালী, কিন্তু বাঙালীর নাম রাখিতে পারেন নাই। ছবির সেটিং ও সাজসজ্জা প্রশংসনীয়; প্রযোজক খরচও করিয়াছেন প্রচুর। আলোকচিত্রগ্রহণ নিন্দনীয় নহে, শব্দগ্রহণের ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

শৈলজানন্দের নূতন চিত্র 'নন্দিনী'

গত সপ্তাহে সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র

ফিল্ম কর্পোরেশনের 'প্রতিশোধ' চিত্রে ছায়া, রমলা, সন্ধ্যা, শীলা হালদার প্রভৃতি। পরিচালক—সুশীল মজুমদার

পরিচালনা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ সংশোধন প্রয়োজন। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় নিউ থিয়েটার্সে ছবি পরিচালনা করিবেন না, ছবি পরিচালনা করিবেন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে এবং তাঁহারই লেখা কাহিনী 'নন্দিনী'। এই ছবির ব্যয়ভার বহন করিবেন জনৈক নূতন প্রডিউসার এবং এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটার্স। জানা গিয়াছে, 'নন্দিনীর' বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিবেন অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, সুলাল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিমা দাশগুপ্তা, খুব সম্ভব নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হইবেন। অবশ্য ইহা এখনও পাকাপাকিভাবে ঠিক হয় নাই।

ফণী মজুমদারের নূতন চিত্র

মুভী টেকনিকের পক্ষ হইতে পরিচালক ফণী মজুমদার ফিল্ম কর্পোরেশন স্টুডিওতে যে নূতন ছবি তুলিতেছেন, গত রবিবার তাহার মহরৎ উৎসব হইয়া গিয়াছে। কয়লা খনির ঘটনা-বলী কেন্দ্র করিয়া ইহার কাহিনী রচিত হইয়াছে। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন মণিকা দেশাই এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন প্রথিতযশা শিল্পী ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা গত তিন সপ্তাহ হইল অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা, অথবা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা কোন খেলা অনুষ্ঠানের অন্তরায় হয় নাই। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট খেলাগুলি নির্বিঘ্নে হইতেছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, এখনও পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের প্রাণে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রতিযোগিতার সূচনায় বিভিন্ন খেলায় যেরূপ অল্পসংখ্যক দর্শক পরিলক্ষিত হইয়াছে, এখনও তাহাই হইতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, কলিকাতা ফুটবল লীগ এখনও জমে নাই। কবে যে জমিবে, কবে যে ক্রীড়ামোদিগণ দলে দলে মাঠে খেলা দেখিবেন, ইহা কেহই ধারণা করিতে পারিতেছেন না। উক্ত প্রতিযোগিতা পরিচালকগণ পর্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কেবল মনে মনে বলিতেছেন, "আর্থিক দুরবস্থাই ইহার প্রধান কারণ।" এই উক্তি যে কতকাংশে সত্য, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, তবে ইহা সম্পূর্ণ দায়ী বলিয়া ধরিয়া লইলে অন্যায় করা হইবে। ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডও ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে একদিনও কোন একটি খেলায় খুব উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় নাই। অনুষ্ঠিত সকল খেলাকে সাধারণ ক্রীড়ার পর্যায় যদি ফেলা হয়, তবে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন দলের মধ্যে "লীগ চ্যাম্পিয়ান" লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনই পরিচয় এই পর্যন্ত ক্রীড়ামোদীরা পান নাই। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন দল প্রতিযোগিতার সূচনায় যেরূপ ক্রীড়াকৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, এখনও পর্যন্ত সেই একই অবস্থায় আছেন। তাঁহাদের কাহারও ক্রীড়াকৌশলের ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের, কিন্তু তাহা হইলেও এই দল প্রতিযোগিতায় এই পর্যন্ত যতগুলি খেলাতে যোগদান করিয়াছে, সকলগুলিতেই অল্পায়াসে বিজয়ী হইয়াছে। ইহাতে উক্ত দলের সমর্থনকারিগণ ধরিয়াই লইয়াছেন যে, এই দল চ্যাম্পিয়ান হইবে। তাঁহারা অনেকে প্রকাশ্যে ময়দানে পর্যন্ত বলিয়াছেন, "খেলা দেখিয়া কি করিব। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহিত কোন দলই সম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। তাঁহারা এই বৎসর চ্যাম্পিয়ান হইবেই।" তাঁহাদের ধারণা সত্য হউক বা না হউক, তাঁহাদের খেলা দেখার উৎসাহ যে কমিয়াছে এবং তাঁহাদের মাঠে ভীড় করিতে যে দেখা যায় না, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ প্রকৃতপক্ষেই এই মহমেডান স্পোর্টিং দলের সমর্থনকারীদের ভীড় বিভিন্ন খেলায় গত বৎসরও যেরূপ দেখা গিয়াছিল, এই বৎসর কোন খেলাতেই সেইরূপ হয় নাই। ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও জনপ্রিয় মোহনবাগান, এরিয়ান্স ও ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার সময়ই বা পূর্বের ন্যায় ভীড় হইতেছে না কেন? ইঁহাদের প্রত্যেকেরই এই বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইঁহারা ক্রীড়ামোদিগণের খেলা দেখার উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে পারিতেছেন না। তাহার কারণ এই সকল দলের খেলা পূর্বাপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যতদিন লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলসমূহ ক্রীড়াকৌশলের উন্নতি না করিতেছেন, ততদিন ক্রীড়ামোদিগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে না।

সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন

সিংহল ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ ও ভারতীয় দলের নিকট উক্ত দলের বিভিন্ন স্থানে পরাজয়ের পর অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শীঘ্র আর আমন্ত্রণ করিতেছেন না। তাঁহারা কয়েক বৎসর নিজ দেশের ক্রিকেট স্ট্যাণ্ডার্ড উন্নততর করিবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকিবেন। যখন বুঝিবেন যে তাঁহাদের স্ট্যাণ্ডার্ড ভারতীয় ক্রিকেট স্ট্যাণ্ডার্ডের সমান, তখনই তাঁহারা ভারতীয় দলকে সিংহলে আমন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু এই ধারণা যে কত ভুল তাহা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুত কে এম রঙ্গরাওর সম্প্রতি প্রকাশিত বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। শ্রীযুত রঙ্গরাও সম্প্রতি সিংহলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, "ভারত ও সিংহল এই দুইটি স্থানের ক্রিকেট দলের পরস্পরের গমন ও আগমন দুই স্থানের সখ্যতাবন্ধন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিবে। সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে সিংহলে আমন্ত্রণ করিবেন বলিয়া জানিতে পারিলাম। এই ভারতীয় দলকে কলম্বোতে নিখিল সিংহলী দল ও সমবেত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে খেলিতে হইবে। সিংহলের অন্যান্য স্থানে দুইটি খেলায় যোগদান করিতে হইবে। আগামী মাসের প্রথমেই সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন ভারতীয় ক্রিকেট দলের ভ্রমণ তালিকা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এই তালিকা যে অনুমোদন করিবেন ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

সিংহল দল ভারতীয় দলকে আমন্ত্রণ করিয়া খেলোয়াড়সুলভ মনের পরিচয় দিয়াছেন। জয়পরাজয় অপেক্ষা উভয় দলের মিলন তাঁহারা চাহেন বলিয়াই মনে হয়। ভারত ভ্রমণকালে তাঁহারা অনেক স্থানে পরাজিত হইলেও তাহাদের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যে ভারতীয় ক্রিকেট স্ট্যাণ্ডার্ডের অপেক্ষা বিশেষ নিম্নস্তরের—ইহা ধারণা করা অন্যায়।

বাঙলার ক্রিকেট পরিচালনা

বাঙলার ক্রিকেট পরিচালনা বিষয়ে এতদিন কোনরূপ গণ্ডগোল ছিল না। বাঙলা ও আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণই সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থাই এতদিন বাঙলার সকল ক্রিকেট দল বিনা দ্বিধায় মানিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল জিমখানা এবং বাঙলা ও আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে যে গণ্ডগোলের উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ক্রিকেট পরিচালনা লইয়া বাঙলাদেশে তুমুল দলাদলি সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়। বেঙ্গল জিমখানার কর্তৃপক্ষগণ এই গণ্ডগোল যে সহজে মিটাইয়া ফেলিবেন তাহারও সম্ভাবনা খুব কম। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পর্যন্ত ইহা গড়াইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই বেঙ্গল জিমখানা ও বাঙলা ও আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্তৃ-

পক্ষগণ উভয়েই কন্ট্রোল বোর্ডের নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই দুই দলের মধ্যে এই গণ্ডগোল লইয়া যেরূপ তোড়জোড় চলিয়াছে তাহাতে ইহার অবসান শীঘ্র হইবে না। বাঙলার ক্রিকেট মহলেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ক্রিকেট দলসমূহও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারাও সুবিধামত কোন না কোন দলে যোগদান করিবেন। শেষ পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও বলা যায় না। তবে বাঙলার ক্রিকেট খেলার যে অবসান হইবে না—ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি। ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ বিচলিত না হইয়া ধৈর্য ধরিয়া যদি থাকেন, তবে ক্রিকেট পরিচালনার অনেক গলদই জানিতে পারিবেন।

জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ

ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন বা জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের জনপ্রিয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদিগণ এই সঙ্ঘের কার্যকলাপ দেখিবার ও জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহাদের পরিচালিত বিভিন্ন জাতীয় খেলায় পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দল যোগদান করিতেছে। বিভিন্ন স্থানের ব্যায়ামোৎসাহী ধনী ব্যক্তিগণ এই সঙ্ঘকে অর্থ সাহায্য করিতে পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। মাত্র ছয় মাস পূর্বে গঠিত হইয়াছে যে সঙ্ঘ তাহার অধীনে বর্তমানে পাঁচটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক স্কুলের ছাত্রদের ইঁহাদের পরিচালিত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার উৎসাহ দেখা দিয়াছে। স্কুলের ছাত্রগণের এই উৎসাহ যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায় তাহার জন্য উক্ত সঙ্ঘ আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙালী বালিকাগণের কতিপয় ক্লাব বা সঙ্ঘ এই সঙ্ঘকে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ এই সকল অনুরোধ পত্র পাইয়া নীরব না থাকিয়া বালিকাদের জন্য এক বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার সংবাদ একদিন মাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৬।৭টি বালিকাদল যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে এবং বহুসংখ্যক বালিকাদলের যোগদান করিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই সঙ্ঘ যে উদ্দেশ্য লইয়া ছয় মাস পূর্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা সফল হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সঙ্ঘ জাতীয় খেলাধুলা বিষয় বাঙলার বালক বালিকাগণের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। পরিচালকগণের একনিষ্ঠতা ও আপ্রাণ চেষ্টা কিরূপভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন বা জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের পরিচালকগণ তাহারই প্রমাণ দিয়াছেন। অর্থহীন সম্বলহীন জাতীয় খেলাধুলা প্রচারের আন্তরিক উৎসাহে উৎসাহিত জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের সভ্যগণ যখন প্রথম এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তখন অনেক বাঙালী ক্রীড়ামোদীই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ইহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ইহাদের পরিচালিত আদিম যুগের জাতীয় খেলাধুলার প্রতি বাঙলার বালক বালিকাগণ আকৃষ্ট হইবে না। বৈদেশিক চাকচিক্যময় খেলাধুলার পাশে বর্তমানে জাতীয় খেলাধুলার স্থান আর হইবে না। ইহারা কাহারও সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না।" কিন্তু বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা দেখিয়া ঐ সকল ক্রীড়ামোদীই মত পরিবর্তন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "ইহারা প্রকৃতই বাঙলার বালক বালিকাগণের প্রাণে জাতীয় খেলাধুলার নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে। ইঁহাদের পরিচালিত বিভিন্ন জাতীয় খেলা বেশ দর্শনযোগ্য। বৈদেশিক খেলাধুলার তুলনায় জাতীয় খেলাধুলার উৎসাহ বা উত্তেজনা কম নহে। দিন দিন ইঁহাদের পরিচালিত প্রতিযোগিতাসমূহে যেরূপসংখ্যক বাঙালী বালকবালিকা যোগদান করিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই সঙ্ঘ বাঙলার খেলাধুলা মহলে বিশিষ্ট স্থানলাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা হইতেছে।" ছয় মাস পূর্বে জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ক্রীড়ামোদিগণ এত অল্প সময়ের মধ্যে মত পরিবর্তন করিলেন দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইতে পারেন কিন্তু আমরা হই নাই। কারণ আমরা জানিতাম ঐ ক্রীড়ামোদীরা জাতীয় খেলাধুলার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রাখেন না বলিয়াই ঐরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা যদি জ্ঞান রাখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন জাতীয় খেলাধুলার মধ্যে বৈদেশিক খেলাধুলার ন্যায় আনন্দ ও উত্তেজনার কোনই অভাব নাই। বৈদেশিক খেলাধুলাসমূহ দৈহিক শক্তি ও সামর্থদানে যতখানি সক্ষম জাতীয় খেলাধুলা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে; বরঞ্চ জাতীয় খেলাধুলার একটা বিশেষ সুবিধা আছে যাহা বৈদেশিক খেলাধুলায় নাই, সেইটি হইতেছে অল্প ব্যয়সাধ্য। বৈদেশিক খেলাধুলার ব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থ ছাড়া অসম্ভব কিন্তু দেশীয় বা জাতীয় খেলাধুলার ব্যবস্থা অর্থ না লইয়াই করা যাইতে পারে। অনাহারক্লিষ্ট দারিদ্র্যতার প্রবল চাপে নিপীড়িত বাঙালী জাত যদি বৈদেশিক খেলাধুলার ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া দেশীয় বা জাতীয় খেলাধুলাসমূহ গ্রহণ করে তবে কোনই অন্যায় হইবে না। খেলাধুলার উদ্দেশ্য মানসিক ও শারীরিক উন্নতির সহায়তা করা। দেশীয় বা জাতীয় খেলাধুলার মধ্যে সে সকল গুণাবলী যখন বর্তমান তখন আমাদের উহা গ্রহণ করিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে?

সমর বার্ত্তা

১৪ই মে।—

ভিসি গভর্নমেণ্টকে কতকগুলি বিষয়ে সুবিধাদানের পরিবর্তে হের হিটলার যে দাবী করিয়াছিলেন, অদ্য ভিসি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উক্ত সর্তাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এডমিরাল দারলা হিটলারের সহিত তাঁহার আলোচনা ও সাক্ষাৎকার সম্পর্কে এক বিবৃতি দিবার পরই মন্ত্রিসভার ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

হের হেসের স্কটল্যাণ্ডে অবতরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জার্মানীতে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, "হের হেস জার্মানীতে যে সমস্ত কাগজপত্র ফেলিয়া আসিয়াছেন, ঐগুলি পাঠ করিয়া জানা গিয়াছে যে, জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিবার নিমিত্ত হের হেস ডিউক অব হ্যামিল্টনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।" ওয়াশিংটনের কতিপয় সরকারী কর্মচারী মনে করেন যে, রুশিয়া এবং রুশ-জার্মান সম্পর্ক সম্বন্ধে হের হিটলার ও হের হেসের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে।

জাপানীদের এক ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ শানসীতে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে এবং চীনাবাহিনীর ৩৪ সংখ্যক ডিভিসনের সেনাপতি জেনারেল কুং সিং ফান তাঁহার সহকারী সেনাপতিগণসহ জাপবাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

১৫ই মে।—

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, ভিসি কর্তৃপক্ষ জার্মানিদিগকে সিরিয়ার বিমান ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন। সেজন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টও সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিতে উপনীত জার্মান বিমানসমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, কতকগুলি জার্মান বিমান সিরিয়ার তিনটি বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করিয়াছে।

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, বৃটেন হইতে সিঙ্গাপুরে বহু সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং বৃটিশ স্থল সৈন্য, বিমানবহরের লোকজন এবং নৌ সৈন্য এইসব সেনাদলে আছে বলিয়া সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ।

বৃটিশ বিমানবহরের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, বৃটিশ নৌবহরের আক্রমণে গত ১২ই মে ভূমধ্যসাগরে ৮ হাজার টনের একখানি প্রতিপক্ষীয় বাণিজ্য জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে।

লণ্ডনের উপর সাম্প্রতিক বিমান হানায় ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপের বাসভবন, ল্যাম্বেথ প্রাসাদ, লণ্ডনের সঙ্গীত কেন্দ্র কুইন্স হল, সেণ্টজেমস প্রাসাদ, অভিজাত সমাজের বিবাহের জন্য বহু ব্যবহৃত গির্জা সেণ্ট ক্লেমেণ্ট ডেনস, শিশুদের বিচারালয় ওল্ড বেইলি এবং স্যালভেশন আর্মির হেড কোয়ার্টার্স প্রভৃতি অট্টালিকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

১৬ই মে।—

বৃটিশ সৈন্যবাহিনী লিবিয়ায় সোল্লুম, মুসাহিদ ও হাফারা গিরিসঙ্কট দখল করে। প্রতিপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে এবং কতিপয় জার্মান সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী আবিসিনিয়ার অন্যতম প্রধান শহর স্কিয়াসসিয়ামানা দখল করে।

১৭ই মে।—

রোমের সংবাদে প্রকাশ যে, কতিপয় ইতালীয় বিমান ইরাকের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কায়রোর সংবাদে বলা হয় যে, গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরও কতকগুলি জার্মান বিমান সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, রসিদ আলীর গভর্নমেণ্ট যাবতীয় রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। তন্মধ্যে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী হেকমৎ সুলেমান অন্যতম। তাঁহাকে বর্তমানে মস্কোর ইরাক রাজদূতে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

চুংকিং-এর এক সংবাদে বলা হয় যে, মধ্য চীনে জাপানীরা যে বিরাট আক্রমণ সুরু করিয়াছে, একমাত্র দক্ষিণ শানসী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রণাঙ্গনেই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

মিশরের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আজিজ এল মারাস পাশা মিশর হইতে পলায়ন করিয়াছেন। জেনারেল আজিজ এক্সিস শক্তিবর্গের একজন সমর্থক বলিয়া পরিচিত।

১৮ই মে।—

বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ ইংলিশ প্রণালীর উপকূলবর্তী জার্মানদের অধিকৃত ফরাসী বন্দরসমূহের উপর গতকল্য রাত্রে প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ করে। মধ্যরাত্রি হইতে ভোর পর্যন্ত বোমা বর্ষিত হয়।

১৮ই মে।—

সুইডেনের কোন এক সংবাদপত্রে বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, হের হেসের পত্নীকে দুই দিন পূর্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একমাত্র বার্লিনেই বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রসচিব এবং বর্তমানে তুরস্কের আফগান দূত ইরাক ও বৃটেনের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে আবেদন জানাইয়াছেন।

মধ্য প্রাচ্যের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ায় বৃটিশবাহিনী আদেলা দখল করিয়াছে।

স্পোলেটোর ডিউক ও ইতালীর রাজার আত্মীয় প্রিন্স আর্মেডিও রবার্টো তাঁহাদের রাষ্ট্র ক্রোশিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। ক্রোশিয়া ইতিপূর্বে যুগোশ্লাভিয়ারই একটি অংশ ছিল।

১৯শে মে।

আবিসিনিয়ার আম্বা আলাগী ঘাঁটির পতন হইয়াছে। আম্বা আলাগীতে ইতালীয়ান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ করিয়া এক ইতালীয়ান ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে, "আওষ্টার ডিউকও তাঁহার বাহিনীর ভাগ্যই বরণ করিয়াছেন।" পূর্বের এক সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয়ানরা আম্বা আলাগী সমর্পণের বৃটিশ সর্ত মানিয়া লইয়াছে। ডিউক অব আওষ্টা এবং ইতালীয়বাহিনীর সেনাপতির আত্মসমর্পণ এই দুইটি দাবী সর্তাবলীর মধ্যে আছে। প্রকাশ, এই সেনাপতির নাম ফ্রুস্কি। ইনি ডিউক অব আওষ্টার প্রধান সেনাপতি।

মাদ্রিদের সংবাদে প্রকাশ যে, স্পেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সেনর সুনার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন; কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কো তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

২০ মে।—

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর আনকারার সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী ইরাণ সীমান্তের নিকট তাশখন্দ অঞ্চলে বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়া মহড়া আরম্ভ করিয়াছে। রুশিয়া ও জার্মানী 'মধ্য প্রাচ্যে' সম্মিলিত কার্যক্রমের একটা ব্যবস্থা করিতেছে এবং জার্মানী ইরাণে ও ইরাকে সমরোপকরণ প্রেরণের জন্য যাহাতে কৃষ্ণসাগরে রুশ জাহাজ ও রুশ বন্দর ব্যবহার করিতে পারে, সেজন্য আলোচনা চলিতেছে—এইরূপ খবরও সংবাদদাতা উল্লেখ করিয়াছেন।

আনকারা রেডিওর ঘোষণায় প্রকাশ, ইরাণের অর্থসচিব পদত্যাগ করিয়াছেন।

জার্মান প্যারাসুট সৈন্য ক্রীটে অবতরণ করিয়াছে এবং আজ সকাল হইতে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৪ মে—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক সিমলায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হক বলেন যে, তিনি বড়লাটের নিকট কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত সম্প্রদায় ও স্বার্থের ভারতীয় প্রতিনিধিদের একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন।

ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে নিযুক্ত রাজদূত শান্তিনিকেতনে এক আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "ভারত ভাস্কর" উপাধি প্রদান করেন।

লাহোর হাইকোর্টের এক রুলিং অনুসারে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট পুলিশকে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোন সত্যাগ্রহী তাঁহার সত্যাগ্রহ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে যেন তাহাকে গ্রেপ্তার করা না হয়, অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

ভারত রক্ষা বিধানবলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর উপর এক আদেশ জারী করিয়া তাঁহাকে ২৪ পরগণা জেলার রাজপুর থানার এলাকায় বাস করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পরলোকগত ডাঃ বারিদবরণ মুখার্জির স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতাগণ ডাঃ মুখার্জির সংগৃহীত দেড় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের প্রায় ৫০,০০০ খণ্ড পুস্তক রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন।

১৫ মে—

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত ধরানাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষা বিধানানুযায়ী শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে যে মামলা বিচারাধীন ছিল, অদ্য উহার উভয় পক্ষের সওয়াল শেষ হইয়াছে। মামলার শুনানী শেষ হওয়া মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলীর জামীন নাকচ হয়। অশ্বিনীবাবুকে শ্রীরামপুর সাবজেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ঢাকা শহরে আরও তিন ব্যক্তিকে ছোরা মারা হয়; তন্মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ইহা লইয়া ঢাকা দাঙ্গায় নিহত লোকের সংখ্যা মোট ৬০ হইল।

ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় ঢাকা কোর্টের সমনের বলে গতকল্য জয়দেবপুর ও মাধববাড়ীর তাঁহার অংশ দখল করিয়াছেন।

১৬ মে—

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ অধিবেশনে ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরও ১৫ মাসের জন্য শ্রীযুক্ত জে সি মুখার্জিকে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদে পুনর্নিয়োগ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাওড়া জেলায় প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত তারাপদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে ভারত রক্ষা আইনে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ঢাকায় গতকল্যকার ছোরা মারার ঘটনা সম্পর্কে মোট ১০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা শহরে ধৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা বর্তমানে ১১ শতেরও অধিক হইয়াছে।

শ্রীমতী পূর্ণিমা ব্যানার্জির উপর এলাহাবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভার ছিল। অদ্য তাঁহার গৃহে খানাতল্লাসীর সময় তাঁহাকে ভারত রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৭ মে—

সত্যাগ্রহ-সংবাদ—গত ১৫ই মে পর্যন্ত তামিলনাদে ১৭৬৬ জন সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৮১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ১৭ই মে এলাহাবাদে ১৮ জন সত্যাগ্রহীকে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। মীরাটে ১৩ জন সত্যাগ্রহী বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

১৮ মে—

কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ শহরের কতকগুলি বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ডি সুজানা এবং ফরোয়ার্ড ব্লক ষ্টুডেন্স ব্যুরোর সদস্য শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনগুপ্তকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট পাঁচজনের নাম এইঃ—শ্রীযুক্ত কমলেশ ব্যানার্জি, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদত্ত সেন, 'নূতন পত্রের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য চ্যাটার্জি, শ্রীযুক্ত শচীন হাজরা ও মিঃ ডালি।

দাঙ্গার সংবাদ—ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশন রোডে এক ব্যক্তিকে ছোরা মারা হইয়াছে। আমেদাবাদে পুনরায় তিন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। বদায়ুনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৯ জন হিন্দু আহত হয়; তন্মধ্যে একজন মারা গিয়াছে।

১৯ মে—

ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার আজ সকালে তাঁহার মাদ্রাজস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লক কার্যালয় এবং আরও প্রায় দশ জায়গায় ব্যাপক খানাতল্লাস করে এবং প্রায় দশজনকে ভারত রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের খ্যাতনামা কর্মী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন গুহ, বিখ্যাত ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী শ্রীযুক্ত সুকুমার চৌধুরী, মাদারীপুর ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার বি এল প্রভৃতি আছেন।

১৯ মে

সত্যাগ্রহ সংবাদ—হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ১৮ জন সত্যাগ্রহ করিতেছিলেন; অদ্য তাঁহারা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যক্তিগতভাবে দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। গত ১৩ই মে সুরমা উপত্যকা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের বিশিষ্ট সদস্যা শ্রীযুক্তা শশিপ্রভা দেব মৌলবীবাজার মুন্সেফী আদালতে ৫ম যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি ও বক্তৃতা করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২০শে মে—

ভারতরক্ষা বিধানে আটক বন্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়কে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে হিজলী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আমেদাবাদে পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়। আজ দুইজন নিহত ও ছয়জন আহত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্বাচনে শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডম্বরু থোলিয়া নামক একজন সত্যাগ্রহী বন্দী উড়িষ্যার কোরাপুর জেলে পরলোকগমন করিয়াছেন।

করাচীর কোন এক কারখানায় প্যারাসুট তৈয়ারী হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আইসল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ডেনমার্কের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষিত হইয়াছে। কোপনহেগেনস্থ প্রাক্তন দূত রিওয়ারসন আইসল্যাণ্ড গণতন্ত্রের প্রথম রিজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

রামগড়ে বন্দী ইটালীর সৈন্যদলঃ—

প্রাতঃকালে সারবন্দী সৈন্যদলের নাম ডাকা হইতেছে

উপায়ে সেই গণ্ডগোল থেকে যে উত্তাপ সংগ্রহ করা হয় তা দিয়ে এক পেয়ালা গরম চা অনায়াসেই তৈরী করা যেতে পারে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ বলছেন, গরম চা কেন একটি ডিমকে বেশ ভালভাবেই সিদ্ধ করে নেওয়া যেতে পারে। এই সংবাদ শুনে আমাদের দেশের ক্রীড়ামোদিগণ নিশ্চয় আশান্বিত হবেন। প্রখর রৌদ্রে অথবা শ্রাবণের অবিরাম বরিষণে খেলা আরম্ভ হবার বহু পূর্বে থেকেই মাঠের ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়। খেলা দেখার বাতিক হঠাৎ যাবার নয় তাই বেশীর ভাগ লোককে অর্ধেক আহারে সেই মল্লক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমে জঠরে ক্ষুধার উদ্রেক ভয়ানক হলেও অনেকের উপায় থাকে না। সেই ভয়ানক মুহূর্তে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সংবাদ আশাপ্রদ নয় কি! গরম ভোজ্যদ্রব্য জঠরের আগুন জল করবে এ আনন্দ চাপবার চেষ্টা করলেও বার হয়ে আসবে।

সাহিত্য সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

বেহালা যুব সম্প্রদায় অনুষ্ঠিত দীনেশ ও সত্যেন্দ্র স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতাঃ—বিষয়ঃ—(১) দীনেশ স্মৃতিঃ—(ক) যুদ্ধ ও যুদ্ধ নিবারণের উপায় (কলেজ ছাত্রদের জন্য)। (খ) জাতি ও সাহিত্য (কলেজ ছাত্রীদের জন্য)। (২) সত্যেন্দ্র স্মৃতিঃ—(ক) বাঙলার চাষী (স্কুল ছাত্রদের জন্য)। (খ) স্ত্রী শিক্ষা (স্কুল ছাত্রীদের জন্য)। উৎকৃষ্ট রচনার জন্য লেখক-লেখিকাদিগকে একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিয়মাবলীঃ—(১) ছাত্র-ছাত্রী মাত্রেই ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন। (২) ফুলস্কেপ কাগজে দশ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিয়া নাম, ঠিকানা, স্কুল বা কলেজের নাম ও শ্রেণী উল্লেখ করিয়া ১।৭।৪১ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।—শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়, C/o 'যুব সম্প্রদায়', বেহালা, দক্ষিণ কলিকাতা।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাসুল সহ ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর টাকা	৬ মাস টাকা	৩ মাস টাকা	১ মাস টাকা	এক সংখ্যার জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা

রক্ষকই ভক্ষক—

স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য পুলিশের অত্যাচার নূতন ব্যাপার নয়। এই অত্যাচার কিরূপ নৃশংস এবং নিষ্ঠুর আকার ধারণ করিতে পারে, লাহোর হাইকোর্টের একটি মামলায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সিঁদ চুরির অভিযোগে সন্দেহভাজন একটি লোকের উপর অত্যাচার করিবার অভিযোগে একজন ছোট দারোগা এবং দুইজন কনেষ্টবল গুরুদাসপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়। এই সব মামলায় নিম্ন আদালতে সচরাচর যাহা ঘটে, এইক্ষেত্রেও তাহাই হয়, অর্থাৎ আসামীরা সকলে বেকসুর খালাস পায়; কিন্তু পাঞ্জাব সরকার হাইকোর্টে আপীল দায়ের করেন। আপীলে ছোট দারোগার সাত বৎসর, হেড কনেষ্টবলের তিন বৎসর এবং দুইজন কনেষ্টবলের এক বৎসর করিয়া শ্রীঘর-বাসের আদেশ হইয়াছে। সন্দেহভাজন লোকটির উপর অত্যাচার কি ধরণের হইয়াছিল, মামলায় তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাকে দিয়া পাঁচশত বৈঠক করান হয়, তাহার পায়ে বেঁড়ী পরান হইয়াছিল। তাহার কপালে বালু ঘষা হয় এবং তাহার গলায় শিকল বাঁধিয়া সেই শিকল ধরিয়া একজন মানুষ ঝুলিতে থাকে, সেই অবস্থায় তাহাকে হাঁটান হয়। তাহাকে জুতাপেটা করা হয়, অবশেষে তাহাকে উবুড় করিয়া শোয়াইয়া কয়েকজন কনেষ্টবল তাহার পিঠের উপর উঠিয়া তাহার পিঠে জুতার গোড়ালী বসাইতে থাকে।" এমন অত্যাচারের ফলে লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়। লাহোর হাইকোর্টের বিচার-পতিগণ রায়ে বলিয়াছেন, [illegible] হউক, আর যাহাই হউক, অসহায় একজন লোকের উপর এমন অত্যাচারের মত ঘৃণ্য অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত। নিরক্ষর, অশিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে পুলিশই অনেক স্থানে হর্তাকর্তাস্বরূপে গণ্য হয়। এ হেন পুলিশের বিরুদ্ধে কথা বলিবার সাহস থাকে খুব কম লোকেরই; সুতরাং অত্যাচার হইলেও এমন ব্যাপারের মধ্যে প্রমাণ মিলে কম ক্ষেত্রেই। পুলিশের সম্বন্ধে জনসাধারণের ভয়ের ধারণাতেই ইহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। জনসাধারণকে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার উপদেশ দিবার আগে শাসকদের উচিত পুলিশের সম্বন্ধে জনসাধারণের মন হইতে ভয়ের ধারণা যাহাতে দূর হয়, তাহা করা এবং তাহা করিতে হইলে পুলিশে চাকুরী যিনি করেন, তিনিই সরকারের পোষ্যপুত্র এই ধারণা যে সব পুলিশ কর্মচারীদের মনে তাঁহাদিগকে শায়েস্তা করা আগে দরকার। যাহারা আইনের মর্যাদা না বুঝিয়া বেআইনী করে, তাহাদের চেয়ে আইনের রক্ষক হইয়া যাহারা বেআইনী করে, তাহারা আরও ভয়ঙ্কর জীব এবং সাজাও তাহাদের ভীষণ রকমের হওয়া দরকার।

[illegible] মানুষ চাই—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের কোন কথাই আমরা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারি না, যখন তিনি আমাদের অনুকূলে কোন কথা বলেন, তখনই অনুকূলতাই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চিত্ত সঙ্কুচিত হয় বরং প্রতিকূলতারই উহা প্রাক্-কৌশল বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। হক সাহেবের সর্বদলের ঐক্য প্রচেষ্টার পরিণতি এবারও সেইরূপ জিন্না সাহেবের পাকিস্থানী প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতায় গিয়াই দাঁড়াইয়াছে। শুনিতেছি মৌলবী ফজলুল হক এবং স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খানের মধ্যে নাকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র আদান-প্রদান হইয়াছে এবং সেই সকল পত্রের প্রতিলিপি জিন্না সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, সেগুলি প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টির নাকি সম্ভাবনা আছে। চাঞ্চল্যের জন্য আমরা উৎসুক নহি, স্যার সেকেন্দারের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার কৌশল কতটা আছে জানি না; কিন্তু হক সাহেবের আছে, ইহা আমরা জানি; কিন্তু সে চাঞ্চল্য ভারতের রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণে সাহায্য করিবে, ইহা আমাদের কল্পনায় আসে না। তবে একথা সত্য যে, ভারতসচিব মিঃ আমেরীর নীতিতে অকংগ্রেসী রাজনীতিক নেতারাও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বাঙলার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহীত প্রস্তাবই তাহার প্রমাণ। কর্তৃপক্ষের নাকি ইহাতে কিঞ্চিৎ সমীহা জন্মিয়াছে এবং সত্বরই বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণ হইবে শুনা যাইতেছে। আমাদের মত এ সম্বন্ধে সুদৃঢ়। শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণে আমরা সন্তুষ্ট নহি। আমরা চাকুরীর ক্যাংলাকে প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী মোটেই না; কারণ সেই চাকুরীর মধ্যে দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দিবার যত প্রলোভনের জাল আমরা দেখিতে পাই এবং দীর্ঘ পরাধীনতায় দুর্বল এই মেরুমজ্জাহীন দেশে সেজন্য শঙ্কিত হই। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টে প্রকৃত কর্তৃত্ব যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন দেশের লোকে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না। চাকুরীর প্রলোভন কাহাকে কাহাকেও বিগড়াইতে পারে আমরা জানি; কিন্তু ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কিছুতেই চাকুরীর দায়ে স্বাধীনতার আদর্শে বিসর্জন দিতে পারিবে না। যদি কেহ তাহা দিতে রাজী হন, তিনি যত বড়ই মেকদার পুরুষ হউন না কেন, নব জাগ্রত ভারত তাহাকে সর্বতোভাবেই পরিবর্জন করিবে।

ব্রহ্মে বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ

আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা শিলং শহরে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন,—'ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত জাপানের যে বাণিজ্যবিষয়ক আলোচনা চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ হইলেই সে ব্রহ্মদেশ ও আসামের তৈল-সম্পদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। এই প্রসঙ্গে স্যার মহম্মদ সাদুল্লা উল্লেখ করেন যে, নিকটতম জাপানী কেন্দ্রের দূরত্ব আসাম হইতে দুই শত মাইলের বেশী হইবে না। আধুনিক সুসজ্জিত যে কোন বিমানপোত মাত্র দুই

চিরকালই সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রকোপ। গোঁড়া গ্রীক খৃষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে এখানে সাম্প্রদায়িকতার লড়াই দীর্ঘ দিন চলিয়াছিল। জার্মানেরা প্রচারকার্যে পটু—তাহারা সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে কি না বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, প্যারাশুট হইতে অবতরণকারী প্রচ্ছন্নচারী সৈন্যদিগকে শত্রু কি মিত্র, ইহা বুঝিয়া উঠা যাহারা সামরিক, তাহাদের পক্ষেই যখন কঠিন হইতেছে, তখন স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে তাহা আরও কঠিন; বিশেষত আধুনিক ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে তাহারা সজ্জিত নয়, তাহাদের সম্বল মাত্র লম্বা ছোরা। তারপর ক্রীটের আর একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, দ্বীপটি ছোট হইলেও যানবাহন গতিবিধির ভাল পথ, এক হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খুব কম জায়গাতেই আছে। কোন্ অঞ্চলে এবং কোথায় কি হইতেছে, যাঁহারা সমরনীতিজ্ঞ, তাঁহারাই তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা তো আরও কঠিন। গ্রীকদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব কিছু আছে, কিন্তু দেশ রাজনীতিক শিক্ষার দিক হইতে অনুন্নত। জার্মানী দলে দলে প্যারাশুট হইতে সেনা নামাইতেছে, সেনাদের সঙ্গে সাময়িকভাবে চলিবার উপযুক্ত রসদপত্রও কিছু কিছু থাকে; তারপরও শুনা যাইতেছে, পরীখা খনন করিবার তোড়জোড় এবং মসলাপত্রও নাকি তাহারা নামাইতেছে। মোটের উপর ক্রীটের লড়াইতে একটা এলোমেলো ব্যাপার চলিতেছে। রণাঙ্গন ইহার স্থির নাই, রণনীতিরও কিছু স্থিরতা নাই; সেনা সঞ্চালনে বিপদও রহিয়াছে সমূহ। আপাতত এক অঞ্চল কিছু শান্ত বুঝিয়া অপেক্ষাকৃত উপদ্রুত অঞ্চলের উপর জোর দিতে গেলে, প্রতিপক্ষ সেই অবসরে অপেক্ষাকৃত শান্ত অঞ্চলের উপরই জোর দিতে পারে এবং তাহাই হইতেছে। জার্মানদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, গ্রীসের উপকূলভাগ তাহাদের দখল থাকাতে। সেখানে বিমানবহরের পাকা ঘাঁটি তাঁহারা পাইয়াছে এবং রসদপত্র ও সমরোপকরণ মজুত করিতে সক্ষম হইতেছে। সুতরাং তাহারা সহজে যে নিরস্ত হইবে, ইহা মনে করা যায় না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন যে, অতি তীব্র হইতেছে এই সংগ্রাম; প্রকৃতপক্ষে হাতাহাতি এমন তীব্র সংগ্রাম এমন ক্ষেত্রে আর হয় নাই এবং বর্তমান যুদ্ধের নূতন অস্ত্রপ্রয়োগের পরীক্ষা-ক্ষেত্রও ইতিপূর্বে এমন আর কোন দিন দেখা যায় নাই। ক্রীটের লড়াইতেই জার্মানেরা শূন্যপথে সেনা আনিবার জন্য গ্লাইডার ব্যবহার করিয়াছে।

বলা বাহুল্য, ক্রীটের এই লড়াই চালাইতে নাকি জার্মানির প্রধান সম্বল হইল তাহার বিমানবহর এবং ইংরেজের প্রধান সম্বল হইল তাহার নৌবহর। ক্রীটের চতুর্দিকে এই নৌবহর বনাম উড়োজাহাজের লড়াই চলিতেছে। কোন্ শক্তি বড়? ইহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। নৌবহরের সুবিধা এই যে, ইহা দীর্ঘতম দূরত্বের বাধাও অতিক্রম করিতে পারে। ইংরেজের নৌবহরের প্রবল বাধা যদি না থাকিত, তাহা হইলে জার্মানি ইতিমধ্যে ক্রীট দখল করিয়া ফেলিত; কিন্তু ইংরেজের এই নৌবহরকেও ক্রীটের আশেপাশে অতি সঙ্কটের মধ্যে লড়াই করিতে হইতেছে। তিন দিন পর্যন্ত ইংরেজের নৌবহরের বাধার জন্য জার্মানেরা কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র বা সমরোপকরণ নামাইতে পারে নাই। কিন্তু উড়োজাহাজের আক্রমণ এড়াইয়া কাজ করিবার আতঙ্কও কম নয়। শত শত জার্মান বিমান ক্রীটের আশপাশে ছাইয়া রহিয়াছে এবং পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিয়াছে, আর প্যারাশুট-যোগে এক রকম সেনাবৃষ্টি করিয়াছে বলা যায়। অদ্ভুত এবং ভীষণ উত্তেজনাকর এই দৃশ্য। ক্রীট দ্বীপে ভাল বিমানবহরের ঘাঁটি নাই, এজন্য ইংরেজকে প্রথমে ক্রীট হইতে নিজেদের বিমানবহর সরাইয়া আনিতে হয়; এজন্য স্থল সৈন্যদের এবং নৌবহরের পক্ষে যে অসুবিধা না হইয়াছিল এমন কথা বলা যায় না এবং বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল, পরে ইহা ধরা পড়াতেই পুনরায় ইংরেজকে ক্রীটে উড়োজাহাজ পাঠাইতে হইয়াছে; কিন্তু উড়োজাহাজ পাঠানোতেই ভাল উড়োজাহাজ না থাকার অসুবিধা দূর হইয়াছে ইহা বুঝায় না। নিউজীল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উড়োজাহাজ সরাইয়া আনার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; তিনি সেই কথাটা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'শত্রুদের উড়োজাহাজের ঘাঁটিগুলি আমাদের এত কাছে যে, উড়োজাহাজ দ্বারা আক্রমণের এত সুবিধা অন্য কোথায়ও হয় নাই। এই উড়োজাহাজের সাহায্য না পাওয়াতে আমাদের সৈন্যদিগকে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে।' উড়োজাহাজের দ্বারা ক্রীটের মত স্থানে শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যেমন সহজ নৌবহরের দ্বারা ততটা সম্ভব নহে। ক্রীটের চারিদিকে গ্রীসের কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ রহিয়াছে; এই সব দ্বীপে জার্মানেরা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। বিশেষত ইটালির দোদেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জ ক্রীট হইতে বেশী দূরে নয়, সুতরাং কেমন করিয়া ভাঁওতা দিয়া বৃটিশ শক্তির দৃষ্টি এড়াইয়া ক্রীটে সেনা নামান যায় জার্মানেরা আছে সেই চেষ্টায় এবং সর্বতোভাবে তাহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ করা ক্রীটের রক্ষা-ব্যবস্থা যতই সতর্কতামূলক হউক না কেন, ষোল আনা সার্থক হইতে পারে না। ক্রীটের যে অঞ্চলে লোকজনের বাস খুব বেশী, দেখা যাইতেছে, জার্মানেরা সেই অঞ্চলেই সেনা নামাইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং এখন জেলোভিঙ্গীতে করিয়া সেনা নামাইতেছে। জার্মানেরা নাকি উড়োজাহাজ হইতে মায়া-সৈনিক নামাইতেছে, অর্থাৎ মানুষের মত পুতুল গড়িয়া সেইগুলি নামাইতেছে, ইহাতে বৃটিশ পক্ষে গোলাগুলী নিরর্থক ক্ষয় হইবে এবং স্থল-বিশেষে এইভাবে বৃটিশ পক্ষকে বিভ্রান্ত করিয়া অন্যত্র নিজেরা জোর দিতে পারিবে, ইহাই হয়ত তাহাদের মতলব। বৃটিশ পক্ষ হইতে ক্রীটের এই লড়াইয়ের পুরা খবর বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না, যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা আশ্বাসমূলক হইলেও লড়াইয়ের ফলাফল সম্বন্ধে সেগুলির দ্বারা সুনিশ্চিত কোন ধারণা করা যায় না এবং করাও নিরাপদ

নহে। সুবিধা অসুবিধা দুই পক্ষেই চলিতেছে এবং ক্রীটের সংগ্রামের তীব্রতা উভয়পক্ষেই সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্মানেরা যখন গোঁ ধরিয়াছে, তখন তাহারা নিরস্ত হইবে না, ইহা বুঝা যাইতেছে। হিটলার দারুণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াই এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং জার্মানপক্ষ জলের মত জীবন ব্যয় করিতেছে ক্রীটের লড়াইয়ের সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই। যে কথা শুনা যাইতেছে, যদি তাহাই সত্য হয়, অর্থাৎ জার্মানি রুশিয়ার সঙ্গে এমন একটা সামরিক সন্ধি করিতে পারে, যাহার দ্বারা ইরাণের ভিতর দিয়া ইরাকে সেনা পাঠাইতে পারে, তাহা হইলে ক্রীট এবং সাইপ্রাস দ্বীপের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে—এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিস্থিতির এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই গ্রীস গভর্নমেণ্টকে ক্রীট হইতে মিশরে সরান হইয়াছে। গত ২৩শে মে অতি সঙ্কটজনক অবস্থা কাটাইয়া গ্রীকরাজ মিশরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

ভূমধ্যসাগরের তীরভাগে জার্মানির রণনীতি কৌশলই দেখা যাইতেছে, বৃটিশ বাহিনীকে এইভাবে চিমটার মত, সম্মুখে এবং পিছনে দুই দিক হইতে আক্রমণ করা। বৃটিশ-পক্ষ ক্রীটের দিকে সেনা প্রেরণের উপর যেই জোর দিবে, অমনই জার্মানি মিশরে জোর দিবে, নতুবা রসিদ আলীর ইংরেজের উপর আক্রমণটা তীব্রতর করিতে চেষ্টা করিবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ভিসি গভর্নমেণ্টকে সে দিব্য হাত করিয়া লইয়াছে। ফ্রান্সের ব্রেস্ট, বোর্দো এবং উপকূলভাগের অন্যান্য সুবিধাজনক স্থান হইতে তাহারা বৃটিশ নৌশক্তির উপর আক্রমণ চালাইতেছে, বৃটিশ দ্বীপের প্রবেশপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া আমেরিকা হইতে ইংরেজের সাহায্য পাইবার পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। জার্মানির এই নৌ সংগ্রামের ফলাফল বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে না, তবে বৃটিশ সামরিকগণ স্বীকার করিতেছেন যে, গত কয়েক মাসে এই দিক হইতে ইংরেজের ক্ষতি সাংঘাতিক রকমের। জার্মানির সঙ্গে নৌ-সংগ্রামে সেদিন ইংরেজের প্রসিদ্ধ বৃহত্তম রণতরী 'হুড' জলমগ্ন হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, ইংরেজের নৌশক্তিকে ঘায়েল করিবার জন্য জার্মানি এই যে চেষ্টা করিতেছে, এই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার উপর ইংরেজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই নৌশক্তির জোর ইংরেজের আছে বলিয়াই ইংরেজ আমেরিকার ফ্যাক্টরী সমরোপকরণের সাহায্য পাইতেছে এবং জার্মান উড়োজাহাজের আক্রমণ সত্ত্বেও নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিতেছে। ইংরেজের এই নৌশক্তির জোর আছে বলিয়াই নিউজীল্যান্ড ইংলণ্ড হইতে ১২ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও ইংরেজ নিউজীল্যাণ্ডের সেনার সাহায্য পাইতেছে। ক্রীটের লড়াইতেও ইংরেজের এই নৌশক্তিরই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং এই লড়াই হইতে বুঝা যাইবে, বৃটিশ নৌবহরের প্রাধান্যজনিত অসুবিধাকে উড়োজাহাজের সাহায্যে বা অন্য কোন আকাশযানের যোগে অতিক্রম করিবার মত নূতন কিছু সমরকৌশল জার্মানেরা প্রয়োগ করিতে পারিবে কি না।

ব্রিটিশের নৌশক্তি জার্মানীকে অনেকটা কাবু করিয়া রাখিয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। জার্মানী এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিবে, ভূমধ্যসাগরের দিকে তাহার প্রচেষ্টার মূলে এই উদ্দেশ্যই রহিয়াছে। হিটলার যদি পশ্চিম এশিয়ায় নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহা হইলে ইরাকের তেল এবং প্যালেস্টাইনের মালপত্র তাঁহার কর্তৃত্বে পড়িবে। ইরাক হইতে তেলের দুই লাইন—একটি হাইফা, অপরটিতে ত্রিপোলী গিয়াছে। এই দুইটি হিটলার দখল করিবেন। বল্কান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিয়া হিটলার তুরস্কের সঙ্গে ইংরেজের যোগসূত্র অনেকটা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই নীতিকে সম্প্রসারিত করিয়া তিনি কৃষ্ণসাগর এবং দার্দেনেলিসের পথে গ্রীস ঘুরিয়া এড্রিয়াটিকের পথে ইটালীর ট্রীয়েস্ট বন্দরে বাটুম হইতে তেল আনিতে পারেন। কিন্তু এই পক্ষে প্রধান বাধা হইতেছে ক্রীট দ্বীপ। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গ্রীসের দ্বীপগুলি তাঁহার হাতে আসাতে এবং ইটালীর অধিকারভুক্ত দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ নিকটে থাকাতে বিমানবহরের দ্বারা তিনি ইংরেজের নৌবহরকে অনেকটা কাবু করিয়া রাখিতে সুবিধা পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া জার্মানদের ডুবোজাহাজ আছে, দ্রুতগামী মোটরবোট আছে, এইগুলি বর্তমানে ঈজিয়ান সাগরে তৎপর রহিয়াছে। সুতরাং জার্মানদের এই অঞ্চলে জাহাজের জোর না থাকিলেও তাহাদের উড়োজাহাজের শক্তিও কম নয়। ক্রীটের আট দিনের লড়াইতে জার্মানীর বোমার আঘাতে ইংরেজের ২খানা ক্রুজার এবং ৪খানা ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়াছে। দুইখানা রণতরী এবং কয়েকখানা ক্রুজার জখম হইয়াছে।

মোটের উপর ক্রীটের লড়াইয়ের গুরুত্ব নানাদিক হইতেই বেশী। ক্রীট এবং সাইপ্রাস জার্মানি যদি দখল করিতে পারে এবং সিরিয়ায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে মিশর এবং প্যালেস্টাইনকে বৃটিশের হাতছাড়া করিবার উদ্যমে সে যে অনেকখানি আগাইয়া যাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।
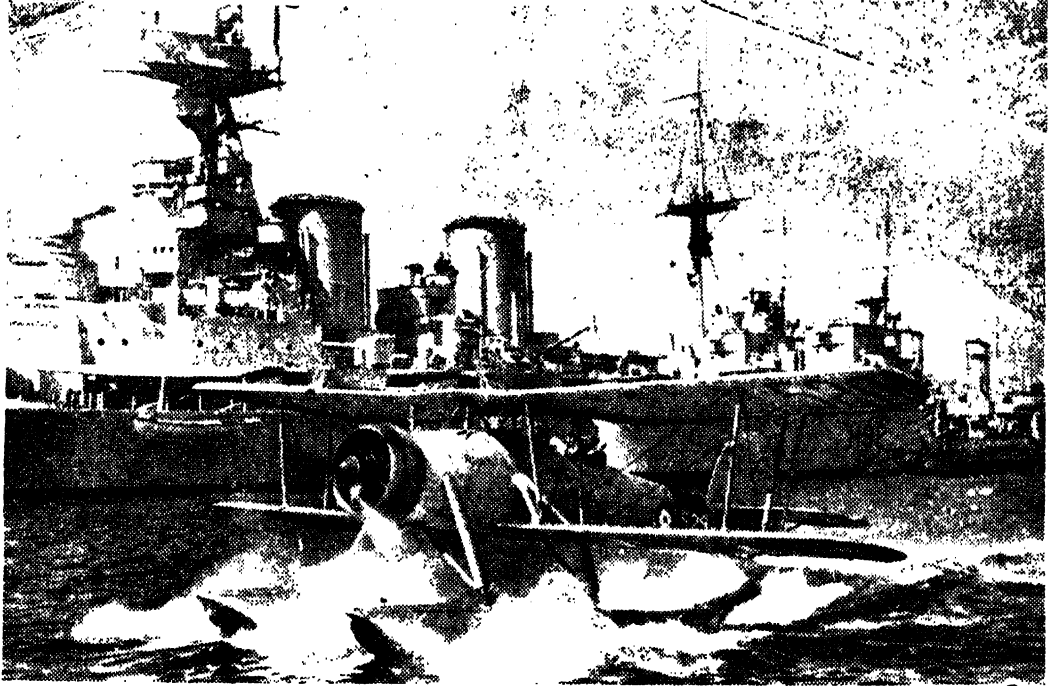
বৃটিশের বৃহত্তম ব্যাটল ক্রুজার (৪২,১০০ টন) গ্রীনল্যাণ্ডের নিকটে জলমগ্ন হইয়াছে
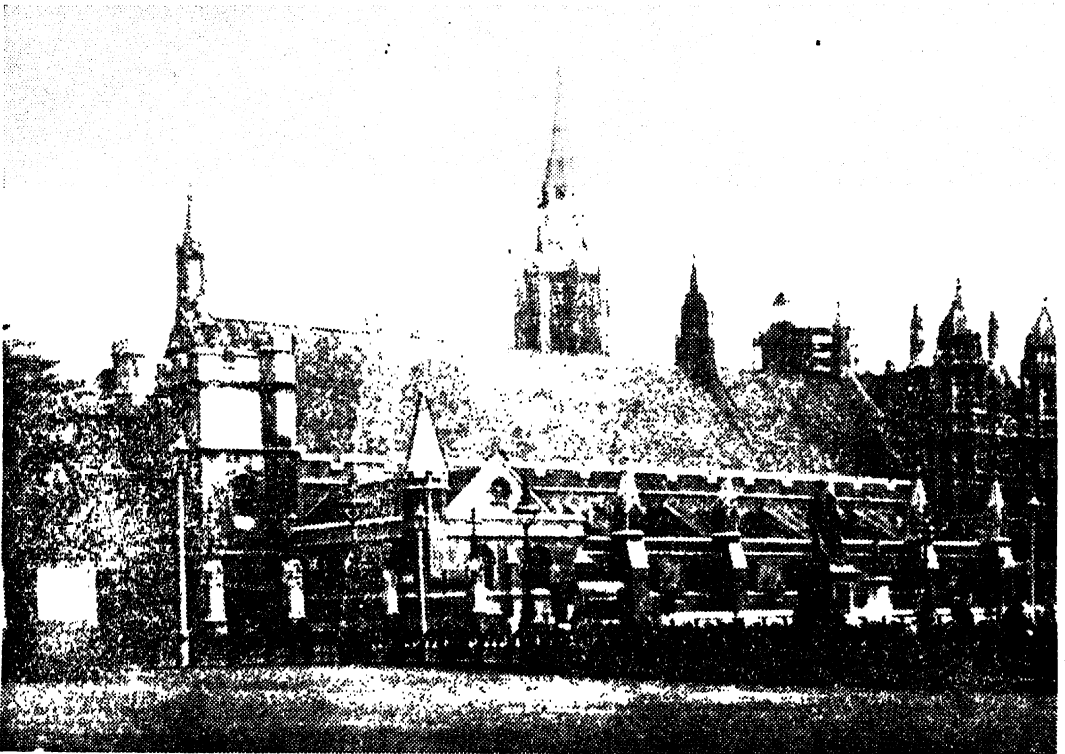
লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হল: সম্প্রতি জার্মান বিমান আক্রমণে ইহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(২৫)

যোগেশ চলিয়া গেলে শোভা অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঝটিকাবিধ্বস্ত প্রকৃতির মত সে স্তব্ধতা—বিপর্যয়ের অসাড়, অনড়, নগ্ন প্রতিরূপ।

এক ঘণ্টাও হয়ত হইবে না অথচ ইহারই মধ্যে তাহার জীবনে কি যেন একটা ওলোট পালোট হইয়া গিয়াছে।

সেই বাড়ি, সেই ঘর, সেই পরিচিত প্রতিবেশ। এতদিন এমনই স্বামীসঙ্গহীন জীবন একাকিনী সে এই প্রতিবেশের মধ্যেই কাটাইয়া আসিয়াছে। অথচ আজ সামান্য একঘণ্টার মধ্যেই কি না বিপর্যয় ঘটিয়া গেল!

বুকের মধ্যে কেবল একটা তিক্ততার অনুভূতি, একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ, একটা ব্যর্থতার বেদনা।

অনুভূতির ছিন্ন সূত্রগুলিকে গুছাইয়া একটা সমন্বয়ে আনয়ন করিবার জন্য শোভা মনে মনে প্রয়াস পাইতেছিল।

দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। সেই শব্দে সচেতন হইয়া শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল—কতকটা সুপ্তোত্থিতের মত।

সে বিহ্বলদৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চাহিল—দশটা বাজিয়াছে—দশটা?

তাহার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি গিয়া পড়িল যোগেশের আলোকচিত্র-খানির উপর—অতীশের দেওয়া ফুলগুলি তখনও উহার চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

শোভার মনে পড়িল যোগেশ আসিয়াছিল, আসিয়া ঐ ঘরের মধ্যেই তাহার মুখের উপরে অতীশের নাম লইয়া তাহাকে সে কলঙ্ক দিয়া গিয়াছে।

শোভার আরও মনে পড়িল অতীশকে সে আজ রাত্রে এই বাড়িতে খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু এখনও সে আসে নাই।

যোগেশ—অতীশ—কলঙ্ক!—শোভার মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতে লাগিল।

মিনিট দুই পরে সে সশব্দে দ্বার খুলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ঝিমা, ও ঝিমা।"

কামিনীর মা সম্মুখে আসিল না, দূরে হইতে সাড়া দিল মাত্র।

"অতীশবাবু এসেছেন কি?" শোভা জিজ্ঞাসা করিল।

"কি জানি মা," কামিনীর মা বিরক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "অতীশ-বাবু এসেছেন কি না তা তুমিই জান।"

শোভা এ মন্তব্যের কোন প্রত্যুত্তর করিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে দারোয়ানকে ডাকিয়া তখনই অতীশের মেসে গিয়া তাহাকে একেবারে সঙ্গে করিয়া এ বাড়িতে লইয়া আসিবার আদেশ করিল।

দারোয়ান হুকুম তামিল করিবার জন্য বাহির হইয়া গেলে কামিনীর মা ধীরপদবিক্ষেপে শোভার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "বউমা, তুমি কি? লজ্জা, সঙ্কোচ, ডর কিছুই কি তোমার নেই? আজও কি অতীশবাবুকে এ বাড়িতে না ডাকলে চলত না?"

দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে অনলবর্ষণ করিতে করিতে শোভা ঝি'র মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "নিজের কাজ করগে' ঝি। আমার নিজের বাড়িতে কাকে আমি ডাকব আর কাকে ডাকব না তা আমিই ভাল জানি। তোমার লেকচার তুমি এ বাড়ির বাবুকে শুনিয়ো, আমাকে নয়।" বলিয়াই সে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সশব্দে পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দনের শব্দ হইল না, কিন্তু অশ্রুজলে উপাধান ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া অতীশ ডাকিল, "মেজদি', ও মেজদি'।"

শোভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব ড্রেসিং টেবেলের বড় আয়নাখানির উপর প্রতিফলিত হইয়া উঠিল—বিস্রস্ত বেশ, অবিন্যস্ত কেশরাশি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুইটি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে; অঞ্জন চোখের জলে গলিয়া গণ্ড, বুক এবং ললাটেরও কতকটা অংশ কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া শোভা নিজেই যেন শিহরিয়া উঠিল—ওঃ, কি বিশ্রীই না সে দেখিতে হইয়াছে!

বাহির হইতে অতীশ আবার ডাকিল, "মেজদি', ও মেজদি'!"

শোভা ধরা গলায় উত্তর দিল, "তুমি একটু ওঘরে গিয়ে বোসো আমি আসছি।"

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া অনেকক্ষণ পর শোভা যখন অতীশের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখনও তাহার মুখের উপরে একখানি কালোমেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু অতীশকে লক্ষ্য করিয়া সে লঘু পরিহাসের কণ্ঠে কহিল, "এত দেরী করলে যে? আমার বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণে ডাকবার জন্য লোক পাঠাতে হল, এমন ত আগে কখনও হয় নি!"

অতীশ সঙ্কুচিত হইয়া অপ্রতিভের মত কহিল, "শরীরটা আজ মোটেই ভাল নেই মেজদি', কাল থেকেই—"

"শরীর না মন?" শোভার কণ্ঠস্বর ঈষৎ তিক্ত শুনাইল, তোমাদের পুরুষমানুষদের বাপু হদিস পাওয়া ভার। জুজুর ভয়, চোরের ভয়—এতেই তোমরা দিনরাত সন্ত্রস্ত থাক। অথচ বড়াইএর তোমাদের অন্ত নেই। তবু যদি চোরের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াই করবার মত সাহস ও শক্তি তোমাদের থাকত!"

ইঙ্গিতটা যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া করা হইল অতীশ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বলত মেজদি'? দারোয়ানের কথা আমি ভাল বুঝতে পারছিলাম না।"

"হবে আবার কি!" বলিয়া শোভা অনর্থক ফুলদানীটা এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় স্থাপন করিল।

অতীশ অপেক্ষাকৃত নতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেশবাবু নাকি এখানে ওঠেন নি? আর এখানে এসে ঘণ্টাখানিক থেকেই চলে গেছেন?"

"শুনেছ ঠিকই।" শোভা একখানি চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল।

"কেন?"

"কেন জানি না বাপু," শোভা কণ্ঠস্বরে ঝঙ্কার তুলিয়া উত্তর দিল, "মেয়েদের মন জুগিয়ে চলা তোমরা পুরুষমানুষেরা মনে কর কাপুরুষতা, আর তোমাদের মন জুগিয়ে আমাদের চলতেই হবে। না পারলেই—পান থেকে চুণ খসলেই, একেবারে প্রলয়।"

অতীশের কণ্ঠে উত্তর ফুটিল না, সে বিহ্বলদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শোভা ধমক দিয়া কহিল, "হাঁ করে দেখছ কি?"

অপ্রতিভ হইয়া অতীশ দৃষ্টি নত করিল। একটু পরে শোভা তপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার দাদা চলে গেছেন তাঁর শুচিতা আর বাহাদুরি বজায় রাখতে। যে জিনিস রাখবার তার নিজের মুরোদ নেই, আর একজন তাই দখল করে নিয়েছে ভেবে তাঁর রাগ ও ক্ষোভের আর সীমা নেই।"

অতীশ আবার শোভার মুখের দিকে চাহিল, শোভা ব্যঙ্গের তীক্ষ্মকণ্ঠে কহিল, "যা আমি করতে পারতাম, তা আমি করিনি। তারই পুরস্কারে তিনি আজ আমায় দিয়ে গেছেন তাঁর শ্লেষ আর ধিক্কার। তবু তোমরা বলবে যে অদৃষ্ট নাকি নেই!"

অতীশ ঠিক ঠিক কিছুই বুঝিল না; কিন্তু শোভা যে ব্যথা পাইয়াছে সেইটুকু বুঝিয়াই সমবেদনায় গলিয়া গিয়া সে আঘাত-কারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ব্রুট্।"

"আর তুমি?" শোভা অধিকতর তীক্ষ্মকণ্ঠে কহিল, "তোমরা সবাই সমান বাহাদুর। এখানে আজ আসবার সাহস পর্যন্ত তোমার হয় নি।"

অতীশ দৃষ্টি নত করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "সাহসের অভাব নয় মেজদি'। আমি ভেবেছিলাম যে আমার দরকার আর নাই।"

"নিশ্চয় আছে," শোভা উত্তর দিল, "এখন তোমাকে আমার আরও বেশী দরকার।"

অতীশ মুখ তুলিয়া শোভার মুখের দিকে চাহিল—দেখিল উত্তেজনায় সে মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, দুই চক্ষের দৃষ্টি শাণিত ছুরিকার মত তীক্ষ্ম, বিদ্যুতের আলোকে কাণের দুল দুইখানি হইতেও দ্যুতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল।

অতীশ সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমি আগেও তোমায় বলেছি মেজদি', আজও বলছি—তোমার জন্য আমি না করতে পারি এমন কাজ নেই। ওটা বাঁদর—মুক্তোর মালার কদর সে বুঝলে না। কিন্তু—"

ঠিক এই সময়েই কামিনীর মা বাহির হইতে তীক্ষ্মকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খাওয়া দাওয়া কি আজ আর হবে না বৌমা? এরা আর কতক্ষণ হেঁসেল আগলে বসে থাকবে?"

শোভা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "না, আর দেরী নেই। তুমি আমাদের দুজনের খাবার ঠিক করতে বল।"

কামিনীর মায়ের পদশব্দ দূরে মিলাইয়া গেলে অতীশ শোভার মুখের দিক চাহিয়া কহিল, "কিন্তু মেজদি', আমি যে খেয়ে নিয়েছি আগেই। এখন আর—"

"ও সব অজুহাত চলবে না," শোভা কহিল, "সারাদিন অনেক যত্ন করে নিজের হাতে আমি সব খাবার তৈরী করেছি। সেসব ফেলা যেতে পারে না।"

অতীশ বিব্রতের মত মাথা চুলকাইতে লাগিল।

একটু পরে শোভাই পুনরায় কহিল, "যার জন্য এসব তৈরী করেছিলাম সে খেলে না। তার অদৃষ্টে নেই—আমি কি করব?" শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

অতীশ আবার শোভার মুখের দিকে চাহিল, শোভাও চাহিল। দৃষ্টি পড়িল চোখে চোখে।

শোভার চক্ষু দুইটি সহসা অস্বাভাবিক রকমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "শুধু একা তোমার খাবারই নয় অতীশ; ওঁর জন্য যা আমি তৈরী করেছি তাও আজ তোমাকেই খেতে হবে। সব আমি তোমাকেই দেব।"

অতীশের মুখের হাসি দেখিতে দেখিতে কাণ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু খাইতে বসিয়া কেহই বড় একটা খাইতে পারিল না। শোভা দুই একটি জিনিষ ছাড়া আর কিছু স্পর্শই করিল না, অতীশও সামান্য কিছু খাইয়াই হাত তুলিয়া বসিল।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া পানের খিলিটি হাতে তুলিয়া লইয়া অতীশ গম্ভীরস্বরে কহিল, "সত্যি মেজদি', তোমায় দেখে কেবলই আমার একটা উপমার কথা মনে পড়ে। তুমি আদিম যুগের উর্বরা বসুন্ধরার মত—বৎসরের পর বৎসর শস্যশষ্পফলফুলের অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে তুমি বিকশিত হয়ে উঠছ, অথচ উপেক্ষায় অনাদরে তা সব নষ্ট হচ্ছে। ওঃ! কি শোচনীয় অপচয়!"

শোভার ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। অতীশ সহসা শোভার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "ঢের হয়েছে মেজদি', আর না। তোমার জীবনের এমন শোচনীয় অপচয় আর তুমি হতে দিও না।"

শোভা একটু দূরে সরিয়া গিয়া কহিল, "আজ অনেক রাত হয়েছে অতীশ, তুমি এখন যাও। কিন্তু কাল এসো ভাই, একটু সকাল করেই এসো—আবার যেন লোক পাঠাতে না হয়।" বলিয়া সে নিজেই বাহির হইয়া শুইবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পরদিন অতীশ কলেজ হইতে মেসে না ফিরিয়া সোজা একেবারে শোভার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অপরাহু তখন প্রায় চারিটা।

কামিনীর মা সিঁড়ি বারান্দায় নিজের শয্যা বিছাইয়া তখনও অকাতরে দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছিল, অতীশ তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া নতকণ্ঠে শোভার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

নিদ্রারক্ত চক্ষু দুইটি অধিকতর আরক্ত করিয়া কামিনীর মা বিরক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "কি জানি বাপু। দুপুর থেকেই শুয়ে আছেন, শুনেছি নাকি মাথা ধরেছে।"

অতীশ কণ্ঠস্বর আরও একটু নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর উনি—যোগেশবাবু?"

ঝি নিজের শয্যাটি ক্ষিপ্রহস্তে গুটাইতে আরম্ভ করিয়া ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে উত্তর দিল, "সে আসবে এই বাড়িতে? রাসলীলা দেখতে? ছি ছি! কর্তা এমন বউ ঘরে এনেছিলেন—সোনার ছেলেকে সে সন্ন্যাসী করে ছাড়লে।"

বৃদ্ধা উঠিয়া আপনমনে গজর গজর করিতে করিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অতীশ ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া পরে জুতার শব্দে সমস্ত বাড়ি সচকিত করিয়া শোভার ঘরের বন্ধ দ্বারের সম্মুখে গিয়া ডাকিল, "মেজদি', ও মেজদি'।"

ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, "এস, দরজা খোলাই আছে।"

দ্বার ঠেলিয়া সহাস্যমুখে অতীশ ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

শোভা শয্যায় শুইয়াছিল, সে উঠিল না, অতীশের দিকে চাহিয়াও দেখিল না; অঞ্চলে বুক ও বাহুখানি আবৃত করিয়া মুখখানি উপাধানের মধ্যে আরও একটু গুঁজিয়া দিয়া ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, "বড্ড মাথা ধরেছে ভাই।"

"মাথা ধরেছে? ব্যাপার কি? জ্বরটর নয় ত? শহরে আবার যা টাইফয়েড্ হচ্ছে!" বলিতে বলিতে অতীশ শোভার মাথার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

শোভা এবারও মুখ তুলিল না, শুধু কহিল, "না, জ্বর নয়। খালি মাথাধরা। তুমি বস।"

একখানি চৌকি খাটের কাছে টানিয়া লইয়া অতীশ উপবেশন করিল।

পাশ ফিরিয়া অর্ধমুদিত চক্ষের আরক্তদৃষ্টি পলকের জন্য

একবার অতীশের মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "এই অসময়ে যে? কলেজে যাও নি?"

"কলেজ আজ একটু সকালেই ছুটি হয়েছে," অতীশ উত্তর দিল, "কলেজ থেকেই সোজা এখানে আসছি।"

"খেয়ে আসনি তাহলে?" শোভা জিজ্ঞাসা করিল।

"খাওয়া একটু পরে হলেও চলবে," বলিয়া অতীশ লজ্জিত হাসিমুখ নত করিল।

শোভা এইবার পূর্ণদৃষ্টিতে অতীশের মুখের দিকে চাহিল, তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল, "পরে কেন? খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই হবে। কিন্তু ভাই, আমাকে আজ মাপ করতে হবে। শরীর আমার ভাল নেই, আজ আর আমি খাবার তৈরী করতে পরব না।"

অতীশ উত্তরে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শোভা তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না। শুইয়া শুইয়াই সে ঝিকে ডাকিয়া লুচি, তরকারি ও চা প্রস্তুত করাইবার আদেশ দিল।

অতীশ বসিবার চৌকিখানি খাটের আরও নিকটে আনিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মাথায় খুব কি যন্ত্রণা হচ্ছে মেজদি'? একটু ওডিকলোন লাগিয়ে দেব?"

শোভা হাসিমুখে অতীশের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "না ভাই, অত সুখ আমার সইবে না। তার চাইতে ঐ দেরাজে এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট্ আছে, তারই একটা বার করে আন দেখি, আর একটু জল।" বলিতে বলিতে সে উঠিয়া বসিল।

খানিকটা জলের সংগে ঔষধটি গলাধঃকরণ করিয়া শোভা খাটের বাজুর উপর হেলিয়া বসিয়া ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, "কলকাতায় আর ভাল লাগছে না অতীশ। ভাবছি, আর কোথাও যাব।"

"সে কথা ত হয়েই আছে," অতীশ সোৎসাহকণ্ঠে কহিল, "এই কদিন পরেই আমার ছুটি আরম্ভ হবে। চল কোন পাহাড়ে।"

শোভা অতীশের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "এখানে হচ্ছে রাসলীলা, আর সেখানে কোন লীলা হবে বল ত!"

মুখ লাল করিয়া উত্তরে অতীশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে কথা ফুটিবার পূর্বেই দ্বার ঠেলিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল প্রথমে কামিনীর মা ও তাহার পশ্চাতে যোগেশ।

পলকে কি যেন একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল। অতীশের লাল মুখ দেখিতে দেখিতে ছাইএর মত শাদা হইয়া গেল। সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শোভাও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া খাট হইতে নামিবার উদ্দেশ্যে পা দুইখানি নীচে নামাইয়া দিল।

বাধা দিল যোগেশ। কহিল, "থাক্ থাক্। তুমি উত্তেজিত হয়ো না শোভা, তাতে মাথাধরা বেড়ে যাবে। আমি এসেছি তোমার সংগে একটা দরকারী কাজের জন্য। খুব বেশী সময় তোমার আমি নেব না।"

শোভা কহিল, "তুমি আগে বোসো।" অতীশের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "একে এখন হয়ত তুমি চিনতে পারবে না। তবে এর ছেলেবেলায় একে তুমি অনেকবার দেখেছ। এরই নাম অতীশ।"

অতীশ মুখখানি হাসিবার মত করিয়া হাত তুলিয়া যোগেশকে নমস্কার করিল।

কোনরকমে একটা প্রতিনমস্কার করিয়া যোগেশ নীরসকণ্ঠে কহিল, "বেশ বেশ। বহুদিন পর দেখা হল, বড় সুখের কথা। ভাল আছেন আপনি?"

"হেং হেং," অতীশ অনবরত ঢোঁক গিলিবার অবসরে শুষ্ক-কণ্ঠে কহিল, "আপনি এসেছেন তা শুনছিলাম মেজদি'র কাছে। তা বসুন আপনারা আমি এখন তবে আসি মেজদি'।"

শোভা শান্ত সংযতকণ্ঠে কহিল, "সে কি কথা! চা না খেয়েই তুমি যাবে নাকি!" কামিনীর মাকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, "ঐ ঘরে বাবুকে চা ও খাবার দাও!"

অতীশ যোগেশকে এড়াঁইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শোভা পুনরায় কহিল, "খেয়েই চলে যেওনা যেন আমাকে না জানিয়ে। আমাদের অনেক কথা আছে তোমার সংগে।"

(২৬)

অতীশ ও ঝি বাহির হইয়া গেলে নিজের হাতে দ্বার ভেজাইয়া দিয়া যোগেশ শোভার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল অদ্ভুত, কঠিন এক টুকরা হাসি।

শোভা কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলে যে! বোসো।"

যোগেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "বড্ড অসময়ে এসে পড়েছি, না শোভা? সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার। আগে খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল।"

শোভা যোগেশের মুখের দিকে একবার চাহিয়াই দৃষ্টি নামাইয়া লইল, কহিল, "তা যখন দাওনি, এখন দুঃখ করে কোন লাভ নেই। তুমি বোসো।"

"বসবার দরকার নেই," যোগেশ কহিল, "একটা কাজ আছে, তা দু' মিনিটে শেষ করেই আমি চলে যাব।" বলিতে বলিতে সে কামিজের পকেট হইতে বড় একখানি খাম টানিয়া বাহির করিল।

শোভা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খাট হইতে নামিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কাজের জন্যই যখন এসেছ তখন তোমার কাজের কথা তুমিও বলবে, আমিও শুনব। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা শোন তুমি।" একটু থামিয়া সে যোগেশের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "লোকের কাছে যা শুনেছিলে, আজ নিজের চোখে তা তুমি দেখলে। তবে শুনে যা তুমি ভেবেছ তাও যেমন সত্য নয়, আজ দেখে যা তুমি ভাবছ তাও তেমনই অসত্য।"

যোগেশের ওষ্ঠপ্রান্তে আবার এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "তোমার কথা যে দর্শনশাস্ত্রসম্মত তা স্বীকার করি। এই মায়াময় সংসারে যা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় তা সবই মিথ্যা, মায়া। সত্য তাই যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।" একটু থামিয়া সে কঠিন কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু এসব সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করবার অবসর আজ আমার নেই। এখন দয়া করে এটা গ্রহণ করে তাড়াতাড়ি আমায় ছুটি দাও," বলিতে বলিতে সে খামখানি শোভার দিকে বাড়াইয়া দিল।

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়াইয়া উহা গ্রহণ করিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "কি আছে এতে?"

যোগেশ একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া এতক্ষণ পর উপবেশন করিল এবং পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্বেদসিক্ত মুখমণ্ডল মুছিতে মুছিতে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কহিল, "ওতে আছে আমার দানপত্র। আমার যা কিছু সম্পত্তি সব তোমার নামে লিখে দিয়ে একেবারে রেজেষ্টারি করিয়ে এনেছি। এ দলিল তোমাকে আর্থিক দাসত্ব থেকেও মুক্তি দেবে।"

শোভা বিহ্বল দৃষ্টিতে যোগেশের দিকে চাহিয়া যেন বিষয়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অর্থ যখন তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল তখন খামখানি যোগেশের পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চাই না আমি তোমার সম্পত্তি। তোমার সংগে আমার

যা সম্বন্ধ তা যদি আমি কাটাতে পারি, তবে তোমার সম্পত্তির মায়াও আমি কাটাতে পারব।"

যোগেশ ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "সেটা বুদ্ধিমতীর কাজ হবে না শোভা। প্রেমে তোমার বুকই ভরবে, পেট ভরবে না।"

শোভা সহসা যোগেশের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে একেবারে কেটে ফেল; কিন্তু এমন করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় মেরো না। আমায় বিশ্বাস কর—কোন দোষ আমি করি নি।"

যোগেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া ক্ষণকাল ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইল, তারপর ফিরিয়া গিয়া শোভাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি তোমায় দোষী বলি নি শোভা—সংসারে সকলে তোমায় দোষী বললেও আমি তোমায় দোষী বলব না। আমি যে তোমার যোগ্য নই সে কথা আমার চাইতে বেশী আর কেউ ত জানে না!"

শোভা যোগেশের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "এ মিথ্যা—সব মিথ্যা কথা।"

যোগেশ নিজের হাত টানিয়া লইয়া চৌকিখানি আরও একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গেল, তারপর পূর্বের মতই স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "এসব সত্য। কেবল অভাবের মানদণ্ডেই যোগ্যতা বা অযোগ্যতার মাপ হয় না, প্রাচুর্য্যের মাপেও তার বিচার করা চলে। অযোগ্যতা অসামঞ্জস্যেরই একটা বিশেষ রূপ। রূপগুণের অভাবের জন্যই হউক আর প্রাচুর্যের জন্যই হউক, তোমার সঙ্গে আমার সামঞ্জস্য হয় নি; আমি তোমার অযোগ্য। তোমার অন্তর তোমার যোগ্য সাথীকে বেছে নিয়েছে। এই স্বাভাবিক, সুতরাং ভাল।" একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল, "বেশ হয়েছে শোভা। যাকে তুমি পেয়েছ সে তোমার স্বশ্রেণীর লোক। আমি যা পারি নি, সে তা পেরেছে। তার ভালবাসায় তার সাহচর্যে তোমার অন্তরের পিপাসা এতদিন পর পরিতৃপ্ত হয়েছে। আমি বলি যে, এ বেশ হয়েছে শোভা।"

শোভা কাতরকণ্ঠে কহিল, "তোমার অনুমান সত্য হলেই না হয় বেশ হয়েছে। কিন্তু এ যদি সত্য না হয়?"

যোগেশ বিরত হইল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই সে পূর্ণদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "বেশ ত। এ সত্য যদি নাই হয়, তবে তুমি হবে এ যুগের সীতা—বিনাদোষে পরিত্যক্তা, অকারণে নির্যাতিতা সতীলক্ষ্মী। বিশ্বসংসার তোমার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠবে। সেও ত কম লাভ নয়।"

"না না", শোভা কাতরকণ্ঠেই উত্তর দিল, "আমি প্রশংসা চাইনা, আমি তোমাকে চাই।"

যোগেশের ওষ্ঠপ্রান্তে আবার কঠিন একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "এই দেখ; তুমি সীতা বা সাবিত্রীর জাতের মেয়ে নও। যতখানি ত্যাগ করতে পারলে সীতা হওয়া যায় সে ত্যাগ করবার শক্তি তোমার নেই। সীতার নামই তুমি হয়ত মুখে জপ করেছ, তার আদর্শ কোনদিনই তোমার অন্তর গ্রহণ করে নি।"

শুনিতে শুনিতে বেদনায় শোভার বিবর্ণ মুখ অধিকতর বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, বোধ করি তাহাই লক্ষ্য করিয়া যোগেশ প্রসঙ্গটির মাঝখানেই থামিয়া গেল এবং অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু এ আমি অভিযোগ করছি না শোভা। যা অসম্ভব তাকে আদর্শ করে খাড়া করলেই তা সম্ভব হয় না। কবির যে স্বপ্ন, যে আদর্শ সীতার মধ্যে রূপ পেয়েছে সে এক অসম্ভব আদর্শ। রক্তমাংসের নারী দূরে থেকে তাকে দেখে মুগ্ধ হতে পারে, কিন্তু ঐ আদর্শকে সে নিজের জীবনে বাস্তব করে তুলতে পারে না। আমাদের সমাজে সীতার মত সতী হতে পারে তারাই, দৈবক্রমে যাদের চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার মিল ঘটে গেছে। সে সৌভাগ্য যাদের হয়নি, তাদের কেউ যদি সীতা হতে না পারে তবে তার মুখে চুণকালি মাখিয়ে তাকে সমাজের বাইরে দূর করে দেব বা ঠেঙিয়ে তাকে সীতা করতে যাব তেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আমি নই। নই বলেই তোমার বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই।"

শোভা অসহায়ের মত কহিল, "তুমি নিজের কথাই কেবল বলে যাচ্ছ। কিন্তু যা ভেবে এ সব কথা বলছ তা যে সবই মিথ্যা। তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালবাসি নি।"

"মিথ্যা কথা", যোগেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তুমি আর কাউকে ভালবাস নি এ কথা যদি সত্য হয়ও, তুমি আমাকে ভালবেসেছ এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। আমাকে তুমি কোনদিনই ভালবাস নি। তুমি ভালবেসেছ আমার পৌরুষকে, আমার রূপকে, আমার প্রতিষ্ঠাকে, আমার ঐশ্বর্যকে। আমার সত্যিকারের 'আমি'কে তুমি যদি একটুও ভালবাসতে তবে তোমার প্রত্যেকটি কাজের ভিতর দিয়ে আমার প্রত্যেকটি আদর্শকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারতে না।"

শোভা বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশ ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তোমরা, হিন্দুর মেয়েরা, ভালবাস পুরুষকে, কোন বিশেষ পুরুষকে নয়। স্বামী তোমরা পাও, খুঁজে নাও না। সে স্বামীর সঙ্গে তোমরা ঘর কর দায়ে পড়ে, বড় জোর কর্তব্য মনে করে, ভালবাস বলে নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভালবাসা হয়ত হয়; কিন্তু বেশীর ভাগই বুকের মধ্যে অতৃপ্ত বুভুক্ষা নিয়ে বাইরে কোনমতে মানিয়ে চলে। ভাল যদি এরা বাসে, তা বিবাহের গণ্ডির বাইরে, আর সেই জন্যই ভয় পেয়ে হয় তাকে ক্লীব করে বাঁচিয়ে রাখে, না হয় গলা টিপে হত্যা করে।" একটু থামিয়া যোগেশ পুনরায় কহিল, "এই সীতা সাবিত্রীর দেশে সতীত্বের মুখোস পরে' যা বেড়িয়ে বেড়ায় তার বেশীর ভাগই কাপুরুষত্বের অক্ষমতা, নারী জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার ছাইচাপা রূপ মাত্র। এ সুন্দর নয়, কুৎসিৎ। তাই তোমায় আমি বলি, অতীশবাবুকে তুমি গ্রহণ কর।"

শোভা আবার যোগেশের হাত চাপিয়া ধরিল, অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার কথা বিশ্বাস করবে না তুমি? সত্যি অতীশকে আমি ভালবাসি নি।"

যোগেশ হাসিল, কহিল, "কোনটাকে বিশ্বাস করব শোভা? তোমার মুখের এই প্রতিবাদকে, না তোমার মুখের হাসির ছটায় তোমারই অন্তরের যে রূপকে আমি এই একটু আগে নিজের চোখে দেখেছি, তাকে? না শোভা, তোমার মুখের কথা সত্য নয়, তোমার মুখের হাসিই সত্য।"

ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া শোভা কহিল, "বেশ, তোমার ইচ্ছা হয় চলে যাও। তোমাকে না পেয়েও এতদিন আমার যেমন কেটেছে, বাকি জীবনটাও তেমনই কাটবে। তোমার যা খুশী তুমি বল; কিন্তু আমি জানি যে, আমার বাবা মনে মনে, আর আমার জ্যাঠামশায় আমার হাত ধরে আমাকে তোমায় দিয়েছেন। আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, চিরদিন তোমারই থাকব।"

যোগেশ অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "দেহের ঊর্দ্ধে কোনদিনই কি তুমি উঠতে পারবে না শোভা? কেবল এই দেহটির তথাকথিত পবিত্রতা বজায় রাখবার নামে তোমার অন্তরের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ উপেক্ষা করে দেহ ও অন্তর উভয়কেই কি চিরদিনই তুমি উপবাসী রাখবে?"

শোভা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "তোমার কথা আমি বুঝি না,

বুঝতে চাইও না। আমি এইটুকুই কেবল বুঝি যে, আমি তোমার, চিরদিন তোমারই থাকব। অতীশ বা আর কেউ আমার এই দেহটির উপর কোন অধিকার পায় নি, পাবেও না।"

পুনরায় সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

শোভা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ যে আমার অন্তরের কথা। এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে না?"

যোগেশ শোভার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এইজন্যই ত আমার দুঃখ। তোমার জীবনের সব চাইতে বড় ট্রাজেডি আমাকে না পাওয়া নয়; যাকে তুমি চাইছ তাকে যে তুমি গ্রহণ করতে পারছ না সেইটাই সব চাইতে বেশী শোচনীয়। তবু আরও একবার তোমায় আমি বলছি, ভুল করো না শোভা। যে আদর্শকে তোমার অন্তর গ্রহণ করতে পারে নি, হয়ত কোন মানুষই যাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, তারই শাসনে সত্যকে অস্বীকার করো না। আমার সঙ্গে তোমার যা সম্বন্ধ তা মিথ্যা, আর অতীশবাবুর সঙ্গে তোমার যা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা সত্য। সে সত্যকে অস্বীকার করলে অনর্থক কেবল দুঃখই তোমায় লাভ হবে, আর কিছু নয়। ইহকালে ত নয়ই, পরকাল যদি থাকে, সেখানেও নয়।"

যোগেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, দেখিয়া শোভা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সত্যি আমায় গ্রহণ করবে না তুমি?"

যোগেশ শোভার মুখের দিকে সচকিতে একবার চাহিয়া দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মৃদুস্বরে কহিল, "তা আর হয় না শোভা। আমাদের উভয়ের মাঝখানে এখন থেকে থাকবেন অতীশ; আমরা কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারব না। সে চেষ্টায় কোন লাভ নেই।" বলিয়া উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না করিয়াই যোগেশ দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বারান্দায় রেলিঙের গায়ে ঈষৎ হেলিয়া অতীশ শোভার ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যোগেশ দ্বার খুলিয়া বাহির হইতেই উভয়ের চোখাচোখি হইয়া গেল।

অতীশ তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া বসিবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যোগেশ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তারপর ধীর পদসঞ্চারে সেও বসিবার ঘরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অতীশ ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল, যোগেশকে দেখিয়াই সে আরও কয়েকপদ পিছনে সরিয়া গেল।

যোগেশের সঙ্গে আবার অতীশের দৃষ্টিবিনিময় হইল। হাসিবার চেষ্টায় মুখখানিকে বিকৃত করিয়া অতীশ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "আসুন না, ভিতরে আসুন।"

সম্ভাষণ ও নিমন্ত্রণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যোগেশ গাঢ়স্বরে কহিল, "ওঁকে দেখবেন অতীশবাবু—জীবনে উনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন।" বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

অতীশ আরও ক্ষণকাল বসিবার ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করিবার পর আবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারও কোন সাড়াশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে সভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে শোভার ঘরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া চুপি চুপি ডাকিল, "মেজদি', ও-মেজদি'।"

ভিতর হইতে কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া বাতাসে বাহিরে ভাসিয়া আসিতে লাগিল একটা চাপা কান্নার অস্পষ্ট শব্দ।

আরও মিনিটখানিক নিঃশব্দে অপেক্ষা করিবার পর অতীশ চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে নামিয়া গেল। (ক্রমশ)

শিল্প ও শ্রমিক

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

বাঙলাদেশের জনসংখ্যা মোটামুটি হিসাবে দশ বৎসরে শতকরা প্রায় পাঁচজন করিয়া বৃদ্ধি পায় সুতরাং ডবল হইতে প্রায় দুই শত বৎসর লাগিবে যদি সত্যি সত্যি বাড়িতেই থাকে। সুতরাং এক স্বামী এবং এক স্ত্রীর এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। ইহা মোটামুটি হিসাব। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই বেশী হয়। যাহা বেশী হয় তাহার পরিমাণ দশ বৎসরে একশজনের মধ্যে পাঁচজন। যদি মাত্র একছেলে মালিকের জমির উত্তরাধিকারী হয়, তবে প্রত্যেক দশ বৎসরে এই শতকরা পাঁচজনকে জমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। কোথায় যাইবে? প্রথমত যে জমি খালি পড়িয়া আছে সেখানে যাইবে, দ্বিতীয়ত এইরূপ প্রণালীবদ্ধ কৃষিকর্মে জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং তদ্দরুণ কর্মের প্রসার হইবে, তৃতীয়ত ইহারা কুটির শিল্প ইত্যাদির চর্চা করিতে বাধ্য হইবে, সুতরাং অনুকূল ব্যবস্থা করিয়া দিলে কুটির শিল্পের উন্নতি হইবে, চতুর্থত যে মালিকের একটির বেশী ছেলে হইবে তাহাকে বাধ্য হইয়া মিতব্যয়ী হইতে হইবে, পঞ্চমত প্রথম পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রকে প্রাণের দায়ে কর্মকুশল হইতে হইবে। প্রাণের দায়ে না পড়িলে যে আলস্য বৃদ্ধি পায় ইহা আশা করি কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখন বক্তৃতা করিয়া পল্লীবাসীদিগের জড়তা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হয়, চরকা এবং তাঁত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হয়। তখন অনুরোধের প্রয়োজন হইবে না। ইহারাই হুকুম করিবে যে, ইহারা চরকা এবং তাঁত চায়।

কেহ কেহ আপত্তি অবশ্যই করিবেন। কিন্তু সঙ্গত কারণ না থাকিলে বাঙালীর উচিত সংঘবদ্ধ কার্যে, সমাজের কল্যাণকামী যুবকদিগকে আত্মত্যাগ করিতে বলিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। স্থাবর সম্পত্তিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করাই কৃষকের সর্বনাশের মূল কারণ, তথা বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল হইবার মূল কারণ। এই তথ্য সকলকে বুঝাইবার মত শক্তিশালী পুরুষ কি বাঙালী সমাজে নাই?

এই প্রকার চাষী হইতে হইলে বেশী নগদ টাকার আবশ্যকতা নাই। আমি যেখানে বসিয়া লিখিতেছি সেখানে জমির দাম বিঘা প্রতি ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকা। এখানে অবশ্যই সস্তা যদিও জমি খুব উর্বর। কিন্তু বাঙলাদেশের বহু জায়গাতেই ২৫ টাকা হইতে ৫০ টাকায় ভাল জমি পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় অবশ্য ১ শত কি ২ শত টাকা। কৃষি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার স্থান এটা নয় সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হইব এবং যান্ত্রিক শিল্পের যুগে মানুষের উপযুক্ত অবসর মিলিয়াছে কি না সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলি যে বাঙলা দেশের অর্ধেক লোক শাকসিদ্ধ এবং ভাত খায়। তাহারা অনায়াসে দুই চার রকমের সব্জি জন্মাইয়া খাইতে পারে কিন্তু তাহারা এতই অন্ধ যে কোথায় বীজ পাওয়া যায় তাহা পর্যন্ত জানে না। এই সকল নিরক্ষর লোককে ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদির মারফতে চার পাঁচ রকমের সব্জির বীজের একটি প্যাকেট গভর্নমেণ্ট অনায়াসে এক পয়সা দামে বিলি করিতে পারেন। এক পয়সায় পোষায় না যিনি বলিবেন তিনি কোন খোঁজ খবর রাখেন না।

(২)

যান্ত্রিক যুগে প্রচুর অবসর মিলিয়াছে কি না

যান্ত্রিক শিল্পযুগের প্রথম অবস্থায় সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রমিককে কাজ করিতে হইত। যখন বৈদ্যুতিক আলোকের জন্ম হইল সেই সময় হইতে অনেক কারখানায় একদল লোক সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং আর একদল লোক সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কাজ করিত। একই লোককে সমস্ত দিন এবং অর্ধেক রাত্রি অবধি কাজ করান অনেক মালিকের অভ্যাস ছিল। অধুনা নানাপ্রকার আইন কানুন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের বহু কারখানার মালিকের এই বদ অভ্যাস যায় নাই। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, শ্রমিক আন্দোলনের ফলে এখন পৃথিবীর কোথাও দৈনিক ৭ ঘণ্টা হইতে ১১ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে হয় না এবং সপ্তাহে একদিন কিংবা দুইদিন ছুটি পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজ করিবার রীতি আছে। মনে রাখিবেন চাষীর দশ ঘণ্টা অথবা কুটির শিল্পীর দশ ঘণ্টা এবং যান্ত্রিক শিল্পীর দশ ঘণ্টা এক কথা নয়। কুটির শিল্পী পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া কাজ করে, চাষী খোলা মাঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কাজ করে, যান্ত্রিক শিল্পীর কর্মস্থান এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানসিক সন্তুষ্টির অনুকূল নয়, অধিকন্তু যান্ত্রিক শিল্পীকে যন্ত্রের মত বাঁধা নিয়মে কাজ করিতে হয়। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহাকে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, ইহাতে স্নায়বিক ক্লান্তি অবশ্যম্ভাবী। সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, যন্ত্র শিল্পীর কার্যে আনন্দ নাই, সৃষ্টি করিবার আনন্দ হইতে সে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। বৈচিত্র্য-বিহীন একই প্রকারের হাজার হাজার সামগ্রী একই উপায়ে যে দিনের পর দিন প্রস্তুত করে এবং দৈনিক দশঘণ্টা করিয়া এইরূপ কার্য করে তাহার জীবনে আনন্দের একান্ত অভাব, এত অভাব যে তাহাকে অস্বাভাবিকরূপে আনন্দের সৃষ্টি করিতে হয়। ইহা ভাবিবার বিষয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানুষের প্রকৃতিগত গাম্ভীর্যের হ্রাস হইয়াছে, চঞ্চলতা, চপলতা এবং হুজুগপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৈনন্দিন কার্যের নিরানন্দতাই তাহার হেতু। মাদকতার সাহায্যেই হউক অথবা যে কোন উপায়েই হউক সময়ের কবল হইতে কিঞ্চিৎ আনন্দ অথবা উত্তেজনা ছিনাইয়া লইবার যে আগ্রহাতিশয্য দৃষ্ট হয় দৈনন্দিন কার্যের নিরানন্দতা তাহারও মূল কারণ। নিরানন্দতাকে ভেদ করাই সভ্যতা এবং ধর্মের উদ্দেশ্য নয় কি? সুতরাং দেখিতে পাই হিতে বিপরীত হইয়াছে। এই দুরবস্থার হাত হইতে মানুষকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই ধর্মের আবশ্যকতা এবং গভর্নমেণ্ট ইত্যাদি সভ্যজনোচিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। সেই জন্যই বৈজ্ঞানিক বলেন, "উল্টা বুঝিলি রাম। আমি ঠিক এই রকমটি চাইনি।" যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে বেশী কাজ করিবার সার্থকতা সেইদিনই হইবে যেদিন নামমাত্র সময়ে, যেমন সপ্তাহে একদিনে কি দুইদিনে জীবনধারণোপযোগী সমস্ত দ্রব্য আহরণ করা যায় যাহাতে মানুষ বাকি সময়ে পরমার্থিক কিংবা অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর পায়। যাহারা ভগবানে অথবা আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করেন না তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যন্ত্রের সাহায্যে দশ গুণ বেশী কাজ করিতে পারার সার্থকতা আর কি হইতে পারে? বর্তমান যুগে ঠিক উল্টাটি হইতেছে। সভ্য দেশগুলি কম সময়ে বেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিবার

পক্ষে উপযোগী যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া তদনুপাতে কার্যকালের লাঘব করিয়া অবসর বৃদ্ধি করে নাই উপরন্তু ক্রমশ অধিক অধিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া যন্ত্রবিহীন তথাকথিত অসভ্যদেশগুলির ঘাড় ভাঙিয়াছে। ফলে সকল দেশেরই যন্ত্রবিহীন কুটির শিল্প আজ মৃতপ্রায়। কুটির শিল্পী আজ দারিদ্র্যদুঃখে জর্জরিত। কিন্তু যে সভ্যতা হিংস্র জন্তুর মত ইহাদের রক্ত শোষণ করিয়াছে সে আজ কোথায়? যন্ত্রের ক্রীতদাস সে আজ অবসন্ন, নিরানন্দ এবং সৌন্দর্যবিহীন। মনের দৃঢ়তা সে হারাইয়াছে তাই আজ সে নাস্তিক এবং স্বার্থপর। এক কথায় বলিতে গেলে ইউরোপীয়েরা আজ পেটসর্বস্ব, পেটের জ্বালায় তাহারা সব করিতে পারে, অন্য কারণে নয়।

এই সব কথা অনেকেই চিন্তা করেন। সর্বদেশেই মনীষিগণ আমাদিগকে বারংবার এই কথা বিভিন্ন উপায়ে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন তবু আমরা চোখ কান বুজিয়া দিনের পর দিন বিরাট বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব; শুধু তাই নয়, যাহারা এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাহাদিগকে সভা করিয়া সম্মানিত করি এবং উপাধি দেই। কিন্তু ঘরে আসিয়া যান্ত্রিক যুগের জীবনধারার অসামঞ্জস্যে চিত্রিত রবিবাবুর কবিতা পড়িয়া বলি "বেড়ে লিখেছেন।" চাই কি এই সম্বন্ধে একটা কেতাব লিখিতে পারিলে একটা খেতাবও মিলিতে পারে। অন্তঃসারশূন্য এই যে জীবনধারা, এই যে ভাবের ঘরে লুকোচুরি—ইহাই হইল আমাদের বর্তমান সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের গতি। ইহার মূল্য কত?

কিন্তু আমি আগেই বলিয়াছি বিজ্ঞানবর্জিত হইলে আজকালকার দিনে কুলির অন্ন ছাড়া আর কিছু জুটিবে না। কাজেই বিজ্ঞান আমরা চাই এবং বিজ্ঞানের সাহায্যেই কি করিয়া যান্ত্রিক শিল্পকে আয়ত্তে আনা যায় অর্থাৎ আমরা বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের যেরূপ ক্রীতদাস হইয়া আছি সেইরূপে না হইয়া যাহাতে যন্ত্রশিল্প আমাদের ক্রীতদাস হয় সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। আনন্দধ্বংসকারী এই শত্রুকে আয়ত্তে আনিবার উপায় চিন্তা করাই ধর্ম, অন্য ধর্ম নাই।

চিন্তা করিয়া দেখিতে পাই যে, ইহাকে দুই দিক্‌ হইতে আক্রমণ করিতে হইবে। কার্যকালে যাহাতে অবসাদ না আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কার্যের অবসানে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে কার্যকালীন সমস্ত অবসাদ বিদূরিত হয়। শ্রমিকও যে একটা মানুষ, সেও যে অমৃতের পুত্রস্বরূপ, সেও যে দেবতার মত অবিচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী, এই বিষয়ে যত্নবান্‌ হইয়া চিন্তা করিবার অবকাশ যাহাতে সে পায়, তাহার ব্যবস্থা যে সভ্যতা করে না বা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে না সেই সভ্যতা বর্বরতারই রূপান্তর মাত্র।

কার্যকালে যাহাতে অবসাদ না আসে তাহার কি ব্যবস্থা? অবসাদ আসে কেন? আগেই বলিয়াছি যান্ত্রিকযুগে কর্মস্থান এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্ততুষ্টির অনুকূল নয় উপরন্তু বৈচিত্র্যবিহীন কর্ম এবং বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির সান্নিধ্য স্নায়বিক ক্লান্তির সৃষ্টি করে। যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করিলে দৈহিক ক্লান্তি বেশী হয় না তাহা আমরা সকলেই বুঝি।

বর্তমানে ক্লান্তি দূর করিবার জন্য আইনকানুন করিয়া আলো বাতাসের সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কি রকম আলো কি রকম কার্যের পক্ষে উপযোগী, কি রকম বাতাস এবং উত্তাপ উপকারী, এই সকল বিষয়ে গবেষণা আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে এইসব বিষয়ে গবেষণা করা হয় কিন্তু আমরা করি না। আমাদের কর্মকর্তাগণ অন্ধের মত হাতড়াইয়া পথ চলিতেই অভ্যস্ত। চোখে দেখি নাই কিন্তু কানে শুনিয়াছি যে কোন কোন দেশে কোথাও কোথাও কয়েক ঘণ্টা কার্যের পর খেলাধুলা এবং আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। এইরূপ করিলে যদি ক্লান্তির লাঘব হয় তবে তাহা না করাই তাজ্জব ব্যাপার।

আলো বাতাস, খেলাধুলো ইত্যাদির আয়োজন কোন্‌ দেশে কিরকমভাবে চলিতেছে এবং তাহার ফল কিরূপ হইতেছে সেই বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়া এই পুঁথির কলেবর বৃদ্ধি করিব না। বিদেশীয় পুস্তক এবং পত্রিকাদি পাঠ করিলেই পাঠক সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। এইখানে এইটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য যে অন্যান্য সভ্যদেশে চেষ্টার ত্রুটি নাই কিন্তু আমরা জরদ্গবের মত পড়িয়া আছি। কিছু একটা করার কথা বলিলেই শুনিতে হইবে যে আমাদের টাকা নাই। ইহার জবাবে বলিতে হয়—টাকা নাই ত যেমন করিয়া হউক, টাকার ব্যবস্থা কর। (ক্রমশ)

যাদু

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার মিত্র
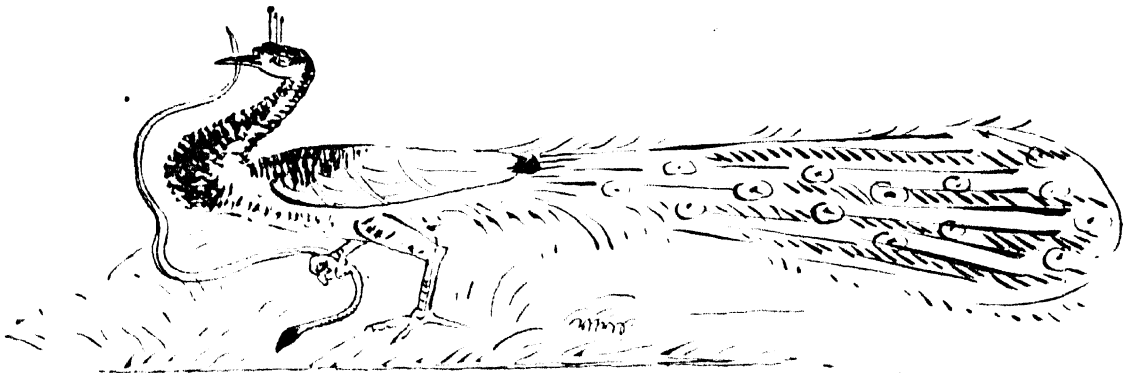
সামনের সুবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। পড়ন্ত রোদের লালচে আলো স্তিমিত হয়ে আসছে ক্রমাগত; এখনও অনেকগুলো গরু ওখানে বিচরণ করছে নিঃশঙ্ক চিত্তে।

নিরুপমার মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার কথা,—আজকাল এমনি, যখন সে একলা বসে থাকে জানলাটার ধারে শূন্য মন নিয়ে, তার মনে পড়ে পুরনো দিনের কথাগুলো। প্রায় সাত বছর হতে চলল, সে বৌ হয়ে এসেছে এই গ্রামে। গোড়ার দিনগুলোর কথা এখন খুব বেশী মনে পড়ে তার। অগুনতি ছেলে এমনি বিকেলবেলায় ভীড় করত ওই মাঠের মাঝে, খুশী আর যৌবন উপ্‌চে পড়ত তাদের প্রতিটি কথায়, প্রত্যেক টুক্‌রো হাসিতে। তারা ওখানে আসত, ওখানে লাফাত, খেলা করত আর যখন তখন জ্বালাতন করত তাকে। ওরা খেলতে খেলতে কতবার এসে জল চাইত তার কাছে। পান খাবার আব্দারও ধরত অনেকে। কিংবা একান্ত অকারণে একটা অর্থহীন কথা নিয়ে আলাপ করত তার সঙ্গে।

'প্রমথদা' কোথায় বৌদি? হয়ত' জিজ্ঞাসা করল কেউ।

নতুন বৌ নিরুপমা একটু মিষ্টি হেসে নির্ভুল উত্তর দিল তাকে; আর ওমনি যেন পেয়ে বসল সে। অসংখ্য ঠাট্টা আর বিদ্রূপে জ্বালাতন করে তুলল ওকে। প্রথমটা লজ্জা পেত নিরুপমা; আর কিছুটা রাগও হত অনেকের ওপর, কিন্তু আজ সত্যিই তার মনের ভেতর হাহাকার করে সেই দস্যি ছেলেগুলোর জন্যে। তারা আজ কোথায়?

তখন কতছেলে সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে ছুটে আসত তার কাছে। তখন সে ছিল সবার বৌদি, তাদের প্রমথদার বৌ। আব্দারের আর অন্ত ছিল না তাদের।

হয়ত গরমের দুপুরে ঝিরঝিরে হাওয়ায় গাটা একটু এলিয়ে দিয়েছে নিরুপমা; কোথা থেকে সেই কাঠফাটা রোদ্দুরে ঘেমে, ডাকাতের মত এল নীলকণ্ঠ। 'একটা পান দেবে বৌদি?'

সেই অনাবিল আলস্যের মাঝে এই উৎপাতে একটু বিষিয়ে উঠল নিরুপমা, 'পান? পান কোথায় পাব?'

'বাঃ, নিজের ঠোঁটদুটো ত রাঙিয়ে তুলেছ বেশ!' রীতিমত ঝগড়া সুরু করে দেয় সে।

এর কি উত্তর দেবে নিরুপমা? শুধু উদ্গত রাগটা গোপন করে উঠে গেল ঘরের ভিতর, 'দেখি, আছে কিনা পান।'

তারপর, খানিকটা সময় পরে যখন সে হাতে করে একটা পান আর বোঁটায় করে খানিকটা চূণ নিয়ে এল তার জন্যে, দেখল, তারই মাদুরটার ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে নীলকণ্ঠ।

নিরুপমাকে দেখেই উঠে বসল সে। বলল, 'সত্যিই কি আর পান খাওয়ার জন্য এতটা পথ ছুটে এসেছি বৌদি? আমি এসেছি তোমার কাছে। যদি রাগ কর, না হয় ফিরে যাই?'

এরপর খুশীতে মুখখানা ভরে উঠেছিল নিরুপমার। তারা কত ভালবাসত ওকে, তাদের কতখানি দাবী ছিল ওর ওপর! আর একদিন, কোন এক অদ্ভুত খেয়ালে রাত্তির বেলা এসেছিল সুরেশ। তখন খাচ্ছিল নিরুপমা। সুরেশ এসে বসে পড়ল তার পাশে। বলল, 'আজ তোমার সঙ্গে খাব বৌদি।'

সেদিন লজ্জায় প্রায় মরে গিয়েছিল নিরুপমা। সে বলল, 'বস, ভাত বেড়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

'বারে!' যেন ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল সুরেশ, 'সে-ভাত ত রোজই খাই বাড়িতে; আজ খাব তোমার সাথে।'

সত্যিসত্যিই সুরেশ খেতে আরম্ভ করল নিরুপমার সঙ্গে। খাওয়ার পর তাদের শোবার ঘরে প্রমথর পাশে খাটের ওপর বসে দস্তুর মত আড্ডা জমাল সে। অনেক রাত পর্যন্ত সে গল্প করল মাথা-মুণ্ডু অনেক কিছু। গল্প শুনতে শুনতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল প্রমথ; আর ঘুমে খানিকটা দূরে ঢুলতে লাগল নিরুপমা। বিরক্তিতে অনেকবার হাই তুলল সে, কিন্তু যাওয়ার নাম নাই সুরেশের। খানিকটা পরে সে শুয়ে পড়ল প্রমথর পাশে। বলল, 'আজকে আমিই এখানে শুই বৌদি, তুমি বরং যাও অন্য কোন জায়গায়।'

'বারে! আমার জায়গায় তুমি শোবে কেন?' সেদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেলেছিল নিরুপমা।

হা-হা-হা করে হাসতে হাসতে উঠে বসল সুরেশ। বলল, 'ভাগের খাবারটা ছেড়ে দিলেও, শোবার এই জায়গাটা তুমি ছাড়তে পারবে না তা জানি বৌদি।'

তারপর অবশ্য চলে গিয়েছিল সে।

কিন্তু আজ তারা আর কেউ নাই। প্রমথ নাই, নীলকণ্ঠ নাই, সুরেশ নাই। সবাই যেন কোন এক যাদুকরের মায়াদণ্ডের ছোঁয়ায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে পটভূমিকা থেকে। গ্রাম আজ শূন্য, মরুভূমি। মাঠটা আজ বুঝি তাদের শোকেই হাহাকার করে সারাটা দিন। ওখানকার বাতাস আজ আর ভরে ওঠে না কারও অনাবিল হাসি আর অসংযত চীৎকারে। শূন্য বাতাস কান্নার মত একটানা সুরে মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে যায় গ্রামের দিকে। হয়ত সেই সব দস্যি ছেলেদেরই খোঁজে।

কিন্তু কেন গেল তারা, কেন তারা ছাড়ল এই গ্রাম, তা ভেবে পায় না নিরুপমা। কি হয়েছিল তাদের এখানে? অভাব? খাবারের অভাব? এতকাল যেভাবে হয়েছে তাদের সব কিছুর সংস্থান তা আজ বন্ধ হল কিসে? যে শহরে তারা গিয়েছে, সে জায়গা কি এই গ্রামের চেয়েও সুন্দর; এমনি প্রশান্ত আর স্নিগ্ধ? সেখানকার আনন্দ কি এখানকার চেয়েও বৈচিত্র্যময়, এমনি প্রাণখোলা, আর সেখানকার সকলেই কি সকলের এতখানি আপন?

সেটা বিশ্বাস হয় না নিরুপমার। এক এক করে গ্রামের সব ছেলে সৌভাগ্যের আশায় গ্রাম ছেড়ে গিয়েছে শহরে। যাওয়ার আগে তারা যা ছিল, এখন যেন তারা আর সে রকম নাই। এখন তারা সব এক ধরণের অদ্ভুত, আলাদা জাতের প্রাণী, যেন হাত-মুখ নাড়া কলের পুতুল। সে প্রাণখোলা হাসি মুছে গিয়েছে তাদের মুখ থেকে আর অন্তর পরিপূর্ণ কত বিচিত্র জটিলতায়। মাঝে মাঝে যারা এসেছে, তারা প্রাণ খুলে কথা পর্যন্ত বলেনি তার সাথে। অথচ, বিদেশে যাওয়ার

আগে তার সঙ্গে দেখা করে কত রকম অদ্ভুত প্রতিশ্রুতিই না দিয়েছিল তাকে!

আর প্রমথ? সে যেন মানুষই নাই আর। বিয়ের পরের বছরই সে গ্রাম ছেড়েছে, ছেড়েছে নিরুপমাকে। তারপর দীর্ঘ ছয়টা বছর গিয়েছে কেটে, এর মধ্যে সে এসেছে মাত্র ছয়বার, থেকেছে সংক্ষিপ্ততম কয়েকটা দিন। বছরের শেষে সামান্য যে কয়টা দিন তাকে দেখে নিরুপমা, আনন্দের চেয়ে তার দুঃখই হয় অনেক বেশী। তার সেই অগাধ প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, তার উজ্জ্বল দুটো চোখের সেই অদ্ভুত চাউনি আর নাই—আছে শুধু স্বামীর দাবী আর প্রত্যাশা। তার ভালবাসা বুক থেকে যেন চলে এসেছে ওষ্ঠাগ্রে। চিঠির মারফৎ সে অতি নিয়মিত প্রেম নিবেদন করে তাকে, জানায় হাজার আকুতি, আর কত যে সব দুর্বোধ কথা দিয়ে বোঝাই থাকে তার পত্র! কিন্তু এই মুখর প্রমথ আর সাত বছর আগেকার সেই নিরীহ ভালমানুষ প্রমথর মধ্যে ব্যবধান অপরিসীম।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙে নিরুপমার (যখন সে সমাহিত থাকে কোনও চিন্তার ভেতর, এমনিই কোন উপলক্ষে চমক ভাঙে তার) সে তাকিয়ে দেখল, ওপাড়ার রাঙা পিসীমা খোঁজ করছেন তার নাম ধরে ডেকে। রাঙা পিসীমার গলা শুনে তার মনটা একেবারে বিষিয়ে উঠল যেন। এই বৃদ্ধা মহিলাকে সে পছন্দ করত না কোন দিনও। সম্ভব অসম্ভব অনেকের নামের সঙ্গে তার নাম যোগ করে অনেক দুর্নাম এ পর্যন্ত রটিয়েছেন তিনি। পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে যাওয়া তিনি, ক্রমাগত হিংসা করে এসেছেন তেইশ বছরকে। নিরুপমা জানত, তিনি ফিরে যাওয়ার পর গ্রামের মেয়েরা তার সম্বন্ধে শুনতে পাবে অনেক নতুন গল্প। তবু সে এগিয়ে গেল দরজা পর্যন্ত। বলল, 'ডাকছেন কেন পিসীমা?'

'একটা চিঠি লিখে দেবে মা?'

'চিঠি? চিঠি আর লিখে কি হবে পিসীমা? এ পর্যন্ত কত চিঠিই তো লিখলেন, আজ দু'বছরে প্রায় একশ'খানা চিঠি লিখেছেন আপনি; কিন্তু তার একটারও ত' জবাব দেয় নাই আপনার ছেলে?'

'চোখের কোণে আঁচল চেপে ধ'রলেন পিসীমা। বললেন, 'সে যে কিভাবে পাষাণ হ'য়ে থাকে বৌমা—'উচ্ছ্বসিত কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

'কিন্তু এই দু'বছরের ভেতর একখানা চিঠি দিয়েও যে একবার খবর নিল না আপনার, কি করবেন তাকে আর চিঠি লিখে?'

'আমার মায়ের প্রাণ যে বুঝ মানে না বৌমা। সে থাকতে পারে আমাকে ভুলে, কিন্তু তাকে পেটে ধ'রে আমি যে অনেক দোষ করেছি বৌমা?'

সমস্ত বিরক্তির মাঝেও একরকম অদ্ভুত সহানুভূতি জাগ্রত হয়ে ওঠে নিরুপমার মনে। বিপদাশঙ্কিত মায়ের প্রাণের ভেতর হারিয়ে যান আসল রাঙা পিসীমা; সে অবস্থায় তকে করুণা করতে ইচ্ছা হয় তার। সে বলে, 'কই পিসীমা দিন, পোস্টকার্ড দিন।'

রাঙা পিসীমা বলেন, 'এবার আর পোস্টকার্ডে চিঠি দেব না বৌমা। বৃন্দাবন যাচ্ছে ক'লকাতায় চাকরীর খোঁজ করতে, তারই হাতে চিঠিখানা দিয়ে দেব আমি।'

'বৃন্দাবন চ'লে যাচ্ছে পিসীমা?' যেন আঁৎকে উঠল নিরুপমা। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। গ্রামের ওই অবশিষ্ট যুবকটিও চলে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে। অনেক, অসংখ্য দুঃখ-কষ্টের ভেতরও এতদিন সে পড়েছিল গ্রাম আঁকড়ে, কিন্তু আজ সেও যাচ্ছে চলে। কথাটা যেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদের মত শুনাল নিরুপমার কাছে। গ্রামের সর্বশেষ প্রাণশক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাবে তাহলে? বিপদে-আপদে, আনন্দে-উৎসবে যে ছিল অপরিহার্য, তাকেও হারাতে হবে শেষ পর্যন্ত? আজ একটা যুবক,—একটা মানুষ চলে যাচ্ছে গ্রাম থেকে, কিন্তু সে যখন ফিরবে, তখন—; আগেকার মানুষগুলোর মুখ মনে পড়ে নিরুপমার। আর ভাবতেও পারে না সে।

রাঙা পিসীমা তাড়া দেন। বলেন, 'সন্ধ্যে হয়ে গেল, লেখ বৌমা।'

এক টুকরো কাগজ আর কলম নিয়ে ব'সে পড়ল নিরুপমা।
'বলুন—'

'লেখ, প্রাণের গোপাল—'

বহুবার লিখে লিখে কথাটা একেবারে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে নিরুপমার। আগেই সে লিখেছিল সে কথাটা। বলল, 'হ্যাঁ, তারপর বলুন—'

'তোমাকে এ পর্যন্ত অনেক পত্র দিয়েও তার কোন জবাব পাই নাই। কি পাষাণ তুমি! একবারও কি তোমার মনে পড়ে না এই অভাগিনী মার কথা? বহু দুঃখ-কষ্টে, বহু শোক-তাপে আমার বুকের রক্ত দিয়ে তোমাকে এত বড়টা ক'রে তুলেছি আমি; কিন্তু বিদেশে গিয়ে তুমি একবারও তোমার সেই চিরদুঃখিনী মার কথা মনে কর না।'

কলম থামিয়ে বসেছিল নিরুপমা। বলল, 'একথা ত' বহুবারই লিখেছি পিসীমা?'

'তা হোক, তুমি আর একবার লেখ; আর লিখে দাও, আমি আর বেশীদিন বাঁচব না গোপাল। আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তুমি আসবে, এসে একবার শেষবারের জন্যে দেখে যাবে তোমার অভাগিনী মাকে।'

আবার বাধা দিল নিরুপমা। বলল, 'বহুবারই ত' তাকে আপনি অভাগিনী মা—অভাগিনী মা ক'রে দুঃখের কথা জানিয়েছেন। আর বেশীদিন যে বাঁচবেন না, একথাও ত' জানিয়েছেন বহুবার, কিন্তু এবার কি সে আসবে?'

'না আসুক বৌমা, কিন্তু আমার মনে হয়, সত্যিই আর আমি বাঁচব না বেশী দিন।' চোখে আবার আঁচল চেপে ধরলেন তিনি।

আর কোন কথা বলে না নিরুপমা। সন্তপ্ত মাতৃ-হৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তিতে আর বাধা দিতে চায় না সে। লক্ষ্মী মেয়েটির মত সে বলল, 'হ্যাঁ, তারপর বলুন—'

রাঙা পিসীমা বললেন, 'লিখে দাও, গোপাল, মরার আগে আমি একবার শুধু তোমার মুখখানা দেখে যেতে চাই; আর ভগবানের যদি ইচ্ছে থাকে, তোমার বৌকে। আমি একটা

সুন্দর মেয়ে দেখে রেখেছি পাশের গ্রামে; বড় সুন্দর মেয়ে। আমার ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। তুমি অমত কর না গোপাল, আমার এ সাধে আর বাদ সেধ' না তুমি। আমি তোমার মা হয়েও তোমার পায়ে পড়ছি গোপাল, তুমি একবার এস, তোমার মাকে একবার দেখে যাও।'

এবার তাঁর তূণের চরম বাণগুলো প্রয়োগ করলেন রাঙা পিসীমা। বয়স্ক বিদেশী ছেলেকে বিয়ের প্রলোভন দেখান, মা হয়ে তার পায়ে পড়া, কোনটাই বাদ দিলেন না তিনি। কিন্তু কোন-একটাও যে সফল হবে, এটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না নিরুপমা। অন্যমনস্কভাবে চিঠিখানা শেষ করে সে, তারপর সেটা ভাঁজ ক'রে প্রায় অজান্তেই তুলে দেয় রাঙা পিসীমার হাতে। সত্যিই, গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে কেমন যেন হয়ে যায় মানুষগুলো; আর তারা আপনার থাকে না কারও। এদিকে তিলে তিলে কেমন ছট্‌ফটিয়ে মরে কত শত নিরুপমা আর রাঙা পিসীমা, কে খোঁজ রাখে তার? একটা দীর্ঘশ্বাস প্রায় খালি ক'রে দেয় নিরুপমার বুকখানা।

'কে?' সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝে প্রায় চমকে উঠ্‌ল নিরুপমা। 'ওঃ, তুমি? চিঠি আছে বুঝি?' সুগোল একখানা হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নেয় নিরুপমা, তারপর সেই অস্পষ্ট আলোর মাঝেই পড়বার চেষ্টা করে হাতের লেখা।

চিঠি লিখেছে প্রমথ। কি লিখেছে সে, তা জানে নিরুপমা। সে আগেই ব'লে দিতে পারে প্রায় প্রতিটি কথা, প্রতিটি লাইন। সেই দুর্বোধ্য ভাষায় বিরহের দুঃসহতাই বলেছে সে ইনিয়ে বিনিয়ে, আর তার সঙ্গে হয়ত নতুন কোন বিশেষণ।

ধীরে সুস্থে আলোটা জ্বালালো নিরুপমা। তারপর সেই স্তিমিত আলোয় খুলে ধরল প্রবাসী স্বামীর পত্র। কিন্তু না, আজ পত্রে আছে নতুন কথা, নতুন সুর। সারা পত্রে যেন একটা পরিশ্রান্তির দীর্ঘশ্বাস আর ব্যর্থতার মৌন অভিশাপ। প্রমথ লিখেছে—

'সারা বিশ্বে আজ প্রলয়ের রুদ্ররূপ। মানুষের ওপর আপতিত হয়েছে স্রষ্টার ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে পৃথিবীতে, মানুষ মেতেছে ধ্বংস-যজ্ঞে। মানুষই চায় আজ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে, পৃথিবী থেকে নিঃশেষে মুছে দিতে সকল সৌন্দর্য, সকল ন্যায়, সকল নীতি। স্রষ্টার আর এক ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছি আমরা; অন্নাভাবে তিলে তিলে নিঃশেষ করবার অদ্ভুত খেয়ালে ধরা পড়েছি আমি। অর্থাৎ চাকরীটা আজ গিয়েছে নিরুপমা।

'চাকরী না থাক, অভিশাপ দেব না অদৃষ্টকে। আজ চাকরী হারিয়ে, অন্নের সংস্থান হারিয়ে, সব কিছু হারিয়েও একটিমাত্র সান্ত্বনা অবশিষ্ট আছে মনে, সব হারবার পর ফিরে পাব তোমাকে, আবার একান্তে পাব আমার প্রিয়াকে।

'শহরের কাজ আমাদের যন্ত্র ক'রে ফেলেছে নিরুপমা। আর মানুষ নেই আমরা। সেই যন্ত্র-মানুষের মনে আজ আবার জেগে উঠেছে নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। আজ কেবলই মনে হচ্ছে আমার তোমাকে আবার পাব, আবার একান্ত আপন ক'রে ফিরে পাব। আজ সব হারিয়ে শুধু তোমাকে ফিরে পাবার আশায় তোমার কাছেই ছুটে যাচ্ছি নিরুপমা।'

চিঠিখানা পড়ে সেটা আবার ভাঁজ করে খামের ভেতর পুরে রাখল নিরুপমা। আজ প্রমথ আসছে; সেই সাত বছর আগেকার প্রমথ হয়ে সে আবার ফিরে আসছে। কর্মক্লান্ত, ভগ্ন-হৃদয় প্রমথ ফিরে আসছে তার কাছে। বাইরের দিকে তাকাল নিরুপমা। গাঢ় অন্ধকার নেমেছে সেখানে। এই অন্ধকারের মাঝ দিয়েই হয়ত' এখুনি আসবে গ্রামের নতুন সরকারী ডাক্তার।

অনেকদিন ধরে প্রায় নিয়মিতই আসে সে, রাত্রের অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে। কোন্ সূত্রে পরিচয় হয়েছিল তার সাথে, তা আর আজ স্পষ্ট মনে নাই তার। শুধু খাপ-ছাড়াভাবে নিরুপমার সেই দিনগুলোকে মনে পড়ে যখন ধীরে ধীরে সে আকর্ষণ করেছে তাকে, একান্ত বশীভূত করেছে তার ইচ্ছাকে। হয়ত আজও সে আসবে।

নতুন ডাক্তার এল। ধীরে ধীরে চোরের মত পা টিপে টিপে এসে চোখ দুটো চেপে ধরল নিরুপমার। যদিও নতুন নয়, তবু আজ একটু চমকে উঠল নিরুপমা। নিজের নরম হাত দুটো দিয়ে ছাড়াতে চাইল ডাক্তারের হাত।

ডাক্তার হাত ছাড়ল। তার আগ্রহ প্রতিফলিত হল চিঠিখানার ওপর। বলল, 'কার চিঠি ওটা নিরুপমা?'

'আমার স্বামীর।'

'কার, প্রমথবাবুর? কি লিখছেন তিনি?'

'তিনি ফিরে আসছেন এখানে। আজই আসবেন তিনি।' আগ্রহের আতিশয্যে কথাটা প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল নিরুপমা। খানিকটা চুপ করে রইল ডাক্তার।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডাক্তার বলল, 'নিরুপমা, চল, আমরা চলে যাই।'

'কোথায়?'

'অনেক দূরে, এই গ্রাম ছেড়ে। যেখানে আমাদের মাঝে আর আসবে না কোনও প্রমথ।'

কথাটা নীরবে শুনল' নিরুপমা তার মনের ওপর দিয়ে একপলকে ভেসে গেল অনেক দৃশ্য। গ্রাম ছেড়ে সে চলে গেছে দূরে, হয়ত শহরে, যেখানে মানুষ গেলে আর মানুষ থাকে না। গ্রাম থেকে শূন্য হয়ে গেল আর একটা মানুষ। এদিকে কর্মজর্জরিত, পরিশ্রান্ত প্রমথ এল অনেক আকাংখা, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তার কাছে, এসে দেখল, সে নাই। তারপর—

আর ভাবতে পারে না নিরুপমা। একটা অভাবিত ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে ওঠে তার চোখের ওপর। আতঙ্কিত হয়ে বলে সে, 'না, আমি যাব না।'

যেন বজ্রাহত হয় ডাক্তার। বলে, 'কেন? কেন যাবে না নিরুপমা?'

'আমার স্বামী আসছেন ফিরে, আমি যাব না।'

(শেষাংশ—১৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজিতপুরের কথা

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দুই

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকেই আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে আসিলেন। সকলেরই এক কথা, আপনি আমাদের গ্রামে আসিয়াছেন, এখানে আপনার সুখ সুবিধার অনেক ত্রুটি হইবে ইত্যাদি। তাঁহাদের সকলের সেই আন্তরিকতা প্রাণে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল, এই সরলতা ও ভালবাসা, মুহূর্তে মধ্যে পরকে আপনার করিয়া লইবার যে ভাবটি তাহা আজ দেশ হইতে বিদায় লইয়াছে। পল্লীগ্রামেও সেই প্রীতি ও ভালবাসার ভাবটি আর নাই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই এখন প্রধান। আমি গ্রামটি ঘুরিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস মহাশয় এবং গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী ভদ্রলোক সঙ্গী হইলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস এম এ, বি টি মহাশয় খুলনা জেলার আজুগড়া স্কুলের হেড মাস্টার, স্বামী প্রণবানন্দজীর একজন প্রধান শিষ্য। বিবাহ করেন নাই। দেশের ও সমাজের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন। নানা বিষয়ের খবর রাখেন। মিষ্টভাষী এবং কর্মী ব্যক্তি।

বাজিতপুর ফরিদপুর জেলার একটি বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী। এগ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই প্রধান। এখানকার মজুমদার উপাধিধারী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পাবনা এবং অন্যান্য জেলার রাজা, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত এই গ্রাম হইতেই ময়মনসিংহে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

আমরা গ্রামের পথ দিয়া চলিলাম। প্রণবানন্দজীর আশ্রমের পাশেই তাঁহার পৈত্রিক বাড়ি—প্রায় পাঁচ সাত বিঘা লইয়া হইবে। প্রণবানন্দের পিতা বিষ্ণুচরণ দাস মহাশয় এ গ্রামের একজন সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ছিলেন। দৈহিক বলেও তিনি বলবান্ ছিলেন। বাড়ির সম্মুখে পুকুর। পুকুরের কোন শ্রী নাই। বৃহৎ বাস্তু-ভিটার দালান কোঠা তাহারও জীর্ণ অবস্থা। আর বাড়ির চারিদিক বেড়িয়া বন-জঙ্গল। এত বড় বাড়ি যায়গা জমি কেই বা দেখে কেই বা রক্ষা করে?

কাহারও বাড়ির পাশ দিয়া, কাহারও বাড়ির মধ্য দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। অতিথি আমি—সকলেই সাগ্রহ চিত্তে আমাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। বড় বড় সব আম গাছ শাখা প্রশাখায় প্রত্যেক বাড়ির আশে পাশে দাঁড়াইয়া আছে। এক সময়ে গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। কেন না পাকা বাড়ির সংখ্যা অনেক। সঙ্গী সতীশবাবু প্রত্যেক বাড়ির অধিবাসীদের নাম পরিচয় ও ইতিহাস বলিয়া দিতেছিলেন। এক সময়ে যাঁহারা কতই না শ্রীসম্পন্ন ছিলেন, যাঁহাদের বৈঠকখানায় দিনরাত বৈঠক বসিত, বার মাসের তের পার্বণ লাগিয়াই থাকিত, দোল-দুর্গোৎসব সব হইত, আজ সে সমুদয় বাড়ি ঘর জনহীন। প্রাচীর ধ্বসিয়া গিয়াছে। দালানের গায়ে অশ্বত্থ চারা গজাইয়াছে। দুই একজন প্রাচীনা নারী সন্ধ্যাবেলায় শুধু প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রাচীন স্মৃতি বজায় রাখিতেছেন। দেখিলে দুঃখ হয়। আমি সারা গ্রামখানি ঘুরিয়া দেখিলাম। প্রত্যেক বাড়িতেই সাদর অভ্যর্থনা ও আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ। কোন কোন বাড়িতে ডাবের সুমিষ্ট জল পান করিলাম।

বাজিতপুর গ্রামটি বেশ বড়। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই—যাহা আছে তাহাও অতি সামান্য।

এগ্রামে কোন কোন বাড়িতে কিছু কিছু পুরানো হাতের লেখা পুঁথি আছে। তাহা দেখিবার সুযোগ করিতে পারি নাই। বাজিতপুরের প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে দ্বিজ রতিরাম রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী পড়া হয়। এ বইখানা শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দাস সন ১৩২৮ সালে অর্থাৎ প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি ঐ মুদ্রিত পাঁচালীর একখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। তাহাতে পাঁচালী রচয়িতা নিজ পরিচয় দিতেছেন ঃ—

কন্যা জামাতারে রাখিল এক ঘরে
যতন করিয়া ধনপতি॥
দ্বিজ রতিরাম সুপদ রচিল
বিক্রমপুর যাঁহার বসতি।

এই দ্বিজ রতিরাম কে ছিলেন, তাঁহার পরিচয় জানা আবশ্যক। পাঁচালীখানার রচনা বেশ ভাল।

আমরা কোন কোন বাড়িতে অনেকটা সময় কাটাইয়াছিলাম, নানা গল্প ও আলাপ আলোচনার মধ্যে গ্রাম্য সমাজ, দলাদলি, স্ত্রীশিক্ষা এমন বিষয় ছিল না, যাহা অল্প সময় মধ্যে না আলাপ আলোচনা করিয়াছি।

বাজিতপুর এখনও সেকেলে গ্রাম। একটা বিষয় বলিবার মত আছে। এখানে আমি একজন মহিলাকেও সে বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা যে বয়সেরই হউন না কেন অনবগুণ্ঠিতাভাবে দেখি নাই। সকলেই ঘোমটা দিয়া পথ চলেন। আজকালকার নারী সমাজের বিদ্রোহ-বাণী এখানে আসিয়া কি পৌঁছায় নাই? এমন কি একটি সুপরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ও নাই। মেয়েরা অনেকেই ঘরে ঘরে পড়ে। তবে সকালে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াশুনা চলে। গ্রামবাসী স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে খুব আগ্রহান্বিত বলিয়া মনে হইল না। পথে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাঙলা গভর্নমেণ্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ি দেখিলাম। অবিনাশবাবু বাজিতপুরের কৃতী সন্তান। তবে দেশে আসেন কি না জানি না।

আমরা ক্রমে গ্রাম্য ডাকঘরের কাছে আসিলাম। গ্রামের ডাকঘর গ্রামের লোকের মিলনকেন্দ্র। আমি ডাকঘরে দুইখানি চিঠি ডাকে দিলাম। ডাকবাবুর সহিত আলাপ হইল। ধনুকের ন্যায় বাঁকা একটি পথে গ্রামটি পর্যটন করিয়া আসিতে সময় নেহাৎ মন্দ লাগে নাই। শীতের দিন—তবু রৌদ্র তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। অদূরে মাঠের পাশে একটি বড় বাড়ি দেখা যাইতেছিল। সে দিকেই চলিলাম।

স্কুলের পাশেই বাজার। বাজারটি দেখিতে গেলাম। বাজিতপুর গ্রাম খেজুরি গুড় ও ঘৃতের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এমন সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত গুড় বাঙলায় আর কোথাও হয় না। গুড়ের ব্যাপারি সবই মুসলমান। কোন হিন্দু এমন কি নমঃ-শূদ্রেরাও গুড়ের ব্যবসায় করে না। এখানকার এক জাতীয় গুড় এমন রসে পূর্ণ যে, উহা খাইলে কলিকাতার বিখ্যাত সন্দেশও তেমন সুস্বাদু লাগিবে না। এখানকার গোয়ালারা যে ঘৃত প্রস্তুত করে—তাহা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। যিনি বাজিতপুরের গুড় ও ঘৃতের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়াছেন, তিনি তাহার বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন না। বাজিতপুরের বাজার তেমন বড় নহে। নানা তরিতরকারি, শাকসব্জী ও মৎস্য বিক্রয় হয়। এখানে বড় বড় রুই মাছও পাওয়া যায়। বাজারে কয়েকখানি স্থায়ী কাপড়ের দোকান, দর্জির দোকান, মুদির ও বানিয়াতি মাল মশলার দোকানও রহিয়াছে। শীতকাল, তাই বাজারে গুড় বিক্রেতার সংখ্যা খুব বেশী। নানা গ্রাম হইতে গুড় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। এখানে দুধ অতি সস্তা। সময় সময় সের এক পয়সাও হয়। এখন দুই পয়সা মাত্র তাহাও ওজন-ব্যতিরেকে অনেক সময় আড়াই সেরি, পাঁচ সেরি হাঁড়ি অতি অল্প মূল্যে কেনা যায়, তাহাতে দুধের সের

এক পয়সার উপর পড়ে না। এ ওজন পাকি। আমি বাজারটি বেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। আমার সঙ্গীরা কেহ বাড়ির জন্য দুধ, মাছ, তরকারীটা কিনিয়া ফেলিলেন। বাজারে সেই কেনা বেচার হট্টগোল, হৈ চৈ বেশ লাগিতেছিল।

বাজিতপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি "আর কে এইচ ই এডোয়ার্ড ইনস্টিটিউশন" নামে পরিচিত। এ স্কুলের হেড মাস্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুরোধে স্কুলের ছাত্রদিগের কাছে কিছু বলিতে হইল। ছেলেরা নীরবে বেশ আগ্রহের সহিতই আমার কথা শুনিল। তাঁহাদের সৌজন্যপূর্ণ শিষ্ট ব্যবহার আমার ভাল লাগিয়াছিল। শিক্ষকদের মধ্যেও কেহ কেহ সুন্দর বলিলেন, কেহ কেহ আমার পরিচিতও ছিলেন।

আমি ভাবিতেছিলাম, আমাদের শিক্ষার ভিতর এমন একটা দোষ আছে যাহার ফলে এই যে সব শান্ত শিষ্ট বালকেরা তাহারা হঠাৎ শহরে যাইয়া হইয়া উঠে স্ব স্ব প্রধান। মনে করে কাহাকেও না মানিয়া চলাই হইতেছে শিক্ষার ধর্ম। বিনয়ী হওয়া পাপ—অবিনয়ী ও অশিষ্ট হওয়াই হইতেছে মনুষ্যত্ব। এমন ঘটনা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। বাঙালী ছেলেরা অল্প বয়স হইতেই সিগরেট ও চুরুটের অনুরাগী। আমি একদিন কলিকাতার ট্রামে একটি বার তের বছরের কিশোরকে প্রকাণ্ড একটা চুরুট টানিতে দেখিয়াছিলাম।

স্কুলের হেড মাস্টার ও অন্যান্য শিক্ষকদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের পর গ্রামের ত্রিপুরাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়টি দেখিলাম। এইটি মহারাজা সূর্যকান্তের কীর্তি। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা সূর্যকান্ত তাঁহার জন্মভূমিকে ভোলেন নাই। তাঁহার এই দান গ্রাম্য নরনারীদিগের ব্যাধি পীড়া দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

আমরা অবশেষে শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার মজুমদার মহাশয়ের বাড়ি আসিলাম। সেকেলে জমিদার বাড়ি। দক্ষিণে মুক্ত প্রান্তর। বাড়ির সমুখে কয়েকটি ঝাউ গাছ। অদূরে মন্দির শোভা পাইতেছে। দীঘির জল টলমল করিতেছে। বাহিরে ফরাস বিছানা। হেরম্ববাবুর পিতা মণীন্দ্রবাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল। ময়মনসিংহ গোলকপুরের বিখ্যাত জমিদার স্বর্গত কুমার উপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় মণীন্দ্রবাবুর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হেরম্ববাবুর বৃদ্ধা জননী অন্তঃপুর হইতে আমাকে চা পানের জন্য অনুরোধ করিলেন। এই বোধ হয় আমার জীবনে প্রথম চা পান করিতে অস্বীকার। বেলা তখন বারোটা বাজিয়াছিল। চা পান না করিলেও কিছু মিষ্টি এবং রসপূর্ণ একটি গুড়ের পাটালি ও জলপান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলাম।

হেরম্ববাবুদের বাড়িটি অতি সুন্দর। বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। দীঘি-পুষ্করিণী-বাগান সমৃদ্ধির পরিচায়ক। আর সমুখে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের মাঝে মাঝে দুই একটি তাল গাছ, খেজুর গাছ, নারিকেল গাছ দেখা যাইতেছিল। কোন্ মুক্ত-প্রান্তর হইতে শীতল বায়ু বহন করিয়া আনিতেছিল সজীবতা। বিস্তারিত মাঠের মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে। কোথাও বাঁধানো সড়ক, কোথাও মেঠো পথ। আর সেই পথে আসিতেছে যাইতেছে যাত্রীদল—মেলার দিক হইতে। হেরম্ববাবুদের বাড়ির বৈঠকখানা হইতে প্রণবানন্দজীর আশ্রম দেখা যাইতেছিল। দেখা যাইতেছিল—গৈরিক পতাকা, দেখা যাইতেছিল ঘনসন্নিবিষ্ট তরু-শ্রেণীর শ্যামল সুন্দর রূপ রৌদ্র কিরণে পুলকিত হইয়া যেন সব হাসিতেছে। বিকেলে সকলেই সভাস্থলে যাইবেন বলিলেন।

হেরম্ববাবু বলিলেন, "এক সময়ে প্রণবানন্দকে নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু যখন তাহাকে দেশের লোক প্রকৃতভাবে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই হইল তাহার তিরোভাব। আজ আমাদের গ্রামের লোকেরা উৎসবের দ্বারা এবং এই মেলার মধ্য দিয়া নানাভাবে উপকৃত হইতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক দিয়া অনেকে সারা বৎসরের খরচ যোগাইবার মত অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। প্রতিদিন শত শত মণ দুধ, ছানা, মিষ্টি ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। প্রতি বৎসর মেলার এই উৎসব দিনে ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোক সমবেত হয়। নানা দেশ হইতে লোক আসে।" হেরম্ববাবুর উক্তির সত্যতা প্রত্যক্ষভাবেই ত অনুভব করিতেছিলাম।

আমরা হেরম্ববাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া মেলা ও আশ্রমের দিকে চলিলাম। গ্রামটি আমরা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছিলাম। এইবার সোজাপথ ধরিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

মেলার মধ্য দিয়া অতি কষ্টে জনতা ঠেলিয়া আমার বাসস্থানে আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, মাদারীপুর হইতে 'মাদারীপুর বার্তাবহ' সম্পাদক প্রবীণ ও প্রাচীন উকীল 'অদ্ভুত স্বপ্ন' প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত বি এল, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার মোক্তার এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের সহিতও প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপ হইল। কেদারবাবু অভ্যর্থনা সভার সভাপতি। এই আশ্রমের সহিত তাঁহার অনেক দিনকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তিনি মাদারীপুর মহকুমারই অধিবাসী।

আমি তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইয়া স্নান করিতে চলিলাম। শ্রীমান্ রাজেন্দ্র জল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি যে বাড়ীতে আছি, আজ এখানেও তিল ধারণের স্থান নাই, কি করি, ছাদে যাইয়া স্নান করিলাম। ছাদের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যাইতেছিল। মাঠের পর মাঠ গ্রামের পর গ্রাম। খালটি চলিয়াছে আঁকিয়া বাঁকিয়া মাঠের মধ্য দিয়া নদীর দিকে। আমার কাছে এ যেন এক আশ্চর্য সংগঠন বলিয়া মনে হইতেছিল। স্বামী আত্মানন্দজী রুগ্ন ও শীর্ণ ব্যক্তি। স্বর্গত ডাক্তার রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন এখানে একবার সভাপতিত্ব করিতে আসেন, তখন তিনি স্বামীজীর নাম দিয়াছিলেন—"খড়কানন্দ।"

স্বামীজীরা কাল কেহই আহার করিবার সুযোগ পান নাই। আজও পাইবেন না বলিয়া দুঃখ হইল। আর আমি যখন জানিতে পারিলাম যে, আমার সঙ্গে এক কক্ষে আত্মানন্দস্বামী ছিলেন, তিনি কেবল আমার সুখ সুবিধা ও ঘর আগলাইয়া ছিলেন—তাঁহার কাল কিছুই আহার হয় নাই। ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল, আমি বলিলাম—আপনি এ বেলা কিছু না খাইলে আমিও খাইতে যাইব না। তাঁহাকে তখন একরূপ জোর করিয়া খালের পর পারে আশ্রমে পাঠাইয়া দিলাম দুইটি প্রসাদ গ্রহণের জন্য।

আমাকে এখানকার অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক কর্মী রমেশচন্দ্র দাস বলিলেন, আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা কিরণশশীর ওখানে হইয়াছে! অল্প দূরেই তার বাড়ি। রমেশবাবু আমাকে লইয়া চলিলেন; তখন বেলা দুইটা বাজিয়াছে। মেলার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়া চলিল ভলান্টিয়ার দল। জনতা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে হট্টগোল, বাঁশী, ঢোল, ঘণ্টা নিনাদ ও ঢাকের গুরুগম্ভীর শব্দে সারা গ্রামখানি সচকিত হইয়া উঠিয়াছে।

নমঃশূদ্র পুরুষ ও নারীদের, যুবক যুবতী ও বালক বালিকা-দের দেখিলে আনন্দ হয়। প্রায় সকলেরই সুগঠিত সবল দেহ।

সকলেই শক্তিশালী। তাহারা অনেকেই স্বামীজীর শিষ্য ও শিষ্যা। প্রণবানন্দ ইঁহাদিগকে আপনার সবল দুইটি বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাই আজ প্রণবানন্দকে হারাইয়া তাঁহার সমাধি দেখিতে আসিয়াছে। তাঁহার সমাধির নিকট মাথা নোয়াইতেছে। মুখে তাদের সারল্যের ছবি, কপটতার লেশমাত্র নাই। বড় ভাল লাগিল ইহাদের দেখিয়া।

রমেশবাবু আমাকে লইয়া চলিলেন কিরণশশীর বাড়ী। কিরণশশী নাম শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল বোধ হয় রমেশবাবুদের কোনও আত্মীয়া হইবেন, কিন্তু যখন কিরণশশী, কিরণশশী বলিয়া রমেশবাবুর ডাকার পরে কিরণশশীরূপী বলিষ্ঠ ও সবল দেহ এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমাকে সাদর অভিনন্দন করিলেন, তখন আমার জাতকের সেই নাম মাহাত্ম্য গল্পটি মনে পড়িল! কমলাক্ষও কানা হয়, লক্ষ্মীও দরিদ্র হয়! আর কিনা কিরণশশীও পুরুষ হইয়া থাকে। আমাদের বাঙলা দেশের নামের ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ অনেক নামই বলা যায়! মেয়েদের নামের সহিত পুরুষের নামের তফাৎ বুঝা যায় না! মেয়েদের নামত আজকাল মঞ্জুলা, কণিকা, বেলা, মল্লিকা, আরতি, গীতা, শোভনা, কোমলতায় দাঁড়াইয়াছে। পুরুষদের নামও তেমনি সান্ত্বনা, ষোড়শী, রমণী, জামিনীতে রূপান্তরিত হইতেছে। পুরুষের পুরুষোচিত সবল নাম আর নাই। মেয়েদের নামত কোমলতার চূড়ান্ত সীমায় যাইয়া পৌঁছিয়াছে। কাজেই ইঁহাদের বীরাঙ্গনা হইবার আশা কোথায়? নামেই যে তাহার পরিচয়।

কিরণশশীবাবু দিনাজপুর রাইগঞ্জ স্কুলের এসিস্টান্ট হেডমাস্টার। কিরণশশীবাবু সুপুরুষ এবং শিষ্ট, শান্ত ভদ্রলোক। তিনি খাবার তেমন কিছুই আয়োজন করিতে পারেন নাই বলিলেন —কিন্তু খাইতে বসিয়া দেখিলাম, রন্ধন হইয়াছে প্রায় পঞ্চাশটি ব্যঞ্জন। আর তাঁহার গৃহিণী মনপ্রাণ ঢালিয়া রাঁধিয়াছেন অতিথি সেবার জন্য। বাঙালী মেয়েরা যদি আবার রান্নাঘরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মন দিতেন তাহা হইলে বাঙালী দীর্ঘজীবি হইতে পারিত! উড়ে ঠাকুর ও দ্বারভাঙা জেলার অধিবাসী ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কবল হইতে বাঙালী পুরুষেরা বাঁচিত। কিন্তু 'সেদিন নাহিকো আর!'

কিরণশশী নাগ মহাশয়দের বাড়িতে অযত্নে রক্ষিত একটি কাঠের দরোজা বা চৌকাঠের কতকটা অংশ দেখিলাম। উহা দেখিবার মত বটে—উহার গায়ে নানারূপ কাঠের পুতুল সাজানো আছে। কোথাও রাধাকৃষ্ণ, কোথাও নৃত্য দৃশ্য, কোথাও কীর্তনের দল, কোথাও কোন মহিলা ঢোলক বাজাইতেছে, কোথাও পর্তুগীজ পুরুষ ও মহিলার মূর্তি। শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। আমাকে কিরণশশীবাবুর দাদা ডাক্তার কুলচন্দ্র নাগ মহাশয় একটি পুতুল উপহার দিয়াছেন। আমার মনে হয়, কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ হইতে ঐটি সংগ্রহ করিয়া আনা উচিত। নতুবা যেমন হয় একদিন হয়ত উহা সমূলে বিনষ্ট হইবে। আড়াই শত তিন শত বৎসর পূর্বের একটি কাঠের শিল্প চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। বাঙলার অনেক কিছু প্রাচীন কীর্তি এইরূপ অযত্নেই বিনষ্ট হইতেছে।

আহারাদির পর একটুমাত্র বিশ্রাম করিয়া আমি কয়েকজন স্বামীজীর সহিত মন্দির ইত্যাদি দেখিয়া আসিলাম। আর দেখিলাম রন্ধনশালা। অতি বৃহদাকারের সব কড়াই, পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত ধরিয়া খিচরান্ন রান্না হইয়াছে। তরকারি, ভাজি, শাক ইত্যাদিও স্তূপীকৃত, গোল আলু, মিষ্টি আলুর যেন এক একটি পাহাড়। সন্ন্যাসীরা সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। অতি পরিষ্কারভাবে রন্ধনশালার চারিদিক ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাঠের বিরাট স্তূপ বৃহদাকার চুল্লীর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতেছে। আর জয় জয় রবে পরিবেশনকারীরা সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। দেখিলাম, পংক্তির পর পংক্তি ধরিয়া সকলে প্রসাদ লইতে বসিয়াছে। কলার পাতা, মাটির গ্লাস ও খুড়িতে সব দেওয়া হইতেছে। এইখানে জাতিগত প্রভেদ নাই, সমাজগত প্রভেদ নাই, এই মহামিলনক্ষেত্রে যে যেখান হইতে আসিয়াছে, প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে। কলিকাতার নিমন্ত্রণ বাড়ির ভদ্রলোকেরাও হৈ চৈ ও গোল করেন এবং পথের ভিখারীদের ত কথাই নাই, কিন্তু এখানে এক একবার চার পাঁচ হাজার লোক খাইতে বসিয়াছে, কিন্তু সামান্য গোলমাল নাই। শিশু, বালক, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধা সব এক সঙ্গে বসিয়াছে। কেহ কোন কথা বলে না। কাহারও পাতে হয়ত ব্যঞ্জন নাই, কিন্তু তাহারা গোলযোগ করে না,—নীরবে প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, জানে তাহারা সন্ন্যাসীরা নিজেরা দেখিয়া দিবেন। তাহাই দেখিলাম, কাহারও পাত খালি হওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ স্বামীজীরা আসিয়া পূর্ণ করিয়া দেন।

স্বামীজীরা ভিক্ষা করিয়া হাজার হাজার নরনারীর সেবা করিতেছেন। এই আনন্দমেলা—এই জগন্নাথ ক্ষেত্র, এই দরিদ্রনারায়ণের সেবা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমি বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করিতেছে। আর একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম যে, মুসলমানেরাও এক সঙ্গে বসিয়া খাওয়াদাওয়া করিতেছে, তাহাদেরও বিনোদ ব্রহ্মচারীর উপর অসাধারণ শ্রদ্ধা। আমি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উৎসবের নানা স্থান পর্যটন করিয়া আবার নির্দিষ্ট বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সভাস্থলে তিল ধারণেরও স্থান নাই।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার মহাশয় মাদারীপুরে মোক্তারি করেন। তিনি একজন নমঃশূদ্র নেতা। তাঁহার সহিত সামাজিক নানা বিষয়ে আলাপ হইল।

আমাদের সমাজ—বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের দুর্গতি ও শক্তিহীন হইবার মূলে রহিয়াছি আমরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ। কত না অত্যাচার ও নির্যাতন সহিয়াছে, তাহা আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি নাই।

ফরিদপুর জেলায় মুসলমান ও নমঃশূদ্র—ইহারাই হইতেছে প্রধান অধিবাসী। ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশে মুসলমানেরা অধিক সংখ্যায় বাস করেন, আর দক্ষিণ ভাগে বাস করেন গোপালগঞ্জ প্রভৃতি বিল অঞ্চলে নমঃশূদ্রগণ। ইঁহাদের বলিষ্ঠ দেহ, সরল সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং শান্তিপূর্ণভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালনের দিকে লক্ষ্য করিলে আনন্দ হয়। ওমেলি সাহেব তৎপ্রণীত ফরিদপুর জেলার বিবরণীতে নমঃশূদ্রগণের সুস্থ ও সবল দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেনঃ—'নমঃশূদ্রেরা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা করিলেও তাহাদের প্রশস্ত বক্ষ, সুগঠিত মাংসপেশী ও উজ্জ্বল দীপ্ত চক্ষু দেখিলে আনন্দ হয়। তাহারা দুইবেলা সামান্য ভাত, ডাল ও মাছ খায়। এক একজনের খোরাকের মাসিক ব্যয় মাত্র ২৸৵০ টাকা।' ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জনবিবরণীর কথা উল্লেখ করিয়া ওমেলি সাহেব বলিয়াছেনঃ—

"In 1[illegible] ...madans and Hindus were 60 [illegible] ...tively of the district popul[illegible] ... between those and t[illegible] ... to the fact that [illegible] ... faster rate

[illegible] কোনবার হয় [illegible] বলিলে বলে, মনে নে [illegible] ছেলে! এতও মনে থাকে [illegible] রসিক মনে মনে বোধ [illegible] সেদিনের পরে আজ ত সে তাহাকে [illegible] নী

than the Hindus, the former added 50 percent, and the latter 20 percent, to their numbers between 1872 and 1911.''

অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় মুসলমান ও হিন্দুদের সংখ্যা ছিল—মুসলমান শতকরা ৬০ জন, আর হিন্দু শতকরা ৪০ জন। কিন্তু মুসলমানদের জনসংখ্যা অতি দ্রুত বর্ধিত হওয়ার ফলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, এই প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দু সংখ্যায় বাড়িয়াছে শতকরা ২০ জন মাত্র, আর মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৫০ জন। কাজেই এ জেলায় ক্রমশই মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে।

ফরিদপুর জেলায়—

''The predominant caste, in point of number is that of the Nomasudras, who number 411,467 and account for over one half of the whole Hindu population of the district. This great caste—the second Hindu caste in Bengal in numerical strength—has in habit in the lower delta and is found in greatest strength in the South-West of Faridpur and the districts of Bakarganj, Khulna and Jessore. The Faridpur district contains more Nomasudras than any other district, the number resident in it being over one fifth of the aggregate for the entire province.''

ওমেলি সাহেবের এই বিবরণীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই নমঃশূদ্র জাতির প্রতি কতটুকু কর্তব্য করিয়াছি, আজ সেকথা আলোচনার সময় আসিয়াছে, অবশ্য এ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের বহু পূর্ব হইতেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

যাদু

(১৯২ পৃষ্ঠার পর)

অপূর্ব ক্রুর হাসি ফুটে ওঠে ডাক্তারের মুখে। বলে, 'স্বামী আসছেন, না? তাই আজ এই অভাগার সকল দরকার ফুরিয়েছে, কি বল নিরুপমা?'

কি হবে তার, তা ভাল করে বুঝে পায় না নিরুপমা। সে বলে ফেলে, 'হ্যাঁ।'

সেই রাত্রের গাঢ় অন্ধকারের ভের্তে তাঁর হাসিতে ফেটে পড়ে ডাক্তার। বলে, 'বেশ, তবে চললাম।'

ডাক্তার চলে গেল। নিরুপমা তেমনি বসে রইল সেখানে। চিন্তার অতলে তলিয়ে গিয়েছে সে।

প্রমথ আসছে। গ্রামের নিঃশেষিত প্রাণশক্তি ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। আজ আসছে প্রমথ, কাল হয়ত আসবে নীলকণ্ঠ আর পরশু সুরেশ। যুদ্ধ বেধেছে সারা বিশ্বে; এর ভয়াবহতা বোঝে না নিরুপমা; সে বুঝতে পারে না প্রমথর দার্শনিকতা। তার মনে হয়, যুদ্ধ বড় ভাল। যুদ্ধ আবার প্রমথকে প্রমথ করে, মানুষকে করে মানুষ। সে ফিরিয়ে দেয় গ্রামের হৃত প্রাণশক্তি, অসম্ভবকে করে তোলে সম্ভব। তারই দৌলতে হয়ত পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে সকল সুখ-শান্তি, আনন্দের কলহাস্যে মুখরিত হবে পৃথিবীর সমস্ত গ্রাম। যুদ্ধকে এক অমিত শক্তিশালী যাদুকরের মত মনে হয় নিরুপমার, যুদ্ধকে বড় ভাল লাগে তার।

পথে আ...
...ম্ববাবুদের বা...
...া দেখা যাইতেছিল।
...যাইতেছিল ঘনসন্নিবিষ্ট
...রণে পুলকিত হইয়া যেন সব
...স্থলে যাইবেন বলিলেন।

পরমাণু

(গল্প)

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

লোকে বলে মরার বাড় গাল নেই। রসিক বলে ঠিক উল্টো। বলে, ওটা আমরা গালের মধ্যেই ধরি না। রোজ সকালে একবার যমের বাড়ি না পাঠিয়ে সাধন ঘুমের থেকেই ওঠে না। ইস্তিরির মুখের শাপান্ত, ওটা হ'ল আশীর্বাদ বুঝলে কি না। না হ'লে আজ ক'বছর ধরে যে লোকটার মরণ চাওয়া হচ্ছে, তার গায়ে কি না একটা আঁচড়ও লাগলো না, এ কি করে সম্ভব। আরও কতরকমের গাল আছে। মেয়েলোকের কথা আমার ভাল মনেও থাকে না। যাস একদিন, শুনে আসিস নিজে।

শোনবার মতই বটে। রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে কান পাতিয়া না থাকিলেও, চোখ মেলিয়া দেখিতে হয় বৈকি? সকালে সকলের আগে বিছানা ছাড়িয়া ওঠে রসিক। কাজের লোক। কলের বাঁশি শুনিয়া রাত চারটেয় বারমাস ওঠা অভ্যাস। ইচ্ছা থাকিলেও এখন আর বেশিক্ষণ বিছানায় থাকিতে পারে না। ছুটির দিনেও নয়। কোলের ছোট ছেলেটা রাত তিনটে থেকে কাঁদে।

ওকে একটু মাই-টাই দাও, গলা যে কাঠ হয়ে গেল—সাধনকে উদ্দেশ্য করিয়া রসিক বলে। সাধন চোখ বুজিয়া থাকে। সব কথারই যে উত্তর দিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই।

সেই কখন থেকে বলছি, তা কথা কানেই যায় না, মানুষ বলেই মনে হয় না, কেমন? কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে রসিক বলে।

হয়ই ত না, সেকথা নতুন জানলে নাকি—সাধনের ঘুমের প্রয়োজন মিটিয়াছে, এখনই উঠিবে সে।

রাতে যে একটু আরাম করে ঘুমোব, সে উপায় নেই। এটা ট্যাঁ, ওটা ভ্যাঁ। আজ থেকে আমার জন্যে মেঝেয় বিছানা করে দিও বাপু।

দরকার হয় করে নিলেই পার। হুকুম কর কার ওপর। হাতীর গতর দেখেছ কি না- সাধন এতক্ষণে মেঝেয় নামিয়া আসিয়াছে শুলেই পার আলাদা বিছানা ক'রে, কে পায়ে ধ'রে সাধতে যায় শুনি, তিনবেলা ভয় দেখান উনি, তবুও যদি ক্ষমতা থাকত—

ক্ষমতা নাই রসিকের! না শরীরের, না মনের। স্ত্রীর মুখের সামনে দাঁড়াইয়া সোজা হইয়া দুইটা কথা কহিবে, এতটুকুও না। সূর্য উঠিলে প্যাঁচার যে অবস্থা হয়, সাধন ঘুম হইতে উঠিলে রসিকের অবস্থা অনেকটা সেই রকমের। কোন্‌দিক দিয়া পালাইবে, দিশা পাইয়া ওঠে না। শরীরের কথা না বলাই ভাল। যন্ত্রের চাকার নীচে দেহকে পাত করিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াই ত রসিক কলে চাকরী লইয়াছে।—ক্ষমতা ত নেই-ই। ক্ষমতা থাকলে কি তিনবেলা ঝাঁটাবাড়ুন খেয়ে তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাকি—রসিকের চোখ ছলছল করে।

আরও বেশী করে মদ খাও, তাহলে থাকবে। দিন দিন কুমড়োর মত মোটা হবে ফুলে। এমনিতেই কি আর শরীর থাকে, রাখতে জানা চাই। সাধন যে ঘরের বৌ—একথা সে যত সহজে নিজে ভুলিয়া যায়, রসিক যে তার স্বামী একথা অত সহজে ভুলিতে পারে না। কোলের ছেলেটার দিকে তাকাইয়াই বোধ হয়।

সাধন জানে। কেমন করিয়া শরীর রাখিতে হয় সাধনের তাহা অজানা নাই। আট বৎসরে পাঁচটি সন্তানের মা হইয়াছে সে। অথচ দেখিলে মনে হয়, সেদিনের খুকি, বিয়ের পর এই প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে বোধ হয়। স্ত্রীর নিটোল চেহারার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে রসিক। কলে কাজ করে, তাই মনে হয়, লোহার মতন গাঁথুনি ওর শরীরের। কিন্তু লোহায়ও মরিচা ধরে।

সাধনের মত বৌ পাওয়া, বুঝলে রসিক, সেও ভাগ্যের কথা, বনমালী প্রায়ই বলে, আমাদের উনি ত মাসের মধ্যে নিত্যি তিরিশ দিন বিছানায় পড়ে থাকেন, আর সংসার ঠেলতে ঠেলতে আমার হাড়মাস আলাদা হয়ে যায়।

রসিকের চোখের সামনে সাধনের চেহারা ভাসিয়া ওঠে। হাতের পাকানো লাঠিটার দিকে তাকায় সে।—এই যে লাঠিটা দেখছিস, বনমালী, এখানে যেবার একজিবিসন হয়, সেবার কেনা। সে ত আজ ক'বছর হয়ে গেল। কিন্তু তেলে পেকে ওর চেহারা হয়েছে দেখ। ও রকম হয়, এক একটা জিনিস ওরকম হাতে এসে যায়, ক্ষয় কাকে বলে জানে না তারা।

রসিকের এ ধারণা আর টিকিবে না বোধ হয়। সাধনের মনেও ঘুণ ধরিয়াছে এতদিনে। সন্দেহের ঘুণ। রসিক মদ খায়। সাধন তাহাতে আপত্তি করে না। মিলে যাহারা কাজ করে, মদ তাহাদের পক্ষে এক ঘণ্টার উপরি আনন্দ। সকলেই খায়। সব নদীর জলই যেমন সাগরে যাইয়া মেশে। কারও বাড়িতে সবশুদ্ধ খায়, স্বামীস্ত্রী ছেলেমেয়ে সব। সাধন অতটা পছন্দ করে না। রসিক একবার একটি বোতল বাসায় আনিয়াছিল।—খাওনা, মাত্তর একদিনই ত, কিই-বা এমন ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

সেকথা হচ্ছে না। সংসারে আমি একা লোক। ওসব ছাইভস্ম খেয়ে সারাদিন পড়ে থাকলে রাবণের পল্লীর আহার যোগাবে কে? তোমার ত এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে বললে গায়ে জ্বর আসে। কথাটা সঙ্গত মনে হইয়াছিল রসিকের। আর অনুরোধ করে নাই।

রসিক মদ খায়। সাধন আপত্তি করে না। যুক্তিঃ সামান্য পাউডার মাখিলেই যদি কালো রঙ ঢাকিয়া যায়, তাহা হইলে পাউডার মাখিতে দেওয়াই ত ভাল। মদ এমন কি? বেশি খায় না রসিক। পয়সা কোথায় তাহার। বাক্সের চাবি সব সাধনের হাতে। প্রত্যেক শনিবার নিজের হাতে পয়সা দেয় সে। কোনবার হয়ত কম পয়সা দেয়। রসিক কিছু বলিলে বলে, মনে নেই, সেদিন বাড়ি এসে বমি করেছিলে! এতও মনে থাকে সাধনের!

রসিক মনে মনে বোধ হয় কৃতজ্ঞতা জানায় সাধনকে। সেদিনের পরে আজ ত সে তাহাকে পয়সা না দিলেই পারিত।

কিন্তু সাধন ত জানে, সেদিন মদ বেশি খাইবার জন্য বমি করিয়াছিল রসিক, আর আজ মদ না খাইতে দিলে সে যাহা করিবে, তাহাতে ডাক্তার না ডাকিয়া উপায় থাকিবে না। সাধন ত ওসব নূতন দেখিতেছে না। তার বাবাও মদ খাইত, মাও অনেকদিন এমনি করিয়াই তাহাকে সাবধান করিয়া দিত। এসব ত সেই একই গলিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

মদ খাওয়ার মত এমন একটি নিরীহ সখে তাই আপত্তি নাই সাধনের। কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে বৌ থাকিতে দুপুর রাতে বাসায় ফেরা এ কোন্ দেশী সখ? সাধনের অভিযোগটা তাই ঠিক মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে নয়, বেশি রাতে বাসায় আসার বিরুদ্ধে।

যে পাড়ায় থাকে ওরা সে পাড়ায় দুপুর রাতে বাসায় ফেরা কিম্বা কোন কোন দিন একেবারেই না ফেরা নূতন নয় কিছু। সারাদিন লোহা পিটিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় বাহির হইয়া যায় ওরা, খুসি হইলে ফেরে, না হইলে ফেরে না। ফেরে না বলিয়াই হয়ত রক্ষা। রাস্তার কিছুটা দূরে হইতে বসতি ঘন হইয়া এখানে বস্তীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাগজকলমে এখানে সাড়ে তিনশ' লোক থাকিতে পারে, কিন্তু বৈশাখের রাত্রে ঘরের তলায় মাথা গুঁজিয়া তাহার অর্ধেকও থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। সারারাত তাহারা এখানে-ওখানে ইতস্তত পড়িয়া থাকে, অনিপুণ হাতে ফসলের বীজ ছড়াইলে যেমন হয়, কোন জায়গায় পাঁচটি গাছ জট পাকাইয়া উঠে, কোথায়ও গাছের অভাবে মাটির রঙই ঢাকিতে চায় না।

বনমালী কোনদিন রাত্রে বাসায় যায় না। রসিক বলে, এতরাতে এখানে ঘুরছিস যে, বাসায় যা বনমালী। বনমালী কেমন যেন হাসে। তাহার অর্থ এই যে, ঘরে সাধনের মত বৌ থাকিলে সেও সাতটায়ই বাড়ি ফিরিতে চাহিত।

সে কি কথা বনমালী, ঘরে তোর বৌ এখন-তখন। এ সময়ে কাছে থাকা তো উচিত। কখন কি দরকার হয়, বলাতো যায় না। শেষ সময়ে জলের অভাবেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে বোধ হয়।

মরলে ত বাঁচি। কিন্তু মরবে না। যমের অরুচি। কাঁহাতক পারি বল। সারাদিন খেটে গায়ের রক্ত জল করে পয়সা আনব, আর সব ওর রোগের কল্যাণে ঢালবো। কেন, কিসের জন্যে? দিয়েছি ওষুধ-টষুধ সব বন্ধ করে। আবার রাত জেগে কাছে বসে থাকো—বয়ে গেছে আমার। তা তোমার কথা বলছিল রসিক, পারত দেখে এসো একবার।

বনমালীর বাড়ির দিকে রসিক মোড় ঘুরিল। ঘুমন্ত অন্ধকারের ভিতর ছোট ছোট বাড়িগুলি প্রহরীর মত জাগিয়া আছে। ভাবিলে, সবাইয়েরই গা ছমছম করে। তবুও তাড়াতাড়ি পা চালান দরকার। না হইলে হয়ত মেয়েটির সাথে দেখাই হইবে না। মরিবার আগে দেখিতে চাহিয়াছে মেয়েটি। কি কথা বলিয়া যাইবে, কে জানে। এমন কথা বলিবে না ত, আমি ওপারে যেয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রব। যেখানে সমাজ নেই, শাসন নেই, বনমালী নেই। যদি তাই বলে, কি মনে করিয়া থামিয়া যায় রসিক। আবার হাঁটে। এ কথাও ত বলিতে পারে, বড় অসময়ে চলে যাচ্ছি রসিক। ছোট ছেলেটা রইল। বনমালীর উপর ভরসা নেই। তুমিই ওর দেখাশোনা কোরো।

কিন্তু তেমন কিছুই হইল না। মেঝেয় মেয়েটির গায়ে পা লাগিবার আগে রসিক বুঝিতেই পারে নাই, সে ঠিক জায়গায় আসিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ। তাহাতে তেল ফুরাইয়া গিয়াছে। সলিতাটি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সে আলোয় কেহ কাহাকেও নিশ্চয় করিয়া চিনিতে পারে না। রহস্যের কুয়াশা সন্দেহের রূপ লইয়া চোখের উপর ঝুলিতে থাকে। মেয়েটি প্রথম কথা বলিল। ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ। সব ভাল বোঝা যায় না। মুখের উপর কান পাতিয়া থাকিতে হয়, নিঃশ্বাসকেও বিঘ্ন বলিয়া বাদ দিতে ইচ্ছা করে।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ। কত ডাকছি তোমায়। একটু জল। কোণার ওই কলসীটাতে আছে, ঐ কোণে। আমার কি এখন সে অবস্থা আছে যে ঐ খাট থেকে নেমে জল খেয়ে আসব!

রসিক বুঝিল খাট হইতে নিজে জল আনিতে গিয়াই মেঝেয় মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে বেচারা। আর উঠিতে পারে নাই। এমনিতেই খোঁড়া মানুষ। সেও বনমালীর জন্যেই। ও কি শুধু মদই খায়, বউকে মারিয়াছেও কতদিন।

রসিক কাসিল। সেই শব্দটুকু ভাঙিয়া চুরিয়া কোন রকমে বউটির কানে গেল বোধ হয়। দামাল ছেলেমেয়ের পেটে তেতো ওষুধ যেভাবে যায়। অন্যের কথা বুঝিবার শক্তি তখন তাহার নাই। সে আবার আরম্ভ করিলঃ রোজই ত যাও। আজকের রাত্তিরটা না হয় নাই গেলে। কত কষ্টই দিলাম তোমাকে, নিজেও পেলাম। তবুও কাল তো আর আমি বলবো না। বিশ্বাস করো, আজ রাত্তিরেই আমি মরব। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, ঐত ওরা আমায় নিতে এসেছে। আর সময় নেই। এখনই যেতে হবে আমাকে। কই, কোথায় তুমি। এমন সময় কি ছেড়ে যেতে হয়। ওগো, তোমরা দাঁড়াও। তোমাদের পায়ে পড়ি, দাঁড়াও একটু। এই যে এসেছো? এসো, কাছে এসো, কাছে, আরও একটু, আরও ...আরও...উঃ। রসিককে বাহুবন্ধনে বেষ্টন করিয়া বনমালীর বউ মরিল। সারারাত মড়া আগলাইয়া রসিক বাড়ির চৌকাঠে যখন পা দিল, চাঁদের মুখে মুমূর্ষুর করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে তখন। দূষিত ক্ষতের মত বনমালীর বৌয়ের বিশীর্ণ হাসি যেন আকাশের সর্বাঙ্গে।

কি, আর বাসায় ফিরে কাজ ছিল কি। থাকলেই পারতে সেই কুটুমের বাড়ি, যেখানে ছিলে সারারাত। বলি, কতজনেই কুলোয়—দরজা খুলিয়া সাধন ঘরে যাইয়া ঢুকিল।

রসিক কথা বলিল না। বনমালীর হাত হইতে মদের বোতলটি কাড়িয়া লইয়া সাধনের মুখে ছুড়িয়া মারিল শুধু। সব কথারই যে মৌখিক উত্তর দিতে হইবে এমনও কোন নিয়ম নাই।

(১৭)

অর্ধ ঘণ্টা পরে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া প্রশান্ত দেখিল লাবণ্য তখনও নিদ্রা যাইতেছে।

একটা গদি-আঁটা প্রশস্ত আরাম চেয়ারে র‍্যাগ ঢাকিয়া বসিয়া লাবণ্যর নিদ্রাভঙ্গের জন্য সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বেশি বিলম্ব হইল না। মিনিট দশ-পনের পরে চক্ষু মেলিয়া লাবণ্য ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; তার পর চেয়ারে উপবিষ্ট প্রশান্তকে দেখিয়া বলিল, "কতক্ষণ উঠেছ? —এখনো নীচে যাও নি যে?"

প্রশান্ত বলিল, "এইবার যাব। তার আগে তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

স্বামীর বিরস-গভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া লাবণ্য ঈষৎ উৎকণ্ঠিত হইল। র‍্যাগ ও লেপের আবরণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি কথা?"

বারান্দায় কুড়াইয়া-পাওয়া রুমালটা লাবণ্যর হস্তে দিয়া প্রশান্ত বলিল, "এটা ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখ।"

সবিস্ময়ে লাবণ্য বলিল, "এ কার রুমাল? কোথায় পেলে?"

প্রশান্ত বলিল, "পেয়েছি এই দোতলার বারান্দায়—সিঁড়ির কাছ থেকে দশ-বারো হাত এদিকে। কার রুমাল, তা ভাল ক'রে দেখলে তুমিও হয়তো বলতে পারবে।"

ব্যস্ত হইয়া রুমালখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে এক কোণে মালিকের নামের আদ্যক্ষর দেখিয়া লাবণ্যর মুখ শুকাইল; বলিল, "গৌরহরির না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "তা ছাড়া আর কার হ'তে পারে, তা'ত বুঝতে পারছি নে। আমার নামও গৌশান্ত নয়, তোমার নামও গৌবণ্য নয়।"

মনের মধ্যে খানিকটা অশান্তি এবং উদ্বেগের উপস্থিতি সত্ত্বেও স্বামীর কথা শুনিয়া লাবণ্যর মুখে ক্ষীণ হাস্যের আভা দেখা দিল; বলিল, "কখন পেলে এটা?"

প্রশান্ত বলিল, "ঘুম থেকে উঠে, বারান্দায় বেরিয়েই।"

চিন্তিত মুখে ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া লাবণ্য বলিল, "কি ক'রে বারান্দায় এল?"

"সেইটেই বুঝতে পারছি নে।"

ভয়ে ভয়ে উদ্বিগ্ন মুখে লাবণ্য বলিল, "কিছু মনে হয় তোমার?"

প্রশান্ত বলিল, "মনে যা হয়, মুখে সব সময়ে তা বলতে নেই। মন আমাদের অনেক সময়ে ভুল পথে টেনে নিয়ে যায়। আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি, যেটা ঘটেছে ব'লে সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল, সেইটেই ঘটে নি; অথচ বাস্তবিক যা ঘটেছিল, তা এমনই অদ্ভুত যে, কল্পনাতেও কেউ তা মনে করতে পারে নি।"

ক্ষণকাল মনে মনে নীরবে কি চিন্তা করিয়া লাবণ্য বলিল, "এ বিষয়ে খোঁজ-তল্লাস কিছু নেবে না? জিজ্ঞাসা-পড়া কাউকে করবে না?"

"করব বৈকি, —নিশ্চয় করব।"

"কাকে করবে?"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "কেন, গৌরহরিকে? উপস্থিত অবস্থায় আর কাউকে ত কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।"

তারপর এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল, "গৌরহরি কি কৈফিয়ৎ দেয় তা শোনবার আগে তুমি যেন কাউকে এ বিষয়ে কোনো কথা বো'ল না লাবণ্য।"

অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে লাবণ্য বলিল, "না, বলব না।"

স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথনের মধ্যে স্পষ্টত কোথাও সুলেখার নামোল্লেখ না থাকিলেও তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত কথোপকথনটা যে আবর্তিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে সংশয়ের লেশ মাত্র ছিল না।

(১৮)

চা-পানের পর অফিস-ঘরে গিয়া প্রশান্ত অবনীশকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

একজন ভৃত্য আসিয়া সেদিনকার লীডার সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া প্রশান্ত সংবাদের শিরোনামাগুলা দেখিতেছে, এমন সময়ে অবনীশ আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমাকে ডেকেছেন স্যার?" তৎপরে পূর্বোক্ত রুমালখানা টেবিলের উপর রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া, প্রশান্ত কোন কথা বলিবার পূর্বে, খপ্ করিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া সাগ্রহে বলিল, "এই পেয়েছি! উঃ! আজ সকাল থেকে কি খোঁজাই না খুঁজেছি এই রুমালটাকে! কোথায় পেলেন স্যার এটাকে? কি ক'রে এল এখানে?"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে প্রশান্ত বলিল, "আমাকে প্রশ্ন ক'র না তুমি! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এ রুমাল যে তোমার, তা ত জানতে পারলাম; দোতলার বারান্দায় এ রুমাল প'ড়ে ছিল কেন?"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া প্রথমে অবনীশের মুখমণ্ডলে বিমূঢ়তার একটা কৃত্রিম ছায়া দেখা গেল; তৎপরে ধীরে ধীরে অতি ক্ষীণ হাস্য তথায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "এই জন্যেই বলে স্যার, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভেবেছিলাম কথাটা গোপনেই রাখব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাঁস হ'য়েই গেল! আশ্চর্য! ঐ বারান্দা ছাড়া রুমালটা ফেলবার আর দ্বিতীয় জায়গা খুঁজে পেলাম না!"

রোষকষায়িত নেত্রে চাপা গলায় তর্জন করিয়া প্রশান্ত

বলিল, "ডেঁপোমি তোমার রাখ! দোতলার বারান্দায় কেন গিয়েছিলে বল!"

অবনীশ বলিল, "দোতলার বারান্দায় যাই নি স্যার, দোতলার বারান্দা দিয়ে গিয়েছিলাম।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

বিনয়-নম্র কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "ও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না স্যার, ও কথা আমি বলতে পারব না।"

টেবিলের উপর মৃদুভাবে মুষ্ঠির আঘাত করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ পূর্বক প্রশান্ত বলিল, "কেমন বলতে পারবে না তা দেখাচ্ছি! না বললে এখনি তোমাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করব!"

মুখে বিহ্বলতার চিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া অবনীশ বলিল, "দোহাই স্যার, ও কার্য করবেন না। তাতে আমার চেয়ে সুলেখা দেবীরই বেশি ক্ষতি হবে। কারণ পুলিশের সামনে আমাকে বলতেই হবে, আমি সুলেখা দেবীর ঘরে গিয়েছিলাম। তারপর সুলেখা দেবীকে জড়িত ক'রে সমস্ত শহরে এমন একটা কুৎসা রটবে, যার জন্যে সুলেখা দেবী আপনাদের কাছে ও আর আপনারা শহরের লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না।"

শুনিয়া একটা অপরিমেয় এবং অননুভূতপূর্ব গ্লানি এবং লজ্জায় প্রশান্তর মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় রুমালখানা কুড়াইয়া পাওয়া পর্যন্ত তাহার মনে এমনই একটা মলিন সংশয় কাঁটার মত সর্বক্ষণ বিঁধিয়া ছিল, কিন্তু সেই সংশয়েরই মধ্যে অবিচ্ছেদ্য আশ্বাসের যে কণিকাটুকু আলগাভাবে লাগিয়াছিল তাহাও যখন একেবারে নিঃশেষে খসিয়া গেল, তখন তাহার মত সংযতচিত্ত সহনশীল ব্যক্তিও একটা রূঢ় আঘাতের তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য বলিবার মত কোনো কথা খুঁজিয়া পাইল না।

প্রশান্তর মনের এই অবস্থাটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়া অবনীশ যত না দুঃখিত হইল প্রশান্তর জন্য, ততোধিক হইল সুলেখার কথা ভাবিয়া। অলীক এবং ক্ষণস্থায়ী হইলেও, যে ঘৃণিত অপযশের কালিমা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার জন্য সুলেখা অত ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিল, স্বামী হইয়া সে স্বহস্তে সেই কালিমার দ্বারা তাহাকে মলিন করিয়াছে। একটা অনির্ণেয় করুণায় ঈষৎ বিগলিত হইয়া কতকটা ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে সুলেখা দেবীর কোন দোষ নেই স্যার, দোষ যদি কারো থাকে ত' সে আমার। আপনি বিচার ক'রে আমাকে যদি দোষী সাব্যস্ত করেন, তা হলে যে দণ্ড আমাকে দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। কিন্তু সুলেখা দেবী নির্দোষ। আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, তখন তাঁর অবস্থা কতকটা সাপের ছুঁচো গেলার মত হয়েছিল। জোর ক'রে ঘর থেকে আমাকে বার ক'রে দিতেও ভয় পান, আবার ঘরের মধ্যে আমাকে বেশীক্ষণ রাখতেও সাহস পান না।"

ক্রুদ্ধ গভীর কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "তুমি যে তোমাকে ছুঁচোর সঙ্গে তুলনা করেছ, সেটা ঠিকই করেছ। তুমি একটা অতিশয় কুৎসিৎ ছুঁচো!"

চকিত হইয়া উঠিয়া অবনীশ বলিল, "আমি যদি আমাকে ছুঁচোর সঙ্গে তুলনা ক'রে থাকি, তা হলে ত' আপনার শালীকেও আমি সাপের সঙ্গে তুলনা করেছি। আপনি কি বলতে চান স্যার, আপনার শালী একটি অতিশয় ভয়ঙ্করী কালনাগিণী?"

তপ্ত কণ্ঠে প্রশান্ত কহিল, "চুপ ক'রে থাক অসভ্য কোথাকার! সুলেখার ঘরে কেন গিয়েছিলে তা বল।"

ঈষৎ উদ্ধত স্বরে অবনীশ বলিল, "একটা পরামর্শের জন্যে।"

"কিসের পরামর্শ?"

অবনীশ বলিল, "যখন এত কথাই বললাম, তখন বাকি কথাটুকুও স্পষ্ট ক'রেই বলি। এ রকম ড্রাইভারের কাজ নিয়ে এমন ক'রে একা একা থাকতে আর আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমার মন খারাপ হয়ে গেছে স্যার! একাই যদি থাকব, তা হলে বিয়ে করলাম কিসের জন্যে বলুন? এবার যদি আপনার এখানে কখনো আসি তা হলে আর একা না এসে দুজনে আসব। আমি এখান থেকে চ'লে যাব স্যার। হরিপদবাবুর আসা পর্যন্ত সে জন্যে অপেক্ষা করব; না, তার আগেই চ'লে যাব, সেই পরামর্শের জন্যে সুলেখা দেবীর ঘরে গিয়েছিলাম।"

রুক্ষ বিদ্রূপাত্মক স্বরে প্রশান্ত বলিল, "এ পরামর্শের জন্যে সুলেখা দেবী ছাড়া আর তুমি লোক খুঁজে পেলে না?"

দুঃখার্তকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "তাঁর চেয়ে আপনার আর এখানে কে আমার আছে, তা' ত আমি দেখতে পাইনে। আর সকলেই ত প্রতিপক্ষ। একমাত্র তিনিই যা একটু দয়া-দাক্ষিণ্য করেন। কাল রাত্রেও আমার প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করেছেন।"

প্রশান্তর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; এই কদর্য কুৎসিৎ ব্যাপারে অবনীশের সহিত আর অধিক আলোচনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "কাল রাত্রের তোমার গর্হিত আচরণের জন্যে আমি তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা করলাম।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে প্রশান্তর দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "আপনি যখন মনিব, তখন আপনার আদেশ মানতে আমি বাধ্য।" তারপর পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া একটা পাঁচ টাকার নোট প্রশান্তর সমুখে রাখিয়া বলিল, "নিন্, রসিদ কাটুন।"

"কিসের রসিদ?"

"জরিমানার।"

নোটখানা অবনীশের দিকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া প্রশান্ত বলিল, "জরিমানা তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।"

পুনরায় নোটখানা প্রশান্তর দিকে ঠেলিয়া দিয়া অবনীশ

(শেষাংশ ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উত্তর মেরুতে সোভিয়েট রুশের সভ্যতা পত্তন

ভবানী পাঠক

য়ুরোপের যে কোন রাষ্ট্র যখনই শিল্পে ও বাহুবলে উন্নত হয়েছে তখনই তাদের মধ্যে ভিন্ন দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের একটা প্রয়াস দেখা গেছে। যে উদ্দেশ্য নিয়েই এই সব ঔপনিবেশিক অভিযান হয়ে থাকুক না কেন, তার মূলে রয়েছে অর্থনীতিক কারণ। শিক্ষা বা সংস্কৃতি প্রচারের বিশুদ্ধ আদর্শ মহারাজা আশোকের সময় হয়তো সত্য ছিল, কিন্তু আধুনিক উগ্র ধনতান্ত্রিকতার মধ্যে সে আদর্শ একটা কথার কথা মাত্র। এমন কি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে আবিষ্কার বা অভিযান করতে আজ আর কেউ অগ্রসর হয় না। একটা অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার, সম্পদ আহরণ বা ঐ রকমই কোন কিছু বৈষয়িক সুখসুবিধা আত্মস্থ করার উদ্দেশ্য ছাড়া আধুনিককালে বড় কেউ আর দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বার হন না। প্যাদরীরা মানবতার দোহাই দিয়ে অবনত মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যান বটে, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস প্রায়শ শেষটায় সদাগরী সার্থকতায় পর্যবসিত হয়।

সোভিয়েট রুশিয়া জনবিরল উত্তরমেরু প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এই প্রয়াস এখনো ক্ষান্ত হয় নি। সোভিয়েট রুশিয়ার উপনিবেশ বিস্তার? কথাটা হেঁয়ালির মত মনে হয়। পররাজ্যে স্বাধিকার বিস্তার তাদের অর্থনীতিক আদর্শের সঙ্গে তো খাপ খাবার কথা নয়।

কিন্তু কথাটা সত্য। সোভিয়েট রুশিয়া তুষারাচ্ছন্ন উত্তর মেরুতে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, নগর পত্তন করেছে, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই তুন্দ্রাভূমিতে সভ্যতার স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার উপনিবেশ বিস্তারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। এর মধ্যে কোন জাতীয় অর্থনীতিক আত্মপূর্তির বালাই নেই। নিছক সভ্যতার বিস্তার ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য এর মধ্যে নেই। এক কথায় এর প্রমাণ দেওয়া যায়। উত্তর মেরুতে উপনিবেশ স্থাপন সোভিয়েট রুশিয়ার একটি রাষ্ট্রীয় ব্যয় মাত্র; এটা কোন ব্যবসা নয়, speculation বা টাকা খাটাবার প্রচেষ্টা নয়। কারণ এই পরীক্ষায় ভবিষ্যতে যে লাভ হবে তাতে মস্কোর ধনভাণ্ডার পুষ্ট হবার কোন ভরসা নেই। কিভাবে এই সংস্কৃতি বিস্তার ও পরীক্ষা চলেছে তা মিঃ এইচ পি স্মলকা স্বচক্ষে দেখে এসে একটি পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। এই প্রবন্ধে সেই পুস্তক থেকে কিছু তথ্য দেওয়া গেল।

তুন্দ্রাস্কুল হইতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত সাইবেরিয়ার ইগারকা শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র ও ছাত্রী

জারের আমলেও উত্তর মেরুতে রুশ রাষ্ট্রের শাসন চলতো। কিন্তু সে শাসন ছিল শোষণেরই নামান্তর। ইয়েনেসির নদীর গলিত বরফের ওপর দিয়ে রুশ বেনেদের মহাজনী নৌকা এসে ভীড় করতো উত্তর মেরুর যাযাবর মানুষের দেশের ঘাটে ঘাটে। ঠুনকো খেলনা বা সস্তা ভডকার (মদ্য) বিনিময়ে তারা মেরুবাসী যাযাবরদের কাছে পেত পশুলোম (Fur), যা খুবই চড়া দামে য়ুরোপের বাজারে বিক্রী হতো। জার-শাসনের একমাত্র কীর্তি ছিল এদের ওপর ট্যাক্স বসানো। এই পশুলোম যোগাড় করার জন্য মেরুবাসীদের দুঃসাধ্য পরিশ্রম করতে হতো। এক বোতল ভডকার দেনা শোধের জন্য দিনের পর দিন বলগা হরিণ নিয়ে চির-

তুহিন মের‍ুস্থলীর প্রান্তরে প্রান্তরে কাঠবিড়ালী বা খেঁক-শিয়াল খ‍ুঁজে খ‍ুঁজে শীকার করতে হতো। এই শোষণের যা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাই ঘটলো একদিন। সভ্যশাসনের করাল বাণিজ্যবুদ্ধি এদের ঘরে ঘরে সর্বনাশের বীজ ছড়িয়ে দিল।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে রুশিয়ার ঔপনিবেশিক রীতি-নীতি এই ধরণেরই ছিল। কিন্তু আজ আবার নতুন করে সে অভিযান আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সে রীতি আর নেই। লাল সোভিয়েট রক্তশোষণের জন্য মেরু অভিযান করছে না; রক্তসঞ্চারের জন্যই করছে। মিঃ স্মলকার-বর্ণনা তারই সাক্ষ্য।

উত্তর মেরু প্রদেশের অধিবাসী যাযাবর মানুষের সংখ্যা মোট দেড় লক্ষ হবে, মোট ছাব্বিশটি বিভিন্ন উপজাতি এই কোন কোন উপজাতির মধ্যে তুর্কী শব্দের আধিক্য, কাদেরও মধ্যে মঙ্গোল ভাষার। এ থেকেই মনে হয় যে, মধ্য এশিয়ার যোদ্ধৃস্বভাব তাতার জাতিদের অভিযানে এরাও একদিন পর্যুদস্ত হয়েছিল। হয়তো তখন এরা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ভূমিতে অল্পতর শীতমণ্ডলে উর্বরতর ভূমিতে বাস করতো। কিন্তু আক্রমণের প্রকোপে ক্রমে ক্রমে দূরে উত্তরে অনুদার কৃপণ তুষারস্থলীর দিকে সরে পড়তে হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে কসাকরা আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ বন্দুকের জোরে এদের পরাভূত করে; মূল্যবান পশুলোমের লোভে শোষণ করে। *এদের সর্দারদের বন্দী করে কসাকরা প্রচুর পশুলোম মুক্তি-*পণ হিসাবে আদায় করে নিত। এই ছিল তখনকার অবস্থা।

জনৈকা তরুণী কমসোমল বা কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী—মেরুবাসী নারীর যথার্থ কমরেডরূপে শিক্ষা ও সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে

যাযাবর জাতির মধ্যে আছে। সভ্য জাতির আচরণের রূঢ়তায় এরা অনেকদিন থেকেই ভুক্তভোগী। টুঙ্গুস, সামোয়েড, ইয়াকুত, গোলদি, লামুত, ইয়ুরাকা, গেলিয়াক, য়ুকাগির, দোলগান, অসটিয়াক আর চুকচি, এই কয়টি উপজাতিই এদের মধ্যে বিশিষ্ট।

অল্পসংখ্যক এস্কিমোও এখানে বাস করে, বেরিং প্রণালীর উপকূলভাগে। এদের মধ্যে অসটিয়াকরা মঙ্গোল বংশোদ্ভব; তাদের চওড়া চিবুক; মাথার খুলির গঠন আর মুখাবয়ব দেখলেই তা বোঝা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের সঙ্গে আমেরিকার আদিম মানুষ রেড ইণ্ডিয়ানদের রক্তসাম্য আছে। এদের ভাষার মধ্যেও বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট।

এই তুষারের দেশে বলগা হরিণই মানুষের জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন। বলগা হরিণের দুধ, মাংস, চর্বি এদের খাদ্য। বলগা হরিণ গাড়ী টানে। বলগা হরিণের চামড়ার তাঁবুতে এরা বাস করে; ঐ চামড়া দিয়েই এদের দেহাচ্ছাদনের পোষাক তৈরী হয়। শীতের সময় প্রখর হিমবাতের দুর্যোগে বলগা হরিণের দলকে দক্ষিণে খাদ্যের অন্বেষণে সরে আসতে হয়; তুন্দ্রাভূমির শ্যাওলাই বলগা হরিণের একমাত্র খাদ্য। কাজে কাজেই মেরুবাসীদেরও বলগা হরিণের জন্যই দক্ষিণে সরতে হয়। প্রকৃতির এই ক্রূর নিয়মের অধীনে থেকেই তারা যাযাবর হতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং এমন মানুষের সমাজে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠা আশা করা বৃথা। এইটাই ছিল জার আমলের এবং তাদের আগের আমলের

শাসকদের ধারণা। কিন্তু আজ সে ধারণা বদলে গেছে। উত্তর মের‍ুবাসী, তুন্দ্রাভূমির অবনত মানুষেরা আজ সংস্কৃতিবান হয়ে উঠেছে। সোভিয়েটের সদুদ্দেশ্য আর অধ্যবসায়ের দরুন সেই রূপকথা আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। এই অবজ্ঞাত মেরুদেশের তুষার প্রান্তরে অদূর ভবিষ্যতে এক 'নূতন আমেরিকা' গড়ে উঠবে, মিঃ স্মলকা সেই আশা পোষণ করেন।

উত্তর মেরুর সংবাদপত্র হরকরা—বিমানযোগে সংবাদপত্রের ডাক প্রেরিত হইয়াছে

সোভিয়েট 'লাল মিশনারীরা' প্রথমে দুটি কাজে হাত দিল। একটি মেরু প্রদেশের নদীগুলিতে নৌচলাচলের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়টি শিক্ষা বিস্তার। বরফ কাটা (ice-breaker) জাহাজ দিয়ে নদীর উজান বেয়ে ছোট ছোট বাষ্পতরী টেনে নিয়ে যাবার পথ ও ব্যবস্থা করা হলো। স্থানে স্থানে আবহাওয়া অফিস, রেডিও স্টেশন এবং স্কাউটিং এরোপ্লেনের ঘাঁটি বসানো হলো। লোক চলাচল বা মালপত্র যানবাহনের সুন্দর ব্যবস্থা এইভাবে করা হলো। এখন নিয়মিত বিমান সার্ভিস বসানো হ'য়ে গেছে। এই মেরুদেশ তুষারে ঢাকা আছে সত্য, কিন্তু তার নীচে অজস্র খনিজ সম্পদ্ লুকিয়ে আছে। সোভিয়েট রুশের উদ্যোগে স্থানে স্থানে খনিপত্তনও হ'য়ে গেছে। সেখানে আজ প্রথম শ্রেণীর নিকেল, কয়লা, তেল, সোনা এবং প্লাটিনাম নিষ্কাশিত হচ্ছে।

কিন্তু এই সব ব্যবস্থা সোভিয়েট রুশিয়া বিদেশী enterpriser'দের পদ্ধতিতে করছে না। এ ব্যাপারে তারা গুরুর কর্তব্য গ্রহণ করেছে মাত্র। মেরুবাসীদের সঙ্গে নিয়ে, এই উদ্যোগে তাদের উৎসাহ সৃষ্টি ক'রে, তাদের শুভ স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে আহ্বান করেছে। লেনিনের উদ্দেশ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দেওয়া হয় নি। লেনিনের নীতি অনুযায়ীই প্রত্যেক মেরুবাসী যাযাবর উপজাতির স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে এই পরিকল্পনার কাজ চালান হচ্ছে। এই সোভিয়েট 'কলম্বাসদের' বিশ্বাস যে, মেরুদেশের সমৃদ্ধি সাধনায় যোগ্যতম লোক হ'ল মেরুবাসীরা স্বয়ং। শত শত বৎসরের অধিবাসের কারণে তাদের মধ্যে যে প্রকৃতিদত্ত শক্তি আছে, সেটা বাইরের লোক সেখানে গিয়ে অর্জন করতে পারবে না, প্রমাণও দিতে পারবে না। সুতরাং প্রধান কাজ হ'ল এই মেরুবাসীদেরই জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দেওয়া। তারাই চিনুক বুঝুক তাদের দেশকে; আর জ্ঞানবিজ্ঞানে শক্তিমন্ত হ'য়ে নিজ দেশের সমৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করুক।

সোভিয়েট সরকার প্রথমেই মেরুবাসীদিগের একটি সুনির্দিষ্ট নাগরিক অধিকার ঘোষণা করলেন। এদের সঙ্গে কারবার চালাবার ক্ষমতা রইল শুধু সোভিয়েট সরকারের

তুষার দেশের ছাত্র বিমানযোগে লেনিনগ্রাড যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে

আর সরকার অনুমোদিত কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানগুলির। তাদের সর্বপ্রকার ট্যাক্স থেকে রেহাই দেওয়া হ'ল। মেরুবাসীদের পরিশ্রমে উৎপন্ন বা আহৃত দ্রব্যসামগ্রীর একটা ন্যূনতম মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। তাদের ক্রয়যোগ্য জিনিসেরও এইভাবে দর স্থির করা হ'ল।

এতো গেল ব্যবসা বাজার সুসংস্কৃত করার কথা। তার

পর একটা ভৌগোলিক সীমা চৌহদ্দি নিরূপণ ও বিভাগ করা হ'ল, যে কাজ আজ পর্যন্ত কেউ করে নি। করবার গরজও ছিল না কারও। এই ভৌগোলিক বিভাগ মেরুবাসীদের মধ্যে নূতন মানবতারও সভ্য জীবনের অপূর্ব আস্বাদ বহন ক'রে আনল। যে উপজাতি স্বভাবত যে অঞ্চলে আহার-বিহারের অন্বেষণে ঘর-সংসার নিয়ে চলাচল করে, সেইগুলি এক-একটি বিভিন্ন জিলা (National district) রূপে মানচিত্রে এবং কাজের বেলায়ও বেঁধে দেওয়া হ'ল। এই জিলাগুলির ভূম্যধিকার সেই সেই বিশিষ্ট উপজাতিকেই মঞ্জুর করা হ'ল। এমন কি, এই সব উপজাতিদের পুরাতন নাম বদলে দিয়ে

শ্বেতাঙ্গ রুশ কম্যুনিস্ট শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী মেরুবাসী ছাত্রকে য়ুরোপীয় নৃত্য শিখাইতেছে

নূতন নামকরণ করা হ'ল। সাবেক কালে তাদের জাতীয়তা বা উপজাতীয়তাসূচক কোন নামই ছিল না। সোভিয়েট রাশিয়া প্রথম এই নামকরণ করেছে।

এর পর আরম্ভ হ'ল শিক্ষা বিস্তারের কাজ। তাদের শিক্ষিত করার উৎসাহ সোভিয়েট রুশিয়াকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তার জন্যে সোভিয়েট সরকারকে অনুতপ্ত হ'তে হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রথমে দলে দলে মেরুবাসী তরুণ তরুণীদের লেনিনগ্রাডের প্রতিষ্ঠানে (উত্তরের উপজাতীয়দের শিক্ষা নিকেতন) নিয়ে এসে তাঁরা শিক্ষা দিতে লাগলেন। জলের মাছকে ডাঙ্গায় রাখলে যে অবস্থা হয়, এই তরুণ মেরু সন্তানদের সেই দুর্ভাগ্য হ'ল। লেনিনগ্রাডের আবহাওয়া তাদের ধাতে এবং রান্না করা মাংস আর কপির তরকারী তাদের পেটে সইল না।

বলগা হরিণের কাঁচা মাংস, বরফগলা জল আর মেরুর বাতাসে পরিপুষ্ট এই সব ছেলেমেয়েদের হঠাৎ শহুরে আবহাওয়া বড় গুরুপাক হ'য়ে উঠল। ফলে নিউমোনিয়া আর যক্ষ্মায় অনেকের মৃত্যু হ'ল। এর পর সোভিয়েট সরকার অন্য প্রথা অবলম্বন করলেন। মেরুদেশেই তাঁরা শিক্ষায়তন স্থাপন করলেন।

শিক্ষাপদ্ধতি অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হ'ল। প্রথমে কিছুদিন তুন্দ্রা স্কুলে (পাঠশালার মত) শিক্ষা দান, তার পর বাছাই বাছাই ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য সাইবেরিয়ায় স্থাপিত কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষালয়ে (ইগারকা, দুদিনকা, নোভিপোর্ট, অবডোরস্ক) পাঠিয়ে শিক্ষাদান। এইখানে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও রুশ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় সাধারণত হ'ল—রাইফেল ব্যবহার শিক্ষা, মাছ ধরার জাল ব্যবহার শিক্ষা, নৌচালনা শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণপরিচয়। মেরুবাসীদের স্বভাবদত্ত শিকার ও মৎস্য ধরার প্রতিভা এইভাবে বিদ্যালয়েই সুমার্জিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া বলগা হরিণ প্রতিপালন ও পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে খুব ভালরকম শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। মোটরবোট পরিচালনা এবং কাঠের গৃহ নির্মাণও অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। এই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবার বাছাই করা বুদ্ধিমান ও নিপুণ ছাত্রদের লেনিনগ্রাড প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন চিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা করতে যান, তখন সে সভায় তিনি একজন নিগ্রো যুবককেও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে দেখেন ও শুনেন। তিনি পরে অনুসন্ধানে জানলেন যে, এই উচ্চশিক্ষিত দার্শনিক নিগ্রো যুবক একটি নরখাদক নিগ্রো উপজাতির বংশোদ্ভব। আফ্রিকায় এই ছেলেটির আত্মীয় গোষ্ঠীকে (যার মধ্যে সে নিজেও ছিল) অন্য একটি উপজাতি যুদ্ধে হারিয়ে বেঁধে রেখেছিল পুড়িয়ে খাবার জন্যে। ছেলেটি সেই বন্দীদশা থেকে কোনমতে পালিয়ে এক য়ুরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীদের ক্যাম্পে পালিয়ে আসে। তার পর সে জাহাজযোগে আমেরিকায় আসে। সেই নরখাদক গোষ্ঠীর বন্য নিগ্রো ছেলেটিই সুশিক্ষা লাভ ক'রে সেই মহাসভায় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিল।

সোভিয়েট রুশিয়ার অদ্ভুত শিক্ষা রীতির গুণে উত্তর মেরুতে আজ ঐ নিগ্রো যুবকের মত শত শত শিক্ষিত যুবক নূতন জীবন লাভ ক'রে ভিন্ন মানুষ হ'য়ে উঠেছে। মেরুবাসীদের মধ্যে লিপি, অক্ষর, ব্যাকরণ ও লিখনপদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এদের রুশ তৈরী করার (Russifying) জন্য চিন্তিত নয়। নিজের নিজের উপজাতীয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, লোকসঙ্গীত, গাথা প্রভৃতি সকল বিষয়ে মেরু ছাত্রেরা গবেষণা করে নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করছে। সামোয়েদ ও ইয়াকুত ভাষায় দুটি সংবাদপত্র প্রচলিত হয়েছে। এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি রুশ ভাষায় লেখা দৈনিক সংবাদপত্রে দুটি ক'রে উপজাতীয় ভাষায় লেখা

প্রবন্ধের ক্রোড়পত্র থাকে। তুন্দ্রা স্কুলের জন্য প্রাথমিক পাঠ্য-পুস্তক সব ছাপা হয়েছে। পুশকিন, টলস্টয়, গোর্কি ও টুর্গেনিভের গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার অনুবাদ বিবিধ উপ-জাতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ ছাড়া সোভিয়েট রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে নানারকমের পুস্তিকা প্রচার ক'রে এদের নূতন সোভিয়েট সমাজতত্ত্বে দীক্ষিত করা হচ্ছে।

লেনিনগ্রাড প্রতিষ্ঠানে মেরুবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনটি ফ্যাকাল্টী (Faculty) খোলা হয়েছে। (১) সোভিয়েট বিভাগ—ইতিহাস, আইন, রাজনীতি ও অর্থনীতি। (২) ব্যবসায় বিভাগ—কৃষি, মাছধরা, আধুনিক শিকার-পদ্ধতি, পশুলোম সংগ্রহ, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং শিল্পোৎপাদন শিক্ষা। (৩) শিক্ষক বিভাগ—বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান রীতি।

এই শিক্ষার জন্য মেরুবাসীদের কোন অর্থব্যয় করতে হয় না। বরং শিক্ষার্থী কাল পর্যন্ত তারা আর্থিক সাহায্য ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা পেয়ে থাকে। খাওয়া, পরা, প্রমোদ, ভ্রমণ ও খেলা—সমস্ত ব্যাপারে তাদের খরচের কোন দায় নেই। অধিকন্তু মাসিক পঁচিশ রুবল হাতখরচা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী থাকার সময় এদের বিবাহের সুযোগও দেওয়া হয় এবং সেক্ষেত্রে দম্পতির জন্য ভিন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এখানে এদের অবশ্য রুশ ভাষার মারফৎ শিক্ষা দেওয়া হয়। য়ুকাগির জাতীয় একটি মেরুবাসী ছাত্র সম্প্রতি অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। এর নাম টায়েকি ওড়ুলোফ; ইনি 'তুষার মানব' নামে একখানা বই লিখেছেন। ইংলণ্ডের পুস্তক প্রকাশ ব্যবসায়ী মেথুয়েন (Methuen) কোম্পানি উক্ত বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (Snow People)।

মিঃ স্মলকা লুগা ইনস্টিটিউটের গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প (এস্টোনিয়ার প্রান্তের নিকটে অবস্থিত) পরিদর্শনে একবার গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেন, শ্বেতাঙ্গ রুশ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা মেরুবাসী ছাত্রদের FoxTrot নাচ শেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর সংগত চলেছে। মেরুবাসীদের জাতীয় নৃত্য আছে অবশ্য; তবুও রুশ শিক্ষকেরা বলেন, শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয়দের সঙ্গে তাদের একাত্মবোধের জন্য এই য়ুরোপীয় নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাদের মধ্যে তিলমাত্র ব্যবধানের সংস্কার না গড়ে উঠতে পারে।

তুন্দ্রাভূমিতে ধনী, দরিদ্র ভেদাভেদ আগে ছিল। যার তিনশত বলগা হরিণ ছিল, সেই ছিল তাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্রের হয়তো একটি দুটি ছিল, অথবা একেবারেই ছিল না। তাদের তখন পেটের দায়ে ধনীর বলগা হরিণ নিয়ে

প্রথমভাগের পাতা—মেরু বালক বালিকার জন্য রচিত পাঠ্য পুস্তক

Aminmi urinmi вakaran.
Akinmi oronmo mamaran.
Makar oronmo namaran.
Amaka oronmi вakaran.
Bikittu ilan oror.

প্রথমভাগের পাতা—মেরু বালক বালিকার জন্য রচিত পাঠ্য পুস্তক

মজুরীতে বা বখরা দিয়ে শিকার খাটতে হ'ত। সোভিয়েট-পদ্ধতি এখানে প্রথমে এসেই ধনীদের স্বত্বচ্যুত (expropriation) করার কাজ আরম্ভ করে নি। উপজাতীয় মণ্ডলে (tribal council) প্রস্তাব পাশ ক'রে সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে প্রত্যেক ধনীকে সমগ্র উপজাতের জন্য কিছু কিছু বলগা হরিণ দিতে হবে। আরও সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, বিক্রয়ের কেন্দ্রে পশুলোম বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য এবং সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য ও আরও সব সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য ধনীদেরই সকল ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তারা না করে, তবে আদালতে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করার কোন কারণ হয় নি। এর পর পাঠান হ'ল এক-একটি কেন্দ্রে এক-একজন Comsomol বা তরুণ ও তরুণী কম্যুনিষ্ট কর্মী। এর কতকগুলি পরিবারকে সংঘবদ্ধ ক'রে নিয়ে যৌথভাবে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা গঠন করল। শিকার করা ও মাছ ধরা সমস্তই যৌথভাবে ...ন্ন ও সমভাগে বণ্টন করার রীতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

রুশের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্যের উন্নতি করা হয়েছে, মেরুদেশেও তেমনি মাছ ধরা ও শিকারকে যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নত করা হয়েছে।

এইভাবে সমগ্র মেরুদেশে এক-একটি সংস্কৃতির ঘাঁটি (cultural base) স্থাপন ক'রে সোভিয়েট সমস্ত তুন্দ্রা-ভূমিতে সভ্যতার পত্তন করছে। মেরুবাসীদের যাযাবর বৃত্তিকে উচ্ছেদ করার কোন প্রচেষ্টা নেই। তবে আশা করা যায় যে, ধীরে ধীরে অর্থনীতিক সমৃদ্ধি পাকা হ'য়ে উঠলে এই সংস্কৃতি ঘাঁটিগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই নূতন নূতন স্থায়ী নগর গড়ে উঠবে। উপজাতীয় মণ্ডলকে (tribal council) এক ধাপ উন্নত ক'রে এখন যাযাবর সোভিয়েট (Nomadic Soviet) স্থাপন করা হয়েছে এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজ চলেছে। এখন এই মেরুবাসীদের মধ্যেই অধ্যাপক, চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা নূতন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। দূর মেরুঅঞ্চলের কঠিন বরফের প্রান্তরে প্রান্তরে সোভিয়েট আজ যে সংস্কৃতির জ্ঞানবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাই মেরুবাসীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ছদ্মবেশী

(২০০ পৃষ্ঠার পর)

বলিল, "আজ্ঞে না, তা হবে না। আপনি মনিব, একশ বার জরিমানা করুন, একশ' বার জরিমানা দোবো। কিন্তু মাইনেতে আমি হাত দিতে দোবো না। মাইনে আমার অটুট থাকবে।"

নোটখানা সজোরে ভূমিতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্রশান্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি যাও আমার সমুখ থেকে।"

ধীরে ধীরে নোটখানা তুলিয়া লইয়া মণিব্যাগে পুরিয়া অবনীশ বলিল, "আজই পাঁচ টাকা আপনার নামে মণি-অর্ডার করব। তা হলে রসিদ কাটাও বাকি থাকবে না।"

প্রশান্ত বলিল, "শোন। হরিপদবাবু আসা পর্যন্ত এ দুদিন তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পার, কিন্তু আমার এ বিল্ডিং-এর সিঁড়ি মাড়াবে না তুমি। বুঝলে?"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, জলের মত।"

"আচ্ছা, যাও।"

"আচ্ছা, আসি।"

নত হইয়া প্রশান্তকে অভিবাদন করিয়া অবনীশ ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

হিন্দু কনসেপসন অব গড এণ্ড রিলিজন—কামিনীমোহন দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲ টাকা। প্রকাশক—নিশিকান্ত দাশগুপ্ত, উকীল, খুলনা।

যশোহরের অন্তর্গত মাগুরার উকীল স্বর্গীয় কামিনীমোহন দাশগুপ্ত একজন ভক্ত এবং সাধক পুরুষ ছিলেন। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন যে সব ভক্ত, সাধক এবং প্রেমিক পুরুষের সাধনা বলে দেশের সর্বত্র নবীন জাগরণের যুগ আনিয়াছিল, কামিনীমোহন ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। পরহিতৈষী, কর্মী এবং স্বদেশপ্রেমিক; প্রকৃতপক্ষে একজন সাধু ব্যক্তি। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনালব্ধ অবদান। হিন্দু অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়তত্ত্বসমূহ গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে; প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এজন্য দরকারই হয়; কিন্তু তাহার চেয়ে বড় দরকার হয় অনুভূতির। দর্শনের তত্ত্বকে এমন সরল ভাষায় প্রকাশের স্বচ্ছতা আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে জানিবার এবং বুঝিবার জন্য যাঁহারা আগ্রহশীল তাঁহারা সকলেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন, শুধু তাহাই নহে বিশেষভাবে উপকৃতও হইবেন, একথা আমরা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি। নামকরা পণ্ডিত লেখকদের লেখা অনেকে পড়িয়াছেন; বাঙলার একজন সাধক ও নিভৃত কর্মীর লেখায় অধ্যাত্ম-জগতের অতি গূঢ় অনুভূতিগুলি কেমন প্রাঞ্জল উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে, একবার পাঠকদিগকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ আস্বাদ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আজ-কাল

মৌলানা ওবেদুল্লা

কিছুদিন থেকে একটা কথা শোনা যাচ্ছিল যে, কমিউনিস্ট-ঘেঁষা একজন মুসলমান নেতা জিন্না সাহেবের কাছে পাকিস্তানের একটা পাকা পরিকল্পনা দিয়ে এক পত্র লিখেছেন এবং কিভাবে সোভিয়েটের উদ্যোগে তাকে কার্যকরী করা যাবে তার হদিশ বাৎলেছেন। ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলকাঠিকে বেমালুম বাদ দিয়ে সোভিয়েটকে নাটের গুরু সাজানো শুনতে আষাঢ়ে গল্পের মতো লাগলেও কথাটা বেশ চাউর হয়েছিল এবং শোনা যাচ্ছিল যে, ঐ মুসলমান নেতাটি আর কেউ নন—প্রাক্তন-পলাতক বিপ্লবী মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধি। কিন্তু মৌলানা সাহেব এই গুজবের টুঁটি চেপে মেরেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, তিনি জিন্নার কাছে কোনো পত্র লেখেন নি, কারণ তিনি পাকিস্তান সমর্থন করেন না এবং মুসলিম লীগের মতবাদকে উদ্ভট ও ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর মনে করেন। তিনি খাঁটি কংগ্রেসপন্থী এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস, ধর্মের ভিত্তিতে কোনো আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

মৌলবী ফজলুল

মৌলানা ওবেদুল্লার এই জাতীয়তার পাশে মৌলবী ফজলুল হকের জাতীয়তা কিন্তু খুব কৌতুকপ্রদ। মুসলিম লীগের অভিমতকে চাপা দিয়ে তিনি বড়লাটের কাছে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রবর্তনের যে প্রস্তাব করেন তাঁর জন্যে লীগের কাছে তিনি গাল খান এবং পাল্টা গালও দেন। এখন আবার তাঁর সুর বদলেছে। পরে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, মুসলিম লীগের নীতি তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং যে গোলটেবিল বৈঠকের তিনি প্রস্তাব করেছেন সে বৈঠক হবে বেসরকারী, তাতে লীগ মুসলমান "জাতির" প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেবে আর লীগ অনুমোদন না করলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হবে না। তাঁর এই ঐক্য-আবেদনের একমাত্র উদ্দেশ্য "সাধারণ শত্রু" অর্থাৎ বৃটেনের প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করা। এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, বুড়ো বয়সে হক সাহেবের এখনো স্বভাব নষ্ট হয় নি। আরো উৎসাহের কথা, তিনি নাকি এবার মীরাটে গিয়ে আর একটি সাদি করে' এসেছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গান্ধীজী

বোম্বাই ও আহমদাবাদে আবার দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। আহমদাবাদে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে এসেছে; কিন্তু বোম্বাইতে এখনো জোর দাঙ্গা চলছে। দুই জায়গাতেই বহু লোকের প্রাণহানি হয়েছে। আহমদাবাদের এক লাখ হিন্দু মুসলমান অধিবাসী শহর ছেড়ে চলে' গেছে। বোম্বাইতে অনেক জায়গায় পুলিশ গুলী বর্ষণ করেছে। ঢাকায় অবস্থা এখন অনেকটা বাইরে থেকে শান্ত, যদিও সাম্প্রদায়িক মন এখনো বেশ বিগড়ে আছে।

গান্ধীজী আহ্মদাবাদের দাঙ্গা উপলক্ষ্য করে' এক বিবৃতিতে বলেছেন, "লোকে যে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গুণ্ডার ভয়ে পালিয়ে যাবে' এটা অসহ্য। গুণ্ডাশাহীকে হিংসভাবে বা অহিংসভাবে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তাদের থাকা উচিত। আমার কংগ্রেস-নীতির ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তাহলে কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মীরা শুধু অহিংস প্রতিরোধ করতে পারে, এতে তারা নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। কিন্তু আমরা যেন পরিষ্কারভাবে লোকদের জানিয়ে দিই যে, পলায়ন হচ্ছে ভীরুতা। তাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিরোধ করা—অহিংস প্রতিরোধে অক্ষম হলে হিংসভাবেই প্রতিরোধ করা।" তিনি দাঙ্গায় কংগ্রেস কর্মীদের অবিচলিতভাবে কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সত্যাগ্রহীদের মুক্তি

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট ২০০ কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহীকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এ'রা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আগে থেকে সত্যাগ্রহ করবার অভিপ্রায় জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন বলে' দণ্ডিত হন। সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্ট এই রায় দেন যে, সত্যাগ্রহ করবার অভিপ্রায় জানানো ভারতরক্ষা বিধানে অপরাধ হতে পারে না। এই রায়ের জন্যেই পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করেছেন।

কারাদণ্ড

হরিপালে গত বছর অগস্ট মাসে এক সভা করার জন্যে এবং সেই সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে গত ২১শে মে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী ও পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য ভারতরক্ষা বিধানে প্রত্যেকে মোট এক বছর করে' কারাদণ্ড এবং জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

* * * * * * *

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কাপড়কল শ্রমিকরা স্থির করেছে যে, ১লা জুনের মধ্যে তাদের দাবী-দাওয়া যদি পূরণ করা না হয় তাহলে তারা সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ করবে।

আন্তর্জাতিক

ক্রীটের যুদ্ধ

ক্রীটের অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে। জার্মানরা বিমানযোগে অবিশ্রাম সৈন্য সেখানে নামাচ্ছে এবং প্রথমেই মালেমি বিমান ঘাঁটি দখল করে' নিয়েছে। রেতিমো ও হেরাক্লিয়নেও তারা ঘাঁটি করেছিল, তবে বৃটিশ সৈন্যেরা নাকি তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দিয়েছে। বৃটেনের পক্ষে আসল মুস্কিল হয়েছে এই যে, জার্মানরা ক্রীট থেকে বৃটিশ বিমানবহরকে একেবারে বিতাড়িত করেছে। জার্মান বিমান, বিশেষ করে' ডাইভ বিমান (স্তুকা) এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে যে, তার মুখে টি'কে থাকা খুবই কঠিন। তবে বৃটিশ নৌবহর বাধা দিচ্ছে বলে' জার্মানরা জাহাজে করে' সৈন্য ক্রীটে নামাতে পারছে না; জার্মানরা বৃটিশ নৌবহরের উপর ভীষণভাবে বোমা বর্ষণ করছে। এ পর্যন্ত ক্রীটের চার পাশে দুটি বৃটিশ ক্রুজার ও চারটি বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার জলমগ্ন হয়েছে এবং দুইটি ব্যাট্‌লশিপ ও আরো কয়েকটি ক্রুজার জখম হয়েছে। বৃটিশ রণতরী ঘায়েল করবার জন্যে জার্মানরা ই-বোটও লাগিয়েছে। দুটি ই-বোট ডুবেছে ও দুটি ঘায়েল হয়েছে। সৈন্য বহনের সময় কতকগুলো জার্মান জাহাজও জলমগ্ন হয়েছে। জার্মান সৈন্যও অনেক মারা গেছে। কয়েকটা নৌকা ক'রে কিন্তু জার্মান সৈন্য অবতরণের কথা শোনা গেছে। এখন কানিয়া ও মালেমির মধ্যে সাংঘাতিক লড়াই চলছে। বৃটিশ পক্ষ থেকেও আরো

সৈন্য ক্রীটে পাঠানো হচ্ছে। মিশরের ঘাঁটি থেকেও বৃটিশ বিমান ক্রীটের উপরে এসে এখন কিছু কিছু লড়াই করছে।

গ্রীক রাজা ও মন্ত্রিরা ক্রীট ছেড়ে মিশরে চলে' গেছেন। জার্মানদের আক্রমণ থেকে তাঁরা অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছেন।

সাইপ্রাস আক্রমণের অভিপ্রায়

শোনা যাচ্ছে ক্রীট শেষ করে' জার্মানরা সাইপ্রাস ধরবে। তারা সে তোড়জোড় নাকি সম্পূর্ণ করেছে। কয়েকদিন ধরে' তুরস্কের উপকূল ঘেঁষে বহু জার্মান বিমান (সৈন্যবাহী বিমান সমেত) দোদেকানীজে উড়ে গেছে। জার্মানদের প্ল্যান সাইপ্রাসকে দুই দিক থেকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরা। একদিক হচ্ছে দোদেকানীজ আর একদিক সিরিয়া। সিরিয়ার বিমানঘাঁটিগুলোতে যে সব জার্মান যোদ্ধা রয়েছে তারাই সিরিয়ার দিক থেকে সাইপ্রাস চড়াও করবে।

সিরিয়া-ইরাক

সিরিয়ায় বিমান ঘাঁটির উপর ইংরেজরা আরো বোমা বর্ষণ করেছে। সিরিয়ায় ফরাসীবাহিনীর একটা দল এক কর্ণেলের অধীনে সীমান্ত পার হয়ে দ্য গল পক্ষে যোগদান করেছে। এখন সিরিয়া-প্যালেস্টিন ও সিরিয়া-ইরাক সীমান্ত বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে।

ইরাকে জার্মানী এখন বেশী সাহায্য দিতে পারছে না। সম্ভবত পূর্ব ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধই এর কারণ। বৃটিশ সৈন্য ইরাকে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ফাল্লুজা দখল করেছে এবং বাগদাদের দিকে চলেছে। রশিদ আলি তাঁর পরিবার তুরস্কে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি নিজে গেছেন মোজালে। অন্যান্য ইরাকী মন্ত্রিরাও নাকি বাগদাদ ছেড়ে চলে' গেছেন। সমরসচিব নাজি শওকৎ আবার আনকারায় গেছেন। ভূতপূর্ব রিজেন্ট বৃটেনের সমর্থক আমীর আবদুল ইলা ট্রান্স-জর্ডান থেকে ইরাকে এসেছেন এবং এক নতুন গভর্নমেন্ট গঠন করছেন। ইংরেজরা তাঁর দরবারে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

ইংরেজরা বলছে, তারা ইরাকী বিমানবহরকে একেবারে ঘায়েল করে' দিয়েছে; তবে জার্মানরা যে কয়টা বিমান পাঠিয়েছে, সেগুলো এখনো বৃটিশ ঘাঁটির উপর হানা দিচ্ছে।

তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীর ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে বলে' বোধ হয়। গ্রীসের উপর জার্মান আক্রমণের সময় থেকে ইউরোপ ও তুরস্কের মধ্যে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন সেই রেল চলাচল আবার আরম্ভ হচ্ছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জার্মান-তুর্কী-বুলগেরিয়ান প্রতিনিধিদের একটা বৈঠকও হচ্ছে। জার্মানী ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার আয়োজন চলছে।

আফ্রিকা

লিবিয়া-মিশর সীমান্তে টহলদার সৈন্যদের সংঘর্ষ চলছিল; মাঝে জার্মানরা ট্যাঙ্ক নিয়ে বৃটিশ সৈন্যদলের দুই পাশ দিয়ে আক্রমণ করে; কিন্তু বৃটিশ সৈন্যের প্রতিরোধের ফলে তারা হটে আসতে বাধ্য হয়। তাদের অনেক ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়। আবার জার্মান সৈন্যদল সীমান্ত অতিক্রম করে' পূব দিকে কয়েক মাইল এগিয়ে গেছে। বৃটিশ সৈন্যেরা হটে' গেছে; তবে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করছে।

আম্বা আলাগির পতনের পর বৃটিশ সৈন্য আবিসিনিয়ায় সোদ্দু দখল করেছে। দুইজন ইতালীয় জেনারেল ও বহু ইতালীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে।

নৌযুদ্ধ

আটলান্টিকে এক বিরাট নৌযুদ্ধ হয়ে গেছে। গত শনিবার গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের মধ্যে জার্মান ও বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের মধ্যে লড়াইতে পৃথিবীর বৃহত্তম রণতরী বৃটিশ ব্যাট্‌লক্রুজার "হুড" (৪২০০০ টন) জার্মানীর বৃহত্তম ও আধুনিকতম ব্যাটল্-শিপ "বিসমার্ক"এর (৩৫০০০ টন) গোলার আঘাতে জলমগ্ন হয়। তারপর বহু বৃটিশ নৌবহর "বিসমার্ক"কে অনুসরণ করে। শত শত মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করার পর চতুর্থ দিনে তারা "বিসমার্ক"কে নাগালের মধ্যে পায়। তারপর প্রচন্ড সংঘর্ষে "বিসমার্ক" জলমগ্ন হয়।

ফ্রান্স-জার্মানী

ফ্রান্স ক্রমশ প্রকাশ্যেই জার্মানীর প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করতে আরম্ভ করেছে। এডমিরাল দারলাঁ এবং মঃ লাভাল তাঁদের বক্তৃতায় বলেছেন যে, জার্মানী ফ্রান্সের কাছে কোনো অন্যায় দাবী জানায় নি এবং জার্মানীর সঙ্গে মিলেমিশে চলাই ফ্রান্সের স্বার্থানুকূল। এর আগে মিঃ ইডেন ঘোষণা করেছিলেন যে, ফ্রান্স যদি বৃটিশ স্বার্থের কোনো হানি ঘটায়, তাহলে অনধিকৃত ফ্রান্সকে আক্রমণ থেকে বৃটেন রেহাই দেবে না। ফরাসী নৌবহর জার্মানীকে দেওয়া হবে কি না, তার স্পষ্ট উত্তর আমেরিকা জানতে চেয়েছিল। এডমিরাল দারলাঁ জানিয়েছেন যে, ফরাসী নৌবহর জার্মানীকে তাঁরা দেবেন না এবং জার্মানী তা চায়ও নি।

* * * * *

বৃটিশ গভর্নমেন্ট কিছুকাল যাবৎ উত্তর আয়র্ল্যান্ডে কন্স-ক্রিপশন প্রবর্তনের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু মিঃ ডি'ভ্যালেরা সেদিন জানিয়ে দেন যে, উত্তর আয়র্ল্যান্ডে কন্সক্রিপশন হলে আয়র্ল্যান্ড গোলমাল বাধাবে। এর পর মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেছেন যে, উত্তর আয়র্ল্যান্ডে কন্সক্রিপশন প্রবর্তন করা হবে না।

* * * * *

আইসল্যান্ডের পার্লামেন্ট ডেনমার্কের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে' আইসল্যান্ডকে স্বাধীন দেশ বলে' ঘোষণা করেছেন।

চীনের অবস্থা

চীনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে চুংকিং গভর্নমেন্টের আপাতত একটা মিটমাট হয়েছে। চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্ট চতুর্থ বাহিনী ভেঙে দেওয়ার পর উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্ট অষ্টম বাহিনী চুংকিংএর সঙ্গে সহযোগিতা করছিল না। ফলে জাপ অভিযানকে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সৈন্যেরা ঠেকাতে পারছিল না। এই অবস্থায় চুংকিং গভর্নমেন্ট কমিউনিস্টদের কাছে সহযোগিতা চেয়ে এক আবেদন জানান। এর পর কমিউনিস্টরা যুদ্ধে যোগ-দানের সিদ্ধান্ত করে। এখন তারা আক্রমণ আরম্ভ করায় জাপানীরা মুশকিলে পড়েছে। শেন্সি, শান্সি ও হোনান প্রদেশে চীনাদের পাল্টা আক্রমণ বিস্তৃত হচ্ছে। চেকিয়াং ও কোয়াংতুং-এও চীনারা পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। চেকিয়াংএ চুকি শহর তারা আবার দখল করে নিয়েছে।

২৭-৫-৪১ —ওয়াকিবহাল

ছায়ালোকের টুকিটাকি

হালে লাহোরের স্টুডিও মালিকদের কোনো একজনের show-house'য়ে— কলিকাতার কোনো এক বিখ্যাত স্টুডিওতে বিখ্যাত ডাইরেক্টর ও টেকনিশিয়ানদের তোলা কোনো এক পাঞ্জাবী ছবি দেখাবার সময় house-এ হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

ছবিখানার দোষ, পাঞ্জাবী কাগজগুলোর মতে—'It has created a new era in the history of Punjabi picture!

দিল্লী ও লাহোরের গুলো—ছবিখানাকে রুচি, মাধুর্য্য, গতি, অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা, ফটোগ্রাফি, রেকর্ডিং, আবহসঙ্গীত প্রভৃতি সব দিক থেকেই ভারতের নামী চিত্রগুলোর মধ্যে স্থান পাবার উপযুক্ত মনে করেন। প্রডিউসার ও তাঁর সঙ্গীদল আপশোষ করেন—বইখানা হিন্দিতে তুললে বহু পয়সা কামানো যে'ত।

যে বাঙালী টেকনিশিয়ানরা বইখানা তোলেন, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতার আদি ভূমি পাঞ্জাবের প্রতি শ্রদ্ধাপরবশচিত্তে ভেবেছিলেন—তাঁদের শক্তির পূর্ণ পরিচয় তাঁরা এ ছবিতে দিয়েছেন।

তবু কেন, প্রথম show'তেই ছবিখানার এমন দুর্গতি হ'ল?

প্রডিউসার ঘেবড়ে গেলেন। ছুটলেন লাহোরে। ছবিখানা নিয়ে লাহোরের অন্য একটা ভাল show house-এ press show দিলেন। যে সমস্ত কাগজের প্রতিনিধি ও 'শহরের যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ show-তে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও ছবি দেখে বিস্মিত মুখে প্রশ্ন করলেন—'এও কি সম্ভব! এ ছবি দেখেও পাঞ্জাবের দর্শক হাঙ্গামা করে? পাঞ্জাবের রুচি কি এতই বিকৃত?'

গুজবের আকারে জানা গেল—হাঙ্গামার প্রথম কারণ—প্রথম show'তেই সম্পূর্ণ অকারণে house-এর sound ও projection machine হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গেল।

শোনা গেল—হাঙ্গামাকারীদের পিছনে প্ররোচনা ছিল—ঐ পাঞ্জাবী বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কোনো এক ব্যক্তির, যাঁর খামখেয়ালীকে ছবি তুলবার সময় প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই, সেই আক্রোশেই তিনি ঘোঁট পাকান। লাহোরের স্টুডিও পক্ষের বহু লোকও সেই সাথে যোগ দেন। এমনকি, তাঁরা দু'একখানা পাঞ্জাবী কাগজকেও হাত করেন। সে সব কাগজে লেখা হয়—যিনি নিজেকে খাঁটি পাঞ্জাবী মনে করেন, তিনি যেন পাঞ্জাবের বাইরে তোলা, পাঞ্জাবী sentiment ও রুচি বিগর্হিত এই ছবিখানা না দেখেন।

অবশ্য পাঞ্জাবের অন্যান্য অনেক কাগজ ঐ কাগজ কয়খানাকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। এমনকি, ঐ সব কাগজের কর্তৃপক্ষদের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করেছেন। তাঁরা এও লিখেছেন, এমন ভাল ছবিকে তাঁরা সমস্ত ভারতের নিকট করতে চাচ্ছেন।

দুষ্টু একদল লোক এসে গেল, লাহোরের স্টুডিওগুলি ছবি তুলে। হিন্দি, উর্দু সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার শক্তি যদি বোম্বে ও কলিকাতা হ

ইস্ট্র ন্যাশনাল মুভিটোনের 'শকুন্তলা' চিত্রে ধীরাজ ও জ্যোৎস্না : ছবি

					বিঃ	পঃ
				[illegible]	৩	১৫
				১০	২	১২
				১৬	৭	১১
			৩	৮	৪	১০
			৩	৯	৪	৯
		১	৩	৯	৭	৮
		১	৪	১৩	১২	৭
	৩	০	৪	৮	৯	৬
৯	২	৩	৪	৯	৬	৬
৬	১	৩	২	২	৪	৬
৯	২	১	৬	৭	১৬	৫
৭	২	১	৪	৩	৮	৫
৭	১	২	৪	৫	১৬	৪
৭	১	২	৫	৬	১৬	৩

ফুটবল খেলা পরিচালনা

বল মরসুমের সময় বিভিন্ন খেলায় রেফারিনার মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি দর্শক ও বিশেষ বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইজন্য দর্শক বা খেলোয়াড়গণ কর্তৃক রূপ একটি বৎসরের কথা আমাদের এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা না দেখিতে বিষয় এই যে, রেফারী এসোসিয়েশন রী মনোনীত করেন তাঁহারা এইরূপ না ঘটে তাহার ব্যবস্থা এই পর্যন্ত । এই দিকে দৃষ্টি দিবেন তাহার কোন ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইবার পূর্বে এসোসিয়েশন নাকি উপরোক্ত ঘটনা ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি ফারীগণকে বাতিল করিয়া নূতন রীগণকে মনোনীত করিয়াছেন। অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম ও

আমদানী পাঞ্জাবের বাজারে হয়, তাহ'লে লাহোরের স্টুডিও-গুলির বিপদ আসন্ন। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবী ছবির standard ভাল করবার জন্যে একাধিক প্রডিউসার বোম্বে ও কলিকাতার দিকে ঝুঁকেছেন। কাজেই পাঞ্জাবী ছবির producer'দের ঐ দুষ্টবুদ্ধি ভাঙ্গবার একমাত্র সোজা উপায় হচ্ছে, show house-এ ঢুকে আলো, চেয়ার ভাঙ্গা। পর্দা ছিঁড়ে ফেলা। House-এর machine হঠাৎ খারাপ হ'য়ে যাওয়া।

Show house-এর মালিকের স্বার্থ যদি house-এর চাইতেও লাহোরের স্টুডিওতে বেশী হয়, তবে এহেন হাঙ্গামায় ইন্ধন পেতে বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু ঐ মালিকটির লাহোর স্টুডিওতে তোলা যে

দিতে পারবে, নষ্টামি বুদ্ধিতে সে ভারতের যে কোনো প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী ওস্তাদ।

বাঙালীদের স্বার্থ পাঞ্জাবে যত না তার চেয়ে শতগুণ বেশী স্বার্থ পাঞ্জাবীদের এই পোড়া বঙ্গদেশে।

পাঞ্জাবের গুণগ্রাহী কাগজগুলোকে আমরা অভিনন্দিত করছি এই জন্য যে, দু'একজন ছাড়া তাদের প্রায় কেউই ঐ নীচমনা লোকগুলোর পক্ষ অবলম্বন করেন নি। এমন কি, অনেকে তীব্রভাবে এই নীচতাকে আক্রমণ করেছেন।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ

গত ১৭ই মে অপরাহ্নে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন হলে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১৯৪১-৪২ সালের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য

করে

সম্ভবত
ইরাকে
বাগদাদের
পাঠিয়ে দিয়েছে
ইরাকী মন্ত্রিরাও
নাজি শওকৎ আবার
বৃটেনের সমর্থক আ
এসেছেন এবং এক নতু
দরবারে একজন বৃটিশ প্রতি

ইংরেজরা বলছে, তারা ইরাক
করে' দিয়েছে; তবে জার্মানরা যে
সেগুলো এখনো বৃটিশ ঘাঁটির উপর

তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীর ঘনিষ্ঠ
গ্রীসের উপর জার্মান আক্রমণের সময়
মধ্যে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
আবার আরম্ভ হচ্ছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থ
তুর্কী-বুলগেরিয়ান প্রতিনিধিদের একটা
ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনি
চলছে।

ছটোনের আগামী চিত্র ... নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় ... ও মতিলাল

আফ্রিকা

লিবিয়া-মিশর সীমান্তে টহল
মাঝে জার্মানরা ট্যাঙ্ক নিয়ে বৃটিশ
আক্রমণ করে; কিন্তু বৃটিশ সৈন্য
আসতে বাধ্য হয়। তাদের অনেক
সৈন্যদল সীমান্ত অতিক্রম করে'
গেছে। বৃটিশ সৈন্যেরা হটে'
করছে।

দেখানো হচ্ছে, বদলাটা যদি
য়ার চেষ্টা করা হয়, তবে কি
হবে?
দ্যতা বহু যুগ হ'তে। তার
সে কথাটা ঐ লোকটি ও তাঁর
রলে তাতে তাঁদেরই মঙ্গল

যে কোনো সময়েই প্রমাণ ক'রে

নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ১৯৪১-৪২ সালের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়ঃ—সভাপতি—তুষারকান্তি ঘোষ; সহঃ সভাপতি—শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ; সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; সহঃ সম্পাদক—শ্রীপঙ্কজ দত্ত; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীশঙ্করমুরলী-ধর বাগড়ে; সভ্যগণ—শ্রীসত্যনাথ মজুমদার; শ্রীকৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশচন্দ্র হিমকার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসুধীর বসু ও শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়।

কলিকাতায় ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন খেলা পূর্বের ন্যায় প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রতিযোগিতার সূচনায় ক্রীড়ামোদিগণ এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা দেখিবার জন্য যেরূপ নিরুৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এখনও পর্যন্ত তাহার কোনই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে না। মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান দলের খেলা ব্যতীত অপর সকল দলকেই দর্শক-শূন্য মাঠে খেলিতে হইতেছে। এক মাস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরও যখন বিশেষ দর্শক সমাগম হইতেছে না তখন আর দর্শক সংখ্যা কোন খেলাতেই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দল এখনও পর্যন্ত কোন খেলাতে পরাজিত হয় নাই। এই পর্যন্ত তাঁহারা আটটি দলের সহিত খেলিয়া একটিমাত্র পয়েণ্ট নষ্ট করিয়াছেন। অবশিষ্ট খেলায় যে পয়েণ্ট হারাইবেন তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। ইস্ট-বেঙ্গল দল এই দলের অগ্রগতিতে বিশেষ বাধা দিবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই গোলে পরাজিত হইয়াছেন। মোহনবাগান দলের সহিত এই দলের এখনও কোন খেলা হয় নাই। মোহনবাগান দল মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করিতে পারিবেন বলিয়া এখনও পর্যন্ত কেহ কেহ আশা করেন। মোহনবাগান দল দুইটি বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই দুইটি খেলোয়াড় দলে থাকিলে ফল কি হইত বলা কঠিন। তবে দলের বর্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে মহমেডান দলকে মোহনবাগান দল বিশেষ বেগ দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মহমেডান স্পোর্টিং দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট আশা আছে।

মোহনবাগান ক্লাবও এই পর্যন্ত কোন খেলাতেই পরাজিত হন নাই। সেইজন্য এই দলের সমর্থকগণ মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন। তবে এই দলের দুইজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এই গুঁই ও এস মিত্র গুরুতর আহত হওয়ায় আক্রমণভাগের শক্তি অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে। এস গুঁইর পায়ের অবস্থা বর্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে হয়তো তিনি মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিরুদ্ধে খেলিতে পারেন। তবে এই কথা ঠিক যে, তিনি খেলায় যোগদান করিলেও স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। এস মিত্র সম্প্রতি এরিয়ান্স ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলিবার সময় গুরুতর আহত হইয়াছেন। ইঁহার ডান পায়ের সম্মুখের হাড় দুইটি স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মেডিক্যাল কলেজে অস্ত্রোপচার করিয়া হাড় জোড়া দিতে হইয়াছে। সুতরাং তিনি এই বৎসর আর কোন খেলাতেই যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করাই অন্যায়। এই খেলোয়াড়টির উপর আক্রমণ-ভাগের শক্তি বিশেষভাবে নির্ভর করিত। ইহার অবর্তমানে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ইনি দলে বর্তমান থাকিলে মোহন-বাগান দলের পক্ষে মহমেডান দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু ইঁহার খেলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মোহনবাগান দল ইহার পরও যদি মহমেডান দলকে পরাজিত করিতে পারেন তবে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন। ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা অপেক্ষা অনেক উন্নততর হইয়াছে। এইরূপ উন্নততর নৈপুণ্য যদি ইঁহারা বজায় রাখিতে পারেন তবে লীগ প্রতিযোগিতায় ইঁহাদের স্থান উপরার্ধেই হইবে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া পরাজিত না হইলে ইহাদের চ্যাম্পিয়ান হইবার পর্যন্ত আশা ছিল। এখনও বহু খেলা বাকী আছে। সুতরাং এখনও পর্যন্ত ইহাদের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই।

আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স দলের খেলা লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায় যেরূপ ছিল বর্তমানে তাহা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা যদি খেলায় উন্নতি না করেন তবে লীগ তালিকায় ইহাদের স্থান নিম্নভাগে হইবে বলিয়া আশংকা হয়।

কালীঘাট, ভবানীপুর ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলাও বিশেষ সুবিধাজনক হইতেছে না। ইহারা যদি খেলার উন্নতি না করেন তবে ইহাদের স্থান লীগ তালিকায় নিম্নভাগেই থাকিয়া যাইবে। দলের সম্মানের কথা স্মরণ করিয়া খেলার উন্নতির চেষ্টা করিবে আশা করি। নিম্নে লীগ খেলার ২৭শে মে পর্যন্ত বিভিন্ন দলের ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

লীগ খেলার ফলাফল

	খেলা	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মহমেডান	৮	৭	১	০	১৮	৩	১৫
মোহনবাগান	৭	৫	২	০	১০	২	১২
রেঞ্জার্স	১০	৪	৩	৩	১৬	৭	১১
ইস্টবেঙ্গল	৮	৫	০	৩	৮	৪	১০
পুলিশ	৮	৪	১	৩	৯	৪	৯
এরিয়ান্স	৭	৪	০	৩	৯	৭	৮
ই বি আর	৮	৩	১	৪	১৩	১২	৭
কালীঘাট	৭	৩	০	৪	৮	৯	৬
ডালহৌসী	৯	২	৩	৪	৯	৬	৬
স্পোর্টিং ইউঃ	৬	১	৩	২	২	৪	৬
ক্যালকাটা	৯	২	১	৬	৭	১৬	৫
ভবানীপুর	৭	২	১	৪	৩	৮	৫
কাষ্টমস	৭	১	২	৪	৫	১৬	৪
নর্থ স্ট্যাফোর্ড	৭	১	২	৫	৬	১৬	৩

ফুটবল খেলা পরিচালনা

প্রতি বৎসর ফুটবল মরসুমের সময় বিভিন্ন খেলায় রেফারি-গণের খেলা পরিচালনার মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি দর্শক ও খেলোয়াড়গণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অনেক সময় রেফারীগণকে এইজন্য দর্শক বা খেলোয়াড়গণ কর্তৃক লাঞ্ছিতও হইতে হয়। এইরূপ একটি বৎসরের কথা আমাদের স্মরণে জাগে না যে বৎসর এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা না দেখিতে হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রেফারী এসোসিয়েশন যাঁহারা বিভিন্ন খেলার রেফারী মনোনীত করেন তাঁহারা এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা যাহাতে না ঘটে তাহার ব্যবস্থা এই পর্যন্ত করেন নাই। কবে যে তাঁহারা এই দিকে দৃষ্টি দিবেন তাহার কোন ঠিকানা নাই। এই বৎসরের ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইবার পূর্বে একবার শোনা গেল, রেফারী এসোসিয়েশন নাকি উপরোক্ত ঘটনা বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি পূর্বের সকল নিয়মিত রেফারীগণকে বাতিল করিয়া নূতন বিচক্ষণ, পক্ষপাতশূন্য রেফারীগণকে মনোনীত করিয়াছেন। এই কথা শুনিবার পর আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম ও

ভাবিয়াছিলাম যে, এই বৎসর সত্য সত্যই রেফারীদের খেলার পরিচালনায় মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি, দর্শকগণের বিক্ষোভ দেখিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা কলিকাতা ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে বাকি রহিল না। এক মাস হইল লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই এক মাসের মধ্যে খুব কম করিয়া ১০ দিন রেফারীগণের খেলা পরিচালনার মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা শুনিতে হইয়াছে। এমনকি কোন এক খেলায় দর্শকগণ এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে রেফারীকে লাঞ্ছনা করিতে পর্যন্ত ছাড়েন নাই। ইহা শুনিবার পর আমাদের বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, "এই ঘটনা আজীবন শুনিতে হইবে। রেফারী এসোসিয়েশন যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নূতনভাবে গঠন না করা হইতেছে ততদিন ইহার অবসান অসম্ভব।"

বেঙ্গল ওয়াটার পোলো লীগ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত বেঙ্গল ওয়াটার পোলো লীগ গত ১৭ই মে তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ... পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার অনেকগুলি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ উক্ত লীগের পরিচালকগণ এতই কর্মতৎপর যে, এই সকল খেলার ফলাফল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে হইয়াছে এই যে, লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না জনসাধারণের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। খেলা পরিচালনা লইয়াও নানারূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে বলিয়া জানা গেল। যোগদানকারী কোন কোন দল নাকি ইহার প্রতিবাদে প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কোন একটি বিশিষ্ট সন্তরণ প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। এই যদি ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতার অবস্থা দাঁড়াইয়া থাকে তবে খুবই দুঃখের বিষয়। একেই বাঙলাদেশের ওয়াটার পোলো খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড পূর্বাপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর পরিচালকগণ যদি এই খেলাটির পরিচালনা বিষয়ে এত অবহেলা করেন তবে ইহার শেষ পরিণাম কি হইবে, ভাবিতেও দুঃখ হয়। ওয়াটার পোলো খেলার নৈরাশ্যজনক পরিণতি বাঙলার সন্তরণের বিভিন্ন বিভাগের উপর বিষাদ কালিমা লেপন করিবে। ফলে বিভিন্ন সন্তরণ বিষয়ের স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িবে। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন বাঙলার সন্তরণের পতন সম্ভব করিবার জন্য কখনই গঠিত হয় নাই। উন্নতিই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা উক্ত এসোসিয়েশনের পরিচালকগণকে ওয়াটার পোলো লীগটি ঠিক মত পরিচালনা করিতে ও খেলার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি।

অসময়ে ক্রিকেট খেলা

মরসুম ব্যতীত অসময়ে কোন খেলাই সম্ভব নহে এবং তাহাতে কোনরূপ উৎসাহ পাওয়া যায় না, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা। কিন্তু ইহা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা সম্প্রতি গঠিত সামার ক্রিকেট ক্লাব প্রমাণ করিয়াছে। এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হইবার এক মাস পূর্ব হইতে কতিপয় ক্রিকেট উৎসাহী কালীঘাট ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ সাহায্যে প্রতি রবিবার ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করিত। এই খেলায় কলিকাতার বিভিন্ন বিশিষ্ট ক্লাবের সভ্যগণকে খেলিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইত। প্রথম প্রথম অনেক খেলোয়াড় এই খেলায় যোগদান করিতে রাজী হইতেন না। কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে না হইতে দেখা গেল কতিপয় বাঙলার নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড় এই খেলায় যোগদান করিবার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ফলে খেলা ক্রমশঃ জমিয়া উঠিল। দুইটি দল গঠিত হইতে লাগিল এবং দুইটি দলে বাঙলার নামজাদা খেলোয়াড়গণ যোগদান করিতে লাগিলেন। তখন দেখা গেল, এই সকল যোগদানকারী খেলোয়াড়গণই স্থায়ী একটি ক্লাব গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ইহার ফলে সামার ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ক্লাব পরিচালনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে লইয়া একটি পরিচালক কমিটি গঠিত হইয়াছে:—

সভাপতি:—শ্রীযুত সুধীর রায়।

সহঃ-সভাপতিগণ:—মিঃ বি এইচ পিক ও মিঃ জি ভিয়াস।

যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়:—শ্রীযুত এ সেন ও এস ঘোষ।

কোষাধ্যক্ষ:—এ ইউ গুপ্ত।

সভ্যগণ:—কে ভট্টাচার্য, আই সুরিটা, এন চ্যাটার্জি, আই ঘোষ, পি কে সেন, এ মুখার্জি, জি ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

জো লুইর পুনরায় সাফল্য

পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো লুই পুনরায় মুষ্টি-যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকাতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ভূতপূর্ব চ্যাম্পিয়ান ম্যাক্স বেয়ার জো'র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৫ রাউণ্ড পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা হইবার কথা ছিল, কিন্তু বেয়ার সপ্তম রাউণ্ডেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। জো লুইকে এই পর্যন্ত ১৫ জনের সহিত লড়িতে হইয়াছে। এই ১৫ জনকেই তিনি পরাজিত করিয়া নিজ অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোন মুষ্টি-যোদ্ধার পক্ষে এইরূপভাবে সম্মান রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ম্যাক্স বেয়ার পুনরায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

সমর বার্তা
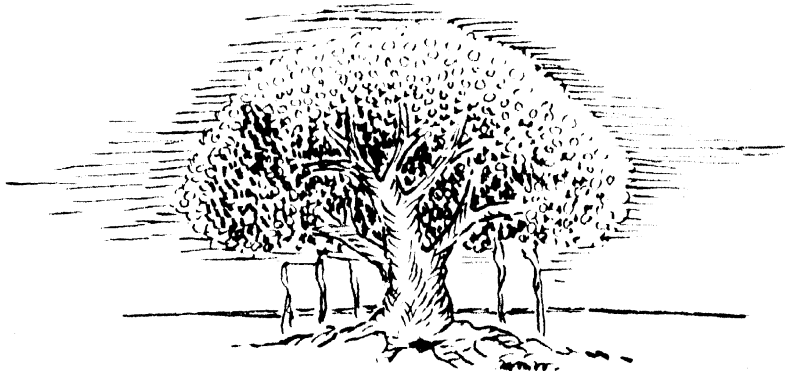
২১শে মে—

ক্রীটের উপর পুনঃপুনঃ জার্মান বিমানহানা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যারাস্যুটবাহী জার্মান সৈন্য বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করে। কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য ক্রীটে যে পনরশত প্যারাস্যুট সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত বা বন্দী হইয়াছে।

ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী সিরিয়ার বৃটিশ কন্সাল অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সিরিয়ার যে সকল ইংরেজ ঐ দেশ ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভারতে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আওস্টার ডিউক আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কায়রোর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য আম্বা আলাগীতে আওস্টার ডিউকের সহিত পাঁচজন জেনারেল এবং কয়েকজন সিনিয়র স্টাফ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রীটের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য জার্মান বিমানবাহিত বাহিনী দ্বিতীয়বার আক্রমণ সুরু করে। দ্বিতীয়বারে তিন হাজার জার্মান সৈন্য ক্রীটে অবতরণ করে। জার্মানরা স্টুকা ও মেসারস্মিট বিমানযোগে নীচুতে নামিয়া বোমাবর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে গ্লাইডার বিমান ও প্যারাস্যুটযোগে সৈন্য নামায়।

২২শে মে—

কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল জানান যে, ক্রীটে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে, অবস্থা আয়ত্তে আছে, তবে জার্মানরা গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিয়া কোন কোন স্থানে সাফল্য অর্জন করিয়াছে। জার্মান প্যারাস্যুট সৈন্যের সংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছে। হেরাক্লিয়ন এখনও বৃটিশের হাতেই আছে। ক্রীটে সমুদ্রপথে সৈন্য আমদানী সম্পর্কে মিঃ চার্চিল বলেন যে, রক্ষিগণ পরিবৃত কতকগুলি যান দৃষ্টিগোচর হইলে উহার দুইখানি যান ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এন্টনী ইডেন ফরাসী জাতিকে এই বলিয়া সতর্ক করেন যে, ভিসি গভর্নমেণ্ট যদি বৃটেনের যুদ্ধ চালনার পক্ষে ক্ষতিকর ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুমতি দেন, তাহা হইলে সামরিক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার কালে বৃটেনের পক্ষে হয়ত আর অধিকৃত এবং অনধিকৃত ফ্রান্সের পক্ষে পার্থক্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না।

মধ্য প্রাচ্যস্থিত বৃটিশ হেড কোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, আবিসিনিয়ায় প্রতিপক্ষীয় দুই ডিভিসন সৈন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর বেড়াজালের মধ্যে আটক পড়িয়াছে এবং কয়েক সহস্র প্রতিপক্ষীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, ফল্লুজা দখলের ফলে বৃটিশ বাহিনী তিনশত ইরাকী সৈন্য বন্দী করিয়াছে। তন্মধ্যে ২৭ জন অফিসার আছেন।

২৩শে মে—

ক্রীটে তুমুল লড়াই চলিয়াছে। জার্মান প্যারাস্যুট সৈন্য এবং বিমানবাহিত সৈন্যেরা এখনও ক্রীটে অবতরণ করিতেছে। জলপথে আসিয়া জার্মান সৈন্যেরা ক্রীটে অবতরণ করিতে পারে নাই বলিয়া লণ্ডনে খবর আসিয়াছে। মালেমী বিমানঘাঁটি এখনও জার্মানদের অধিকারে আছে।

এডমিরাল দারলাঁ বেতারে ঘোষণা করেন যে, ফরাসী নৌবহর কাহাকেও দেওয়া হইবে না এবং ফ্রান্স গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না।

২৪শে মে—

গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী দরিয়ায় উত্তর আটলাণ্টিকে বৃটিশ ও জার্মান নৌবহরের মধ্যে এক প্রচণ্ড নৌযুদ্ধের সময় বৃহত্তম বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ "হুড" (৪২১০০ টন) ধ্বংস হয় এবং জার্মান রণতরী "বিসমার্ক" (৩৫০০০ টন) ঘায়েল হয়। বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ "হুড"-এর অতি অল্পসংখ্যক লোক রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

ক্রীটে মিত্রশক্তি বাহিনী হেরাক্লিয়ন ও রেতিমনো হইতে জার্মান সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করে। মালেমী বিমানঘাঁটিটি এখনও জার্মানরা দখল করিয়া আছে। গতকল্যও উহারা তথায় সৈন্য নামাইয়াছে। কিছু কামানও উহারা তথায় নামাইয়াছে। কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা ক্রীটে প্যারাস্যুটে কৃত্রিম সৈন্য অবতরণ করাইতেছে।

উত্তর চীনে কম্যুনিস্টগণ জাপানীদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে।

২৫শে মে—

গ্রীসের রাজা এবং গ্রীক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ক্রীট ত্যাগ করিয়া মিশর যাত্রা করেন। অদ্যকার ইতালীয়ান ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, ক্রীটের অদূরে এক্সিস শক্তিদ্বয়ের কার্যকারিতার ফলে বৃটিশ নৌবহর উহার ঘাঁটিতে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। বৃটিশ বিমানবাহিনী মালেমী বিমানঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তদুপরি বৃটিশ বিমানবহর মালেমী এলাকায় সৈন্যবাহী জার্মান বিমানসমূহের উপরও আক্রমণ চালায়। জার্মানরা ঘাঁটিটি দখলে রাখার জন্য পাল্টা জবাব দিতেছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মান প্যারাস্যুট বাহিনীর প্রথম যে দল ক্রীটে অবতরণ করে, তাহারা গ্রীসের রাজার বাসভবনও কয়েক শত গজের মধ্যেই অবতরণ করিয়াছিল।

আনকারার সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে রসিদ আলি তুরস্ক প্রবেশের ছাড়পত্র চাহিয়াছেন। আনকারায় গুজব এই যে, রসিদ আলি বাগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া মসুলে গিয়াছেন। প্রকাশ, জার্মান সাহায্যের প্রত্যাশায় তিনি তথায় একটি গভর্নমেণ্ট স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ মহল বলিতেছেন যে, তুরস্কের সহিত ছাড়া সিরিয়া ও লেবাননের আর সমস্ত সীমান্তই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৬শে মে—

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইতালীয়ান বাহিনীর চারিটি ডিভিসন বিলুপ্ত হইয়াছে এবং দুইজন ইতালীয়ান জেনারেলসহ আরও বহু সহস্র সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নানাস্থানে প্রতিবাদ সভা হয়।

গত ডিসেম্বর মাসে মার্শাল পেতাঁ কর্তৃক পদচ্যুত হইবার পর মঃ লাভাল অদ্য সর্বপ্রথম বেতারে বক্তৃতা করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, হের হিটলারের সহিত তাঁহার দশ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল।

গত ১৭ই মে লণ্ডনের উপর বিমান আক্রমণের সময় ডাঃ সোহনলাল কোছাড় দুইটি কন্যাসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্তা কোছাড় ও অপর একটি কন্যা গুরুতররূপে আহত অবস্থায় লণ্ডনের কোন হাসপাতালে রহিয়াছেন। ডাঃ সোহনলাল কোছাড় গত ৩০ বৎসর যাবৎ লণ্ডনে ডাক্তারী করিতেছিলেন।

২৭শে মে।—

উত্তর আটলাণ্টিকে এক প্রচণ্ড নৌযুদ্ধে বৃটিশ নৌবহর জার্মানীর বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ "বিসমার্ক"কে ডুবাইয়া দিয়াছে এবং এই নৌযুদ্ধে ৩৫ হাজার টনের বৃটিশ রণতরী "প্রিন্স অব ওয়েলস" জখম হইয়াছে।

ক্রীটের নিকটবর্তী দরিয়ায় জলযুদ্ধে বৃটিশপক্ষের "গ্লস্টার" ও "ফিজি" নামক দুইখানি ক্রুজার এবং "জুনো", "কেলী", "গ্রেহাউণ্ড" ও "কাশ্মীর" নামক চারিখানি ডেস্ট্রয়ার নিমজ্জিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইখানি ব্যাটলসিপ এবং কয়েকখানি ক্রুজারেরও ক্ষতি হইয়াছে; তবে তাহা তেমন মারাত্মক নয়। এই জলযুদ্ধে তিনখানি ক্ষুদ্র জার্মান জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, জলপথে ক্রীটে জার্মান সৈন্য নামাইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ক্রীটে বৃটিশ পক্ষের সামরিক বল বৃদ্ধির জন্য নূতন সৈন্য আশু পাঠান হইতেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২১শে মে—

বাঙলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীযুত ধরানাথ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা বিধানানুসারে যে 'মামলা চলিতেছিল, শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস এন বেকার আই-সি-এস তাহার রায় দিয়াছেন। তিনি ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী প্রত্যেককে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ড ও ৪০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গতকল্য কুমিল্লায় আইন অমান্য আন্দোলনের বিংশতিতম দিবসে শ্রীপ্রাণকানাই শর্ম্মা, শ্রীদেবেন্দ্র ভৌমিক ও আবদুল আজিজ নামক তিনজন ফরোয়ার্ড ব্লক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাদ্রাজের মেয়র শ্রীযুত বাসুদেব রায়পেটা পরলোকগমন করিয়াছেন।

২২শে মে—

পাঞ্জাব সরকার দুইশত সত্যাগ্রহী বন্দীর মুক্তির আদেশ য়াছেন। এই বন্দীদের মধ্যে পাঞ্জাব পরিষদের কয়েকজন সদস্যও াছেন। সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্ট এই রুলিং দিয়াছেন যে, এ জন সত্যাগ্রহ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া নোটিশ দিলেই ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী অপরাধী হয় না। উক্ত রুলিং অনুযায়ীই পাঞ্জাব সরকার উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় কমরেড শরদিন্দু বসু, কমরেড তারক ভট্টাচার্য, কমরেড আশু রায় ও কমরেড চিত্ত গুহ ভারতরক্ষা আইনানুসারে ধৃত হন।

বোম্বাইয়ে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। পুলিশ জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। অদ্য দাঙ্গায় চারজন নিহত ও ষাটজন আহত হয়।

কলিকাতায় গুণ্ডার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। গতকল্য কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভট্টাচার্য বাদুড়বাগান লেন দিয়া যাইবার কালে অকস্মাৎ দুইজন গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং গুণ্ডারা তাঁহাকে ছোরামারার ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে মূল্যবান সমস্ত দ্রব্য ও মনিব্যাগ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে। পুলিশ কলাবাগান বস্তিতে হানা দিয়া নিজাম নামক একজন দাগীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

২৩শে মে—

মহাত্মা গান্ধী গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক মিঃ ভোগীলাল লালার নিকট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন, "গুণ্ডা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করা কাপুরুষতা। জনসাধারণের কর্তব্য গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করা। অহিংস প্রতিরোধ প্রকৃষ্ট উপায়; কিন্তু তাঁহারা যদি অহিংসভাবে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে হিংসভাবে হইলেও তাহাদের প্রতিরোধ করা কর্তব্য।"

গতকল্য বোম্বাইয়ে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত মোট ১১ জন নিহত ও ৯০ জনেরও বেশী লোক আহত হইয়াছে।

২৪শে মে—

বোম্বাইয়ে দাঙ্গাকারী জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ দুই স্থানে গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। গুলীবর্ষণের সময় একজন আহত হয় এবং দাঙ্গার সময় ছুরিকাঘাতে দুইজন নিহত হয়। গতকল্য দাঙ্গা কার্যে রত চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল। আজ তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি দশ ঘা করিয়া বেত্রদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা শহরে ও জেলায় সম্প্রতি যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বাঙলা সরকার বিচারপতি মিঃ ম্যাকনেয়ার (সভাপতি) এবং জেলা ও দায়রা জজ মিঃ ডবিউ ম্যাকসার্প আ-সি-এসকে লইয়া এক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন।

২৫শে মে।—

দিল্লীতে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন পণ্ড হইয়া যায়। সম্মেলনে নির্বিচারে সকলকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলকে প্যাণ্ডেল হইতে বাহির করিয়া দেয় ও শান্তি স্থাপন করে।

লাহোরে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঞা ইফ্‌তিকারউদ্দিনের আমন্ত্রণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় শতাধিক প্রতিনিধি তাঁহার ভবনে সমবেত হইয়া পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখিবার উপায় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। স্যার আবদুল কাদের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিন ঘণ্টা আলোচনার পর পাঞ্জাবের প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নিকট প্রাদেশিক শান্তি ও শুভেচ্ছা রক্ষায় যত্নশীল হইতে আবেদন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিবার জন্য এগারজনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

২৬শে মে—

বোম্বাই শহরের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দমন করিবার জন্য বোম্বাইয়ে বৃটিশ সেনা আনা হইয়াছে। রবিবার সন্ধ্যায় অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং সেইজন্য মিলিটারী আমদানী করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোবাইয়ের গবর্ণর দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। বোম্বাই দাঙ্গায় এযাবৎ ২২ জন নিহত এবং ১৫৯ জন আহত হইয়াছে। দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্যন্ত এক হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ছুরিকাঘাতে তিনজন নিহত হয়। পুলিশ আজ ৩৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করে।

দুর্ঘটনা—বজবজে স্নানের ঘাটে গঙ্গায় তিনটি কাবুলী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। উল্টাডাঙ্গা রেল স্টেশনের নিকট রাজেন ভুইঞা (১৮) নামক একজন খালাসী বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।

২৭শে মে।—

গতকল্য ফেণীতে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়। ঝড়ে শত শত ব্যক্তি গৃহহারা হইয়াছে। একটি বাড়ি ধ্বসিয়া পড়ায় একটি বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। বরিশালেও প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ফলে বাড়ি ঘর ও অন্যান্য সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে আজ ছয়জন ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। বোম্বাইয়ের দাঙ্গায় এতাবৎ ২৪জন নিহত ও ১৬৭জন আহত হইয়াছে।

দিনাজপুরে আতিয়ার রহমান নামক জনৈক সি আই ডি'র মৃতদেহ একটি পুকুরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

বাঁকুড়া জেলায় ১০ বৎসরের একটি বালিকার অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কটকের এক সংবাদে প্রকাশ, দেশের নানাস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ চলিতেছে দেখিয়া উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর নিকট "শান্তি সেনাদল" গঠনের অনুমতি চাহিলে মহাত্মা গান্ধী তাহার অনুমতি দিয়াছেন।

উৎকামন্দের এক সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকার শীঘ্রই ঘোষণা করিবেন যে, ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী দণ্ডিত রাজনৈতিক এবং সত্যাগ্রহী বন্দীরা ভবিষ্যতে আর ভারতরক্ষা বিধান অমান্য করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে এবং অতীতের কার্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

ইরান ও বর্তমান যুদ্ধ

শ্রীদে—

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইরান বা পারশ্য বৃটিশ ও রুশ সাম্রাজ্যের সংঘর্ষের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০৭ সালে উক্ত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি নিষ্পন্ন হয় তাহাতে বৃটিশ ইরানের দক্ষিণ অঞ্চল এবং রুশিয়া উত্তর অঞ্চলের কর্তৃত্ব লাভ করে। কিন্তু ১৯১৭ সালে জারের পতনের পরে আপন ঘর সামলাইতে যাইয়া রুশিয়া পারশ্যের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারে নাই। ইহাতে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কার্জন পারশ্য উপসাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বৃটিশ কর্তৃত্ব স্থাপনে অভিলাষী হন। তদুদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত তুরস্কবাসীদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া পারশ্যের শক্তিশালী ঘাঁটিসমূহে সৈন্য স্থাপন করেন। পারশ্যের শাহ তখন নামে মাত্র শাসনকর্তা—রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা বিদ্যমান। তিনি তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেনের সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বাধিকার অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। পারশ্য, তুরস্ক, মিশর, ইরাক, আফগানিস্তান তখন ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের নিকট দাবার ঘুঁটির মত। তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত এই সকল দুর্বল রাষ্ট্রসমূহকে লইয়া খেলিতেন। এই সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণের ও রুশিয়ার লেনিনের প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিদের প্রতি বাণী এই সকল দেশের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভে উদ্বুদ্ধ করে। তবে লেনিনের সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজম নয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাণীসমূহ এই সকল জাতিদিগকে আকৃষ্ট করে। জারের পতনের পর রুশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ হয় ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বে নিপীড়িত জাতিদিগকে মুক্তিপ্রদান তাহাদের সমাজতন্ত্রবাদের নীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহারা তুরস্ককে নানাভাবে সাহায্য করে। ফলে ঐ দেশটি মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠে। তারপর রুশিয়ার মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহকে মুক্তি প্রদান ও তাহার নৈতিক সমর্থনে পারশ্যের জাতীয়তাবাদ প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়, বিদেশী অভিভাবকত্বের বেড়াজাল হইতে পারশ্য নিষ্কৃতি পায়।

রেজা শাহ্ পল্লভী

তবে রুশিয়ার যে পারশ্যকে সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিলাষ ছিল না তাহা বলা যায় না। কারণ ১৯২০ সালে পারশ্যের উত্তর অঞ্চলের গিলান প্রদেশে সোভিয়েট গণতন্ত্র (রিপাবলিক) প্রতিষ্ঠা করিয়া বলশেভিকগণ পারশ্যের উর্বর ভূমি মাণ্গানডারান পর্যন্ত আক্রমণ করে। এই সময়ে জনৈক অজ্ঞাত পারশীয় কসাক সৈনিক দেশের দারুণ দুর্দিন উপস্থিত উপলব্ধি করিয়া তিন হাজার সৈনিকসহ বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীবৃন্দকে বন্দী করেন। তদানীন্তন ভীরু নিষ্কর্মা শাহ তাহাকে সমরসচিব ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে বৃত করিতে বাধ্য হন। ইহার পর বৃটিশের চুক্তিপত্র অস্বীকৃত হয় ও গিলানের সোভিয়েট গণতন্ত্র

ইরানের দৃশ্য : পার্সেপোলিস

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সৈনিকের নাম রেজা খান। রুশিয়ার জারের অধীন সৈনিকদের দ্বারা পরিচালিত পারশীয় কসাক সৈন্য বিভাগে তিনি বহুদিন সৈনিকের কাজ করেন। রেজার পশ্চাতে বাহিরের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি অথবা কোন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের শক্তি ছিল না। তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের জোরে বিদেশী শক্তিকে পারশ্যভূমি হইতে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে নূতন জাতীয়তাবাদের জাগরণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ঐশ্লামিক রাষ্ট্রসমূহ মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের জাগরণের জন্য পারশ্যের দার্শনিক আল আফগানীর নিকট ঋণী। তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে, প্রতীচ্যের কর্মপ্রবাহ ও ভাবধারাকে যদি প্রাচ্যদেশসমূহ কর্ম ও ভাবজীবনে খাপ খাওয়াইয়া না লইতে

বাগদাদের এল খাদিমেণের স্বর্ণচূড়া

পারে তবে ঐ সকল দেশের মৃত্যু অনিবার্য। তিনি তুরস্কে নবীন তুর্ক আন্দোলন, মিশর, আফগানিস্থান ও পারশ্যে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই সব আন্দোলনই পরবর্তীকালে লেনিন ও উইলসনের মতবাদকে ভিত্তি করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া জাতিকে সকল শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিয়াছিল। পারশ্য ইউরোপের ভাবধারাকে আপনার মত করিয়া লইয়াছে, অদূর প্রাচ্যে নূতন ভাবধারা প্রবর্তনে তুরস্কই অগ্রদূত, কিন্তু পারশ্যের মত সুপ্রাচীন সংস্কৃতিধারায় পুষ্ট নহে বলিয়া সে পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারিয়াছে, ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে একেবারে সম্পর্কশূন্য করিতে পারিয়াছে, কিন্তু পারশ্য তাহা পারে নাই। তবে যে মোল্লার দল পূর্বে ধর্ম ব্যতীত পারশ্যের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ ও প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেন, রেজা খাঁর আমলে সেই মোল্লাদের জন্য ধর্ম ব্যতীত সকল ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইল এবং কোরাণের নীতি নির্দেশ বাদ দিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা হইল, শিক্ষাকে ব্যবহারিক ও পোষাক পরিচ্ছদ আধুনিক করা হইল। কোন জাতির আধুনিকী করণ, অর্থাৎ তার রাজনৈতিক জীবন ও চিৎপ্রকর্ষের উন্নতি অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন ব্যতীত সম্ভব নয়। জাতির বুদ্ধিজীবী উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রথম আধুনিক ভাবে প্রভাবিত হয় পরে সেই ভাবধারা তাহাদের সংরক্ষণে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত আসিয়া পেঁছে। অতঃপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে রেজা খান আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমেই রেজা খাঁ সামন্ততন্ত্রের শেষ অবশিষ্টকে এমনভাবে ধুইয়া মুছিয়া দিলেন—ইহাদের পুনরাবির্ভাবের আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না। মহাযুদ্ধের পূর্বে সামন্তরাজ কর্তৃকই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইত, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতাই তাহাদের হস্তে ছিল। রেজা খাঁ ইহাদিগের ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন, এমন কি সেখ ফৈজল পর্যন্ত তেহারাণ গভর্নমেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। শাতিল আরব নদীর তীরে ফৈজলের জমিদারী আছে। ইহার কতকাংশ তিনি এাংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীকে দিয়াছেন বলিয়া বৃটিশের রক্ষণাধীনে তিনি কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। দক্ষিণ পারশীয় সৈন্য বিভাগে কতিপয় বৃটিশ কর্মচারী ছিল তাহাদিগকেও সরাইয়া আনিতে হইল।

১৯২৩ সালে রেজা খান প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইলেন এবং ১৯২৫ সালে পারশ্যের গণ-পরিষদ তাঁহাকে পারশ্যের শাসনকর্তার পদে অভিষিক্ত করিল।

স্বাধীনতা লাভ হইল বটে। কিন্তু আধুনিক জগতে দেশরক্ষার উপযোগী সৈন্য ও অর্থবল কোথায়। সৈন্যদের সুশিক্ষিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনা যায়। কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বভাবজাত রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ লইয়া, 'উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবেন।' কিন্তু ফ্রান্স

দাঙ্গা নিবারণকল্পে পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিতে-ছিলেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার এই সব স্বেচ্ছাসেবককে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য জিদ ধরিয়া বসেন। ইহার ফলে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসকে তাহাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সরাইয়া আনিতে হইয়াছে। কংগ্রেসকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য জিন্নাসাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার সাহেবের গায়ে জিন্নাসাহেবের বাতাস লাগিল কেন, বুঝিয়া উঠা অনেকের পক্ষে কঠিন হইলেও, ভারতসচিব আমেরি সাহেবের উক্তি এবং বিবৃতির মধ্যে আমরা ইহার কারণের কিছু সন্ধান পাইতে পারি। পুলিশ কমিশনার সাহেবের এই সিদ্ধান্তের ফলে বোম্বাইয়ের দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের লোকেরা কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট হইতে যে সেবা পাইতেছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাই হইতেছে দুঃখের বিষয়। কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকেরা বিহারে শান্তি স্থাপনের কার্যে যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের উচিত ছিল আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা। দেশের লোক পুলিশকে সাহায্য করে না, এমন অভিযোগই আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু ভাল উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করিতে গেলেও এ দেশের পুলিশ দেশের যুবকদের সাহায্য গ্রহণে তেমন অপ্রীতিকর এবং অনাবশ্যক ফেঁকড়া তোলে, বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের জাতির বাড়াবাড়িই সে পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ।

সঙ্কটত্রাণ সংকেত—

বাঙলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সংবাদ প্রকাশ এবং মন্তব্য সম্বন্ধে সরকারী যে নিষেধবিধি বলবৎ ছিল, ১লা জুন হইতে তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিয়া বাঙলার মন্ত্রীদের উদারতায় আমাদের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইবার কোন কারণ অবশ্যই পায় নাই। আমরা ঐরূপ নিষেধবিধি একান্তই অনাবশ্যক এবং অনিষ্টকর বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছি। বাঙলা দেশের শান্তি এবং স্বস্তির জন্য চিন্তা বাঙলার মন্ত্রীদেরই একচেটিয়া নয়, বাঙলা দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকেরও সেটুকু বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার মত বুদ্ধি আছে, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের ইহা বুঝা উচিত ছিল এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ এবং মন্তব্য করিবার ক্ষমতা যদি সঙ্কুচিত না করা হইত, তাহা হইলে দেশের সুস্থ জনমতকে জাগ্রত করিবার দিকে সংবাদপত্রসমূহ অনেক কাজ করিতে পারিতেন। শান্তির ভাব দেশের মধ্যে সেক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সরকারের পক্ষে এই সম্পর্কে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার কারণ যদি না থাকে, তবে বাঙলা সরকারেরও নিশ্চয়ই ছিল না।

সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন—

সিমলা শহরে কয়েক দিবস অধিবেশনের পর নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের স্থায়ী কমিটির অধিবেশন শেষ হইল। সংবাদপত্রগুলি যাহাতে গভর্নমেণ্টের কার্যে সহযোগিতা করিতে পারে, তাহার উদ্দেশেই পরামর্শদাতৃ পরিষদ স্বরূপে এই কমিটি গঠিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ সকলে প্রেস এডভাইসরী কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করা দরকার বোধ করেন নাই এবং কার্যত স্থায়ী কমিটিকে স্পষ্টভাবে উপেক্ষাই করিয়াছেন। কমিটি এই বিষয়ের প্রতি গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া যে যে স্থানে ভারতরক্ষা বিধান প্রয়োগ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া আদেশ জারী করা হইয়াছে, সেগুলি প্রত্যাহার করা উচিত। কমিটির পরামর্শের কোন মূল্যই যদি না থাকে এবং তাহার কার্যকারিতাই স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে, জনমতের উপর কমিটির কোন মর্যাদা থাকে না। প্রেস এডভাইসরী কমিটির পরামর্শ কর্তারা কিভাবে উপেক্ষা করিতেছেন যুক্তপ্রদেশের "সৈনিক" এবং "ন্যাশনাল হেরাল্ডের" জমানত দাবীই তাহার প্রমাণ। "সৈনিকের" জন্য যুক্তপ্রদেশের সরকার জমানত দাবী করিয়াছিলেন ৬ হাজার টাকার। প্রেস এডভাইসরী কমিটি এবং ভারতের সকল সংবাদপত্র সমস্বরে প্রতিবাদ করাতে সম্প্রতি জমানতের পরিমাণ কমাইয়া তাঁহারা হাজার টাকা করিয়াছেন; স্ট্যাণ্ডিং কমিটি এই আদেশ সমগ্রভাবে প্রত্যাহার করিতে বলিয়াছেন। দিল্লীর চুক্তি অনুসারে প্রেস কমিটিগুলির ক্ষমতা যদি স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে এই দাবী গভর্নমেণ্ট অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

ঢাকা তদন্ত কমিটি—

গত ২রা জুন সোমবার হইতে ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি মিঃ ম্যাকনায়ার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে আশ্বস্তির ভাব বাড়িবে, তিনি এই মত সমর্থন করেন। এই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ ব্যাপারে সংবাদপত্রসমূহের উপর কোনরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার নাই; কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণাদির সময় এমন কারণ দেখা দিতে পারে, যে সময় খুঁটিনাটি কোন কোন বিষয়, যেগুলি প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয়, সেগুলি প্রকাশ না করিতে বলা হইতে পারে। বিচারপতি ম্যাকনায়ারের এই উক্তিতে আমাদের আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু নাই, কারণ এমন কতকগুলি ক্ষমতা না দিলে কোন কমিটির পক্ষেই তদনুরূপ কার্য চালান সম্ভব

হইতে পারে না। তবে আমাদের একটি বক্তব্য আছে তাহা এই যে, কমিটিকে তদন্ত সম্পর্কে পুলিশের কার্যের বিচার করিতে হইবে এবং আইন ও শান্তিরক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেগুলি সঙ্গত এবং যথোপযুক্ত হইয়াছিল কি না এ সিদ্ধান্তও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। এই কর্তব্য প্রতিপালন করিতে হইলে পুলিশের কার্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন; কিন্তু এ সম্বন্ধে খাঁটি কথা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। যাঁহারা আইন ও শান্তিরক্ষক, তাহাদের পক্ষে অপ্রীতিকর বা অসুবিধাজনক সাক্ষ্যদানে ঝুঁকি লইতে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে সাহসে কুলায় খুব কম লোকের; কারণ বিভ্রাটে পড়িবার যার ভয় আছে—সত্য কথা বলিলেও ভয় না আছে, এমন নয়, আর সাক্ষ্য প্রমাণে একটু ঊনিশ বিশ হইলে তো আর কথাই নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, জনসাধারণকে এইরূপ একটা আশ্বাস কমিটি হইতে দেওয়া উচিত যে, এ সম্পর্কে মনের কথা খুলিয়া বলিতে তাহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আর একটা কথা এই যে, পূর্বেও কয়েকবার দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত হইয়াছে, বাঙলায় হইয়াছে, হইয়াছে এই ঢাকায়ই পূর্ববর্তী দাঙ্গা সম্পর্কে; কিন্তু পুরাপুরি রিপোর্ট তাহার প্রকাশ করা হয় নাই, গভর্নমেণ্টের দপ্তরেই তাহা পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের গভর্নমেণ্টও কয়েকটি ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর দাঙ্গা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট চাপা দিয়াছেন। এই তদন্তের সম্বন্ধে যেন তেমন ব্যবস্থা না হয়; কিংবা গভর্নমেণ্টের দপ্তরে রিপোর্ট পেঁীছিবার পরই উহা ধামা চাপা না পড়ে।

মস্তিষ্কের অপব্যবহার—

মিস ইলানর রাথবোন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একজন মহিলা প্রতিনিধি। সম্প্রতি তিনি "কতিপয় ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশ্যে" এই শিরোনামা দিয়া কালা আদমী ভারতবাসী-দিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদানে পরম উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কংগ্রেস কেন ব্রিটিশ সরকারের সমরোদ্যমে সহযোগিতা করিতেছে না এইজন্য তাঁহার আক্ষেপ। আক্ষেপটা পণ্ডিত জওহরলালের উপর দিয়া বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—পণ্ডিত জওহরলাল, আপনিই একদিন বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডকে এক সময়ে আপনি অখণ্ড ভালবাসিতেন। আপনার এই কথার আজ কি অর্থ আমরা করিব? যে ইংলণ্ডকে আপনি ভালবাসিতেন, আপনার কার্য ও প্রভাব দ্বারা তাহার জন্য কোন সৌজন্য আপনি নিরূপিত করিয়া দিতেছেন!" পণ্ডিত জওহরলাল এখন কারাগারে। বাহিরে থাকিলে উচিত জবাবই তিনি ইহার দিতেন; দেখাইতেন কংগ্রেসের পুণা প্রস্তাব! দেখাইতেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সমরোদ্যমে সাহায্য যাহাতে করা যায় সেজন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব পর্যন্ত কংগ্রেস কি ভাবে ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আসল কথাটা ধরা পড়িতেছে মিস রাথবোনের বিবৃতিতে। তিনি বলিতেছেন—"আপনাদের সাহায্য ছাড়াও আমরা জয়লাভ করিব। ভারতীয় অন্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য আমরা ভালভাবেই পাইতেছি। তবে আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।" কংগ্রেসের সাহায্যের প্রয়োজন নাই, এই মনোবৃত্তি বৃটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে আজও একান্তভাবে কাজ করিতেছে। ইঁহাদের চিন্তা ব্রিটিশের বিপদের জন্য নয়, ভারত-বাসীদের, বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসেরই জন্য। মিস রাথবোন পণ্ডিত জওহরলালকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার উক্তি অত্যন্ত বেহিসাবী গর্বপূর্ণ, বিজয়ী আক্রমণকারীরা আজকাল আর সময় দিয়া আক্রমণ করে না। তাহারা ভারতবর্ষের বুকের উপর যে নৃশংসতার অনুষ্ঠান করিবে তাহা অমৃতসরের ঘটনার তুলনায় অনেক—অনেক ভয়াবহ।" ইংরেজের জয়লাভ যখন নিশ্চিত এবং জার্মানদের পরাজয় সুনিশ্চিত, তখন অমৃতসরের তুলনায় অনেক—অনেক ভয়াবহ জার্মানদের অত্যাচারের জন্য ভারতবাসীদের নিশ্চয়ই ভয় নাই; সুতরাং মিস রাথবোনের সে কথা তোলা অত্যন্তই অবান্তর হইয়াছে বলিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতার মূল কি?—

মহীশূরের দেওয়ান মীর্জা ইসমাইল খাঁন সম্প্রতি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সেদিন মহীশূরের জামিয়া মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিতে গিয়া বলেন,—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সকল পার্থক্য লইয়া হট্টগোল করা হইয়া থাকে, তাহা অতি তুচ্ছ। উভয়ের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য-বন্ধন রহিয়াছে, তাহাই সত্য এবং তাহার তুলনায় ঐ সকল পার্থক্য সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। উভয়ে একই বংশের, একই দেশে এবং একই স্রষ্টার সন্তান।" সকলেই জানেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলিয়া হট্টগোল করিবার মত কিছু প্রকৃত-পক্ষে নাই; তবু যে হট্টগোল হয়, তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ হট্টগোল করাই কতকগুলি লোকের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ ঐরূপ হট্টগোল না করিলে তাহাদের মোড়লী চলে না, নেতাগিরি চলে না, এদেশের সরল প্রকৃতির লোকদের স্বার্থ ভাঙ্গিয়া নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে পুষ্ট করা সম্ভব হয় না। ইহাদের এই পাপ ব্যবসার ফলে, ঐ দলের এক শ্রেণীর ধড়িবাজ লোকের পৌষ মাস পড়ে বটে; কিন্তু দেশের এবং সমাজের হয় সর্বনাশ। সোজাসুজি যাহারা দেশের শত্রুতা করে তাহারা বরং ভাল; কিন্তু সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধুয়ায় যাহারা নিজেদের স্বার্থপুষ্টির জন্য, দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়া পরোক্ষভাবে স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থের সর্বনাশ করে, তাহারা অধিকতর সাংঘাতিক জীব। মীর্জা ইসমাইলের বিবৃতিতে ইহাদের স্বরূপ যদি কিছু উন্মুক্ত হয় তবে দেশের অনেক কল্যাণ হইবে।

ক্রীট ত্যাগের পর

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলিয়াছিল আঠার দিন, ক্রীটের লড়াই বার দিনে শেষ হইয়াছে। দ্বাদশ দিন বিপুল বিক্রমে লড়াই করিবার পর ইংরেজ পক্ষের প্রায় পনের হাজার সেনা ক্রীট হইতে মিশরে চলিয়া আসিয়াছে। ক্রীটের লড়াইয়ের গতি দেখিয়া পূর্ব হইতেই অনুমান করা গিয়াছিল যে, এই লড়াইয়ের এই পরিণতি দাঁড়াইবে। ইংরেজ পক্ষের ক্রীট পরিত্যাগের কারণ সম্বন্ধে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন,—"ক্রীটের সামরিক গুরুত্ব এবং ক্রীটের উপর জার্মান আক্রমণের ভীষণতা ব্রিটিশ জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল; কিন্তু দুই দিক হইতে এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্ত্বেও যুদ্ধের সমস্ত ব্যাপার তাহারা জানিতে পারে নাই। ইংরেজ পক্ষকে ধরিতে গেলে উড়োজাহাজের সাহায্য না পাইয়াই লড়াই করিতে হইয়াছে, সপ্তাহ খানেক পূর্বে এই কথাটা যখন জানা গেল, তখনই হল্যাণ্ড এবং অন্যান্য যে যে স্থানের লড়াইতে নাৎসীরা সাফল্যলাভ করিয়াছে, সেই সমস্ত স্থানের লড়াইয়ের স্মৃতি ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে উদিত হইল এবং তাহারা দুঃসংবাদ পাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিল।"

ক্রীটের লড়াইতে জার্মানেরা রণকৌশল দেখাইয়াছে এবং শৃঙ্খলার সহিত সংকল্পশীলতার সঙ্গে যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছে, ব্রিটিশ পক্ষও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। হল্যাণ্ড এবং নরওয়ে প্রভৃতি স্থানের লড়াই আর ক্রীটের লড়াইতে জার্মানেরা যে রণকৌশল দেখাইয়াছে, তাহার মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে। ইতিপূর্বে প্যারাসুটবাহিত জার্মান সেনারা জার্মানীর স্থল সৈন্যদের ছুটকো ছাটকা সহায়তাই করিয়াছে। শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজের ক্রীটের উপকূলভাগের উপর গিয়া বোমাবর্ষণ করিয়াছে; এইভাবে বোমাবর্ষণ করিয়া শত্রুপক্ষের রক্ষীসেনাদিগকে তাহারা একটা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। এ পক্ষের উড়োজাহাজ ছিল না; কাজেই ইংলণ্ডে জার্মান উড়োজাহাজগুলির যে অসুবিধা

ক্রীট দ্বীপের বিখ্যাত বন্দর সুডা

ক্রীটে তাহা ছিল না, একথা বলা চলে। বোমাবর্ষণের পর জার্মানেরা যখন দেখিয়াছে যে, আশেপাশে শত্রুপক্ষের সৈন্য নাই, তখন তাহারা প্যারাসুটের বহর লইয়া আসিয়াছে এবং প্যারাসুট সাহায্যে সেনা নামাইয়া দিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এক এক অঞ্চলে প্যারাসুট বাহিত ভীমদর্শন শস্ত্রধারী জার্মান সেনারা নামিয়াছে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী প্যারাসুট সাহায্যে জার্মান সেনাদের ক্রীটের সুদা উপসাগর অঞ্চলে অবতরণের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, কিছু সময়ের মধ্যেই পঙ্গপালের ঝাঁক যেন

ইরাকের বসরা বিমান ঘাঁটি হইতে হোটেলের দৃশ্য: ১৯৩৮ সালের মার্চ-এ এই বিমান ঘাঁটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়

ঘাঁটি, সেতু প্রভৃতি নষ্ট করিয়া স্থল সেনাদের সুবিধা করাই ছিল তাহাদের কাজ; কিন্তু ক্রীটের লড়াইতে জার্মানী স্থলপথে সৈন্য পাঠাইতে পারে নাই। শূন্যপথে বাহিত সৈন্যেরাই সেখানে গিয়া লড়াই করিয়াছে। এই লড়াইয়ের রকমটা ছিল অদ্ভুত। প্রথমত জার্মানীর বোমাবর্ষী উড়োজাহাজগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, তারপর প্যারাসুটগুলি নামিতে লাগিল মাটির দিকে। গোলাপ ফুলের পাপড়ী যেমন ঝুর ঝুর করিয়া খসিয়া পড়ে, তেমনি পড়িতে লাগিল প্যারাসুট—সে অবতরণ অজস্র এবং অবিরল ধারায়। প্যারাসুট সৈন্যেরা অবতরণ করিবার কিছুকাল পরে তাহারা ইঙ্গিতে জানাইল যে, সেনা
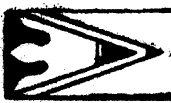
নামাইবার সুবিধা আছে; তখন গ্লাইডার এবং সেনাবাহী উড়োজাহাজ হইতে সৈন্যেরা নামিতে লাগিল। জার্মানেরা জলপথে ক্রীটে বেশী সৈন্য নামাইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রিটিশ পক্ষের নৌবহর এদিকে কয়েকদিন বাধা দিয়া খুবই ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু গ্রীসের পর্বতসংকুল সংকীর্ণ উপকূলভাগে ব্রিটিশ নৌবহরকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নৌবহরের দিক হইতে এই লড়াইতে ব্রিটিশ পক্ষের ক্ষতি কম হয় নাই, তেমনই জনক্ষয়ের দিক হইতে জার্মানদের ক্ষতিও হইয়াছে অপরিসীম। গ্রীসের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র জার্মান প্যারাসুট বাহিনীর শবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল বলা যায়। গলিত, পিষ্ট এবং বহুভাবে বিকৃতাংগ সে সব মৃতদেহ—বীভৎস তাহার দৃশ্য; কিন্তু জার্মানেরা কোন ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া

ব্রিটিশ সামরিকগণ ক্রীটের লড়াইয়ের সুবিধা অসুবিধা না জানিতেন ইহা নয়; তবে জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা এই দ্বীপটিকে এত গুরুত্ব দিলেন কেন? ক্রীটের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব তো আছেই। ক্রীট এবং সাইপ্রাস এই দুইটি দ্বীপ জার্মানেরা যদি দখল করিয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে ঈজিয়ান সাগরের এশিয়ার দিকটায় তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আমাদের আফ্রিকাস্থ উড়োজাহাজের ঘাঁটির বিমান বহরের সাহায্যের চেয়ে বিমান শক্তির বেশী সাহায্য না পাইলে আমাদের সেনারা দীর্ঘকালের জন্য ক্রীটে এবং তাহার আশে পাশে লড়াই চালাইতে সমর্থ হইবে ইহা আশা করা যায় না। এ কৈফিয়তে অবশ্য নিজেদের রণনীতি সংগতি ষোল আনা প্রতিপন্ন হয় না। ক্রীট যখন
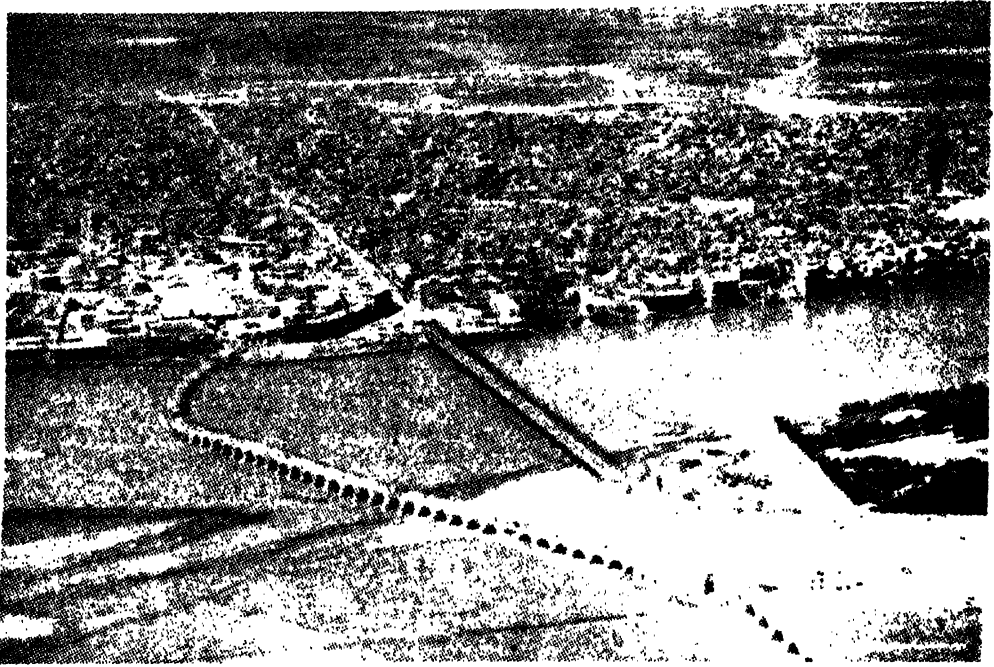
মসুল বন্দর— রসীদ আলী তাঁহার দলবল সহ এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ধরে নাই। ক্রীট তাহারা দখল করিবেই, এই সংকল্প লইয়াই যুদ্ধে নামিয়াছিল; সে সংকল্প তাহারা সিদ্ধ করিয়াছে। ক্রীটের লড়াইতে জার্মানদিগকে কিভাবে জীবন দিতে হইয়াছে, সে সম্বন্ধে জনৈক সৈনিকের বর্ণনা এইরূপঃ—"জার্মানদের শবদেহের দ্বারা, যতদূর দৃষ্টি চলে ভূমিভাগ সমাচ্ছন্ন ছিল। পাহাড়ের চূড়াইয়ের উপর তাহারা নামিয়াছিল, সেখানে গ্রীকেরা তাহাদিগকে হত্যা করে। যেসব জায়গায় রীতিমত লড়াই চলিয়াছিল, সে জায়গায় তো জার্মানদের লাস না মাড়াইয়া তিন গজও যাইবার উপায় ছিল না। এমন মৃত্যুময় দৃশ্য না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কোন কোন স্থানে, প্যারাসুটের মধ্যে জড়াইয়া জার্মানেরা পড়িয়াছিল। প্যারাসুটের রশি হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে গিয়াও অনেকে মরে। জংলা যে সব জায়গা সেই সব জায়গায় জার্মানদের মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিতেছিল, প্যারাসুটের দড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়া তাহারা মরিয়াছে। প্যারাসুটীদের পকেটে বোমা থাকে, সেই বোমা ফাটিয়া মরিয়াছে অনেকে।"

আক্রান্ত হয় নাই, আক্রমণ চলিতেছে গ্রীসের উপর, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তখন পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন,—'আমরা কিছুতেই পিছু হটিব না। সে কল্পনাও আমাদের মনে নাই। ক্রীট এবং তোবরুকে আমরা প্রতিরোধের প্রবল ঘাঁটি সমস্ত গড়িয়া তুলিয়াছি" কিন্তু কার্যত ক্রীট হইতে ইংরেজকে হটিতে হইল, যেমন বীরত্বপূর্ণ কৌশল সহকারে তাঁহারা সগৌরবে ডানকার্ক হইতে হটিয়াছিল, নরওয়ে হইতে হটিয়াছিল, শুনিতেছি, এক্ষেত্রেও তেমনি হটিতে হইয়াছে; কিন্তু হটিবার সংকল্পও যেখানে ছিল না, সেখানে হটিতে হইল কেন? ক্রীটের আক্রমণ অপ্রত্যাশিত নয়। কর্তারাই বলিয়াছেন, সাত মাস হইল তাঁহারা ক্রীটে ছিলেন, এই সাত মাসে ক্রীটে বিমান বিভাগের বড় বড় ঘাঁটি তাঁহারা করেন নাই কেন? নরওয়ের লড়াইতেও আমরা ব্রিটিশ পক্ষের উড়োজাহাজের যথেষ্টতা ছিল না শুনিয়াছি; ডানকার্কে হটিবার মূলেও ছিল সেই ত্রুটিই। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেও ব্রিটিশ সমর বিভাগ সে ত্রুটি পূরণ করিতে পারেন নাই। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশের শক্তি-

শালী নৌবহর রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জার্মানরা প্রায় এক হাজার উড়োজাহাজে ক্রীটে ৩০ হাজার সেনা নামায়। ইহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, নৌবহরের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে উড়োজাহাজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে। উড়োজাহাজ হইতে জার্মানদের অবিরত বোমা বৃষ্টির জন্য ব্রিটিশের নৌবহর শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও ক্রীটে জার্মান সেনার অবতরণ-প্রতিরোধ কার্যকর হয় নাই। এ সব তর্ক উঠিবে; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ক্রীটের এই লড়াইতে জার্মানদিগকে প্রবলভাবে বাধা দিয়া ইংরেজ পক্ষের নিশ্চয়ই অনেক সুবিধা হইয়াছে। ইহার ফলে ইরাকের অবস্থা ইংরেজের পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। জার্মানেরা যদি ক্রীটে বাধা না পাইত এবং তাহারা সরাসরি সিরিয়ায় তাহাদের বিমানবহর এবং প্যারাসুট-বাহিনী প্রেরণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ইরাকের অবস্থা নয়; কিন্তু, ক্রীটের লড়াইয়ের ফলে প্রত্যক্ষভাবে জার্মান সেনাদল জার্মানদের উড়োজাহাজের কোন বড় শক্তি বা প্যারাসুটীরা ইরাকে যাইতে পারে নাই। ক্রীটে জার্মানেরা আড্ডা গাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইরাকে তাঁহাদের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু রসীদ আলীর এই পলায়নের সঙ্গেই ইরাকের সমস্যা একেবারে মিটিয়াছে, এমন মনে করা ভুল হইবে। জার্মানদের গুপ্তচরেরা এখনও ইরাকে আছে নিশ্চয়ই; ব্রিটিশ বাগদাদে গিয়াছে; ব্রিটিশ ইরাকের গুরুত্ব হইল মোসুলের তেলের খনির জন্য এই মোসুলের তেলের প্রধান কূপ কারকুকে এখনও জার্মানেরা রহিয়াছে। তারপর সিরিয়ায় ভিসি গভর্নমেন্ট তাহাদের হাতে এখনও ক্রীড়নকস্বরূপ কাজ করিতেছেন। ইতিমধ্যে জার্মানেরা ক্রীটের পর যদি সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করিয়া ফেলে এবং সিরিয়ার উপকূলের সঙ্গে সোজাসুজি তাহাদের সংযোগ
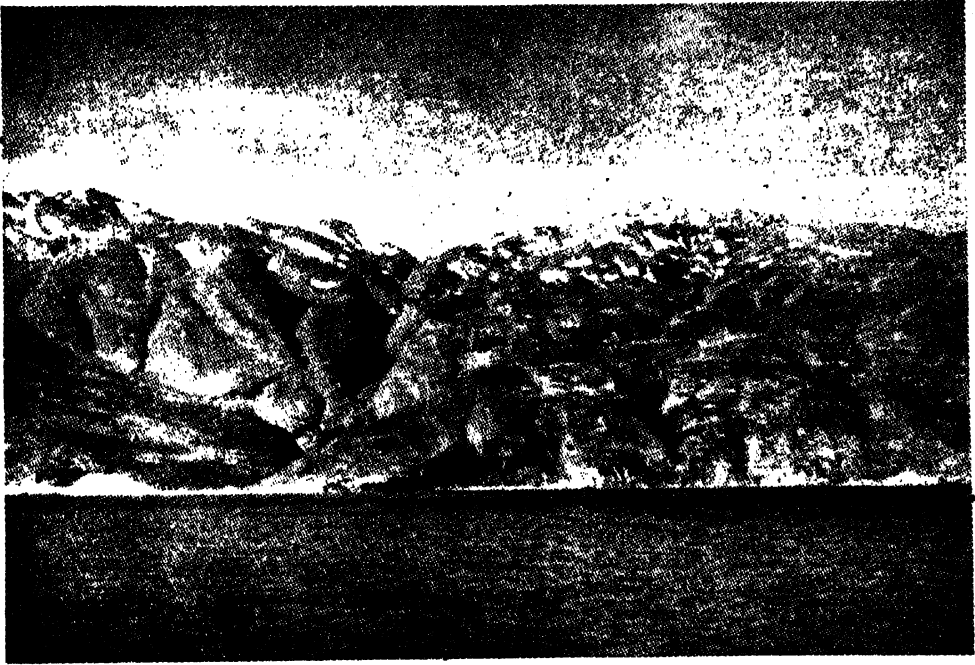
গিরিমালাবেষ্টিত ক্রীটের উপকূল

ইংরেজের পক্ষে প্রবল প্রতিকূল হইয়া পড়িত। ক্রীটের লড়াইতে দারুণ অন্তরায় ঘটে বলিয়াই ইরাকের লড়াইয়ে রসিদ আলী জার্মানদের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই এবং জার্মানদের নিকট হইতে বেশী রকম সাহায্য না পাইলে, তাঁহার পরিণতি যাহা হইবে সকলেই বুঝিতেন, তাহাই হইয়াছেও। ব্রিটিশ সেনাদল বাগদাদে পেঁাছিয়াছে এবং রসীদ আলী তাঁহার দলবল সহিত ইরাণে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্রীটের রণাঙ্গনে ইংরেজ এই সুবিধা পাইয়াছে। ইরাকে লড়াই যখন বাধে, তখনই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী সে লড়াই ইংরেজের পূর্ব সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে কতটা সংশ্লিষ্ট তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, জার্মানেরা রসিদ আলীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; প্রকৃতপক্ষে তিনি এ আশঙ্কাও করিয়াছিলেন যে, ইরাকে ইংরেজ পক্ষ সুবিধা করিবার পূর্বেই জার্মানেরা সেখানে গিয়া পেঁাছিবে। জার্মান এবং ইটালীয়ানেরা ইরাকে না গিয়াছে, এমন স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ইরাকের সমস্যা এবং শুধু ইরাক কেন, সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় জটিল সমস্যা সৃষ্টি হইবার আতঙ্ক এখনও ষোল আনাই রহিয়াছে।

সামরিক বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, হিটলার তিন দিক হইতে এশিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমত রুমেনিয়ার ভিতর দিয়া কৃষ্ণসাগরের দিকে তাঁহার লক্ষ্য রহিয়াছে; দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল লিবিয়ার পথে মিশরের দিকে। এদিকে তাহারা সোল্লুম পুনরায় দখল করিয়াছে, তৃতীয় লক্ষ্য সাইপ্রাস, সিরিয়া এবং ইরাকের ভিতর দিয়া। সিরিয়ায় ইতিমধ্যেই বহু নাৎসী বিমান বীর গিয়া পেঁাছিয়াছে এবং অনুকূল পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কতকগুলি জার্মান সৈন্য ট্যাঙ্ক লইয়া জাহাজযোগে সিরিয়ায় ইতিমধ্যে আসিয়াছে ইহাও খবর আসিয়াছে। ক্রীট দখল করিবার পর, সিরিয়ায় সেনা নামান, এখনও জার্মানদের পক্ষে অনেক অসুবিধাজনক। কারণ ফরাসীরা যদি জার্মানদিগকে সিরিয়ায় সেনা নামাইতে দেয়ও, জার্মানদের

সেক্ষেত্রেও অসুবিধা রহিয়াছে। ব্রিটিশ পক্ষের নৌবহরের ঘাঁটি রহিয়াছে সাইপ্রাসে। সাইপ্রাসে ইংরেজের উড়ো জাহাজেরও ভাল ঘাঁটি রহিয়াছে। এই ঘাঁটি হইতে অল্প দূরে পাল্লার কামান দাগিয়া জার্মানদের জলপথে সিরিয়ায় অবতরণে বাধা দেওয়া চলিবে এবং শূন্যপথেও সাইপ্রাস হইতে জার্মানেরা তদনুরূপ বাধা পাইবে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, অতঃপর জার্মানদের লক্ষ্য ইংরেজের সাইপ্রাস দ্বীপ।

এই সঙ্গে রুশ-জার্মান সন্ধির কথাও অনেকে বলিতেছেন। সন্ধির আলোচনা চলিতেছে। পরিণতি কি হইবে বলা যায় না। "টাইমস" পত্রের আনকারার সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, এই সন্ধি যদি কার্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন বাটুমের পথে জার্মানদিগকে ইরাকে সৈন্য লইয়া যাইতে দিবে। হইতেই এবং এই দিক হইতেই রুশ-জার্মান সন্ধির গুরুত্ব। আটলাণ্টিকের লড়াই কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, কি ভীষণভাবে পাতাল পুরীর এই সংগ্রাম চলিতেছে, আমরা তাহার ষোল আনা খবর রাখি না। সম্প্রতি ইংরেজের "হুড" ডুবি এবং জার্মানীর "বিসমার্ক" ডুবি হইতে এই গুরুত্ব কিঞ্চিৎ ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার চেয়ে গুরুত্ব বাড়িয়াছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বেতার বক্তৃতায়। তিনি সেদিন স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, জার্মানী যেভাবে আটলাণ্টিক সমুদ্রে জাহাজ ডুবাইতেছে, তাহা ইংরেজ এক মাসে যে পরিমাণ জাহাজ তৈয়ার করিতে পারে, তাহার তিনগুণ বেশী এবং আমেরিকা ও ইংরেজ দুইয়ে মিলিয়া যত জাহাজ তৈয়ার করিতে পারে, তাহার দুই গুণ বেশী। নরওয়ের উপকূলভাগ

বিমানপোত হইতে জার্মান সৈন্যের অবতরণ

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও আমাদের বিশ্বাস যে, রুশিয়া এখন কিছুতেই যুদ্ধে নামিবে না এবং যুদ্ধে না নামিয়া যে সুবিধা সে পায়, সে ফাঁকতালে তাহা হাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং রুশিয়ার স্বার্থের ক্ষতি না করিয়াও তার স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এমনভাবে জার্মানীর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিবার ক্ষেত্র এখনও নাকি রুশিয়ার অনেক রহিয়াছে।

এক দিকে ইংরেজ যেমন জার্মানীকে ঘরবন্দী করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে, অন্য পক্ষে জার্মানীও সেইরূপ ইংরেজ যাহাতে আমেরিকার সাহায্য না পায়, সেজন্য চেষ্টা করিতেছে। ইংরেজের আশ্রয় এবং সম্বল বর্তমানে প্রধানত আমেরিকার সাহায্য, সেইরূপ জার্মানীরও আশা ভরসা রুশিয়ার অর্থনীতিক সাহায্য। রাজনীতিক দিক হইতে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের পিছনে এই দুই শক্তি কাজ করিতেছে। আটলাণ্টিকের লড়াইয়ের গুরুত্ব এই দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলের ব্রেস্ট শহর পর্যন্ত প্রধান প্রধান যতগুলি বন্দর আছে সবগুলি এখন জার্মানদের হাতে এবং এই সব বন্দর হইতে জার্মানদের ডুবোজাহাজের ঝাঁক আটলাণ্টিক মহাসাগরেরর বক্ষে পাঁতি পাঁতি করিয়া ফিরিতেছে। জার্মানদের লক্ষ্য ব্রিটিশ রণতরীগুলির উপর নয়, লক্ষ্য হইল রসদবাহী জাহাজগুলির উপর। রণতরী ডুবিলেই সাধারণত খবর পাওয়া যায়; কিন্তু এইসব ছোট খাটো জাহাজ ডুবির খবর পাওয়া যায় না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই জাহাজডুবির গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন এবং বিশেষ ব্যবস্থা জারীও করিয়াছেন, কিন্তু এই বিশেষ ব্যবস্থা জারী কার্যত যুদ্ধের সমান নয়। বাস্তবিক আমেরিকা যদি ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধে নামে তবে যুদ্ধের গতি অন্যরকম হইবে, সেই সঙ্গে রুশিয়া যদি জার্মানীর সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অগ্রসর হয়, তাহা হইলেও যুদ্ধ সুদীর্ঘ হইবে সুনিশ্চিত।
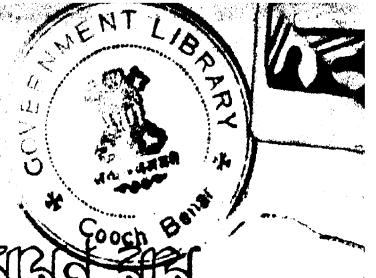
(২৭)

যোগেশ শোভার বাড়ি হইতে সোজা একেবারে অমলের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল ভাবিয়াছিল যে, যোগেশ মুখে যাহাই বলুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে শোভার সঙ্গে চলনসই রকমের একটা রফা করিয়া লইবেই। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া যোগেশ যখন তাহাকে জানাইয়া দিল যে কেবল যে সে দানপত্রখানিই সত্য সত্যই শোভার হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহাই নহে, অতীশকেও তাহার নবলব্ধ দায়িত্ব সম্বন্ধে সে নিজের মুখে সচেতন করিয়া দিয়া আসিয়াছে তখন বিস্মিত অমলের মুখ হইতে প্রথমদিকে অনেকক্ষণ কোন কথাই বাহির হইল না। সে নির্বাক হইয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যোগেশ হাল্কাভাবে কেমন একটা লঘুতা ফুটাইয়া তুলিয়া পুনরায় কহিল, "স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার অনুমতি দিয়ে এবং সতীনকে নিজের ঘরে অভ্যর্থনা করে সমস্ত অধিকার তাকেই ছেড়ে দেবার পর স্বয়ং বনবাসে গিয়ে তোমাদের সমাজের সতীরাই এযাবৎ তোমাদের সকল কবি ও শিল্পীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে এসেছেন; কিন্তু আজ দেখ যে, ওকাজ সতীরাই কেবল পারেন না, যাঁরা সৎ তাঁরাও অর্থাৎ পুরুষেরাও পারেন।"

অমল তথাপি স্তব্ধ হইয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যোগেশ ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছ?"

"কিছু না," অমল সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিল, "নিজের জিদই বজায় রাখলে—সত্যের বিনিময়ে!"

যোগেশ উত্তর দিল, "না, সত্যকে স্বীকার করলাম, নিজের দুর্বলতাকে জয় করে। আমাকে তোমার অভিনন্দন জানান উচিত অমল।"

অমল চটিয়া গিয়া কহিল, "তোমাকে আমার বেত মারা উচিত, কারণ তুমি কাপুরুষ। এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মতই তুমিও পিউরিট্যান। তোমার মুখের বড় বড় বুলি আসলে দশজনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজেকেও ভুলাবার ফন্দীমাত্র।"

"তা হবে," বলিয়া যোগেশ একটি সিগারেট ধরাইল। উহার সবটা সে টানিয়া শেষ করিল না, অর্ধেকটা ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে অমলকে কহিল, "তোমার চাকরকে বল ভাই আমার বিছানাটা গুছিয়ে বেঁধে দিতে। আমি আজই যাব।"

"কোথায় যাবে?" অমল প্রশ্ন করিল।

"আপাতত লাহোরে ফিরে যাব।" যোগেশ উত্তর দিল, "ওখানে কলেজে একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে। পাই ভালই, না পেলেও রাভী নদীর তীরে বসেই কান পেতে নিজের মর্মবাণী শুনবার চেষ্টা করব। অপেক্ষা করব সেই আহ্বানের যা এই সুষুপ্ত জাতিটাকে সমগ্রভাবে আবার জাগিয়ে, মাতিয়ে তুলবে।"

শুনিয়া গৌরী যোগেশকে আরও কয়েকদিন থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, যোগেশ রাজী হইল না। প্রথম দিকে কয়েকবার সে ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল, তারপর বলিয়াই ফেলিল, "জানেনই ত বৌদি', আমি চিরকালের একগুঁয়ে। আমার মুখের 'না'কে কেউ 'হাঁ' করাতে পারে না।"

অমল গম্ভীরভাবে কহিল, "কেবল মনোমোহন চাটুয্যে একবার তোমার মুখের 'না'কে 'হাঁ' করিয়েছিলেন, আর সেটা তোমার বিয়ের সময়।"

যোগেশের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে কহিল, "তা ঠিক তবে তার ফল যে শুভ হয়নি তা ত তুমি জান।"

অমল অস্বীকার করিতে পারিল না, কাজেই সে কোন উত্তর দিল না।

কিন্তু যোগেশের যাত্রার প্রাক্কালে সে পুনরায় কহিল, "ভুল করেই যাবে যোগেশ? এ ভুল কি ভাঙবে না?"

গম্ভীরস্বরে যোগেশ উত্তর দিল, "এ যদি ভুল হয়, এর বীজ বোনা হয়েছিল এক যুগ আগে। মাটিতে বীজ পড়লে তা থেকে গাছ হবে, সে গাছে ফল ফলবে, এটা প্রকৃতির নিয়ম। একে কে আটকাতে পারে না।"

চক্ষু মুছিয়া গৌরী ধরা গলায় কহিল, "যোগেশবাবু, আপনি আবার বিয়ে করুন। বয়স ত বেশী হয় নি আপনার!"

অমল ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "ঠিকই ত। সত্য কেবল এক তরফা হবে কেন যোগেশ? শোভা বৌদি'র বেলায় যা তুমি সত্য বলে স্বীকার করলে নিজের বেলায় তাকে সত্য বলে মানবে না কেন?"

যোগেশ মুহূর্তের জন্য যেন একটু বিব্রত বোধ করিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া সে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "মানব না তা ত বলি নি। সন্ধান করছি আমার মানসীর। তাঁর খোঁজ যদি পাই তবে তাকে ঘরে নিয়ে আসবার সৎসাহসের অভাব আমার হবে না, তা তুমি নিশ্চয় জেনো।"

অমল মাথা নাড়িয়া কতকটা ক্ষুণ্ণ কতকটা তিক্তকণ্ঠে কহিল, "মিথ্যা কথা যোগেশ। গোড়াতেই যে গলদ রয়ে গেছে। কোনদিন তুমি তোমার মানসীর সন্ধান পাবে না। বুকের মধ্যে কেবল একা মরুভূমিই চিরকাল বয়ে বেড়াবে। তাইতেই আমার দুঃখ।"

ডাকগাড়ী হাওড়া পরিত্যাগ করিলেও অমলের এই কথা কয়টিই বারবার যোগেশের কানের কাছে যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল, আর বুকের মধ্যেও সে অনুভব করিতে লাগিল কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় শূন্যতা—ক্রোধ নয়, অভিমান নয়, অনুরাগ নয়, বিদ্বেষ নয়, জ্বালা নয়, বেদনা নয়, অথচ ইহাদের যে কোন অনুভূতির চাইতে অস্বস্তিকর অনুভূতিহীনতারই যেন কেমন একটা সচেতন অনুভূতি।

গাড়ীর মধ্যে সহযাত্রীদের দিকে যোগেশ একবার চাহিয়াও দেখিল না, বাঙলার প্রকৃতির দ্রুত পলায়মান স্বপ্নের মত জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ শ্যামল সৌন্দর্য খোলা জানালার ধারে বসিয়া উপভোগ করিবার কোন চেষ্টা করিল না, গাড়ী ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই সে সহযাত্রী সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়া বাঙ্কের উপর উঠিয়া সটান শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঘুমাইবার মত করিয়া চক্ষু মুদিয়া সে পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না, অথচ ঠিক যে সে জাগিয়া রহিল তাহাও নহে। অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ঘটনার অস্পষ্ট স্মৃতি তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাল পাকাইয়া তাহার চেতনাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল মাত্র।

তাহার আচ্ছন্ন কল্পনা শোভা ও অতীশকে লইয়া কত ঘটনা ও কত কাহিনীই রচনা করিয়া যাইতে লাগিল। উহার কতখানি

যে স্বপ্ন আর কতখানি যে অর্ধসচেতন মনের পর্দার উপর কল্পনার সচেষ্ট সৃষ্টি, যোগেশ তাহা সঠিক ঠাহর করিতে পারিল না।

সকালের দিকে চক্ষু চাহিয়া প্রথমেই সে মনে মনে হইলেও সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া উঠিল যে, শোভার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতাকে অতীশের ভালবাসার সোনার কাঠির স্পর্শে সার্থক হইয়া উঠিবার সকল সুবিধা নিজের হাতে সৃষ্টি করিয়া এতদিন পর শোভাকেই কেবল যে সে সুখী করিতে পারিয়াছে তাহাই নহে, নিজেও সে সুদীর্ঘ একযুগের অবসানে মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছে। একটা উল্লাসের সুর গুন গুন করিয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে বাঙ্ক হইতে নীচে নামিয়া আসিল।

অথচ মুক্তির আনন্দে তাহার বুকের ভিতরটা নৃত্য করিয়া উঠিল না, কণ্ঠের সুর সমে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই আপনা হইতেই থামিয়া গেল।

যুক্তপ্রদেশের ভিতর দিয়া পাঞ্জাব মেল ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিতেছিল। যোগেশ বাতায়ন পথে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, অনেক দূরে দিগন্ত ধূ ধূ করিতেছে—নিকটে শ্যামলিমার লেশমাত্রহীন ধূসর, ঊষর বিস্তীর্ণ মাঠ। পূর্বের আকাশে শিশু সূর্য তখনই যেন একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার।

তাহার মনে হইল যে, বাহিরের প্রকৃতি যেন তাহার অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। সে অনুভব করিল যে, তাহার বুকের মধ্যেও যেন অমনই ঊষর শূন্যতা খাঁ খাঁ করিতেছে।

অথচ কি যে তাহার আগে ছিল এবং কি হারাইয়া যে তাহার বুকের ভিতরটা অত শূন্য হইয়া গেল তাহা কিছুতেই সে ভাবিয়া পাইল না।

শোভার কথা, অমলের কথা, অতীশের কথা, এমন কি কামিনীর মা'র কথাও পুনঃ পুনঃ তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। ইহারা কখনও বা একা একা আবার কখনও বা সকলে একত্র হইয়া তাহার মনের প্রাঙ্গণে ভিড় জমাইয়া তুলিতে লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া নিজেকে নিজে সে বলিতে লাগিল, শোভা কোনদিনই তাহার কেহ ছিল না, আজও নাই।

আবার তখনই তাহার মনে পড়িল শোভার সেই অশ্রুকলঙ্কিত মুখ, যোগেশেরই কাছে আসিবার জন্য তাহার সেই সকাতর আগ্রহ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার যোগেশের স্মরণ হইল, শোভার ঘরে, শোভারই শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট তরুণ সুন্দর অতীশ—তাহার দৃষ্টিতে ব্যাকুল আগ্রহ; অর্ধশায়িতা শোভার চোখে, ওষ্ঠে ও গণ্ডে কৌতুকের চটুলতা, প্রসন্ন হাস্যের উজ্জ্বল দীপ্তি।

আসনের উপর নড়িয়া বসিয়া যোগেশ আবার বাহিরের দিকে চাহিল—যুক্তপ্রদেশের সেই ধূসর, ঊষর বিস্তীর্ণ মাঠ, যেন আগুনে পুড়িয়া খাঁক হইয়া গিয়াছে।

অমলের কথা তাহার স্মরণ হইল। অমল তাহাকে বলিয়াছিল, চিরদিনই সে শোভাকে ভালবাসিয়া আসিয়াছে।

চমকিয়া যোগেশ নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি সত্য সত্যই শোভাকে এতদিন সে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়া আসিয়াছে? তাহার বুকের ভিতরের আজিকার এই জ্বালা—এ কি তবে সত্য সত্যই ঈর্ষা?

সবেগে মাথা নাড়িয়া যোগেশ মনে মনে হইলেও স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করিল, না, না, না; এ তাহার ঈর্ষা নয়, ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা নয়—এ তাহার আহত অহঙ্কারের মৃত্যুশয্যায় আর্তনাদ মাত্র। এতদিন পরে শোভা যে একেবারেই তাহার কর্তৃত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে কেবল সেই কথা উপলব্ধি করিয়াই তাহার ক্ষমতাপ্রিয় অহমিকা অসহ্য বেদনায় গুমরিয়া মরিতেছে।

কিন্তু কারণ যাহাই হউক, যোগেশ তাহার নিজের অন্তরের আর্তনাদকে অস্বীকার করিতে পারিল না। বাহিরে উত্তাপ যতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার বুকের ভিতরের জ্বালাও যেন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

গাড়ীর চাকার অবিরাম ঘর্ঘর ধ্বনির ভিতর দিয়া অমলের কথা কয়টি যোগেশের কানের কাছে যেন বার বার বাজিয়া উঠিতে লাগিল—বুকের মধ্যে কেবল একটা মরুভূমিই তুমি বয়ে বেড়াবে যোগেশ!

ডাকগাড়ী পুঞ্জে পুঞ্জে ধূম ও ধূলি উড়াইয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

(২৮)

যোগেশ যে সত্য সত্যই কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছে, এ সংবাদ শোভার নিকট বহিয়া আনিল অমলের ভৃত্য হরি। তাহাকে শোভার কাছে পঁহুছাইয়া দিয়া কামিনীর মা চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল, "শোন বৌমা, এইবার তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে—এখন তোমার পথ একেবারে নিষ্কণ্টক হল।"

সংবাদ শুনিয়া শোভা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কামিনীর মা কণ্ঠস্বর আরও এক পর্দা উপরে চড়াইয়া কহিল, "আমাকেও এইবার বিদায় দাও বৌমা, তোমার ঘরসংসার তুমি বুঝে নাও। এখানে আমি আর থাকতে পারব না।"

শোভার চক্ষু দুইটি সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে শান্তকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, তাই ভাল। তুমি আজই এই বাড়ি থেকে চলে যাবে। আমার বাড়িতে আর একদিনও তোমার ঠাঁই হবে না।"

হরির দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তোমার বাবুকে একবার আসতে বলো হরি—বলো যে আমি ডেকেছি। এখন যাও।"

হরি ও কামিনীর মা বাহির হইয়া গেলে শোভা স্বহস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া প্রথমেই দেরাজ হইতে যোগেশের লেখা দানপত্রখানি বাহির করিয়া সেখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিল, তারপর শিয়রের দিকের টেবেলের উপর হইতে যোগেশের আলোকচিত্রখানি তুলিয়া লইয়া খোলা জানালা দিয়া সেখানি সে বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

কাঁচ ভাঙ্গিবার ঝন্ ঝন্ শব্দ নীচে হইতে উপরে ভাসিয়া আসিল, পরক্ষণেই শোনা গেল অনেকগুলি কণ্ঠের বিস্ময়, আশঙ্কা ও প্রতিবাদের সমবেত অনৈক্যতান। একটি হিন্দুস্থানী নারীর কণ্ঠ আর্তনাদের মত হইয়া অন্য কণ্ঠগুলিকে যেন ডুবাইয়া দিল।

নীচে কি হইল শোভা কিন্তু তাহা চাহিয়াও দেখিল না, সে সশব্দে বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

সে কাঁদিল না, ঘুমাইল না, উঠিলও না। শয্যায় চিৎ হইয়া শুইয়া সে সিলিংএর দিকে চাহিয়া রহিল।

বাহির হইতে কামিনীর মা যথাসময়ে তাহাকে স্নানাহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে শোভা তেমনই শুইয়া শুইয়াই তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাহাকে হাঁকাইয়া দিল।

বৈকালের দিকে অতীশ আসিয়া অভ্যাসমত রুদ্ধদ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া অন্যান্য দিনের মতই মৃদু, স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "মেজদি' ও মেজদি'।"

শোভা তথাপি উঠিল না, দ্বার না খুলিয়া শুইয়া শুইয়াই সে উত্তর দিল, "আমার শরীর ভাল নেই অতীশ, তুমি আজ যাও।"

রাত্রির দিকে ঝি ও দারোয়ান একত্র হইয়া আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে শোভার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। শোভা সেবারও দ্বার না খুলিয়াই সংক্ষেপে উত্তর দিল যে, সে ভালই আছে, তাহার জন্য কাহারও উদ্বিগ্ন হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

সত্যই যে তাহার কিছুই হয় নাই, বোধ করি তাহাই প্রমাণ করিবার জন্যই পরদিন শোভা সকালেই স্নান করিল, বাছিয়া বাছিয়া একখানি ভাল শাড়ি পরিধান করিল, মুখে স্নো মাখিল এবং তাহার

উপর খুব বড়, খুব উজ্জ্বল করিয়া ললাটে সিঁদুর ও তাহার নীচে কাঁচপোকার টিপ লাগাইয়া বাহিরে আসিয়া অমলকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দারোয়ানকে তাহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিল।

শোভাকে দেখিয়া অমলের কণ্ঠে সহসা ভাষা ফুটিল না। শোভা কিন্তু ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "ভাবছেন বুঝি যে এত ঘটনার পরেও যে মেয়ে এমন সাজগোজ করতে পারে, তার স্বামীর তাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। না?"

অমল কুণ্ঠায় সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গিয়া আত্মসমর্থনে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শোভা তাহাকে সে অবসরই দিল না। পরম সমাদরে তাহাকে বসিবার ঘরে বসাইয়া সে নিজে তাহার ঠিক সম্মুখে বসিয়া অকুণ্ঠিত, পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "কেবল একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য আপনাকে এত কষ্ট দিয়ে এখানে আনা। এ আমার অন্যায় নিশ্চয়ই, তবে আশা করি যে, এ অন্যায় আপনি মাপ করবেন।"

অমল বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

দুই চক্ষের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ ফুটাইয়া তুলিয়া শোভা তীক্ষ্মকণ্ঠে কহিল, "কেবল একটা কথা অমলবাবু। আচ্ছা বলুন ত, এইবার আপনার সব সাধ মিটেছে?"

প্রশ্ন বুঝিয়া অমলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে সঙ্কুচিতভাবে দৃষ্টি নত করিয়া কুণ্ঠিতকণ্ঠে কহিল, "আমার উপর আপনি অবিচার করছেন বৌদি'। এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব একটুও নেই; আমি বরং যোগেশকে—"

"বাঃ রে!" বাধা দিয়া শোভা লঘু পরিহাসের স্বরে কহিল, "আমি সেই অভিযোগ করেছি না কি? আমার প্রশ্ন খুব সরল—এইবার আপনার সাধ মিটেছে ত?"

অমল উত্তর দিতে পারিল না, একবার সলজ্জ ব্যথিতদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই সে আবার দৃষ্টি নত করিল।

শোভা কতকটা যেন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "উত্তর না দিলে আর কি করব! তা বসুন আপনি, আমি চা আনি।"

অমল সচকিতে সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "না না, চা থাক্। আমি দুদিন থেকেই যে কথাটা ভাবছি, তাই আপনাকে বলি। শুনবেন—মানবেন আমার উপদেশ?"

এইবার শোভা কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। অমলের মনের কথা সে ঠাহর করিতে পারিল না বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সে উত্তরও দিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু ইতস্তত করিয়া অমল দৃঢ়স্বরে কহিল, "যোগেশ লাহোর ফিরে গেছে, সেখানে চাকরি করবে বলে। আমার অনুরোধ, আপনি নিজেও সেখানে চলে যান। যোগেশ এখানে যা'ই বলে থাকুক না কেন, আপনি নিজে লাহোর গেলে সব গোলমাল চুকে যাবে। আর—" অমল একবার ঢোক গিলিয়া পরে বাক্যটি সম্পূর্ণ করিল, "আর তাতে সে হয়ত খুসীই হবে।"

শোভা অমলের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, চকিতে সে দৃষ্টি নত করিয়া লইল।

অমল সনির্বন্ধকণ্ঠে পুনরায় কহিল, "মানবেন আমার উপদেশ বৌদি'? যাবেন লাহোর?"

শোভা মুখ তুলিল না, ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে কহিল, "না।"

"কেন না?" সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বসিয়া অমল জিদ করিয়া কহিল, "এ ত আপনার অভিমানের সময় নয়। অভিমান করে' নিজের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনও নষ্ট করবেন?"

শোভা সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অমলের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "আপনার উপদেশের অপব্যয় করবেন না অমলবাবু। আপনার কথা যাঁর কাছে বেদবাক্য তাঁকে উপদেশ দিন গে'। আপনার উপদেশ ছাড়াও আমার চলবে।"

অমলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আপনি এখন কি করবেন?"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া শোভা উত্তর দিল, "করব আবার কি? থাকব এখানে, এই বাড়িতে। এ বাড়ি এখন আমার তা জানেন?"

"জানি", অমল উত্তরে কহিল, "কিন্তু শুনছি যে ঝি চলে যাবে। তারপর কে থাকবে এখানে আপনার সঙ্গে? কে আপনার তত্ত্বাবধান করবে?"

শোভার ওষ্ঠপ্রান্তে অদ্ভুত এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কঠিনকণ্ঠে কহিল, "কেন? অতীশ থাকবে। তাকে নিয়ে আমি এই বাড়িতে বাস করব—আপনাদের সমাজের বুকের উপর, আপনাদের সকলের চোখের সামনে।"

অমলের মুখের সমস্ত রক্ত দেখিতে দেখিতে যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেল, তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

শোভা যেন তাহা লক্ষ্যই করিল না, সে বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "যা আমার মনে ছিল না, তা আপনারাই আমার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বেশ, পারতেও এতদিন যা আমি করি নি, এবার থেকে তাই আমি করব।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

অথচ বৈকালে অতীশ শোভার খোঁজ লইতে আসিলে শোভা তাহাকে মোটে আমলই দিল না। একটা সেলাই হাতে তুলিয়া লইয়া উহারই মধ্যে আপনাকে সে যেন একেবারে ডুবাইয়া দিল।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করিবার পর অতীশ যেন আর থাকিতে না পারিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মেজদি', সেলাইটা কি খুব জরুরী?"

"না ত," শোভা উত্তর দিল, কিন্তু মুখ তুলিল না।

সেই আনত মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া অতীশ ঈষৎ বিরক্ত, ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "তবে ওটা এখন রাখ, রেখে আমার দু'একটা কথা শোন।"

হাতের সেলাইটি টেবেলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শোভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তোমার এখন চা চাই বুঝি?"

"না, চা চাই না," অতীশ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আমি কেবল বুঝতে চাই। সব কথা আজ আমি বুঝতে চাই।"

"না চাই না," শোভা হাসিয়া উত্তর দিল, "তোমার চাই চা, কিন্তু তার আগে চাই তোমার মুখ ধোওয়া। বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার; যাও, বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এস।"

অতীশ জিদ করিয়া কহিল, "না মেজদি', আমার প্রশ্ন আজ তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। এ অনিশ্চয়তা আর আমি সইতে পারছি না—আজ একটা বুঝাপড়া চাইই।"

"বাচালতা করো না অতীশ," শোভা তীক্ষ্মকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যা বলছি তাই কর। আগে মুখহাত ধুয়ে এস।"

অতীশ খপ করিয়া শোভার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "না মেজদি', একটা বুঝাপড়া আজ হওয়া চাইই চাই। তুমি সব কথা আজ আমায় খুলে বল।"

শোভা হাত টানিয়া লইল না, চকিতে একবার অতীশের

মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া যে হাতখানি অতীশ ধরিয়া ফেলিয়াছিল উহাই ঘুরাইয়া অতীশের হাত ধরিয়া তাহাকে সে বাথরুমের মধ্যে লইয়া গেল। চলিতে চলিতে সে কহিল, "তোমাকে নিয়ে আমার এক জ্বালা হয়েছে। চিরকাল কি তুমি এমন কচি ছেলেই থাকবে? নিজে থেকে কিছুই বুঝবে না?"

কিছুক্ষণ পর চা খাইতে খাইতে ঐ কথাটারই সূত্র ধরিয়া অতীশ কহিল, "আমায় কিছু বুঝতে দিচ্ছ না, সেইটাই তোমার বিরুদ্ধে আমার সব চাইতে বড় অভিযোগ। কিন্তু এ আর আমি চলতে দিব না। একটা স্পষ্ট জবাব এখন আমার চাইই—তোমার জন্যও চাই, আমার জন্যও চাই।"

শোভা অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে অতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, 'তাই হবে অতীশ, তবে আরও কয়েকদিন সবুর কর। এ কয়দিন বরং তুমি আর এখানে এসো না। সময় হলে আমিই তোমায় ডেকে পাঠাব।"

অতীশ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে গদগদকণ্ঠে কহিল, তাই ডেকো মেজদি'—যখন, যে মুহূর্তে তোমার দরকার হয়। যোগেশবাবুর কাছে ক্রমাগত তুমি কেবল আঘাতই পেয়েছ। সে আঘাতের বেদনা মুছে ফেলবার জন্য আমি প্রাণ দিয়েও চেষ্টা করব—এ কথা তুমি অবিশ্বাস করো না।"

(২৯)

দিন পনর পর একদিন সকালে শোভার দারোয়ান অতীশের কাছে গিয়া তাহাকে জানাইল যে, বৌদিদিমণির কাছে সেই মুহূর্তেই তাহার ডাক পড়িয়াছে, অন্য শত জরুরি কাজ থাকিলেও সব ফেলিয়া তখনই অতীশকে সেখানে যাইতে হইবে।

বিস্মিত অতীশের অনেকগুলি উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে দারোয়ান কেবল এইটুকুই জানাইতে পারিল যে, বৌদিদিমণি সেদিন সকালে উঠিয়াই বাক্স বিছানা গুছাইতে সুরু করিয়াছেন, ঐ রাত্রেই তিনি নাকি কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও যাইবেন।

শোভা নিজে অতীশকে দেখিয়াই সহাস্যকণ্ঠে কহিল, "আ, তুমি এসে বাঁচালে অতীশ। একা কি এই সব করা যায়!"

বিস্ময়, উদ্বেগ ও আশঙ্কায় কম্পিতকণ্ঠে অতীশ কহিল, কিন্তু ব্যাপার কি মেজদি'? এ বাঁধাছাঁদা কেন?"

"আমি আজই চলে যাচ্ছি ভাই, কাশী;" শোভা উত্তর দিল।

"কাশী?" অতীশ রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল।

"হ্যাঁ, কাশী। এবার এখানকার বাস উঠল।"

অতীশের কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সে পাংশুমুখে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

লক্ষ্য করিয়া শোভা কহিল, "অবাক হচ্ছ অতীশ? হবারই কথা। আমি নিজেই অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, এ ইচ্ছা আমার কেন হল।"

একটু থামিয়া মৃদু বিষণ্ণকণ্ঠে সে পুনরায় কহিল, "কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কোন উপায়ও নেই অতীশ। অনেক রকমেই সংসারকে আগলে ধরে থাকতে চাইলাম, কিন্তু সংসার আমায় চাইলে না। তাই যাচ্ছি বাবা বিশ্বনাথের কাছে,—দেখি, তাঁর পায়ের তলায় যদি একটু আশ্রয় পাই।"

"এ সব তুমি বলছ কি মেজদি'?" বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া অতীশ মহাবিরক্তকণ্ঠে কহিল, "এ পাগলামি কে তোমার মাথায় ঢুকালে, বলত? না, এ চলবে না", অতীশ মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "কেন? কি দুঃখে তুমি কাশী যাবে? সেখানে কার কাছে থাকবে তুমি? না, না, মেজদি', এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।"

"দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করছ ভাই? আমার দুঃখের কি সীমা আছে?" শোভা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "স্বামীর কাছে যে মেয়ের স্থান হল না, স্বামী যার সতীত্বকে পর্যন্ত অবিশ্বাস করলেন, তার দুঃখ জগতে রাখবার ঠাঁই নেই। এতদিন যে আশায় এইসব আঁকড়ে পড়ে ছিলাম সে আশাও যখন একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তখন আর এখানে থাকব কিসের জন্য? তাই আপাতত যাচ্ছি কাশীতে আমার জ্যাঠামশায়ের কাছে। তারপর"—বলিতে বলিতে শোভা থামিয়া গেল।

"তারপর কি?" অতীশ রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল।

একবার ঢোক গিলিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া শোভা কহিল, "শুনেছি কাশীতে নাকি অনেক আশ্রম আছে। খোঁজ যদি পাই, তারই একটাতে গিয়ে যোগ দেব।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল।

অতীশ মহা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "বল কি মেজদি'? যোগেশবাবুর মত অমন উন্মাদ, অমন পাষণ্ড—যে তোমার মত স্ত্রীর কদর বুঝলে না—তারই কাছে তোমার ঠাঁই হল না বলে তুমি এই বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হবে?"

শোভা অঙ্গুলীসংকেতে নিজের ললাট দেখাইয়া শান্ত, গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "অদৃষ্ট।"

অতীশ খপ্ করিয়া শোভার হাত দুইখানি নিজের দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া কতকটা আবদার, কতকটা অনুরোধ ও অনেকখানি আদেশ কণ্ঠস্বরের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া কহিল, "না মেজদি', এ কখনই হতে পারে না। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না। আর যাওয়াই যদি তোমার ঠিক হয়, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

নিজের হাত দুইখানি টানিয়া লইয়া শোভা শান্তকণ্ঠে কহিল, "পাগলামি করো না অতীশ, তা হয় না।"

"হয় না?" অতীশ দুই চক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গারের মত করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "আজ এতদিন পর তুমি বলছ, হয় না? এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে এতদিন এমন করে আমায় ভুলিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরালে কেন? ছি ছি, এই তোমাদের স্বভাব? না, ঠিকই হয়েছে তোমার শাস্তি। যোগেশবাবু ঠিকই করেছেন।"

শোভার মুখ অসহ্য ক্রোধে লাল হইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই একবারে ছাইএর মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কি একটা কথা বলিবার জন্য মুখ খুলিয়াও চেষ্টা করিয়াই ঐ ইচ্ছা দমন করিয়া তৎক্ষণাৎ সে খোলা স্টিল ট্রাঙ্কটির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অপরিসীম মনোযোগের সঙ্গে ভিতরের জিনিষগুলি গুছাইতে সুরু করিয়া দিল।

অতীশও আর কথা কহিল না, ঘরের মাঝখানে সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ঘণ্টাখানিক কাল কখনও বসিয়া, কখনও ছুটাছুটি করিয়া অনেকটা কাজ শেষ করিবার পর শোভা এক সময়ে হঠাৎ উপবিষ্ট অতীশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানি উপরের দিকে অনেকটা তুলিয়া সরস, সহাস্যকণ্ঠে কহিল, "কি খোকন? রাগ ভাঙ্গল?"

অতীশ তড়িৎস্পৃষ্টের মত নিজের মাথাটি দূরে সরাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শোভা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি হল? রাগ আরও বাড়ল নাকি?"

বার দুই ঢোক গিলিয়া অতীশ কহিল, "রাগ নয় মেজদি', এ দুঃখ। কি দুঃখ যে আজ আমার হচ্ছে তা যদি তুমি বুঝতে!"

মুখচোখের বিশেষ একটা ভঙ্গী করিয়া শোভা কহিল, "দুঃখ করার জন্য সারা জীবনই তোমার সামনে রয়েছে অতীশ। আজকের মত ঐ প্রক্রিয়াটি মুলতুবি রেখে তুমি যদি বাক্স, বিছানা গুছাবার কাজে আমায় একটু সাহায্য করতে ভাই, আমার উপকার হত।"

অতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তোমার সিদ্ধান্তই কি ঠিক মেজদি'? আজই কি তুমি চলে যাবে?"

"হ্যাঁ ভাই, আর দেরী করা চলবে না," শোভা উত্তর দিল।

"তোমার সঙ্গে কে যাবে?"

উত্তর হইল, "দারোয়ান।"

অতীশ স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

শোভা কতকটা যেন আপন মনেই কহিল, "তোমাকেও সঙ্গে নিতে পারতাম, তবে মানুষের বিষাক্ত রসনাতে আরও খানিকটা বিষ মাখিয়ে দেবার ইচ্ছে হয় না।"

রাত্রে ষ্টেশনে যাইবার পথে সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঐ কথাটারই সূত্র ধরিয়া অতীশ কহিল, "আমারই জন্য শেষে তোমার এই সর্বনাশ হল মেজদি'।"

"একের দোষে অপরের সর্বনাশ হয় না অতীশ," শোভা শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "সর্বনাশ হয় মানুষের যার যার নিজের দোষেই। আমার এই যে দুর্ভাগ্য, তার সব দায়িত্ব আমার। হয়ত আমিই ভুল করেছি।"

অতীশ চুপ করিয়া রহিল।

ষ্টেশনে অনেক ঠেলাঠেলি ও অনেক চেঁচামেচি করিয়া অনেক কষ্টে অতীশ যখন শোভাকে একখানি ইণ্টারক্লাশের মেয়েগাড়ীতে বসাইয়া দিতে পারিল, তখন গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতীশ আসবাবপত্রগুলি বাঙ্কের উপর গুছাইয়া রাখিতে লাগিয়া গেল।

শোভা কতকটা যেন অপরাধীর মত কহিল, "তোমাকে আজ সারাদিন অনেক কষ্ট দিলাম অতীশ।"

অতীশ চকিতে একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া প্রবলবেগে মুখ মুছিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শোভা কহিল, "তুমি আগে নাব; গাড়ী ছাড়বে এখনই।"

অতীশ কিন্তু নামিল না, প্রণাম করিবার অজুহাতে সহসা শোভার পা দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। তাই এমন অনেক ভুল আমি নিজে করেছি যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আজ তোমাকে। আমায় মাপ করো মেজদি'।"

অতীশকে হাত ধরিয়া তুলিয়া শোভা কহিল, "না, গোড়ার ভুল আমারই। এ শাস্তি আমার ন্যায্য প্রাপ্য।"

গার্ডের বাঁশী বাজিল। শোভা কহিল, "গাড়ী এখন ছাড়বে, তুমি নাব।"

অতীশ নামিতে না নামিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু সেই চলন্ত গাড়ী হইতেই জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া অতীশের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া শোভা অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, "তোমার মেজদি'র একটা কথা রাখবে ভাই?"

গাড়ীর সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে অতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

কণ্ঠস্বর ঈষৎ নত করিয়া শোভা কহিল, "মিস সেনকে তুমি বিয়ে করো অতীশ, না হয় আর যাকে তোমার পছন্দ হয় কিন্তু বিয়ে তুমি অবশ্য করো,—এমন একা আর থেকো না বল, আমার কথা রাখবে?"

অতীশ মুখ তুলিয়া শোভার মুখের দিকে চাহিতেই উভয়ের চোখাচোখি হইয়া গেল।

কিন্তু গাড়ীর গতিতে তখন বেগ আসিয়াছে। উহারই টানে শোভার হাত হইতে অতীশের হাতখানি ছাড়িয়া আসিল

অতীশের আর উত্তর দেওয়া হইল না, কিন্তু তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শোভার মুখখানিও দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

—শেষ—

বহুরূপী জীবদেহ

—ভাস্করাচার্য—

জীব সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সুরাহা হ'লেই চোখে পড়ে জীবদেহ। কিন্তু সেই দেহ যদি একই রকম হ'ত, ভাবনা ছিল না। বলা যেত জীব শিবই হোন বা ক্রমোদ্ভূতই হোক—তার বাইরেকার রূপটা এই। কিন্তু মুস্কিল এই দেহ এক রকম নয়। একটা গেরস্থ বাড়ির শিশুর চোখে পড়ে বেড়াল, গরু, হাঁস, কুকুর ইত্যাদি; তেমন ভাগ্যবান শিশু হ'লে বাড়িতে দেখবে ময়ূর, নানারকম পাখী (কোকিল, টিয়ে, তোতা, ময়না ইত্যাদি), গিনিপিগ্, খরগোস, রকমারি কুকুর। এরা কেউ একরকম নয়। এদের ডাক একরকম নয়। এদের আচরণ একরকম নয়। ক্রমে শিশু একথাও জান্তে পারে যে কুকুরের বাচ্চা কুকুরই হয়। দেশী কুকুর—বিলাতী কুকুর। বিলাতী কুকুরেরই কত নাম। শিশু ক্রমে এখবরও পায় যে, অমুকের বাড়িতে দার্জিলিং থেকে যে ভুটিয়া কুকুরটা আনা হয়েছিল সেটা এখানে এসে বাঁচেনি—বড্ড গরম।

ছেলেমেয়েরা পিঁপড়ের কামড় খায়: লাল পিঁপড়ে, কালো পিঁপড়ে, গুঁড়ো পিঁপড়ে, ডেঁয়ো পিঁপড়ে। খাটে ছারপোকা আছে, দেয়ালে টিক্‌টিকি আছে; পুকুরে মাছ আছে, ঝোপে সাপ আছে, ডোবায় ব্যাঙ আছে। উই আছে ইঁদুর আছে, তেলাপোকা আছে, মাছি আছে, মশা আছে। আফ্রিকার জঙ্গলে বা প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় না গিয়েও এত জীবদেহের সাক্ষাৎ মেলে তাই ঢের—অগুণতি।

এরা জন্মাচ্ছে মরছে, কমছে বাড়ছে। নানারকমে মরছে নানারকমে জন্মাচ্ছে। ছারপোকার জ্বালায় মানুষ অস্থির; মাছির ভন্‌ভনানিতে উদ্‌ব্যস্ত। কে কতটা বা কি পরিমাণে বাড়ে বা সংখ্যাবৃদ্ধি করে তার হিসেব মানুষের নখাগ্রে। জলের অতিকায় তিমি ডাঙ্গার অতিকায় হাতী—এবার জীবনধারা মানুষ জানে। আরও জানে আরও অতিকায় ও অতি অদ্ভুত জীব পৃথিবীতে ছিল; তারা আজ নেই। এরা কিসে মরে তারও হদিস্ মানুষের জানা আছে। কিন্তু পারস্পরিক শত্রুতার মধ্যেও জাতি হিসেবে এরা বেঁচে আছে। ছাঁটি কলেও ইদুঁর নিঃশেষ হয়নি, ফ্লিট ছড়িয়েও মশা যায়নি।

আজকে এরকমই মনে হবে বটে। কারণ চাক্ষুষ কাউকে তো লুপ্ত হ'তে দেখা যাচ্ছে না! যারা আছে তারা আছেই। কিন্তু কঙ্কাল নিয়ে মাটির স্তর নিয়ে যাঁরা ইতিহাস পড়েন তাঁরা বলেন, এরা যে কেবল মরে আর জন্মায় এমন নয়, গোটা জাত মরে "ভূত" না হোক্ লোপ পেয়ে যায়।

মানে, মরে সব্বাই—যেমন খায় সব্বাই। সারাটা শীতকাল অহিরাজ হাত পা গুটিয়ে লুকিয়ে মুদ্রাযোগাভ্যাসে অনশন ধর্মঘট ক'রে থাক্‌তে পারেন কিন্তু গ্রীষ্ম বর্ষায় বুভুক্ষার যে ছট্‌ফটানি সুরু হয় তাতে মানুষ পর্যন্ত পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে। এই ধরুন না, যাকে বলা হয় উপোসী ছারপোকা!

মরাবাঁচার এমনি কতকগুলো নিয়ম আছে যেগুলো সব জীবদেহের সাধারণ ভূমি বলা যেতে পারে। জীবদেহের আদিম প্রয়োজনকেও বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, মোটামুটিভাবে এদের খাদ্য বা অখাদ্যের সাধারণ তালিকা রচনা চলে। সাপ আর মানুষ দুজনেই মুরগীর ডিম খায়—সাপ পেলে মানুষকে কামড়ায়। গেরস্থ ঘরে মাছি, ইঁদুর, পিঁপড়ের হাত থেকে খাবার সাম্‌লাতেই গেরস্থকে অস্থির হ'তে হয়। এই গরুতে কচি ডাঁটাগুলো সব খেয়ে ফেল্‌ল, ঐ বেড়াল মাছ নিয়ে পালাচ্ছে—গেরস্থ বাড়ির এ হৈ চৈ সর্বজনীন ও চিরন্তন।

যে বিষে মানুষ মরবে মানুষ বেছে বেছে সেই বিষই ইঁদুরকে কুকুরকে খাওয়ায়। সমস্ত জীবের মধ্যেই রোগের

আদি বিমানচারী

একটা সাধারণ রীতি আছে। কারণ রোগটাও পরস্বাপহারী জীবের আক্রমণ মাত্র—প্রত্যক্ষ উকুনের মত। বাসা বাঁধে জীবে জীবে লড়াই হয়, যার মরবার—সে মরে। সাপের বিষে মুরগীও মরে, মুরগীখেকো মানুষও মরে। পিঁপড়ের কামড়ে যে বিষ আছে তার হাত থেকে রেহাই আছে কিন্তু এর হাত থেকে নেই।

দেহের রাসায়নিক বিশ্লেষণেও এই ঐক্য পাওয়া গেছে। পরমাশ্চর্য এই, শারীরতাত্ত্বিকেরা এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দেহে গাঠনিক ঐক্য পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন। মানুষ মাছ খায়, মানুষ ঘোড়ায় চড়ে—কিন্তু মাছ, ঘোড়া ও মানুষের শিরদাঁড়া চোখ ইত্যাদির মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। আরও গভীরে গিয়ে দেখা যায় সবাই কোষী জীব।

এমন ঐক্যের আবিষ্কারের পর মানুষের বুদ্ধিতে একটা যোগসূত্র আবিষ্কারের ইচ্ছা জাগাটা স্বাভাবিক। তাঁরা অনেক পরিশ্রম ক'রে, অনেক বর্তমান ও অতীত তথ্য ঘেঁটে এ

প্রশ্ন তুল্‌লেন, এরা কি সবাই আদিতে এক বংশজাত নয়? একই উৎপত্তি থেকে এরা কি আসে নি?

এই উৎপত্তির তত্ত্ব যিনি লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচার ক'রতে গিয়ে সর্বাধিক অপ্রিয় হয়েছিলেন এবং আজ যাঁর খ্যাতির অবধি নেই তিনি হচ্ছেন স্যার চার্লস ডারুইন। তাঁর "প্রজাতির উৎপত্তি" ও "আমাদের আদিপুরুষ" মনুষ্য জীবনে কাব্যের স্থান অধিকার করেছে।

যে কোন একটি জীবদেহ ধরে পিছোলেই এ খবর পাওয়া যায় যে, তাদের বর্তমান আকৃতি বা প্রকৃতি ঠিক এরকম ছিল না। আজকের মানুষে আর আগেকার মানুষে ঢের তফাৎ। নূতন জন্মের মানেই নূতনত্ব। যেকথা মানুষের সম্পর্কে সত্য সেকথা সব জীবদেহের পক্ষেই সত্য। সবারই পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে জীবদেহ এগোচ্ছে। এটা

ফলখেকো বাদুড় দুলতে দুলতে বাচ্চাকে আদর করছে

কল্পনা করতে পারা যায়, এমনি পরিবর্তন যদি অবিশ্রাম ঘটতে থাকে তবে একদিন এমন হবে যে আজকের পরিবর্তিত জীবদেহটি মূল জীবদেহ থেকে পৃথক্ হবেই।

ডারুইন তাঁর "প্রজাতির উৎপত্তি" বইখানার অবতরণিকায় ব'লেছেনঃ

"এটা কল্পনা করতে পারা যায় যে, জীবসমূহের গোড়াসূত্র নিয়ে বিচার করতে গিয়ে প্রকৃতিবিদ্‌রা দেহী জীবের পারস্পরিক আত্মীয়তা, তাদের ভ্রূণ কুটুম্বিতা, তাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি, উৎপত্তির পর্যায়ক্রম এবং অন্যান্য এ ধরণের ঘটনা ভেবে এই উপসংহারে পেঁাছোতে পারেনঃ বিভিন্ন প্রজাতীয় জীব স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয়নি, শাখাপ্রশাখার মত, অন্যান্য প্রজাতীয় জীব থেকে সমুদ্ভূত হ'য়েছে।"

তিনি আরও ব'লেছেন,

"আমার দৃঢ় ধারণা যে, প্রজাতিরা কেউ অমর নয়; শাখা-প্রশাখা যেমন কোন একটা প্রজাতি থেকে প্রসূত বলে গ্রাহ্য হয়েছে, ঠিক তেমনি যেগুলোকে একই বংশগত বলা হচ্ছে, সেগুলো অন্য কোন একটা প্রজাতি, সাধারণত বিলুপ্ত প্রজাতিরই ধারা।"

প্রকৃতিবিদ্‌গণ হামেসা জলবায়ু ও খাদ্যাদি বাহ্যিক পরিবেষ্টনীর কথা এই রকমভেদের কারণ বলে উল্লেখ ক'রে থাকেন। ডারুইন বলেন, একদিক থেকে একথা সত্য হ'তে পারে; কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্যিক পরিবেষ্টনীকেই দায়ী ক'রলে অসংগত হবে।

ডারুইন পরিবর্তনের দুটো বাহন (বা কারণ) বাৎলেছেন। একটা দেহাভ্যন্তরীণ আর একটা তার বাহ্যিক পরিবেষ্টনী। পরিবেষ্টনীর প্রভাব জীবের ওপর দুভাবে কার্যকরী হতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক দেহের ওপর অথবা পরোক্ষভাবে জননেন্দ্রিয়ের ভেতর। প্রত্যক্ষটি আবার দুরকমঃ দৈহিক স্বভাব ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। প্রথমটা মুখ্য বলে মনে হয়। কেননা, যদ্দুর দেখা গেছে, স্বতন্ত্র অবস্থায়ও এমনি রকমভেদ হয়ে থাকে; পক্ষান্তরে, বিভিন্ন রকমভেদ একই অবস্থায় দেখা দেয়। অনেকগুলো সামান্য সামান্য পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—খাবারের পরিমাণের ওপর আকার, খাবারের গুণের ওপর রং, চামড়ার স্থূলতা আর জলবায়ু থেকে চুল ইত্যাদি।

একই দেশে পালিত হ'য়ে একই খাবার খেয়ে লক্ষ ব্যষ্টির গঠনের তারতম্য এমন অদ্ভুতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোনটিকে "বিকৃত" বলতে ইচ্ছে যাবে। কিন্তু বিকৃত আর সামান্য রকমভেদের মাঝখানে কোন সীমারেখা টানা যায় না। একত্র সমাবিষ্ট বহু ব্যষ্টিতে সামান্য অথবা খুবই স্পষ্ট—এমন গাঠনিক পরিবর্তনমাত্রকেই প্রত্যেক ব্যষ্টি-দেহের ওপর জীব-পরিস্থিতির অপরিমিত পরিণতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। শৈত্যের অনুভূতিটা সব্বার একরকম নয়। যার যার শারীরিক অবস্থা ও গঠনের ওপর শৈত্য অনুরূপ অপরিমিত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য একযাত্রায় পৃথক্ ফল হয়; কারো হয় কাশ বা সর্দি, কারো বাৎ, কারো বা অঙ্গপ্রদাহ। আবার এমনও আছে যার কিছুই হয় না।

দুই নম্বর জননেন্দ্রিয়। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তনে পর্যন্ত কী আশ্চর্যরকম প্রভাব যে জননেন্দ্রিয়ের ওপর হ'তে পারে, তার নিঃসংশয় প্রমাণের অভাব নেই। একদিকে চোখে পড়ে, গৃহপালিত জন্তু ও গাছপালা তাদের সহজ রুগ্নতা ও দৌর্বল্য সত্ত্বেও বন্ধতার ভেতর নিঃসংকোচে বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছে। অন্যদিকে চোখে পড়ে, যাদেরকে বাচ্চাকালে পোষমানা অবস্থায় দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য-সম্বলসহ স্বাভাবিক বেষ্টনী থেকে নিয়ে আসা হ'ল কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে যাদের সন্তানোৎপাদন-যন্ত্রাদি অক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, তারা বন্ধাবস্থায় এসে, রীতিমত না হ'লেও তাদের পিতামাতা থেকে ভিন্ন রকমের বাচ্চা দিতে সুরু

কর্‌লে। ডারুইন বলেন, এদেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ডারুইনের মতে জীবই প্রাথমিক; একে সক্রিয়, অক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে তার আবেষ্টনীর প্রক্রিয়া ও প্রভাব অস্বীকার্য কিন্তু সে গৌণ। তিনি বলেন, এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক হ'চ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এথেকে আমরা বুঝতে পারব কেন দু'জায়গাকার বাহ্যিক পরিস্থিতি এক হওয়া সত্বেও বিভিন্ন আকৃতির জীব বসবাস করে থাকে।

জীব জীবের জন্ম দেয়, পুনসৃষ্টি করে। পুনসৃষ্টির সঙ্গে বংশক্রমিকতা জড়িত। কিন্তু সন্তানোৎপাদনের হারটা অনাবশ্যকরকমে এতই বেশী যে সমজাতীয় জীবের মধ্যে লাগে স্থিতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক জীব থেকে অন্য জীব আত্মরক্ষা করতে চায়; একজন আর একজনকে মেরে নিজে পুষ্ট হতে চায়। আমার মাথার উকুন আমার মাথায় ঘা করে বাসা বাঁধ্‌তে চায়; আমি চাই তাদের নির্বংশ করতে—দুজনই আমরা বাঁচ্‌তে চাই। মাথার উকুন যদি বেশী হ'য়ে পড়ে, তাদের খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহে যদি অপ্রাচুর্য ঘটে তবেই হবে উকুনে উকুনে মারামারি, স্বজাতিবিরোধে তারা এমন একটা সংখ্যায় হ্রাস পাবে যেখানে বিজয়ী অবশিষ্টেরা আবার কিছুদিন বসবাস করতে পারে। মানুষও যদি তেম্‌নি হয় বেশী, খাদ্যাদি যদি হয় কম, তবে মানুষে মানুষে করবে লড়াই, মানুষের সংখ্যা পাবে হ্রাস। এমনি করে লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে আসবে সমতা। এ ব্যাপারে দুর্বলের মৃত্যু, সবলের জয়জয়কার, দুর্বলের বংশলোপ, প্রবলের বংশবৃদ্ধি ও প্রসার। জন্ম হয় লাফিয়ে লাফিয়ে দ্বিগুণ ছন্দে, খাদ্যবৃদ্ধি ঘটে ধীরে মন্থর-গতিতে এক পা এক পা গুনে; তাই চাই মহামারী দুর্ভিক্ষ, লড়াই।

স্থিতির লড়াইয়ে এই হিংসুটেপনা সমজাতীয় জীবেই সব চাইতে বেশী নিষ্ঠুর ও ভীষণ। এই থেকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন, সর্বশ্রেষ্ঠের জয়কেতন উড়িয়ে দে'য়া—বিজেতার রকমভেদের বংশক্রমিক চলচ্ছক্তি। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, জন্ম ও জন্মদানটা বড় ব্যাপার। আবার সে ব্যাপারে যৌন নির্বাচনটা আরও গভীর তত্ত্ব। জন্মলাভ করবে তারা যারা প্রবল পক্ষ, জন্মদান করবে তারা যারা বৃহত্তর ও ক্ষমতাসম্পন্ন। এ হ'ল জাতি ও প্রজাতির কথা; এক জাতির ভেতর শ্রেষ্ঠতর প্রজাতি বৃদ্ধি পাবে; এক প্রজাতির ভেতর প্রবলতর ব্যষ্টি বংশবৃদ্ধি করবে। তাহ'লে *সমশ্রেণী জাতি বা প্রজাতি-সম্ভূত হ'লেও যে প্রবলতম সে-ই যৌন ব্যাপারে নির্বাচিত হবে, আর সকলের হবে পরাজয়।*

মোট কথা, যে জিত্‌লো সে প্রবল ব'লেই জিত্‌লো। কাজেই, সে যে-বংশধরের সৃষ্টি করবে তা প্রবলই হবে এবং তারাই টিঁক্‌বে। এই জেত্‌বার কৌশলে তাদের একটা বৈশিষ্ট্যও এসে গেল; তা থেকে এল রকমভেদ; অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনটা যেন ছাক্‌নি; রদ্দি মাল সব বাইরে থেকে যাচ্ছে, ভাল যা-কিছু তা ছাড়পত্র পাচ্ছে। এই থেকে মহান্ মহত্তর হ'চ্ছে। এই কারণেই যারা মহত্তর তারাই বেঁচে যায়, যারা দুর্বলতর তারা থাকে না; আজ পর্যন্ত সৃষ্টির যা কিছু গেছে তা পরাজিত হয়েই গেছে; যা এসেছে তা জয়ডংকা বাজিয়েই এসেছে। এই আক্রমণ পরিক্রমণ চল্‌ছেই—অবিরাম অবিশ্রান্ত। বর্ণসংকর যদি হয়ে থাকে তবে সেও এই জন্যই; প্রকৃতির নিয়মে জারজ বলে কোন গালিগালাজ নেই। কেউ অংক কষে সজ্ঞানে এ নির্বাচন চালাচ্ছে না। ঘটনাসংযোগে এ অপ্রতিহত হয়ে চলেছে। পুরানো রূপের বিলুপ্তি নূতন রূপের আবির্ভাবে অনিবার্যক্রমে হয়ে থাকে। এক পুরুষের নিকৃষ্টতা পরবর্তী পুরুষে বর্তায়; এম্‌নি করে সেই প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যায়। একবার তিরোহিত হ'লে আর তার আবির্ভাব ঘটে না। প্রবলপক্ষই বিস্তৃতভাবে ছড়ায় এবং তাদের মধ্যেই বেশী রকমভেদ দেখা দেয়; এই রূপান্তরিত বংশধরেরা চায় পৃথিবীকে আকীর্ণ করতে। তাই স্থিতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা হীনতর তাদের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়; প্রবলতর জায়গা জুড়ে বসে; মনে হয় পৃথিবীটা বুঝি একদিনেই বদ্‌লে গেছে। এই করে তাদের দেহগঠনও যে বদ্‌লে গেছে কংকালবিদ্‌দের এ ধারণা মোটেই ভিত্তিহীন নয়।

ভূতত্ত্ব স্পষ্টই বল্‌ছে যে, প্রত্যেক জমির বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটেছে। তা' থেকে এ মনে করা যেতে পারে যে, দেহী-জীব প্রকৃতির আওতায় রূপান্তরিত হয়েছে—বুনো হাঁস মুরগী আর গেরস্থঘরের হাঁস মুরগীতে যেম্‌নি তফাৎ। অবশ্য রূপান্তরের ছন্দ অত্যন্ত মন্থর।

পরিবর্তন সম্বন্ধে ডারুইনের কোন সন্দেহই নেই। একই জাতীয় জীব ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক নির্বাচনে রূপান্তরিত হ'য়ে স্বতন্ত্র প্রজাতি শাখাপ্রশাখা বসবাস বা প্রবাস সুরু করেছে এবং তাদের ওপর আবার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটেছে, রূপান্তর ঘটেছে। জীবের রকমভেদ এই ক'রেই এলো।

অর্থাৎ জীবের সঙ্গে জীবের সম্পর্কটাই সর্বাগ্রগণ্য; তাই থেকেই রকমভেদ, স্বাতন্ত্র্য; ডারুইনের মতে রকমভেদের অন্য কোন কারণ যদি থেকে থাকে তবে তা' হবে গৌণ। একই প্রজাতির অন্তর্বিরোধ। বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে যে লড়াই তাও যেমন সত্যি, একই জাতীয় জীবের অন্তর্বিরোধও তেম্‌নি সত্যি। বানরে ও মানুষে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে যেমন সত্যি, মানুষে মানুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তেমনি সত্যি। কেননা বিবর্তনের নিয়মানুযায়ী আদিতে জীবের একটি মাত্র রূপই ছিল।

মানুষ রূপান্তর মাত্র, বানর রূপান্তর মাত্র, পশুপক্ষী সবই রূপান্তর মাত্র—কেবল কালক্রমে তারা বিশিষ্টাকৃতির ও বিভিন্ন প্রকৃতির হয়েছে।

ডারুইন, অবশ্য, একথাও স্বীকার করেছেন যে, রকমভেদের আইনকানুন সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা বিপুল। তবে অভ্যাস থেকে গাঠনিক বৈশিষ্ট্য—ব্যবহারে সবলতা, অব্যবহারে পঙ্গুতা ও অঙ্গহ্রাস অনেকক্ষেত্রেই বেশ কার্যকরী দেখা গেছে। যোগীরা যে যা অভ্যাস করেন তাই যোগাভ্যাস। ঊর্ধ্ববাহুর হাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। বাঙালী কলমধরা

(শেষাংশ ২৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নূতন পৃথিবী

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

অফিসেই শরীরটা ভাল লাগছিল না। ছুটি নিয়ে এলাম ছুটি হবার আগেই। বাড়ি এসেও সমস্ত শরীরটা যেন আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছিনে। ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়েছি সত্য; কিন্তু শরীরের কোথায় যেন এক দীর্ঘ ফাটল ধরেছে।

আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিশেষ কিছুই ত নয়। ছোট্ট, নিতান্তই ছোট্ট একটি ব্রণ হয়েছে ঠোঁটের কাছে। কিন্তু সেই ছোট্ট একটুখানি একটু ব্রণের মাঝে এক অদৃশ্যমান যন্ত্রণা যেন পক্ষী শাবকের মত ডানা মেলে ঝট ফট করছে।

মুহূর্তের মধ্যে চেহারাটাই বা হয়েছে কি রকম।

না। জানিয়ে কাউকে কাজ নেই। কাল সারা রাত জেগে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম। বোধ হয়, সে জন্যেই শরীরটা তেমন ভাল নেই। তা ছাড়া আর কি!

তবু কাকে যেন বললামঃ আইডিন আছে। আইডিন? আইডিন? কি হবে আইডিন দিয়ে।

উত্তর দিতে ভাল লাগছে না। আইডিন লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার আসবার এ সময় নয়। স্ত্রী এবং বৌদি—ওরা দু'জনেই বাড়ি নেই। রোজকার মত সম্ভবত আশেপাশের কোন বাড়িতেই গেছেন বেড়াতে। সমস্ত দিন খাটে বেচারারা!

কিন্তু ক্রমশই যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে উঠছি। অসহ্য একটা যন্ত্রণা যেন ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে। এমন ত আমার কোন দিনই হয় নি।

তবু ভাগ্য ভালই বলতে হবে।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। কন্যার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। চার বছরের শিশুটি অতক্ষণ অন্য বাড়িতে থাকতে রাজি নয়। বোধ হয়, আসবার তাগিদ দিয়েছে অনেক-বার, তাতে কিছু হয়নি—অগত্যা লাগিয়েছে অব্যর্থ কান্না।

সেই কথাই স্ত্রী ঢুকতে ঢুকতে বলছিলেনঃ মেয়েটাও হয়েছে এমনি—কোথাও দু' দণ্ড বসবার জো নেই।

কিন্তু ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে অবাক হলেন।

বললেনঃ আজ এত সকালে যে?

হাসতেই চেষ্টা করলামঃ আসতে নেই—না?

স্ত্রী হাসলেন।

রসিকতা করতেও ছাড়লাম নাঃ ভাবলাম, অসময়ে ঘরে ঢুকে দেখব কোন্ প্রেমিকের সাথে বসে গল্প-গুজব করছ, তা না—ঘরেই নেই। তা ঘরে অনেক অসুবিধে ঠিকই।

এক সময়ে এ-সব কথার উত্তর স্ত্রী দিতেন এবং ভাল ক'রেই দিতেন। আমার বিবাহের পূর্বে নাকি কার কার সাথে অনিবার্য প্রেম ছিল, এ-সব কথারও উল্লেখ করতে ছাড়তেন না। কিন্তু কন্যার মাতা হ'বার পর কিই যে হয়েছেন! সেই কুড়ি বছরেই নাকি একেবারে বুড়ি হয়, ঠিক তাই। অবশ্য বয়স ওঁর ঠিক কুড়িই।

কোন উত্তর দিলেন না স্ত্রী।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমার শরীরটা কিন্তু ভাল দেখছিনে। কি হয়েছে বলত?

বললামঃ হ্যাঁ। শরীরটা ভাল নয় ব'লেই চলে এসেছি সকাল সকাল। মুখে একটা ব্রণের মত হয়েছে।

স্ত্রী বললেনঃ দেখেছি। কিন্তু দিয়েছ কি?

বললামঃ আইডিন।

তিনি বললেনঃ ভালই হয়েছে। কাল রাত জেগে ছিলে। বললে ত শুনবে না। বসে বসে লেখা আর বসে বসে পড়া এইত কাজ।

অবাক না হয়ে পারিনে। এক মাস কোন কাগজে কোন রচনা না বেরোলে স্ত্রীর আমার অভিযোগের অন্ত থাকে না, কিন্তু ছাপার সেই অক্ষরগুলি যে গুনে গুনে আগে কাগজে আমাকেই লিখতে হয়—সে কথা স্বীকার করতে তার আপত্তি নেই—যত আপত্তি বসে বসে লেখা।

কিন্তু যাক্ সে কথা। কাল রাত জাগার জন্যেই যে এতটা অবসন্ন হয়েছি, তাতে আর ভুল নেই।

একটা গুণ আমার স্ত্রীর আমি লক্ষ্য করেছি। অসুখ-বিসুখ দেখে সহসা চঞ্চল হয় না। তাঁর বাবা ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারের মেয়ে ডাক্তার হয়নি, কিন্তু রোগের ব্যাপারে ডাক্তারের সহিষ্ণুতা পেয়েছে।

স্ত্রী বললেনঃ চা ক'রে আনছি। চা খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—ঠিক হ'য়ে যাবে এক্ষুণি।

বললামঃ সেই ভাল। কিন্তু চায়ে চিনিই দিও, নুন যেন দিও না।

এর একটা ইতিহাস ছিল। এবং এ ইতিহাস আমার কাছে ছিল দুর্লভ। শুনে স্ত্রী হেসে চলে গেছেন।

আমিও হাসলাম।

আর এখনও ভাবছি এই ভেবে যে, নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে লিখতে বসেছি কিনা গল্প। রাজকন্যা সেই—নেই তার কাঞ্চী মেখলা। প্রেমও নেই—নেই তার তরঙ্গময় যৌবন কল্লোল...শুধু কি না ব্রণ আর আইডিন...আর না নিয়েই কিনা লিখতে বসেছি এক গল্প।

কিন্তু এখনকার ভাবনা এখন থাক। আসা যাক্ বিগত পরিচ্ছেদে। চঞ্চল মুখর আলোর স্পর্শ আমার ঘরের মধ্যেও এসে পেঁাচেছে। বড় রাস্তা দিয়ে মটরটা ধক্ ধক্ করতে করতে চলে গেল। ওপাশের পার্ক হতে ছেলেদের হল্লা শুনতে পারছি। তারুণ্যের সজীবতায় তারা আনন্দ করছে।

ধূসর পৃথিবী নানা রংয়ে এখন সুন্দর হয়ে উঠেছে। চারদিকে প্রাণময় সুর আর গন্ধ। ভাল লাগছে। বেশ ভাল লাগছে। পৃথিবী যে এত সুন্দর ভুলেই গিয়েছিলাম যেন। মহানগরকে এতোদিন শুধু ভেবেছি একটা যান্ত্রিক সভ্যতার ইতিবৃত্তভাবে। কিন্তু আজ তাকে যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে আমরা দুচোখে যা দেখি তাই সব নয়। আরো আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এক জিনিসই এক এক ভাবে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের যাযাবর বৃত্তিতে আমরা

জিনিষ তৈরী করিবেন, আমি আর একটা জিনিষ তৈরী করিব ইত্যাদি ধরণের অনেক কথা বলিয়া উপরের তর্ক খণ্ডাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু যেভাবেই বলুন, যন্ত্রশিল্পী যদি সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করে তবে সর্বখাদ্যসার 'ক্ষুধান্তক বটিকা' আবিষ্কার না করিয়া সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উপায় নাই। একমাত্র উপায় কলহ, মারপিট, যুদ্ধ, ধ্বংস।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা খণ্ডাইবার আর এক উপায় এই যে, যখন যন্ত্রশিল্পের উপরিউক্ত সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে তখন একই কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করিবার জন্য সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া পর পর কাজ করিবার মত লোকের অভাব হইবে না। আমার ছেলেকে আমার স্ত্রী সপ্তাহে এক ঘণ্টা দেখিবেন, আপনার স্ত্রী আর এক ঘণ্টা দেখিবেন, রামের স্ত্রী আর এক ঘণ্টা দেখিবেন, রহিমের স্ত্রী আর এক ঘণ্টা দেখিবেন। আবার আপনার ছেলেকে আমার স্ত্রী এক ঘণ্টা দেখিবেন, রামের স্ত্রী আর এক ঘণ্টা দেখিবেন ইত্যাদি। এ যেন সেই পুরাণো গেঁজেলের গল্প—আমি তোমাকে পেঁৗছে দেই, আবার তুমি আমাকে পেঁৗছে দাও। অবশ্য জমির উর্বরতা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা দশ গুণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে একজন চাষীকে দশ ঘণ্টার স্থলে এক ঘণ্টা কাজ করিলেই চলিতে পারে নতুবা ক্ষুধান্তক বটিকা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

(ক্রমশ)

বহুরূপী জীবদেহ

(২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা করায় আজ যেমন বন্দুক পাকড়ানোর কাজে বাতিল হয়ে গেছে। বিবর্তনবাদের হিসেব অনুযায়ী মানুষ এককালে "গেছো" ছিল; পরে যখন চারটে হাতকে বা চারটে পা কে দুটো হাত আর দুটো পায়ে ভাগ করল তখন তার রকমটাই গেল বদলে। পায়ের বৈশিষ্ট্য হ'ল দাঁড়ানো, হাতের কাজ হ'ল ধরা—আর সর্বাঙ্গে এল ঋজুতা। যা ছিল হরাইজেণ্টাল তাই হ'ল পারপেণ্ডিকিউলার; মানুষের সমস্তটা ভার পর্যায়ক্রমে পায়ের গোড়ালি আর আঙুলে এসে ঠেক্‌ল—পেটের ওপর পড়্‌ল মস্ত চাপ। তাইথেকে হার্নিয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য হ'য়ে রইল। মেরুদণ্ডের ঢঙটা গেল আগাগোড়া বদলে। আজ আর তার চলনভঙ্গি জান্তব নয়।

নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে প্রজাতির পুরোনো অভ্যাসও বদলাতে পারে; অথবা এর এমন রকমারি অভ্যাস হ'তে পারে যা ঐ প্রজাতি সমধর্মীর কারও নেই।

ডারুইন বহুরূপী জীবদেহের যে তত্ত্ব উদ্ঘাটন ক'রলেন তাতে প্রথমে যে মুগ্ধ বিস্ময় জেগেছিল এবং এহেন অশাস্ত্রীয় কথার বিরুদ্ধে যে ধর্মের চীৎকার উঠেছিল তা এককালে থিতিয়ে গেল।

তারপর এল তর্কের ঝড়—প্রলয়ংকর-ঝড়—ডারুইনতত্ত্ব যায় যায়!

নূতন পৃথিবী

(২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ঐত ঐত সেই হারানো জগত্। যে জগতকে আমি কখনও দেখিনি—যে জগতের কত কথা কত সময় কতদিন সবাই আমরা আলোচনা করেছি, ঐত সেই জগত্। লোকজন—হৈ হৈ। আমাদের জগতের বাইরে একটা বিরাট জগত—যার খোঁজ আমরা কেউ জানতাম না।

কিন্তু চোখের সামনে সূর্যোদয়ের মত স্নিগ্ধ দুটি চোখ আমার ঝাপসা চোখের মধ্য দিয়েও ফুটে বেরুচ্ছে।

শরীরটা যেন হাল্‌কা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ব্যথা যেন কমে গেছে। নূতন জগৎ যেন আমাকে আগ্রহে কাছে ডাকছে।

কিন্তু এ শুভ মুহূর্তে এত কান্না কেন! শুধু কান্নাই শুনতে পারছি। কারা কাঁদছে—কি হয়েছে আমার?

কিন্তু সে যাত্রা আমি বাঁচলাম। আমার নাকি কঠিন অসুখ হয়েছিল। মৃত্যুকে আমি দেখিনি। মৃত্যুর রূপ আমি অনুভব করেছি। অত্যন্ত কঠিন কাল্পনিক মূল্য দিয়েই তা করতে হয়েছে—পৃথিবীর পরপারে আরেক নূতন পৃথিবীর সুস্পষ্ট রূপ আমি দেখতে পেরেছি। আর দেখেছি বাস্তব জগতের বিচিত্র অনুষ্ঠান। মৃত্যুর রূপ দেখেছি আমি মিনতির চোখে—সেই প্লাবনের জলস্রোতে আর অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মুখে।

মিনতি ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। হাসতেও চেষ্টা করল বুঝি। ধীরে ধীরে তার দিকে তাকালাম। তার দুচোখ জলে ভরে এল। এতদিন সে কাঁদেনি। কিন্তু আজ সে চুপ করে থাকতে পারল না।

এও কি মৃত্যুরই আর এক সুস্থ প্রকাশ?

অন্ধকার হয়ে এসেছিল—মিনতি উঠে আলোটা জেবলে দিল।

প্রাণের টান

মহারাজকুমারী শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী

একে অমাবস্যার রাত তার উপর কাল মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কড় কড় শব্দে মেঘের ডাকে অনিমার বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, যদি শ্যামল না আসে—সে কি চিরদিনের মত তার কাছে বিদায় নিল? কিন্তু সে ত বিশেষ কোন অপরাধই তার কাছে করে নি। শ্যামল কি তবে অনিমার স্নেহের মূল্য একটুও দেবে না, সে কি তাকে একেবারেই ভুলে যাবে?

অনু, অনু, তুই ওখানে কি কচ্ছিস্, এই ঝড় জল মেঘ ডাকছে, আর তুই অমনি করে জানালায় দাঁড়িয়ে?

—যাই মা।

—একি বাপু, পরের ছেলে তার জন্যে কি অত ভাবলে চলে! রাগ করে গেছে, আবার দুদিন পরে ফিরবে, এত যত্ন পাবে কোথায়।

শৈলদেবী বুঝলেন না আজ অনিমার মনের গতি। জোয়ারের জল যেমন সামনে যা কিছু পায় তাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোন বাধাই সে মানে না, আজ অনিমার মনের অবস্থাও তাই, কারও কোন কথাই শোনে না, শুধু চোখ দিয়ে তার ঝরে পড়ে অজস্র জল।

সত্যই ভুলেছে শ্যামল অনিমাকে। কতকগুলো দিন চলে গেছে, কই অনিমাকে ত সে লিখেও জানায় নি এক কলম—"দিদি ভাল আছি আমি।"

অনিমা আজ বোঝে সে নিজেকে, কেনই বা শ্যামলের মনে থাকবে অনিমাকে। প্রথমত তার নিজের ভাই নয় শ্যামল, আর দ্বিতীয় কি? অনিমা যে বিধবা, তার মনে স্বস্তি দেবার ইচ্ছা কারও কি হতে পারে? পৃথিবীর আদি থেকে বর্তমান, এই ত সংসারের রীতি, সমাজের নিয়ম।

—বলি ও অনু, অমনি করে নিজের শরীর পাত করবি? যাই সবাইকে বলিগে, একটা কাগজে ঐ কি বলে বিজ্ঞেপন না কি দেয় তাই দিতে বলি, বলেন শৈলদেবী।

অনিমা বোঝাতে পারে না তার মনের ব্যথা, তার বুকের স্নেহ ভালবাসা জমাট বেঁধে পাথরের মত তার মনটাকে পিসে দিতে চায়। অনিমা ভাবে, সে যদি না বাল্যে বিধবা হ'ত, তার যদি স্নেহ দেবার একটা কেউ আবার থাকত, তাহলে আজ শ্যামল তার এই ভাঙ্গা মনটাকে নিয়ে আরও ভেঙ্গে এমন করে ছিনিমিনি খেলতে সাহস পেত না।

দেখতে দেখতে কতকগুলো বছর চলে গেছে, কিন্তু শ্যামলের দিদি বলে ডাকা আজও অনিমার কানে ভেসে আসে, আর একে একে তার মনে অতীতের দিনগুলো সিনেমার ছবির মত পর পর চলে যায় তার চোখের উপর দিয়ে।

একদিন শ্যামলকে কোলে করে দুধ খাইয়েছে অনিমা, হঠাৎ শ্যামল দিলে দুধের বাটী উল্টে, অনিমা তাকে দিলে দুটো থাপ্পর। শ্যামল রাগ করে গেছল ঘোষেদের বাড়ি, কিন্তু সে তার দিদিকে ছেড়ে একটুও থাকতে পারলে না, আবার ছুটে এসে ডাকলে দিদি। কিন্তু এতগুলো বছর চলে গেল, শ্যামল তো আর এল না, তার অভাগী দিদিকে একবারও ডাকলে না। অনিমা ভাবে তার এমন কি অপরাধ সেদিন হয়েছিল, সে শুধু বলেছিল, শ্যামল তুমি যৌবনে আত্মহারা হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেল না, এই ত তার অপরাধ।

সে ত কোনদিনই মনে করে নি যে, শ্যামলকে পথ হতে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছি, তার স্বাধীনতায় আঘাত দিয়ে তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবো! শ্যামল যে তার স্নেহের আধার, অন্ধের নয়ন।

রোজই অনিমা সকালে উঠে খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে যায়, যদি শ্যামলের সন্ধান কোথাও এতটুকু মেলে। কিন্তু আশা তার একদিনও পূরণ হয় না, ব্যর্থতার ব্যথায় বুকটা তার ভরে যায়। কিন্তু আজ আর তা হল না। কাগজে একটা খবর পড়ে ব্যথার বদলে এল তার চিন্তা।

দিদি, আমার খুব অসুখ তুমি এস, আমার ভুল বুঝো না। —তোমার শ্যামল।

এই ত তবে ডেকেছে তার শ্যামল। তার দিদিকে কি সে কখনও ভুলতে পারে! কিন্তু এ ডাকের অপেক্ষা সে যদি কোনদিনই অনিমাকে না ডাকত, সেও যে ছিল ভাল।

অনিমার চিন্তা স্রোতের তৃণের মত ভেসে চলতে লাগল।

মা-ও মা!

—কিরে অনু!

—আমার একটা কথা শুনে যাও।

অনিমার কত দিন পরে এই আগ্রহের ডাকে কতকটা আশ্চর্য হয়েই ছুটে এলেন শৈলদেবী।

দেখ মা দেখ, আমায় ডেকেছে আমার শ্যামল। আনন্দে ও চিন্তায় আজ আত্মহারা অনিমা।

অনু, তুই কি তার কাছে যাবি? বলেন শৈলদেবী।

—সে কি মা, যাব না? শ্যামল আমায় ডেকেছে তার অসুখে। এখন কি আমি অভিমান করতে পারি?

অনিমা আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। ছুটে চলে এল শ্যামলের কাছে কলকাতায় একটি ভাঙ্গা জীর্ণ বাড়িতে।

—দিদি, তুমি আমার উপর খুব রেগেছ না?

—শ্যামল, তুমি বড় দুর্বল, এখন আর তুমি কথা বলো না।

—আচ্ছা দিদি, আমাদের দেশের লালদীঘির ধারে বকুল-গাছটি কত বড় হয়েছে? নবুদের কুকুরটা এখনও বেঁচে আছে ত? হরিদের পুকুরে এখনও সেই রকম বড় বড় মাছ পাওয়া যায়?

—চুপ কর শ্যামল, ডাক্তারবাবু এলে রাগ করবেন।

—দিদি, এবার একটি কথা বলে চুপ করবো। তোমার কাছ ছাড়া বার বছর, এর মাঝে আমি কতদিন খেতে পাই নি, কতদিন ফুটপাতে শুয়ে কাটিয়েছি। দিদি আমি নিজে যত

কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু তোমায় যে আরও কষ্ট দিয়েছি, এই কথা মনে হতেই আমার নিজের গলা নিজেই টিপে ধরতে ইচ্ছা করছে—বলেই শ্যামল হাঁপাতে লাগল।

—আর কথা বলো না শ্যামল—বলতে বলতে অনিমার স্বর ভারী হয়ে উঠল, শত চেষ্টাতেও অনিমার চোখের জল বাঁধ মানলো না।

দিনে দিনে সুস্থ হয়ে উঠল শ্যামল দিদির যত্নে। দিদির স্নেহ তাকে ঘিরে রেখেছে চারিধার, এতে কি শ্যামল ভাল না হয়ে পারে!

একের পর এক করে নির্বিবাদে দিনগুলো চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা দিন খানিকটা জমাট অন্ধকার নিয়ে শ্যামলের সামনে এসে দেখা দিল। অনিমাকে সাংঘাতিকভাবে বসন্ত আক্রমণ করলো। সেদিনের রাত বড় ভয়ঙ্কর—প্রকৃতি যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছেন। ঝড়, জল, বজ্রাঘাত। কলিকাতা মহানগরী নিঝুম, গাড়ি ঘোড়া ত দূরের কথা, একটি মানুষ অবধি যাতায়াত করছে না। শ্যামল তার দিদিকে নিয়ে বসে আছে, আর তার মনের মধ্যে কে যেন বলছে, শ্যামল! আজ তার জীবনে সুখের শেষ। না, না, একি হয়! তার দিদি যদি তাকে ছেড়ে যায়—সে কি সহ্য করতে পারবে? তার আজ মনে হচ্ছিল, সে ছুটে চলে যায় তার যা কিছু পরিচিতের নাগালের বাইরে।

—শ্যামল!

—দিদি, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না শ্যামল, আজ শান্তি পাব, অনেক ব্যথা বুকে আমি বয়েছি। আজ আমায় শান্তি দাও, মুক্তি দাও—বলেই অনিমার জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

—দিদি, দিদি তুমি যেও না, আমি তোমায় অনেক আঘাত দিয়েছি, আজ আমায় ক্ষমা করে বুকে টেনে নাও।

অনিমা এবার কথা বলতে পারলে না, দুফোঁটা চোখের জলে জানিয়ে গেল শ্যামলকে, শত অপরাধ করলেও দিদির বুকে ক্ষমা চিরদিনই।

—দিদি, তোমার শ্যামল তুমি নিয়ে যাও—বলেই আছড়ে পড়ল দিদির বুকে শ্যামল।

তখন সবে মাত্র পূব আকাশে লাল রংয়ের তুলির আঁচড় কে টেনে দিয়ে অনিমার যাত্রার পথটাকে রাঙিয়ে দিয়েছে।
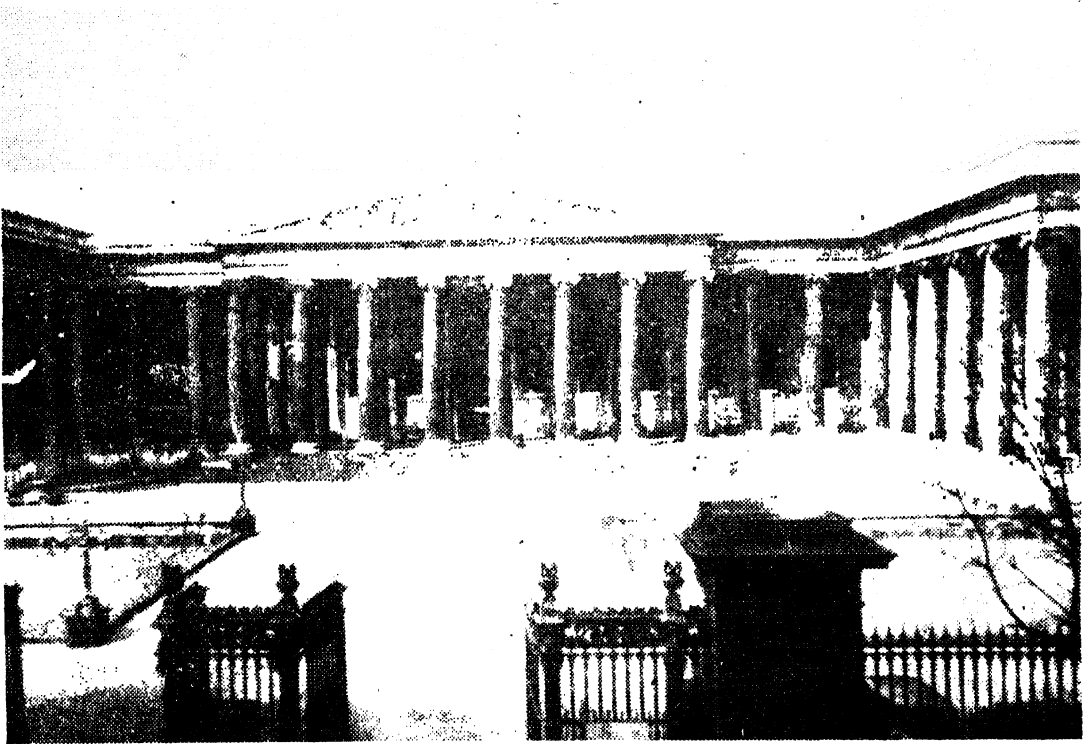
লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়াম: সম্প্রতি জার্মানির বিমান আক্রমণে ইহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে

পদকর্তা "চম্পাতি"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

সুপ্রসিদ্ধ পদসংগ্রহ "পদকল্পতরু" গ্রন্থে ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৫৩২, ৭২৫, ১৬৫৮, ১৬৬৪, ১৬৭৪, ১৭৪৪, সংখ্যক নয়টি পদ 'চম্পাতি' ভণিতাযুক্ত। ইহার মধ্যে পাঁচটি মানের পদ এবং চারিটি মাথুর বিরহের পদ। পদগুলি কবিত্বপূর্ণ, পদের ছন্দ এবং ভাষাও ভাবের অনুরূপ। কিন্তু ১৬৭৪ সংখ্যক পদটি লিপিকর প্রমাদে চম্পাতির ভণিতায় পদকল্পতরুর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। স্বর্গগত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সংকলিত "চণ্ডীদাস" পদসংগ্রহ গ্রন্থে এবং অপরাপর হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথির মধ্যে এই পদ "চণ্ডীদাস" ভণিতায় গৃহীত হইয়াছে। রামগোপাল দাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ "রসকল্পবল্লীতে" এই পদের দুইটি ছত্র "মহাজনের গীতপদ্য" বলিয়া উদ্ধৃত আছে। চম্পাতির অপরাপর পদের সঙ্গে এই পদের ভাষারও ঐক্য নাই, এই পদটির ভাষা খাঁটি বাঙলা। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই পদের অবিকল দুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই পদটি যে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পদকল্পতরুতে পদের "কলি"গুলি উল্টাপাল্টা হইয়া আছে। আমরা নিম্নে সমগ্র পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

> ওপারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
> পাখী হঞা উড়ি জাঙ পাখা না দেয় বিধি॥
> যমুনাতে দেঙ ঝাঁপ না জানো সাঁতার।
> কলসে কলসে সেচোঁ না ঘুচে পাথার॥
> মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
> সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
> আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
> হাথের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
> আগুনিতে দেঙ ঝাঁপ আগুনি নিভায়।
> পাষাণেতে দেঙ কোল পাষাণ মিলায়॥
> তরুতলে জাঙ বড়াই সেহ না দেয় ছায়া।
> যার লাগি মুঞি মরো সে হইল নিদয়া॥
> কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর বরে।
> ছটফট করে প্রাণ বঁধু নাহি ঘরে॥

পদকর্তা চম্পাতির আজ পর্যন্ত বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় নাই। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় পদামৃত সমুদ্রের টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন—"শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজান্য মহাপাত্রঃ চম্পাতি রায় নামা মহাভাগবত আসীৎ স-এব গীত কর্তা। তস্য সিদ্ধি দশয়োর্মপি তন্নাম।" অন্যত্র ঐ টীকা—"চম্পাতি রায় নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ স এব গীত কর্তা।"

চম্পাতি যদি সিদ্ধ নাম হয়, তাহা হইলে পদকর্তার প্রকৃত নাম কিছু ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজের একটি মানের পদে "রায় চম্পাতি"র নাম পাওয়া যায়। (পদসংখ্যা ৫৩১) —"রায় চম্পাতি বচন মানহ দাস গোবিন্দ ভাণ।" ইহা হইতে "চম্পাতি" সিদ্ধ নাম বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত নাম না হইয়া ইহা উপনাম হইতে পারে। গোবিন্দ কবিরাজের পদে তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন পদকর্তা ও ধনী ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত হইবে না, যে চম্পাতি রায় ও গোবিন্দ দাসের সমসাময়িক পদকর্তা। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর ইঁহাকে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "রায়" উপাধি ইঁহার খ্যাতির পরিচায়ক, "চমূপতি" শব্দ রূপান্তরিত হইয়া চম্পাতি হইয়াছে কিনা ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলিতে পারেন। "চমূপতি" ও "বাহিনীপতি" শব্দ একার্থ বাচক। ইহা লইয়া একটা অনুমান করা চলে।

(১৩৪৭) চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষে বন্ধুবর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম এ মহাশয় "বাসুদেব সার্বভৌম" নাম দিয়া তথ্যপূর্ণ একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি উড়িষ্যাতে সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্বভৌমের বাঙালীত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। অপিচ এই প্রবন্ধ হইতে আমরা সার্বভৌমের পুত্র পৌত্রেরও পরিচয় পাইয়াছি। আমরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই মূল্যবান গবেষণার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"কাশীর সরস্বতী ভবনে বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র (জলেশ্বর) বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য বিরচিত 'শব্দালোকোদ্যোত' গ্রন্থের সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি আছে। (ন্যায় বৈশেষিক ৩৫৮নং পুঁথি, 'পত্রসংখ্যা ৫২, লিপিকাল ১৩৪২ সম্বৎ) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই অজ্ঞাতপূর্ব গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়া বাঙালী এক মহা নৈয়ায়িকের লুপ্ত কীর্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাসুদেবের জীবদ্দশায় রচিত হইয়াছিল। এবং গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণের কোন দেবতাকে নমস্কার না করিয়া নিজ পিতৃদেব সার্বভৌমের বন্দনা করিয়া অপূর্ব দুইটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

> নৈগমে বসতি নৈপুণং বিধেঃ সার্ব্বভৌম পদ সাভিধং মহঃ।
> জীর্ণ তর্কতনু জীবনৌষধং জৈমিনেস্তর্য়তি জঙ্গমং যশঃ॥ ১
> কংসারিপোরবতারে বংশে বৈশারদে জাতং।
> উত্তংসং খলুপুংশং তং বন্দে সার্ব্বভৌমাখ্যাং॥ ২

* * * উক্ত জলেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র মহাপণ্ডিত স্বপ্নেশ্বরাচার্য শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্য শেষে আত্মপরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন*—

> গৌড়ক্ষ্মাবলয়ে বিশারদ ইতি খ্যাতাদভূদ্ভূমণেঃ
> সর্ব্বোর্ব্বীপতি সার্ব্বভৌম পদভাক্ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ।
> তস্মাদাস জলেশ্বরো বুধবরো সেনাধিপঃ ক্ষ্মাভৃতাং
> স্বপ্নেশেন কৃতং তদঙ্গজনুষা সদ্ভক্তি মীমাংসনম্॥
> (শাণ্ডিল্য সূত্র মহেশ পালের সং পৃঃ ১০৯)

*বাসুদেব সার্বভৌমের পিতার নাম নরহরি বিশারদ, মাতার নাম ভাগিরথী।

ঐ সংখ্যা ভারতবর্ষে ভট্টাচার্য মহাশয় মহেশ মিশ্রের কুল পঞ্জিকা হইতে ইহার সমর্থক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"সার্ব্বভৌমস্য ক্ষেম্য সুং রাঘব চক্রবর্ত্তী চং পরমানন্দ চং মুকুন্দ ভট্টাচার্য্যঃ—তৎসুতৌ জলেশ্বর চন্দনেশ্বরৌ। জলেশ্বরস্য বাহিনীপতি খ্যাতি লভ্য চং কৃষ্ণানন্দ আর্ত্তি গাং দ্বৌ তৎ সুতাঃ সপনেশ্বর নীলকণ্ঠ গোপীনামাঃ"........ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র জলেশ্বরের বাহিনীপতি উপাধি ছিল। জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর পিতাকে "সেনাধিপঃ ক্ষ্মাভৃতাং" বলিয়াছেন। জলেশ্বর গোবিন্দদাসের সমসাময়িক, অনুমিত হয় ইনিই চম্পতি ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীচৈতন্যদেবের শাখা গণনায় সার্বভৌমের পর জলেশ্বর ও স্বপ্নেশ্বরের নাম পাওয়া যায় না। তথাপি স্বপ্নেশ্বরকে শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্য করিতে দেখিয়া মনে হয়, সার্বভৌমের ভক্তিধারা পৌত্র পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। জলেশ্বরের যে শ্লোক পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে 'কংসারিপোরবতারে' 'শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অবতার' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং জলেশ্বরও শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবানরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার পক্ষে পদাবলী রচনা অসম্ভব মনে হয় না। সেকালে শাক্ত শৈব সম্প্রদায়ের কোন কোন কবি, এমন কি মুসলমান কবিগণ পর্যন্ত পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেকালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়াও সার্বভৌম-পুত্র জলেশ্বরের মত পণ্ডিত ও কবির পক্ষে পদাবলী রচনা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত পদাবলীর দুইটি সংস্কৃত কবিতার নীচে রচয়িতারূপে "জীবদাস বাহিনীপতি", "বাহিনীপতি" নাম দেওয়া আছে। জীবদাস বাহিনীপতি কোন পৃথক্ ব্যক্তি, কিন্তু যে কবিতাটির নীচে কাহারো নাম না দিবা মাত্র "বাহিনীপতি" উপাধিটি লিখিত আছে, সে কবিতা জলেশ্বর বাহিনীপতিরও রচিত হইতে পারে। বাহিনীপতির সংস্কৃত কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সান্দ্রানন্দ মনন্তমব্যয়মজং যদ্যোগিনোঽপিক্ষণং
সাক্ষাৎ কর্ত্তুমুপাসতে প্রতিদিনং ধ্যানৈকতানাঃ পরং।
ধন্যাস্তা ব্রজবাসিনাং যুবতয়স্তদ্ব্রহ্মযোঃ কৌতুকা-
দালিঙ্গন্তি সমালপন্তি শতধা কর্ষন্তি চুম্বন্তি চ॥

'যে অনন্ত অব্যয় অজ আনন্দ ঘনমূর্তিকে মুহূর্তমাত্র প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যোগিগণ একাগ্রধ্যানে প্রতিদিন উপাসনা করিয়া থাকেন, ধন্যা ব্রজযুবতীগণ নিরন্তর তাঁহার সহিত কৌতুকালাপ করেন, তাঁহাকে শতবার আকর্ষণ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া থাকেন।'

আমরা নিম্নে চম্পতি ভণিতার দুইটি পদ তুলিয়া দিলামঃ—

॥ দুর্জয় মান ॥ শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি—

অখিল লোচনতম তাপ বিমোচন
—উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি বুঝলু তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তর আহিরিণি জাতি॥
সকল জীবজন জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুসীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে॥
থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ যো সকল শরীরে।
কাগজপত্র পরশে যব নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥
খেলে খেলে সকল কুসুম মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখি মাঝে।
চম্পতি পতি অতি আকুল তো বিনু
বিখাদ না পায়সি লাজে॥

॥ মাথুর বিরহ ॥ শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ ॥

ধায়ল বিরহিণী কালিন্দি রোধ।
সহচরি বচনে না মানে পরবোধ॥
মাতল করিনি যৈছে গতি ধাব।
ঐছে চললি কোই লাগি না পাব॥
অতি দুরবল পুন পড়ি সোই ঠাম।
মুরছিত হই তঁহি হরল গেয়াল॥
শ্রবণে বদল দেই কহে শ্যাম নাম।
চেতন পাই কহে কাঁহা ঘনশ্যাম॥
সখিগণ সেই করু কুঞ্জ পরবেশ।
চম্পতি পতি হেরি তনু ভেল শেষ॥

চম্পতির পদগুলি "চম্পতিপতি" এইরূপ শ্লিষ্ট ভণিতাযুক্ত। মাত্র ৪৮১ সংখ্যক পদে "চম্পতি" ভণিতা আছে। চম্পতি ভণিতাযুক্ত দুই একটি পদ হাতের লেখা পুঁথিতে ভূপতি ভণিতায় পাওয়া যায়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯

একতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দুইখানা হেলান-চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া দেহের নিম্নাংশ রৌদ্রে প্রসারিত করিয়া দিয়া লাবণ্য ও সুলেখা রোদ পোহাইতেছিল।

উভয়ের মধ্যে কাহারও মনের সুস্থির স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না বলিয়া পরস্পরে কথাবার্তাও বিশেষ কিছু হইতেছিল না। দুইজনেরই মন পরিপূর্ণ হইয়াছিল অবনীশের কথা লইয়া একটা প্রবল ঔৎসুক্যে। কিন্তু সেই ঔৎসুক্যের সহিত মিশ্রিত ছিল—লাবণ্যর মনে প্রধানত উদ্বেগ এবং সুলেখার মনে প্রধানত কৌতুক।

অবনীশের রুমাল যে যথাবাঞ্ছিত কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, লাবণ্যর স্তব্ধ-গভীর ভাব হইতে সুলেখা তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়াছিল; কিন্তু অপর দিক হইতে তদ্বিষয়ে কোন কথা উঠিবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নির্বাক থাকিলে ভবিষ্যতে অপর পক্ষের মনে সংশয় এবং অশান্তি প্রগাঢ়তর হইবার যুক্তিলাভ করিবে ভাবিয়া গতরাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে সে নিজের দিক হইতে কোন কথাই উত্থাপিত করে নাই।

স্বামীর নিষেধ-বাক্য স্মরণ করিয়া লাবণ্যও সঠিক কিছু জানিবার পূর্বে এ বিষয়ে সুলেখাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। অথচ মনের মধ্যে এই গুরুভার ঔৎসুক্য বহন করিয়া অনল্প কাল সুলেখার পাশে শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার উপযুক্ত ধৈর্যেরও তাহার অভাব ছিল। তাই সুলেখার দিক হইতে কথাটা উঠাইবার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সে বলিল, "গৌরহরির মতো একটা অত্যন্ত বদলোককে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাদা অতিশয় গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন।"

লাবণ্যর মনে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে মুখে উদ্বেগের কপট চিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া সুলেখা বলিল, "আবার কি হ'ল দিদি?"

বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে লাবণ্য বলিল, "কেন, তুই কি কিছু জানিস নে সুলেখা?" বলিয়া এই তথ্য নিষ্কাশক প্রশ্নের উত্তরে সুলেখা কি বলে শুনিবার জন্য তীক্ষ্ণনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া লাবণ্যর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া মৃদুকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "দাদা ত' দুদিন পরে আসছেন, তিনি এলে যা ভাল মনে হয় কোরো।"

"কিন্তু তার আগে এ দু'দিন?"

"এ দু'দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে;—এর মধ্যে সে আর এমন কি কাণ্ড করবে।"

লাবণ্য বলিল, "দু'দিন ত' দু'দিন, দুষ্টু লোকে দু' ঘণ্টাতেই কাণ্ড করতে পারে।"

সুলেখা বলিল, "তুমি কি ওকে সেইরকম দুষ্টু মনে কর?"

দৃঢ়কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "নিশ্চয় করি। তুই করিসনে না কি?"

গতরাত্রের কথা স্মরণ করিয়া সুলেখা মনে মনে বলিল, "আমিও করি।" তাহার পর মুখ নাড়িয়া এক দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ তোমার দুষ্টু লোক আসছে।"

ইমারতের ধারে ধারে সাদা ঘুটিং-এর অপ্রশস্ত রাস্তা। লাবণ্য চাহিয়া দেখিল, সেই রাস্তা ধরিয়া অবনীশ তাহাদের দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবনীশ নত হইয়া হইয়া দুইবারে দুইজনকে অভিবাদন করিল; তাহার পর দক্ষিণ হস্তখানা শূন্যে উল্টাইয়া দিয়া মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "চাকরী হয়ে গেল!"

অবনীশের কথা লাবণ্য বুঝিতে পারিল না; বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে বলিল, "কি বলছ?"

"বলছি, তার ওপর এই—জরিমানা!" বলিয়া অবনীশ দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলী বিসরিত করিয়া দেখাইল।

অবনীশের স্বেচ্ছাজড়িত এ কথাও লাবণ্য বুঝিতে পারিল না; শুধু 'জরিমানা' শব্দের শেষার্ধটুকু শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মানা?"

অবনীশ বলিল, "সিঁড়ি মাড়াতে মানা।"

বিরক্ত হইয়া লাবণ্য বলিল, "ও-রকম ক'রে আস্তে আস্তে জড়িয়ে জড়িয়ে বলছ কেন? জোরে স্পষ্ট ক'রে বল।"

আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া অনেকটা স্পষ্ট কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "জোরে বললে সায়েব শুনতে পাবেন বারান্দার উপরে গিয়ে বলব মেমসায়েব?"

বিরক্তি, ক্রোধ এবং কৌতূহল—তিনই লাবণ্যর মনে উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জয় হইল কৌতূহলেরই; ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে সে বলিল, "এস।"

অনুমতি পাইবামাত্র ফুলগাছের টব ডিঙ্গাইয়া অবনীশ এক লম্ফে বারান্দার প্রান্তভাগে উঠিয়া পড়িল, তাহার পর মুহূর্তের মধ্যে রেলিং টপকাইয়া লাবণ্য ও সুলেখার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আসিবার ক্ষিপ্রগতি এবং অদ্ভুত পথ দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া উঠিল; বিস্মিতকণ্ঠে সে বলিল, "এ কি!" পাশে সিঁড়ি থাকতে এমন লাফালাফি ক'রে এলে কেন?"

অবনীশ বলিল, "বললাম ত' মেমসায়েব,—এ বাড়ির

বৈষ্ণব সাহিত্য

আপনারা আমার কাছ থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিয়াছেন। আমার পক্ষে এ আদেশ পালন করা বড়ই কঠিন, প্রথমত বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কিছুই নাই; দ্বিতীয়ত এই সব আলোচনা করিতে গেলে কতকগুলি পরিভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। অথচ সেই সব পরিভাষা আজকালকার বাঙালী শিক্ষিত সমাজে অনেকটা অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চেয়ে পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা আমরা সহজে বুঝি এবং সেই সব পাশ্চাত্য পরিভাষা ব্যবহার করাই এদেশে সভ্যরুচিসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশের বৈষ্ণব সাধকদের বিশিষ্ট পরিভাষা বর্জন করিয়া বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গেলে মুস্কিল একটা এই দেখা দেয় যে, তেমন সতর্কতার ফলে রসের সূত্রই ছিন্ন হইয়া যায়। রসের তোড়ের ভাব যেমন সহজ সরল হইয়া ভাষাতে ফুটে, বিচারের উপর দৃষ্টি রাখিতে গেলে তাহা হয় না, বিষয়টি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত হয় মাত্র; কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথম কথাই হইল এই যে, এ জিনিষ আলোচনার চেয়ে অনুভবের বস্তু বেশী; ইহার ব্যক্তিই হইল অব্যক্তির উৎসের সঙ্গে মনের যোগ। এ জ্ঞান হইল, যে জ্ঞান গোপনের খবর দেয়,—'জ্ঞানং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং' বলাটা এখানে যাহা বলা যায় না এমন রসের সঙ্গে সূক্ষ্ম মনের সংযোগ মাত্র। সোজা কথায় ভাষা এখানে ভাবের রাজ্যে মনকে লইয়া যায়। বিচারবিতর্ক ছাড়িয়া অবিচারিত উপলব্ধির মধ্যে মনকে নিমগ্ন করিয়া ফেলে।

মাধুর্যের গুণ হইল ইহাই এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বরূপ হইল এই মধুরতা। মানুষের মনের ধর্মই হইল এই মধুরতার সন্ধান, অন্য কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, এই মধুরতাই মানুষের স্বভাব, ইহাতেই তাহার স্বাচ্ছন্দ্য। আমরা সকলেই খোঁজ করি মধুরের। মন খোঁজে মধুরকে, ইন্দ্রিয় সন্ধান করে মধুরের। কিন্তু মধুরকে আমরা পাইয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না: কারণ যে জিনিষ খুঁজি তাহাই যদি পাই, তবে প্রাপ্তিতে আর ছেদ ঘটে না, পাওয়া জিনিষ আর অনিত্য থাকে না। যে জিনিষ মধুর বলিয়া আমরা মনে করি আবার কিছুকাল পরেই সে জিনিষ অমধুর বলিয়া বুঝি, আর সে জিনিষ ছাড়িয়া অন্যত্র মধুরের খোঁজে ছুটাছুটি করি। বলিতে গেলে আমরা যে স্তরের জীব, সে স্তর শুধু অনুমানের স্তর, প্রতীতির স্তর, প্রত্যক্ষতার স্তর নয়। আমরা যেন মধুরের রাজ্যে ছিলাম, সেই মধুরকে হারাইয়াছি এবং তাহারই খোঁজ করিতেছি। আমাদের মন বল পায় যখনই কোন জিনিষকে মধুর বলিয়া বুঝে, তাহা যতটুকু সময়ের জন্যই হউক। এই মধুর বলিয়া দেখা এবং বুঝাটা হইল স্মৃতির কাজ। যে জিনিষ আমার চেনা আছে, তাহাকেই নূতন করিয়া পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ। এই জন্যই নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিলেন মনের স্মরণ প্রাণ। কবি কালিদাসের 'রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' শ্লোকটি সাহিত্যিক আপনারা, আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, আমাদের এই যে স্মৃতি ইহা সত্য স্মৃতি নহে, এ স্মৃতি নিত্য নয়। স্মৃতি যদি সত্য হইত, নিত্য হইত, তাহা হইলে জীবনে মধুরতাও নিত্য হইত, তাহা খণ্ডিত হইত না। আর এই খণ্ডনই তো অভাব, খণ্ডনই হইল বেদনা, ইহাই মৃত্যু—অনিত্য অসুখ হইল এ লোক, নিত্য মধুরকে একান্ত লাভের অভাবেই। বৈষ্ণব সাহিত্যের রাজ্য হইল, নিত্য স্মৃতির রাজ্য; সুতরাং নিত্য মাধুর্যলোকের রস-সংশ্রয়ই সেই সাহিত্যের স্বরূপ।

এখন কথা হইতেছে এই যে, মধুর জিনিষটার ধর্ম কি, সে জিনিষটা কেমন? এইখানে লীলার কথা আসিয়া পড়ে, বলিতে হয় এই কথাই যে মধুর জিনিষ ক্রিয়াশীল এবং সে ক্রিয়া হইল মনের উপর প্রভাব, মধুরের এই প্রভাব কেমন, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেখানে নিত্যের সঙ্গে আমাদের ঘটে সংযোগ, খণ্ডতা আর থাকে না, খণ্ডতা যেখানে নাই, সেখানে অভাববোধের অবসর নাই। আমাদের ব্যষ্টিগত এই যে অহঙ্কার ইহা এই অভাববোধেরই জন্য। আমরা করা, চলা, বলা এই অভাব বোধকে আশ্রয় করিয়াই। এখানে অস্তি নাই আছে নাস্তি, অর্থাৎ পাওয়া নেই, আছে না পাওয়া। এই স্তরে আমরা যাহাই পাই, তাহা ঠিক পাই না; এক লক্ষ টাকা এই স্তরে আমার পাওয়া নয়, দুই লক্ষ টাকা না পাওয়া। এই অহঙ্কারই বন্ধন এবং এই অহঙ্কারই ভেদের মূলীভূত কারণ; যত দুর্ব্বলতা এ জীবনের যত অসহায়ত্ব, তাহার কেন্দ্র হইল এইখানে। এই অহঙ্কার যখন লুপ্ত হয়, অখণ্ড এবং নিত্য মাধুর্যের মধ্যে, তখন ক্ষুদ্রতা আর থাকে না, কামের রাজ্য হইতে মন তখন প্রেমের রাজ্যে উন্নীত হয়; অহঙ্কারকে যেখানে লুপ্ত করিয়া এই উপলব্ধি, এই স্তরের কথা একটু বুঝা দরকার। সেখানে আমি আমার বিষয়-বিচার সম্পর্কিত আমি নই, সেখানে তিনিই বড়। মধুরই তখন চালক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাগবতের কথায় 'নিবৃত্তমানায়ে, স্বয়ম্ভুবে'। সেখানে মধুর স্বপ্রকাশ। খণ্ডতার দিকে আমার মনের গতিও সেখানে বৃথা। আমি চেষ্টা করিলেও মধুরের ক্রিয়াকে আমি এড়াইতে পারি না। আমি না চাহিলেও তাহার প্রভাবই আমার সকল বিচারের উপরে গিয়া উঠে; মনের উপর মধুরের আকর্ষণ হয় সর্বদা। আমার উপর মধুরের কর্তৃত্ব তখন অবিতর্কিত এবং মধুরের অবিতর্কিত কর্তৃত্ব বলিতে রসেরই কর্তৃত্ব বলিতে হয়। রসের এই পরম প্রভাবে পড়িয়া মনের আশ্বস্তি যেখানে একান্ত সেখানে আছে প্রত্যক্ষতা অর্থাৎ রূপ।

অনুমান প্রমাণ নয়, প্রত্যক্ষতাই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণবস্তু। ভাগবতের ঋষি সেইজন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, অবিতর্ক লিঙ্গে ভগবান্ প্রসীদতাম্। অবিতর্ক রসবিগ্রহ হইয়া তুমি মনকে স্পর্শ দাও। ভাগবতের ঋষি বলিলেন,—আমি নিজের কথা বলিতেছি না, যিনি সকল সুন্দরের সন্নিবেশ, আমি তাঁহার শ্রী দেখিতে পাইতেছি এবং সেইজন্যই আমার কথা এমন মধুর হইতেছে। 'যদা স্তদেবাসতর্কৈস্তিরোধীয়েত'—তর্ক যেখানে সেখানে এই রস থাকে না, একথাও তাঁহারা বলিলেন। এই যে অবিতর্ক লিঙ্গ কথাটা শুনিলাম, এই কথাটা একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। মন যে জিনিষকে স্পর্শ করে, তাহাই হয় প্রত্যক্ষ কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ধর্ম হইল মনকে বিক্ষিপ্ত করা, প্রত্যক্ষতা হইতে বঞ্চিত করিয়া পরোক্ষতার মধ্যে মনকে লইয়া ফেলা। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের এই ধর্মকে অতিক্রম করিতে হয়। পরোক্ষতাই বেদনা এবং গ্লানি প্রত্যক্ষতাই আনন্দ, এবং আনন্দের রাজ্য অতীন্দ্রীয়ের রাজ্য; কিন্তু আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষতা বলিতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বাজাইয়া লইতে পারি, তাহাকেই বুঝি এবং তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করি। বিষয়টা ঠিক উল্টা। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় দেখে না, দেখে মন; ইন্দ্রিয় জড় বস্তু; এই জড় বস্তুর সাহায্য লইয়া, এই জড়ের প্রভাবে পড়িয়া ইন্দ্রিয় যখন দেখে তখন সত্যকে দেখে না, নিত্যকে দেখে না; দেখে অনিত্য এবং অসত্য। বৈষ্ণব সাহিত্য ইন্দ্রিয়ের বিচার সাপেক্ষ এবং পরোক্ষতার স্তর হইতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে মনকে লইয়া যায় এবং মনকে বিষয় নিরপেক্ষ একটা নিত [illegible] শয় দেয়, দেয় এক কথায় বলা যায় ভাব। পরো [illegible]
বিচারের ভিতর দিয়া যে সব ভাব আমরা [illegible]
ইন্দ্রিয়গুলি জগতের ঠিক খবর আমাদিগ [illegible]
পাইতে হইলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আশ্রয় ল [illegible]

সাহিত্য মধুর এবং সে মধুরের বল হইল অসংশয়িত উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষতা। যেখানে আন্দাজে বলা, না দেখিয়া বলা সে বলার মধ্যে জোর থাকে না, প্রভাব থাকে না। বৈষ্ণব দেখিয়া বলেন, মানুষের মন যোগাইবার জন্য তাহার বলা নয়, তাঁহার বলাটা অনুরোধে উপরোধে পড়িয়া নয়, তাঁহার বলা বৈষ্ণব কবির ভাষায় —'ত্যজি নিজ কৈতব বিধান'। ব্যক্তি অহংকারের গণ্ডীর মধ্যে যে কৃত্রিমতা, খণ্ডতা বা কার্পণ্য এবং কৃচ্ছ্রতা, তাহাতে অতিক্রম করিয়া ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া বলা, সকলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বলা। তিনি যাহার কথা বলেন, তিনি সকলের পক্ষে সত্য, সকলের পক্ষে শিব এবং দেশ কাল পাত্রে অখণ্ডিত পরম সুন্দর সে বস্তু।

এই যে প্রত্যক্ষ মধুরতার স্তর, সাধারণ মানুষের স্তর ইহা নয়। সাধারণ মানুষ চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি; কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যিকের জগৎ আমাদের মত ধুলা মাটির জগৎ নয়। তাঁহার পক্ষে 'মুহুরবলোকন মণ্ডনলীলা' আমরা যে চোখে জগৎটা দেখি, সে চোখ তাহার থাকে না, নিত্য মধুরকে উপলব্ধির ফলে তাহার পক্ষে জগৎ মধুর হইয়া উঠে। জগৎ সম্বন্ধে সাধারণ বিচারের এই যে দৃষ্টিটা তিনি ছাড়েন কোন জিনিষ পাইয়া? যাহা তিনি এতকাল নিজের অহংকৃত চেষ্টার মধ্যে পাইয়াছিলেন না, তাহাই পাইয়া ছাড়েন। এই পাওয়ার স্তরকে জ্ঞানীর ভাষায় বোধিই বলুন বা অন্য যাহাই বলুন, বৈষ্ণব তাঁহার অনুভূতির দিক হইতে বলিবেন, অনুগ্রহ বা কৃপা। তবে অনুগ্রহ বা কৃপা বলিতে আমরা সাধারণ লোকেরা একপক্ষের ঐশ্বর্যগত প্রাধান্য এবং অপরপক্ষের হীনতা বা দীনতা এইরূপে একটা আত্যন্তিক ব্যবধান বুঝি; অমধুরের স্তরে ইহাই বটে; কিন্তু মধুরতার নিত্য স্তরে এই ব্যবধান নাই। যেখানে সম্বন্ধ মধুর সেখানে ঐশ্বর্যগত ব্যবধান থাকিতে পারে না। সেখানকার অনুগ্রহকে অনুগ্রহ না বলিয়া আদর, আপ্যায়ন বলিলেই বোধ হয় সম্বন্ধের প্রগাঢ়তা আরও একটু বেশী করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে। মধুরের এই আদর আপ্যায়ন যখন উপলব্ধি করা যায় সর্বতোভাবে এবং একান্তভাবে, তখন মধুর জাগিয়া উঠেন জীবনদেবতাস্বরূপে রসময় মূর্তিতে। অবিচ্ছিন্ন তাঁহার রস-প্রসাদের পরিপুষ্টিতে দেহ, মন, প্রাণ তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। অভাবের তাড়নায় যে সব ইন্দ্রিয় কর্মের কৃচ্ছ্রতার মধ্যে চলিতেছিল, পাইতেছিল গ্লানি এবং বেদনা, মনের গোড়ায় মাধুর্যের স্থায়ী রস-সংস্থিতি লাভ করার জোরে, ভাবস্থৈর্যের আশ্বস্তিতে বা প্রশান্তিতে বা প্রেমে সেই সব ইন্দ্রিয়ের কর্মে আর কৃচ্ছ্রতা থাকে না, তখন 'রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ' রসময় দেহের গঠন, তনু চিদানন্দময়; সাধকের পক্ষে এই স্নিগ্ধ দেহ লাভ ঘটে। অন্য কথায় সাধক তখন নিজের স্বরূপকে ফিরিয়া পান—'স্বরূপে সবার হয় গোলকে বসতি।' নিত্যধাম ব্রজভূমির যে বিস্মৃতির বেদনা তিনি অভাবের স্তরে এই জড় জগতে ভোগ করিতেছিলেন, তাহাকে কাটাইয়া নিত্য স্মৃতিতে সেই ব্রজবাস লাভ করেন। এই অবস্থায় জীবনদেবতার সঙ্গে তাহার রসের খেলা আরম্ভ হয়—'বিলাস যুগল স্মৃতিসার।'

অভাবের স্তরে যিনি খুঁজিতেছিলেন ভোগ, এই জড় দেহের তুষ্টিপুষ্টিগত অনুদারতা, যে স্তরে অপরের সঙ্গে জীবনে বিরোধই সৃষ্টি করিত, ভাবস্থৈর্যের স্তরে গেলে, জীবনদেবতার প্রত্যক্ষ আপ্যায়নের অকুতোভয়তা বা অভয়ত্ব লাভ করিয়া অবীর্যকে অতিক্রম করিয়া তিনি উদারবীর্য হন। বিরোধের পরিবর্তে তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্য এবং সাম্য বলিলেও কথাটা ঠিক সমগ্র রস দিয়া বলা হইল না, সাধকের জীবনে এই স্তরে সত্য হইয়া উঠে সেবা।

সেবা কাহার সেবা? এইখানে আমরা অনেকে ভুল বুঝিয়া বসি। সাধন তত্ত্বের দিক দিয়া গেলে এই সত্য উপলব্ধি হইবে যে, পরের কেহ সেবা করিতে পারে না, পরজ্ঞানে যে সেবা সে সেবায় রস নাই, তাহাতে লাভও নাই, বলও নাই সেখানে। সেবা যেখানে নিত্য এবং সত্য, সেখানে মাধুর্যের মধ্যেই সেবা, সেখানে জীবন-দেবতাকে পাইয়াই সেবা, আত্মাকে পাইয়াই সেবা এবং সেই সেবার মধ্যেই পরম পুরুষার্থতা। প্রকৃতপক্ষে একান্ত স্বার্থ এবং একান্ত লাভ মানুষের এইখানেই। প্রহ্লাদ সে কথাটাই বলিলেন এই ভাষায়—"এতাবান্ এব ভূতেষু পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্।" বাঙলার বৈষ্ণব সাধক বলিলেন,—'তুয়া প্রিয়প্রদ সেবা এই ধন মোরে দিবা।' ঐশ্বর্য জ্ঞানের ঊর্ধ্বে, অনিত্যতার সকল ব্যবধানকে ছাড়াইয়া, সেখানে যে ধাম তাহা নিত্য, 'মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ' যেখানে সকলই মধুর, সেই প্রত্যক্ষ রস সংবিদের ভূমি, ভাবময় ভূমি হইল বৃন্দাবন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যিকের যিনি জীবনদেবতা, তিনি সেই নিত্যধাম বৃন্দাবনের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সুস্মিত শ্রীমুখের মাধুর্য বর্ষণ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের মনোবীণায় ঝঙ্কার তুলেন। তাঁহার ভ্রূভঙ্গি-সূচিত ভূরি অনুগ্রহ তাঁহাকে নাচাইয়া তোলে। এই অনুগ্রহ এই আপ্যায়ন দেখেন তিনি সর্বত্র। আমাদের ধারণা এই থাকিতে পারে যে, যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া এই অনুগ্রহের অভিব্যক্তি বা আপ্যায়ন, এই স্তরে তাহার বুঝি স্বতন্ত্র সত্তা থাকে; ইহা আমাদের ভুল ধারণা। রসের রাজ্যে, একান্তলাভের ক্ষেত্রে এই উপাধি থাকে না। যে মুরলীর ভিতর দিয়া অর্থাৎ যে সব উপাধিকে আশ্রয় করিয়া ভাবটি আসে সেই মুরলীতেই শরৎ-অমন্দ-চন্দ্রানন ফুটিয়া উঠে। প্রেমিকের কাছে প্রেমিকের লিপিই প্রগাঢ় ভাবে পরিণত হয় প্রেমিকের স্বরূপে; প্রত্যক্ষতার স্পর্শ প্রেমিকা সেই লিপির ভিতর দিয়াই পায়। প্রেমিকা সে লিপিকে বুকে করে, চুম্বন করে। আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে এই অবস্থার প্রকাশ পায় নিরুপাধিক আনন্দময় সত্তার; সাধকের যিনি প্রিয় দেবতা তাঁহার। তখন বিশ্বের কাছে নিবেদিত হয় তাঁহার প্রণতি—'অধোক্ষজ মে নমসা বিধীয়তে' এবং এই প্রণতির রীতি পাই বৈষ্ণব সাহিত্যে; ছন্দ গান ও ঝংকারে।

কতকটা আধুনিক রুচিসম্মতির দিকে তাকাইয়া আমাকে কথা কয়েকটি বলিতে হইল; কিন্তু 'রাধাকৃষ্ণের সেই লীলা অতি গূঢ়তর।' সে রস উপলব্ধি করিতে হইলে বিশিষ্ট সাধন মার্গ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যদি জীবনে তাহা সম্ভব নাও হয়, তবু বৈষ্ণব সাহিত্যের রস মাধুর্যের স্পর্শে অবিরত ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়না যদি আমরা কিছু ভুলিতে পারি, তাহা হইলেও শুধু পরমার্থিক নহে, আর্থিক দিক হইতেও আমাদের অনেক লাভ হইবে। আমাদের যত দুর্দশা অপ্রেমের জন্য। মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলে আমরা মানুষ হইতে পারিব না। বৈষ্ণব সাহিত্য এই মানুষকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে। মানুষকে পরম মর্যাদা দিতে শিখাইয়াছে এই বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্য শুধু পরলোকের কথাই বলে নাই, পরলোক লইয়া থাকে নাই, বৈষ্ণব সাহিত্য 'প্রেত্য চ ইহ' এই ইহলোকে মানুষের সেবাকেই বরং বড় করিয়া দেখাইয়াছে। সুযোগ পাইলে সে কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। এ জাতিকে যদি মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হয়, তবে বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চার সত্যই প্রয়োজন আছে।*

*সাহিত্য সেবক সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিস্বরূপে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিখন।

বিচিত্র বার্তা

দেহে যতই শক্তি থাকুক না কেন, শরীরের কয়েকটি অংগ এমনই ভংগুর যে শক্তিশালী বীরও অপেক্ষাকৃত দুর্বলের কাছে বে-কায়দায় পড়ে পরাজয় স্বীকার করে। সবলের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুযুৎসু শিক্ষা সকলের একান্ত প্রয়োজন। যুযুৎসু শিক্ষায় দৈহিক বলের প্রয়োজনীয়তা বেশী নেই। মানব দেহে কোন কোন অংগের দুর্বলতা বেশী সে সম্বন্ধে মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান, ক্ষিপ্রতা এবং যুযুৎসুতে অনুশীলন থাকলেই একজন দুর্বল লোক দুর্বৃত্তের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সহজেই পারে। বৈজ্ঞানিকেরা মানবদেহ পরীক্ষা করে শরীরের কোন কোন অংগের দুর্বলতা রয়েছে তা সাধারণের নিকট প্রকাশ করেছেন। আমরা এর জন্য তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, মানুষের দেহে কিডনীর স্থানটাই সব থেকে বিপদজনক। এ সমস্ত জায়গায় আঘাত মানুষকে বেশী কাবু করে। তলপেটের আঘাতও উপেক্ষার নয়। ব্রহ্মতালুর উপর আঘাত পড়লে মানুষের মৃত্যু ঘটে। এটি বিশেষ বিপদজনক স্থান। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এক লাঠি বা ঘুশির আঘাত, দুই বুড়ো আংগুলের সবল চাপ ব্রহ্মতালুর উপর ঠিকভাবে পড়লে অনিবার্য মৃত্যু হয়। অনেক সময় সৌভাগ্যবশত হয়ত কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়; কিন্তু এরূপ আঘাতে বিশেষভাবে জখম হয়ে বহুক্ষণের জন্য চেতনা হারায়। অনেক সময় শরীরের উপরের আঘাত মারাত্মক না হলেও দেহের মধ্যে সুক্ষ্ম শিরা উপশিরার উপর যে আঘাত পেঁৗছে, তা খুবই মারাত্মক হয়। বিশেষজ্ঞরা কয়েক বৎসরের পরীক্ষায় দেখেছেন পৃথিবীর কি পরিমাণ লোকের মৃত্যু কোন কোন আঘাতের ফলে ঘটেছে। শতকরা কত লোক মরেছে নীচে তারই একটি তালিকা দেওয়া হল।

পায়ে আঘাত লেগে মৃত্যু—২৮·২
দেহের পাঁজরে আঘাত লেগে মৃত্যু—৮·২
চোখের উপর আঘাত লেগে মৃত্যু—৫·৯
মাথায় গুরুতর আঘাতে মৃত্যু—৪·৫

*　　*　　*　　*

বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, সব মাছই বোবা, কানেও শুনতে পায় না। একমাত্র তাদের ঘ্রাণ শক্তিই প্রবল। তাঁরা আরও বলছেন, যদিও তাদের 'Nervous system' বেশী, তারা কোন-রকম যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না।

*　　*　　*　　*

আমেরিকার ন্যাশনাল মিউজিয়ামে ১০০,০০০,০০০ বছরের পঞ্চাশটি মুক্তাকে নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। মুক্তা-গুলি ঝিনুক জাতীয় 'Inoceramues' নামে শামুকের দেহ থেকে পাওয়া যায়। যে সময়ে বৃহদাকার জীব ডায়নোসারদের বংশ শেষ হতে চলেছে সেই সময়ে এই জাতীয় শামুক প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যেত। এককালে এইগুলি দীপ্তিমান মুক্তা ছিল। মৃত্তিকার গর্ভে থেকে এদের সে প্রভা আর এখন নেই। বর্তমানে এদের রং হয়েছে ঈষৎ

ভৌতিক খেলা—দড়ি বেয়ে শূন্যে আরোহণ দৃশ্যটি ক্যামেরার কারসাজিতে তোলা হয়েছে

পিঙ্গল। একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই এদের মুক্তা বলে চিনতে পারেন।

*　　*　　*　　*

আমেরিকার ব্যাপারই আলাদা। সেখানে এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, যা চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। ডাক বিভাগের কথা বলছি, শুনে আশ্চর্য না হ'য়ে থাকতে পারবেন না। ওখানে যে সব চিঠি কিম্বা পার্শেল নির্ভুল ঠিকানার

অভাবে অথবা মালিকের নামের ভুলে বিলি হয় না, সেগুলিকে সুরক্ষিত ক'রে রাখা হয় একটি পৃথক্ বাড়িতে। এমনি সব চিঠিপত্র জমা হ'য়ে সেখানে একটা যাদুঘর তৈরী হয়েছে। পার্শ্বেলের মধ্যে যে সব জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলি সুদৃশ্য আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হয়। আপনারা হয়ত ভাবছেন, পার্শ্বেলে আর এমন কি জিনিস লোকে পাঠায়! আমাদের দেশের মতই রঙিন্ সাড়ি, বইয়ের বাণ্ডিল, ছেলেদের খেলনা, ওষুধের শিশি, দৈব মাদুলি, উপহারের রকমারি জিনিস আর কি? কিন্তু আগেই বলেছি, ওদেশের ব্যাপারই অন্য। একবার একটা পার্শ্বেলের মালিকের খোঁজ না পাওয়ায় যাদুঘরে সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল সেখানে সাজিয়ে রাখবার জন্যে। সেখানের কর্মচারীদের কাজে এতটুকু একঘেঁয়েমি নেই। পার্শ্বেল কেটে জিনিস বার করবার উৎসাহ সকলের। পার্শ্বেলের ভিতর কি আছে, এ প্রথম দেখবার লোভ কেউ ছাড়তে চায় না। এতে বিপদও আছে। ভয়ে ভাবছেন বিপদ আবার কি! শুনলে শিউরে উঠবেন। সেই পার্শ্বেলটা কেটে একটা বড় টিনের বাক্স বের করা হ'লে তার মধ্যে সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। টিনের বাক্সের ওপর আবার ছিদ্র ক'রে দেওয়া হয়েছে যাতে সাপটা মারা না যায়। অনেক সাবধানে বাক্সের ঢাকনিটা খুলতেই চারটে সাপ ফনা তুলে পোস্ট অফিসের ঘরে আবির্ভাব হ'ল। তাদের বেশীক্ষণ আর এ বিক্রম দেখাতে হ'ল না, মেরে ফেলে কাচের জারে এ্যাসিডে ডুবিয়ে যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হ'ল। মড়ার মাথা, ব্যাঙের কঙ্কাল, টিকটিকির কাটা লেজ, একপাটি জুতো, মানুষের দাঁত এমনি ধরণের অনেক জিনিস পার্শ্বেলের মধ্যে পাওয়া যায়। পার্শ্বেলের মালিককে কিম্বা যে পাঠিয়েছে তার ঠিকানা অনেক অনুসন্ধানে না পাওয়া গেলে জিনিসগুলিকে যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। কেবল এরকম বাজে জিনিসই যাদুঘরে ভর্তি হয় নি। অনেক মূল্যবান অলঙ্কার, নোটের তাড়া, দামী পোষাক প্রভৃতিও রয়েছে। চিঠির মধ্যে হিসাব করে দেখা গেছে, বেওয়ারিস চিঠির মধ্যে বছরে লক্ষ টাকার নোট যাদুঘরে জমা হয়েছে। চিঠি যে লোককে পাঠান হয়েছে, তার নাম ও ঠিকানা ভুল এমন কি চিঠিতে নিজের নাম, ঠিকানাও পর্যন্ত এমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ রাখে নি, যাতে ক'রে পোস্ট অফিস টাকাটা ফেরৎ দিতে পারে। অনেকে আবার এমনি ধরণের ভুল ক'রে পোস্ট অফিসে চিঠি দিয়ে তাদের হারান জিনিস ফেরৎ পেয়েছে। তরুণ তরুণীর প্রেমের চিঠিই কত! বুড়োরা তা পড়তে পড়তে হাসতে থাকে। বিগত যৌবনের টুকরো টুকরো ঘটনা স্মরণ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

একবার একটা আস্ত নরকঙ্কাল পার্শ্বেলের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। এ সবে আর ডাকঘরের কর্মচারীদের বিশেষ ভয় থাকে না। ভয় তাদের ভেঙ্গে গেছে। অনেকে মজা দেখবার জন্যেও নানা রকম অদ্ভুত জিনিস পাঠায়। মানুষের এটাও একটা অদ্ভুত খেয়াল বৈকি! যেখানে যে জিনিসের সুনাম আছে, সম্ভব হ'লে তা খবরের কাগজের ভিতরে গোপনে পাঠান হয়, তবে বেশীর ভাগই ধরা পড়ে। ফ্রান্স থেকে প্রায়ই সৌখিন রুমাল গোপনে খবরের কাগজের ভিতর দিয়ে প্রিয়জনকে পাঠান হয়। ডাক বিভাগের কর্মচারীরা প্রতিদিন আমেরিকায় বসে সন্দেহ হ'লেই কাগজ খুলে রুমালগুলি বের ক'রে নেয়। এসব রুমাল রাখা হয় যাদুঘরে। বিচিত্র রুমাল, সুসজ্জিত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার, প্রিয়জনের উপহার, প্রেমলিপি, এ সমস্তই দর্শকদের চোখে যাদু আনে। সকলে যাদুঘরে এসে হারানো জিনিসের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। সেগুলির উপর মানুষের খেয়াল, পাগলামি, ভুল-ভ্রান্তি, ভালবাসার ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে আছে।
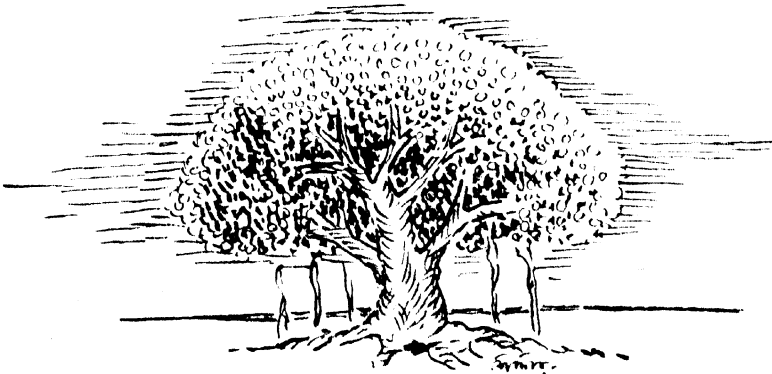
প্রাত্যহিক

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

পচা নোংরা জগতের অভিশপ্ত অধিবাসী মোরাঃ
পরস্পর হানাহানি—আরণ্যক লুব্ধ ব্যাভিচার;
ঘুমভাঙা চলাপথে দূরগম্য লক্ষ্য আমাদের
আমরাতো নিষ্ঠাহীন—সম্মুখেতে ঘনায় আঁধার!

আঁধার ঘনায় জানি—আঁধারের নেই কি গো শেষ
কোথা সেই লাল সূর্য পূর্বাশার আলোর সন্ধানী!
আলোক স্তিমিত বিশ্ব—অপসারি' কুয়াশার জাল
মধ্যাহ্নের দীপ্ত তেজ দহিবে কি পুঞ্জীভূত গ্লানি!

কে বলে মানুষ মোরা? রাজপথে মৃত্যুর মিছিল
স্বাস্থ্য-শক্তি-আয়ু সেতো দানবের খেলার পুতুল;
শূন্যপথে হানা দেয় শ্যেন দৃষ্টি বোমারু বিমান
কখন নিশ্চিহ্ন হবে সভ্যতার স্পর্ধা অপ্রতুল!

বিশাল সমুদ্রবক্ষে টর্পেডোর ক্ষুব্ধ আনাগোনা
ডেস্ট্রয়ার মাইনের ইতস্তত হিংস্র সঞ্চরণ;
কনভয় সশংকিত—মেঘ মাঝে বিমানের হানা
অতর্কিত বোমাবৃষ্টি—ঘটিবে কি সমাধি শয়ন!

নগরীর উপকণ্ঠে স্পর্ধা বাড়ে যন্ত্র দানবের
সদ্যপিচ ঢালা পথে বাইকের নিঃশব্দ গমন;
ফ্যাক্টরীর বাঁশী বাজে—অগণিত মানব কংকালে
দলে দলে ভীড় করে—নিরূপায় বঞ্চিত জীবন!

দুবেলা দুখানি রুটি সঞ্চয়ের পরম পাথেয়
শোণিতের বিনিময়ে তবু তারা কৃপার ভিখারী;
অনাগত কতো দূরে লক্ষ কণ্ঠে ওঠে কলরব
বেয়নেট ঠিক আছেঃ অসহায় ক্ষুব্ধ নরনারী।

দেবালয়ে অহরহ দেবতার মিথ্যা আরাধনা!
দ্বারপ্রান্তে আশাহত অগণিত ভক্ত নরনারী;
অপাংক্তেয় তবু তারা—কী আশ্চর্য সমাজের নীতি
কে দেবে জবাব আজি? কেন নহে পূজা অধিকারী!

বধির দেবতা তবু আরামের রাজ সিংহাসনে!
সহস্রের যুক্ত স্বর পশে না তো শ্রবণে তাহার;
মন্দিরে দেবতা নেই—এতো শুধু নিষ্ক্রিয় পাষাণ
কোথায় পূজারী সেথা? মিথ্যে ওই মন্ত্রের ঝংকার!

রূপান্তর

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

ভোঁতা তলোয়ার দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে
বনেদী দিনের স্মৃতিকে বাঁচাতে চাও?
ধারালো ফলাটা জানো কি গিয়েছে বেঁকে
পাণ্ডুর হলো রূপালী চাঁদের ছটাও?

উচ্ছল দিন যদিও বা ভেসে আসে
ঘরের বাতাস তবু ত সুরভি নয়
রক্তের ঝাঁঝ সেদিনের ইতিহাসে
আজ কেন তবে অযথা পেতেছ ভয়?

পুরান কাঠামো। নোনাধরা ভিতে বসে
বিগত দিনের স্মৃতিকে অযথা টানো।
শীতের বাতাসে বহু পাতা গেছে খ'সে,
তলোয়ার বেঁকে কাস্তে হয়েছে জানো?

ঘূর্ণিবাত্যা
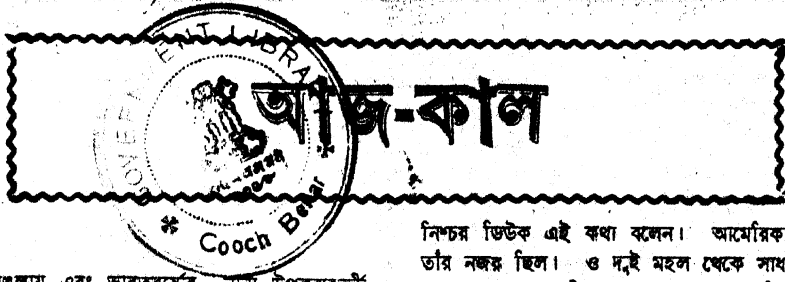
দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় এবং ভারতবর্ষের নানা উপকূলবর্তী জায়গায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা হয়ে গেছে। বাঙলা দেশেই এর ধাক্কা লেগেছে সাংঘাতিক। নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায় ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। বাখরগঞ্জের ভোলা মহকুমা থেকে যে বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা মর্মন্তুদ। সরকারী অনুমানে এক হাজারের বেশী আর বেসরকারী অনুমানে হাজার তিনেক লোক সেখানে প্রাণ হারিয়েছে এবং অসংখ্য লোক নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হয়েছে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীতে বান ডাকায় এরকম তাণ্ডব হয়েছে। ঘণ্টায় শ' তিনেক মাইল বেগে যখন ঝড় উঠেছে, তখন তেতুলিয়া নদীর জল ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু হয়ে এসে ভোলা দ্বীপকে চুবিয়ে দিয়ে যায়। ভোলা ছাড়া অন্যান্য মহকুমারও খুব ক্ষতি হয়েছে। নোয়াখালির অবস্থাও অনেকটা এই রকম হয়েছে। বরিশাল ও নোয়াখালির দুর্গতদের সাহায্য দেবার জন্য গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে এবং বেসরকারী চেষ্টায় ব্যবস্থা হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

বোম্বাইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখনো কমের দিকে যায় নি, বরং আরো ছড়াচ্ছে। শ্রমিক অঞ্চলগুলো এ পর্যন্ত দাঙ্গার বাইরে ছিল, কিন্তু সেখানেও দুর্বৃত্তেরা গোলমাল বাধাতে আরম্ভ করেছে। গভর্নমেণ্ট নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিশেষ ফল দেখা যাচ্ছে না। অস্ত্রের আঘাত করা ও আগুন লাগানোর অপরাধে বেত মারার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। আহমদাবাদেও এই আইন চালু করা হয়েছে। বোম্বাইয়ে এ পর্যন্ত সবসুদ্ধ ৪১জন মারা গেল।

বিচারপতি মিঃ ম্যাকনেয়ার এবং মিঃ ডব্লিউ এস শার্প আই-সি-এস'কে নিয়ে ঢাকা দাঙ্গা সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, সোমবার থেকে তাঁরা কাজ আরম্ভ করেছেন।

শ্রমিক ধর্মঘট

মালয়ে রবার শ্রমিকদের ধর্মঘট সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যা বলেছেন, তার মোট কথা এই যে, শ্রমিকরা ভালো মজুরীই পায়, কিন্তু কেন্দ্রীয় ভারতীয় সমিতির প্রচারকার্যের ফলেই এই রকম গোলমাল বেধেছে। ৭০০০ শ্রমিক এই ধর্মঘটে জড়িত। ১০ই থেকে ১৫ই মে'র মধ্যে পাঁচজন নিহত হয়েছে।

প্রকাশিত সরকারী বিবৃতি এই রকম ছাড়া ছাড়া সঙ্গতি-হীন। ঘটনার পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনো বিবরণ এ পর্যন্ত দেওয়া হয় নি।

নাগপুরে যে ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট চলেছে, গত ৩০শে মে তাদের প্রতি সহানুভূতিতে শহরে ধর্মঘট হয়। এ ধর্মঘটে সকলে স্বেচ্ছায় পূর্ণভাবে যোগ দেয়। একটা দোকান পর্যন্ত শহরে খোলা ছিল না। এ থেকে বোঝা যায়, শ্রমিকরা সর্বসাধারণের সঙ্গে কি রকম ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেছে।

ভারতের জন্য চিন্তা

ভারতবর্ষ নিয়ে বৃটিশ কর্তারা নানারকম অভিনয় করছেন। 'পার্লামেন্টারি আণ্ডার সেক্রেটারী ফর ইণ্ডিয়া' ডিউক অব ডেভনশায়ার লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, ভারতে ভারতের দ্বারা ভারতের জন্যে শাসনের ব্যবস্থা করাই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য। ছাত্রদের হাততালি পাবার জন্যেই নিশ্চয় ডিউক এই কথা বলেন। আমেরিকার দিকেও হয়তো তাঁর নজর ছিল। ও দুই মহল থেকে সাধুবাদ তিনি পাবেন। তবে আমরা ভারতীয়েরা কথা অনেক শুনেছি এবং কাজও অনেক দেখেছি; সুতরাং আমরা মানে করি অন্য রকম। প্রথমত, এ সব অস্পষ্ট কথার মূল্য বিশেষ নেই; দ্বিতীয়ত, 'ভারতের দ্বারা' বলতে 'বড়লাটের দ্বারা' বোঝানই স্বাভাবিক। কারণ আজকাল ভারতবাসী অনেক ইংরেজ যখন বলে, ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া উচিত, তখন তাদের মনে এই কথাটাই যেন প্রচ্ছন্ন থাকে যে, ভারতবাসী ইংরেজকে পার্লামেণ্টের অধীনতা-মুক্ত শাসন ক্ষমতা দেওয়া উচিত। অবশ্য ভারতীয়রাও সঙ্গে থাকবে বলে' তারা আশা করে।

এই রকম আর এক অভিনয় করেছেন মিস এলীনর র‍্যাথবোন। এই মহিলা ভারতীয় 'বন্ধু'দের উদ্দেশ করে এক খোলা চিঠিতে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলেছেন। কখনো তোয়াজ, কখনো রাগ, কখনো অভিমান—নানা আবেগ তিনি এই চিঠিতে দেখিয়ে-ছেন। তাঁর আসল কথা, ইংরেজ যদি অন্যায় কিছু করে' থাকে, তবে সে সব ভুলে গিয়ে তাদের পক্ষে পুরোপুরি ভিড়ে পড়ো। ঘুমপাড়ানী মাসীর মতো তিনি আমাদের নাৎসী জুজুরও ভয় দেখিয়েছেন। দরদেরও একটা সীমা থাকা শোভন নয় কি?

আন্তর্জাতিক

ক্রীটের যুদ্ধের সমাপ্তি

ক্রীটে বারো দিনের মধ্যে বৃটিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে। পনেরো হাজার বৃটিশ সাম্রাজ্য সৈন্য ক্রীট থেকে কোনো রকমে জাহাজে করে' পালিয়ে গেছে। কত সৈন্য যে রয়ে গেছে, তার হিসেব এখনো দেওয়া হয় নি। গ্রীক সৈন্যদের ক্রীট থেকে সরানো হয় নি। বিমান শক্তিই আসলে এ যুদ্ধের মীমাংসা করেছে। প্রথম থেকেই জার্মানরা ক্রীটের আকাশে আধিপত্য স্থাপন করে; তারপর তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে বৃটিশ নৌবহর, সৈন্য এবং সামরিক ঘাঁটি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। মালেমি ও কানিয়া জার্মান বিমান-বাহিত সৈন্যেরা দখল করার পর বৃটিশ সৈন্যেরা সুদা উপসাগর থেকে হটে' যেতে বাধ্য হয়; এর সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা তীব্র লড়াইএর পর হেরাক্লিয়নও (কান্দিয়া) দখল করে নেয়। এই সমস্ত সময় জার্মান বিমানের অবিশ্রাম আক্রমণ চলতে থাকে, যার ফলে বৃটিশ সৈন্যদের টিঁকে থাকা অসম্ভব হয়।

ক্রীটে বিপর্যয় থেকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছে। ক্রীট তাঁদের দখলে আছে সাত মাস, আর জার্মানরা গ্রীস দখল করেছে সেদিন; ক্রীটে তাঁরা ভৌগোলিক কারণে বিমান ঘাঁটি শক্ত করতে পারলেন না, অথচ জার্মানরা একই ভৌগোলিক অবস্থা সত্ত্বেও গ্রীসে কি করে' বিমান ঘাঁটি দুর্জয় করল? ইজিয়ান সাগরের যে দ্বীপগুলো দখল করে' নেওয়ায় জার্মানরা ক্রীট আক্রমণের এত সুবিধে পেল, সে দ্বীপগুলো ইংরেজরা কেন এতদিনে দখল করে নি? ইত্যাদি। বৃটিশ পত্রিকা "ডেলি মেল" প্রশ্ন করেছে—কবে এই সব অপূর্ব পলায়নের শেষ হবে?

ক্রীট যুদ্ধের শিক্ষা

ক্রীটের পতনের তাৎপর্য খুব বেশী। মিঃ চার্চিলই কয়েক দিন আগে বলেছিলেন, ক্রীটের জয়-পরাজয় সমগ্র ভূমধ্য-সাগরীয় সংগ্রামকে পরিবর্তিত করে' দেবে। ক্রীট পূর্ব ভূমধ্য-

সাগরের এক চমৎকার জায়গায় অবস্থিত; সুদা উপসাগরের মতো উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আর ওখানে নেই। এখানে ঘাঁটি করে' জার্মানরা পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অনেকখানি ক্ষমতা বিস্তার করতে পারবে এবং সাইপ্রাসের উপর তাদের আক্রমণ চালাবার সুবিধে হবে। এর সঙ্গে প্যালেস্টিন ও সুয়েজের ভাগ্য জড়িত। ক্রীট থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপরও তারা সহজে বিমান আক্রমণ করতে পারবে। প্যারাশুট ও বিমানবাহিত আক্রমণের সাফল্য-সম্ভাবনা যে কতখানি তাও ক্রীটের যুদ্ধ থেকে দেখা গেল। বৃটেনের উপর অভিযান সম্পর্কে ক্রীট যুদ্ধের কলাকৌশল পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। (মল্টা ও সাইপ্রাসের তো কথাই নেই।) একবার যদি জার্মানি বৃটেনের আকাশ দখল করে' নিতে পারে, তাহলে মাটি দখল করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে না। আধুনিক যুদ্ধে বিমান শক্তিই যে সর্বপ্রধান, এই কথাই ক্রীট থেকে প্রমাণিত হ'ল। এই সব শিক্ষাকে ইংরেজরা এখন কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে বলে' আশা করা যায়।

জার্মানরা ইতিমধ্যেই সাইপ্রাসের দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। গত কয়েক দিনে বহু জার্মান বিমান সিরিয়ায় উড়ে গেছে, তা ছাড়া ছোট ট্যাঙ্ক নিয়ে জার্মান সৈন্যদল জাহাজে করে' সিরিয়ায় নেমেছে। তারা সাইপ্রাসের পাশ দিয়েই সেখানে গেছে বলে' জানা গেল। পশ্চিমে দোদেকানীজ এবং পূবে সিরিয়া থেকে সাইপ্রাসের উপর একযোগে আক্রমণ হবার সম্ভাবনা। বৃটিশ বিমান সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছে।

ইরাক

ইরাকে বৃটিশ সৈন্যেরা বাগদাদে পে'ৗছেছে। বিতাড়িত রিজেন্ট আমীর আব্দুল ইলাও বাগদাদে গেছেন। রশিদ আলি ইরানে পালিয়েছেন শোনা যায়। রশিদ আলি চলে যাওয়ার পর মেয়রের নেতৃত্বে এক ইরাকী কমিটি বাগদাদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের সঙ্গে বৃটিশ অধিনায়কের এক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি হয়ে গেছে। এই চুক্তি অনুসারে বৃটিশ বন্দীরা মুক্তি পাবে, এক্সিস বন্দীরা অন্তরীণ হবে এবং ইরাকী বন্দীদের রিজেণ্টের হাতে সমর্পণ করা হবে। আমীর আব্দুল ইলা একটা নতুন গভর্নমেণ্ট গঠন করছেন। ইরাকের উত্তর অংশের কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

আফ্রিকার যুদ্ধ

লিবিয়ার সীমান্ত থেকে মিশর এলাকার মধ্যে যে চারটি জার্মান সাঁজোয়া দল হানা দেয় তারা সোল্লুম দখল করে নিয়েছে। উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত মাইল পঞ্চাশ জায়গা নিয়ে লড়াই চলছে। এ যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা জানা যায় নি। তোব্রুকেও কিছু কিছু সংঘর্ষ হচ্ছে। ক্রীট জয়ের পর জার্মান বিমানবহর এবার তোব্রুকের উপর মনোযোগ দিতে পারে। আবিসিনিয়ায় আরো কয়েকটা ইতালীয় ঘাঁটি বৃটিশ ও হাবসী সৈন্যেরা দখল করেছে এবং অনেক ইতালীয় সৈন্য বন্দী করেছে। ফরাসী সাম্রাজ্য টিউনিসিয়ার স্ফাক্স বন্দরে বৃটিশ বিমানবহর একাধিকবার হানা দিয়ে এক ইতালীয় রণতরীর উপর বোমা বর্ষণ করে। এডমিরাল দারলাঁ এর জোর প্রতিবাদ করেছেন।

বিমান-আক্রমণ

ক্রীট যুদ্ধের সময় জার্মানরা পশ্চিম দিকে বিমান হানায় ঢিলে দিয়েছিল। এখন আবার জোর আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এয়ারির রাজধানী ডাবলিনের উপর বোমা বর্ষণ। গত শনিবার শেষ রাত্রে জার্মান বিমান ডাবলিনের উপর ভীষণভাবে বোমা ফেলে। পরে এয়ারির অন্তর্গত আর্কলোর কাছেও তারা বোমা ফেলে। ডাবলিনে বহু লোক হতাহত এবং অনেক বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। ডি'ভালেরার গভর্নমেণ্ট জার্মানীর কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করেছেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এয়ারিতে জার্মান বিমান হানা না হয়, তার প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন।

রবিবার রাত্রে জার্মানরা ম্যাঞ্চেস্টারের উপর ভীষণ আক্রমণ করে। জার্মান বিমান কয়েক ঘণ্টা ধরে' আগ্নেয় ও অতি-বিস্ফোরক বোমা বর্ষণ করে। এই আক্রমণে ম্যাঞ্চেস্টারের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

বৃটিশ বিমানবহর বার্লিন, কলোন, বুলোন প্রভৃতি জার্মান ঘাঁটির উপর হানা দেয়।

আমেরিকার অভিপ্রায়?

প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্ট তাঁর জাতিকে ও জগৎকে সম্বোধন করে' তাঁর বহু প্রতীক্ষিত বক্তৃতা দিয়েছেন। এই বক্তৃতার প্রাক্কালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "পূর্ণ জরুরী অবস্থা" জারী করে' এক ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তিনি বলেন যে, ইউরোপের পর পশ্চিম গোলার্ধের উপর আক্রমণের মতলব এক্সিস-শক্তির আছে বলে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সামরিকভাবে পূর্ণ প্রস্তুত থাকা দরকার। তিনি সকলকে দেশরক্ষার কাজে সহযোগিতা করতে আবেদন জানান। শ্রমিক ও মালিককে বিনা বিরোধে উৎপাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করতে তিনি অনুরোধ করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ক্ষমতাবলে প্রেসিডেণ্ট এক যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর সব সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন।

বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্ট নাৎসী জার্মানিকে আক্রমণ করে' মোটামুটি এই কথা বলেন যে, সমুদ্রে জার্মানির আধিপত্য স্থাপনের প্রত্যেক চেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করবে এবং বৃটেনে সমরোপকরণ পেঁ'ৗছে দেবার জন্যে আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। প্রেসিডেণ্ট তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ করে' দেন যে, জার্মানি আট্‌লাণ্টিকে যে হারে বৃটিশ জাহাজ ডুবোচ্ছে তা বৃটেনের জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতার তিন গুণ; বৃটেন ও আমেরিকা একসঙ্গে যত জাহাজ তৈরী করতে পারে এই জাহাজ-ডুবির পরিমাণ তার ডবলের বেশী।

পরবর্তী এক বিবৃতিতে প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী কোনো শাসন বিভাগীয় আদেশ তিনি এখন দিচ্ছেন না এবং নিরপেক্ষতা আইন সংশোধনের কোনো প্রস্তাব তিনি করবেন না।

প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। কেউ বলছে তিনি যুদ্ধ ছাড়া সবই ঘোষণা করেছেন; আবার কেউ বলছে, তাঁর বক্তৃতা বাকসর্বস্ব, কাজের কথা ওতে কিছু নেই। তবে একথা ঠিক যে, তিনি বৃটেনকে সাহায্য দেবেনই বলেছেন; কিন্তু কখন দেবেন, কিভাবে দেবেন তা কিছুই বলেন নি।

জাপানের ব্যর্থতা

চীনে জাপ অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম চীনে চীনা-বাহিনী ও চীনা গরিলা সৈন্যদের প্রবল পাল্টা আক্রমণে জাপানীরা বিপর্যস্ত হয়েছে। এক দক্ষিণ শান্‌সিতেই ৪০ হাজার জাপ সৈন্য হতাহত হয়েছে। চীনারা জাপ সৈন্যের বেষ্টনী ভেঙে ফেলে উত্তরে অগ্রসর হয়েছে। গরিলা সৈন্যেরা ব্যাপকভাবে জাপানী যোগপথগুলো ছিন্নভিন্ন করে' দিচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব চীনেও জাপানীরা পর্যুদস্ত হয়েছে। চীনারা ওয়েনচাও, হাইনেন, চুকি ও ফুচিং আবার দখল করে' নিয়েছে। এখন জাপানীদের হাতে আছে শুধু নাংপো ও ফুচাও।

৩-৬-৪১ —ওয়াকিবহাল

নিউ সিনেমায়—"দেওয়ালী"

রঞ্জিৎ মুভীটোনের হিন্দী চিত্র

পরিচালনা—জয়ন্ত দেশাই
কাহিনী—পণ্ডিত সুদর্শন
সংগীত—ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ
ভূমিকায়—মাধুরী, জ্যোতিলাল, ঈশ্বরলাল, কে দাতে, দিক্ষিত, ইন্দুবালা, সুরেশ, কেশরী, ভগবানদাস, বাসন্তী।

হাল-বোম্বাইয়ের ছবি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, আজকাল যে সব হিন্দুস্থানী ছবি আমাদের দেশে আমদানী হচ্ছে তার শাঁসটি দেশী হলেও খোলসটি বিদেশী, একেবারে আমেরিকার ছবি হ'তে ধার ক'রে আনা ঘটনাগুলিকে যেন পরপর সাজিয়ে ধরা হয়েছে; যার চাপে কাহিনীর কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়। যেমন বলা যেতে পারে, ডাক্তারকে নায়ক বানিয়ে ওষুধের লেবেলমারা শিশি বোতল টেস্ট-টিউব আর এক্সপেরিমেণ্ট এবং পরে একটা ক্লাইম্যাক্স খাড়া ক'রে সেগুলিকে আছড়ে ভেঙে ফেলা ইদানীং বিদেশী ছবি থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে। আদালতে মামলা আঁটা ব্যারিস্টারের তর্কযুদ্ধ, রাস্তায় তরুণী ভিখারিণীর গান গেয়ে ও নেচে ভিক্ষে চাওয়া, স্টেজ খাড়া ক'রে তার উপরে অভিনয় ও গান ও চানাচুর বিক্রীর দৃশ্যগুলি বোম্বাইয়ের অধিকাংশ ছবিগুলিতে ফরমুলার মতো একটার পর একটা সাজিয়ে রাখা হয়। কাহিনী বা ঘটনাবস্থানের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক এই সব দৃশ্যগুলি চাই।

এবারে গল্পাংশটুকু সংক্ষেপে ব'লে নেওয়া যাক। দেওয়ালী উৎসবের দিন। এ উৎসব দরিদ্রের জন্য নয়, এ উৎসব ধনীর। উৎসব-মুখর আলোকোজ্জ্বল নগরীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তুলসী; 'হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।' এক দরিদ্র পিতার একমাত্র কন্যা সে, তাই উৎসবের আনন্দ হ'তে সে আজ বঞ্চিত। ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ বাপ, তার পালনের ভার ছোট মেয়ে তুলসীর উপর। তুলসী কাজের চেষ্টা করল, কাজ জুটল না, ভিক্ষেয় বেরুলো, ভিক্ষে পেল না। অবশেষে সে চুরি করল এবং ধরাও পড়ল। জেল হোলো বাপের এবং তুলসীকে রিফর্মেটরী স্কুলে পাঠাবার বন্দোবস্ত হোলো।

ডাক্তার কৈলাস সে সময়ে এক ডাক্তারী গবেষণায় ব্যস্ত। রক্তের অশুদ্ধতাই মানুষকে অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত করে এইটিই তাঁর বিশ্বাস এবং বিশুদ্ধ রক্ত ইনজেকসন ক'রে এই প্রবৃত্তি দূর করবার পরীক্ষায় তিনি তন্ময়। এই কাজে তুলসীকে তাঁর প্রয়োজন হ'ল, তিনি তাকে ভাল ক'রে তুলবার জন্যে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন এবং ছোট ভাই সুধীরের উপর ভার

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'মায়ের প্রাণ' চিত্রে শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী। ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতায় প্রদর্শিত হইবে

দিলেন তুলসীকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলবার। ডাক্তার কৈলাসের ব্যারিস্টার প্রণয়িনী রেখা দেবী ব্যাপারটা ভাল মনে করলেন না, তিনিই তুলসীর বাবাকে চোর সাব্যস্ত ক'রে জেলে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ধারণা, মেয়েও আবার চুরি করবে। তুলসীকে নিয়ে ডাঃ কৈলাস ও রেখার মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগল।

ডাক্তার কৈলাসের ধারণা ছোটভাই সুধীরের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু সুধীর লুকিয়ে লুকিয়ে জুয়া খেলে এবং একদিন সে চুরি ক'রে বসল। এদিকে তুলসী তখন নিজেকে রেখা দেবী আর কৈলাসের বিচ্ছেদের কারণ মনে ক'রে দুঃখে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। চুরির অপরাধ এসে চাপল তার ঘাড়ে। সুধীরকে বাঁচাবার জন্য তুলসী আদালতে নিজেই সে অপরাধ

স্বীকার করে নিল। শেষ মুহূর্তে সুধীর আদালতে এসে আত্মসমর্পণ করল, তার জেল হ'ল।

এর মধ্যে এক বৎসর কেটে গেছে। আবার দেওয়ালী উৎসবের দিন, রেখার বাড়িতে উৎসবের ধূমধাম। ডাঃ কৈলাস সে বাড়িতে এসে দেখে সুধীর তুলসী ও তুলসীর বাবা আনন্দে মসগুল, আর রেখাই তার উদ্যোক্তা।

ছবির কাহিনীর মধ্যে অবান্তর দৃশ্যাবলী অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করলেও তার স্বাভাবিক গতি আছে, তবে শেষের দিকে রেখার মনের পরিবর্তন এমন হঠাৎ খাপছাড়াভাবে দেখানো হয়েছে যে, দর্শকদের খেই হারিয়ে হাতড়ে মরতে হয় একটা কিছু নাগাল পাবার জন্য। স্থানে স্থানে entertainmentএর দিকে ঝোঁক দিতে গিয়ে নাচ আর গানের একাধিক দৃশ্য জুড়ে দিতে হয়েছে ব'লে কাহিনী দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। শেষ দৃশ্যে এই দৈর্ঘ্যকে গুটিয়ে আনতে গিয়ে পরিচালক gap ফেলে গেছেন, সেখানে এসে দর্শকদের একবার হোঁচট না খেয়ে উপায় নেই।

ডাঃ কৈলাসের ভূমিকায় মোতিলালের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। তাঁর চলাফেরা, বলবার ভঙ্গি কোনকিছুর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই, অভিনয় প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। এর পরেই বলা যায় বাসন্তীর কথা। তার কয়েকটি গান ও অভিনয় প্রসংশনীয়, এমন কি ছবির নায়িকা রেখাও এর কাছে ম্লান হয়ে গেছে। ব্যারিস্টারণী রেখার ভূমিকায় মাধুরীর অভিনয় ভাল লাগেনি, বড্ড বেশী আত্মসচেতন এবং অভিনয়ে আড়ষ্টতা দূর হয়নি। সুধীরের ভূমিকায় সুরেশকে মনে রাখবার মতো। এই ছবিতে আরও তিনটি চরিত্র খাড়া করা হয়েছে কিছু হাস্যরস যোগাবার জন্যে। একজন হচ্ছেন আদর্শবাদী চিত্রশিল্পী রঙ্গিলাল, যিনি দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করবেন তবু চিত্রশিল্পকে ব্যবসার ক্ষেত্রে টেনে নামাতে চান না। আর আছে এক লক্ষপতি কৃপণ ও তার কুশ্রী কন্যা। এই তিনটি চরিত্র কাহিনী থেকে বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না। আরোও ভল হ'ত যদি two reeler ছবি ক'রে এই তিনজনকে আলাদা ক'রে আগে দেখিয়ে দেওয়া হোতো।

ছবির গানের দিকটি উপেক্ষণীয় না হলেও প্রশংসা করবার মত এমন কিছু হয়নি। সবশুদ্ধ এগারটি গানের মধ্যে বাসন্তীর কণ্ঠমাধুর্যের গুণে হাল্কা সুর ও ছন্দের দুখানিমাত্র গান মনে দোলা দেয়। ক্যামেরার কাজে কৃতিত্বের পরিচয় আছে, শব্দগ্রহণ সুস্পষ্ট।

সার্কো প্রোডাকসন্স-এর 'মধুসূদন' চিত্রের নায়িকা মায়া ব্যানার্জী। ছবিখানি গণেশ টকীজে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে

ইন্দ্র মুভীটোনের 'শকুন্তলা' চিত্রে মনোরঞ্জন ও জ্যোৎস্না। ছবিটি আগামী ৭ই জুন (শনিবার) 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট খেলাগুলি আগামী সপ্তাহের মধ্যে শেষ হইবে। ইহার পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে 'কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে', 'কাহার চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা আছে', ইত্যাদি আলোচনা এখন হইতেই চলিয়াছে। ইহার বোধ হয় প্রধান কারণ বাঙলার দুইটি জনপ্রিয় দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য প্রতিযোগিতা চলিয়াছে বলিয়া। ইহাদের একটির নাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও অপরটির নাম মোহনবাগান ক্লাব। এই দুইটি দলের মধ্যে একটি দলও এই পর্যন্ত কোন খেলায় পরাজিত হয় নাই। তবে মহমেডান স্পোর্টিং দল একটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করায় ও মোহনবাগান দুইটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করায় ইহাদের মধ্যে বর্তমানে একটি মাত্র পয়েণ্টের ব্যবধান রহিয়াছে। এই দুই দলের মধ্যে ব্যবধান সমান অথবা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা এখনও আছে। কারণ এই দুইটি দল এখনও পর্যন্ত পরস্পরের সহিত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাই। এই খেলাটি যেদিন অনুষ্ঠিত হইবে সেদিন মাঠে ভীষণ ভীড় হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুই দলের খেলার ফলাফল যাহা হইবে তাহার উপরই ক্রীড়ামোদিগণের আলোচনা বন্ধ হওয়া অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। তখন ক্রীড়ামোদিগণ একরূপ স্থির নিশ্চিত হইতে পারিবেন কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে।

মহমেডান স্পোর্টিং দল প্রতিযোগিতার সূচনায় যেরূপ খেলিতেছিল বর্তমানে তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল খেলিতেছে। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব দুইজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সূচনা অপেক্ষা খারাপ খেলিতেছে। সেই জন্য মনে হয় মোহনবাগান দল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সহিত পূর্বে মিলিত হইলে যেরূপ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিত, এখন সেরূপ পারিবে না। তবে ইহা ঠিক দলের সম্মান রক্ষার জন্য মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়গণ প্রাণপণ খেলিবেন। এই খেলাটি এই জন্য দর্শনযোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইষ্ট বেঙ্গল দল ধীরে ধীরে খেলার উন্নতি করিলেও মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের সমান পয়েণ্ট করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই দল বর্তমানে যেরূপ খেলিতেছে প্রতিযোগিতার সূচনায় যদি সেইরূপ খেলিত তবে ইহারা মহমেডান ও মোহনবাগান দলের সহিত লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপে সম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিত। তবে এখনও দ্বিতীয়ার্ধের খেলা বাকী আছে। এবং ঐ অর্ধে মহমেডান ও মোহনবাগান দলের খেলার যে হঠাৎ পতন হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং এই দলের খেলোয়াড়গণের চ্যাম্পিয়ান হইতে পারিবে না বলিয়া এখন হইতেই চিন্তা করিবার কোন কারণ হয় নাই।

শীল্ড বিজয়ী দলের খেলা

শীল্ড বিজয়ী এরিয়াল্স দল প্রতিযোগিতার সূচনায় বেশ ভালই খেলিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই দলের খেলা খুবই নৈরাশ্যজনক ও হতাশব্যঞ্জক হইতেছে। সম্প্রতি এই দল পর পর পাঁচটি খেলায় পরাজিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি খেলায় এই দল অধিক গোলে পরাজিত হইয়াছে। এইরূপভাবে এই দল যে নৈরাশ্যজনক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিবে ইহা অনেকেরই কল্পনাতীত ছিল। মোহনবাগানের পর আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হইয়া এই দল বাঙালী খেলোয়াড়গণের যে সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল বর্তমানে তাহা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অনেক ক্রীড়ামোদীই এই দল সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। কিন্তু বর্তমানে এই দল যেরূপ নিম্নস্তরের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে এই সকল সমর্থকগণ বিশেষভাবে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা এতদূর হতাশ হইয়াছেন যে, হতাশা তীব্র বিরক্তিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহারা এরিয়াল্স দলের প্রত্যেক খেলাতেই গোলমাল ও হৈচৈ করিতেছেন, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। আমরা আশা করি, এরিয়াল্স ক্লাবের পরিচালকগণ লীগ খেলায় দল যাহাতে আরও নিম্নস্তরের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন না করে ও খেলায় উন্নতি করে, তাহার দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। ভবানীপুর, কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি দল খেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহারা চ্যাম্পিয়ান তো হইবেই না, লীগ তালিকায় নিম্নভাগে অবস্থান করিবে, ইহা কি গৌরবের বিষয় হইবে?

নিম্নে প্রথম ডিভিসন লীগ খেলার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মহমেডান	৯	৮	১	০	২০	৪	১৭
মোহনবাগান	৯	৭	২	০	১৪	৩	১৬
ইষ্টবেঙ্গল	৯	৬	০	৩	১৬	৫	১২
রেঞ্জার্স	১১	৪	৪	৩	১৭	৮	১২
পুলিশ	৯	৫	১	৩	১০	৪	১১
কালীঘাট	৯	৪	০	৫	১০	১১	৮
এরিয়ান্স	৯	৪	০	৫	১০	১৫	৮
ডালহৌসী	১০	৩	২	৫	১১	১৭	৮
ই বি আর	১০	৩	১	৬	১৪	১৪	৭
ভবানীপুর	৯	৩	১	৫	৫	১০	৭
স্পোর্টিং ইউঃ	৮	১	৫	২	৩	৮	৭
নর্থ ষ্ট্যাফোর্ড	৯	২	২	৫	১০	১৩	৬
কাষ্টমস	৯	২	২	৫	৭	১৮	৬
ক্যালকাটা	১০	২	১	৭	৭	১৭	৫

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

সন্তোষ মেমোরিয়াল আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার আয়োজন হইতেছে। বাঙলা দেশের উপর "সি" বিভাগের ভার পড়িয়াছে। এই বিভাগে বাঙলা, বিহার ঢাকা ও যুক্তপ্রদেশ এই চারিটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। প্রথম রাউণ্ডে বাঙলা দল বা আই এফ এ দলের সহিত ঢাকা দলের খেলা হইবে। এই খেলা কলিকাতায় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। অপর খেলাটি হইবে যুক্তপ্রদেশ দলের সহিত বিহার দলের পাটনায়। এই দুইটি খেলার বিজয়ী দল দুইটি হয় পাটনায় না হয় লক্ষ্ণৌতে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ আছে। আই এফ এ এই আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপটি প্রদান করিয়াছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা কলিকাতায় হইবে বলিয়া অনুমতি দিয়াছেন। ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার চারিটি খেলা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবেই। এই জন্যই "সি" বিভাগের শেষ খেলাটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত না করিয়া পাটনায় অথবা লক্ষ্ণৌতে করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আই এফ এর প্রাদেশিক কমিটিই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই। আমরা কেবল ভাবিতেছি এই প্রতিযোগিতার জন্য আই এফ এর যে দল হইবে তাহাতে কতজন বাঙালী খেলোয়াড় স্থান পাইবেন। বর্তমানের কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন দলের খেলা অবলোকন করিয়া আমাদের ইহাই আশংকা হইতেছে যে, ঐ দলে বাঙালী খেলোয়াড়কে খুব কম সংখ্যাতেই খেলিতে দেখা যাইবে। অবাঙালী খেলোয়াড়গণ অধিক সংখ্যায় স্থান পাইবেন। ইহার পর ইউরোপীয়ানগণ। সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যা হইবে বাঙালী খেলোয়াড়ের। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার জন্য বাঙলার বিভিন্ন দলের পরিচালকগণ দায়ী। তাঁহারাই নিজ নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অবাঙালী খেলোয়াড়গণকে আমদানী করিয়া এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা যখন এইরূপ ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন তখন হইতে যদি বাঙালী খেলোয়াড়গণ এইরূপ আয়োজনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিতেন, তবে বর্তমানে বাঙালী খেলোয়াড়গণকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইত না। সুতরাং এখন যদি আন্দোলন আরম্ভ করেন, কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবাঙালী খেলোয়াড়গণ বাঙলার ফুটবল মাঠে যে সুনাম অর্জন করিয়াছেন, তাহা মুছিয়া ফেলা অল্প দিনে সম্ভব নহে। ইহার জন্য চাই নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর বাঙালী খেলোয়াড়গণের একতাবদ্ধ তীব্র প্রতিবাদ। তবে যদি কিছুকাল পরে কোন পরিবর্তন হয়। বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই।

ওয়াটার পোলো খেলা পরিচালনা

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের ওয়াটার পোলো পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা কিছু বলিয়াছি। সম্প্রতি আমরা আরও কতকগুলি বিষয় জানিতে পারিয়াছি যাহা শুনিবার পর আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি "পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি চরমে উঠিয়াছে।" বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ওয়াটার পোলো খেলার সংবাদাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ না করিয়া যে দোষ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা খেলা পরিচালনার জন্য যে সকল রেফারী নিযুক্ত করেন তাঁহারা এতই দক্ষ ও পক্ষপাত দোষশূন্য যে, ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সকল দলই একরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন 'লীগের খেলা শেষ পর্যন্ত খেলিতে সক্ষম হইবেন কি না।' এসোসিয়েশনের নিযুক্ত রেফারিগণের খেলা পরিচালনাই বিভিন্ন দলকে এইরূপ চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছেন যে, উক্ত রেফারিগণ না জানেন সাধারণ ওয়াটার পোলো খেলার নিয়মকানুন, না জানেন কোন দলের খেলোয়াড়ের খেলা নষ্টকারী হাবভাব ধরিতে। কোন খেলোয়াড় অযথা চিৎকার করিয়া উঠে 'ফাউল ফাউল', অমনি রেফারী হুইসিল দেন। ফাউল হইয়াছে কি না তাহা ভাল করিয়া দেখেন না বা জানিবার চেষ্টা করেন না। একাধিকবার একই খেলোয়াড় যদি ঐরূপ চিৎকার করে তখন রেফারী জল হইতে তুলিয়া দেন নিরীহ প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে। ফলে হইতেছে এই যে, উক্ত অনিষ্টকারী খেলোয়াড়ের ইঙ্গিতে প্রতিপক্ষ দলের তিন চারিটি খেলোয়াড়কে অযথা জল ত্যাগ করিতে হইতেছে। এইরূপ এক সঙ্গে তিনজন খেলোয়াড় মাঠে না থাকায় দল শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে যেখানে জয়লাভ ছিল নিশ্চিত। তাহার উপর পরাজিত দল যদি রেফারীর নিকট কোন প্রতিবাদ জানায় ফল হয় বিপরীত। তিনি রাগিয়া হন খুন। বিজিত দলের পরবর্তী খেলায় তিনি পরিচালনা করিতে আসিয়া অহেতুক 'হুইসিল' দিয়া দলকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলেন। স্বাভাবিকভাবে খেলিবার কোনই সুবিধা দেন না। ফলে ঐ দলের খেলোয়াড়গণ মরিয়া হইয়া পড়েন। দুই দলের মধ্যে লাগিয়া যায় ভীষণ মারামারি। রেফারী তখন মারামারি করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সক্ষম হন না। হয় দেন খেলা বন্ধ করিয়া না হয় অযথা উভয় দলের একে একে খেলোয়াড় তুলিয়া খেলা একেবারে নষ্ট করিয়া দেন। দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া উত্তেজিত হয়। খেলার শেষে দেখা যায় রেফারী দৌড়াইতেছেন, পিছনে ছুটিয়াছে একদল 'মার মার' শব্দ করিয়া। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া ও শুনিয়া কে না বলিবে 'ত্রুটি-বিচ্যুতি চরমে উঠিয়াছে'? বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ইহা বন্ধ করিয়া নিজেদের সুনাম রক্ষার কি ব্যবস্থা করিবেন?

সমর বার্ত্তা

২৮শে মে—

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট গত রাত্রে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "পূর্ণ জরুরী অবস্থা" ঘোষণা করেন।

লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, ক্রীটের সামরিক পরিস্থিতি গুরুতর। মালেমী-কানিয়ার মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলের চারি পার্শ্বে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মানরা মালেমীতে এখনও সৈন্য অবতরণ করাইতেছে। কানিয়াতে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইবার পর বৃটিশবাহিনী পশ্চাৎ দিকের অধিকতর সুবিধাজনক ঘাঁটিতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

বৃটিশ নৌ বিভাগের এক ইস্তাহারে ঘোষিত হয় যে, ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণে আরও চারিটি শত্রুপক্ষীয় জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী গভর্নমেণ্ট পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্টকে লিখিতভাবে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ফরাসী নৌবহর এবং ফরাসী উপনিবেশসমূহ জার্মানি বা অপর কোন শক্তির নিকট সমর্পণ করা হইবে না।

২৯শে মে—

বৃটিশ নৌ বিভাগ হইতে ঘোষিত হয় যে, জার্মান রণতরী বিসমার্ক ধ্বংসের কার্যে সাহায্য করিবার সময় বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার 'ম্যাসেনার' জার্মান বিমানবহরের আক্রমণে জলমগ্ন হয়। উহার ৪৬জন নাবিক নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃটিশ নৌবাহিনী সমুদ্র-বক্ষ হইতে বিসমার্কের একশতাধিক অফিসার ও নাবিককে উদ্ধার করিয়া বন্দী করিয়াছে। বিধ্বস্ত বৃটিশ রণতরী 'হুডে'র মাত্র তিনজন প্রাণে বাঁচিয়াছে। 'হুড' জাহাজের জনসংখ্যা ছিল ১৩৪১জন।

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী কায়রোতে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ, ক্রীটে প্রচণ্ড হাতাহাতি সংগ্রাম চলিতেছে। জার্মানরা বিমানে অবিরামভাবে সৈন্যাদি আমদানী করিতেছে। জার্মানরা কানিয়া দখলের দাবী করে; কিন্তু লণ্ডনে উহা সমর্থিত হয় নাই। ক্রীটের হেরাক্লিয়ন, রেতিমো ও কানিয়ার উপর জার্মানরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে, ফলে তিনটি প্রধান শহর একে-বারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

সুডা উপসাগরে বৃটিশ ক্রুজার 'ইয়র্ক' শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষণের ফলে ধ্বংস হইয়াছে।

কর্নেল লিণ্ডবার্গ ফিলাডেলফিয়ায় এক যুদ্ধবিরোধী সভায় এই সতর্ক বাণী করেন যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট গত মঙ্গলবার যে পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন, আমেরিকা যদি তাহা অনুসরণের চেষ্টা করে, তাহা হইলে "আমরা দুই গোলার্ধের মধ্যে এমন এক যুদ্ধ বাধাইয়া দিব যাহা বহু পুরুষকাল স্থায়ী হইতে পারে।"

কুর্ট ফন রীথকে নিউইয়র্কে এক হোটেলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি ১৯৩৪ সালে অস্ট্রিয়ায় ব্যর্থ নাৎসী অভ্যুত্থানের সময় জার্মান দূত নিযুক্ত ছিলেন।

৩০শে মে—

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহল বলেন যে, ক্রীটের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। জার্মানরা হেরাক্লিয়ন দখলের যে দাবী করিয়াছে, তাহা লণ্ডনে সমর্থিত হয় নাই।

বাগদাদের এক সংবাদে প্রকাশ, বালক রাজা ফয়জল সহ রসিদ আলি উত্তর দিকে পলায়ন করিয়াছেন। লণ্ডনে সরকারী-ভাবে ঘোষিত হয় যে, রসিদ আলি ইরাক হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার সমর পরিষদের অধিনায়ক আমিম জাকি সহ ইরান যাইয়া পৌঁছিয়াছেন।

৩১শে মে—

লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, ক্রীটে বৃটিশ সৈন্যেরা সুদা উপসাগর এবং কানিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে তাহারা এখনও হেরাক্লিয়নে আছে; সেখানে এখন প্রবল লড়াই চলিতেছে।

আয়ারের রাজধানী ডাবলিনের উপর বিদেশী বিমান বোমা-বর্ষণ করে। অনেক বাড়ি ঘর ধ্বংস ও বহুলোক হতাহত হইয়াছে।

ইরাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাগদাদ হইতে প্রতিপক্ষীয় ইরাকীগণ যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জ্ঞাপনের ও রসিদ আলি এবং তাহার সহচরগণের ইরাক হইতে পলায়নের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে কায়রো হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃটিশবাহিনী বাগদাদের উপকণ্ঠে গত রাত্রিতে (শুক্রবার) পৌঁছে এবং ইরাকের রাজধানীর শহরতলীতে প্রবেশ করিয়াছে।

১লা জুন—

বৃটিশ সমর দপ্তরের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১২ দিন ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম চালাইবার পর বৃটিশবাহিনী ক্রীট ত্যাগ করিয়া আসিতেছে এবং বৃটেনের পক্ষের ১৫ হাজার সৈন্য মিশরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ক্রীটের যুদ্ধই যে বর্তমান মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ডতম সংঘর্ষ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংগ্রাম না চালাইবার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে বিমানের সাহায্য না পাইলে ক্রীটে ও উহার আশেপাশে বৃটেনের নৌ ও সামরিকবাহিনীর পক্ষে অনির্দিষ্টকাল সংগ্রাম চালান সম্ভব নহে।

ইরাকী মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গত শনিবার ২৮শে মে রাত্রিতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অদ্য প্রাতঃকাল আট ঘটিকা হইতে ইরাকে যুদ্ধবিরতি হইয়াছে এবং রিজেণ্ট আবদুল ইল্লাহ অদ্য প্রাতে বাগদাদে প্রবেশ করিয়া-ছেন।

কায়রোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইরাকীদের যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্তানুযায়ী এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, শান্তির সময়ে ইরাকীবাহিনী যে সব ঘাঁটিতে ছিল সেই সব ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং বৃটিশ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও এক্সিসপক্ষীয় বন্দীদিগকে ইরাকে অন্তরীণ করা হইবে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, ইরাকের রাজা ফয়জল বাগদাদে নিরাপদে আছেন। জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতিও রসিদ আলির সহিত পলায়ন করিয়াছেন।

মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট কার্ডিনাস ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত হইলে মেক্সিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করিবে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, নরওয়েস্থিত প্রধান জার্মান নৌ সেনাধ্যক্ষ এডমিরাল বোয়েম অসলোর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

২রা জুন—

কলম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত আনকারার বেতার সংবাদে প্রকাশ, জার্মান সৈন্যদল উপকূল বাণিজ্যে ব্যবহৃত একখানা মালবাহী জাহাজে সিরিয়ায় পৌঁছিয়াছে। উহাদের সহিত নাকি হাল্কা ট্যাঙ্কও আছে। উক্ত মালবাহী জাহাজখানি দোদেকেনিস্ দ্বীপ হইতে রওনা হইয়া সাইপ্রাস দ্বীপ ও তুরস্কের উপকূল ধরিয়া অলক্ষ্যে সিরিয়ায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, সিরিয়ার হাই কমিশনার জেনারেল ডেনৎস পূর্ব সিরিয়ার অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করিয়াছে।

অস্ট্রিয়া ও ইতালীয় সীমান্তে ব্রেনার গিরিবর্ত্মে হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে আন্ত-রিকতাপূর্ণ আলোচনা হয় এবং আলোচনার উপসংহারে রাষ্ট্র-নায়কদ্বয় আলোচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হন।

গত শনিবার ডাবলিনের উপর বোমাবর্ষণের ফলে ২৭জন নিহত ও প্রায় ৮০জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৮শে মে—

গত ২৫শে মে রাত্রিতে বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হয়। উহার ফলে সমগ্র মহকুমা বিধ্বস্ত হইয়াছে। ভোলা শহরে মাত্র ১২টি পাকা বাড়ী দণ্ডায়মান আছে; অপর সমস্ত বাড়ীঘর ভূমিসাৎ কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়; সমস্ত কুটীর ভূমিসাৎ হইয়াছে। ঘূর্ণিবাত্যার সহিত প্রচণ্ড বেগে জোয়ারের জল আসে। শহরে পাঁচ ফুট এবং অনেক চরে ১০ ফুট জল হইয়াছিল। জলে গ্রামবাসীদের ঘরের সমস্ত ধান, চাউল, ডাল প্রভৃতি খাদ্য শস্য ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার গরু, মহিষ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আশঙ্কা করা হইতেছে যে, সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

নোয়াখালির উপর দিয়াও প্রবল বারিপাতসহ প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ফলে শহরের ও পল্লী অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাই শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুইজন নিহত ও ১৫জন আহত হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, তাঁহার পুত্র শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঞ্জিৎকুমার বসুর বিরুদ্ধে আব্দুলবারি হাওলাদার নামক কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের জনৈক ওয়াচারকে প্রহার করিবার অভিযোগে যে মামলা আনা হইয়াছে, আসামী পক্ষের দরখাস্ত অনুযায়ী আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৭ই জুন পর্যন্ত শুনানী মুলতুবী রাখেন।

ভারতরক্ষা আইন—কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশ কমরেড শৈলেন বসুকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে। মিঃ সুজাত আলি মজুমদার নামক একজন কৃষাণ কর্মীকে নোয়াখালি জেলায় যাইয়া বাস করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কলিকাতার বীরসিং নামক একজন পাঞ্জাবী অধিবাসীকে বাঙলা সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে বাঙলা দেশ ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেন।

২৯শে মে—

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অদ্য কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ আমেরী জানুয়ারী মাস হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপর অধিকতর কড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া মিঃ সোরেন্সেন যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করেন।

ছোটনাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনারের নিকট পিটারবার দাঙ্গার মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। এই মামলায় ৩৭জনের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারা (নরহত্যা) ও অন্যান্য কয়েকটি ধারায় অভিযোগ আনা হইয়াছে।

খুলনার এসিস্ট্যাণ্ট সেসন জজ মিঃ এস পি রায় বীরাঙ্গ অপহরণ মামলায় আসামী আব্দুল খালেক সেখ, ইমানদ্দী সেখ ও হামিদ সেখকে চারি বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডি করেন।

৩০শে মে—

বোম্বাইয়ে সাতজনকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গত রাত্রিতে আহত যে সমস্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আরও দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দাঙ্গার ফলে এ পর্যন্ত ৩৯জন হত এবং ২০০জন আহত হইয়াছে।

সিমলায় শ্রীযুত কে শ্রীনিবাসনের সভাপতিত্বে সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়।

বার্লিন হইতে 'নিউইয়র্ক টাইমস'এ প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব কাইজার দারুণ সর্দি ও অন্ত্রপীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে সন্দিহান।

৩১শে মে—

বরিশাল জেলার ভোলা, সদর এবং পটুয়াখালি মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ঘূর্ণিবাত্যার ফলে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের দুর্দশার মর্মন্তুদ কাহিনী এবং বহু লোকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কংগ্রেস, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মহাসভা, মহাজন সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের সেবা ও সাহায্য করিতেছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ঘূর্ণিবাত্যা অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য বরিশাল যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্তা শশিপ্রভা দত্ত মৌলবী-বাজারের আদালত প্রাঙ্গণে সত্যাগ্রহ করিবার অপরাধে পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে পাঁচ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জি এবং আরও কয়েকজনকে লইয়া ঢাকা অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির সমক্ষে উপস্থিত থাকিবেন।

বাঙলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর কয়েকটি বাধা নিষেধ আরোপ করিয়া বাঙলা সরকার গত ২২শে মার্চ যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দাঙ্গার সংবাদ—বোম্বাইয়ে ছুরিকাঘাতে একজন নিহত হয়। আমেদাবাদে ছুরিকাঘাতে একজন শিক্ষয়িত্রী আহত হয়।

শ্যামের ভূতপূর্ব রাজা প্রজাধিপক স্যারের অন্তর্গত ভার্জিনিয়া ওয়াটারে তাঁহার বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছেন।

১লা জুন—

বরিশাল জেলায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ও তৎসহ জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের ফলে ১৫ লক্ষ লোক অল্পাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনুমান এই যে, এই প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যায় দুই হাজার হইতে তিন হাজার লোকের প্রাণহানি হইয়াছে। এই ঘূর্ণিবাত্যায় ভোলা মহকুমাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তেঁতুলিয়া ও মেঘনা নদীতে ও ভোলা মহকুমার বিভিন্ন খালে বহু নরনারী ও শিশুর মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

দাঙ্গার সংবাদ—বোম্বাইয়ে ছুরিকাঘাতে তিনজন নিহত হয়। লক্ষ্ণৌয়ের বিট্রাইচ নামক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৩৬জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিখ্যাত বৃটিশ ঔপন্যাসিক স্যার হিউ ওয়ালপোল পরলোকগমন করিয়াছেন।

২রা জুন—

ঢাকায় বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে বিচারপতি মিঃ ম্যাকনেয়ার (প্রেসিডেণ্ট) ও মিঃ ডব্লিউ ম্যাকসার্পকে লইয়া গঠিত দাঙ্গা তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠক হয়।

শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার গত ১৩ই এপ্রিল "জাতীয় সপ্তাহ" উপলক্ষে বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তৎসম্পর্কে আজ প্রাতে তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে তাঁহাকে কলিকাতার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মামলাটি আগামী ৪ঠা জুন পর্যন্ত মুলতুবী রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুত মহাদেব দেশাই সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের মুলতুবী বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়।

পুস্তক পরিচয়

যুগের দাবী—শ্রীশশধর দত্ত, জয়শ্রী পুস্তকালয়। ১৬৫নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন; সুতরাং বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অপরিচিত নহেন। আমরা তাঁহার লিখিত 'যুগের দাবী' পাঠ করিলাম; তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থের ন্যায় এই বইখানিতেও একটা বিষয় আমাদের নজরে পড়িল, তাহা হইল বাস্তব অনুভূতির অভাব এবং সুলভ লোকপ্রিয়তা খুঁজিয়া বাহির করার দায়ে আখ্যানভাগের মধ্যে আরোপাংশের আধিক্য। শ্রমিক সমস্যা লইয়া উপন্যাসখানি লিখিত কিন্তু শ্রমিক জীবনের আবেষ্টন, সুখ-দুঃখের সুনিবিড় বেদনা গল্পাংশে তেমন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির আলোকের খেলা উপন্যাসখানাতে কম, এইজন্য মনকে সুনিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়া ইহা নাড়া দেয় না, অপেক্ষাকৃত চমকপ্রদ সস্তা প্রয়োগকৌশল উপন্যাসখানাতে আছে; কিন্তু এমন সস্তা চমক সৃষ্টির অপেক্ষা প্রগাঢ় মননশীলতারই আজ প্রয়োজন বেশী। শ্রমিক জীবনকে মর্যাদাময় ও মাধুর্যময় করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইলে প্রত্যক্ষ হয় রসসংস্পর্শের প্রয়োজন উপন্যাসখানিতে তাহার অভাব অনেকেরই চোখে পড়িবে।

কল্পনা—কালীশ মুখোপাধ্যায়। মূল্য সাত আনা। প্রকাশক—সংস্কৃতি পরিষদ, ৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের বই। লেখকের উদ্যম অতি মহান্ এবং আদর্শ খুবই উঁচু। যে বেদনাটি এই ছোট বইখনানার ভিতর দিয়া তিনি বাঙলার ছেলেমেয়েদের বুকে জাগাইতে চাহিয়াছেন, তাহাকে অতর্কিত রসরূপ দেওয়া খুবই কঠিন। শিশুদের অন্তর পাণ্ডিত্য বা সিদ্ধান্ত ধরিতে পারে না, তাহাদের মন খুঁজে রূপের স্বচ্ছন্দ সংস্পর্শকে। তাহাদের চিত্তে এমন উচ্চ আদর্শের ছন্দটি বাজাইয়া তুলিতে হইলে প্রচুর তপস্যার প্রয়োজন। বইখানাতে তত্ত্বের সূক্ষ্মতা রসরাগে ততটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, শিশু চিত্তকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে যতটা ঔজ্জ্বল্যের প্রয়োজন ছিল, বইখানা পড়িয়া এই কথাই আমাদের মনে হইল। তবে এমন প্রচেষ্টা যতটা সার্থকতা লাভ করে ততই ভাল, এজন্য আমরা লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি। বাঙলার ঘরে ঘরে এমনই বই ছেলেমেয়েদের হাতে দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইব। নির্যাতিতা, প্রপীড়িতা বাঙলা মায়ের বন্দনা গীতি বাঙলার ছেলে-মেয়েরা যেন না ভুলে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন যা রচনা, লেখকের কণ্ঠে মিলাইয়া আমরাও ইহাই প্রার্থনা করি।

বইখানায় দুইটি বানান ভুল আছে, 'তোড়ন সাড়ি সাড়ি পদ্মফুল' এই রকম। তাহা ছাড়া তথ্যের সম্বন্ধেও একটা ভুল আমাদের চোখে পড়িল। এক জায়গায় লেখা হইয়াছে—"নাইট্যাঙ্গেলের নাম জান কি না জানি না। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনিও ব্রিটিশ সৈনাদের শুশ্রূষায় নিজকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।" গত মহাযুদ্ধ বলিতে নির্দিষ্টভাবে জার্মান সংগ্রাম বুঝায়। নাইটিঙ্গেল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহতদের শুশ্রূষার ভার লইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে এই ভুলগুলি সংশোধিত হইলে আমরা সুখী হইব। বলা বাহুল্য, আমরা এমন বইয়ের বহুল প্রচার সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই, সুদৃশ্য এবং মনোরম।

দাবী—তড়িৎকুমার বসু। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্তৃক ১১০।২, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে উপন্যাস-সাহিত্য বলিলে ভুল করা হইবে। আজকাল 'চিত্র-নাট্য-রূপী-কথা-সাহিত্য' অর্থাৎ 'সিনারিও-সাহিত্য' নামে একজাতীয় সাহিত্য চলচ্চিত্র জগৎকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা তাহারই একটি উদাহরণ। নায়ক-নায়িকা খাড়া করিয়া কেবল সংলাপের সাহায্যে চরিত্রগুলিকে ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সে চেষ্টা কিয়দংশে সফলও হইয়াছে। সাহিত্য-রস বিবর্জ্জিত বলিয়া বইখানি সাধারণ পাঠকের নিকট উপভোগ্য না হইলেও 'চিত্র-নাট্য-রূপ' সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করিতে চান, তাঁহারা বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারেন। বইখানিতে যে নূতনত্বের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু সে চেষ্টার সাফল্য বিচার করিবেন পাঠকবর্গ।

সাহিত্য সংবাদ

তরুণ সাহিত্য বাসর

তরুণ সাহিত্য বাসর কর্তৃক আহূত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রকাশিত হইল। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে এপ্রিলের শেষভাগে অনুষ্ঠিত তরুণ সাহিত্য বাসরের ১ম বার্ষিক সম্মিলনীতে উক্ত পুরস্কার সকল বিতরিত হইয়াছে।

(১) ছোট গল্প (পদক) ১ম—শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ, যশোহর।

(২) সাহিত্যে সাম্যবাদ (কাপ) ১ম—কুমারী নীলিমা বেদতীর্থ, হাওড়া।

(৩) সিরাজউদ্দোলার জীবনী (পদক) ১ম—শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য, ২৪ পরগণা।

(৪) বঙ্গ সাহিত্যে নারীর দান (পদক) ১ম—ইলা বসু, কলিকাতা।

(৫) সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশে (পদক) ১ম—আবদুর রহিম, শ্রীহট্ট।

(৬) বাঙলার কৃষকের দুরবস্থা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় (পদক) ১ম—কুমারী অলকা মজুমদার, দিনাজপুর।

(৭) 'বাঙলা সাহিত্যে যশোহরের দান' প্রবন্ধ—উপযুক্ত সংখ্যক লেখা না আসায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইয়াছে।

—মহম্মদ আবুল কাশেম, সম্পাদক, 'তরুণ সাহিত্য বাসর'।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাসুল সহ ৬৷৷০ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর টাকা	৬ মাস টাকা	৩ মাস টাকা	১ মাস টাকা	এক সংখ্যার জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এক-কালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্ম্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮ম বর্ষ] ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 14th June, 1941. [৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বরিশাল ও নোয়াখালি—

বাঙলার রাজস্ব সচিব স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় গত রবিবার টাউন হলের সভায় বরিশাল জেলার ঝঞ্ঝাবাত্যায় ৫ হাজার লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমরা যে সব খবর পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, কেবল এক ভোলা মহকুমার মৃত্যু সংখ্যাই ঐরূপ হইবে, বরিশালের অন্য স্থানের হিসাব তো আছেই। লোক তো মরিয়াছে; কিন্তু যাহারা জীবিত আছে, তাহারাই বা আছে কি অবস্থায়? সে অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে; অবিলম্বে সাহায্য যদি না করা হয় তাহা হইলে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বরিশালের যে অবস্থা, নোয়াখালির অবস্থা ঠিক ততটা খারাপ না হইলেও কম কিছু নয়। আজ প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন চিকিৎসা-ব্যবস্থার, প্রয়োজন যাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে তাহাদিগকে আশ্রয় দানের। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সেদিন টাউন হলের সভায় বলিয়াছেন যে, ভোলার অবস্থা দেখিয়া আসিবার পর হইতে তাঁহার চোখে নিদ্রা নাই, স্যার বিজয়প্রসাদও আবেগের কথা অনেক বলিয়াছেন; কিন্তু শুধু আবেগ প্রকাশে সমস্যার সমাধান হইবে না; দরকার অবিলম্বে কাজের, দরকার টাকার। গভর্নমেণ্ট যে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যেরই মত। দেশবাসীর এ প্রসঙ্গে কর্তব্য আছে ইহা সত্য; কিন্তু গভর্নমেণ্টের কর্তব্য সকলের আগে। স্যার মন্মথনাথ মুখুজ্যেকে সভাপতি করিয়া টাউন হলের সভায় একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং মৌলবী ফজলুল হক এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। সমিতির গঠন সুযোগ্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ভরসা হইল বাঙলার তরুণেরা। বাঙলার উপর দুর্বিপাক যখন আপতিত হইয়াছে বর্ধমানের বড় বন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত বাঙলার তরুণেরাই নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া দেশবাসীর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে রাজরোষকেও তাহারা এজন্য গ্রাহ্য করে নাই। আজ বাঙলায় যে বিপদ আসিয়াছে ইহা হইতেও বিপন্নকে রক্ষা করিবে বাঙলার সেই যুবক দলই। আমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছি; তাহারা বঙ্গব্যাপী সাহায্য কেন্দ্রসমূহ গঠন করিয়া বিপন্নদের রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করুক এবং নিজেরা ছুটিয়া যাউক বিপন্নের দ্বারে দ্বারে সাহায্য লইয়া। বৈষম্যের যত গ্লানি দুর্দৈবের এই পীড়নে এবং তাড়নে আজ তাহা দূর হউক।

চাউলের দর ও গভর্নমেণ্ট—

চাউলের দর ক্রমেই চড়িতেছে; কিন্তু বাঙলা সরকার এক বিবৃতি দিয়াই খালাস। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমানে চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না; কারণ, আসল কারণ দেশে চাউলেরই অভাব। এ বৎসর চাউল উৎপন্নই হইয়াছে কম, তাহার উপর জাহাজের অভাবে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানীও কম হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ সব যুক্তিতে এ সম্বন্ধে দায়িত্ব এড়ান গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হয় না। চাউলের যদি সত্যই অভাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেশের লোকের অন্নাভাব মিটাইবার মত চাউল না জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে চাউলের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা তো করা হইতেছেই না, বরং চাউলের রপ্তানী যুদ্ধের টানে বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধ যতই প্রবল আকার ধারণ করিবে, ততই এই রপ্তানীর স্রোত বাড়িবে; তখন দেশের লোকের অবস্থা কি দাঁড়াইবে গভর্নমেণ্ট কি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? প্রত্যেক দেশের গভর্নমেণ্টই এইরূপ সমস্যার ক্ষেত্রে দেশের লোকের যাহাতে খাদ্যাভাব না ঘটে সেই দিকে প্রথমে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা দুনিয়াছাড়া। তারপর জাহাজের অভাবের কথা। বঙ্গোপসাগরে এমন কিছু শত্রুপক্ষের উপদ্রব দেখা

দেয় নাই, জাহাজের অভাব অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় না—সংকট-সঙ্কুল সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়া বিলাতের লোকের অন্নের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, আর ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙলা দেশে চাউল আমদানী করিবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করা যায় না, এ সব কৈফিয়ৎ হইতে কি মনে হয়? মনে হয় এই যে, আমাদের দুঃখ-কষ্ট, সবই গৌণ ব্যাপার। আমাদের এই অসহায়ত্ব উপলব্ধি করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখে বলিয়াছেন,—"খাদ্য বোঝাই জাহাজসমূহ পাহারা দিয়া ইংলণ্ডে আনিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইতেছে অথচ আমার স্বদেশের লোকগণ অনাহারে মরিয়াছে তথাপি তাহাদের জন্য পার্শ্ববর্তী জিলা হইতে একটি গরুর গাড়ী বোঝাই চাউলও আনীত হয় নাই, তখন আমি স্বদেশের ইংরেজ ও ভারতের ইংরেজদের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া পারি না।" বাঙলার অন্নসমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিবে, এমন অবস্থায় শাসকদের যদি কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ থাকে, তাহা হইলে সকলের আগে এদেশের অন্নাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

কি হ'ত জীবের গতি—

ভারতবাসীদিগকে যাহারা প্রীতির চক্ষে দেখে না, যাহারা চাহে ভারতবাসীদিগকে নিগ্রহ করিতে, তাহাদের কথার ঘা বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু ভারতহিতৈষী নামে পরিচয় দিয়া যাঁহারা অনুগ্রহ বা কৃপাবর্ষণে ভারতবাসীদিগকে কৃতার্থ করিতে আসেন, তাহাদের মনোবৃত্তির মধ্যে অবমাননার যে ছুরি থাকে, তাহার আঘাত ভারতবাসী হিসাবে আত্মমর্যাদাবোধ, ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ, যাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র আছে, তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে; মিস রাথবোনের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথের অন্তর হইতে ভারতের মর্যাদাবুদ্ধিরই বহ্নিজ্বালা বিকীর্ণ হইয়াছে। ইংরেজের অনুগ্রহেই ভারতবাসীরা মানুষ হইয়াছে, ইংরেজের পদরজ এদেশে না পড়িলে এদেশের লোকেরা বর্বরের জীবন যাপন করিত, তথাকথিত ভারতহিতৈষী ইংরেজদেরও এই ধারণা রহিয়াছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ এমন ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব একদিন ইংলণ্ডে দাঁড়াইয়াই দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, —"আপনারা ইংরেজেরা আমাদের দেশে গিয়া আমাদিগকে সভ্য করিয়াছেন, ইহা মনে করিবেন না; আপনাদের পূর্বপুরুষেরা যখন গাছের ডালে ডালে লাঙুল জড়াইয়া ঝুল খাইতেন, তাহার অনেক পূর্ব হইতেই আমাদের সভ্যতা দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।" ইংরেজ এদেশের লোককে যে শিক্ষা দিয়াছে এবং দিতেছে, কবি তাহার স্বরূপ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষায় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে কুশিক্ষিত করিবার সরকারী প্রচেষ্টাসত্ত্বেও উহা দ্বারা লাভবান হইয়াছেন। ভারতে শিক্ষার সরকারী ব্রিটিশ খাত দিয়া বিদ্যালয়ে আমাদের সন্তানসন্ততিদের নিকট ইংরেজী চিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু আসে নাই, উহার উচ্ছিষ্ট আসিয়াছে এবং সেই উচ্ছিষ্ট ভারতবাসীদিগকে তাহাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রের পুষ্টিকর সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।" দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের অবস্থা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কবি তাহা জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি ভাবিয়াছিলাম, সুরুচিসম্পন্ন ইংরেজগণ এই সযত্ন অন্যায়ের জন্য অন্তত নীরব থাকিবেন এবং আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন; কিন্তু তাঁহারা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন ইহা শালীনতার সীমার বহির্ভূত।" পরাধীনের জীবনে নিগ্রহ অনেক আছে, কিন্তু প্রভুত্বস্পর্ধীদের এই অনুগ্রহের নিগ্রহই সবচেয়ে তাহার পক্ষে বেশী বেদনাদায়ক। এই অনুগ্রহের নিগ্রহ হইতে ভারত কবে নিষ্কৃতি লাভ করিবে জানি না।

জগৎবাসীর জন্য চিন্তা—

যুদ্ধের দৌলতে জার্মানদের 'নূতন বিধান' জাপানীদের 'নবীন প্রাচী', কত কথাই আমরা শুনিতেছি, ব্রিটিশ রাজনীতিকরাও অবশ্য এমন ধরণের নূতন কিছু গড়িবার জন্য বিদ্যা ফলাইতে কসুর করে নাই। মিঃ এডেনের মুখে যুদ্ধের পর তাঁহাদের পরিকল্পনা কি, তাহা আমরা কিঞ্চিৎ শুনাইয়াছি। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নূতন গড়িবার এই বিদ্যা এতদিন পর্যন্ত নিবদ্ধ ছিল কেবল ইউরোপের মধ্যে, কোন প্রভুই ইউরোপের বাহিরে কালা আদমীর দেশের জন্য মাথা ঘামান প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সেদিন ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মনে যাহাই থাকুক, আগে অন্তত মুখে ভারতপ্রীতি ফলানোর একটা রেওয়াজ তাহাদের মধ্যে ছিল; কিন্তু এবারকার শ্রমিকদের এই সভায় ভারতের সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও একটি কথা কেহ উচ্চারণ করেন নাই। শ্রমিক দলের নেতা মিঃ আর্থার হেণ্ডারসনের বক্তৃতায় বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মত শুধু ইউরোপের জন্য না ভাবিয়া জগতের জীবজনের জন্যও কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আগে যুদ্ধ জয় করা আমাদের দরকার, তার পর জগৎবাসীদের জন্য বিবেচনা করিবার প্রয়োজন পড়িবে। জগৎবাসীদিগকে ব্রিটিশ পরিকল্পিত এই নূতন বিধানের সম্পদ কি ভাবে দান করা হইবে, হেণ্ডারসন সাহেব সে সম্বন্ধে বড় রকমের একটা প্রস্তাব ফাঁদিয়াছেন। তিনি বলেন, শুধু ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলই নয়, ব্রিটিশ এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ যুক্ত একটি ঘোষণা করিবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করিবে তাহা সমর্থন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, জগতের দুর্গত এবং অধীন জাতিরা এই উক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ধরা যাউক, ভারতবর্ষেরই কথা। প্রথমত, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এককভাবে নিজেরা তাঁহাদের নিজেদের নীতি নির্দেশ করিলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইংরেজের মিত্রশক্তিদের অসুবিধা ঘটিবার কোন কারণই কল্পনা করা যায় না এবং সেজন্য যুদ্ধে জয়লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করারও কোন

সঙ্গত কারণ নাই। আজ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি সিরিয়া এবং লেবাননবাসীদিগকে স্বাধীনতা দিবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, সেজন্য যদি যুদ্ধে জয়লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না হয় এবং যুদ্ধে জয়লাভে সুবিধা হইবে বুঝিয়াই যদি তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের সম্বন্ধে তেমন প্রতিশ্রুতি দিতে বাধা কোথায়? ভারতের জাতীয় মহাসমিতি তেমন প্রতিশ্রুতি চাহিতেছেন এবং চাহিতেছেন ইহাই জানাইয়া যে, তাহা হইলে ইংলন্ডের যুদ্ধ জয়ে সহায়তার ভারতবাসীদের সর্বজনীন আন্তরিকতা জাগ্রত হইবে, ইহাই কি বাধা? যুক্তি যেমনই উদ্ভট, তেমনই উৎকট! লণ্ডন শহরের একটি খবরে জানা যাইতেছে যে, পার্লামেণ্টের ব্রিটিশ শ্রমিক দল সত্বরই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে তাঁহাদের ভারত সম্পর্কিত বর্তমান নীতি কি, ইহা ঘোষণা করিতে বলিবেন। ইহাও শুনা যাইতেছে যে, রুশিয়া হইতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ যখন ফিরিতেছেন, তখন তাঁহাকেই ব্রিটিশ দলের প্রতিনিধিস্বরূপে ভারতে পাঠান হইবে। ইংলন্ডের শ্রমিক দলের ভারত-সম্পর্কিত কর্মতৎপরতার দৌড় যে বিশেষ কিছু হইবে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের সে বিশ্বাস নাই; তবে আমাদের কথা এই যে, পার্লামেণ্টে মামুলী প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই চলিবে না, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি যে দাবী করিয়াছেন, তাহা মানিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে বাধ্য করিতে হইবে। ব্রিটিশ শ্রমিক দল তাহা করিতে রাজী আছেন কি? যদি না থাকেন, তাহা হইলে ভারতের সম্বন্ধে নীরব থাকাই বরং তাঁহাদের পক্ষে ভাল, নিষ্ফল সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া কালা আদমীর দলকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

খাকসার দলন—

খাকসারেরা দেশের জন্য, জাতির জন্য কোন্ ভাল কাজটা করিয়াছে, আমরা জানি না। তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখপত্রেই প্রকাশ,—'আমরা সমগ্র জগতের মুসলমানদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুসলমানদের একজন আমীর ও একটি প্রতিষ্ঠানের অধীন থাকা উচিত। হিটলার যদি সমগ্র পৃথিবীতে নাৎসীবাদ প্রচার করিতে পারেন, মুসোলিনী যদি পৃথিবী জুড়িয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে পারেন, স্ট্যালিন যদি কমিউনিজমকে জীবন্ত বাস্তবে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তবে খাকসার দলও ইসলাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।' কোন্ উপায়ে হইবে এই ইসলাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা? এ সম্বন্ধে খাকসারদের ঘোষণা এই যে, 'প্রত্যেক খাকসার দক্ষিণহস্তে কোরান ও বামহস্তে তরবারি ধারণ করিবে।' মধ্যযুগীয় কুসংস্কারান্ধ এই অনুদার এবং অনিষ্টকর নীতি লইয়া যাহারা কাজ করিতেছে, ভারত গভর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য কেন যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এতদিন পরে ভারত গভর্নমেণ্ট খাকসার দলকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহেও সেই পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। খাকসারদের আন্দোলনের প্রতি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বেই করা হইয়াছিল, কিন্তু হক মন্ত্রিমণ্ডল সে কথা কানে তুলিয়া লওয়া তখন ভাল বোধ করেন নাই; ভারত গভর্নমেণ্ট ঐ প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করায় এখন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহাদিগকেও খাকসার আন্দোলন নিষিদ্ধ করিতে হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট এতদিন পরে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন, আগে তাহা অবলম্বিত হইলে দেশ অনেক অনর্থ হইতে রক্ষা পাইত।

কলিকাতার বস্তী-জীবন—

এত হরিজন আন্দোলন, কুলী মজুরের জন্য এত দরদের কথার বৃষ্টি যে যুগে, সেই যুগেও বাঙলার রাজধানী খাস কলিকাতা শহরে বস্তীগুলির আবর্জনা মাসে দুইবার করিয়া অপসারণ করা হয়। পনর দিন পর্যন্ত বস্তীতে যত আবর্জনা জমে, পচে, গলে আর পূতিগন্ধ বিস্তার করিয়া শহরের বায়ুকে কলুষিত করে। ফলে বস্তীতে বাস করে যে সব হতভাগ্যেরা, তাহারাই শুধু যে নানা রোগে আক্রান্ত হয়, তাহা নহে, শহরের ভাগ্যবানেরাও বড় রক্ষা পান না। কর্পোরেশনের সদস্য মিঃ ডি এন মুখার্জি এতদিন পরে কর্পোরেশনের দৃষ্টি যে এদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিনবার করিয়া বস্তীসমূহের আবর্জনা দূর করিবার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয়, ইহাই দেখিতে চাই।

চুক্তির অবসান—

গত বৎসর কর্পোরেশনে কংগ্রেস ও লীগে যখন চুক্তি হয়, তখনই উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ ছিল। সে যাহা হউক, চুক্তি হইলেই তাহা অলঙ্ঘ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। উভয় পক্ষের পারস্পরিক কতকগুলি সুবিধা লইয়া চুক্তি হয়, এক পক্ষ যদি অপর পক্ষকে সে সুবিধা না দেন, তবে চুক্তি আপনা হইতেই ফাঁসিয়া যায়। কংগ্রেস-লীগে চুক্তিও হইয়াছিল কলিকাতার পৌরজনগণের স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া; কিন্তু দেখা গেল, লীগওয়ালাদের দাবী বাঙলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছে। লীগ দল কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করিতে উদ্যত হইয়াছিল যেসব উদ্দেশ্যে, তাহার মধ্যে বাঙালী মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তাহাদিগকে সকল দিক হইতে দাবাইয়া রাখাও অন্যতম। এবারও লীগের দল কর্পোরেশনের সকল রকম কর্তৃত্বের ক্ষেত্র হইতে বাঙালী মুসলমানদিগকে দূরে রাখিবার জন্যই ফন্দী আঁটিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-লীগ প্যাক্টের এই পরিসমাপ্তি বাঙালী হিন্দু এবং

বাঙালী মুসলমানদের মিলনের গ্রন্থীই দৃঢ় করিবে; যে উদ্দেশ্যে প্যাক্ট করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার ফলেই প্যাক্টের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

লোকগণনার ফল—

অনেক প্রদেশেই লোকগণনার ফল মার্চ মাসের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জুন মাসের আধাআধি প্রায় আসিয়া পড়িল এ পর্যন্তও বাঙলা দেশের লোকগণনার ফল কেন প্রকাশিত হইল না? আমরা এমন একটা কথা শুনিয়াছিলাম যে, এবারকার আদমসুমারীতে বাঙলা দেশে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটিয়াছে, সেইজন্য বাঙলার প্রধান মন্ত্রী নাকি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। ভিতরের কথা অবশ্য আমরা বলিতে পারি না। "মডার্ণ রিভিউ" পত্রও দেখিতেছি বলিতেছেন—"শুনা যায়, মিঃ ফজলুল হক পার্ক সার্কাসের এক ঘরোয়া মজলিসে বলিয়াছেন যে, এবারকার আদমসুমারীতে মুসলমানেরা শতকরা ৪৮জন হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, গতবারের আদমসুমারীতে হিন্দুদের গণনা একেবারেই ঠিক হয় নাই; সুতরাং এবারকার গণনায় হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অপ্রত্যাশিত কিছু নয় এবং হিসাবে যদি ঠিক হয়, তবে হিন্দুদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটা স্বাভাবিক; কিন্তু মৌলবী ফজলুল হক তো নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না! লোকগণনার প্রাক্কালে তিনি যেভাবে প্রচারকার্যে নামিয়াছিলেন, তাহাতেই মনে করা গিয়াছিল, ব্যাপার হয় তো বা কিছু গুরুতর। লোকগণনার ফল প্রকাশে বিলম্ব করা হইতেছে, শুধু তাহাই নহে, হিন্দু কম্পাইলেশান অফিসারকে সরাইয়া সম্প্রতি একজন মুসলমান স্কুল ইন্সপেক্টরকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে; কোন কোন জেলার লোকগণনার প্যাডসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের নিকট পাঠানো হয় নাই; ইহাও শুনিতেছি যে, নোয়াখালির প্যাডগুলি নাকি ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। লোকগণনার ব্যাপার চুকিয়া যাইবারও পর এই যে সব ঘটনা, ইহার কারণ কি? হিন্দুদের যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটে—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার হার না টিকে, তাহা হইলে যে সব যায়, পাকিস্থান যায়, লীগওয়ালাদের কল্পনার আকাশকুসুম শূন্যে বিলীন হয়; সুতরাং লীগের সিংহ-ব্যাঘ্রদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা দিবে, ইহা স্বাভাবিক। লোকগণনার ভার মূলত ভারত গভর্নমেন্টের উপর এবং এ সম্পর্কে দায়িত্বও তাঁহাদেরই। আমরা বাঙলার ব্যাপারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গঙ্গায় বান—

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার গঙ্গায় হঠাৎ বান ডাকিয়া কলিকাতার অনেক লোক হতাহত হইয়াছে এবং নৌকাডুবি প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আহিরীটোলা ঘাটের ক্ষতিই হইয়াছে বেশী। নদীর বাঁকের জন্য আহিরীটোলার পর হইতে বানের গতি গঙ্গার পরপারের দিকে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গায় মাঝে মাঝেই বান আসিয়া থাকে; কিন্তু বৎসরের বর্তমান সময়ে, বিশেষত চতুর্দশী তিথিতে এমন প্রবল বান গঙ্গায় ইহার আগে আর নাকি দেখা যায় নাই। দৈব দুর্বিপাক এড়াইবার উপায় অবশ্য মানুষের হাতে ষোলআনা নাই; তবু যতটা সম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বান যখন দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইতেছিল, পোর্ট কমিশনার কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল, তখন লোকজনকে সতর্ক করিয়া দেওয়া—সংকেতের দ্বারাই হউক, আর অন্য যেভাবেই হউক, বিপদের গুরুত্ব জানাইবার কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত। কলিকাতার আহিরীটোলা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নপূর্ণার ঘাট—এই অংশটাতে মাঝে মাঝেই লোকজন জলে পড়িয়া গিয়া মারা যায়। কর্তৃপক্ষের উচিত, যে সব ঘাটে বিশেষ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেই সব ঘাটে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা; অন্তত স্নানার্থীদের যে সব ঘাটে ভিড় হইয়া থাকে, সে সব ঘাটে তেমন ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ভারতরক্ষা ও দেশবাসী—

বড়লাটের সেই বেদবাক্যতুল্য আগস্টের বক্তৃতা, যে বক্তৃতায় ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বিশ্বাস। সেই বক্তৃতায় দুইটি কথা বলা হইয়াছিল, প্রথমত বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণের; দ্বিতীয়ত ভারতীয়রা যাহাতে ভারতের রক্ষা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া বড় একটি পরামর্শ পরিষদ গঠন। ভারত গভর্নমেণ্ট এত দিনে পরামর্শ পরিষদ কিভাবে গঠন করা হইবে, তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। এই পরিষদের সভাপতি হইবেন ভারতের জঙ্গীলাট এবং সদস্য থাকিবেন দশজন। ছয়জন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের ভিতর হইতে নির্বাচিত হইবেন, আর ৪জন হইবেন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দল হইল প্রধান দল। তাঁহারা এখন আর পরিষদে নাই, অনেকেই কারাগারে আবদ্ধ আছেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিলে আর যেসব সদস্য আছেন, দেশের জনমতের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্কই নাই; সুতরাং ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবী সেই সব জো হুজুরের দল কতটা করিতে পারিবে বলাই বাহুল্য। পরামর্শ পরিষদের সদস্যদের কি ক্ষমতা থাকিবে তাহার নির্দেশ নাই, সম্ভবত জঙ্গীলাটের রায়ে সায় দেওয়াই হইবে তাঁহাদের একমাত্র কাজ। এমন অবস্থায় ব্যবস্থাটা হয়ত কর্তাদের মনের মত হইয়াছে; কিন্তু কতটা কাজের হইয়াছে, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। দেশের যাহারা প্রকৃত প্রতিনিধি, তাহাদিগকে ছাড়া এই পরিষদ দেশের জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। কর্তাদের উচিত ছিল ইহা বুঝিয়া সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য চেষ্টা করা, তাহা হইলেই রাজনীতিক দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করা হইত।

ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা ও শাসনের স্বরূপ

ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা মিস্ রাথবোনের চিঠি পড়ে আমি অত্যন্ত মর্মপীড়া অনুভব করেছি। মিস্ রাথবোন কেউ হবেন, তাঁর বিষয় আমি কিছু জানি না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মামুলী 'শুভাকাঙ্ক্ষী' ব্রিটিশ ভদ্রমণ্ডলী যে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের বিচার করে থাকেন, এই মহিলার লেখায় সেই মনোভাবেরই নমুনা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চিঠি আসলে জওহরলালকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। মুক্তি-সংগ্রামের সেই বীর যোদ্ধাকে মিস্ রাথবোনের দেশবাসীই আজ কারা-প্রাচীরের আড়ালে কন্ঠরোধ করে রেখেছে। আমার সন্দেহ নেই তিনি আজ মুক্ত দশায় থাকলে এই মহিলার অযাচিত হিতোপদেশের সতেজ ও সমুচিত উত্তর স্বয়ং তিনিই দিতেন। অবস্থা বৈগুণ্যে জওহরলাল এ সময় মৌন থাকতে বাধ্য। কাজেই এই চিঠির প্রতিবাদ ঘোষণা করার প্রয়োজন হয়েছে। রোগশয্যায় থেকেও তাই আমাকে সেই কর্তব্য পূর্ণ করতে হচ্ছে। মূঢ়তা ও ধৃষ্টতার আশ্রয়ে এই মহিলা যেভাবে আমাদের সমগ্র বিবেক-বুদ্ধিকে স্পর্ধার সঙ্গে অশ্রদ্ধা করতে সাহস করেছেন, তাতে তাঁর স্বদেশবাসীর হিতার্থকেই তিনি খর্ব করেছেন।

আমাদের অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক তাঁকে লজ্জিত করেছে। কারণ "ইংরেজী চিন্তা-রাজ্যের কূপ থেকে জ্ঞানবারি আকণ্ঠ পান" করার পরেও আমরা আমাদের এই দরিদ্র দেশের শুভাশুভের জন্য কিছু কিছু চিন্তা করে থাকি।

পশ্চিমের জ্ঞানসাধনার সর্বোত্তম ঐতিহ্যের বাহন হিসাবে ইংরেজী চিন্তানুশীলন থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে রাখতে চাই যে, আমার দেশবাসী যাঁরা এই দিক দিয়ে লাভবান হয়েছেন তাঁদের নিজের গুণেই সেটা সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের কুশিক্ষিত করার সকল প্রকার সরকারী ব্রিটিশ প্রচেষ্টা একদিকে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। যে কোন য়ুরোপীয় ভাষার সাহায্যে পশ্চিমের জ্ঞানসাধনার পরিচয় লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতিই কি সেই ভরসায় বসেছিল, কবে ব্রিটিশ জাতি তাদের দ্বারে দ্বারে জ্ঞানের আলোক পৌঁছে দিয়ে যাবে? তাঁরা শিক্ষা না দিলে আমরা এখনও অজ্ঞতার তামসিক যুগে পড়ে থাকতাম, এই ধারণা পোষণ করা আমাদের তথাকথিত ইংরেজ বন্ধুবর্গের পক্ষে একটি নিছক দম্ভ ও আত্মপ্রসাদ লাভের আয়াস মাত্র। ব্রিটিশ সরকারী নীতির খাতে যে শিক্ষার ধারা আমাদের দেশের বিদ্যার্থী ছেলেমেয়েদের কাছে গড়িয়ে এসে পড়েছে, তার মধ্যে ইংরেজী চিন্তারাজ্যের আবর্জনাই ভেসে এসেছে, তার সার সত্যটুকু আসেনি। ফলে যে শিক্ষারীতি আমাদের দেশজ রুচি ও সংস্কৃতিতে লালিত, তার প্রসাদান্ন ভোজনের পরিতৃপ্তি থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

ধরেই নেওয়া যাক্ যে আমাদের 'আলোকপ্রাপ্তির' একমাত্র পন্থা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা। এই শিক্ষার "কূপোদক আকণ্ঠ পান করেও" দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৩১ সালে অর্থাৎ দেশের উপর দুই শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ শাসনদণ্ড চালনার পর, দেশবাসীর শতকরা একজন মাত্র ইংরেজী ভাষাজ্ঞান লাভ করেছে। এদিকে মাত্র পনের বৎসরের সোভিয়েট রাজ্যের

নিয়ন্ত্রণের পর রুশিয়াতে ১৯৩২ সালের হিসাবে দেখা যায়, সেখানে শতকরা আটানব্বই জন শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। (ইংরেজের উদ্যোগে প্রকাশিত স্টেটসম্যান ইয়ার বুক থেকে এই তথ্য নেওয়া হয়েছে। সুতরাং রুশের সপক্ষে বাড়িয়ে বলার কোন সম্ভাবনা এতে নেই।) কিন্তু এই সংস্কৃতি নাম-ধেয় বস্তুর চেয়ে বেঁচে থাকার মত মোটা সম্বলের প্রয়োজন আমাদের আরও বেশী। এই প্রয়োজন পূর্ণ হলে তবেই সেই ভূমিকার উপর প্রকৃত জ্ঞানের ইমারত দাঁড়াতে পারে।

আমাদের ব্রিটিশ প্রভুরা জাতির আর্থিক অদৃষ্টের ঝুলির ফাঁস শতাব্দীর উপর শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে বসে আছেন। দেশের সমুদয় সম্পদ শক্তি আহরণ করে পুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তাঁরা কতটুকু কাজ করেছেন? চারদিকে তাকালেই দেখি ক্ষুধাশীর্ণ সব নর-দেহ, অন্নের জন্য আর্ত চীৎকার। আমি দেখেছি, পল্লী মেয়েরা পাঁক খুঁড়ে কয়েক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য হাতড়াচ্ছে। তার কারণ, ভারতের পল্লীতে স্কুলের চেয়ে কূপ আরও বিরল বস্তু।

আমি জানি আজ ইংলণ্ডবাসীর সম্মুখে অনশনের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে। এর জন্য আমার সমবেদনার অভাব নেই। কিন্তু যখন দেখি কিভাবে ইংলণ্ডের প্রতি উপকূলে খাদ্যসম্ভারবাহী জাহাজকে কনভয়ের রক্ষাকবচের আড়ালে পৌঁছে দেবার জন্য ইংলণ্ডের সমস্ত নৌশক্তিকে নিয়োজিত করা হয়েছে—তখনই মনে সেই ছবি আবার জেগে ওঠে; আমার স্বদেশবাসীকে ক্ষুধার পীড়নে মরতে দেখেছি। সে সংকটে পাশের জেলা থেকে এক গাড়ি চালও তাদের ঘরে কেউ পৌঁছে দেয় নি। ভারতে ইংরেজ আছে, ইংলণ্ডেও ইংরেজ রয়েছে। কিন্তু আচরণের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে এই বৈপরীত্য খুব বেশী করেই চোখে পড়ে।

ইংরেজ আমাদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য অন্নব্যবস্থা করে নি। এর জন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ না থাকতে পারি। কিন্তু বলা হয়, ইংরেজ ভারতের সংসারে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে এসেছে। অন্ততপক্ষে এর জন্য তো আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া উচিত?

আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখি, দেশব্যাপী দাঙ্গার তাণ্ডব চলেছে। আমাদের মত ভারতবাসীই দলে দলে প্রাণ হারাচ্ছে, আমাদের বিত্ত সম্পত্তি আর নারীর মর্যাদা লুণ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু শক্তিমান ব্রিটিশের বাহুপেশীতে সাড়া নেই; অন্দরাবৃত্তির রক্ষায় সে এগিয়ে আসে না। শুধু সাগরপার থেকে বৃটিশ কণ্ঠের কটূক্তি ভেসে আসে, ঘরোয়া শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের এই অযোগ্যতার জন্য।

ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নেই, সকল অস্ত্র আয়ুধে সজ্জিত যোদ্ধা শ্রেষ্ঠতর শক্তির কাছে পরাভব মেনেছে। আজকের এই মহাযুদ্ধেও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, অবস্থার বিপাকে নির্ভীকতম ব্রিটিশ ফরাসী ও গ্রীক যোদ্ধাকেও রণক্ষেত্র ছেড়ে সরে পড়তে হয়েছে। এর কারণ তারা অরাতি-পক্ষের শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রবলের মার সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু সশস্ত্র গুণ্ডার আক্রমণের তাড়নায় যখন আমাদের দেশের দরিদ্র নিরস্ত্র ও নিঃসহায় কৃষক ক্রন্দনরত শিশু-সন্তানকে বুকে চেপে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে, তখন সরকারী শাসকের পদে সমাসীন ইংরেজ সাহেব হয়তো আমাদের এই কাপুরুষ সুলভ আচরণে ঘৃণার হাসি হাসতে থাকেন।

শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজের নিজের ভিটেমাটী বাঁচাবার জন্য আজ ইংলণ্ডে প্রত্যেক বে-সামরিক অধিবাসীও অস্ত্র গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারতে সরকারী ফতোয়া জারী করে লাঠিচালনা শিক্ষাও বন্ধ করা হয়েছিল। চিরকালের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে সশস্ত্র প্রভুদের কৃপার পাত্র হয়ে যাতে আমরা থাকি, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশবাসীকে ইচ্ছে করেই নিরস্ত্র ও নির্বীর্য করে রাখা হয়েছে।

নাৎসী শক্তি ব্রিটিশের বিশ্বপ্রভুত্বকে লোপ করার স্পর্ধা ঘোষণা করেছিল। এই কারণে ব্রিটেনবাসী নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু মিস্ রাথবোনের বাসনা, আমরা যেন তাঁর দেশবাসীর করচুম্বন করি, কারণ সেই হাতেই আমাদের অঙ্গে দাসত্বের শৃঙ্খল চড়ানো হয়েছে। কোন গভর্নমেণ্টের মুখপাত্রস্বরূপ আমলারা মুখে যেসব সদভিলাষ উচ্চারণ করেন তাই দিয়ে সেই গভর্ন-মেণ্টের বিচার হয় না। জনসাধারণের কল্যাণে বাস্তবক্ষেত্রে যে সত্যকারের যত্ন ও সার্থকতা দেখা যাবে, একমাত্র তার দ্বারাই সে শাসনযন্ত্রের গুণাগুণের বিচার হতে পারে।

ইংরেজ বিদেশী, সেই হেতু তারা আমাদের অন্তরঙ্গতা থেকে বঞ্চিত, তাদের প্রতি আমাদের মনোভাবে সহিষ্ণুতার অভাব ঘটেছে, এটাই বড় কারণ নয়। আসল সত্য হলো, আমাদের হিতসাধনার সমস্ত দায়ের বোঝা তাঁরাই গ্রহণ করেছেন, মুখে এই কথা ঘোষণা করে কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা এই সুবৃহৎ কর্তব্যকে এড়িয়ে যান। তাঁদের স্বদেশবাসী জনকয়েক ধনিকের পকেট ভারি করার জন্য ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ বলি দেওয়া হয়েছে।

আমার ধারণা ছিল যে, যেকোন ইংরেজ সজ্জন এই সব অন্যায় চোখে দেখে অন্ততঃপক্ষে মৌন অবলম্বন করে থাকবেন। প্রতিবিধানের জন্য যে আমরা উঠে পড়ে লাগি না, তাতেই তাঁদের বরং আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু যারা আঘাত করেছে তারাই আবার অপমান করতে এগিয়ে আসবে, কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত এই আচরণ সকল ভদ্রোচিত রীতির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। *

* বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস্ রাথবোন ভারতীয়দের প্রতি কটূক্তি করিয়া পণ্ডিত জওহরলালের উদ্দেশ্যে যে পত্র দিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি।

বৈষ্ণব সাহিত্যে মানুষের স্থান

কাহার কাহারও মুখে একথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, বৈষ্ণব সাহিত্যে মানুষকে ছোট করা হইয়াছে। দাস্য, শরণাগতি প্রভৃতি ভাব ঢুকাইয়া বৈষ্ণব দর্শন মানুষের আত্মপ্রত্যয় এবং আত্ম-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে; তাহার ফলে স্বপ্রতিষ্ঠ কর্মপ্রবৃত্তি লোপ হইয়াছে সমাজের। এই সব যুক্তি দেখাইয়া কেহ কেহ এ কথা পর্যন্ত বলেন যে, এই বৈষ্ণবধর্মের জন্যই জাতি পরাধীন হইয়াছে। মানুষের কর্ম, মানুষের স্বপ্রতিষ্ঠা যদি পশুর স্তরের হইত, তবে এই সব যুক্তির মূল্য অবশ্য থাকিত, কিন্তু মানুষের কর্মের সার্থকতা পশুর মত কর্মে নয়, বিশেষত তাহার যে কর্ম সমাজ ও দেশের স্বার্থকে সমুন্নত করে, তেমন কর্ম করিতে হইলে তাহাকে পশুর কর্মের স্তরের উপরে উঠিতে হয়; তেমন কর্মের মূলে থাকার প্রয়োজন হয় সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে তাহার মিলন। মানুষের সমাজ জীবনে তখনই সমুন্নতি ঘটে, যখন সমষ্টির জন্য তপস্যার প্রেরণা মানুষ নিজের মধ্যে পায়, এবং ইহাতেই ব্যক্তির সুখ এবং সমাজে সুখের প্রতিষ্ঠা। বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথায় বলা যায়—'সুখং সঙ্ঘস্য সামগ্রী, সমগ্রানাং তপঃ সুখং'।

সমগ্রের জন্য এই যে তপ, কতকটা অন্য ভাষায় তাহাকেই প্রেম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মানুষ যেখানে মনে সত্যকার বল লাভ করে, এই প্রেমের উপলব্ধির অনুপাতেই পাইয়া থাকে। যে কেন্দ্রগত, ব্যষ্টি-স্বার্থের মধ্যে যত নিবদ্ধ, মনের গোড়ায় তাহার তত দুর্বলতা, সে তত কৃপণ এবং তত তাহার ভয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য মানুষকে দুর্বল করে নাই, স্বার্থসংকীর্ণ জীবনের গ্লানিভার হইতে সে সাহিত্য মানুষকে মুক্ত করিয়া মানুষের জীবনে প্রেমের মহাবল প্রতিষ্ঠিত যেভাবে হয়, সেই পথ দেখাইয়াছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', —এ কথা বলিয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যিকই। 'স্বরূপে সবার হয় গোলকে বসতি,' একথা বৈষ্ণব সাহিত্যেরই কথা। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নর বপু তাঁহার স্বরূপ,' এ বৈষ্ণব সাহিত্যিকেরই উপলব্ধি—'ভজিবে পরমব্রহ্মে নরাকৃতি তনু', বৈষ্ণব সাহিত্যিকেরই পরম সূক্ষ্ম এই রসানুভূতি।

বৈষ্ণব সাহিত্যিক মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, সে দেখা দেখিতে হইলে বৈষ্ণব দর্শনের রসতত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া কিছু দরকার হইয়া পড়ে। ভালবাসা, প্রেম এগুলিকে শুধু সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ না করিয়া যদি আমরা মানুষের জীবনের মূলে এইগুলি স্বাভাবিক শক্তিস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি, তবে তখন আমরা বুঝিব বৈষ্ণব সাহিত্যিকের মনের যে মানুষ সেই মানুষকে। বৈষ্ণব সাহিত্যিকের ভগবানে দাস্য, শরণাগতি, এগুলি সিদ্ধান্ত নয়, এগুলি রস, সেই সব রস বৈষ্ণব সাহিত্য-সাধনার ভিতর দিয়া জীবনে যদি মানুষ সত্য করিতে পারে তবে মানুষ সবল হয়, কি দুর্বল হয়, ইহাই হইতেছে এ পক্ষে একমাত্র সমীচীন বিচার।

এই বিচারের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বৈষ্ণব সাহিত্যিক 'দুর্লভ মানুষ দেহ' পাইয়া যে ভগবানকে নিত্য ভজন করিতে বলিয়াছেন, বৈষ্ণবের সেই ভগবান্ বস্তুটি কি আগে সেই বিচার করা উচিত হইয়া পড়ে; কারণ এই 'ভগবান' বস্তুটিকে বৈষ্ণব মানুষের জীবনে আমদানী করাতেই যত গোল। বৈষ্ণবের এই যে ভগবান ইনি হইতেছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলেন,—'সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।' বৈষ্ণবের ভগবান সৎচিৎ এবং আনন্দ এই তিনটি বস্তু লইয়া গঠিত। এই তিনটি শক্তির মধ্যে প্রধান শক্তি হইল আনন্দ; কারণ আনন্দই হইল সৎ এবং চিদের মূলীভূত কারণ, আনন্দের অভাবে সতের সত্যতা থাকে না এবং চিদের চিৎ সত্তা নিরর্থক হয়। কথাটা একটু ভাঙিগয়া বলা প্রয়োজন। প্রথমত দেখা যাউক, জীবনে কোন্ জিনিষকে আমরা সৎস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি, যাহার মধ্যে আনন্দ পাই তাহাকেই; বস্তুর ভিতর দিয়া আনন্দাংশের যে পরিমাণ উপলব্ধি তাহার সৎ সত্তা জীবনে ততই প্রতিষ্ঠিত, তেমনই চিদেরও কথা। চিৎ শব্দের অর্থ কি? বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলেন, 'চিদর্থে সংবিদ যারে জ্ঞান বলি মানি'। এই জ্ঞানের স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলেন—'জ্ঞানং অভেদ দর্শনং'। এখন এই অভেদ দর্শন নির্ভর করে কিসের উপর? এই প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যিক দিলেন—'আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।' একটু ঘুরাইয়া লইয়া ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে আনন্দযুক্ত চিন্ময় রসের নামই প্রেম। যে বস্তুতে অভেদত্ব উপলব্ধি হইবে তাহার মধ্যে আনন্দ পাওয়া দরকার। যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে জ্ঞানও নাই। প্রকাশক যে বস্তু, গীতার মতে তাহা সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি। কৃষ্ণের এই যে, পরমাশক্তি আনন্দাংশ, এই 'হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে সুখ আস্বাদন' এবং হ্লাদিনীর অনুগতিই জীবের প্রধান ধর্ম। হ্লাদিনীর সার অংশ হইল প্রেম, আর প্রেমের পরম সার হইতেছে মহাভাব এবং মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। এই রাধার অনুগতিতেই হইল জীবের স্বরূপোলব্ধি, স্বভাবে তাহার প্রতিষ্ঠা।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, এক কৃষ্ণকে রাখিলেই হইত, আবার রাধাকে আনা হইল কেন? রাধা ও কৃষ্ণ ইঁহারা কি দুইজন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে,—রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্' দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ। জড় জগতে সম্বন্ধ যে বস্তুর যাহার সহিত, এই দুইয়ে পার্থক্য থাকে, জড় জগতে একান্ততা কোথায়ও নাই। কিন্তু চিৎ-জগতে এরূপ নয়; সেখানে সম্বন্ধ অর্থই একত্ব, আপনার বলিতেই অভেদ। বৈষ্ণব সাহিত্যিকের আরাধ্য যে কৃষ্ণ, সে কৃষ্ণ এই রাধাকে সঙ্গে লইয়া এবং রাধার সঙ্গে অভেদত্ব সূত্রেই তিনি রসময়, লীলাময় এবং প্রেমময়—'সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ পরানন্দ ধাম।'

রাধা ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যিকের কৃষ্ণতত্ত্ব নাই, এবং কৃষ্ণ ছাড়া রাধাতত্ত্ব নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যিকের সৃষ্টি এই যুগল বিলাসে রসেরই বিস্তারে। রাধা কৃষ্ণের শক্তি, আরও একটু যোগ্য ভাষায় কৃষ্ণেরই তিনি মাধুরী। কৃষ্ণের স্বভাব হইতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যি-কের ভাষায়—'আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন, আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।' তিনি বিষয়, তিনি আবার আশ্রয় রস। রাধার মাধুরী কৃষ্ণের ঐশ্বর্যত্ব লোপ করিয়া দেয়, এই মাধুরী বশে, তিনি হইয়া পড়েন ধীর-ললিত, প্রেয়সীর বশীভূত। রাধার অনুগতি তিনি নিজেই কামনা করেন এবং সৃষ্টির দর্পণের ভিতর দিয়া এই অনুভূতির অসমোর্ধ মাধুর্য বিকাশ আস্বাদন করিতে চাহেন। সৃষ্টির পরম সার্থকতা হয় এই অনুগতির স্ফুরণে। সেখানে কৃষ্ণ তাঁহার নিজের স্বধর্মকেই ফিরিয়া পান। সেখানে আপনাকে বিকাইয়া দেন।

সমগ্র সৃষ্টির বীজস্বরূপ এই রাধার অনুগতির রস, সৃষ্টির ইহাই কারণতত্ত্ব। রাধার অনুগতির যেখানে স্ফুরণ হয়, সেখানে সমষ্টির এই কারণতত্ত্বের সঙ্গে হয় যোগ। সৃষ্টির এই বহুধা বিকৃতি, এই বিভেদ তখন অব্যাকৃত বিহারের উপলব্ধিতে সার্থকতা লাভ করে। সৃষ্টির সকল ভাষা তখন পরিণত হয় ভাবে, বিভিন্ন সুর এক ছন্দ ধরিয়া উঠে এবং সৃষ্টির সকল সুর এক ছন্দে বাজিয়া উঠিবার আশ্রয় হইল একমাত্র মানুষ। বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের মতে কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি হইল মানুষ। অর্থাৎ

অন্তরঙ্গা শক্তি হ্লাদিনী এবং বহিরঙ্গা শক্তি এই বিশ্ব, ইহার মাঝখানে সে আছে যেন দাঁড়াইয়া। মানুষের মন হ্লাদিনী শক্তির দিকেও যেমন অগ্রসর হইতে পারে, সেইরূপ বহিরঙ্গা শক্তির দিকেও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। যেখানে মানুষের চিত্ত হ্লাদিনীর পথে উন্নীত হয়, অর্থাৎ রাধার অনুগতি প্রাপ্ত হয়, সেখানে কৃষ্ণের স্বধর্মই লাভ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের ভাষায় তখন 'কৃষ্ণের যতেক গুণ ভক্তেতে সঞ্চরে।' বিশ্বের সকলের সঙ্গে হয় তাহার যোগ; সুখ দুঃখ এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের অতীত স্তরে সে নিত্য আনন্দময় ধামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে রাজ্যে দুঃখ নাই, জরা নাই, আছে কেবল যৌবন, মৃত্যু নাই আছে কেবল অমৃতত্ব। মানুষ তখন হয় ভক্ত এবং ভক্ত পায় রাধার অনুগতি। তিনি তো কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণেরই শক্তি, সুতরাং রাধার অনুগতির ভিতর দিয়া ভক্ত তখন কৃষ্ণ সেবাকেও পায়।

আনন্দাংশ যিনি রাধা, তাঁহার স্বরূপ কি? বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলেন,—'কৃষ্ণকে করায় নিজ শ্যামরস পান, নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম।' সুতরাং আনন্দের কারণতত্ত্ব হইল রাধাকৃষ্ণের এই যুগল-বিলাস এবং আনন্দ যিনি জীবের প্রাণ হয় তাহা হইল এই যুগল বিলাস রস আস্বাদনেই তাহার প্রাণ, এইজন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যিক বলিলেন, 'রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর'। ভগবৎ-ভজনতত্ত্বের ইহাই গোড়াকার কথা। বাঙলার বৈষ্ণব সেই কথাই শুনাইলেন—এক বটে ভাই, কিন্তু জেনো দুইজনেই একজন, দুই বিনে কোন ভজন সাধন? মহাকবি কালিদাসও সেই বৈষ্ণব-বাণীরই সমর্থন করিয়াছেন তাঁহার রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ করিতে গিয়া—'বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগার্থ-প্রতিপত্তয়ে জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।' এখানেও ঐ যুগল সেবারই প্রয়োজন দেখান হইয়াছে। ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার পরম প্রতিষ্ঠা হয় ইহাতে মানুষের জীবনে। ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ তখন তাহার সমগ্র জীবনে সে উপলব্ধি করে; প্রত্যক্ষ রসস্পর্শে বিভাবিত মন সকল ভাষার অন্তর্নিহিত রস-বস্তুকে তখন ধরিয়া ফেলে এবং অখণ্ড সে রসস্পর্শে নিরন্তর হয় আপ্যায়িত এবং উজ্জীবিত। পদ্মপুরাণ এই তত্ত্বেরই বিশ্লেষণ করিয়া গায়ত্রীকে গোপকন্যা বলিয়া অভিহিত করিলেন—'গোপ-কন্যা ত্বহং বীর. বিক্রীণামহে গোরসং'। ইন্দ্রের সঙ্গে গায়ত্রীর যখন সাক্ষাৎ ঘটিল, তখন ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে গায়ত্রী বলিলেন, বীর, আমি গোপকন্যা, গোরস বিক্রয় করি, ননী, দই, ঘোল তোমার কি চাই বল, আমার কাছ থেকে যা কিছু রস সবই পাইবে। জীবনের যত না পাওয়া এই অবস্থায় তখন তাহার পরম প্রাপ্তি ঘটে, একান্ত লাভের এই স্তর। রসময়ের রসলীলায় জীবন তখন নিমগ্ন হইয়া যায়। যে মন অভাবের জন্য ছিল দুর্বল, কুণ্ঠিত, ভীত, রসছন্দে সে হয় পরিস্ফূর্ত। তখন আর চাওয়া থাকে না তখন কেবল দেওয়া, কামলোকের ঊর্ধ্বে প্রেমে প্রতিষ্ঠিত সে-জীবন। নিত্য জীবন, সে সত্য জীবন। সাধক তখন মর্ত্যদেহ অতি-ক্রম করিয়া সিদ্ধ দেহ লাভ করেন। দেহ, মন, প্রাণ সর্বত্র তখন প্রত্যক্ষতার আশ্বস্তি। বৈষ্ণব সাহিত্যিক জোর করিয়া একথা বলিয়াছেন যে, পরলোকের জন্য এসব উপলব্ধি নয়, ইহলোকেই ইহা লাভ করিতে হইবে। তিনি একথা বলিয়াছেন যে, যাঁহারা দেবতা স্বর্গবাসী, তাঁহারা যেমন এমন অমৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না সেইরূপ যাহারা নরকবাসী তাহাদের পক্ষেও এই পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে; শুধু মানবদেহেই এই তত্ত্বকে জীবনে সত্য করিয়া পাওয়া যায়।

এই তত্ত্বকেই উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণব দার্শনিক বলিলেন,—হ্লাদিন্যাঃ সংবিদাশ্লিষ্য সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ', হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা যুক্ত হইলে মানুষ সচ্চিদানন্দ লাভ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট নরদেহের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্মমাস্থিতঃ আনন্দং পরমাত্মানং আত্মস্থং সমুপৈতি মাম্'; এই নরদেহেই আমাকে দর্শন করা সম্ভব, আমার ধর্ম লাভ করিয়া আনন্দময় পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে লাভ করা যায় এই দেহে।

সমষ্টির মধ্যে নিজের রসসত্তার উপলব্ধিই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ,—বৈষ্ণব সাহিত্যিকের ইহাই আদর্শ। এই আদর্শের পরম অভিব্যক্তিই হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যিকের সাধনার ভিতর দিয়া। এই আদর্শ জগৎকে উপেক্ষা করে নাই, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেয় নাই, জগৎ জুড়িয়া উদার সুরে যে সংগীতের ঝঙ্কার উঠিতেছে, বাজিতেছে যে চিরকিশোরের বাঁশী 'রাধা নামের সাধা রবে', সেই বাঁশীর গানকে নিজের মধ্যে গভীর করিয়া সে তাহার জীবন-দেবতাকেই সমর্পণ করিতে চাহিয়াছে। সংসার ছাড়িয়া বৈষ্ণব সাহিত্যিক মানুষকে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেয় নাই; সে বলিয়াছে, শুধু নিজের স্বার্থসংকীর্ণ দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের রসে জীবনকে নিষিক্ত করিয়া লইয়া সেবার পথে বিশ্বের মাধুর্যকে জীবনে সত্য করিতে এবং প্রেম-গীতি-রস ছন্দে সে মানুষের চিত্তকে একান্তভাবে আপ্যায়িত করিয়া উদার করিয়াছে। মানুষের খণ্ড জীবনকে বৈষ্ণব সাহিত্যিক অখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে এবং সেই পথে সে মানুষের মধ্যে জাগাইয়াছে সহানুভূতি এবং সমবেদনাকে সত্য করিয়া ও নিত্য করিয়া এবং এইভাবে আপনাকে বহুর মধ্যে একান্ত করিয়া আস্বাদন করিবার রসসূত্র মানুষের জীবনে পাইয়াছে বলিয়াই সে মানুষকে বন্দনা করিয়াছে এবং বারবার এই কথাই বলিয়াছে যে, মানুষের সেবা যদি জীবনে সত্য না হয়, তবে সব বৃথা—'সে সব লোকের কি কল্যাণ কোন দিনে হইয়াছে, হইবেক ভাবি দেখ মনে'। জগৎ সে আদর্শ সমগ্রভাবে এখনও হয়ত উপলব্ধি করিবার মত স্তরে উঠে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যিকের আদর্শ নিন্দনীয় হইতে পারে না। মানুষ যদি কোনদিন সত্যই সভ্য হইতে চায়, উঠিতে চায় এই ঘৃণ্য জিঘাংসাগত বর্বরতার ঊর্ধ্বে, তাহা হইলে বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের অনুভবগম্য প্রেমের রসলোকের স্পর্শই তাহাকে তাহার মনকে দিতে হইবে। নহিলে তাহার মন সবল হইবে না, দুর্বলই থাকিবে এবং শকুনি, গৃধিনী মত হানাহানি সবল মনের পরিচয় নয়, দারুণ দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং প্রেতভয়ে শঙ্কিত বর্বরের মানসিক বিকৃতিরই ইহা সাক্ষ্য প্রদান করে।

শ্রীনমিতা মজুমদার

পৌষের সন্ধ্যা এলো ঘনিয়ে, অল্প তার আয়ু। সেই স্বল্প আলোকে বাগানে গেটের ধারে মোড়া পেতে বসে অসিত। কোলের বই থেকে ঝুঁকেপড়া মুখ তুলে দেখ্‌লো অদূরে পথের ওপরে নন্দিনী। শাদা ঢাকাইয়ের আঁচল তোলা মাথায়, কাশ্মিরী শালের প্রান্ত বোলপুরী স্যাণ্ডালের কাছাকাছি—বুক উঠল দুলে। ছ'বছর পরে দেখলো নন্দিনীকে, কত যুগযুগান্তর যেন। এই পথ পার হয়ে হয়তো নন্দিনী যাবেন চলে—শুধু এই পার হয়ে যাবার দেখা।

আশ্চর্য! দরজা খুলে নন্দিনী এলেন ভিতরে। এখন করবে কী? কিছু বুঝতে না পেরে মোড়া ছেড়ে পড়ল দাঁড়িয়ে।

নন্দিনী একেবারে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, মুখ তুলে কাঁপা গলায় বল্‌লে—

আমার সময় হয়েছে।

চমকে উঠে একেবারে বলে উঠ্‌ল—

কী বল্‌চ—ভেবে পাইনে।

—একদিন তোমার সময় হয়েছিলো, তখন সাড়া দিতে ছিলো ভয়। এখন আমার পালা। সময় তো আমার হয়েছে —তোমার সময় কি এখনো আছে?

অসিতের চোখে কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো, বললে—নন্দিনী, এ আমি জানতুম তাই চুপ্‌ করে ছিলুম। কিন্তু তুমি তো আমাকে অবজ্ঞাই করে এসেছো!

—অবজ্ঞা করেছি—সে মিথ্যা; অবজ্ঞা করার ভাণ করেছি।

—তাই মনে হোত। বাইরে থেকে মনে হোত, এ বড়ো নির্দয়তা। তবু তোমার মনখানিকে যেন দেখতে পেয়েছিলুম। ভালো করে সহজে তো চাওনি আমার দিকে, কখনো যখন চেয়েছ তোমার টলোমলো মন যেন ধরা দিয়েছে তোমার মুখে—হয়তো এ আমার কল্পনা। তবু মনে হোত—আজ যত নির্দয় হও না কেন—যেদিন দেবে সেদিন কানায় কানায় দেবে ভরে—কোথাও ফাঁক্‌ রাখবে না।

কিন্তু কেন নন্দিনী, কাকে ভয় ছিলো, আমাকে?

—না, আমার আপ্‌নাকে।

—আজ তোমার আপ্‌নাকে তুমি সম্পূর্ণ করে দেখতে পেয়েছ—এ-কী সত্য?

—খুব সত্য। এ-যে কতোবড়ো সত্য তোমাকে জানাই কী করে? ধরা পড়বার সময় যখন এলো তখন প্রাণপণ জোরে বলেছি—এ সত্য নয়—সে আমার আপ্‌নাকে ভোলানো। যেদিন চুপ্‌ করে স্থির হয়ে বস্‌লুম আমার সমস্ত জোর করবার বাঁধন খসিয়ে—চম্‌কে উঠ্‌লুম। কান্নার মধ্য দিয়ে যে জাগা তাকে তুমি বল্‌বে কী?

—আমার পাশে এসো। কবি যদি হতুম, আমার এই মুহূর্তটিকে তুল্‌তুম সোনা দিয়ে ভরিয়ে।

—দেখো—বল্‌লে নন্দিনী,—ঐ দূর বনে ঘন সবুজের পরে নেমে এসেছে কালো অন্ধকারের ঢাকা, তার পরে সন্ধ্যার বিকশিত রাগরক্ত; যেন রহস্যের মতো ঢাকা দিয়ে নেমেছে তার সমস্ত সত্তাকে, তারপরে দিয়েছে আপনাকে জানার রক্তিম দোলা। কী আশ্চর্য! যেন রবিঠাকুরের আঁকা ছবি—কী ঘন, কী গাঢ়, কী মিলিত তার রঙ্‌। কী অপরূপ, অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিত।

—মনে পড়ে, তোমাকে প্রথম দেখলুম বাগানে। কট্‌কী শাড়ীর আঁচল-ঘসা-মুখ, কাশ্মিরী কাজ করা গরদের চাদরে দেহলতা ঘিরে ঢাকা, সূর্যের ঝলোমলো আলোতে কী অপরূপ! ইচ্ছে করল এই কথাটিকে সুন্দর করে বলতে—উদয়কালকে দেখলুম তোমার ঘোমটা-খসা-মুখে, আবরিত তনুর আকাশে।

—সেই প্রভাতকালকে তুমি নাও এই সন্ধ্যালোকের মাঝে।

নীচু হয়ে অসিতের পায়ে নন্দিনী মুখ রাখ্‌লো। ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো অসিত—

ও-কী? ও-কী কর্‌ছ নন্দিনী!

সুন্দর করে হাস্‌ল নন্দিনী, বল্‌লে,—ওতো তোমার নয়—একান্ত করে আমারই।

—আজ মনে হচ্ছে, নন্দিনী, তোমার কোনোখানে আঘাত আছে—হয়তো সে কোনো প্রথম দিনের প্রথম কালে—তাই আপনাকে তোমার এত ভয়। ধরা দেবার সময় যখন এলো তখন জেগেও বল্‌লে,—জাগিনি। নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলে আপ্‌নাকে, কেঁদে উঠে বললে,—এবার জেগেছি।

শোনো নন্দিনী, ভয় রেখো না মনে, রেখো না সংশয়। শুধু বলো—বিশ্বরহস্যের বিস্ময়ের মাঝখানে আমাদের এই সন্ধ্যালোকের যেন জায়গা থাকে—যেন এ ফাঁকি না হয়।

নন্দিনী কোনো কথা বল্‌লে না—শুধু মুখ তুলে দু'চোখ মেলে ধর্‌ল অসিতের মুখে, চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে নন্দিনী এসেছিলো বোনের বাড়ীতে পাটনায়—সে ছ'বছর আগে। ওর ভগ্নিপতির বন্ধু অসিত তখন সসম্মানে এম-এ, ল-এর গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকালের জন্য বসেছিল কোর্টে, লাগ্‌ল না ভালো, তাই দিলো ছেড়ে। ইচ্ছে আছে করবে প্রফেসরী। আরো এক্‌টা ইচ্ছে আছে মনে—বাঙলার যে জমি আছে পড়ে তাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে করবে চাষ; তাই রাশিয়া থেকে বই আনিয়ে পড়্‌ছে বসে। ওর বইয়ের আলমারীতে দেখা যাবে—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, টেনিসন্‌ আর রবিঠাকুরের বইয়ের পাশে চাষ করবার বই—আর ঠিক্‌ তারি পাশে বার্গ্‌সঁ।

বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ওর মুখশ্রী, তারি পরে একটা রহস্যের ঢাকা। চোখে পড়্‌বার মতো নয় ওর চেহারা, মনে লাগ্‌বার মতো।

সেই ছেলে যে নন্দিনীকে কী চোখে দেখ্‌লো সে সেই জানে।

মনে পড়ে, মৌখিক জানার পালা শেষ হবার পরের খবর। যেন প্রথম পরিচয় এলো নন্দিনীর লেখার মধ্য দিয়ে। বন্ধুর কাছ থেকে খাতা নিয়ে গিয়েছিলো অসিত। সেই খাতা ফেরৎ দেবার সময় যখন এলো নন্দিনী তখন বাগানে; বুকের কাছে তুলে ধরা কালো কাপড়ে বাঁধানো খাতা, মুখের পরে মেলে ধরা স্থির দু'টি চোখ—উঠ্‌ল একেবারে চম্‌কে—কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে হাতপেতে খাতা নিয়ে এলো চলে।

তারপরে দেখাশোনার মাঝখানে নন্দিনীর চল্‌ল যে ব্যবহার সে মোটেই সুর-ধরানো নয়; নন্দিনী না হয়ে হ'ত যদি অন্য মেয়ে তবে তার আচরণ ভদ্রজনোচিত নয়, একথা মনে কর্‌তেও হয়তো অসিতকে বাধ্‌তো না।

ভাবনা হোল মনে—ওর প্রথমকালে এক্‌টা ঘটনা ঘটেছিল। একান্ত শিশুতরুণ মনের সঙ্গে মিল্‌লো ওর কবি—তাই মনে কর্‌ল এই সত্য—এই বিশেষ কিছু।

তার পরেকার আঘাতে পড়্‌ল ভেঙ্গে।

তখন এই কিছু-না-টাকেই মনে করেছিল মস্ত কিছু, তাই আজকের এই কিছু হাঁ টাকে কিছুতেই স্বীকার করল না, বল্‌লে—এ কিছু নয়।

ছুটি শেষের আগেই মনোরমাকে বল্‌ল,—আমি যাব।

—সে কী, এখনি?

—হাঁ।

ওর ভিতরকার এই অশান্ত আবেগ আর কারুর কাছে থাক্ না চাপা মনোরমার কাছে থাক্‌ল না। বোনকে ডেকে বল্‌লে,—

অসিতকে চিন্‌তে পারিস্, ওযে ধরা পড়েছে।

নন্দিনী জবাব দিলো না—চুপ্ করে চেয়ে থাক্‌ল আকাশে।

মনোরমা বল্‌লে,—সাধারণের মতো যদি ও তবে ভাবনা করতুম না।

নন্দিনী এবার বল্‌লে—মন বুঝতে সময় লাগে।

মনোরমা হাসল—দিদি, অনেক পড়্‌তে পারো, লিখতে পারো অনেক—তবু একটুকু জানতে এখনো বাকী আছে যে—বোঝা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আর সময় কী?

তবু নন্দিনী এলো চলে—আস্‌বার সময় কর্‌ল না দেখা অসিতের সঙ্গে, মনকে বল্‌লে—একে বলে না পালানো।

তারপরে এই ছ'বছরে বিশ্ব-সংসারে অনেক বদল হ'লো। নন্দিনীর লেখা এলো বেড়ে। ওর জগৎ যেন এই—আর কিছু নেই।

ফাল্গুনে আমের মুকুলে যখন ধর্‌ত গন্ধ তখন কোনো এক্‌টা ইসরায় চঞ্চল হয়ে বলে উঠ্‌ত—এলো গল্প লেখার সময়। আর বর্ষার মেঘ-সজল-বায়ে সন্ধ্যাকালে যখন কান্নার করুণ একটি সুর আস্‌ত ঘনিয়ে তখন বল্‌তে চাইত আপনাকে—এলো গান; সুর করে মনের মধ্যে আস্‌ত ছেয়ে—তোমার সময় হোলো।

ইতিমধ্যে ঘট্‌ল একটি আশ্চর্য ঘটনা। আরো একজন স্পষ্ট করে জানিয়ে গেল আপ্‌নাকে ওর কাছে—সে এত স্পষ্ট যে ভয় হোল না মনে, ভাবনা ধরল না, শুধু মায়া কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ল।

মায়া কর্‌তে গিয়ে যখন পার্‌ল না, তখন উঠ্‌ল চমকে। সারারাতের কান্নার মধ্য দিয়ে জান্‌লো ধরা পড়ে আছে কোন্‌খানে।

*   *   *   *

নন্দিনী পা মেলে দিয়ে ছিলো বাগানে বসে—আমলকী গাছের তলে, ওর হাতে কলম কোলের'পরে খাতা। প্রত্যহের তুচ্ছতা যখন অপরূপ হয়ে ওঠে আনন্দে তাকেই বলি জীবন; —এই কথাটাকে চায় বল্‌তে।

এমনি সময় এসে দাঁড়ালেন যিনি, বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। তসরের থান পরা, আঁচলে বাঁধা চাবি। মুখখানি স্নেহে ভরা অথচ করুণ; যেন বেদনাহত মায়ের মতো।

নন্দিনী উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে। চিবুক স্পর্শ করে তিনি বল্‌লেন—আহা!

স্নান শেষে নন্দিনীর খোলা চুল কানের ধার দিয়ে এসেছে বুকে পিঠে—গরদের শাড়ীর কালো পাড় খোলা পায়ের পরে—কালো চোখে একটি স্নিগ্ধ লাবণ্য। যার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে এলেন—ইচ্ছে করলো তাকেই করুণা করতে। বললেন,—শুনেছিলুম তুমি বুদ্ধিমতী, কবি তুমি—তোমার যাতে আনন্দ সকলের নয় তাতে—ভয় হোলো, তোমাকে জয় করবে এমন বিজয়িনী হবে কে? তাই বল্‌তে এসেছিলুম—মা, দয়া করো। তোমার হয়তো কাউকে দরকার করে না—যাদের দিন কাট্‌বে কান্নার মাঝখানে তাদের বাঁচতে দাও। কিন্তু, তোমাকে দেখে আজ যে আমারও মায়া করতে ইচ্ছে করছে।

নন্দিনীর ভিতরটা এলো শুষ্ক হয়ে, শুধু বল্‌লে—তাকে দেখব আমি।

—এসো!

রাস্তা পার হয়ে তাদের ঘরে এসে দাঁড়াল নন্দিনী, মেয়েটি ছিলো শুয়ে—উঠে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে যেন উঠ্‌ল জ্বলে—চোখে জ্বলে উঠ্‌ল আগুন।

নন্দিনী ভারী গলায় বল্‌লে—এসো, বোন্ এসো।

অকারণে যখন ঈর্ষা কর্‌তে হয় মানুষকে তখন সে যে কতখানি করে বসেছে মর্‌তে—সেই খবরটা যেন নন্দিনী পেল।

কী আশ্চর্য! থম্‌কে গেল ওর উদ্ধত ক্রোধ। বৈশাখের মেঘ এসে পৌঁছল শ্রাবণ-দিনে। সমস্ত দেহ উঠ্‌ল কেঁপে—চোখ এলো ভরে। যার নাগাল পাবে না ভেবে মনে মনে কর্‌ত ঈর্ষা, ভেবেছিল অবজ্ঞা করে করবে ছোট—আজ বুঝ্‌লো তার শক্তি কতখানি। হারমানা ছাড়া আর আছে কী! ছুটে এলো—কেঁদে বল্‌লে,—আমাকে বাঁচাও দিদি।

নন্দিনী দু'হাতের আড়ালে ওকে নিলো বুকে আর ও উঠ্‌ল ফুলে।

-বাণিজ্য বিপত্তি

বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্তে করে বল্‌লে নন্দিনী,—তাঁকে কি জেনেছ বোন্।

—তাতো জানিনে দিদি, শুধু আমি যে তাঁর বলেই জেনেছি।

নন্দিনীর চোখ ভরে এলো। জান্‌লার ফাঁক্ দিয়ে দেখা যায়—বাগানটার একপ্রান্তে একটা পেয়ারা গাছ—সব-পাতা-ঝরা—একেবারে সম্পূর্ণ নিরাভরণ—বৈরাগীর প্রেমের মতো; যেন কোনও চীনা শিল্পীর হাতে আঁকা।

ঘরে আলো জেব্লে অসিত পড়ছে নন্দিনীর লেখার খাতা—যেখানে বল্‌তে চেয়েছে—উল্টো দিক্ থেকে যখন এসেছে প্রেম তখনি সম্পূর্ণ হয়েছে মিলন; ঠিক্ সেইখানটা। এমনি সময় নন্দিনী এলো ঘরে।

—এ কী, এত রাত্রে ?

—কেন, সময় কী নেই ?

অসিত হাস্‌ল—তোমার আসার মতো আর আছে কী ! কখন তোমার অসময় নন্দিনী ?

নন্দিনী পাশে এসে হাত চাপা দিলো লেখাতে—বল্‌লে, —রেখে দাও খাতা, ওতো চিরকাল রইল।

—হাঁ। তুমিও চিরকালের।

খাতা রেখে মুখ তুলে অসিত বল্‌লে,—

আজ বিশেষ কিছু বল্‌বে বোধ করি।

—যদি চুপ্ করে থাকি।

—কোনও ক্ষোভ নেই, তাতেও আমার আনন্দ ভরা হয়ে উঠ্‌বে।

—আজ কিছু দিতে এসেছি। অসিতের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল নন্দিনী।

অঞ্জলি পেতে অসিত বল্‌লে,—দাও।

—সব জিনিষ হাত পেতে নেওয়া যায় এই কী জানো তুমি।

অসিত বল্‌লে—মানুষের অন্তঃপুরে পৌঁছবার যে পথ —তারি একটি মানুষের হাত।

—যা দিতে চাই—তাই নিতে চাও, এত সহজে, কোনও ভয় নেই—বল্‌লে নন্দিনী।

—তোমাকে আমার ভয় কী। নন্দিনী, আজ তোমাকে কী যেন লাগছে।

—কী মনে লাগ্‌ছে আজ।

—কী জানি, মন বল্‌ছে—কোথায় যেন নাড়া খেয়েছ। নন্দিনী, আমাকে বলো, কী তোমার কষ্ট।

—না না, কোনও কষ্ট নেই আমার—বল্‌লে নন্দিনী,—তোমাকে কিছু দিতে চাই।

অবাক্ লাগ্‌লো অসিতের, নন্দিনী চলে গেল পাশের ঘরে, মেয়েটির হাত ধরে যখন এলো কাছে—তখন উঠ্‌ল আর্ত-নাদ করে—

না না, নন্দিনী, এ নয়।

মেয়েটি আহত হয়ে উঠ্‌ল চম্‌কে, অসিতের হাত থেকে হাত নিলো টেনে।

নন্দিনী ওর হাত এনে ফের রাখ্‌লো অসিতের হাতে—ওর জলভরা মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল অসিত—ওর

পরিস্থিতির প্রকোপে তাহার পরিণাম অনিষ্টদায়ক হইয়াছিল।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ ছিল যুদ্ধ পরিস্থিতির সহিত অর্থ-নৈতিক ও শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক ব্যবস্থার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের বৎসর। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকার উপর্যুপরি কয়েকটি জরুরী বিধিনিষেধ (Ordinance) প্রবর্তিত করেন। বিদেশীয় ব্যক্তিগণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, সরকারী প্রয়োজনে বাণিজ্য-তরীর দখল গ্রহণ, সমুদ্র-যাত্রী জাহাজ ও বিমান সত্ত্বের অদলবদল ও দখল নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বব্যাপক ভারতরক্ষা (Defence of India Ordinance) বিধির প্রবর্তন, বৎসরের প্রারম্ভেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পরে আসিয়াছিল, প্রথম যুদ্ধ-ব্যয়-সংক্রান্ত অগ্রিম তালিকা (First War Budget), লভ্যাংশের উপর অতিরিক্ত কর (Excess Profits Tax), রেল মাশুল ও ভাড়ার বৃদ্ধি, পেট্রলের উপর ধার্য কর বৃদ্ধি, শর্করার উপর নির্ধারিত অন্তর্দেশীয় শুল্কের দ্বিগুণ বৃদ্ধি এবং বৎসরের শেষভাগে, ডাক, টেলিফোন, আয়কর এবং অতিরিক্ত করের বর্ধিত হারের সহিত আসিয়াছিল আমদানী ও রপ্তানি ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধিত সঙ্কোচ, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ; সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মালপত্রের বাধ্যতামূলক যুদ্ধ দায়িত্ব সংক্রান্ত বীমা এবং ভারত তালিকা-ভুক্ত পোতগুলির ক্রমবর্ধমান সরকারী তলপ (Requisition)।

যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রসূত সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিঘাত লাভ করিয়াছিল, ভারতের বহির্বাণিজ্য এবং বিশেষ করিয়া, রপ্তানি ব্যবসায়। ভারতের আমদানী ও রপ্তানি—উভয়বিধ বহির্-বাণিজ্যের গতি প্রকৃতির গুরু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব বৎসরের তুলনায় আমাদের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্যের অপহ্নব ঘটে নাই। ১৯৩৯ সালে আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ৬১ কোটি টাকা; ১৯৪০ সালের অঙ্ক হইয়াছিল ১৬৩ কোটি টাকা। ১৯৩৯ সালে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ছিল ১৮৮ কোটি টাকা; ১৯৪০ সালের মূল্য সমষ্টি হইয়াছিল ২১৮ কোটি টাকা। যুদ্ধের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সহিত বৈদেশিক পণ্যের আমদানী হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারতকে ঐ সকল পরিহার্য অপরিহার্য পণ্যে আত্মনির্ভরশীল হইবার কঠোর প্রচেষ্টা করিতে হইতেছে। বিষম ক্ষতি হইয়াছে, রপ্তানি বাণিজ্যে। মুখ্যত ভারতের রপ্তানি পণ্য কৃষিজাত কাঁচা মাল। ইউরোপের বিভিন্ন বিপণি হইতে বিচ্যুত ও বঞ্চিত হইয়া, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সদ্য সমাপ্ত সরকারী বৎসরের প্রথম নয় মাসে, অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত, রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে দুইশত কোটি টাকার। অসংস্কৃত চর্ম, খইল, তৈল বীজ, কার্পাস তুলা, পাট এবং পশম প্রভৃতির রপ্তানি রুদ্ধ হইয়া এই ক্ষতির সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ কয়েক মাসে পরিণত পণ্যের (Manufactured goods) রপ্তানি বৃদ্ধি হেতু রপ্তানি বাণিজ্যের মোট মূল্য ১৪ কোটি টাকা বেশী হইয়াছিল। প্রধানত কার্পাস তুলা এবং পাট নির্মিত দ্রব্যাদি, কয়লা, লৌহ এবং ইস্পাতের রপ্তানি বৃদ্ধিই ইহার মূল কারণ। রবার নির্মিত দ্রব্যাদি, কাগজ, কলম প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম, কাচ, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি এবং

মনে পড়ে, মৌখিক জানার পালা শেষ হবার পরের খবর। যেন প্রথম পরিচয় এলো নন্দিনীর লেখার মধ্য দিয়ে। বন্ধুর কাছ থেকে খাতা নিয়ে গিয়েছিলো অসিত। সেই খাতা ফেরৎ দেবার সময় যখন এলো নন্দিনী তখন বাগানে; বুকের কাছে তুলে ধরা কালো কাপড়ে বাঁধানো খাতা, মুখের পরে মেলে ধরা স্থির দুটি চোখ—উঠল একেবারে চমকে—কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে হাতপেতে খাতা নিয়ে এলো চলে।

তারপরে দেখাশোনার মাঝখানে নন্দিনীর চল্‌ল যে ব্যবহার সে মোটেই সুর-ধরানো নয়; নন্দিনী না হয়ে হ'ত যদি অন্য মেয়ে তবে তার আচরণ ভদ্রজনোচিত নয়, একথা মনে কর্‌তেও হয়তো অসিতকে বাধ্‌তো না।

ভাবনা হোল মনে—ওর প্রথমকালে এক্‌টা ঘটনা ঘটেছিল। একান্ত শিশুতরুণ মনের সঙ্গে মিল্‌লো ওর কবি—তাই মনে কর্‌ল এই সত্য—এই বিশেষ কিছু।

তার পরেকার আঘাতে পড়্‌ল ভেঙ্গে।

তখন এই কিছু-না-টাকেই মনে করেছিল মস্ত কিছু, তাই আজকের এই কিছু হাঁ টাকে কিছুতেই স্বীকার করল না, বল্‌লে—এ কিছু নয়।

ছুটি শেষের আগেই মনোরমাকে বল্‌ল,—আমি যাব।

—সে কী, এখনি?

—হাঁ।

ওর ভিতরকার এই অশান্ত আবেগ আর কারুর কাছে থাক্ না চাপা মনোরমার কাছে থাক্‌ল না। বোনকে ডেকে বল্‌লে,—

অসিতকে চিন্‌তে পারিস্, ওযে ধরা পড়েছে।

নন্দিনী জবাব দিলো না—চুপ্ করে চেয়ে থাক্‌ল আকাশে।

মনোরমা বল্‌লে,—সাধারণের মতো যদি ও তবে ভাবনা করতুম না।

নন্দিনী এবার বল্‌লে—মন বুঝতে সময় লাগে।

মনোরমা হাসল—দিদি, অনেক পড়্‌তে পারো, লিখতে পারো অনেক—তবু একটুকু জানতে এখনো বাকী আছে যে—বোঝা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আর সময় কী?

তবু নন্দিনী এলো চলে—আস্‌বার সময় কর্‌ল না দেখা অসিতের সঙ্গে, মনকে বল্‌লে—একে বলে না পালানো।

তারপরে এই ছ'বছরে বিশ্ব-সংসারে অনেক বদল হ'লো। নন্দিনীর লেখা এলো বেড়ে। ওর জগৎ যেন এই—আর কিছু নেই।

ফাল্গুনে আমের মুকুলে যখন ধর্‌ত গন্ধ তখন কোনো এক্‌টা ইসরায় চঞ্চল হয়ে বলে উঠ্‌ত—এলো গল্প লেখার সময়। আর বর্ষার মেঘ-সজল-বায়ে সন্ধ্যাকালে যখন কান্নার করুণ একটি সুর আস্‌ত ঘনিয়ে তখন বল্‌তে চাইত আপনাকে—এলো গান; সুর করে মনের মধ্যে আস্‌ত ছেয়ে—তোমার সময় হোলো।

দিতে পারতুম—ভেবে পাইনে।

—পার্‌তে ওগো পার্‌তে। নিঃশেষ কর্‌তে আপনাকে। ভালোবাসলে মেয়েরা পারে না কী?

—কিন্তু ভুল্‌ছো কেন, আমি তো কেবলমাত্র মেয়ে নই।

—ভুলি নি, কবি তুমি। সেই তোমাকে এম্‌নি করে ঝড়ের-সমুদ্রে এনে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। ভুলিয়ে দিয়ে গেল—তুই মেয়ে শুধু কবি নোস্। ওগো কবি, জেনে রেখো, অনেক জানো বলেই অনেক হারালে।

—হারাই নি, আমার আসন ঠিক্ আছে।

—রাক্ষুসী, তোমার জন্যে রইল কবিতা, তাকে দিয়ে এলে কী?

—তাঁকে আমি চিনি, তাঁর সব রইল।

—বুঝতে পারছ্ না বলেই এম্‌নি করে বল্‌ছ। জানো না যে চিরকাল অন্তরের মধ্যে পাওয়ারই আর এক নাম নিঃসঙ্গতা। সেদিন দেখ্‌লুম ওর মুখ, কী কঠিন, কী পান্ডুর। সুখদুঃখ, ভালোমন্দ সব ছাড়িয়ে। তোমরা বল্‌বে বৈরাগীর মতো; আমার মনে লাগ্‌ল মৃত্যুর মতো রক্ত-হীন—কী অসহ্য সে। বল্‌লুম—তুমি ছাড়্‌লে কেন? শান্তস্বরে বল্‌লে—ছাড়ার মধ্যে যে পাওয়া সেইটাকে পাব বলে। বুঝলুম—তোমার কথাটাই একান্ত নিজের করে জপ কর্‌ছে। কান্না পেলো ছুটে চলে এলুম। সে মুখ যদি দেখ্‌তিস্—বুক ফেটে মর্‌তিস্ সেখানে।

নন্দিনীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

মনোরমা বল্‌লে—দিদি, যত জোরই কর না কেন বাইরে—তুমি যে মেয়ে একথা ভুলবে কেমন করে?

নন্দিনী বল্‌লে,—দিদি, তোমাদের ক্ষ্যাপা বিধাতার হাতে কত সৃষ্টিছাড়া পাগ্‌লামী। বিশ্ব সংসারে সকলের চাওয়াই কী এক। সব মেয়ে কী চায় তাতো বল্‌তে পারিনে—কিন্তু নিজের কথা জানি। আমার সংসার পথের সঙ্গীকেই যদি চাইতুম আমার দুঃখসুখের সঙ্গী করে, তবে কী মিথ্যে হোত আমাদের সেই সন্ধ্যাকাল; সে আমি ভাব্‌তেও পারিনে।

আমি তখন শিশুকালের একটা ঘুমে আচ্ছন্ন—আমার সেই ঘুমে আচ্ছন্ন আপনাকে তিনি দিলেন জাগিয়ে একেবারে মুখোমুখী করে—কী কঠিন সত্য তার প্রকাশ। আমার সেই জাগ্রত আপনাকে দিয়ে এলেম তাঁর পায়ে—তিনি তো তাকে নিলেন।

আমার মতো এমন করে আর কোনও মেয়ে পেয়েছে কি-না জানি না—কিন্তু সত্যি বল্‌ছি মনুদিদি,—আমার জন্যে তোমরা ভাবনা রেখো না মনে।

চোখের জলে মিশে নন্দিনীকে লাগ্‌ল কান্না-ধোওয়া হৃদয়ের মতো।

মনোরমা নন্দিনীর মুখটা নিলো টেনে, মাথায় হাত বুলিয়ে ওর চোখ এলো ভরে—বল্‌লে,—বোন্—হয়তো তাই। হয়তো এমন জায়গায় এসে তোমরা পাও যেখানে ছাড়া আর পাওয়ার কোনও সীমা টানা নেই।

শুধু আজকের দিনে এইটুকু বলে যাই, যেন এই পাওয়া তোমার থাকে চিরকাল, যেন বাঁচতে পারো।

বিগত বর্ষের শিল্প-বাণিজ্য বিপত্তি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারী বৎসর ১৯৪০-৪১ সম্প্রতি কালের তিমির গর্ভে বিলীন হইয়াছে। এই ঘটনাবহুল দুর্বৎসর যুদ্ধাগ্নির যে প্রজ্জ্বলিত, প্রসারণশীল, লেলিহান শিখা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে, তাহার তীব্র দহন-ক্রিয়া কতদিনে, কি প্রকারে, প্রশমিত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। বর্তমানে আমরা যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যভাগে উপনীত। সুদীর্ঘ চারি বৎসর ব্যাপী (১৯১৪-১৮) বিগত মহাযুদ্ধের তীব্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, এই যুদ্ধ যে এরূপ প্রলয়ংকরী অতি-দ্রুত-বিস্তারশীল আকৃতি ও প্রকৃতি অবলম্বন করিবে, তাহা অতি অল্প লোকই অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। ধ্বংসলীলার ভীষণতায় বর্তমান বিপ্লব বিগত মহাযুদ্ধাপেক্ষাও ভীষণতর। ধন-জন, মান-সম্ভ্রম, পশার-প্রতিপত্তি, কীর্তি-কলাপ কিছুই ইহার নিষ্ঠুর ও নির্মম পীড়ন হইতে মুক্ত নহে। অর্থ-বিত্ত, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত।

সমগ্র ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ ছিল যুদ্ধ-বর্ষ। সুতরাং অর্থ-সামর্থের সহিত শিল্প-বাণিজ্যও এই অশুভ বর্ষে বিষম ও বিপুল বাধা-বিঘ্নে বিপন্ন ও সংকট-সঙ্কুল হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, পূর্ববারের ন্যায় এবারেও, শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থ-সম্পদ যুদ্ধ-পূর্ব দশকের অবিচ্ছিন্ন মন্দার প্রকোপ হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করিবে। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে দুরাশা বিদূরিত হইয়াছিল। ১৯৪০ সাল হ্রস্বায়মান দ্রব্য-মূল্যের সহিত, অনিশ্চিত পরিস্থিতির আনুষঙ্গিক শিল্প-বাণিজ্যের অপকর্ষ লইয়া, সমুপস্থিত হইয়াছিল। জার্মানির দ্রুত বিজয় অভিযান এবং ক্রমান্বয়ে একটির পর অন্য আর একটি দেশের পতন, এই পরিস্থিতিকে জটিলতর রূপ প্রদানপূর্বক, মে মাসের শেষে এবং জুন মাসে, ফরাসীর আত্মসমর্পণের পর, বিষম চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে, লোকে ধনশালা (banks) এবং ডাক ঘরের সঞ্চয় ভাণ্ডার (Savings banks) হইতে রাশি রাশি অর্থ উঠাইয়া লইয়াছিল। ধাতব মুদ্রা সংগ্রহ ও গুপ্ত সঞ্চয়ের ফলে, বাজারে রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার আত্যন্তিক অভাব ঘটিয়াছিল। মূলধনের অন্তর্ধানের সহিত মুদ্রা প্রচলন ও বিনিময় বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

আচম্বিতে ফরাসীর অপ্রত্যাশিত অধঃপতনে মিত্রশক্তির আয়ত্তাধীন জাহাজের অপ্রতুল ঘটিয়াছিল। মাল ও যাত্রী চলাচলের স্থান সঙ্কোচ এবং সংকট সংকুল ভূমধ্যসাগরের সংকীর্ণ পথ পরিত্যাগপূর্বক, উত্তমাশা অন্তরীপের দীর্ঘতর পথে জাহাজ পরিচালনা প্রয়োজন হেতু, সমুদ্র বাণিজ্যের প্রভূত সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, এই বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তিসঙ্কুল ঘনঘটাচ্ছন্ন পরিস্থিতির বিভীষিকা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৯৪০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এই আতঙ্কজনক অবস্থার শুভ পরিবর্তন ঘটে এবং নৈরাশ্যের কুহেলিকা বিদূরিত করিয়া আশার আলোক আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু সমগ্রভাবে, আলোচ্য বর্ষের আর্থিক অবস্থা এবং শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থার যে স্থায়ী বিপর্যয় সংঘটিত হয়, যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রকোপে তাহার পরিণাম অনিষ্টদায়ক হইয়াছিল।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ ছিল যুদ্ধ পরিস্থিতির সহিত অর্থ-নৈতিক ও শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক ব্যবস্থার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের বৎসর। যুদ্ধ ঘোষণার সংগে সংগেই কেন্দ্রীয় সরকার উপর্যুপরি কয়েকটি জরুরী বিধিনিষেধ (Ordinance) প্রবর্তিত করেন। বিদেশীয় ব্যক্তিগণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, সরকারী প্রয়োজনে বাণিজ্য-তরীর দখল গ্রহণ, সমুদ্র-যাত্রী জাহাজ ও বিমান সত্ত্বের অদলবদল ও দখল নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বব্যাপক ভারতরক্ষা (Defence of India Ordinance) বিধির প্রবর্তন, বৎসরের প্রারম্ভেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পরে আসিয়াছিল, প্রথম যুদ্ধ-ব্যয়-সংক্রান্ত অগ্রিম তালিকা (First War Budget), লভ্যাংশের উপর অতিরিক্ত কর (Excess Profits Tax), রেল মাশুল ও ভাড়ার বৃদ্ধি, পেট্রলের উপর ধার্য কর বৃদ্ধি, শর্করার উপর নির্ধারিত অন্তর্দেশীয় শুল্কের দ্বিগুণ বৃদ্ধি এবং বৎসরের শেষভাগে, ডাক, টেলিফোন, আয়কর এবং অতিরিক্ত করের বর্ধিত হারের সহিত আসিয়াছিল আমদানী ও রপ্তানি ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধিত সঙ্কোচ, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ; সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মালপত্রের বাধ্যতামূলক যুদ্ধ দায়িত্ব সংক্রান্ত বীমা এবং ভারত তালিকা-ভুক্ত পোতগুলির ক্রমবর্ধমান সরকারী তলপ (Requisition)।

যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রসূত সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিঘাত লাভ করিয়াছিল, ভারতের বহির্বাণিজ্য এবং বিশেষ করিয়া, রপ্তানি ব্যবসায়। ভারতের আমদানী ও রপ্তানি—উভয়বিধ বহির্বাণিজ্যের গতি প্রকৃতির গুরু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব বৎসরের তুলনায় আমাদের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্যের অপহ্নব ঘটে নাই। ১৯৩৯ সালে আমদানী পণ্যের মূল্য ছিল ৬১ কোটি টাকা; ১৯৪০ সালের অঙ্ক হইয়াছিল ১৬৩ কোটি টাকা। ১৯৩৯ সালে রপ্তানি পণ্যের মূল্য ছিল ১৮৮ কোটি টাকা; ১৯৪০ সালের মূল্য সমষ্টি হইয়াছিল ২১৮ কোটি টাকা। যুদ্ধের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সহিত বৈদেশিক পণ্যের আমদানী হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারতকে ঐ সকল পরিহার্য অপরিহার্য পণ্যে আত্মনির্ভরশীল হইবার কঠোর প্রচেষ্টা করিতে হইতেছে। বিষম ক্ষতি হইয়াছে, রপ্তানি বাণিজ্যে। মুখ্যত ভারতের রপ্তানি পণ্য কৃষিজাত কাঁচা মাল। ইউরোপের বিভিন্ন বিপণি হইতে বিচ্যুত ও বঞ্চিত হইয়া, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সদ্য সমাপ্ত সরকারী বৎসরের প্রথম নয় মাসে, অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত, রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে দুইশত কোটি টাকার। অসংস্কৃত চর্ম, খইল, তৈল বীজ, কার্পাস তুলা, পাট এবং পশম প্রভৃতির রপ্তানি রুদ্ধ হইয়া এই ক্ষতির সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ কয়েক মাসে পরিণত পণ্যের (Manufactured goods) রপ্তানি বৃদ্ধি হেতু রপ্তানি বাণিজ্যের মোট মূল্য ১৪ কোটি টাকা বেশী হইয়াছিল। প্রধানত কার্পাস তুলা এবং পাট নির্মিত দ্রব্যাদি, কয়লা, লৌহ এবং ইস্পাতের রপ্তানি বৃদ্ধিই ইহার মূল কারণ। রবার নির্মিত দ্রব্যাদি, কাগজ, কলম প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম, কাচ, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি এবং

রাসায়নিক দ্রব্যাদির রপ্তানিও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

রপ্তানি ক্ষেত্রের অসীম সঙ্কোচ সংঘটিত হইয়াছিল। একমাত্র যুক্তরাজ্য ব্যতীত, ইউরোপের সকল বাজারই ভারতের পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের সহিত আমাদের আমদানী ও রপ্তানি উভয়বিধ বাণিজ্য কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাম্রাজ্য বহির্ভূত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমেরিকা হইতে দ্বিগুণ পণ্য আমাদের দেশে আসিয়াছিল এবং মূল্য সমষ্টি ১৯ কোটি টাকা হইয়াছিল। ভারতের মালও অধিকতর পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিল। আমাদের নিকটতর প্রতিবেশী জাপান হইতে ঐ নয় মাসে ২ কোটি টাকা অধিক মূল্যের পণ্য আসিয়াছিল; কিন্তু জাপান ৩ কোটি টাকা কম মূল্যের পণ্য ভারত হইতে লইয়াছিল।

কিন্তু এই সকল অঙ্ক হইতে বাণিজ্যের খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, যুদ্ধ হেতু দ্রব্য-মূল্যের মানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং মূল্য হইতে রপ্তানি পণ্যের একুন পরিমাণের ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করা দুর্ঘট। দ্বিতীয়ত, যদিও রপ্তানি বাণিজ্যের মোট মূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে,—এ বৃদ্ধি যুক্তরাজ্যের যুদ্ধসম্ভার প্রয়োজন নিমিত্ত, সুতরাং সাময়িক ও আকস্মিক। বস্তুত আমাদের স্বাভাবিক রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। ফলে, যদিও বাণিজ্য-জমা-খরচে ভারতের জমার ঘরের অঙ্ক অধিকতর হইয়াছিল, তথাপি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রাথমিক উৎপাদক, গত সরকারী বৎসরে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। বিশেষত পরিণত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি হেতু উন্নতি ক্ষণস্থায়ী; কারণ, যুদ্ধ হেতু সাময়িকভাবে কার্পাস ও পাট প্রস্তুত দ্রব্যাদির চালানি বাড়িয়াছিল, কিন্তু ভারতের সাধারণ শিল্পোন্নতির কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। অবশ্য যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং ইউরোপের বাজার হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু ভারতের বাজারে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ—নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা। সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রধান দেশগুলি যেমন যুদ্ধ প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া স্ব স্ব এলাকায় নানাবিধ স্থায়ী শিল্পের উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে—ভারত তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে নাই। আমাদের একান্ত কর্তব্য ও নিতান্ত প্রয়োজন এই সুযোগে, পোত, বিমান, হাওয়া গাড়ি, রেল ইঞ্জিন এবং গুরু রাসায়নিক প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় আদিম ও মৌলিক শিল্পের স্থায়ী, বলিষ্ঠ ও বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠা।

যুদ্ধ সংকট ও সরকারী প্রয়োজন হেতু মালবাহী জাহাজের সংখ্যালাঘববশত মাল চালান দিবার স্থানাভাব জন্য আমাদের বহির্বাণিজ্য মন্দীভূত হইয়াছিল। উপকূল বাণিজ্যও এই বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে মুক্ত ছিল না। ক্রমবর্ধমান সরকারী তলপ ও দখলের নিমিত্ত উপকূল বাণিজ্যও মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজের অভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ফলে, পশ্চিম উপকূল বাণিজ্য সংরুদ্ধ এবং ভারত ও বর্মার ব্যবসায় সংকীর্ণ হইয়াছিল। বহির্বাণিজ্যের বিপর্যস্ত অবস্থা গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছে। মাল চালানী জাহাজের স্বল্পতা হেতু বৈদেশিক বাণিজ্যের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপের বাহিরে যে সকল বাজারে আমরা মাল চালান দিয়া এখনও প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারি, জাহাজের অভাবে সেগুলিও আমাদের আয়ত্তের বহির্ভূত। বর্তমান সুযোগ পরিত্যাগ হেতু ভবিষ্যতে ঐ সকল বাজারে স্থানলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। বিলাতী মাটি ও পাথুরিয়া কয়লার আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া আমরা এখন যথেষ্ট পরিমাণে এই দুইটি পণ্য বিদেশে চালান দিতে পারি। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ জাহাজের অভাবে এখন আমরা নিতান্ত নিরুপায় ও নিঃসহায়। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে, শান্তি সংস্থাপিত হইলে সরকার যদি ভারতে বাণিজ্য নৌবহর প্রতিষ্ঠার সনির্বন্ধ আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এরূপ দুর্দশা ঘটিত না। কেবল মাত্র যে উপকূল বাণিজ্যের অসুবিধা দূর হইত, তাহা নহে; ভারতের রপ্তানি ব্যবসায় এবং কৃষিরও প্রচুর সুবিধা ঘটিত। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত, আমরা বিগত মহাযুদ্ধের অমূল্য অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারি নাই। আশা করি পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যে উপর্যুপরি দুইটি কালান্তক যুদ্ধের সংঘটন হইতে লব্ধ চৈতন্যের ফলে, ভারত সরকার পুনঃ শান্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির অনুকূলে উপযুক্ত বাণিজ্য নৌবহর সৃষ্টি ও পুষ্টি এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারের প্রচুর। যতদিন সে শুভ সুযোগ সমুপস্থিত না হয়, ততদিন যাহাতে বর্তমান নৌবহরের প্রত্যক্ষ, অথবা পরোক্ষভাবে কোন ক্ষতি বা বিঘ্ন না ঘটে, তৎপ্রতি সরকারের সতর্ক দৃষ্টি অবশ্য কর্তব্য।

যুদ্ধ পরিস্থিতি হেতু, তিনটি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়াছে। জাহাজের অনটন, রপ্তানি রুদ্ধ কাঁচা মালের অপচয় এবং যুদ্ধসম্ভার ব্যবস্থাপন। এই তিনটি সমস্যার সুমাধান হেতু প্রয়োজন,—শিল্পাশ্রয়—শিল্প সংগঠন ও শিল্প সম্প্রসারণ,—নূতনের প্রতিষ্ঠা ও পুরাতনের প্রসার। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ, বিশেষত বিগত মহাযুদ্ধের অবসান হইতে ভারতবাসী, নির্বন্ধাতিশয় সহকারে, সরকারকে শিল্পোন্নতি সংঘটনার্থ সক্রিয় নীতি ও রীতি অবলম্বন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ-উপরোধ এবং আবেদন-নিবেদন জানাইতেছি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় শিল্প তদন্ত সমিতি (Indian Industrial Commission) ভারতের শিল্প সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এবং সুসঙ্গত সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার অন্যান্য সমস্যায় আকৃষ্ট হইয়া শিল্প সম্পদ সংস্থান ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। ফলে, বর্তমান যুদ্ধারম্ভে, যুদ্ধ সাহায্য সঙ্কল্পে, কোন বিষয়ে প্রস্তুত ছিল না। যাহার আত্মরক্ষার উপযুক্ত সম্বল ছিল না, সে রাষ্ট্র রক্ষার্থ কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? আত্মরক্ষায় অসমর্থ ভারত সাম্রাজ্যের সম্পদ নহে—ভারস্বরূপ।

আজ যুদ্ধের আত্যন্তিক প্রয়োজনে, ভারতের শিল্প সামর্থ্যের প্রতি অবহিত হইয়া সরকার সম্যক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধসম্ভারের এমন কোন অঙ্গ নাই যাহা ভারত প্রস্তুত করিতে পারে না। সরকারের যোগান বিভাগ আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, যে ভারতবর্ষ যুদ্ধ-পূর্ব, যুদ্ধ প্রয়োজনীয় চল্লিশ হাজার রকমের দ্রব্যাদির মধ্যে, মাত্র অর্ধেক সরবরাহ করিতে পারিত; সেই দুস্থ দুর্বল ভারত এখন, এমন কোন যুদ্ধ সামগ্রী নাই, যাহা অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে প্রস্তুত করিতে পারে না। এই চৈতন্য যথাসময়ে উদ্বুদ্ধ হইলে, আজ ভারত সবল সাম্রাজ্যের দুর্বল দায়িত্ব না হইয়া, বলিষ্ঠ সহকারী হইতে পারিত। এই চৈতন্যসম্ভূত প্রচেষ্টার প্রয়োজনে সরকার ভারতের অক্ষমতা দূর করিবার নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থার বিধান করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানমণ্ডলী (Boar of Scientific and Industrial Research), রপ্তানি পরামর্শদাতা সমিতি (Export Advisory Council) গঠিত হইয়াছে, শিল্পাশ্রয়ী ও শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের প্রয়ো নানুযায়ী বৈঠকের ব্যবস্থা হইয়াছে; পরস্পর সাহায্যশীল সম্পূরক ও অনুপূরক শিল্প-শৃঙ্খলার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনপূর্বক ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বাধাবিঘ্নহীন তৎপরতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে এবং যুদ্ধান্তে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্ধিত শিল্প সমূহকে সজীব ও বলিষ্ঠ রাখিবার নিমিত্ত, সরকার সংরক্ষণ-সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই উদ্যম ও সংকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করা। ভারতের অতি প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নতি দ্বারা দেশের ও দেশবাসীর স্থায়ী কল্যাণ সম্পন্ন গৌণ অভিপ্রায় মাত্র। যুদ্ধ-সম্ভার সংগ্রহ ও সংস্থানের অত্যাবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু এই সাময়িক প্রচেষ্টাকে দেশের স্থায়ী কল্যাণকল্পে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত, ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহের এতদিন অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। দেশবাসীর ন্যায়, সরকারেরও তাহাই একান্ত কাম্য। দেশের স্থায়ী উন্নতি ব্যতীত, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের কল্যাণ সম্ভব নয়। সে শুভ সংঘটন নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে দেশের স্থায়ী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিশীল প্রসারের উপর। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, ৭৬২ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার চুক্তি হইয়াছিল। এই যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে, ইহার দ্বারা সাময়িক প্রয়োজন সাধন করিয়াই ইহার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যুদ্ধার্থে ভারতে প্রতিদিন ১৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইতেছে। এই বিপুল অর্থকে সমস্ত প্রয়োজনীয় শিল্পে বণ্টন করিয়া যাহাতে ভারতের সর্ববিধ শিল্প ও ব্যবসায়ের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিতান্ত প্রয়োজন। এই অর্থের আদান প্রদান ও বিনিময়ের সুযোগ লইয়া একটু দূরদৃষ্টির সাহায্যে সরকার ভারতের বহু কল্যাণকর অবশ্য-প্রয়োজনীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও প্রসার সাধন করিতে সক্ষম। এই সুমহান্ সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহারে ত্রুটি ঘটিলে পরিতাপের ও অনুশোচনার অবধি থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য গুচ্ছের বৈঠক ও অনুষ্ঠানের কথা স্বতঃই মনে হয়। বর্তমান ব্রিটীশ প্রধান মন্ত্রীর ভাষায় এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রাচ্য দেশ-সমূহের পরস্পর সাপেক্ষ প্রণয়জ শক্তি, সামর্থ্য ও সুযোগের সমবেত সমন্বয়-সামঞ্জস্য দ্বারা তাহাদের আত্ম ও জ্ঞাতি প্রয়োজন সংসাধন। কিন্তু অসমঞ্জস সম্মেলনের পরিণাম ফল দুর্বলতম পক্ষের প্রতি চিরদিন শোচনীয় হয়। প্রবল প্রতাপ ও প্রভাব এবং শক্তি-সামর্থ ও সহায়-সুযোগসম্পন্ন প্রতিপক্ষের সহিত যথাযোগ্য বণ্টননীতিমূলক কার্য প্রণালীর ফলে ভারতের সর্ববিধ নূতন এবং অসম্পৃষ্ট শিল্প ব্যাহত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা। স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ-সমূহে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের কাঁচা মাল যোগাইয়াই ভারতের প্রচেষ্টার সমাধি লাভ ঘটিতে পারে। সুতরাং সরকার যুদ্ধার্থ যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, ভারতের পক্ষে তাহার অংশ অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা বিদ্যমান। যুক্তরাজ্য প্রেরিত রোগার দূতমণ্ডলী এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যগুচ্ছ যোগান সমিতি যদি ব্যয় বরাদ্দ বণ্টনের অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ সম্ভারের ত্বরিত যোগান-সৌকর্যহেতু ভারতের ভাগ্যে চির কল্যাণকর শিল্প অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্যতা সুদূর পরাহত-হইবার সম্ভাবনা প্রবল। একতাই বল। ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য করাই সমীচীন। কিন্তু, যুদ্ধ সামগ্রীর ত্বরিত সরবরাহের অজুহাতে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে, সুযোগ-সামর্থে, সমন্বয়ের নামে, ভারতের অর্থনৈতিক সমুন্নতি স্বার্থের যাহাতে ক্ষতি না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন। ভারতের বর্তমান, নূতন এবং ভাবী আদিম, মৌলিক ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই কর্তৃত্ব ভারতবাসীর আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্বায়ত্ত শাসনাধীন দেশসমূহের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণীয়।

একটিমাত্র উদাহরণের এইখানে উল্লেখ করিব। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোটর গাড়ি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের উদ্যম হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত সরকারী সাহায্যের অভাবে সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। পক্ষান্তরে যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পরে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেণ্ট মোটর গাড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তথাকার একটি কোম্পানীকে সর্বপ্রকার সাহায্যদান করিয়া ঐ শিল্পের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিয়াছেন। সেখানকার বিধান এই যে, মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশ স্বদেশবাসীর থাকিবে। এখানে ভারত সরকার, যুদ্ধারম্ভে যুদ্ধ প্রয়োজনের ত্বরিত তাগিদে একটি আমেরিকান কোম্পানীর সহিত যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণ সুযোগ পাইলেও ১৯৩৬ সালে ভারতের জাতীয় প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া আজ রাষ্ট্রশক্তিকে প্রভূত সাহায্যদান করিতে পারিত।

(শেষাংশ ৩০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নন্দদুলাল

(বড় গল্প)

শ্রীআশীষ গুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু,

সুপ্রিয়, তোমার কাগজের বার্ষিক সংখ্যার জন্য গল্প চেয়েছ, শাসিয়েছ যে কোন ওজর আপত্তিই গ্রাহ্য করবে না, লেখা নাকি এবার একটা আদায় করবেই। কিন্তু কথাটা আমার ওজর আপত্তির নয়, তোমার ফরমাসের। বায়না তোমার অনেক, বহুবার তোমাকে লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তোমার কাছে যে অপরাধী হ'য়ে আছি একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু তাই বলে' তোমার অনুরোধের ভাষাটার কথাও ভুলে যেয়ো না যেন। —একটি শান্ত মধুর কাহিনীর জন্য তোমার আগ্রহ এবং সে কাহিনী যাতে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প'রে সংস্থাপিত হয় এমনতর তোমার অনুরোধ। সেই অনুরোধের কথা বিস্মৃত হইনি বলেই, ইচ্ছে ছিল যেদিন লিখব সেদিন যেন তোমার আকাঙ্ক্ষার যতদূর সম্ভব কাছাকাছি পেঁৗছতে পারি। —আজ সে সুযোগ সমাগতপ্রায় —অতএব প্রথমেই গল্পের নাম লিখে নাও "নন্দদুলাল"। —জানো সুপ্রিয় আজ আমার প্রকৃতই শান্ত মধুর কোন কাহিনীর জন্য মন কেমন করছে,—একটি ছোট গৃহকোণ, একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ, একটি সমন্বিত প্রাণপ্রবাহের ইতিহাস। —ঘাটশিলার এই সুবর্ণরেখার তীরে বসে মনে হচ্ছে যেন সংসারে দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই, মলিনতা নেই,—এই যে নদী তীরবর্তী সন্ধ্যাটুকু এর চেয়ে রমণীয় আর কিছু কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। চারিদিকে দলে দলে ভ্রমণবিলাসী নর-নারীর আনাগোনা, তাদের আনন্দোদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে কেবলই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, হে ভগবান এই হাসি, এই উল্লাস, এই সরলতা এ যেন ছদ্মবেশ না হয়। যদি প্রার্থনা আমার সার্থক হয় তাহলে একথা মনে করায় অতিশয়োক্তি নেই যে সুবর্ণরেখার তীরে বসে আমি দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে থাকার ফল লাভ করলাম।

ভাবছি, এখন একটি গৃহের কাহিনী যদি তোমাকে শোনাতে পারতাম যেখানে বিবাহিত জীবনেও প্রেম রইল, প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝেও শুচিতা রইল, হাস্যপরিহাসের মধ্যে আদবকায়দার প্রতি নিষ্ঠার চেয়ে আন্তরিকতা বেশী রইল এবং সবটা মিলিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বাইরের ব্যবহার দেখে তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের গভীরতা সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী তদের আচরণের সেই ধারণা দৃঢ়তর হবার সুযোগ রইল, তাহ'লে খুসী হ'তাম। —স্থির করেছি আজ তোমাকে এমনই একটি আদর্শ কাহিনী শোনাব। আর একটা কথাও যুগপৎ মনে হচ্ছে। —যদি সম্ভব হয় তাহ'লে সত্য কাহিনী শোনাব। যে আদর্শ নরনারী আমার এই কাহিনীর কেন্দ্রীভূত হবে তাদের চতুর্দিকে আমার প্রসন্নতার উচ্ছ্বাসের দরুণ দু'একটা অতিশয়োক্তির কারুকার্য থাকবে হয়ত। কিন্তু আমার নায়কনায়িকা রক্তমাংসের মানবমানবী হবে, অর্থাৎ সত্যের পরে হবে তাদের প্রতিষ্ঠা। বিশেষণে যদি তাদের অভিহিতও করি তাহ'লেও সে বিশেষণ নিশ্চয়ই অমূলক হবে না। —বড় জোর মাত্রার কিছু তফাৎ হয়ত থাকতে পারে তাতে।

হরিণ-ধুবড়ীর কাছে একতলা একটা বাঙলো প্যাটার্নের বাড়িতে বাস করি,—বাড়িটার মাঝখান দিয়ে ভাগ করা,—পূর্বে এক বাড়িই ছিল, এখন উঠানের মাঝখানে দেয়াল তুলে দিয়ে দু'খানা করা হ'য়েছে।

ও বাড়িতে যে পরিবার বাস করে তাদের সঙ্গে আমার মুখচেনা আছে, আলাপ নেই। —আমি বেড়াতে এসে আলাপ করতে ভালবাসিনে বলেই আলাপ নেই, নইলে ওতরফের উৎসাহ কম দেখিনি এবিষয়ে।

ছোট ব্রাহ্ম পরিবারটি। বাপ-মা, পুত্র-পুত্রবধূ, অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা। —পিতা পোষ্ট অফিসে চাকরি করতেন, বছর দুয়েক হ'ল রিটায়ার করেছেন।—ছেলে আইন পড়ে, পুত্রবধূ পড়ে ফোর্থ ইয়ারে, কন্যা আগামী বৎসর আই-এ দেবে। —পরিপাটি সংসার, নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীটির মত অনুচ্ছ্বসিত, কিন্তু মাধুর্যে পূর্ণ। বাপ-মা'র চোখের মণি ছেলে-মেয়ে, পুত্রবধূ,—আরও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে,—ছেলে বিহারের ওদিকে ডাক্তারী করে। মেয়ে বিবাহিতা, স্বামীগৃহবাসিনী।

—আমার শোবার ঘরের দেয়ালের ওধারে পুত্র-পুত্রবধূ বাস করে। আমার প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে ওদের পরিবারের কলগুঞ্জন। —দিবারাত্র শুনি "ও বৌদি", "ও বৌমা", "ও দাদা", "ও ঠাকুরঝি", "ও মণ্টু"! —ভারী ভালো লাগে সুপ্রিয়। আমার উঠানের কোণে যে বারান্দাটুকু সেখানে ক্যাম্পচেয়ারে কাৎ হ'য়ে বসে' আকাশের পানে তাকিয়ে আমি ওদের কথা শুনি। —অপরাহ্নের দিকে ওরা রোজ বেড়াতে যায়, বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার পর, বাড়িতে ঢুকবার সময় ওদের কথাবার্তা যেন বর্ষাকালের স্রোতস্বিনীর মত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, ওদের পদধ্বনিতে আমি পাই সেই আনন্দের আভাস যার বহিঃপ্রকাশের প্রয়োজন আছে ওদের চিত্তে, যে খুসীকে ওরা আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেদের মধ্যে। মণ্টু, মণ্টুর স্ত্রী রেবা, আর মণ্টুর বোন নমিতার যেন আর উল্লাসের পরিসীমা নেই,—ছেলে, মেয়ে ও পুত্রবধূর পানে তাকিয়ে পিতামাতার আর তৃপ্তির অবধি নেই।

সুপ্রিয়, এটা সত্য ঘটনা, এ একেবারে আক্ষরিকভাবে সত্য। এর মধ্যে রং ফলাবার কোন প্রয়াস থাকবে না, যেমনটি দেখেছি, ঠিক ঠিক যা অনুভব করেছি তাই লিখে যাব। তোমাকে ত গোড়াতেই বলেছি যে একটা আদর্শ কাহিনী শোনাবার জন্য এবং সম্ভব হ'লে একটা আদর্শ সত্য কাহিনী শোনাবার জন্য আমার মনের আকুতি, তারই জন্য আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা। ডুবুরির মত আমার মনের অতলস্পর্শ অনুভূতির তলদেশ স্পর্শ করার জন্য আমার আগ্রহ, সেই আগ্রহের ফলে যদি বা এমনতর এক সত্যবোধের

সাক্ষাৎ মিলিল, তাতে কোনরকম রং ছুঁইয়ে—তুমি বিশ্বাস কোরো সুপ্রিয়—আমি কিছুতেই তার জাতিচ্যুত করব না।

কিন্তু যা বলছিলাম।— ওদের আনন্দের জন্য আমি চিত্ত মেলে থাকি, কান পেতে থাকি ওদের চরণধ্বনির জন্য। মণ্টুর স্ত্রীর কণ্ঠে দিবারাত্র সংগীত লেগেই আছে, গুন গুন ক'রে মেয়েটি সকাল থেকে রাত্রি দশটা অবধি গান গায়,—"তার চরণের ধ্বনি শুনিতে কি পাও?"

নমিতা খিলখিল ক'রে হাসে,—"হ্যাঁগো, পাই, খুব শুনিতে পাই! সে যে আসে আসে—" বলে সে মধুবর্ষী কণ্ঠে গান ধরে।

"তোরা শুনিসনি কি, শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
সকল সুরে বেজেছে তার
আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।"

মণ্টু বাড়িতে ঢুকে প্রশ্ন করে, "কে আসে রে নমি?"

হেসে জবাব দেয় নমিতা, "বৌদি গাইছিল দাদা, 'তার চরণের ধ্বনি শুনিতে কি পাও?' তাই জবাব দিলাম, 'হাঁ পাই বৈকি,—সে যে আসে, আসে, আসে।"

একটু থেমে আবার হেসে ওঠে নমিতা, "বলব, দাদা তুমি বৌদির গানের কি জবাব দেবে?

মণ্টু বলে "কি?"

"বল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারংবার
ফিরেছি ডাকিয়া,
যে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।

বল না দাদা এমনই ক'রে বৈবিক ছন্দে।"

মণ্টুর স্ত্রী মিষ্ট গলায় তর্জন করে' ওঠে, "এই ঠাকুরঝি, এই নমি!"

আমি দেওয়ালের গায়ে কান পেতে থাকি সুপ্রিয়, এমন সুখকর কর্মব্যস্ততা আমার জীবনে আর ঘটেনি,—সমস্ত দিনে আমার অবসর নেই, বাইরে বেরোবার আমার জো নেই, কখন কোন পরম রহস্যজনক আনন্দের অভিব্যক্তি যে আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিমিষে অন্তর্হিত হ'বে তারই জন্য আমি সতত সজাগ থাকি।

ভারী সুবিধে হয়েছে আমার, মণ্টুর ঘর আমার ঘরের পাশে অবস্থিত হওয়াতে। ওদের—মণ্টুর ও রেবার কথা-বার্তা আমার কানে আসে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তারপর ওরা এক ফাঁকে পড়ে ঘুমিয়ে, কিন্তু আমি আমার অন্ধকার ঘরে জেগে থাকি রাত্রি দেড়টা দুটো অবধি উপরের অনালোকিত অ্যাজবেস্টস্ সীলিং-এর দিকে তাকিয়ে। ভাবি, 'জীবনতরী বয়ে যেত মন্দাক্রান্তা তালে, আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।' কিন্তু কালিদাসের কালে না জন্মেও আমার পাশের ঘরের অধিবাসীরা মন্দাক্রান্তা তালে জীবনতরী বেয়ে চলেছে, আর চোরা বালিতে পা ফেলে ফেলে আমাদের প্রাণশক্তি প্রায় শেষ হ'য়ে এল! মণ্টুদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে ছন্দ বাজে একরকম আর আমার কাছে বিশ্বকবির প্রশ্ন অন্যরকম—

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
... ...
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিবাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"

কবি একই সুপ্রিয়, কিন্তু উত্তরের ঘর ও দক্ষিণের ঘরে বাণীর ও সুরের কত তফাৎ দেখেছ? একই কবির গান আমরা গাই, নমিতা ও আমি,—একই ভগবানের পৃথিবীতে বাস করি রেবা, মণ্টু ও আমি! এ এক রসিকতা মন্দ নয়!

সেদিন রাত্রে রেবা বলল, "ছোট্ট ছেলের 'নন্দদুলাল' নাম আমার খু-উ-ব ভালো লাগে, ভারী মিষ্টি, ভারী আদরের কিন্তু।"

মণ্টু বল্‌ল, "ধোৎ, যেমন তোমার পছন্দ।"

এবার বিস্ময়ের সুরে রেবা বল্‌ল, "কেন? পছন্দটা খারাপ হ'ল কিসে?—ভালো নাম তুমি যা খুসী রাখ, কিন্তু ডাক নাম 'নন্দদুলাল' খু-উ-ব চমৎকার!"

শুনে মণ্টু হেসে উঠ্‌ল, "আচ্ছা বাপু তাঁর সুযোগ সুবিধামত যখন তিনি আসবেন, রেখো তুমি তাঁর নাম 'নন্দ-দুলাল'—এখন রাত অনেক হ'য়েছে, ঘুমোও—"

পরদিন রাত্রিতে মণ্টু বল্‌ল, "জান রেবা, ভেবে দেখ্‌লাম 'নন্দদুলাল' নামটা সত্যিই চমৎকার,—ডাক নাম হিসেবে বাচ্চা মানুষের ওর চেয়ে ভালো নাম আর হয় না।"

উৎসাহিত হ'য়ে রেবা বল্‌ল, "কেমন, বলেছিলাম না আমি যে অত আদরের নাম! মীরা তার গিরিধারীকে ডাক্‌ত বলে' ওই নামে!"

এমনই ক'রে দিন কাটে।

সেদিন বেলা চারটে থেকেই ওদের বাড়িতে একটু বেশী রকম সাজগোজের আয়োজন চল্‌ছিল রেবার ও নমিতার,—মিঃ মুখার্জির নাতীর জন্মদিন, সেখানে ওদের নিমন্ত্রণ সন্ধ্যাবেলা।

—নমিতা গা ধুয়ে এসে রেবার দিকে চেয়ে ভারী বিস্মিতকণ্ঠে বল্‌ল, "বৌদি, তুমি ও কানবালা কোত্থেকে পেলে?"

উত্তর দিল রেবা, "মা'র গহনার ঝাঁপিটা খুলেছিলাম, দেখি আমাদের গহনার সঙ্গে এটাও র'য়েছে। পুরানো

আমলের জিনিস,—কি সুন্দর কাজ দেখছ ঠাকুরঝি! আজকাল আর এত সুন্দর কাজ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—"

নমিতার কোন উত্তর শুনতে পেলাম না।—

অনেকক্ষণ ধরে উৎকর্ণ হয়ে আছি, ওবাড়ির কথাবার্তা মন্থর হ'য়ে এসেছে—ওরা সব চলে গেল নাকি! —কিন্তু এত নিঃশব্দে চলে' যাবার পাত্র ত মণ্টু, রেবা, নমিতা নয়।—হঠাৎ মণ্টুর গলা শুনতে পেলাম, "কি হয়েছে রে নমি, যাবিনে কেন শান্তাদিদের ওখানে?"

ক্লান্ত সুরে নমিতা জবাব দিল, "মাথা ধরেছে দাদা হঠাৎ, শরীরটাও খুব খারাপ বোধ হচ্ছে,—আমি আর যাব না। তুমি আর বৌদি ঘুরে এস,—শান্তাদিকে বুঝিয়ে বোলো খুব ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু শরীর খারাপের জন্য আসতে পারলাম না কিছুতেই। বুঝিয়ে বোলো ভালো করে', কিছু তাহ'লে মনে কর্‌বেন না নিশ্চয়—"

রেবা পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌ল, "তা হ'বে না ঠাকুরঝি, যেতেই হ'বে তোমায়, নইলে আমিও যাব না কিছুতেই—"

কিন্তু নমিতা কোন অনুরোধেই রাজী হ'ল না, ওর মা বারংবার বল্‌লেন, ওর বাবা দু একবার বোঝালেন, "যা না, বৌমা এত করে' বল্‌ছেন, গিয়েই না হয় চলে' আসিস্‌ 'খন—"

কিন্তু নমিতা সম্মত হ'ল না কিছুতেই। অবশেষে মণ্টু আর রেবা নমিতাকে বাদ দিয়ে চলে' ,গেল নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে।

—আমার ক্যাম্প চেয়ার পেতে আমি যথারীতি আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। পূর্ণিমার চাঁদ সমারোহ করে' আকাশের কোলে দেখা দিয়েছে।—মাঠের ওপাশে কোন্‌ বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠ্‌ল,—সহসা মনে পড়্‌ল, আজ বৃহস্পতিবার।—যে বাড়িতে শাঁখ বাজ্‌ছে সে বাড়ির একটি কল্যাণী বধূকে যেন আমি মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি,—সে বোধ হয় এবার পূজোয় বসবে, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়বে হয়ত সে এখন সুর করে'। বহু অকল্যাণের মাঝে হয়ত ওই বধূর কল্যাণের সাধনা, অমঙ্গলকে বিদূরিত করবার জন্য ও হয়ত শাঁখ বাজায়, পাঁচালী পড়ে! কিন্তু পাঁচালী ও পড়ে কিনা তাই বা কে জানে! ওর শিশুসন্তানের নাম 'নন্দদুলাল' রেখেছে কি এই মেয়েটি? রেবার ত জানি 'নন্দদুলাল' নামের প্রতি লোভ, মণ্টুরও তাই, কিন্তু।—নমিতার কণ্ঠস্বর কানে এল, সে তার মাকে বল্‌ছে, "বৌদির কানের কানবালাটা কি তুমি তাকে দিয়েছ?"

অপরাধীর কণ্ঠে মা বল্‌লেন, "রাগ করিস নি মা,—ঝাঁপির ভিতরে কেমন করে যে ওটাও চলে' এসেছিল! আজ বৌমা গহনা বার করতে গিয়ে কানবালাটা টেনে বার করলেন, বললেন, 'চমৎকার জিনিস ত মা,—এটা আমি নিই?' —আমি বললাম, 'নমিকে বলে' রেখেছি ওটা ভেঙে দুটো ঝুমকো গড়িয়ে দেব ওকে, ওর অনেকদিনের সাধ! শুনে বৌমা বল্‌লেন, 'এমন ভালো জিনিসটা ভাঙবেন না মা,—আমি এটা নিই, ঠাকুরঝিকে নূতন করে' ঝুমকো গড়িয়ে দিলে সে ঢের ভালো হ'বে,—নেব মা আমি এটা?'—এমন ছেলেমানুষের মত কর্‌তে লাগ্‌লেন বৌমা, যে অবশেষে বল্‌লাম, "তোমাদেরই ত জিনিস মা, তোমরা নেবে তাতে এত জিজ্ঞেস করবার কি আছে?"

ভারী গলায় নমিতা বল্‌ল, "বেশ! আর আমি ওই কানবালা ভেঙে আমার জন্যে ঝুমকো গড়াবার কথা বলেছি আজ তিন মাস, আর তুমি এক কথায় বৌদিকে দাতব্য করলে ওটা!"

—আকাশে চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার রজনীর সোনার থালার মত চাঁদ। কিন্তু মাঝে মাঝে কালো মেঘে ঢাকা পড়ে' যায় আকাশের মাধুর্য,—মাঠের ওপাশের বাড়ির সেই বধূ বোধ হয় এখন আর পাঁচালী পড়ছে না,—যদি কান পেতে থাকি তাহ'লে হয়ত শুনতে পাব ওই বধূর 'নন্দদুলাল' সর্বাঙ্গে ফোড়ার যন্ত্রণায় ত্রাহি চীৎকার শুরু করেছে!—কেন জানিনে মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

আমার মনের নিছক কল্পনা কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু দু' তিন দিন পর্যন্ত বোধ হ'ল যেন মণ্টুদের বাড়ির আবহাওয়া কিছুটা ভারী হ'য়ে আছে। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে আর দিবারাত্র হাঁকডাক শুনিনে, কাব্যচর্চা শুনিনে, সান্ধ্যবায়ুসেবনে বেরোবার উদ্যোগ আয়োজনের সশব্দ সমারোহের আর আভাস পাইনে।—অবশ্য ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল, আবার কানে আসে, "এই বৌদি", "এই ঠাকুরঝি", "এই দাদা", "এই নমি,"—আবার সেই সকাল সন্ধ্যা হাই হিলসের জুতোর, কানপুরী চপ্পলের নৃত্যোদোদুল ছন্দ, আবার সেই খুশীর প্রাবল্য।

"পথের ঘর"এ দিন কয়েক হ'ল উৎপলারা এসেছে কলকাতা থেকে। উৎপলা মণ্টুর ছোটবেলাকার বন্ধু,—তার দাদার হ'য়েছে প্লুরিসি,—ডাক্তাররা বলেছেন এখন থেকে ভালো করে' যত্ন না নিলে ক্ষয়রোগে দাঁড়াতে পারে। ভয় পেয়ে গিয়েছেন উৎপলার মা বাবা এমনতর সম্ভাবনার আভাসে,—তাই তাড়াতাড়ি এসেছেন ঘাটশিলায় ছেলেকে নিয়ে হাওয়া বদল করতে। আর তা ছাড়া মণ্টুরা এখানে আছে সেটাও ওঁদের পক্ষে বিশেষ করে' ঘাটশিলায় আস্‌বার একটা কারণ,—এমনতর অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে বন্ধুপরিবারের সান্নিধ্য অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলে' উৎপলার বাবা রমেন্দ্রনাথ মনে করলেন।

উৎপলা রেবার সমবয়সী হ'বে, গত বছর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি, এবার আবার নূতন করে' প্রস্তুত হচ্ছে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য,—কিন্তু ভাইয়ের অসুখের জন্য শেষ অবধি পরীক্ষা দেওয়া হ'য়ে উঠ্‌বে কিনা সে সম্বন্ধে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।—

সুপ্রিয়, এমন করে' আমি এ কাহিনী বলে' যাচ্ছি যে এক একবার রেবা, মণ্টু, নমিতা, উৎপলার ব্যাপারে নিজেকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিধাতাপুরুষ বলে' মনে হচ্ছে,—তোমারও সেই রকম ধারণা হ'বে কিনা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু আমার কেবলই ভয় হচ্ছে যে এমনতর নিখুঁত করে' যদি এ কাহিনী বর্ণনা করি' তাহ'লে সত্য ঘটনাকে তুমি গল্প বলে' না ভুল

কর,—যদি নিমেষের তরেও তোমার মনে তেমন সন্দেহের উদয় হয় তাহ'লে দুঃখ পাব, কিন্তু নিজেকে এই বলে' সান্ত্বনা দেব যে সেই রূপহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন বিধাতাপুরুষনামধারী দুজ্ঞেয় শক্তি যদি আজ এক একান্ত সত্য কাহিনীকে মিথ্যার মত রমণীয়, অসত্যের ন্যায় ত্রুটিহীন ক'রে সৃষ্টি ক'রে থাকতে পারেন, তাহ'লে আমি না হয় তাঁর এই বিচিত্র পরিহাসের কথক হ'তে গিয়ে তোমাদের কাছে কিছুটা সন্দেহভাজন হলামই! কিন্তু পুনরায় বল্‌ছি সুপ্রিয়, প্রকৃতই ভালমন্দের জন্য দায়ী যদি কাউকে করতে হয় ত তাঁকে কোরো, আমাকে নয়।

আমি এমনি করে' ওদের সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি অবধি সংগ্রহ করি কেবলমাত্র দিবারাত্র সচেতন হ'য়ে থেকে। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে ওদের নিজেদের কত হাস্যপরিহাসের কথা ওরা নিজেরাই ভুলে যায়, কিন্তু সেসব টুকিটাকি জড় হ'য়ে ওঠে দিনের পর দিন আমার মনের বিচিত্র সংগ্রহশালায়। আজকাল এক একবার মনে হয় ওদের নিবিড় আনন্দের সারবস্তু গ্রহণ করে' আমি যেন ওদের পিছনে ফেলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলোকে উন্নীত হয়েছি,—মনে মনে আজকাল অনেক সময়েই অনুভব করি যে চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়াটা নিশ্চয়ই বেশী আনন্দের!—ওদের দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়, কেবলই মনে হয় এমন ছন্দানুগ পরিবার আর দেখিনি, এমনতর শেলীর কাব্যের পাতাছেঁড়া জীবনযাত্রা আর দেখব না, এবং তৎক্ষণাৎ অনুভব করতে থাকি যে জিতেছি আমি, ওরাই শেষ অবধি হেরেছে আমার কাছে!

উৎপলাকে পেয়ে এবাড়ির আনন্দ উল্লাস যেন আরও বহুগুণ বর্ধিত হল। মণ্টু, রেবা, নমিতা সব সময় যায় উৎপলাদের বাড়ি, উৎপলাও অবসর পেলেই এসে বসে মণ্টুদের এখানে,—বিশেষ করে ঘাটশিলায় আসবার পর থেকেই উৎপলার দাদার অসুখ ক্রমশ ভালোর দিকে মোড় নেওয়াতে এই দুই পরিবারের আর প্রকৃতই খুসীর অবধি রইল না।

আমার এক এক সময় এই ভেবে দুঃখ হয় যে, আমি যদি উৎপলাদের বাড়িতেও এদের আনন্দ উল্লাসের সন্ধান রাখতে পারতাম, যদি একই সময়ে বারান্দায় সমাসীন হবার আমার উপায় থাকত উৎপলাদের গৃহ এবং মণ্টুদের গৃহের অপর প্রান্তে!

উৎপলার উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মণ্টুদা, জামসেদপুর যাবে?'

গত রাত্রি থেকে রেবার একটু জ্বরের মত হয়েছে, মণ্টুর মা রেবার কাছে বসে ছিলেন, উৎপলার গলা শুনে ডাক দিয়ে বললেন, 'মণ্টু একটু বেরিয়েছে,—বুলি, তুই এদিকে আয়—'

উৎপলা এসে বস্‌ল রেবার কাছে, জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে বৌদির, মাসিমা?"

শাশুড়ীর পরিবর্তে রেবা নিজেই উত্তর দিল, 'বিশেষ কিছু নয়, একটু সর্দি জ্বরের মতন—'

মৃদু হেসে উৎপলা বলল, 'বেশ মেয়ে যাহ'ক! আমি বলে কাল জামসেদপুর আউটিংএর সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললাম, আর এমনি সময় তুমি জ্বর বাধিয়ে বসলে!'

শাশুড়ীকে সম্বোধন করে বলল রেবা "কাল বোধ হয় ঠিক হয়ে যাব, না মা?"

জোরের সঙ্গে বললেন, মণ্টুর মা, "না, না তা হবে না,—কাল সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা অবধি নদীর ধারে বসে জ্বর বাধিয়েছে, আর আমি তোমাকে এখুনি আবার জামসেদপুরে সমস্ত দিনের জন্য দিগ্বিজয় করতে পাঠাই আর কি!—ওসব এখন আর কিছুদিনের জন্য হচ্ছে না, শুধু সকালে-বিকেলে একটু একটু বেড়াবে, ভোরবেলা থেকে রাত দশটা অবধি যে যখন তখন বনে জঙ্গলে, রাস্তায় রাস্তায় কিংবা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াবে সে সব এবার শরীরটা খুব ভালো করে না সেরে ওঠা অবধি একদম বন্ধ—'

বলল উৎপলা, "হাঁ মাসিমা, সত্যিই একটু সাবধান হওয়া দরকার। কিন্তু "কানা গোরুর ভিন্ন মাঠ" বৌদি! চেঞ্জে এসে মানুষের শরীর ভালো হয়, আর তোমার হয়ে গেল ঠিক উলটো!"

একটু হেসে রেবা বলল, "যাহ'ক তবু চেঞ্জ হল ত, ভালোই হক আর মন্দই হক।"

"হাঁ তা ত হল, কিন্তু জামসেদপুর স্কীম যে মাঠে মারা যাবার যোগাড় হল তোমাকে ছাড়া—"

"তাতে দুঃখটা কি আমারই কম নাকি?"

"কম বেশী যাই হক না কেন, পণ্ড করলে ত আপাতত এখন একটা আউটিংএর সম্ভাবনা, শনিঠাকুরনশাই?"

রেবা হেসে উঠল, "এরও একটা আনন্দ আছে কিন্তু বুলি ঠাকুরঝি,—আমার আনন্দের কথা বলছি, তোমাদের নয়, নিজের এমনতর ইম্পর্ট্যান্স-এ—"

তরল কণ্ঠে হেসে বলল উৎপলা, "সাধে নাম দিলাম তোমাকে 'শনিঠাকুর?'

ক্রমশ
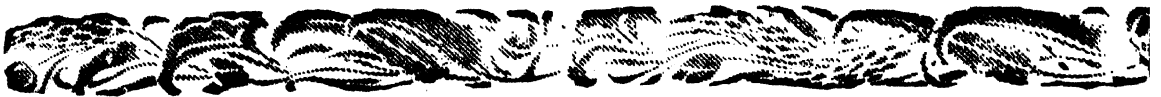
হিন্দুসমাজ সংস্কার ও কায়স্থ জাতি

ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল এম এস

বিশাল হিন্দু সমাজরূপ বনস্পতির কায়স্থ সমাজ একটি শাখা। শাখার সহিত মূলের সম্বন্ধ যেমন, অখণ্ড হিন্দু সমাজের সহিত কায়স্থ সমাজের সম্বন্ধও সেইরূপ। হিন্দু সমাজের যে যে কারণে অবনতি ঘটিয়াছে, কায়স্থ সমাজের অবনতির হেতুতেও সেই সেই কারণগুলি যে থাকিবে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

স্ত্রীজাতির উপর অবিচার ও অশ্রদ্ধা হিন্দু সমাজের সামাজিক গঠনের ভিতর গ্রথিত হইয়া আছে। তর্কের ঝোঁকে যতই আমরা অস্বীকার করি না কেন, তথাপি তাহা দিবালোকের ন্যায় এমনই সুস্পষ্ট যে, শত তর্কেও এ সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। বহু পূর্বে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "সাম্য" নামক পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই আলোচনাটি আমরা সকলকে একবার পড়িয়া দেখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। গভীর চিন্তাশীল মনীষীশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই আলোচনায় হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা ও তাহার ফলে সমাজের অবনতির বিষয় এমন যুক্তিসহকারে আলোচনা করিয়াছেন যে, তাহা তর্কের কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া ঢাকিয়া ফেলা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ব্যবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য সম্বন্ধে প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে, পিতামাতা পুত্রসন্তানকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন অথবা বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছেন, শিক্ষা কি কেবল অর্থ উপার্জনের জন্যই প্রয়োজন? যদি অর্থ উপার্জনের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেই পুরুষেই উপার্জন করিবে, নারীগণ চিরদিন পুরুষের পোষ্য হইয়া রহিবে, স্বামীর অভাবে পুত্রের, ভ্রাতার অথবা যে কোন নিকট বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের পোষ্য হইয়া রহিবে, সমাজের এরূপ বিধানের হেতু কি?

স্ত্রীজাতির আর্থিক পরাধীনতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, স্ত্রীজাতির নিজের অর্থ কিছুই থাকে না। কন্যা পিতৃধনের উত্তরাধিকারিণী কেন হয় না? স্বামীর ধনেও তাহার অধিকার অতি সামান্য, দান বিক্রয়ের অধিকার তাহার নাই। কেহ কেহ বলেন যে, বিষয় কার্যে অভিজ্ঞতা না থাকিলে বিষয় রক্ষা করা যায় না, সেইজন্যই স্ত্রীগণকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের কখনও হাতে সম্পত্তি আসিল না, সে কেমন করিয়া সম্পত্তি রক্ষায় পটু হইবে?

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও দেখাইয়াছেন, স্ত্রীজাতি অবলা, অনভিজ্ঞ—বৃহৎ কার্য পরিচালনে অক্ষম, এইসব যুক্তি যাঁহারা তুলেন, তাঁহারাই যে নারীগণের এই অজ্ঞতার জন্য দায়ী, একথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। বৃহৎ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাহাদের অন্তঃপুরে প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ধিত হইবে কোথা হইতে?

কি মনোবৃত্তি হইতে এই অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও বঙ্কিমবাবু আলোচনা করিয়াছেন—তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া কিছুই বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ঘটি, বাটী, তৈজস-পত্রের ন্যায়ই পুরুষ নারীদিগকে নিজ নিজ অধিকারভুক্ত সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, তবে এ সম্পত্তি সচল সম্পত্তি। পুরুষের সামাজিক ব্যবস্থায় কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, হিন্দু নারী যেন অন্য পুরুষে আসক্তা হইবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছেন, পুরুষগণ কোনরূপে তাঁহাদের গৃহ-প্রাচীরে আবদ্ধ রাখিয়া নিজের সম্পত্তি পরহস্তগত হইতে দিতেছেন না। পুরুষের এই মনোভাব ও এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থার আওতায় পড়িয়া হিন্দু নারীগণের মনের অবস্থা এরূপভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা ইহা অনায়াসে মানিয়া লইয়াছেন, এই ব্যবস্থার অসম্মান যে কোথায়, সে অনুভূতিও আর তাঁহাদের নাই।

অথচ এই নারীগণই জাতির জননী। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ইঁহাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ও শৈশবে ইঁহাদেরই ক্রোড়ে লালিত হয়। জননী যদি আশৈশব দাস মনোবৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তদনুযায়ী সামাজিক আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হন, তবে তাঁহার সন্তানও যে দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইবেই, ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

অবশ্য দেশের আবহাওয়া আজকাল কিছু কিছু পরিবর্তিত হইতেছে এবং পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই জাতি নূতন করিয়া বাঁচে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন কায়স্থ সভা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সময় এখন আর নাই। কায়স্থ সভাকে এখন সেই অতীত ধরিয়া থাকিলেই চলিবে না, যে যুগ আসিয়াছে, যে যুগ চলিতেছে, সেই যুগের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ গঠন করিতে হইবে।

জাতীয়তার নব উদ্বোধনই এই যুগের প্রধান বিশেষত্ব। কেবলমাত্র কায়স্থ সমাজ লইয়াই কার্যসূচী রচনা এযুগে ফলপ্রসূ হইবে না। নিখিল হিন্দু সমাজের সহিত কায়স্থ সমাজের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এখন সাম্প্রদায়িক নীতির ফলস্বরূপ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে—ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে বলীয়ান ও সজীব করিয়া তোলা ভিন্ন সেই সঙ্ঘর্ষ হইতে সমাজরক্ষা অন্য উপায়ে হইতে পারে না।

হিন্দু সমাজকে বলীয়ান করিয়া তুলিবার কি কি উপায় আছে তাহাই চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে।* হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল জাতির ভিতরই এই অনুভূতি জাগ্রত করা প্রয়োজন যে, তাহারা প্রত্যেকেই হিন্দু সমাজ মহীরূহের শাখা মান, বিচ্ছিন্ন ভাবে তাহারা বাঁচিতে পারে না। সুতরাং মূলস্বরূপ যে মহান্ সমাজজীবন রস দিয়া তাহাদের পোষণ করিতেছে,—তাহার যত কিছু দোষ ত্রুটী যাহাতে দূর হয়, সেই চেষ্টার সঙ্গে নিজ নিজ শ্রেণী ও শাখারও ত্রুটিবিচ্যুতি দূর

*শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' দ্রষ্টব্য।

করিতে হইবে। এক শরীরের বিভিন্ন অংশের যেমন পরস্পর সহযোগিতায় শরীর সঞ্জীবিত থাকে,—ধমনী, শিরা ও উপশিরা প্রভৃতি পরস্পরের সাহায্যে প্রত্যেকেই যেমন সবলতা ও কর্মশক্তি লাভ করিতেছে, সেইরূপ কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ শ্রেণী এবং যাহারা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া কথিত হয় তাহাদেরও পরস্পরের সহিত যে একটি নিবিড় যোগ আছে, ইহাও আজ আমাদের অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতে হইবে।

অসবর্ণ বিবাহ এই সংযোগের একটি সূত্র। অবশ্য আমরা একথা বলিতেছি না যে, কায়স্থ সমাজ নিজ বিশেষত্ব বিসর্জন দিক, তবে বিশেষত্ব রাখিয়া অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত রাখা অসম্ভব নয়।

"কায়স্থ সভার" উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রস্তাব আছে যে, কায়স্থ সভা পণপ্রথা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে। শুধু উপবীত গ্রহণের প্রচার লইয়া ব্যস্ত থাকিলে পণপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করা হয় না। পণপ্রথা নিবারণের যথার্থভাবে চেষ্টা করিতে হইলে প্রথমত গরীব কায়স্থ যুবকগণের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা আন্তরিকভাবে করিতে হয়। দ্বিতীয়ত গরীব মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষালাভের সাহায্য করিবার চেষ্টাও করিতে হয়। হিন্দুজাতির অন্যান্য শ্রেণীর সমিতি যেমন তিলি সমাজের সমিতি, সদ্‌গোপ শ্রেণীর সমিতি প্রভৃতি প্রধানত এই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যে চাঁদা সংগ্রহ করেন, তাহা উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার সাহায্য কার্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। যাঁহারা এইরূপেভাবে পড়াশুনা করিয়া জীবনসংগ্রামে সফলতা লাভ করেন, এমন অনেক ছাত্র এই ঋণের কথা মনে করিয়া পরে তাঁহাদের শ্রেণীর সমিতিকে সাহায্য করেন। এইসব ছাত্রের আত্মীয়কুটুম্বগণের এইরূপ একটি কার্যকরী সমিতির প্রতি সহানুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কায়স্থ সভার কর্তৃপক্ষগণের এই দিক দিয়া কোনই উদ্যোগ বা কর্মচেষ্টা দেখা যায় না। তৃতীয়ত অর্থনীতির দিক দিয়া নারীগণের সহায়তা লাভ আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এখনকার দিনে নারী পুরুষের ভারস্বরূপ না হইয়া যেন সর্ববিষয়ে সহকর্মিণী এবং সহায়তাকারিনী হন, ইহাও প্রার্থনীয়। ইহাতে দরিদ্র কায়স্থগণের মধ্যে পণপ্রথার প্রাবল্য হ্রাস হইবে।

অসবর্ণ বিবাহ অনেক স্থলেই পণপ্রথার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ হইতেছে। আমাদের মনে হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়াই উচিত। কায়স্থ সমাজের মনোবৃত্তি অনেকটা এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ঢাকা জেলায় বহু পূর্বেও বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। সাহা বৈশ্য সমাজের সহিত বৈদ্য ও কায়স্থের বিবাহ আদান প্রদান পূর্ববঙ্গে হইত। আমরা ইহাও জানি অনেক অর্থবান তিলি বা অন্য নবশাখ কায়স্থ পরিচয়ে কায়স্থ সমাজে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। আমাদের পরিচিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারে বিবাহ হইয়াছে। উভয় পরিবারই সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং ব্রাহ্মণী শশ্রূমাতা সাদরে কায়স্থকুমারীকে বধূরূপে বরণ করিয়া গৃহে লইয়াছেন।

কায়স্থ সমাজের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন একান্ত আবশ্যক। বিধবা বিবাহের প্রচলনের অভাবে হিন্দু সমাজ কেবল ক্ষয়গ্রস্ত হইতেছে না, তাহার মধ্যে নানা দুর্নীতিও প্রবেশ করিতেছে। সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে আজকাল কিছু কিছু চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা আশানুরূপ নহে। বিশেষত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। কায়স্থ সমাজ যদি এ বিষয়ে অগ্রণী হয়, তবে হিন্দু সমাজের অন্যান্য অংশে সেই দৃষ্টান্তে বিধবা বিবাহ অধিকতর প্রচলিত হইতে পারে।

নারীর প্রতি অশ্রদ্ধার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বলপূর্বক নিগৃহীতা ও ধর্ষিতা নারী যে হিন্দু সমাজে স্থান পায় না, তাহার কারণ নারীর প্রতি এই অশ্রদ্ধা। অথচ হিন্দু স্মৃতিকারেরা বলপূর্বক ধর্ষিতা ও নিগৃহীতা নারীকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য খুবই উদার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কায়স্থ সমাজ এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। বিধবা বিবাহ ও নিগৃহীতা নারীকে সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে কায়স্থ সভায় কয়েক বৎসর পূর্বে যদিও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত হয় নাই।

উপসংহারে কায়স্থ সভার প্রবীণ নেতাদের প্রতি নিবেদন, কায়স্থ সভা যে আজ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ সমাজের তরুণদের সহযোগিতার অভাব। তারুণ্যই সমাজের সঞ্জীবনী শক্তি। কায়স্থ সভা তাঁহাদের প্রচেষ্টায় তরুণদের সহকর্মী করিয়া লউন এবং তাহাদের মতামতের সহিত নিজেদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া নূতন ভাবে কার্যের পথে অগ্রসর হউন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

(২৮২ পৃষ্ঠার পর)

সকলেই প্রস্তুত দেখিলাম। বীরেনের ওখানে তখনও বাস আসে নাই। রামদাসের আগ্রহাতিশয্যে পদব্রজেই স্টেশনাভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তায় ক্ষিতীশবাবুর নিকট বিদায় লইলাম। হয়ত কলিকাতায় দেখা হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি যেদিন টাঙ্গাইল রওনা হইলাম তিনি সেইদিন সন্ধ্যায়ই কলিকাতায় আসেন এবং পরদিন বাসায় আসার সংবাদ পত্রযোগে অবগত হই। স্টেসনে সেদিন ভয়ানক ভীড়। কোন প্রকারে গাড়িতে উঠিয়া বেলা ৮৷৷টার সময় আবার কোলাহলময় জনাকীর্ণ কলিকাতায় ফিরিলাম।

কবির জন্মদিনের স্মৃতি মুছিবার নয়, অন্তত আমার কাছে কৃপণের ধনের মত ইহা চিরসঞ্চিত থাকিবে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পীড়িতা ভগ্নীর চিকিৎসার দরুণ ২৪শে চৈত্র কলিকাতায় পৌঁছি। চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য ডাক্তার ও লেবোরেটরীর পশ্চাতে দৌড়াইয়া কয়েকদিন খুবই ব্যস্ত রহিলাম, মানসিক উদ্বেগও কম চলিল না।

দশজনের মতই দেশের ও বিশ্বের খবরের জন্য সংবাদপত্র দেখিতে লাগিলাম, বিশেষত বর্তমান মহাযুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক সংবাদের জন্য সর্বদাই উদগ্রীব থাকিতাম। মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ কে কোথায় কি করিল, কোন দুর্বল জাতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, সমুদ্রগামী যাত্রীজাহাজ কে টর্পেডোযোগে ডুবাইয়া নিরীহ যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করিল বা অযথা নাশ করিল, কোথায় বোমা ফেলিয়া নিরীহ গ্রাম ও শহরবাসীর ধন প্রাণ, বাড়িঘর বিনষ্ট করিল—যুদ্ধের এই নিরঙ্কুশ দানবতার দিকটাই সর্বাগ্রে চোখে পড়িত।

তখন ঢাকায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলিতেছে। গুণ্ডাদের নির্মম আক্রমণে কোন্ নির্দোষ প্রাণ বলি পড়িল, কার বাড়িঘর বিনাদোষে ভস্মীভূত হইল—সে অনেক কথা। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ, বোম্বাইয়ে সপ্রু কনফারেন্স, আমেরী সাহেবের অর্থ-হীন বিবৃতি, জিন্না সাহেবের পাকিস্তানের হুমকী, বাঙলার মন্ত্রিগণের দাঙ্গা নিবরণে অক্ষমতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহারই সহিত দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের সংবাদও দেখিতাম। হঠাৎ চোখে পড়িল বিশ্ববরেণ্য, পরমভক্তিভাজন কবিসম্রাট রবীন্দ্র-নাথের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। রোজ বিকেলের দিকে তাপ উঠিতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এই সংবাদ রেডিওতেও প্রচারিত হইল। তখন প্রিয় কবির জন্য মন উচাটন হইল। কবির জন্মতারিখ ২৫শে বৈশাখ। জানিতে পারিলাম কবির স্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া, ১লা বৈশাখেই অশীতিতম বর্ষপূর্ণ হওয়ার ও একাশীতিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। কবিকে দেখিবার ও উৎসবে যোগদানের জন্য প্রাণে একটা ব্যাকুলতা বোধ করিলাম। ভগ্নীর ব্যাধির অবস্থা স্মরণে ও নিজদেহের বর্তমান অপটুতা অনুভব করিয়া অনেক বিষয়ই যেমন হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়, ইহার গতিও তাহাই হইবে মনে করিলাম। জগতে কতই করিব, কতই দেখিব সদাই আকাঙ্ক্ষা হয়—তার কয়টা কার্যত ঘটিয়া উঠে?

যখন এই চিন্তা মন হইতে একরূপ বিলুপ্ত—এমন সময়ে ২৯শে চৈত্র প্রাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃসম শ্রীমান বীরেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন—'আমি আজ এ বেলায়ই শান্তি-নিকেতন যাইতেছি। রামদাস বাবু (রামদাস উকিল) কাল বিকেলে যাইবেন ও আমার ওখানেই থাকিবেন—আসুন না তার সঙ্গে।' আমি বলিলাম, 'যাওয়ার ত ষোলআনা লোভই কিন্তু বাড়িতে অসুখ ও নিজের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষত অসহ্য গরমের জন্য যাওয়া ঘটিবার কোন উপায় দেখি না। এখানেই যে গরম, ওখানে যা হইবে তা ত বুঝিতেই পারেন।'

কিন্তু সময় যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, কবিকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরদিন বেলা ৩টার সময় রামদাসের সঙ্গে যাওয়া হইল না। অপরাহ্ণ যখন ৫টা বাজিয়াছে এবং দক্ষিণা হাওয়ায় একটু ঠান্ডা পড়িতেছে, মনটা নূতন করিয়া কবির জন্য উৎকণ্ঠিত হইল—কে জানে আর দেখা হইবে কিনা। কবি দীর্ঘজীবন লাভ করুন, কিন্তু নিজে দিন দিন যেরূপ ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে আমারই হয়তো সুযোগ

১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে জয়ন্তী-উৎসব : কবিগুরু বামপার্শ্বে উপবিষ্ট

মিলিবে না! তাড়াতাড়ি একটি এটাশি কেসে একখানা ধুতি, গামছা, দাঁত মাজার সামগ্রী প্রভৃতি দুচারটি জিনিস ও হাতে একটি ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

রাত্রি প্রায় ১০॥টার সময় বোলপুর ষ্টেশনে নামিলাম। প্ল্যাটফরমেই দেখা হইল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ও আরও ২।৪টি শান্তিনিকেতনগামী ভদ্রলোকের সহিত। আশ্রমের বাস উপস্থিত ছিল। রামানন্দ বাবু বীরেনের ওখানে যাইবেন, প্রিয়বাবু অতিথিশালায় যাইবেন সুতরাং আমাদের পেঁৗছাইয়া উঁহারা যাইবেন। সকলে বাসে চাপিলাম। বীরেনের ওখানে নামিয়া দেখি, রামানন্দবাবুর দুই কন্যা সীতা দেবী ও শান্তা দেবী, জামাতাদ্বয় কালিদাস নাগ মহাশয় ও ও সুধীরবাবু ছেলেমেয়েদের রেজিমেণ্ট লইয়া তথায় আছেন। বীরেন ও রামদাসকে দেখিতে পাইলাম না, তাহারা হয়ত গরম এড়াইবার জন্য ছাদে ছিলেন। ভীড় দেখিয়া আমি অন্যত্র যাওয়া স্থির করিলাম। পূর্ববারে ক্ষিতীমোহনবাবুর ওখানে না ওঠায় তিনি বহু অনুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু এত রাত্রে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করা সমীচীন মনে করিলাম না। নিকটেই 'জগদানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যার বাটীতে গেলাম, উঁহারা আমার

আত্মীয়াও বটেন এবং বহুবার ওদের ওখানে ওঠার তাগিদ দিয়াছেন। সেখানে যাইয়া দেখি, সামনের চাতালে বহু লোক শুইয়া আছে বা শুইবার উদ্যোগ করিতেছে। একটু ভয় পাইলাম, কিন্তু জগদানন্দবাবুর নাতিরা ওখানে ছিল, তাহারা ভিতরে লইয়া গেল। সেখানে তাহাদের মাতা ও বোন মমতা ছিলেন—এইমাত্র বর্ষশেষ উৎসব সমাধা করিয়া উহারা গৃহে ফিরিয়াছেন। আমাকে পাইয়া তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু গৃহিণীকে লইয়া যাই নাই সেজন্য অনেক অনুযোগ করিলেন।

তারপরে খাওয়া-দাওয়ার তাগিদ। আমি সাধারণতই রাত্রে স্বল্পাহারী—আবার রাস্তায়ই সে কার্য শেষ করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু কে শুনে কার কথা, কিছু জলযোগ করিতেই হইল। ঘরে গরম বিধায় উঠানে শোবার ব্যবস্থা হইল। সেখানে একখানা চৌকী ছিলই, বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িলাম। জ্যোৎস্না ধবধব করিতেছিল, বেশ একটু হাওয়া দিতেছিল, আকাশে কয়েক টুকরা মেঘও দেখা যাইতেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি তালগাছে হাওয়া লাগিয়া একটা আরামদায়ক শব্দ হইতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, বৈদ্যুতিক আলো আর জ্বলিতেছিল না—বেশ একটি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলাম।

একটু বাদেই বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ পড়িতে লাগিল, উহা উপেক্ষা করিয়া ঐখানেই রহিলাম। বাড়ির সবাই তখন উঠিয়া পড়িয়াছে, ঘরে যাইবার জন্য তাহারা তাড়াহুড়া লাগাইল—বিছানাখানা গুটাইতে হইল এবং সম্মুখস্থ খোলা বারান্দায় উহা বিস্তৃত করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ওদিকে বহুদিন বৃষ্টি হয় নাই, কূপ ও ইন্দারার জল পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে, গাছপালা মলিন ও পত্রবিরল। বৃষ্টির আগমনে সকলেই উল্লসিত ও আশান্বিত হইলেন। বৃষ্টি ২।৩ ফোঁটা পড়িয়াই বন্ধ হইল। ভরসা করিয়া পুনরায় বাহিরে যাওয়া হইল না, দণ্ডস্বরূপ মশক দংশনের প্রিয় অনুভূতি সহ্য করিতে হইল, কিন্তু নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

পরদিন খুব ভোরেই উঠিলাম। ক্ষিতিমোহনবাবুর বাটী গেলাম। আমাকে দেখিয়া ত অবাক্, কখন আসিলেন, কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কতদিন থাকিবেন,—নানারূপ প্রশ্নবাণে সমাচ্ছন্ন। উত্তরে বলিলাম, রাত্রে আসিয়াই জানিলাম যে, আপনাদের বাটীতে স্থান নাই, কাজেই মমতাদের ওখানেই উঠিলাম, অজের দিন ত আছি—। এমন সময় সকলকে সমবেত হইবার জন্য আশ্রম হইতে ঘণ্টাধ্বনি চলিল। প্রাতে নববর্ষের প্রার্থনাদি হইবে এবং উহার পৌরোহিত্য করিতে হইবে ক্ষিতীশবাবুকেই, সুতরাং বিলম্ব চলে না, কিন্তু চা না খাইলেও অব্যাহতি নাই। মেয়ে ও নাতনীদের ডাকিয়া দিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, আমিও চা-পর্ব শেষ করিয়া—অবশ্য বিনা চিনিতে—একবার বাসা হইয়া আশ্রমাভিমুখে ছুটিলাম।

মৃদু প্রভাত সমীরণ বহিতেছিল—পূব দিকে সূর্য তখনও সোনার বরণ লইয়া দেখা দেন নাই। পাখীদের মধুর কাকলী বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, একটা পাপিয়ার 'চোখ গেল' রব সব ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। উৎসব কেন্দ্রে চারিদিক হইতে লোক ছুটিতেছে। গুরুপল্লী হইতে আশ্রমের দিকে যাইতে একটি বড় মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়। সোজা উত্তরে ছাত্রীদের বোর্ডিং—অধিকাংশ ছাত্রীই বাসন্তী রঙের শাড়ী পড়িয়াছিল, ছেলেদের অধিকাংশের গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয় ছিল। অন্যান্যে নানা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যাইতেছিল: বেশভূষা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর, কিন্তু উহার মধ্যেই সূক্ষ্ম কলা জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। প্রাতঃ সম্মেলনের স্থান হইয়াছিল কাঁচের ঘরে। প্রসিদ্ধ আম্রকুঞ্জের নিকট দিয়া ওখানে পৌঁছিতে হয়। আম্রকুঞ্জের বাঁধান বেদীর ধারে আশ্রমের বালকবালিকারা নানা কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে। কেহ আলিপনা দিতেছে, সবুজ ও কচি দেবদারু পাতা দ্বারা কেহ বেদী সাজাইতেছে; বারিপূর্ণ কুম্ভোপরি কেহ আম্রপল্লব স্থাপন করিতেছে। নয়ন সম্মুখে ঋষিদের আশ্রমের চিত্র ভাসিয়া উঠিল। কি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া।

কাঁচঘরের সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখি, গৃহ ও চতুর্দিকের চাতাল একেবারে নরনারীতে পরিপূর্ণ। পশ্চিম দিকে ও নিকটস্থ উত্তরে-দক্ষিণে মেয়েদের সমাবেশ, পূর্বে ও নিকটস্থ উত্তরে-দক্ষিণে পুরুষের সমাবেশ। দক্ষিণ দিকের এই দুই দলের মাঝে কালিদাস নাগ মহাশয়কে দেখিয়া সেইখানেই উপবেশন করিলাম। সকলেই কিন্তু বাহিরে পাদুকা রাখিয়া আসিলেন। প্রাথমিক সংগীতের রেশ তখন মিলাইয়া যাইতেছিল। ক্ষিতীবাবু তাঁহার চিরমধুর কণ্ঠে ও মোহিনী ভাষায় বৎসরের সূচনাকে অভিনন্দিত করিয়া বর্তমান শোচনীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার কি কর্তব্য, তাহার ইঙ্গিত করিলেন। যাহাতে এই নবীন বর্ষ আমাদের নিকট শুভ হয়, তাহার জন্য ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। বালকবালিকাদের সম্মিলিত মধুর গান সকলকে আনন্দ দিতেছিল। ধূপদানীতে ধূপের কাঠি পুড়িতেছিল, উহার স্নিগ্ধ গন্ধে স্থানটিকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছিল।

উপাসনা শেষ হইলে সকলে উঠিয়া পড়িলাম। জানিলাম আম্রকুঞ্জে জলযোগের ব্যবস্থা আছে ও একবার যাইতে হইবে। হঠাৎ বন্ধুবর নরেন দেবের সহিত দেখা হইল, শ্রীযুত রামানন্দবাবুও ঐ সময় সেখানে আসিলেন। জানিলাম বন্ধুপত্নী শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী অসুস্থা অবস্থায় অতিথিশালায় আছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য নরেনবাবু সহ রামানন্দবাবু ও আমি গেলাম। হাঁপানীর আক্রমণ হইয়াছিল, এ তাঁহার নূতন নয়। কবিকে দেখিবার জন্য উঁহারা দিন কয়েক আগে আসিয়াছেন—এখন প্রায় সারিয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গে কন্যা নবনীতাও আছে। ওখান হইতে আম্রকুঞ্জে গেলাম। ছেলেমেয়েদের একান্ত আগ্রহে কিছু ফল গ্রহণ করিলাম। রাত্রের আহারাদির সর্বভার তাঁহার উপরে। প্রায় হাজার লোকের আয়োজন। তাঁহার সঙ্গে রান্নার ব্যবস্থা দেখিতে গেলাম, উক্ত স্থান একেবারে উত্তরায়ণের গায়। ভাবিয়াছিলাম এবার কবির সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিব না, কিন্তু লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আস্তে আস্তে উত্তরায়ণে প্রবেশ করিলাম। এখানে বহু লোকের ভীড় দেখিলাম। কে একজন, বোধ হয় শ্রীমান বীরেনই বলিল, গুরুদেব নীচেই দক্ষিণের বারান্দায় আছেন, ইচ্ছা করিলে দেখা করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে?—হায়রে, সমস্ত অন্তর যাঁহার জন্য পিপাসিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নাকি আবার ইচ্ছা সাপেক্ষ—আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলাম, অন্তর উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল। ধীর পদক্ষেপে কবির নিকট উপনীত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছেন'? ছোট্ট একটি 'ভাল আছি' বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম এবং বলিলাম, আপনার শরীরের এই অবস্থায় আজ বিরক্ত করিতে আসি নাই, আসিয়াছি শুধু সহজ সশ্রদ্ধ অকপট ভক্তি নিবেদন করিতে, এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। তখন বোধ হয় বেলা ১১টা হইবে, বেশ একটু গরম অনুভব করিতে লাগিলাম;

সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া গৃহে অর্থাৎ জগনানন্দবাবুর বাড়িতে ফিরিলাম।

অপরাহ্ণ ৬টার পূর্বেই রামদাস আসিয়া দেখা দিল। কিছুক্ষণ বাদে উভয়ে বীরেনের বাড়ি গেলাম। রামানন্দবাবুরা ততক্ষণ রওনা হইয়া গিয়াছেন। সেখানে অন্যান্য সকলের সহিত দেখা করিয়া বীরেনদের সহ আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলাম।

চারিদিক হইতে আবার লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। আজ এই বিশেষ দিনে সকলেই কবির দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং জগদীশ্বরের নিকট সকলেরই আন্তরিক প্রার্থনা যে, কবিগুরু আরও অনেক দিন আমাদের মধ্যে থাকিয়া তাঁর নব নব উন্মেষ-শালিনী প্রতিভা ও সৃষ্টি দ্বারা আমাদের আনন্দ বর্ধন করুন।

উত্তরায়ণের পূর্বদিকের মাঠে সামিয়ানা খাটাইয়া ও পত্রে-পুষ্পে সজ্জিত করিয়া উৎসবের স্থান করা হইয়াছে। উত্তরায়ণের প্রশস্ত পূর্ব হাতার মধ্যদেশে একটি আলিপনা দিয়া সম্মুখের দুপাশে জলপূর্ণ কলসীর উপর নারিকেল ও মাল্য দিয়া কবিবরের বসিবার স্থানটিকে সুরুচিসম্পন্নভাবে সাজান হইয়াছে। সামিয়ানার নীচে সতরঞ্চি ও চাদর পাতিয়া দক্ষিণ দিকে পুরুষের স্থান ও উত্তর দিকে মেয়েদের জায়গা করা হইয়াছে। মধ্য দিয়া কবির দিকে যাইবার জন্য লাল শালু আচ্ছাদিত রাস্তা।

এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নরনারীতে পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু খুবই আশ্চর্য যে, কোলাহল মাত্র নাই। কবির দর্শণ আশায় ও তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। একটি 'রবার টায়ারড্ ইনভ্যালিড চেয়ার' ভিতরে যাইতে দেখিলাম—বুঝিলাম যে রোগক্লান্ত কবিকে আনার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু কবির মন জরাগ্রস্ত হয় নাই—তিনি হাঁটিয়াই আসিলেন অবশ্য দুই-জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। সম্মুখে নত হইয়া চলিতেছিলেন সত্য, কিন্তু তেজোদীপ্ত মুখশ্রী। তিনি আসামাত্র সমস্ত জনতা সম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আসন গ্রহণ করিলে সকলে উপবেশন করিল। কবির নিকট ক্ষিতীমোহনবাবু, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আশ্রমের আরও জনকয়েক রহিলেন।

তখন শঙ্খধ্বনি ও মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিতে লাগিল। আশ্রমের বালকবালিকাগণ সার বাঁধিয়া গান গাহিয়া গাহিয়া দক্ষিণ দিক হইতে পূর্ব দিক ঘুরিয়া ফটকের সেই লাল শালুমণ্ডিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে এক বিচিত্র ও অভিনব দৃশ্য। কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও হাতে দীপ, কাহারও হাতে গন্ধ, কাহারও হাতে মাল্য, কাহারও হাতে ধূপ এবং থালায় বা ট্রেতে রাশি রাশি ফুল, ফল ও বিবিধ আহার্য উপকরণ লইয়া গুরুদেবের সমীপে উপনীত হইয়া গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতির অর্ঘ্যদান সনাতন প্রথায় অনুষ্ঠিত হইল। বিদ্যার্থীরা কারুকার্যময় সুচারু বাঁধান কয়েক-খানি খাতা গুরুদেবকে উপহার দিয়াছিল।

আমার মন তখন এক সুদূরে অতীতে চলিয়া গেল। এমনি করিয়াই ঋষিদের আশ্রমে ও রাজগৃহে রাজচক্রবর্তীদের ও বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনা হইত।

ইহার পর ক্ষিতীমোহনবাবু সমস্ত আশ্রমবাসী ও অতিথি-গণের পক্ষ হইতে এই শুভ জন্মদিনে কবিগুরুর আরোগ্য কামনা করিলেন এবং তিনি যাহাতে শতায়ু হইয়া তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা তাঁহার অফুরন্ত হাসি, গান, রহস্য, উপদেশ ও সাহিত্যে নব নব সৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে আনন্দ দিতে পারেন সেজন্য জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বের সর্বত্র হইতে তাঁহার দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনা আসিতেছে। সমস্ত বিশ্বের প্রয়োজন হইতে তাঁহাকে আশ্রমের প্রয়োজন অনেক বেশী, তাঁহাকে বাদ দিয়া আশ্রমের কথা চিন্তা করাই যায় না, তাঁহাকে না হইলে ত' চলে না।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—'আমার বাণী ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এমত অবস্থায় আপনাদিগকে বেশী কিছু বলিতে পারিব না। আপনারা যে আজ আমাকে অভিনন্দন জানাইতেছেন, সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। আপনাদের ভালবাসা পাইয়া আজ আমি ধন্য। আজ জীবনের শেষ সময়ে আশ্রমবাসীদের ও সকলকেই সরল প্রাণে তাহাদের মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ করিতেছি।"

তাঁহার যে উদাত্ত মধুর কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য ও বলিবার বিশেষ ভঙ্গী দেখিবার জন্য একদিন অসাধারণ ভীড় ঠেকাইয়া রাখা যাইত না, আজ তাহা নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। দেহের এই অনতিক্রম্য পরিণাম দেখিয়া কত কথাই মনে হইল, কিন্তু এই জীর্ণ দেহের অভ্যন্তরে যে কথা মজুদ ও সবল দৃপ্ত মনটি রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া বিস্ময়ের অন্ত রহিল না ও মানুষের আত্মার অমরত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

এর পর ক্ষিতীমোহনবাবু কবির লিখিত 'সভ্যতার সংকট' নামক নববর্ষের বিশেষ বাণী পাঠ করিলেন। আপনারা ও বিশ্বের সকলেই সেই বার্তা পাঠ করিয়াছেন। কি সবলদৃপ্ত ভাষা, কি নির্ভিক সত্য সমালোচনা। এই বাণী শুনিতে শুনিতে স্বদেশীর দিনের রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়িল, যখন আবেদন নিবেদনের বিরুদ্ধে নির্ভিক হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ; বর্তমান দানবীয় রীতির হিংস্র পশুবলের বিরুদ্ধে যখন তিনি বলিতেছিলেন—ভারত-বাসীর সহিত ইংরেজের যে অশোভন ব্যবহার গণতন্ত্রের মুখোস পরিয়া সাম্রাজ্যবাদের যে ভীষণ ষ্টীম রোলার তাহারা আমাদের উপর চালাইতেছে—তখন আমাদের মনের মধ্যে সত্যই একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। এমন খোলাখুলিভাবে, এমন দৃঢ়তার সহিত এসব কথা ইতিপূর্বে তাঁহার নিকট আর শুনি নাই। বাণী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। কবির প্রতি সম্ভ্রম সহস্র গুণে বাড়িল। অন্তরের অন্তরে তাঁহাকে বারবার প্রণতি জানাইলাম এবং শ্রীভগবানকে বলিলাম, বিশ্বের এই শান্তি-কামী পুরুষসিংহকে আরও অনেক দিন দয়া করিয়া আমাদের মধ্যে রাখিয়া দাও।

তার পর গান হইতে লাগিল এবং নৃত্যের উদ্যোগ চলিল। সমস্ত অর্থসম্ভার স্থানান্তরিত করা হইল। কবিকে মধ্যদেশ হইতে একপাশে আরাম কেদারায় বসান হইল। শান্তিনিকেতনের নাচ-গানের বিশেষ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বাঙলার সংস্কৃতিতে ইহার বিশেষ দান আছে। অনেকগুলি গান ও নাচ হইল—তার মধ্যে জাভা নাচটি ওখানে নূতন বলিয়া মনে হইল। শেষ পর্যন্ত থাকিয়া কবি এসব উপভোগ করিলেন। উহা হইতেই বুঝা যায় এই সবের প্রতি তাঁর কত প্রীতি। নিজ হাতে এ সব গড়িয়া তুলিয়াছেন।

মণ্ডপের পূর্বদিকের মাঠেই আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সকলে সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং মহানন্দে খাওয়াদাওয়া চলিতে লাগিল। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য আমি উহাতে বঞ্চিত হইলাম। অল্প পরেই এই আনন্দমুখর স্থান হইতে বাসার দিকে ফিরিলাম।

বাহিরের চৌকীতে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু সম্মুখস্থ চাতালে বেশী হাওয়া লাগিবে বলিয়া বিছানা লইয়া তথায় যাইতে নির্দেশ পাইলাম। সত্যই ওখানকার অবারিত হাওয়ায় দেহ জুড়াইয়া গেল।

রামদাস আসিয়া বলিয়া গেল, গাড়ির ঠিক সময়ে ডাকিয়া লইয়া যাইবে। আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ৩।টা না বাজিতেই রামদাস হাজির। ছেলেদের নিকট বিদায় লইয়া বীরেনের বাড়ি গেলাম। তখনও বাস আসার বিলম্ব, কিন্তু রামানন্দবাবু ভিন্ন আর

(শেষাংশ ২৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২০

যথাসময়ে প্রশান্ত এবং লাবণ্যর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সুলেখা একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহার পর প্রশান্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "দিদিকে সব কথা বললেন জামাইবাবু?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, বলেছি।"

"আমাকে বলবেন কিছু?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া লইয়া প্রশান্ত বলিল, "তোমাকে?—তোমাকে শুধু এই কথা বলতে চাই যে, তোমার প্রতি তোমার দিদির যা অনুযোগ, সেটা একেবারে অসার নয়।"

শান্তকণ্ঠে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্রতি দিদির কি অনুযোগ?"

প্রশান্ত বলিল, "তোমার দিদির অনুযোগ, কাল রাত্রেই গৌরহরির কথা আমাদের না-হয় নাই জানিয়েছিলে, কিন্তু আজ সকালে উঠেই জানানো উচিত ছিল।"

সুলেখা বলিল, "ঠিক এই অনুযোগ ত' আমারও আপনাদের বিরুদ্ধে থাকতে পারে জামাইবাবু?"

সুলেখার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "আমাদের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ থাকতে পারে?"

সুলেখা বলিল, "আজ ভোরে দোতলার বারন্দায় আপনি যখন গৌরহরিবাবুর রুমাল কুড়িয়ে পেলেন তখন না-হয় আমার ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে সেকথা না-ই জানিয়েছিলেন, কিন্তু আমার ঘুম ভাঙার পরই আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ আমাকে তা জানান নি কেন?"

প্রশান্তর মুখে আর্ততার একটা ক্ষীণ ছায়া দেখা দিল; লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "শুনছ লাবণ্য, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!" তাহার পরে সুলেখাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুধু তোমার কথা ভেবেই জানাই নি সুলেখা। ঘটনার সঙ্গে তোমার কোন যোগ না থাকলে অকারণ তোমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে, এই কথা ভেবেই তোমাকে আগে জানাই নি।"

যুক্তকরে সুলেখা বলিল, "আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন জামাইবাবু, ঠিক সেই রকম কারণে আমিও হয়ত আপনাদের জানাই নি। ব্যাপারটা হয়ত' আমার এমন গুরুতর ব'লে মনে হয় নি, যার জন্যে অনর্থক একটা গোলযোগের সৃষ্টি ক'রে আপনাদের বিব্রত করা উচিত হ'ত। গৌরহরিবাবু অবিবেচনার কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যায় আচরণ করেন নি।"

প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু অবিবেচনার কাজও অন্যায় আচরণ সুলেখা। সাধারণ বিবেচনার সাহায্যে সকলেরই যে কাজ সহজে করবার কথা, তার বিপরীত কিছু করলে নিশ্চয় তা অন্যায় আচরণ হয়।"

সুলেখা বলিল, "গৌরহরিবাবুর প্রতি আপনার দণ্ডবিধান থেকে এখন তা বুঝতে পারছি।"

সুলেখার উত্তর শুনিয়া প্রশান্তর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই কি সেই শান্ত ভদ্র লজ্জাশীলা সুলেখা, যাহার মুখ দিয়া সহজে কথা পর্যন্ত বাহির হইত না! তবে কি এই ব্যাপারের মধ্যে সত্য সত্যই একটা কলুষের সংশ্রব আছে যাহার উগ্রতা তাহাকে এইরূপ উদ্ধত এবং মুখর করিয়া তুলিয়াছে! শীলতার লাঘব ঘটিলে স্ত্রীলোক প্রগল্‌ভা হয়, এ কথা প্রশান্ত ভাল করিয়াই জানিত। সমস্ত ব্যাপারটা দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল।

এবার কথা কহিল লাবণ্য। ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে সে বলিল, "কেন, দণ্ডবিধানটা অন্যায় হয়েছে ব'লে তোর মনে হচ্ছে না-কি?"

সুলেখা কোনো উত্তর দিবার পূর্বে প্রশান্ত কথা কহিল; বলিল, "এখনো যদি আলোচনার কিছু বাকি থাকে সুলেখা, তার মধ্যে কিন্তু আমার আর স্থান নেই। আমার কাজ আছে, আমি চললাম।" বলিয়া সে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকেই প্রস্থান করিল।

"আমার অবশ্য কাজ নেই, কিন্তু আমিও চললাম।" বলিয়া সুলেখাও উঠিয়া গেল।

লাবণ্য তাহার উদ্বিগ্ন ভারাক্রান্ত মন লইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। জড় বস্তুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া রহিল।

২১

দ্বিপ্রহরে আহারের পর সুলেখা তাহার শয়ন কক্ষে শয্যার উপর শুইয়া সেদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রখানা পড়িতেছিল, এমন সময়ে লাবণ্য কক্ষে প্রবেশ করিল। একবার অপাঙ্গে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুলেখা যেমন খবরের কাগজ পড়িতেছিল তেমনই পড়িতে লাগিল।

সুলেখার পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া লাবণ্য উপবেশন করিল। তাহার পর, অবান্তর কথোপকথনের ভূমিকায় সময় নষ্ট না করিয়া যে কথার আলোচনা করিতে আসিয়াছিল একেবারে সোজাসুজি তাহার অবতারণা

করিয়া বলিল, "তোর জামাইবাবুর ওপর তুই রাগ করেছিস সুলেখা?"

খবরের কাগজখানা নিজের বাম পার্শ্বে স্থাপন করিয়া লাবণ্যর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সুলেখা বলিল, "আজ সকালের কথাবার্তার জন্যে?"

"হ্যাঁ?"

সুলেখা বলিল, "সকালের কথাবার্তার জন্যে ত জামাই-বাবুরই আমার ওপর রাগ করবার কথা।"

লাবণ্য বলিল, "সে কথাও মিছে নয়। আচ্ছা, কোনো দিন ত ওঁর সঙ্গে ও-রকম ক'রে কথা ক'সনে, আজ কইলি কেন?

দুঃখিতকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "কি জানি দিদি, কয়েক-দিন থেকে মনটা কেমন খিঁচড়ে গেছে, মেজাজটাও গেছে বিগড়ে। কিছু ভাল লাগে না।"

লাবণ্য বলিল, "অবনীশের জন্যে মন কেমন করে না-কি?"

সুলেখা বলিল, "কিছু ভাল না লাগা যদি মন কেমন করা হয়, তাহ'লে করে।" বলিয়া সামান্য একটু হাসিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া লাবণ্য বলিল, "তা-ও ত' ওদের আসা আবার পাঁচ ছয় দিন পিছিয়ে গেল।"

আগ্রহ সহকারে সুলেখা বলিল, "কেন?"

"আজ আবার দাদার চিঠি এসেছে, কি একটা নতুন কাজ এসে পড়ায় তাঁর রওনা হ'তে পাঁচ ছ' দিন বিলম্ব হ'য়ে যাবে।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া কপট আনন্দের প্রভায় মুখমণ্ডল উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়া সুলেখা বলিল, "তা, কাজ পড়লে কি ক'রে আর আসবেন বল।"

লাবণ্য মনে করিয়াছিল এ কথা শুনিয়া সুলেখা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইবে; কিন্তু তৎপরিবর্তে তাহার মুখে প্রসন্নতার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত হইল; বলিল, "অবনীশ বোধ হয় দাদার জন্যে আর অপেক্ষা না ক'রে পরশুই এসে পড়বে।"

সুলেখা বলিল, "না, তা কখনো আসবেন না। যখন আসবেন, দুজনেই একসঙ্গে আসবেন।"

তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "গৌরহরি-বাবু তাহ'লে ত' আরও পাঁচ ছয় দিন থেকে যাবেন দিদি?"

লাবণ্য বলিল, "না, গৌরহরিকে উনি কালকেই মাইনে চুকিয়ে বিদেয় করবেন।"

এ কথা শুনিয়া নিমেষের মধ্যে সুলেখার মুখ হইতে আনন্দের সমস্ত দীপ্তিটুকু অপসৃত হইল; মুখের মধ্যে অপ্রসন্নতার ঘন ছায়া বিস্তার করিয়া সে বলিল, "এটা কিন্তু ভাল হবে না। দাদা যখন তাঁকে পাঠিয়েছেন, দাদার আসা পর্যন্ত তাঁকে রাখা উচিত।"

মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া লাবণ্য বলিল, "দেখ্ সুলেখা, তোর এই গৌরহরির পক্ষ অবলম্বন ক'রে কথা কওয়া আমার কিন্তু ভারি খারাপ লাগে! বিশেষত আজকে খুব বেশি রকম লেগেছে।"

সুলেখা বলিল, "সে তুমি বড্ড বেশি নার্ভাস ব'লে।"

"আমি নার্ভাস?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুলেখা বলিল, "ওমা, তুমি আবার নার্ভাস নও? সে কথা আমি ভুলে গিয়েছি না-কি। আমাদের বাড়ির পূবদিকের বাড়িতে কোনো ছেলের অসুখ হ'লে, পাছে তার কান্নার শব্দ কানে আসে, সেই ভয়ে তুমি পশ্চিমদিকের বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে ব'সে থাকতে।"

"সে আর এ এক হল?"

"এক।"

এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া লাবণ্য বলিল, "শোন্ সুলেখা, মা নেই, আমি তোর বড় বোন, মার মতো। তোরই ভালর জন্যে আমি গোটা কয়েক কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব। ঠিক উত্তর দিবি কি-না বল্।"

সুলেখা বলিল, "ঠিক উত্তর দেবো না কেন? নিশ্চয় দেবো। কি কথা, বল?"

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল দীপালি। লাবণ্যর নিকট উপস্থিত হইয়া সে বলিল, "মা, বাবা তোমাকে বাইরের ঘরে ডাকছেন।"

"কেন রে?"

"তা জানিনে।"

"আচ্ছা, বল গে এখনি আসছি।"

দীপালি প্রস্থান করিলে সুলেখা বলিল, "কি কথা বলো।"

লাবণ্য বলিল, "বিয়ের আগে গৌরহরির সঙ্গে তোর জানাশোনা হয়েছিল?"

সুলেখা বলিল, "জানাশোনা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ, তা ত' বুঝতে পারছি নে।"

লাবণ্য বলিল, "এই আলাপ-পরিচয় আর কি?"

একটু ভাবিবার লক্ষণ দেখাইয়া সুলেখা বলিল, "তেমন বেশি নয়, —সামান্য।"

"আর, —আর—"

লাবণ্যর ইতস্তত ভাবে অধীর হইয়া সুলেখা বলিল, "আর কি বল না?"

লাবণ্য ভাবিল, আর অধিক গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া একেবারে চরম প্রশ্নে উপনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, বিশেষত ও-দিক হইতে যখন প্রশান্তর তলবও আসিয়াছে। খানিকটা আগাইয়া গিয়া দুই হাত দিয়া সুলেখার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া সানুনয় কণ্ঠে সে বলিল, "শোন্ সুলেখা, লক্ষ্মী ভাই, সত্যি ক'রে বল, আমার মাথা খাস মিথ্যে বলিস নে,—গৌরহরিকে, গৌরহরিকে কি তুই ইয়ে করেছিলি?"

লাবণ্যর মুষ্টি হইতে নিজের হস্ত সজোরে ছিনাইয়া লইয়া গম্ভীর মুখে সুলেখা বলিল, "না দিদি, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা ক'র না; এ-সব কথার উত্তরও আমি তোমাকে দেবো না। যদি বলি, গৌরহরিবাবুকে আমি ইয়ে

বিপর্য্যয়

গোপাল ভৌমিক

ধূসর প্রান্তর দেখে ঝলসে নয়ন
কোথা সে বিচিত্র কীর্তি
দেখি না ত' সৌন্দর্যের নিখুঁত চয়ন।
স্বপ্নালস চোখ দুটি খুলি
সৌন্দর্য-রভস চায় আমার ভিখারী
প্রত্যাশায় আঁখিপদ্ম তুলি।
প্রাগৈতিহাসিক দৃষ্টি আঁখির কিনারে;
যুগান্তের পথ চেয়ে তাই
প্রত্যাহত ফিরে আসে আমার দুয়ারে।

প্রপীড়িত স্থূলে দৃষ্টি দেখে ধ্বংস-স্তূপ
দেখে না ত' ভবিষ্যতে তার
আবৃত বীজের নীচে সুন্দরের রূপ।
দীপ্ত বুদ্ধি দিয়া বুঝি বৃথা এই খেদ
অসম্ভব ভুলে যাওয়া
অবিস্মরণীয় তবু আত্মার নির্বেদ।
প্রচ্ছন্ন অতীত চৈত্যে আমার বিহার;
নিপীড়িত বুদ্ধিজীবী মন—
অনাগত ভবিষ্যৎ হাসে নির্বিকার।

সভ্যতার অভিশাপ

শ্রীঅমল সেন

জীবনের উষ্ণস্রোত স্তব্ধগতি লুপ্তিগুহাপথে
মুক্তি পাবো কিনা পাবো কে জানে তা অন্ধকার হ'তে!
আজি চারিদিকে ভয়—জীবনেরে খণ্ডছিন্ন করি
সভ্যতা সংকট ক্ষণে বেজে ওঠে মৃত্যুর বাঁশরী।
আকাশের নীলিমায় ঝড়ো মেঘ ভিড় করিয়াছে,
আঁধারে ঢেকেছে বিশ্ব, অভিনব মূর্তি ধরিয়াছে
মানুষের নূতন সভ্যতা!

মহাবিশ্ব নরমেধ যাগে
বহুরে আহুতি দিয়া আজি বল কোন্ বর মাগে
নরমাংস ক্ষুধিত সভ্যতা! মানুষের স্পর্ধিত অন্যায়
লুপ্ত ক'রে দিতে চায় ধরণীরে পাপের বন্যায়।
নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি—বাতায়নে নেমেছে আঁধার,
অতন্দ্র নয়নে জেগে ব'সে আছি খুলে দিয়ে দ্বার
চাহিয়া সম্মুখ পানে।

ধ্বংসের দেবতা আছে জেগে,
ছুটেছে উন্মত্ত হয়ে হিংসা আজ দুর্নিবার বেগে।
ত্রস্ত মানবের চিত্ত—যেবা দূরে, যেবা কাছে আছে
মৃত্যুভয়ে শংকাতুর, শুনি, আর্তকণ্ঠে তারা যাচে
দুমুষ্টি ক্ষুধার অন্ন, একটুকু সংকীর্ণ আশ্রয়,
জীবনেরে বাঁচাইতে জীবনের লাগি সদা ভয়।
জীবন ধিকৃত এত!

নিদ্রা হ'তে উঠি চমকিয়া
পুত্রহারা মাতা কাঁদে, স্বামী-শব বক্ষে আঁকড়িয়া
কাঁদে শোকাতুরা নারী—অগণিত সন্তানের লাগি
ব্যথাতুরা বসুন্ধরা কাঁদে শুনি সারানিশি জাগি।
মানুষের হাতে আজ সুন্দরের হ'ল পরাভব,
তাই হেরি দিকে দিকে নবতর জীবন-উৎসব।
প্রলয় ঘনালো মেঘে।

মানবের সভ্যতা শ্মশানে
মুক্তির বারতা শুনি জীবনের জয়ধ্বনি গানে!

ঘূর্ণিবাত্যা বিধ্বস্ত বরিশালের মর্মস্পর্শী দৃশ্য

ভোলায় ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার ফলে মৃত গবাদি পশুর দেহ খালে টানিয়া ফেলা হইতেছে
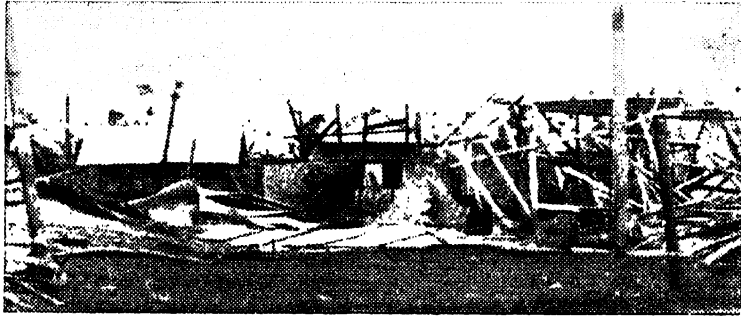
ভোলা টাউন স্কুলের ধ্বংসাবশেষ
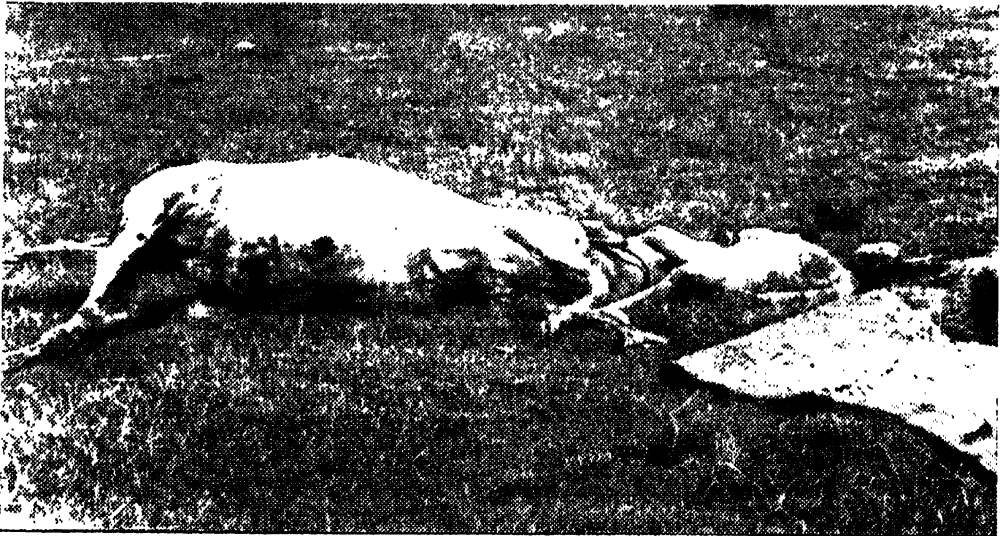
ভোলা শহরের নিকট খালের ধারে একটি ৮।১০ বৎসরের বালক ও গরুর শব একসঙ্গে পড়িয়া আছে

নাটমঞ্চের ভাল মন্দ, দোষ ত্রুটি নিয়ে আমরা বহুবার গঠনমূলক আলোচনা করেছি। ক্রম অবনতির পিছল পথে দাঁড়িয়েও কর্তৃপক্ষ নাটমঞ্চের অধোগতির কারণ বুঝতে পারেন না, পারলেও তা রোধ করবার শক্তি তাদের নেই। সম্ভবত এরা বহু অভিজ্ঞতার ফলেও অভিজ্ঞ হতে পারেন না। নাটমঞ্চগুলি যে সর্বদা অনভিজ্ঞ ও নূতন লোক পরিচালনা করেন তা' ত' নয়ই, উপরন্তু রঙ্গমঞ্চকে শিশু টেকনিকের দিক থেকে যেমন অভিনবত্ব আছে তেমনি নাটকে প্রাণশক্তিও রয়েছে। শালীনতার দিক থেকে আমরা এর নিন্দা করি, কারণ মনস্তত্ত্ব ও আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে শ্যামলী ও স্বামীজীর আকস্মিক দৈহিক মিলন ও তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপে। তবে নাটকটি অতিশয় উপভোগ্য। রিহার্সাল এখনও আমাদের দেখা হয়ে উঠেনি। নাট্যনিকেতনের নূতন সংবাদ নেই। গত দেড় বছর যাবৎ কেমন যেন মৃদুগতিতে

গত ১৫ই মে আলমোড়ায় উদয়শংকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রশংকরের সহিত মাইহার স্টেটের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। বিবাহ বৈদিক মতে সম্পন্ন হয়

অবস্থা থেকে যাঁরা একদিন মানুষ করে তুলেছিলেন আজও কর্ণধাররূপে তাঁরাই রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করছেন। কিন্তু আজ কোথায় সেই শৌর্য কোথায় সেই উৎসুক নরনারীর ভীড়, কোথা বা সেই সাফল্যগৌরব-মণ্ডিত অভিনয় রজনীর আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস?

বর্তমানে কলকাতায় চারটি নাটমঞ্চ চলছে, নাট্যভারতী, নাট্যনিকেতন, স্টার, ও মিনার্ভা। নাট্যভারতী ও স্টারের অবস্থা এদের মধ্যে বেশী ভাল বলে মনে হয়। নাট্যভারতী থেকে শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চলে যাওয়ায় নাট্য-ভারতীর কিছু ক্ষতি হয়েছে। তবে এরা নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে পেয়েছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী বর্তমানে পি-ডব্লিউ-ডি নাটকে মিঃ সেনের ভূমিকায় নামছেন। টাইপ চরিত্রে অভিনয়ে অহীনবাবু বর্তমানে বঙ্গ নাটমঞ্চে অদ্বিতীয়। কাজেই অহীনবাবু যে চরিত্রটিকে অপূর্ব করে তুলবেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। এখানে প্রতি শনি ও রবিবার শ্রীযুত জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত নাটক পি-ডব্লিউ-ডি এবং প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার শ্রীযুত অয়স্কান্ত বক্সীর নূতন নাটক রিহার্সাল অভিনীত হচ্ছে। দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পি-ডব্লিউ-ডি নাটক হিসাবে ভাল। ঠেকে ঠেকে চলছে। প্রথম শুনলাম কথাশিল্পী সৌরীন্দ্র মজুমদারের মহাযুদ্ধ নামক একখানি নাটক অভিনীত হবে, তারপর হঠাৎ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'নরনারী'র বিজ্ঞাপন পড়ল, তারপর শুনলাম প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'শতাব্দীর অভিশাপে'র নাট্যরূপ অভিনীত হবে। উপরোক্ত কোন বইই মঞ্চস্থ হয়নি। এখন শুনছি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী'র নাট্যরূপের মহলা চলছে। কবে নাটকটি মঞ্চস্থ হবে তা' আমরা জানিনা। এখানে পুরাতন বিখ্যাত নাটকগুলির অভিনয় হচ্ছে। নরেশচন্দ্র মিত্র, রবি রায়, ভূমেন রায়, শৈলেন চৌধুরী, ছায়া, উষা, নমিতা, বীণাপাণি এখানে নিয়মিতভাবে অভিনয় করছেন। মাঝে মাঝে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে দেখতে পাওয়া যাবে।

স্টারের অবস্থা গতানুগতিক। অর্থোপার্জনই এদের একমাত্র লক্ষ্য, সেদিক থেকে এরা সাফল্য দাবী করতে পারেন। স্টার থিয়েটার্সের সম্মুখে যে সকল হাস্যকর চিত্র সগৌরবে টাঙ্গানো আছে তাতে এখনও লোক আকৃষ্ট হয়। মেলো-ড্রামাটিক অভিনয় এদের ভালই হয়।

মিনার্ভায় নূতন দল এসেছে, নাটকের সুরও বদলেছে।

জয়ন্তী অভিনয় দেখে মনে হল, আধুনিক হবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নাটক ও অভিনয়ের উৎকর্ষতার অত্যন্ত প্রয়োজন।

রঙমহলের দ্বার এখনও উদ্ঘাটন হয়নি। শ্রীযুত বি এন সরকার, অনাদি বসু, হরি পাল প্রভৃতি ব্যক্তিদের নেতৃত্বে নূতন সম্প্রদায় রঙমহল পরিচালনা করবার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, শুনছি তা কার্যকরী হয়নি। খবর পাওয়া গেল যে, শ্রীযুত যামিনী মিত্র ও রঙমহলের মালিকের পুত্র নাকি রঙমহলে থিয়েটার চালাবেন। শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ নূতন সম্প্রদায়ে যোগদান করবেন বলে প্রকাশ।

নিউ টকীজের এপার-ওপার চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য ও মেনকা ঃ ছবিখানি আগামী ২০শে জুন 'পূরবী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে

পুস্তক পরিচয়

অগ্রদূত—মাসিকপত্র, জ্যৈষ্ঠ। সম্পাদক—শ্রীরামকৃষ্ণ মজুমদার। কার্যালয়—ভদ্রকালী, বেণীমাধব ঘোষ লেন, পোঃ কোতরং, হুগলী। বার্ষিক মূল্য—২৷০ আনা, প্রতি সংখ্যা, তিন আনা।

"অগ্রদূত"কে অভ্যর্থনা করিতেছি। প্রথম সংখ্যা আশাপ্রদ। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। "শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য" উল্লেখযোগ্য রচনা, বিষয় বিশ্লেষণের ভাষা এবং ভঙ্গী দুই-ই সুন্দর; তীক্ষ্ম অনুপ্রবেশের ক্ষমতাও লেখাতে সুপরিস্ফুট। "মৌলিক ও বাস্তব সাহিত্য" উপভোগ্য রচনা। "ভবিষ্যতের দল" লেখকের ঐকান্তিকতা মনের উপর ছাপ দেয়। কবিতাগুলির মধ্যে "প্রভাত" এবং "মরণ অপরূপ" দুইটি লেখা ভাল। সুবিখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্করবাবুর "প্রিয়বরেষু" বেশ সরস। আমরা সহযোগীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দেশপ্রাণ—মাসিকপত্র। কার্য্যালয়, ১৬বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। দাশনগর সংখ্যা।

কর্মবীর আলামোহন দাসের নাম বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। সামান্য থৈ-মুড়ি ফেরিওয়ালারূপে জীবন আরম্ভ করিয়া আজ তিনি দাশনগরের বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙালী আজ গর্ব করিতে পারে কর্মবীর আলামোহনের শিল্পসাধনায় বিভিন্নমুখী বিরাট প্রতিভার জন্য। আলোচ্য সংখ্যায় বিভিন্ন দিক হইতে আলামোহনের সাধনার বৈশিষ্ট্য বুঝান হইয়াছে। দাশ ব্রাদার্স সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎসব সম্পর্কে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী, ডক্টর মেঘনাদ সাহা, শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিবর্গের বক্তৃতার চুম্বক এই সংখ্যায় আছে। বলা বাহুল্য ইহাদের বক্তৃতাগুলির ভিতর দিয়া বাঙলার জাতীয় সমস্যাসমূহের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত হইয়াছে। "দেশপ্রাণের" বর্তমান সংখ্যাখানির সর্বত্র আদর হইবে আমরা এই আশা করি।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ক্যালকাটা ও ডালহৌসী দল ব্যতীত সকল দলেরই প্রায় একটি করিয়া খেলা বাকী আছে। ক্যালকাটা দল লীগ তালিকার সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় এই দল বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সর্বোচ্চ স্থানে বর্তমানে আছে। এই দল এখনও পর্যন্ত কোন খেলায় পরাজিত হয় নাই। এই দলের একটি মাত্র খেলা বাকী আছে মোহনবাগান ক্লাব দলের সহিত। এই খেলায় যাহাই ফল হউক না কেন, এই দল প্রথমার্ধের খেলায় লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে অবস্থান যে করিবে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার পর দ্বিতীয় স্থানে বর্তমান আছে মোহনবাগান ক্লাব। মহমেডান স্পোর্টিং দলের সহিত ইহার পয়েণ্টের ব্যবধান তিন। ইষ্টবেঙ্গল দলের নিকট পরাজিত হওয়ায় মোহনবাগান দলের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রথমার্ধের একটি খেলা বাকী আছে, তাহাও আবার মহমেডান স্পোর্টিং দলের সহিত। সুতরাং ঐ খেলায় যদি পরাজিত হয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ইষ্টবেঙ্গল দল যদি শেষ খেলায় বিজয়ী হয়, তবে মোহনবাগান দলকে প্রথমার্ধে তৃতীয় স্থান অধিকার করিতে হইবে। ইহাদের পরবর্তী স্থান অধিকারী দলসমূহের সহিত চ্যাম্পিয়ানসিপ অথবা রাণার্স আপ হইবার জন্য যে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিত।

কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে

লীগ চ্যাম্পিয়ান কোন্ দল হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। কারণ খেলার ফলাফল অনেক সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। তবে বর্তমানে মহমেডান, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল—এই তিনটি দল যে অবস্থায় আছে, তাহাতে মহমেডান স্পোর্টিং দলেরই চ্যাম্পিয়ান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মহমেডান স্পোর্টিং দল এই পর্যন্ত কোন খেলাতেই পরাজিত হয় নাই। মোহনবাগান দলের নিকটও প্রথমার্ধের শেষ খেলায় পরাজিত হইবে, তাহারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রথমার্ধে এই দল দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হইতে যে তিনটি পয়েণ্ট অধিক সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাই দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় এই দলকে যথেষ্ট শক্তি দান করিবে। তাহা ছাড়া, বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। মাঠ প্রত্যহই খেলার সময় কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইতেছে। এইরূপ মাঠে মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়গণ কয়েকটি খেলায় বেশ ভালই খেলিয়াছেন। সুতরাং পরবর্তী খেলাগুলিতে এইরূপ অবস্থা মাঠের হইলেও, এই দলের পক্ষে বিজয়ী হওয়া বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ মাঠের অবস্থার মধ্যে এই দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে কেবল ইষ্টবেঙ্গল ও রেঞ্জার্স দল। মোহনবাগান দল সুবিধা করিতে পারিবে না। ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান দল এইরূপ মাঠে খেলিয়া পরাজিত হওয়ায় সকলকে এইরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। অতএব মোহনবাগান দল এই দলকে চ্যাম্পিয়ানসিপের পথে বাধা দিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। রেঞ্জার্স দলের সহিত মহমেডান দলের পয়েণ্টের ব্যবধান বর্তমানেই অনেক। সুতরাং রেঞ্জার্স দল চ্যাম্পিয়ানসিপের অন্তরায় হইবে না, এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। একমাত্র ইষ্টবেঙ্গল দলই মহমেডান স্পোর্টিং দলকে বিশেষ বেগ দিতে পারে, যদি এই দল বর্তমানের কয়েকটি খেলায় যেরূপ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা করিতে পারে। তবে ইহা আমরা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে, প্রথম ডিভিসনের লীগ তালিকার প্রথম তিনটি স্থান মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান—এই তিনটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। লীগের যোগদানকারী অপর কোন দল এই তিনটি স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

এরিয়ান্স ও ভবানীপুর দল

শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স দল পর পর ছয়টি খেলায় পরাজিত হইবার পর খেলায় বিজয়ী হওয়ায় অনেকেই বলিতেছেন, "যাক্, এতদিনে এরিয়ান্সের পরিচালকগণের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহারা ইহার পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ভাল ফল প্রদর্শন করিবেন।" কিন্তু আমরা বলিব, বড় দেরীতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। এখন শত চেষ্টা করিয়াও রাণার্স আপ পর্যন্ত হইতে পারিবেন না। পর পর দুইটি খেলায় পরাজিত হইবার পর যদি খেলার উন্নতি করিতেন, তবে হয়তো বা কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিত। যাহা হউক, বর্তমানে এরিয়ান্স ক্লাব দল যখন উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন দ্বিতীয়ার্ধের সকল খেলা সমানভাবে চালাইলেই আমরা সুখী হইব।

ভবানীপুর ক্লাব দল পুনরায় খেলায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। শেষ পর্যন্ত ইহা বজায় রাখিলে এই দলের স্থান লীগ তালিকার উপরিভাগেই থাকিবে। কালীঘাট ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। দ্বিতীয়ার্ধের সকল খেলায় এই দুইটি দল আরও উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই দুইটি দল লীগ তালিকার নিম্নভাগেই থাকিয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আগামী সপ্তাহ (৩২ সংখ্যা) হইতে তরুণ কথা-সাহিত্যিক সৌরীন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস 'নূতন পৃথিবী' প্রকাশিত হইবে।

লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
মহমেডান	১২	১১	১	০	২৭	৪	২৩
মোহনবাগান	১২	৯	২	১	১৭	৫	২০
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৯	০	৩	২২	৭	১৮
পুলিশ	১১	৬	২	৩	১৩	৬	১৪
রেঞ্জার্স	১২	৫	৪	৩	১১	৯	১৪
ভবানীপুর	১১	৫	১	৫	৯	১১	১১
ডালহৌসী	১৩	৪	৩	৬	১২	১৯	১১
এরিয়ান্স	১২	৫	০	৭	১৩	২২	১০
কাষ্টমস	১২	৩	৪	৫	৮	১৮	১০
ই বি আর	১২	৪	১	৭	১৬	১৫	৯
কালীঘাট	১২	৪	১	৭	১২	১৫	৯
স্পোর্টিং ইউঃ	১২	১	৫	৬	৩	১৪	৭
নর্থ স্ট্যাফোর্ড	১২	২	২	৮	১২	২৫	৬
ক্যালকাটা	১৩	২	২	৯	৮	২১	৬

পৃথিবীর পেশাদার টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

সম্প্রতি আমেরিকার চিকাগো শহরে পৃথিবীর পেশাদার টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস ও ডাবলস উভয় বিভাগেই ফ্রেড্ পেরী বিজয়ী হইয়াছে। গত বৎসর ডোনাল্ড বাজ এই সম্মানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সিঙ্গলসে হঠাৎ এক অখ্যাতনামা হলিউডের টেনিস খেলোয়াড় ফাউন্সের নিকট স্ট্রেট সেটে পরাজিত হওয়ায় সিঙ্গলস সম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। ফাউন্সের এই সাফল্য টেনিস উৎসাহীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে। ডোনাল্ড বাজের ন্যায় খেলোয়াড় এইরূপ শোচনীয়ভাবে অখ্যাতনামা খেলোয়াড়ের নিকট পরাজিত হইবেন কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই। ডোনাল্ড বাজ পেশাদার তালিকাভুক্ত হইবার পর কোন খেলায় পরাজিত হন নাই। এই পরাজয় তাঁহার প্রথম পরাজয়। যাহা হউক, তিনি ডাবলসে ফ্রেড পেরীর সহযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছেন। নিম্নে সিঙ্গলস ও ডাবলস উভয় খেলার ফাইনালের ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

সিঙ্গলস ফাইনাল

ফ্রেড পেরী ৬-৪, ৬-৮, ৬-২, ৬-৩ গেমে স্কীনকে পরাজিত করিয়াছেন।

ডাবলস ফাইনাল

ফ্রেড পেরী ও ডোনাল্ড বাজ ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ গেমে স্টোফেন ও গ্রেডহিলকে পরাজিত করিয়াছেন।

জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘের প্রচেষ্টা

ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন বা জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ বাঙলার সকল জাতীয় খেলার প্রসার ও উন্নতিকল্পে গঠিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘ মাত্র ছয়মাস হইল গঠিত হইয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যে উক্ত সঙ্ঘ কয়েকটি জাতীয় ক্রীড়ার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সকল প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক দল যোগদান না করিলেও প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ও ফলাফল বাঙলার অনেক ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কয়েকজন ধনী ব্যায়ামোৎসাহী ব্যক্তি এই সঙ্ঘকে সাহায্য করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ও আর্থিক সাহায্যও করিয়াছেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানের ক্রীড়ামোদিগণ পর্যন্ত এই সঙ্ঘের পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি কয়েকটি জেলায় উক্ত সঙ্ঘের অনুরূপ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সঙ্ঘ এই সকল উৎসাহী ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতেছেন। এতদিন জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ যে সকল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কেবল বালকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহারা বালিকাদের জন্যও একটি হাডুডু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তাঁহাদের একরূপ বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে। কারণ তাঁহারা সম্প্রতি কয়েকটি বালিকা বা মহিলা ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েকটি অনুযোগপত্র পাইয়াছেন। এই পত্রে বলা হইয়াছে,—"সঙ্ঘের নারীসমাজকে উপেক্ষা করা উচিত হয় নাই।" সঙ্ঘের পরিচালকগণ এই অনুযোগপত্রসমূহের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই উক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল বয়সের বালিকাগণকে এই প্রতিযোগিতায় হয়তো নামানো সম্ভব হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা পরীক্ষামূলক হিসাবে এই প্রতিযোগিতাটি ছোট ছোট বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। তবে ভবিষ্যতে বড় বালিকাদের জন্য এমনকি মহিলাদের জন্যও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের আছে। বালিকাগণের সুবিধার জন্য উক্ত হাডুডু প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন নূতনভাবে গঠন করিয়াছেন। হাডুডু প্রতিযোগিতার পর গাদী, এমন কি বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের যে সকল খেলা প্রচলিত আছে তাহার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ করিবেন। এইজন্য জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ একটি বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান কমিটি গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত সকল খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে কয়েকটি খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার জন্য মঞ্জুর করিবেন তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সঙ্গে বালকদের জন্য যে সকল খেলা আছে তাহারও বিষয় আলোচনা করা হইবে।

জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা বাঙলার বালকবালিকাদের মধ্যে জাতীয় খেলার উৎসাহ জাগরিত করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

মল্লযুদ্ধে রুশিয়ার স্থান

পৃথিবীর মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় রাশিয়ান মল্লযোদ্ধাগণ বহুকাল হইতেই শ্রেষ্ঠদের মধ্যে স্থানলাভ করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৩ সালে প্যারিসে যে নিখিল বিশ্ব মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয়, তাহা রাশিয়ান মল্লযোদ্ধা বিশ্ববিখ্যাত ব্যায়ামবীর জর্জেস হেকেনস্মিড্ চ্যাম্পিয়ান হন। উক্ত মল্লবীর রুশিয়ার জন্য যে সম্মান অর্জন করেন তাহাই রুশিয়ার সকল মল্লবীরকে অভাবনীয় উৎসাহ দান করে। ১৯০৫ সালে পুনরায় ইভান পড়ুবুলী নামক একজন রাশিয়ান মল্লবীর পুনরায় ঐ সম্মানলাভ করেন। সম্প্রতি জোহানীজ কোটকাজ নামক আর একজন রাশিয়ান মল্লযোদ্ধার অপূর্ব সাফল্যের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই মল্লযোদ্ধা গত কয়েক বৎসর পৃথিবীর প্রায় সকল বিশিষ্ট মল্লযোদ্ধাকে পরাজিত করিয়াছেন। সম্প্রতি মস্কোতে এক মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে ইউরোপের দুই বৎসরের চ্যাম্পিয়ান কোবারিজ, এস্তোনীয়ার চ্যাম্পিয়ান নিও, আর্মেনিয়ান চ্যাম্পিয়ান প্রায়েসুলিয়া, জর্জিয়ার চ্যাম্পিয়ান ম্যাকালান, ইউক্রেনের চ্যাম্পিয়ান গোঞ্জা যোগদান করেন। ইহারা প্রত্যেকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোটকাজের নিকট পরজিত হইয়াছে। রুশিয়ায় পাঁচ হাজার রেজেস্ট্রি করা বিশিষ্ট মল্লযোদ্ধা আছেন। কোটকাজ ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সাহিত্য সংবাদ

গল্প প্রতিযোগিতা

"বঙ্গীয় কিশোর ছাত্র দলের" উদ্যোগে একটি গল্প প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইবে। কোনরূপ প্রবেশমূল্য নাই। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলা দেশের নানা স্কুল হইতে ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করিতে পারিবে। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন পরিষ্কার করিয়া নাম ঠিকানা সহ গল্পটি আগামী ৩০শে জুনের (১৯৪১) মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান। প্রতিযোগিতার ফল আগামী ১৫ই জুলাইর (১৯৪১) মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

নিয়মাবলীঃ—

(ক) এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ১৫ বৎসরের অধিক না হয়।

(খ) গল্পের "বিষয়বস্তু" নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে না। প্রতিযোগীদের খেয়াল মত গল্প হইবে।

(গ) গল্প ফুলস্ক্যাপ্ কাগজের ৫ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া চাই।

শ্রীক্ষৌণিশচন্দ্র মিত্র, সম্পাদক, গল্প প্রতিযোগিতা বিভাগ, ২৩।২এ, সতীশ মুখার্জি রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

এক একটা এমন অপয়া বাড়ি থাকে যেখানে লক্ষ্মীর বরপুত্র এসেও সর্বস্বান্ত হয়ে পথে দাঁড়িয়েছে। কলকাতা শহরে বাড়ি বদলের সময় বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে অনেক পাড়ায় এমনি ধরণের বাড়ির খোঁজ মেলে। পাড়ার দুষ্ট লোকের অপবাদেও অনেক সময় ভাল বাড়ির ভাড়াটে পাওয়া আবার মুস্কিল হয়ে পড়ে। কেবল বাড়ি কেন গাড়িতেও এমনি কোন না কোন এক অপদেবতা এমন ভর করে বসে যে তাকে তাড়াতে গিয়ে বহুলোকের জীবন গিয়েছে, বহু ধনী লোক ভিক্ষার ঝুলি বয়ে তবে কোন রকমে প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। সত্যি সত্যিই অপদেবতার আকর্ষণে এমনিভাবে মানুষে ধন প্রাণ হারায়, না এসব কেবল আকস্মিক ঘটনা মাত্র, এ নিয়ে তর্ক করবার মত অবসর এখানে নেই।

পৃথিবীতে এমনি বহু ঘটনা ঘটছে। সময় থাকতে যারা সরে পড়ে তারাই নাকি এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে। ক্রমান্বয়ে বহু দুর্ঘটনার পর কেউ আর ভয়ে বাড়ির উপর চোখ না দেওয়ায় দেখা গেছে বৃহৎ অট্টালিকা মানুষের অব্যবহারে পাড়ার আরও বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতের মত, বাড়ির চূণবালির সঙ্গে মিশে আছে যেন যাদুমন্ত্র, অপরিষ্কার বৃহৎ হলঘরের আনাচে কানাচে মাকড়সার জাল যেন ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে মানুষে শিকারের জন্যে। ভয়েতে পাড়ার ছেলেমেয়েরা পোড়ো বাড়ির দিকে কোনদিন এগিয়ে যেতে সাহস পর্যন্ত পায় না। মনের এ দুর্বলতা মানুষের মধ্যে বহুদিন ধরে রাজত্ব চালিয়ে আসছে।

১৯৪০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উপর সেই অপদেবতা আবার কি হিংস্রবৃত্তি অবলম্বন করবে? অনিবার্য দুর্ঘটনার কল্পনা করে যারা আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্টদের পুরাতন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আমেরিকায় ১৮৪০, '৬০, '৮০, ১৯০০ এবং ১৯২০ সালে যাঁরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিষেকের পরই তাঁদের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রতি বিশ বৎসর অন্তর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ভাগ্য-ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করে আসছিল। এই রহস্যময় মৃত্যুর কালচক্রে পড়তে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট হেনরি হ্যারিসন, আব্রাহাম লিনকলন্‌, জেমস এ গারফিল্ড, উইলিয়াম ম্যাককিনলে এবং ওয়ারেন জে হার্ডিংকে। ১৮৪০ সাল থেকে ঠিক বিশ বৎসর অন্তর এইসব দুর্ঘটনা আমেরিকার জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। ১৯৪০ সাল ছিল ঐ রহস্যময় কালচক্রের ষষ্ঠ অধ্যায়। বিশ বৎসরের কালচক্রের ঘর্ষণে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের তিনজনের মৃত্যু হয় গুপ্তহত্যার দ্বারা, বাকি সকলের প্রেসিডেন্ট পদে অভিষেকের পরই মৃত্যু হয়।

১৮৪০ সালে এই রহস্যজনক মৃত্যুর কালচক্রের পরিক্রমণ প্রথম আরম্ভ হয়। ১৮৪০ সালে হ্যারিসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং অভিষেকের এক মাস পরেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ১৮৬০ সালে লিনকলন্‌ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮৬৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় বারের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করবার পরই উলকস বুদ নামে একজন গুপ্তঘাতকের বন্দুকের গুলীতে মৃত্যু বরণ করেন। ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে প্রেসিডেন্ট অভিনয় দেখতে গেছেন; সময়—শুক্রবারের সুন্দর রজনী। থিয়েটারের বক্সে প্রেসিডেন্ট প্রবেশ করলেন। চতুর্দিকের দর্শক আনন্দধ্বনি এবং করতালি সহযোগে প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানাল। অর্কেস্ট্রা আরম্ভ হ'ল—প্রধান অতিথিকে বরণ করা হ'ল। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও আরম্ভ হয়ে গেল। আর আরম্ভ হ'ল কালচক্রের অতীত ইতিহাসের পুনরাভিনয়। পিস্তলের গুলী রংগমঞ্চের দর্শকদের সচকিত করে প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করল। অচেতন অবস্থায় দেহরক্ষীরা প্রেসিডেন্টকে রংগমঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে ১৮৬৫ সালের ৫ই এপ্রিলে তাঁর সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হ'ল। গারফিল্ডের মৃত্যু হয় ১৮৮০ সালে একজন পাগলের গুলীতে।

ম্যাক্‌কিনলে বিপুল ভোটাধিক্যে ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'ন। কিন্তু ঐ বৎসরেই বিপ্লবীদলের চক্রান্তে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। ১৯২০ সালে হার্ডিং নির্বাচিত হ'ন। ১৯২৩ সালে এক আকস্মিক অদ্ভুত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা ভালভাবে রোগ নির্ণয় করবার সময়ই পান নি।

প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ যখন অর্ধেক হয়ে এসেছে সে সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা নিয়ে চারিপাশেই একটা কুৎসা রটেছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং বিক্রমকে খর্ব করবার জন্য চারিদিকেই একটা ষড়যন্ত্রের চেষ্টা চলেছিল। এসব

অদ্ভুত সাজসজ্জায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ: প্রাচীনকালে এইরূপ অদ্ভুত সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সৈন্যরা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের তাক লাগিয়ে কৌশলে যুদ্ধে জয়লাভ করত। শত্রুপক্ষের সৈন্যরা এই বিচিত্র সাজ দেখে যখন হতবাক হয়ে ছত্রভংগ হয়ে পড়ত সেই সুযোগে বিচিত্র বেশধারী সৈন্যদল বিপক্ষ-দলকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসত।

ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ভেঙ্গে পড়লেন। শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং বিপক্ষ দলও ক্ষান্ত হবে এই ভেবে কিছুদিনের জন্য এ্যালাস্কাতে স্বাস্থ্য ভ্রমণে যাওয়াই ঠিক করলেন। সঙ্গে রইলেন শ্রীমতী হার্ডিংও। কিন্তু ওয়াশিংটনে ফিরে আসবার কিছুকাল আগে তিনি এক অতি গোপনীয় সংবাদ পেলেন। সে গোপনীয় সংবাদ কোনদিনই প্রকাশ পায় নি; কিন্তু সেই সংবাদই তাঁকে মৃত্যুর দ্বারে টেনে এনেছিল। সংবাদ লাভের পর থেকেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় শ্রীমতী হার্ডিং একদিন একটা পত্রিকা পড়ে প্রেসিডেণ্টকে শুনিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করলেন। "That's good. Go on, read some more"—প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ক্লান্তভাবে বললেন। এরপরই সব শেষ। সব ঠাণ্ডা মেরে গেল।

১৯৪০ সালই ছিল সেই কাল-চক্রের লক্ষ্য স্থান। ১৮৪০ সাল থেকে বিশ বৎসর অন্তর যে কালচক্র আমেরিকার প্রেসিডেণ্টদের জীবন শেষ করে আসছিল তার গতি আজ বিপরীত দিকে ঘুরেছে। "হোয়াইট হাউসে"র অপদেবতা আজ বোধ হয় বাড়ী বদল করেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রক্ষা পেয়ে গেলেন।

বিগতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য বিপত্তি

(২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রাচ্য দেশসমূহের যুদ্ধসম্ভার উৎপাদন ও সরবরাহের সমবেত চেষ্টার সহজ সুবিধার্থ ভারতকে বোধ হয় অন্যান্য দেশের চল্‌তি ও অগ্রগতিসম্পন্ন শিল্পগুলির উৎপাদন সৌকর্যার্থে কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়াই কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। যে সকল শিল্পের উপযোগী উপাদান আমাদের দেশে সুলভ ও প্রচুর, সেই সেই শিল্পের উৎপাদন প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য।

প্রাচ্যগুচ্ছের অধিবেশন সময়ে, অন্যান্য দেশগুলির সহিত যাহাতে আমাদের আদানপ্রদান ও ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি হয়, তৎসম্বন্ধে বাণিজ্য বিভাগের সহিত ঐ সকল প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম। সকলেই আশা করিয়াছিল যে, রপ্তানি পরামর্শদাতা সমিতির গত জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে এই আলাপ-আলোচনার ফল সভ্যগণের গোচরে আনা হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং প্রাচ্যগুচ্ছের ধুরন্ধরগণের সাহচর্য ও সহযোগিতার ফলে আমাদের আমদানী ও রপ্তানি ব্যবসায়ের কতটুকু, অথবা কোন প্রসার ঘটিবে কিনা, সে বিষয়ে আমরা এখনও ঘোর তিমিরে। এ বিষয়ে আমরা আশু আলোকপ্রার্থী।

আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সম্প্রতি ভারত সরকার আমাদের ষ্টার্লিং ঋণ সম্বন্ধে একটি অতি সমীচীন ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদেশে ঋণ গ্রহণ স্বদেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে; বিশেষত, যখন স্বদেশে সেই পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ অসম্ভব নহে। যুক্তরাজ্যের সহায়তায় ভারত সরকার ১২০ কোটী টাকার ষ্টার্লিং অর্থাৎ বিলাতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে বহু টাকা সুদের দায় হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যও যুদ্ধ প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত এই অর্থ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের প্রারম্ভ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ষ্টার্লিং সংস্থান (securities) বৃদ্ধি করিতে ব্রতী ছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই সংস্থানের পরিমাণ ছিল, ৫৯ কোটী টাকা। বর্তমান ১৯৪১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী এই সংস্থানের পরিমাণ হইয়াছিল ১৪০ কোটী টাকা। দেশবাসী ষ্টার্লিংএর পরিবর্তে সুবর্ণে এই সংস্থান সঞ্চয়ের বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছিল। যাহা হউক, বর্তমান ব্যবস্থার ফলে কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি (Guilt-edged securities) বাজারের উন্নতি ঘটিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও বিনিময় বাজারে অর্থ সচ্ছলতাহেতু ভারতের পশার-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আনুষঙ্গিক এবং আলোচ্য বর্ষের গরিষ্ঠ ঘটনা হইলেও ভারতের সহিত বিচ্ছিন্ন বর্মার নূতন বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং সিংহলের সহিত অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচেষ্টার বিফলতা ও উভয়ের ফলাফলের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

বিলম্বের অবসর নাই—

দুরন্ত বর্ষার দুর্দিন ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল। দেশবাসীর নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, বিলম্ব করিবার অবসর আর নাই। বিপন্নকে সাহায্য করিবার জন্য যে সাহায্যের প্রয়োজন, দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত তেমন সাড়া কোন দিক হইতেই পাওয়া যাইতেছে না। মাসাধিককাল কাটিয়া গেল, এখনও যদি আশু প্রতীকারের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে যাঁহারা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাঁহাদিগকেও রক্ষা করা যাইবে না। বিত্তহীন, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন লক্ষ লক্ষ লোক মরণের পথে অগ্রসর হইবে। নোয়াখালি এবং ভোলার গ্রামে গ্রামে নানা ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দিবে। সরকারী সাহায্যের ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার নমুনা তো নোয়াখালির ব্যাপারেই বুঝা যাইতেছে। নোয়াখালির বিপন্নদের সাহায্য করিবার জন্য সরকার হইতে ১৫ হাজার টাকা দাতব্য এবং ৩ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। নোয়াখালি জেলার সদর মহকুমার ১৫০টি ইউনিয়ন আছে এবং প্রতি ইউনিয়নে প্রায় ৫ শত পরিবারকে সাহায্য করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রতি ইউনিয়নে ১০ টাকা হিসাবে দাতব্য এবং প্রতি তিন বিঘায় ৫ টাকা হিসাবে কৃষিঋণ বণ্টন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই হিসাবে মাথা পিছু লোকে দুই পয়সা, কোন কোন অঞ্চলে সব শুদ্ধ তিন পয়সা করিয়া সাহায্য পাইবে। যাহার জমি নাই কিংবা যাহার তিন বিঘার কম জমি আছে, তাহার ভাগ্যে কোন কৃষিঋণ মিলিবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই সাহায্যের জোরে এমন দুর্দিনে কি লোক বাঁচিবে, বাঁচিবে তাহারা যাহাদের সর্বস্ব গিয়াছে? ইহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে দীর্ঘদিনের জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা দরকার, দরকার শুশ্রূষার ব্যবস্থার, দরকার খাজনা মকুব প্রভৃতি করা; এজন্য এখনও উপযুক্ত চেষ্টা হইতেছে না, আন্দোলন হইতেছে না। কর্তব্য সহজ নয় এবং সে কর্তব্যের গুরুত্ব সময় থাকিতে যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি; কারণ তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। বাঙালী মনুষ্যত্বের এই ক্ষেত্রে কোনদিন নিজীবতা দেখায় নাই। আজও দেখাইবে না, আমরা এই ভরসাই করিতেছি।

আদর্শ ও বাস্তব—

দাঙ্গা-প্রপীড়িত অঞ্চলে শান্তি সেনাদল প্রতিষ্ঠার্থ গান্ধীজী যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে অতি সামান্য সাড়া পাওয়া গিয়াছে। আচার্য কৃপালনী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে ইহার কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"জনসাধারণকে দীর্ঘকাল কোন অকৃত্রিম আত্মবিসর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণে প্ররোচিত করা যায় না। ইহাদিগকে বাস্তব ফলদায়ক কোন কাজ করিতে আহ্বান করিতে হইবে। মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চাহে; সম্মানজনক ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে তাহারা সময় সময় জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইবে; কিন্তু শুধু কোন সিদ্ধান্তের জন্য জনসাধারণকে মৃত্যু বরণ করিতে আহ্বান করিলে তাহারা উৎসাহিত হইবে না।" কথাটা বুঝিয়া উঠা একটু কঠিন। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, মানুষ ভালবাসার জন্যই মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে, কখনও আপনাকে ভালবাসা কখনও অপরকে ভালবাসা। আততায়ীকে সে আপনার মনে করিতে পারে না এবং সেজন্য আততায়ীকে বাধা দেওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠে—অহিংসার পরিপূর্ণ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য আততায়ীর কাছে প্রাণ দেওয়ার জন্য সে প্রেরণা পায় না। আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন,—"যে যে দল দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে কিংবা উহাতে ইন্ধন যোগায় তাহাদিগকে সাহায্য করা কোন সম্প্রদায়ের কর্তব্য নহে, কেহ আততায়ীর হস্তে পতিত হইলে তাহার পক্ষে আততায়ীকে হত্যা করিবার জন্য ছোরা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্যের উপায় করিয়া দেওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে, পরন্তু তাহার কর্তব্য আততায়ী যাহাতে ছোরা না পায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।" আচার্য কৃপালনী যে কথা বলিয়াছেন ইহা হইল সাধারণ মানুষের সামাজিক এবং নৈতিক জ্ঞান বা কর্তব্যের কথা; কিন্তু এই সব নির্দেশ সমাজের সকল ক্ষেত্রের সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। অধিকন্তু অপরাধী ব্যক্তিবিশেষের উপর জোর না দিয়া ব্যাপকভাবে এই সামাজিক সহযোগিতা বর্জনের নীতি অবলম্বন করিতে গেলে ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক ছোপ পাইয়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং আচার্য কৃপালনী যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, সে পথ, পথ নয়। আততায়ীকে বাধা দিবার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে রহিয়াছে, দুর্বলতার জন্য যদি তাহা ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই হইল এ শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের স্বাভাবিক উপায়, পরিপূর্ণ অহিংসার নীতি যদি মানুষের অন্যায়ের প্রতিরোধের সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ক্ষীণতর করে, তাহা হইলে ইষ্ট তো হয়ই না, বরং অনিষ্টই হয় বেশী। বিশেষত সামাজিক বর্জনের এই নীতিকে আমরা পরিপূর্ণ অহিংসার নীতি বলিতেও পারি না।

বৃটিশ নারীর বাণী—

মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির পর ইংলণ্ডের কয়েকজন মহিলা ভারতের নারী সমাজকে উদ্দেশ করিয়া আর একটি বাণী প্রচার করিয়াছেন। মিস র‍্যাথবোনের চিঠিখানার মত এই চিঠিখানা ততটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ নয়; কিন্তু মুরুব্বিয়ানার সুর ইহাতেও একেবারে যে না আছে এমন কথা বলা যায় না। পরলোকগত মহাত্মা এণ্ডরুজ একদিন আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন, আমরা ইংরেজেরা ভারতবাসীদের সম্পর্কে যখনই কোন কাজ করিতে চাই, তখন এমন কি ভারতবাসীদের সেবার ক্ষেত্রেও ভারতবাসীদের চেয়ে আমরা যে শ্রেষ্ঠ এই ধারণা মনের কোণ হইতে দূর করিতে পারি না এবং তাহার ফলে সব ক্ষেত্রে একটা সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি আমাদের নিকট হইতে সত্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বৃটিশ নারীরা

মানবতার দিক হইতে ভারত নারীদের নিকট এই আবেদন করিয়াছেন, ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা থাকিতে পারে না। নারী স্বভাবতই মানবতাময়ী, দুঃখকষ্ট দেখিলেই তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে এবং ইংলন্ডের উপর আজ যে দুর্দৈব আপতিত হইয়াছে ভারতের নারীসমাজ যে সেজন্য ব্যথিত হইয়া উঠিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়; কিন্তু একটা প্রশ্ন এই যে, দেশ এবং জাতির স্বাধীনতার সাধনায় ভারতের নারীরা যখন দুঃখদুর্দশা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা এবং স্বজনের বিচ্ছেদজনিত ব্যথায় যখন জর্জরিত হইতে হইয়াছে, তাঁহাদের শান্তিময় গৃহে জ্বলিয়া উঠিয়াছে যখন অশান্তির জ্বালা, তাঁহাদের চোখের জলে যখন মাটি ভিজিয়াছে, তখন ভারতের নারীদের সেই দুঃখে-কষ্টে, বিচারবিহীন বিধি-বিধানের প্রতিবাদে ইংলন্ডের এই সব উদারহৃদয়া মহিলা মহোদয়াগণ তো কিছুমাত্র সাড়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই এবং এখনই বা ভারতবাসীদের বাস্তব বেদনায় কতটা দুঃখ-কষ্ট তাঁহারা আন্তরিকভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন? যদি সে সম্বন্ধে আন্তরিকতা সত্যই তাঁহাদের থাকিত, তাঁহারা যদি নিজদিগকে ভারতনারীর অবস্থায় লইয়া গিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে 'বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতকে স্বাধীন ও সমকক্ষ অংশীদারস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে বৃটেন চায়'—এমন সেকেলে কথা তাঁহাদের মুখ হইতে এখনও শুনা যাইত না। জয়লাভের জন্য মিলন সাধনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা দেখিতেছেন এবং ভারতবাসীদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতে বলিতেছেন, কিন্তু এই মিলন সাধনের অন্তরায় ঘটাইতেছে বৃটিশ রাজনীতিকদের যে অদূরদর্শিতার নীতি, নিজেদের অধিকার না ছাড়িবার যে অনুদার স্পর্ধা—বৃটিশ নারীদের দৃষ্টিতে সেসব পড়িতেছে না। তাঁহারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বাণী ভারত নারীদিগকে শুনাইয়াছেন। রুজভেল্ট খুব উদারহৃদয় ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁহার বাণীর মূল্য কি থাকিতে পারে? গণতান্ত্রিক স্বার্থরক্ষায় আজ যে বৃটেন সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, ভারতবাসীদিগের গণতান্ত্রিক পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার পথে সেই বৃটেনের কেহ তো বাধাস্বরূপে দাঁড়ায় নাই। বৃটিশ নারীরা ভারতের নারীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন 'ইংলন্ডে যাহা হইতেছে, ভারতে তেমন বিপদ দেখা দিতে পারে না, আপনারা ইহা ভাবিবেন না। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপর জগতের সঙ্ঘবলের সর্বাপেক্ষা সামরিক শক্তিতে সম্পন্ন যন্ত্রের আক্রমণ চলিতেছে, আপনারাও দেখিয়া আসিতেছেন যে, এক দেশের পর আর এক দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করা হইতেছে'—ভারতনারীরা ইহা দেখিতেছেন 'খুবই সত্য, কিন্তু করিবার আছে কতটুকু ইহার প্রতিকারে পরাধীন ভারতবাসীর? বৃটিশ গভর্নমেণ্টই যে তাহাদের সে শক্তিকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছেন। বৃটিশ শাসনের সর্বাপেক্ষা প্রধান কলঙ্ক হইল এই যে, এই শাসন ভারতবাসীদিগকে মনুষ্যত্বহীন এবং নির্বীর্য করিয়াছে, বড় দুঃখের সঙ্গেই গোখেলকে একদিন এই কথা বলিতে হইয়াছিল, আর আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরেও রবীন্দ্রনাথকেও সেই দুঃখই করিতে হইয়াছে। ভারতবাসীদের অবস্থা যখন এমন, তখন ভারতের এই অবস্থার জন্য দায়ী যাহারা, ভারতবাসীদের নিকট আবেদন না করিয়া সেই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করাই বৃটিশ নারীদের উচিত ছিল; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না—এমন জিদ যাঁহারা করিতেছেন, বৃটিশ নারীদের কর্তব্য ছিল, আগে তাঁহাদের অন্তর হইতে আত্মঘাতী সেই অন্ধ প্রেস্টিজের মোহকে দূর করা।

হিন্দু মহাসভার সিদ্ধান্ত—

বর্তমান অবস্থায় হিন্দু মহাসভার কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলিকাতায় মহাসভার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য বীর সাভারকর, ডাক্তার মুঞ্জে প্রভৃতি নিখিল ভারতের হিন্দু নেতৃগণ কলিকাতায় মুঞ্জে প্রভৃতি নিখিল ভারতের হিন্দু নেতৃগণ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাম্প্রদায়িক সমস্যাই বর্তমানে প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার মূলে একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা রহিয়াছে, এমন মনে করিবারও কারণ আছে। বুঝা যাইতেছে, ভারতের সংহতি শক্তিকে এলাইয়া দিবার জন্য একটা অভিসন্ধি লইয়া কাজ হইতেছে—বিভিন্ন স্থানের বিচ্ছিন্ন দাঙ্গাহাঙ্গামার ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনিষ্ট হইতে দেশকে আজ বাঁচাইতে হইবে—জাগাইতে হইবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়, ভারতের সংকল্পশীলতাকে; প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের তুলনায় ব্রিটিশ সরকারের ভারত সম্বন্ধে ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি সবই গৌণ ব্যাপার। হিন্দু মহাসভার কলিকাতার বিগত অধিবেশনের উপসংহারে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—'আমরা কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী নহি। ভারতকে যাঁহারা ভালবাসেন, ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি আছে, সকলের উপর ভারতের স্বাধীনতা যাঁহারা সমর্থন করেন এবং দেখিতে চাহেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, আমরা তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি।' এই দিক হইতে কংগ্রেসের আদর্শ এবং হিন্দু মহাসভার আদর্শের কোন পার্থক্য নাই, ভারতের সংহতি শক্তিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে যে অনিষ্টকর উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে—হিন্দু মহাসভা তাহার প্রতিরোধে অগ্রসর হউন, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন এখানে নাই, ভারতের কল্যাণকামী মাত্রেই ইহা চাহিবেন।

সর্বংসহা

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর মহাবক্ষ ধরিত্রীর ন্যায়ই সর্বংসহা!

প্রতিটি দিনের প্রতিটি সন্ধ্যা এবং রাত্রি ইহাদের প্রতিটি মুহূর্তেই নগরীর বুকে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটিতেছে! পাপ, পুণ্য, দুঃখ সুখ অশ্রুহাসির কি সুবিরাট সমারোহ! নগরী সর্বংসহা না হইলে ইহাদের ভার সহ্য করিত কে?

প্রশস্ত রাজপথের পাশে যে সংকীর্ণ ইঁটবাঁধানো অন্ধ গলি—তাহার ভিতরের যে সংকীর্ণতর জীবনপ্রবাহগুলি অনন্ত মুহূর্তের প্রতি পদক্ষেপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহাদের জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘটনার সহিত আর কাহারও পরিচয় না থাকিলেও নগরী তাহাদের কথা জানে। আর প্রাসাদ সম অট্টালিকাগুলির সুউচ্চ সৌধরাশির গর্বিত ইতিহাস সেও নগরী সযত্নে লিখিয়া রাখিয়াছে। পরস্পরবিরোধী এই দুইটি জীবন ধারায় পাপ, পুণ্যের যে বৈষম্য—পাঁচিলের যে ব্যবধান আর আভিজাত্যের ভেদাভেদ জ্ঞানের মাঝেও যে কত কলঙ্কের কাহিনী আত্মগোপন করিয়া আছে আমরা তাহা জানি না; কিন্তু নগরী তাহা জানে এবং সর্বংসহা নগরী বলিয়াই তাহার বুকে সেজন্য এতটুকু স্পন্দন নাই।

ওই সুপ্রশস্ত রাজপথের সুরম্য অট্টালিকার পিছনে যে অন্ধ গলি নোংরামি আর কদর্যতায় ভরা, যাহার প্রতি এতদিন কাহারও নজর ছিল না একদিন তাহার ভিতরই মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

কত দীর্ঘ প্রভাত ও রজনীর মাঝে ও-বাড়ির সহিত অন্ধ গলির সম্পর্ক চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে—বিরাট পাঁচিলের মাঝে যে সুবিরাট ব্যবধানকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল মুহূর্তের দুর্বলতায় তাহা বুঝি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়।

প্রভাতের আলোক যখন ওবাড়ির পাঁচিলকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল অন্ধ গলির মলিন অন্ধকারে মাটির নীচু দেওয়ালগুলির অন্তরালে তখন কলগুঞ্জন সুরু হইল।

পাঁচু বিশ্বাসকে ঘিরিয়া তখন নানা জল্পনা কল্পনা চলিয়াছে।

কাহারও কাহারও ইহাতে যে ঈর্ষা না হইয়াছে এমন নয়। এ একটা মস্ত বড় সুযোগ, এখন ইহাকে কাজে লাগাইতে পারিলেই তবে না বুদ্ধিমান বলা যায়! ওইতো লম্বা একহারা চেহারা মেয়েটির—আর তাহাতে বর্ণ ঔজ্জ্বল্যই বা কোথায় তেমন—কিন্তু সবই নসিবের ব্যাপার। তাহা না হইলে অমন রাজপুত্তুরের কখনও চোখে ধরে অমন এক মেয়েকে।

পাঁচু বিশ্বাসের আর ক্ষতি কি ইহাতে? মোটা টাকা এইবার সে ইহা হইতে কামাইতে পারে।

কিন্তু পাঁচু বিশ্বাস কোন কিছুই এসব ভাবিতেছে না—শুধু চক্ষু বহিয়া তাহার দুরদর ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

আরে তুমি এতে কাঁদছো কেন? এতে তোমার তো লাভ ষোল আনাই। আজই একটা পুলিশে ডায়েরী লিখিয়ে দাও—মেয়ে তোমার এখনও নাবালিকা। বাছাধন কোথা দিয়ে পার পায় দেখা যাক একবার। একদম জেলঘরে বাস করতে হবে চাঁদমোহন—বুঝলে হে—criminal offence যাকে বলে। বল ত চল আমার এক পরিচিত উকীলের কাছে, এসব ধারা তার একেবারে কণ্ঠস্থ!

চাঁদমোহন কহিল—কিংবা কর্তাকে গিয়ে সোজা বল—হয় এর জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দিন না হলে আপনার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিন!

কিন্তু পাঁচু বিশ্বাস শুধু নির্বোধের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—কি সর্বনাশই না তাহার হইয়াছে! হতভাগী মেয়ে তাহাকে এমন করিয়াই সর্বদিক দিয়া মারিয়া গেছে—তাহার মুখে চুণকালি মাখাইয়া দিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের সূর্য কিরণের প্রখরতায় কলগুঞ্জরণ ক্রমশ অন্ধ গলির সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া বড় রাস্তার মাঝেও আসিয়া পৌঁছাইল।

চায়ের দোকানে হাফ কাপ চা আর আধ পোড়া বিঁড়ির মাঝে সমাজ সংস্কারের সুতীক্ষ্ন বক্তৃতা ধারা—বড়লোক, বড়লোক বলে পীর নাকি হে। এ যে দিনে ডাকাতিরও বাড়া! ছুঁড়িটাকে নিয়ে সোজা সটকে পড়ল ওই একরত্তি ছোকরা। আর কি taste, আরে ছি ছি, তুই বড়লোকের ছেলে ওরকম মেয়ে ত তোর হাতের ময়লা, পয়সা ফেললে দিনে হাজার গন্ডা মেয়ে না অমন পাওয়া পাওয়া যায়।

পাড়ার বস্তির ছেলেদের হইতে আরম্ভ করিয়া বেকার যুবকদের দল সর্বত্রই ওই একই প্রসঙ্গ—শালা চালিয়াৎ, ভাজা মাছটি পর্যন্ত উলটে খেতে জানতো না, এখন কি হয়েছে?

আরে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, বড় ঘরের সমস্ত বড় বড় কান্ডকারখানা; তুমি আমি হলে দেখতে এতক্ষণ কত কান্ডই না হত!

বিকালের দিকে পরিমন্ডল যখন বিশেষ ঘোরাল এবং জোরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও বাড়ির কর্তা তখন পাঁচু বিশ্বাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

যা হবার তা হয়ে গেছে এখন প্রতীকার কি বল? তোমার ওই মেয়ের জন্যে আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলে তাও কি না পর হয়ে গেল।

আর আমার ওই মা মরা মেয়ে কত্তা, বুকের রক্ত দিয়ে যাকে তিলে তিলে বাঁচিয়ে রেখেছি, নিজে না খেয়ে সকল রকম দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করে যাকে এতটুকু থেকে এতবড় করে তুলেছি—পাঁচু বিশ্বাস হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুই চক্ষু ছাপাইয়া দরদর ধারায় অশ্রু জল নামিয়া আসিয়া গন্ডস্থল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল—কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কর্তাবাবু হরিমোহন ঘোষালের পা দুটি

জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুউদ্গত কণ্ঠে কহিল—আমার কি উপায় হবে কত্তাবাবু? এ কাল মুখ নিয়ে আমি আর কেমন করে বেঁচে থাকব? খেটে খুটে কার জন্যেইবা সংসার ধম্মো করব?

হরিমোহনবাবু অনেক বুঝাইলেন, কিছুনা পাঁচু, যারা গেছে, তারা যাক জাহান্নমে, কোন মায়া কোন দয়া কোন বেদনা কোন চিন্তা তাদের জন্যে নেই। যারা তোমার আমার দিক চেয়ে দেখল না—বাপের মর্যাদা, বংশের সম্মান, সমাজের আইনের দিকে তাকাল না তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই আমাদের নেই। আমি তাকে তেজ্যপুত্র করেছি। একটি মাত্র আমার ছেলে, এই বাড়ি ধন ঐশ্বর্য এসবের কোন কিছুর অধিকারী সে নয়। আমি এ সমস্ত দেবতার সেবায় দিয়ে পরকালের কাজ করব।

আমার কি উপায় হবে বাবু?

হরিমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করতে চাও তুমি?

আমি আর এখানে থাকতে পারব না। লোকের উপহাস কুড়িয়ে এ জায়গায় আর বাস করতে পারব না।

কোথায় যাবে তুমি? দেশঘর আছে?

থাকলেও সেখানে আর ফিরে যাব না। আমি বৃন্দাবনে যাব কত্তা। ঠাকুরের পায়েই শেষের কটা দিন কাটিয়ে দেব।

তাই ভাল পাঁচু, জীবনের তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাজ।

হরিমোহনবাবু উঠিয়া সিন্দুক খুলিয়া এক তাড়া নোট বাহির করিয়া পাঁচু বিশ্বাসের হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি গরীব মানুষ এই নাও একশ টাকা বৃন্দাবনে চলে যাও। এখানকার লোকজনের কথায় কেস টেস করার কোন মতলব কর না তাতে অনর্থক কেলেঙ্কারীই বাড়ান হবে। সে মেয়ে নিয়ে ত তুমি আর ঘর করতে পারবে না।

পাঁচু বিশ্বাস নোটের তাড়া ফিরৎ দিয়া কহিল—সবই যখন গেছে কত্তা তখন আর বৈষয়িক কোন জিনিস নয়, এমনিই ভিক্ষে সিক্ষে করে খাব আর ঠাকুরের নাম নেব। পাঁচু বিশ্বাস চলিয়া গেল এবং সেই যে চলিয়া গেল নগরীর কোন প্রান্তে আর তাহার সন্ধান মিলিল না। নগরীর বুকে এতটুকুও তাহার বিচ্ছেদ বেদনা বাজিল না। প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যে বিপুল জন কোলাহলে আর বিরাট বৈচিত্র্যের মাঝে নগরীর এ কাহিনীটুকু অন্তহীন গভীর তরঙ্গরাশির আবর্তনে ভাঙিয়া চুরিয়া কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। সর্বংসহা নগরীর মৃত্তিকায় এ ছোট ফাটলটুকু নিমেষেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। দিন যায় রাত্রি আসে।

বিরাট বড় বাড়িটির সুউচ্চ প্রাচীর পিছনকার মাটির অধিবাসীদের সহিত সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া মহা আভিজাত্যে আবার নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল।

পাঁচু বিশ্বাসের কন্যাকে আর ও বাড়ির অধীশ্বর হরিমোহনবাবুর পুত্রকে লইয়া যে কুৎসিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল দিনের ব্যবধানে আর পাঁচু বিশ্বাসের অন্তর্ধানে তাহা চাপা পড়িয়া গেছে। সে কথা যাহারা জানিত অনেকেই তাহাদের মধ্যে হয়ত বা আর নাই আর যাহারা আছে ধনীর দম্ভের কাছে তাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের সে আলোচনা বুঝিবা তেমন করিয়া আর ফুটিয়া উঠিতেও পারে না।

তারপর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেছে। কালের গতি মুখরতায় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কত পুরাতন বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গেল, কত কাহিনী বৈচিত্র্যহীন হইয়া স্মৃতির জীর্ণ পৃষ্ঠায় মুছিয়া গেল। নগরীর মাটি তাহাতে এতটুকুও কাঁপিল না।

বহু অন্বেষণের পর হরিমোহনবাবুর একমাত্র কুল-প্রদীপকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার গৃহে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। অত বড় বাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী অত ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তি মুহূর্তের দুর্বলতায় একাকার হইয়া যাইতে পারে না। হরিমোহনবাবুর পুত্র নির্মলকুমার ভুল করিয়াছিল—তাহার প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হইয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য সুখ সম্ভোগ ছাড়িয়া পথে পথে একটি কুলটা মেয়ে লইয়া ঘুরিয়াছে। আর কি—ইহার অধিক আর প্রায়শ্চিত্ত কি হইতে পারে?

সে হতভাগিনী মজিয়াছিল; নরকের জঞ্জালে স্বর্গের পরিকল্পনা করিয়াছিল ইহাই ত তাহার মস্ত বড় পাপ! সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে একলাই করিতে হইবে। আর কেহই তাহার জন্য দায়ী হইতে পারে না। তাহার জীবন নাটকের এ অধ্যায়ের সহিত আর কাহারও যোগসূত্র নাই।

কোথায় সে গেছে? সে কথা কেই বা ভাবিতে যাইবে? তাহার কলঙ্কিত জীবন পঙ্কিলতার মাঝে যদি হাবুডুবু খায় কাহার তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে?

অর্থ এবং বিত্তশালী নির্মলকুমার তাই বলিয়া সারা-জীবন ধরিয়া ইহার জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারে না। তাহার জন্য সংসারের প্রয়োজন আছে সমাজের প্রয়োজন আছে।

সেদিন ফাল্গুনী প্রভাতে বড় বাড়ির তোরণদ্বারে মহা উৎসবের মাঙ্গলিকী বাঁশির সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়, হাসি গানে ওবাড়ির উৎসব লগ্ন মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল।

হরিমোহনবাবুর একমাত্র পুত্র নির্মলকুমারের শুভ বিবাহোৎসব।

বড় ঘরের বড় কাণ্ড। আত্মীয় স্বজনে আভিজাত্যের বিরাট আড়ম্বরে সে উৎসবের আলো নগরীর বুককে আলোকিত করিয়াছে। মাননীয় অতিথি সজ্জনের শুভাগমনে আনন্দের বান ডাকিয়াছে। সপ্তাহ ধরিয়া সে উৎসবের বাঁশি বাজিল। নাচ, গান, থিয়েটার, প্রীতিভোজ, নগরী মাতিয়া উঠিল এ উৎসবের প্রীতি আয়োজনে।

পিছনের অন্ধ গলির অধিবাসীরাও একদিন আসিয়া উঠানে পাত পাড়িয়া গেল। পাঁচ বৎসর পূর্বের সে

কলঙ্কিত কাহিনীর কথা কোথায় চাপা পড়িয়া গেছে!

মাটির অন্ধকারে কারাগৃহে হয়ত বা তাহার ক্ষীণধ্বনি উঠিয়াছিল। পুরাতন অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সে কাহিনী লইয়া আলাপ আলোচনা করিয়াছিল কিন্তু বদ্ধ বাতাসে তাহা সেইখানেই অবরুদ্ধ হইয়া গেছে। বাঁশির মধু রজনীর মঙ্গল সুর সে অমঙ্গল ধ্বনিকে মাটির ভিতরই চাপা দিয়াছে।

বিরাট ভোজের মাঝে অন্ধগলির অন্ধ অধিবাসীরা তাহাকে অন্ধকারেই নিমজ্জিত করিয়াছে।

নির্মলকুমারের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

রাজার ঘরে রাজবধূই আসিয়াছে। রূপে, অর্থে, আভিজাত্যে যোগ্য ঘরে যোগ্য বধূই আসিল।

কিন্তু পিছনের অন্ধকার গলির বদ্ধ বাতাসে আবার জাগিয়া উঠিল পুরাতন দিনের সেই দুর্ঘটনার বৈশাখী ঝটিকা।

নগরীর নোংরা মাটির অন্ধকার একখানি কক্ষে একখানি পরিচিত মুখের কদর্য কলঙ্ক রেখাকে আবার যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল।

পুরাতন অধিবাসীরা নিঃসংশয়ে মত প্রকাশ করিল ওই মেয়েটিই পাঁচু বিশ্বাসের কন্যা দিবা। একটি অন্ধকার রাত্রে বড় বাড়ির নির্মলকুমারের সহিত কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়া দুর্যোগের পথে নামিয়াছিল।

কারখানার কোন শ্রমিকের ঘরনী আজ সে। কেমন করিয়া আবার জীবনের নানা দুর্যোগের মাঝখান দিয়া আজ আবার সংসার পাতাইয়াছে এবং ঘটনাক্রমে আজ আবার তাহার পুরাতন খেলাঘরের মাঝেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার সঙ্গের পুরুষটি কোন কারখানার মজুর। দৈনিক স্বল্প আয়ের মাঝে তাড়ি খাইয়া মাতলামি করিয়া কদর্য জীবনযাপন করে। নির্মলকুমারের দক্ষিণের জানালা দিয়া ওদের মাটির ঘরখানি দেখা যায়।

গভীর রাত্রে উৎকট তাড়ির নেশায় মাতলামি আর মেয়েটাকে নির্মম প্রহার, কুৎসিত গালাগালি-মন্দ নিত্যকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল।

বস্তির মাঝে ইহার জন্য হয়ত তেমন অনুশোচনা নাই, কিন্তু নির্মলকুমারের সুদৃশ্য ঘরখানিকে যেন পীড়িত করিয়া তুলিল।

দক্ষিণের জানালা খুলিবার উপায় নাই—যদি কোনক্রমে চোখাচোখি হইয়া যায়!

একদিন নির্মল স্পষ্টই শুনিল পিছনের বস্তিতে গণ্ডগোল।

আকণ্ঠ তাড়ি গিলিয়া নানা কুৎসিত সম্ভাষণের মাঝে পুরুষটি মেয়েটিকে বলিতেছে, যা না, গিয়ে বলগে যা না—হাজার টাকা না দিলে সব ফাঁস করে দেবো।

মেয়েটি অনুচ্চকণ্ঠে কি যেন প্রতিবাদ জানাইল।

পুরুষের পৌরুষসিংহ ইহাতে গর্জন করিয়া উঠিল—তবে রে হারামজাদী, যতবড় মুখ না ততবড় কথা! দূর হ আমার ঘর থেকে, যা না তোর পীরিতের জনের কাছে—

উপর্যুপরি কিল চড় লাথিতে শুধুমাত্র অস্ফুট আর্তনাদ ধ্বনি মাটির দেওয়ালে আছড়াপিছড়ি করিতে লাগিল।

বড় বাড়ির বড় জানালাকে দৃঢ় করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল মাত্র!

নির্মলকুমারের স্ত্রী জয়ন্তী সেদিন স্বামীকে অনুনয় করিয়া বলিল—আর তো পারা যায় না, পিছনের বস্তিতে এমনি উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। পাজী লোকটা দিনরাত তাড়ি খেয়ে মেয়েটিকে এমনি মারধোর আর নির্যাতন করে যে চোখে দেখা যায় না।

নির্মল অবজ্ঞার সহিত কহিল, ছোটলোকদের কাণ্ডকারখানা, বাড়ির পিছনে এমনি নোংরামি সৃষ্টি করেছে—ওদিককার জানালাটা আর খুলো না কোনদিন—মিস্ত্রি ডাকিয়ে এদিকে আর একটা জানলা বসিয়ে নিতে হবে।

জয়ন্তী সমবেদনার কণ্ঠে বলিল—আহা মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে চোখ ফেটে জল আসে। এত যে অত্যাচার—এত যে মারধোর, কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন রা-টা পর্যন্ত করে না। সেদিন এমনি করে জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল যে তার করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে আমারই দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। হ্যাঁগা ওর একটা প্রতিকার করতে পারো না তোমরা?

শুষ্ককণ্ঠে নির্মল কহিল, এর আর আমরা কি করতে পারি বলো?

কেন পুলিসে খবর দিতে পারো না? এতখানি নৃশংসতা মানুষ হয়ে কেমন করে দেখা যায় বলতো?

একি ভদ্রঘরের কাণ্ড যে, পুলিসের ভয়ে থেমে যাবে?

নির্মল এ প্রসঙ্গকে এড়াইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল।

জয়ন্তীর কোমল নারীচিত্ত বস্তির মেয়েটির দুঃখে সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামীর কথাকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ভদ্রঘরের মেয়ে নয় বলিয়া তাহার দুঃখের কোন প্রতিকার নাই, পুলিসের আইন এ অত্যাচার নিবারণ করিতে পারে না একথা স্বাভাবিক বিদ্যাবুদ্ধি থাকিতে সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করে?

অসহায় মেয়েটির জন্য তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

সেদিন সকালে আকাশে একরাশ মেঘ করিয়াছে।

জয়ন্তীর চিত্ত যেন ভাববিহ্বল হইয়া উঠিল।

শয্যার শিয়রে রাখা রজনীগন্ধার দলগুলি হইতে গত রাত্রির গন্ধ সুবাস একেবারে মরিয়া যায় নাই। মিষ্টি গন্ধে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

স্বামী তখন তাহার গভীর নিদ্রায় মগ্ন। জয়ন্তী উঠিয়া দক্ষিণের জানালাটি খুলিয়া দিল। মেঘের অন্তরালে প্রভাতের

সূর্য ঢাকা পড়িয়া গেছে। বাহিরের এলোমেলো বাতাসে কেমন যেন আবেশের স্পর্শ জাগিয়া আছে। জয়ন্তীর মনে তাহা দোল দিল।

কিন্তু অকস্মাৎ পিছনের বস্তির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল।

উঠানের মাঝে জনতা আর পুলিসের ভীড়। মেয়েটির মৃতদেহ ঘিরিয়া চতুর্দিকে জনমণ্ডলী।

জয়ন্তী স্বামীকে তুলিয়া দিল—ওগো শুনছো, শুনছো, ওঠো না, কি সর্বনাশের দৃশ্য গো!

নির্মল ধড়মড় করিয়া উঠিল, কি কি হয়েছে?

পিছনের বস্তির মেয়েটি মরে গেছে!

নির্মল ভীতিকণ্ঠে বলিল, এ্যাঁ, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিরক্তি কণ্ঠে কহিল—তা আমি তার করবো কি? এই সুখবরটি শোনাবার জন্যেই কি সাত সকালে তুমি আমার ঘুম ভাঙালে?

জয়ন্তী স্বামীর এই রূঢ়তায় ব্যথা পাইল। আহা এতে তোমার একটু কষ্টও হচ্ছে না?

ছোটলোকদের কাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কিংবা মন আমার নেই তা বলে। জানলাটা তুমি আবার খুলেছো?—বন্ধ করে দাও!

নির্মল পাশ ফিরিয়া শুইল।

পিছনের বস্তির মেয়েটি পাঁচু বিশ্বাসের কন্যা। সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

গভীর রাত্রে গলায় ফাঁস লাগাইয়া জীবনের কলঙ্কিত ইতিহাস আর নির্যাতনের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছে। মৃত্যুর জন্য কাহাকেও সে দায়ী করে নাই। আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে সে কয়েকটি আখর টানিয়া গেছে—তাহার মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নয়।

সব মিটিয়া গেল।

নির্মলকুমার এইবার নিশ্চিন্ত হইল—বড় বাড়ি চিরতরে এইবার তাহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিল।

নির্মলকুমারের দক্ষিণের জানালাও আর বন্ধ করার প্রয়োজন নাই।

নগরী আবার ভরিয়া উঠিল তাহার প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যে ঘটনাবৈচিত্র্যে! এ ঘটনার চাঞ্চল্যকর ইতিবৃত্ত যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের এ আখ্যায়িকা তাহার জন্য নগরীর বুকে এতটুকু স্পন্দন জাগিল না।

জীবনের নিত্য স্রোতে সুবিরাট প্রাচীরের সুউচ্চতা পিছনের অন্ধ গলির অন্ধ অধিবাসীদের সংকীর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া দম্ভভরে নিজের আভিজাত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিল।

দিন তেমনি করিয়াই যায় এবং রাত্রি ঘনাইয়া আসে।

সর্বংসহা নগরী প্রতিদিনের প্রতিটি কাহিনী বুকে ধরিয়া বাসুকীর মতই স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। কতকাল বৈশাখীর রুদ্র ঝটিকা তাহার বুকের পর দিয়া উন্মত্ত তাণ্ডব লীলায় বহিয়া চলিয়াছে—মাটির বুকে কিন্তু তাহার জন্য এতটুকু স্পন্দন নাই।

বাজিতপুরের শেষকথা

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাজিতপুরে যে মহাসম্মেলন হইল তাহার একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম এই যে, নিরপেক্ষ শ্রোতার দল তাহারা, নীরবে সব কথা শুনিল এবং কেহ কেহ আলোচনাও করিল। একজন নিরক্ষর বৃদ্ধ নেতা যেরূপ সুন্দরভাবে তাহাদের সমাজের কথা, শিক্ষার কথা ও অবনতির বিষয় আলোচনা করিল, তাহা বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে।

মানুষ আঘাত পাইয়াই বিদ্রোহী হয়। নমঃশূদ্রেরা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের নিকট হইতে আঘাত পাইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এ বিষয়ে ও'মেলি সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

"In 1873 they proclaimed a general strike, refusing to serve anyone of the upper classes, in whatever capacity, unless a better position in the hierarchy of castes was accorded to them."

কিন্তু কতটা ফল তাহারা পাইয়াছে সে ইতিহাসের আলোচনা আমি এখানে করিব না।

তেইশ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। আমি একবার গোপালগঞ্জের দিকে আসিয়াছিলাম, তখন কয়েকজন মিশনারী সাহেব ও একজন মিশনারী মহিলার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা গোপালগঞ্জের নানা পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া নমঃশূদ্রদিগকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিতেছেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। একটি স্টেশনে প্রায় চারি পাঁচ শত নমঃশূদ্র পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। আমি দেখিলাম, সাহেব ও মেমেরা ছোটদের হাত ধরিয়া, আদর করিয়া পথ চলা শুরু করিলেন। তাহাদের এই সদয় ব্যবহারে এবং খৃষ্টান হইলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়ে বলিয়াই আজ কত বৎসর যাবত নমঃশূদ্রেরা খৃষ্টান হইতেছে। একথাগুলি বাজিতপুরে আসিয়া আমার মনে হইতেছিল।

সভার পরে নমঃশূদ্রদের বিভিন্ন দলের যুবকেরা বিবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়া প্রদর্শন করিল। লাঠিখেলা, তরোয়ালা খেলা ইত্যাদি নানা ক্রীড়া কৌতুক দেখিলাম। তাহাদের সুন্দর ছিপ্‌ছিপে সুগঠিত দেহ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এমন যে সবলা, সাহসী জাতি তাহাদিগকে আমরা নির্যাতিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহার ফলে সমাজে যে কী ভীষণ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা কি প্রত্যক্ষ করিতেছি না!

হিন্দু মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই দিকে কাজ করিতে অগ্রসর হইয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণপথ মুক্ত করিয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু অর্থ কোথায়? কর্মী কোথায়?

আমার সহিত এই প্রসঙ্গে অনেকের সহিত আলাপ হইল। মাদারীপুরের একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—"কলিকাতা রাজধানী। সেখানকার সভাসমিতিতে যাঁহারা বড় বড় কথা বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ত আমরা পল্লীগ্রামের জনসেবায় পাই না।"

আমি বলিলাম,—"কলিকাতার নেতাদের দোষ দেওয়াটা সহজ। কিন্তু আপনারা যাঁহারা কাছে আছেন, তাঁহারা নানারূপ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ত এই সব দিকে মন নিবেশ করেন না। আমরা পরস্পরকে দোষ দিতে পারি, কেননা তাহা সহজ, কিন্তু প্রতিকারের বিধান কোথায়?"

এখানে একটি কথা বলিতেছি। কলিকাতাতে সম্প্রতি কেহ কেহ অবাঙালীদের বাঙলাভাষা শিক্ষা দিয়া বাঙলা সাহিত্যের ও বাঙলা ভাষার প্রচার করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; স্কুলও খুলিতেছেন। সবই ভাল কথা। কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি বাঙালীদের বাঙলা শিখাইবার জন্য তাহাদের আগ্রহ কোথায়? এই যে নিরক্ষর নমঃশূদ্র জাতি ও অন্যান্য কত জাতি রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষার জন্য আমরা কি করিয়াছি। যে দেশের শতকরা ১০ জন মাত্র লিখনপঠনক্ষম সেই হাজার হাজার নিরক্ষর বাঙালীর শিক্ষার জন্য আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্রভৃতি যে সৌখিন প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহার দ্বারা এত বড় বিরাট দেশের নিরক্ষরতা কতটা দূরীকরণ হইবে জানি না। রাষ্ট্র এখানে সেরূপ প্রচেষ্টা করিতেছে কোথায়? তারপর আজকাল অনেক স্থলেই গভর্নমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়গুলির সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতেছেন। মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার যে সুযোগ ছিল তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। কেননা—আমাদের দেশে বর্তমান যুগেও এমন মহাপ্রাণ ব্যক্তির সংখ্যা অতি বড় কম যাঁহারা গ্রামের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন! কবিরা কাব্যে পল্লীজননীর সৌন্দর্যে বিভোর হইলেও প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার মধ্যে তাঁহারা একদিনও হয়ত বাস করিতে চাহিবেন না। প্রগতিশীল মহিলারা যতই ক্লাব, বৈঠক করুন না তাঁহাদের মধ্যে এমন কয়জন আছেন জানি না, যাঁহারা নগরের বিলাস ও সভাসমিতির আন্দোলন মোহ ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে যাইয়া বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, নিরক্ষর প্রবীণাদের শিক্ষার জন্য মনোযোগী হইবেন। যদি বাঙালীর হৃদয় ও মনে প্রকৃত প্রাণের আহ্বান জাগিত তাহা হইলে গ্রামের লোকের অবস্থা ফিরিত, নিরক্ষরতা দূর হইত, শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিত। মেয়েদের মধ্যেও স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ ঘটিত এবং তাহারা পরম উৎসাহের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। আজ আমাদের গ্রামবাসীদের, মহকুমাবাসীদের ও নাগরিকদের প্রাণে প্রকৃত স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে কখনই জাতি জাগিতে পারিবে না। এ বিষয়ে সুধী ব্যক্তিরা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমার এস্থানে কয়েকজন মুসলমান নেতার ও সরকারী কর্মচারীর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সম্বন্ধে আলাপ হইল।

তাঁহারা বলিলেন,—"ফরিদপুর জেলায় আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে বাস করিতেছি, আমাদের মধ্যে কলহের কোন কারণ ঘটিবে না। শুনিয়া আনন্দ হইল। বিধাতা করুন তাহাই যেন হয়।

এই প্রসঙ্গে ঢাকার কথা একটু বলিতেছি। ঢাকা জেলার লোক আমরা—বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সও ঢাকাতেই অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছি। আমাদের বাল্যকালে হিন্দু-মুসলমানের কোনও কলহের কথা কখনও শুনি নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঢাকার কালেক্টর মিঃ এ এইচ ক্লে (Mr. A. H. Clay) তৎসঙ্কলিত 'Principal Heads of the History and Statistics of Dacca District' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন,—

"Religious quarrels between Hindoos and Mahomedans are of rare occurrence, both classes living together in perfect peace and harmony."
আর আজ ৭০ বৎসরের মধ্যে কত প্রভেদ!

আর একটি কথাও প্রণিধানযোগ্য। Thoronton Gazetteerএ সে সময়ে ঢাকা জেলার হিন্দু ও মুসলমানের ১৮৫৭-১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"The population of the District consists of Hindoos, Mahomedans, and Christians in the following proportions:—

Hindoos 455,182, Mahomedans 449,223, Christians 210."

"It is calculated that the population of the entire district consists of Hindoos and Mahomedans in nearly equal proportions, but in the city latter predominate."

সত্তর বৎসর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার কিরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এইভাবে পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক জেলারই পরিবর্তন ঘটিতেছে বলিয়াই উল্লেখ করিলাম।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় বড় সান্ধিক্ষণে 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' বহিখানি প্রচার করিয়াছেন। বাজিতপুরে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এ সত্যটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিলাম যে, বিরাট হিন্দুজাতি মরিতে চলিয়াছে। সেই মৃত্যুর প্রবল স্রোত কে রোধ করিবে? সে সমস্যার সমাধানের চিন্তা আজ প্রত্যেক হিন্দুর করা কর্তব্য।

যেমন একদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে বাজিতপুরে আসিয়াছিলাম, তেমনি আবার বাজিতপুর ছাড়িলামও প্রথম প্রহরের মধ্যে। অতি প্রত্যুষে আসিয়া মাদারীপুরে চন্দ্রভূষণবাবুর বাড়ি উঠিলাম। তাঁহার বালক পুত্র স্বদেশ তেমনি হাস্যমুখে সাদরে অভিনন্দন জানাইল। চা পান করিয়া মাদারীপুর শহর বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার পূর্ব পরিচিত কেদারবাবু প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নানাজনের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার ছাত্র শ্রীমান্ মনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মণীন্দ্রের সহিত অনেক কথা হইল। এইভাবে বেলা এগারোটা পর্যন্ত ঘুরিয়া বাড়ি আসিলাম। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহিত এখানে অনেককাল পরে দেখা হইল।

তারপর বেলা একটার সময় মাদারীপুর ছাড়িলাম। স্বামী আত্মানন্দজী, জগদীশ, রাজেন্দ্র—সঙ্গীদের সহ কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

মাদারীপুরের বাড়িঘর, চরমুগরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। পথে কেবলি মনে হইতেছিল রবীন্দ্রনাথের অমোঘ বাণী:—

"দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি' দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

নন্দদুলাল

(বড় গল্প)

শ্রীআশীষ গুপ্ত
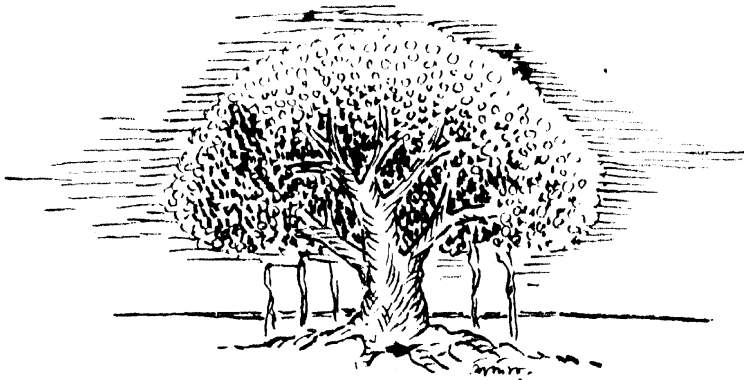
(২)

উৎপলাদের জামসেদপুর যাবার প্রস্তাব উপস্থিত স্থগিত রইল বটে, কিন্তু রেবার শরীর দু একদিনের মধ্যে সারবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। একশ-এক একশ-দুই ডিগ্রী জ্বর তার কয়েকদিন ধরেই চলতে লাগল, বেশ কিছুটা দুর্বলও হয়ে পড়ল সে, অতএব চুপচাপ করে বিছানায় শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া তার আর কোন উপায় রইল না।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন নমিতা, মণ্টু ও উৎপলার সঙ্গে বেড়াতে বেরুতো, কিন্তু যখন রেবার অসুখ চার পাঁচ দিনের মধ্যে সারল না, তখন নমিতা স্থির করল সে বাড়িতে থাকবে রেবাকে সঙ্গদানের জন্যে।

মণ্টু বিকেলে বেরোবার সময় বলে গেল, "বেশী দেরী হবে না রেবা শীগ্‌গিরই ঘুরে আসছি।"

নমিতাকে রেবা বলল, "তুমিও একটু বেড়িয়ে এসো না ঠাকুরঝি, সমস্ত দিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকলে রোগীর তদ্বির করতে গিয়ে নিজেও রোগী হয়ে উঠবে যে—"

নমিতা বলল, "বেশ, আমাকে তুমি এমনইতর স্বার্থপর মনে কর, না? তুমি থাকবে অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে আর আমি মনের আনন্দে বাইরে বাইরে বেড়িয়ে বেড়াব। হুঃ, আমি কি দাদা নাকি!"

একটু থেমে বলল, "আর তুমি না থাকলে বেড়াতে ভালোও লাগে না। দাদা আর বুলিদির সঙ্গে বেড়াতে বেরোলে ওরা দুজনে এমন মগ্ন হয়ে গল্প করে যে, আমায় যে বিশ্রীভাবে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে তা ওদের খেয়ালই থাকে না।"

উত্তর দিল রেবা, একটু যেন ভারী গলায় ব'ল মনে হল "আমার অসুখ হওয়াতে তাহলে ওঁদের দিক থেকে অসুবিধে বিশেষ হয়নি?"

নমিতা হেসে উঠল, "না—"

কিন্তু প্রত্যুত্তরে রেবা হাসল না, কারণ, হাসলে শুনতে পেতাম।

উৎপলা বলল, "বৌদি, এবার বাপু তুমি সেরে ওঠ, এত-দিন ধরে শুয়ে থাকাটা মোটেই ভদ্রতাসঙ্গত হচ্ছে না—"

রেবা বলল, "সেরে উঠবার ইচ্ছেটা আমারও কিছু কম নয় বুলিঠাকুরঝি, আর তাছাড়া ব্যাপারটা আমার পক্ষে লজ্জারও হয়ে দাঁড়িয়েছে,—আমার জন্যে তোমাদের জামসেদ-পুর স্কীম সাফার করছে—"

উৎপলা বলল, "লজ্জার নয় বৌদি, দুঃখের—"

"তোমাদের পক্ষে দুঃখের হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে লজ্জার!—"

"বাজে বোকো না, বুঝলে?" উৎপলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "জামসেদপুর যাওয়ার বিষয়ে মণ্টুদার কত আগ্রহ জান? সে [illegible] কত স্কীম করে—সকালবেলা রিভার্স-সাইটে পিকনিক করবে, দুপুরবেলা ওয়্যার প্রডাক্টসএ যাবে, টাটার কারখানা দেখবে, আর দিন দুয়েক যদি থাকবার বন্দোবস্ত করতে পারে তাহলে চাঁইবাসা যাবে। চায়না-ক্লে মাইনস আছে সেখানে, জামসেদপুর থেকে মোটরে চাঁইবাসা, লাগবে কিন্তু চমৎকার! কত যে আলোচনা করে মণ্টুদা রোজ সকালে বিকেল আমাদের ওখানে বসে! দাদাকে ব'লে, তুমি একটু তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ না! আর আমাকে ত দিনরাত তাড়া দিয়ে অস্থির করে তুলল। কিন্তু জান বৌদি, তোমার ওপর ভারী চটেছে মণ্টুদা এরকম বেরসিকের মত সাইকোলজিক্যাল মোমেণ্টএ অসুখ বাধানর জন্যে!"

শুষ্ক কণ্ঠে রেবা বলল, "উনি বুঝি রোজই দু'বেলা তোমাদের বাড়ি গিয়ে আমার অসুখের জন্য এমনিতর শোক-প্রকাশ করেন, বুঝি ঠাকুরঝি?"

"হাঁ—" বলে' উৎপলা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। "মণ্টুদার সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি বৌদি? কি নিয়ে? রোজ আমাদের ওখানে যাওয়া নিয়ে, না তোমার অসুখের সম্বন্ধে চিন্তা-হীনতা নিয়ে?—কিন্তু এই ক'দিনের জ্বরে তোমাকে ভারী বেরসিক করে' তুলেছে, তাই কথা কইতে ভয় হয়, 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ' হ'তে হবে দেখছি অবশেষে তোমার সম্বন্ধে! —মণ্টুদার এবং আমার পরিহাস সিরিয়াসলি নিয়ো না যেন বৌদি—"

"ওঁর তরফে কোন ওকালতি তোমার না করলেও চলবে বুলিঠাকুরঝি—" তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রেবা।

রেবার প্রথম জ্বরের দিন থেকে ষোল দিন কেটেছে।

আজ দু'দিন ধরে' রেবার জ্বর নেই, এমনিভাবে আরও দিনদুয়েক কাটলে সে অন্নপথ্য করবে স্থির হয়েছে।

নমিতা বলল, "তুমি সেরে উঠলে বাঁচি বৌদি,—এমন করে' ঘরের মধ্যে আর বন্ধ হয়ে থাকতে পারিনে।"

উত্তর দিল রেবা "সুস্থ মানুষের এমন করে ঘরের মধ্যে আটকে থাকলে খারাপ লাগবে না? আমারই যে কি বিশ্রী লাগে!—বলি তোমাকে এত করে যে, বেশিক্ষণ না হয় না বেড়ালে, একটু আধটু এদিক ওদিক ঘুরে এসো, শুনবে না ত সে কথা!"

নমিতা ঈষৎ অপ্রসন্নকণ্ঠে বলল, "তুমি ত বললে বেড়িয়ে এসো, কিন্তু যাই কার সঙ্গে বলত। দাদার সঙ্গে ত বেরু-বার জো নেই, বুলিদি আছে তাকে আগলে,—রাস্তায় বেরোও, দুজনে থাকবে মাইলখানেক আগে আমি থাকব বেটিনিউয়ের ত পিছনে পিছনে, আর না হয় আমাকে এগিয়ে দিয়ে দুজনে এমন করে পিছোতে সুরু করবে যে এতবড় সম্মানে মন-মেজাজ ঠিক রাখাই উঠবে দায় হয়ে! তুমি ভালো হয়ে না উঠলে ওদের সঙ্গে আর আমার বেড়ানো হবে না বাপু, একটা

কথা কইবার লোক নেই, কেবল মুখ বুজে প্রকৃতির শোভা দেখ!"

হঠাৎ কি ভেবে নমিতা হেসে উঠল, "কি হয়েছে যে দাদার আর বুলিদির,—বুলিদিদের বাড়িতে গেলেও দেখি দুজনে বারান্দার এককোণে দুখানা ক্যাম্প চেয়ার টেনে নিয়ে একেবারে মগ্ন হয়ে গল্প করছে! পৃথিবীতে যে আর কারও অস্তিত্ব আছে তাও যেন ওদের মনে থাকে না!—দাদা আর বুলিদি ইলোপ না করলে বাঁচি!"

শুষ্ক হাসি হেসে ওঠে রেবা, "সে কিন্তু মন্দ হবে না! চেঞ্জে এসে এমনতর লীলাখেলা, ওঃ জাস্ট ফর এ চেঞ্জ!"

"কিন্তু বৌদি, ঠাট্টা থাক। তুমি সেরে উঠলে একদিন তবু একটু জামসেদপুর ঘুরে আসতে পারি, বন্দোবস্ত ত সব হয়েই রয়েছে, মনটা উসখুস করছে কোথাও একটু যাবার জন্যে।"

বিবর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল রেবা, "আমি কিন্তু জামসেদপুরের বিষয়ে মোটেই উৎসাহ পাচ্ছিনে, তোমরাই না হয় একদিন ঘুরে এসো, আমি মার কাছে থাকবখন—"

"বাঃ-রে, ওসব চালাকী চলবে না, তোমার জন্যে বলে এত-দিন জামসেদপুরে যাওয়া বন্ধ রয়েছে, আর তাছাড়া বললাম কি তাহলে ছাই এতক্ষণ ধরে? তুমি না গেলে আমি যাব নাকি!"

পাঁচ দিন পরে।

রেবা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। মণ্টু ও উৎপলা স্থির করেছে আগামী রবিবার দিন জামসেদপুর যাবে,—ওবাড়ি থেকে যাবে উৎপলা, উৎপলার ছোট বোন ঊষসী আর ওদের ছোট ভাই সুভাষ এবং এবাড়ি থেকে যাবে মণ্টু, রেবা ও নমিতা। কিন্তু রেবা এ প্রস্তাবে রাজী হল না, বলল, "আমার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। আমি যাব না।"

মণ্টু রেবাকে বোঝাতে লাগল, শরীর তার ঠিক হয়ে গিয়েছে, এমনতর প্রমোদ ভ্রমণে বরং দেহমন প্রফুল্ল হবে এবং শেষ অবধি স্বাস্থ্যের পক্ষে তাতে উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, রেবার আপত্তির কারণ শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে ঢের বেশী গভীর ও গুরুতর বলে মনে হল। মণ্টু লোভ দেখাতে লাগল, "টাটার কারখানা দেখতে যাব, ওয়্যার প্রডাক্টসএ যাব, চাঁইবাসা যাব মোটরে, খাসমহলে নূতন কলোনি হচ্ছে, ক্রমশ ভারী চমৎকার হয়ে উঠছে সেদিকটা, যাব সেখানে বেড়াতে, সুবর্ণরেখা আর খড়কাই নদীর ধারে পিকনিকের বন্দোবস্ত করব, দুদিন না হয় থাকাই যাবে জামসেদপুরে। বুলিদের আত্মীয় আছে জামসেদপুরে, কিছু অসুবিধে হবে না—"

এত সব প্রলোভনের উত্তরেও রেবা কিন্তু কথা কইল না।—আমার মনে হল যেন সে বুনো ভালুকের মত কঠিন-ভাবে ঘাড় হেঁট করে আছে।

মণ্টু বিরক্ত হয়ে উঠল, "থাক তাহলে, দরকার নেই আর কোথাও গিয়ে। পলকে আজ বলে দেবখন যে যাওয়া হবে না—"

রেবা এইবার কথা কইল, সুরটা মনে হল ভারী বাঁকা বলে, "উৎপলকে 'পল' বলে ডাকছ কবে থেকে?"

প্রশ্ন শুনে মণ্টু যেন ভয় পেয়ে গেল। অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে প্রতিপ্রশ্ন করল, "তার মানে?"

"কিছু না,"—রেবা সহজ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল, "কিন্তু আমি গেলেই ত তোমাদের নানা রকম অসুবিধে, তোমার পলের"—

শেষাংশের বিদ্রূপের সুর শান্ত কণ্ঠের ভাণকরে চাপা গেল না। শিশুর হাতের বেলুন আলপিনের খোঁচা খেয়ে ফাটল যেন শব্দ ক'রে। ক্রুদ্ধ নিম্নকণ্ঠে মণ্টু যেন গর্জন করে উঠল, শুদ্ধ ভাষায় প্রশ্ন করল, 'অর্থাৎ?'

"অর্থাৎ আমি কচি খুকী নই, সব বুঝি"—উত্তেজনায় বেপথুমান কণ্ঠে উত্তর দিল রেবা।

শুনে মণ্টু যেন বিহ্বল হয়ে গেল,—প্রথমটা যেন ক্রোধে তার মুখে ভাষা জোগাল না, তারপর চীৎকার করে সে বলল, "তুমি একটা ইতর নীচ স্ত্রীলোক—তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী উদারতা আশা করা অন্যায়—"

নিজের ব্যবহারে একটুও লজ্জিত হল না রেবা, স্বামীর এমনতর উত্তেজনায় ভয় পেল না একটুও, শ্লেষমন্থর কণ্ঠে শুধু বলল, "আমার সম্বন্ধে এ সত্যোপলব্ধিটা কতদিন ধরে হয়েছে? উৎপলা যেদিন থেকে 'পল' হয়েছে সেদিন থেকে নাকি?"

মণ্টু যে কি বলবে তা যেন ভেবে পেল না, সহসা বোধ হয় তার মনে হল যে এই দুরন্ত সংগ্রামে আত্মরক্ষার চেয়ে প্রতি-আক্রমণ প্রশস্ততর কৌশল বলে প্রমাণিত হবে। একটু ইতস্তত করে বিদ্রূপের সুরে সে বলল, "তোমার সুধীরদা এসেছেন মৌভাণ্ডারে এঞ্জিনীয়ার হয়ে!—তোমার দাদার বন্ধু সুধীরদা, সেই দেবদূত, যাঁর নামে তোমার জিবে জল আসে। খবর পাওনি এখনও? দেখা করতে আসেন নি তিনি?—তুমি যাবে না একদিন 'আই সি সি'তে?"

কিন্তু আক্রমণ ব্যর্থ হল, ট্যাঙ্কের পরে গুলতির খোলাম-কুচি পড়ল যেন। অতিশয় শান্ত কণ্ঠে রেবা বলল, এত বেশী শান্ত কণ্ঠে যে অভিনয় বলে মনে হল যেন, "হাঁ খবর পেয়েছি, —রবিবার দিন যাব মৌভাণ্ডারে সুধীরদার সঙ্গে দেখা করতে।—কিন্তু তোমার ও মুখে আর তাঁর নাম কোরো না, বিয়ের আগে তুমি 'সমাজের' বহু মেয়ের পিছনে পিছনে ঘুরে বারংবার জিলটেড হয়েছ তা আমি জানি,—কিন্তু স্ত্রী পনেরো দিন অসুখে পড়ে থাকলে যে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার জন্য ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াবে এটা তোমার পক্ষেও মাত্রাধিক্য,—এমনতর একটা ওয়ার্থলেস গ্যাড অ্যাবাউটের মুখে সুধীরদার নাম শোভা পায় না"—

মণ্টু যেন এবার ক্ষেপে গেল, "তোমার মতন একটা ফ্লার্ট মেয়ে আমাদের সমাজে আর আছে নাকি?—বিয়ের আগের তোমার কো-এডুকেশনের রঙিন ইতিহাস আমারও জানা আছে। আমি মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি জিলটেড হয়েছি! মিথ্যেবাদী ইতর কোথাকার-[illegible] [illegible]লার

সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক, আর তোমার সঙ্গে তোমার সুধীরদার সম্পর্ক ধর্মচর্চার, না?"

রেবা যেন শিউরে উঠল, "সুধীরদা! মাগো!" যূপ-কাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত ছাগশিশুর আর্তনাদের সে কণ্ঠস্বর।

সুপ্রিয়, আমার আজকের মানসিক অবস্থা আমি তোমাকে যথাযথ বোঝাতে পারব না,—মণ্টু-রেবার জন্য আমার অন্তর আজ ক্ষুব্ধ, পীড়িত,—এদের জন্য আজ আমার নিরবচ্ছিন্ন বেদনা। কিন্তু তোমার ধর্মাধিকরণে আমি শুধু সাক্ষ্যদানের আহ্বান পেয়েছি, সত্য শপথের দুশ্ছেদ্য নাগপাশে আমি আবদ্ধ, সত্যের পথ যদি পরম দুঃখের পথ হয় তাহ'লেও তার থেকে একচুল এদিক ওদিক কর্‌বার আমার উপায় নেই। তোমাকে যে সত্য কাহিনীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পালন করতে আমি বাধ্য, কিন্তু চিত্ত আমার বেদনাবিবশ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু যা বলছিলাম। মণ্টু বলল, তীক্ষ্ণ নির্মম বঙ্কিম সে কণ্ঠস্বর, "রবিবার জামসেদপুর যাবার সুবিধে কেন হবে না তা আমি বুঝেছি। সুধীরদার সঙ্গে সব বন্দোবস্ত পূর্বেই হয়ে গিয়েছে!"

রেবার কানে একথা ঠিক প্রবেশ করল কি না বোঝা গেল না, সে শুধু হতবুদ্ধির ন্যায় দু'তিনবার বলল, "সুধীরদা? অ্যাঁ সুধীরদা? উঃ মাগো!"

মণ্টু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল, কুৎসিত কর্দমনিক্ষেপের পর কুৎসিততর নীরবতা, একটা অসংগত কিছু সঙ্ঘটিত হবার অস্বস্তিকর সম্ভাবনায় পূর্ণ!—মনে হল যেন মাটিতে একটা সূঁচ পড়লেও চমকে উঠ্‌ব!

রবিবার দিন মণ্টু ও উৎপলা যেন অনেকটা জেদ করেই জামসেদপুর বেড়াতে গেল। উষসী, সুভাষ ও নমিতা গেল সঙ্গে। নমিতা যেতে চায়নি কিছুতে রেবাকে ফেলে, কিন্তু মণ্টু তাকে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল। মণ্টুর মা বাবা রেবাকে যাবার জন্যে বলেছিলেন, কিন্তু রেবা চূড়ান্তভাবেই রাজী হল না। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের অজুহাত একটা চমৎকার অজুহাত। অতএব মণ্টুর মা বাবা আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। যাবার পূর্বে উৎপলা এসেছিল এবাড়িতে, কিন্তু নমিতার সঙ্গে কথা কয়েই সে চলে গেল রেবাকে একটা সম্বোধন পর্যন্ত না করে! ঠিক হ'ল উৎপলারা রাত্রি ন'টা নাগাত ফিরে আস্‌বে। সকালে যাওয়ার এবং রাত্রিতে ফেরার সুবিধেমত ট্রেন নেই বলে তারা মোটরে গেল এবং মোটরেই ফিরবে স্থির করল। মোটরের রাস্তা খুব ভাল নয়, কিন্তু এক দিনেই ফিরতে হবে বলে এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত সম্ভব হল না।

মণ্টুরা চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে রেবা বলল শাশুড়ীকে, "মা, উনি বলছিলেন সুধীরদা মৌভাণ্ডারে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনে এঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছেন। সুধীরদা আমার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু—"

মণ্টুর মা বললেন, "নাম শুনেছি সুধীরের। তোমাদের সঙ্গে ওদের ত একরকম আত্মীয়তাই। সেবার গিরিডিতে পরিচয় হয়েছিল ওর মা বাবার সঙ্গে, সুধীর তখন বিলেতে, বড় ভাল লোক সুধীরের বাপ মা—"

"সুধীরদাও বড় ভাল ছেলে মা, আপনি খুসী হবেন। জানেন না বোধ হয় আমি এখানে আছি, আজ একটা খবর দিতে চাই সুধীরদাকে বিকেলে একবার আস্‌বার জন্যে। পাঠাব মা শ্যামাকে একখানা চিঠি দিয়ে?"

মণ্টুর মা বললেন, "সে ত ভাল কথাই, পাঠাও না—"

ওদের বাড়ির চাকর শ্যামলাল চিঠি নিয়ে চলে গেল।

বিকেলবেলা একটা স্ট্যাণ্ডার্ড লিটল নাইন গাড়ি হাঁকিয়ে সুধীর এসে উপস্থিত হল। মণ্টুর মা বাবার সঙ্গে অনেক কথা হল, বিলেতের কথা, সুধীরের মা বাবার কথা, ভাইবোনদের কথা, তাদের ঘর-সংসারের কথা, সুধীরের নিজের বিয়ের আপাত সম্ভাবনা আছে কি না সেকথা। মনে হল মণ্টুর মা বাবা সুধীরের সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত খুশী হয়ে গিয়েছেন।

রেবা বলল, "মা, বাড়িতে বসে বসে আর ভাল লাগছে না, চলুন না সুধীরদার গাড়িতে সবাই মিলে একটু ঘুরে আসি—"

প্রস্তাব শুনে সুধীর অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করল এবং তার গাড়িতে করে একটুখানি বেড়িয়ে আসবার জন্যে মণ্টুর বাবাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল।

মণ্টুর মা বাবা রাজী হলেন।

ওরা সকলে মিলে সুধীরের গাড়িতে বেড়াতে বার হলেন এবং ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে এলেন। চা এবং খাবার খেয়ে এবং আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে সুধীর চলে গেল।

সে চলে যেতেই মণ্টুর মা বললেন, "চমৎকার ছেলে! নমিকে যদি ওর হাতে দিতে পার্‌তাম! বৌমা একটু ভাল করে চেষ্টা করে দেখ ত—"

রাত্রি ন'টার সময় মণ্টু ও নমিতা বাড়ি ফিরে এল,—উৎপলাদের বাড়িতে উৎপলা, উষসী ও সুভাষকে আগেই পৌঁছে দিয়ে এসেছে। নমিতা প্রথমে এসেই রেবার ঘরে ঢুকল, দেখল রেবা চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছে... ন প্রগাঢ়

করল, "বৌদি শুয়ে আছ যে বড়? শরীর ... আছে। কারণ সে

"হাঁ—" উত্তর দিল রেবা, "বেড়া... হিসাবে কিংবা প্রধান

অবসন্ন কণ্ঠে শ্লেষের সুরে ... বক্তৃতা করিতেছে। একদল

আমাদের সঙ্গে যাওনি ভালই ...নাকি অর্থনীতিতে পণ্ডিত।

"কেন?"

"গেলে আমার মত ... ম্যানেজার ঝুনঝুনওয়ালা বলিয়া-

রইলেন আমাদের এড়ি না কেন রাজেনবাবু, বাঙালী ভারি

ভোগান্তির একশেষ!

টেনে নিয়ে যাওয়া!" শ্রোতার অভাবে রাজেন্দ্র মোটেই

বারান্দায় মণ্টুর বহুক্ষণ যাবৎ সে শ্রমিক আন্দোলনের

খুব উৎসাহসহকারে জাতির শোচনীয় অধঃপতন লইয়া

সুধীরের মত ছেলে ...ছিল। ছগনলালবাবু বাঙলী জাতিকে

বিকেলবেলা আজ ... চটিয়া উঠিল এবং টেবিল চাপড়াইয়া

পাঠিয়েছিলেন বৌমা ...mn your intelligentia. পেটে নেই

৩

ভাত, পরনে নেই কাপড়—কেবল বড় বড় কথা। বংশপরম্পরায় খেতে না পেয়ে এ জাত গেল। আগে ছিল ম্যানেজারবাবু, এখন সব বকে যাচ্ছে। এই ধরুণ, এখানে এতদিন ধরে মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভারতের সুদূর কোণ হতে কত লোক এসে পয়সা লুটে নিয়ে যাচ্ছে আর বাঙালী যুবকরা বলছে খেতে পাচ্ছিনে।

বহু শিক্ষিত বাঙালী এখন কলে কাজ করছে।

এদের ওপর ধারণা আমার ভাল নেই। এরা কাজ করে, কাজ শিখে উন্নতি করতে চায় না, প্রথম হতেই চায় চেয়ারে বসে কলম নিতে। Hopeless! এদের কাজ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে,—they are quite unfit for any labour.

রাজেন্দ্রের বক্তৃতা করবার স্পৃহাটা যখন অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল, তখন স্পিনিং বিভাগ হইতে সংবাদ আসিল যে, একটা কুলী বেল্টে জড়াইয়া গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

রাজেন্দ্রের বক্তৃতা করা আর হইয়া উঠিল না। তাড়াতাড়ি স্পিনিং বিভাগে ছুটিয়া গেল।

ট্রেড ইউনিয়ন সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে মিল কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন। প্রথম যুগের ন্যায় যদিও এখন দুর্ঘটনা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা হয় না, কিন্তু বর্তমানে দুর্ঘটনার গুরুত্বকে নূতন রূপ দেওয়া হইয়া থাকে।

জগতধাত্রী মিলের ভয় শুধু ট্রেড ইউনিয়নকে নয়, লোকনাথবাবুকেও। লোকনাথবাবুর বিশ্বাস, পরিচালনার ত্রুটির জন্যই সাধারণত দুর্ঘটনা ও শ্রমিক গোলযোগ হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র লোকনাথবাবুর ধারণা পরিবর্তন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সক্ষম হয় নাই। মিলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে লোকনাথবাবু রাজেন্দ্র এবং মিঃ ঝুনঝুনওয়ালাকে অভিযোগ করিয়া বলেন, যতটুকু সতর্ক হবার প্রয়োজন ছিল, তা নিশ্চয় হননি—হয়ত লোকটি অভাবের তাড়নায় কিংবা শারীরিক দৌর্বল্যের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। আপনাদের কাজ শুধু লাভ বৃদ্ধির চেষ্টা করা নয়—ওদের ভাল-মন্দ, অসুখ-বিসুখ, রোগ-শোকও দেখা।......

লোকনাথবাবু কোন যুক্তি মানেন না, তাই তাহারা দুর্ঘটনা ও মজদুর বিক্ষোভের কথা সর্বদা চাপা দিতে চেষ্টা করে।

আজিকার দুর্ঘটনা মারাত্মক হয় নাই। স্পিনিং কক্ষের বড় বেল্টটার পার্শ্বে লোকটি কাজ করিতেছিল। অসতর্ক মুহূর্তে বেল্টে কাপড় জড়াইয়া যায়। বেল্টে দেহটি জড়ায় নাই বলিয়া লোকটি বাঁচিয়া গিয়াছে। চাকার নিকটস্থ একটি থামে আটকাইয়া যায় এবং কোমর হইতে কাপড়টি খুলিয়া যাওয়ায় লোকটি নীচে পড়িয়া যায়। একটি পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং শরীরের অন্যান্য কয়েক স্থানেও আঘাত লাগিয়াছে। সময় মত চিকিৎসা হওয়ায় লোকটির জ্ঞান ফিরিতে বেশী দেরী হয় নাই। লোকটি যদি কাপড় খুলিয়া পড়িয়া না যাইত, তবে তাহার অস্তিত্ব পাওয়া যাইত না। জীবন্ত মানুষটি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কতকগুলি রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হইত।

রাজেন্দ্র ঘটনাটি চাপা দিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু চাপা রহিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের নিকট সংবাদ গিয়াছে এবং তদন্তের জন্য তাহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। এত তাড়াতাড়ি যে বাহিরে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবে, তাহা রাজেন্দ্র ভাবিতে পারে নাই। সংবাদটি যাহাতে এখন চাপা থাকে, সেজন্য সে যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিল।

রাজেন্দ্র খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করিতেছিল, বিশ্রাম করা আর হইল না, পুলিশ আসিয়াছে শুনিয়া মিলে আবার ছুটিয়া গেল।

পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করিয়া চলিয়া গেল। তদন্ত করিবার বিশেষ কিছু ছিল না। রাজেন্দ্র ও ডাঃ চ্যাটার্জি বিবৃতি দিয়াছেন মাত্র।

পুলিশ চলিয়া গেলে রাজেন্দ্র যেন ফাটিয়া পড়িল। টেবিল চাপড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ভজুয়া, অজহর আমি জানতে চাই, কে পুলিশকে এবং ট্রেড ইউনিয়নকে এ 'এক্সিডেন্টের' খবর দিয়েছে?

ভজুয়া বলিল, বহুৎ আদমী ত' মজদুর সভাকা মেম্বর আছে।

রাজেন্দ্র বলিল, মজদুর সভা করাচ্ছি। অজহর, সভার লোকদের বল গিয়ে এখন দেখা হবে না।

অজহর চলিয়া গেল।

ছগনলাল বলিলেন, রাজেনবাবু, বড়বাবুকে একটা সংবাদ দেওয়া উচিৎ আছে না, পরে দোষী না হবে।

প্রয়োজন নেই। উনি বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে মেতে আছেন, সকল দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সামান্য ব্যাপার নিয়ে ওঁকে উদ্বিগ্ন করতে চাইনে।

ছগনলাল বলিলেন, ও বাৎ ঠিক আছে। তবে বুঝিছেন কি রাজেনবাবু ইউনিয়ন না আবার মামলা করে।

অসম্ভব নয়, ওরা ওৎ পেতে বসে থাকে। আমার ওপর যেন ওদের জাতক্রোধ বেশি। তবে আমি এ সব গ্রাহ্য করিনে। ছ' মাসের মধ্যে আমি সকলকে ছাড়াব, মজদুর সভার একটি লোকও এখানে থাকতে পারবে না।

বড়বাবু রাগ করিতে পারেন।

খামাকা রাগ করলে চলবে কেন। মিলকে বাঁচাতে হবে ত'। সামান্য কুলীরা চোখ রাঙ্গাবে আর আমাদের তাই সইতে হবে—অসম্ভব, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা। একসঙ্গে তাড়াব না, ধীরে ধীরে তাড়াব, তাতে ওরা জোট করে ধর্মঘট করতেও পারবে না, বড়বাবুও খবর পাবেন না।

এ ভাল policy আছে।

আমি কবে সব ঠিক ক'রে ফেলতুম, শুধু মঞ্জুশ্রীর জন্যে পারিনি। I know how to tackle the coolies.

অজহর আসিয়া সংবাদ দিল যে, সঞ্জিত লাহিড়ী

কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিতেছে।

রাজেন্দ্র ক্ষেপিয়া গেল, ভজুয়াকে বলিল, ধরে নিয়ে আয়।

ছগনলাল বাধা দিয়া বলিলেন, সে ভাল হবে না। শিক্ষিত ভদ্রলোক আছে, গোলমাল হবে।

রাজেন্দ্র বলিল, সঞ্জিতই বোধ হয় gang leader. আজই আমি বরখাস্ত করব। অজহর, সঞ্জিত লাহিড়ীকে খবর দিয়ে আয়। শোন্, সঙ্গে করেই নিয়ে আসবি।

অজহর চলিয়া গেল।

রাজেন্দ্র বলিল, পেটে ভাত পড়লেই যত বদমায়েসী বুদ্ধি আসে। —স্ত্রী-পুত্র নিয়ে খেতে পাচ্ছিল না, বড়-বাবুকে হাতে পায়ে ধরে কাজ পায়; তখনই আমি বলেছিলুম, শিক্ষিত লোক ঢোকাবেন না।

সঞ্জিত আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল!

রাজেন্দ্র নিঃশব্দে খানিকক্ষণ সিগারেট টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, What's your name?

সঞ্জিতকুমার লাহিড়ী।

তুমি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য।

তুমি বলিয়া সম্বোধন করায় সঞ্জিত কোন উত্তর করিল না।

রাজেন্দ্র ধমকের সুরে বলিল, জবাব দাও! গোপন করে কোন লাভ নেই। তুমি ভেবো না যে তুমি সবচেয়ে বেশি চালাক। তোমার শয়তানি সব আমি জানি। You're a fifth columnist, মিলের সকল খবর তুমিই প্রকাশ করে দাও। You're an organiser of the union and you get 'দালালী' for recruitment.

অপমানে, ক্রোধে সঞ্জিতের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু কোনভাবে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, আমরা মিলের কর্মচারী হতে পারি কিন্তু আমাদেরও মর্মস্থান আছে, সেখানে মালিক মজুরে ভেদ নেই। সেখানে যদি আঘাত লাগে—

What! nonsense. ভজুয়া একে ঘর থেকে বের করে দে!

সঞ্জিত ভজুয়ার দিকে মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, খোট্টা হতে পারে কিন্তু জোরে পারবে না, বের করে আর দিতে হবে না, ভদ্রলোকের পক্ষে বলাটাই যথেষ্ট! ভজুয়া আজ তার একজন সহকর্মীর এত বড় অপমানে কোনই গ্লানি বোধ করিল না, নিজে কুলী হয়ে অপর কুলীকে গলাধাক্কা দিতে এল, কিন্তু একদিন এরাও জাগবে এবং তখন আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যে এক কুলী অপর কুলীকে জবাই করবে না।

রাজেন্দ্র টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, Get out rascal, আমি তোমাকে dismiss করলুম।

অকস্মাৎ মঞ্জুশ্রী আসিয়া পড়ায় সকলেই একটু চমকিয়া উঠিল। মঞ্জুশ্রী পূর্বেই মিলে আসিয়াছে কিন্তু রাজেন্দ্র কিংবা ছগনলাল সে সংবাদ পান নাই। গোলমাল শুনিয়া মঞ্জুশ্রী ভিতরে প্রবেশ করে নাই, দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল।

মঞ্জুশ্রীকে দেখিয়া ছগনলাল তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, এসো মা, তুমি কখন এলে?

এই ত' খানিকক্ষণ হল। আপনি বসুন কাকাবাবু।

রাজেন্দ্রের ইঙ্গিতে ভজুয়া ও অজহর চলিয়া গেল, কিন্তু সঞ্জিত গেল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজেন্দ্র ক্রোধ দমন করিয়া সঞ্জিতকে বলিল, যাও!

মঞ্জুশ্রী চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিল, সঞ্জিতবাবু, আপনি একটু বাইরে অপেক্ষা করুন, দরকার আছে, যাবেন না যেন।

সঞ্জিত মুহূর্তের জন্য মঞ্জুশ্রীর মুখের দিকে চাহিল। পুঞ্জীভূত বেদনা, গ্লানি ও ক্রোধ যেন মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। অদ্ভুৎ—অদ্ভুৎ ওই চাউনি, ওই কন্ঠস্বর। সঞ্জিত বিমুগ্ধ অন্তরে ধীরে ধীরে মাথা নত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাজেন্দ্র চেয়ারটা একটু নাড়িয়া বসিয়া যথাসম্ভব উদ্ধত কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল, একটি সাধারণ কুলীকে তুমি বাবু বলে সম্বোধন করলে—আপনি বললে! He's your employee. তোমার এ আচরণ আপত্তিকর, আমাদেরও অসম্মান হয়।

মঞ্জুশ্রী স্বভাবতই কোমল প্রকৃতির, কখনও কাহাকেও রূক্ষ্ম কথা কহিতে পারে না। এত বড় মিলের ভবিষ্যৎ মালিক হওয়া সত্বেও কখনও নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে নাই। মিল পরিচালনার অনেক দুর্নাম তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে; অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে কিন্তু রাজেন্দ্রের ঔদ্ধত্য, অনমনীয় ব্যবহারে সে শত ইচ্ছা সত্বেও কোন প্রতিকার করিতে পারে না। নারীর এই স্বাভাবিক দৌর্বল্য তাহাকে পীড়া দেয় কিন্তু কোন প্রতিকার খুঁজিয়া পায় না। সঙ্ঘর্ষকে তাহার এড়াইয়া চলিতে হয়—মানবতার ইহাই বড় পরাজয় ও কলঙ্ক।

মঞ্জুশ্রী অতি সহজভাবে বলিল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন রাজেনবাবু যে সঞ্জিতবাবু আর এ মিলের কর্মচারী নয়, খানিকক্ষণ পূর্বে আপনি নিজেই ওকে কর্মচ্যুত করেছেন। শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার সম্মান না দিতে পারলে আমাদেরই কলঙ্ক।

এমনি করলে মিল আর চালাতে হবে না। ছোট লোকদের সঙ্গে ত' কখনও মেশনি, যত ভাল ব্যবহার করবে ততই ওরা মাথায় চড়ে বসবে।

সত্য সত্যই যদি ভাল ব্যবহার করা যায় তবে কখনই ঠকতে হয় না। সে কথা যাক্,

রাজেন্দ্র চটিয়া উঠিয়া বলিল, ভাল ব্যবহার! What do you mean by this? তুমি কি বলতে চাও আমি দুর্ব্যবহার করি।

সে প্রশ্ন এখানে উঠছে না। আমি শুধু অনুরোধই করছি। আপনাদের মুখের কথার উপর বহু পরিবারের

অন্ন নির্ভর করে। এ দুর্দিনে বেকার বসা কি ভয়ঙ্কর কথা ভাবুন ত'!

এ সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে কাজ করা চলে না মঞ্জুশ্রী। কাজ কাজই, no work, no pay. যারা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সম্মানহানি করবে এবং discipline ভঙ্গ করবে তাদের আমি ক্ষমা করতে পারিনে। I request you not to interfere in my works.

আপনি অযথা অবিচার করছেন। আমি শুধু গরীবদের প্রতি একটু সদয় হবার জন্যে অনুরোধ করছি।

I don't want any advice. ভালমন্দ বিচার করবার আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

অপরাপর দিন মঞ্জুশ্রী রাজেন্দ্রের দুর্বিনীত ও উদ্ধত জেদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ পারিল না, অপমানে তাহার চিত্ত দৃঢ় হইল, সহজ ও নম্র অথচ সুতীক্ষ্ম সতেজ কণ্ঠে বলিল, প্রয়োজন হলে gratis advice শুনতে হবে বৈ কি!

রাজেন্দ্র টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, What? Do you think me a puppet in your hand?

একটা সামান্য বিষয় নিয়ে এত হৈ চৈ করছেন কেন— আস্তে বলুন, লোকগুলিই বা ভাববে কি!

রাজেন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিল, আস্তে বলব কার ভয়ে! আমি অনেক সয়েছি, কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে।

চীৎকার করলেই যুক্তি হয় না, অপরের ওপর দোষ দেওয়া যায় না।

ছগনলালবাবু রাজেন্দ্রকে শান্ত করিতে কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। রাজেন্দ্র হঠাৎ চটিয়া যায় এবং চটিয়া গেলে সে সহজে শান্ত হয় না, কখনও হার মানে না। কাজেই ছগনলালবাবু রাজেন্দ্রকে শান্ত করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া মঞ্জুশ্রীকে বলিলেন, ক্ষান্ত দাও মা। তোমায় ত' কখন্ উত্তেজিত হতে দেখি না, এমন কি ভাল আছে, বেয়ারা টেয়ারা কি মনে করিবে।

মঞ্জুশ্রী সত্য সত্যই লজ্জিত হইয়া পড়িল। একটু অনুতপ্ত স্বরে বলিল, একটা সাধারণ ব্যাপার যে এমন দাঁড়াতে পারে তা' আমি ভাবতে পারিনি কাকাবাবু।

রাজেন্দ্র বলিল, Your the very tone is objectionable. তোমার কথার ধরণে মনে হয়, যেন আমি ইচ্ছে করে ঝগড়া করি! You've lowered my position to the coolies.

মিথ্যে কথা!

না মিথ্যে নয়, আমার হাতে definite প্রমাণ আছে। বস্তিতে বস্তিতে লোক পাঠিয়ে তুমি খবর নাও, এর মানে?

যারা আমাদের মিলে কাজ করে' প্রতিপালিত হচ্ছে, আমাদের কোয়ার্টার্সে বাস করছে, তাদের দুঃখদুর্দশা নিয়ে যদি অহরহ সভাসমিতিতে, কাগজে আলোচনা হয় তবে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়া অপরাধ নয় রাজেনবাবু।

আলবৎ অপরাধ। এর সহজ অর্থ হচ্ছে তুমি আমায় বিশ্বাস কর না, তোমার ধারণা হয়েছে, আমি কুলীদের ওপর অত্যাচার করি, অবিচার করি। যাহোক, আমি তোমার সঙ্গে এ সম্পর্কে তর্ক করতে চাইনে, I request you not to interfere in my work. মনিবী চাল আমি সহ্য করব না।

রাজেন্দ্র উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া সদর্পে বাহির হইয়া গেল।

রাজেন্দ্রের ব্যবহারে ছগনলালবাবু লজ্জায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মঞ্জুশ্রীকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, কিছু মনে ক'র না মা, রাজেনবাবু এমনি লোক ভাল আছে, তবে মাঝে মাঝে একটু ক্ষেপে যান।

কিন্তু রাগেরও একটা সীমা আছে। তিনি গোঁয়ারতুমি করলে আমিই বা কেন মানতে যাব।

মিলেমিশে ত' কাজ করতে হবে। দু'জনই রাগ করিলে চলিবে কেন।

নাই বা চলল।

সে কি কথা আছে, তা হোবে কেন, তোমাদের যে বিয়ে হোবে।

বিয়ে হবে বলে উনি যা খুশী করবেন তাই আমাদের মানতে হবে এমন কোন কথা নেই কাকাবাবু। কৃত্রিম দুর্বলতা ও চক্ষুলজ্জায় বরাবর অন্যায়কে এড়ান যায় না। মিলে কি হচ্ছে না হচ্ছে সকল খবরই আমি রাখি। বাবা বরাবরই বলেন, মিলের লাভ তিনি চান না, লাভ থেকে যেন শ্রমিকদের সাহায্য করা হয়। বাবার এত বড় আদর্শের এই পরিণাম!

তা' অবশ্য কথা বটে, কিন্তু রাজেনবাবু—

মিথ্যে আপনি রাজেনবাবুকে সমর্থন করছেন। আপনি ত' জানেন, আমার কোন অনুরোধই রাজেনবাবু রাখেন নি। যত জনকে আমি চাকরি দিয়েছি রাজেনবাবু কোন না কোন ছুতোয় তাদের তাড়িয়েছেন। যাদের আমি একটু সাহায্য করি, তাদেরই তিনি আমার চর মনে করে পীড়ন করেন। তবু আমি কোনদিনই কোন জোর করিনি। অনুরোধ ভিন্ন কোনদিন কোন জোর খাটিয়েছি? অথচ উনি বরাবর আমায় অপদস্থ করেছেন।

তোমরা মাতৃজাতি, তোমরা ক্ষমা না করিলে, তোমরা সয়ে না গেলে সংসার যে চলিবে না মা। বড়বাবু জানিলে আমায় মন্দ বলিবেন।

না কাকাবাবু, এ আর চলবে না।

কি চলবে না—ঝগড়া হোবে যে, তা কি ভাল হোবে।

উপায় নেই, রাজেনবাবুর স্বেচ্ছাচার বন্ধ করতেই হবে। বাবার কুখ্যাতি আমি হতে দেব না আর গরীবদের অত্যাচার পীড়নে আমি চুপ করে থাকতে পারব না। ঝগড়াঝাঁটি যদি হয় তবে হোক, আমি আজ থেকে বাবার প্রতিনিধিস্বরূপ সকল কাজ দেখাশোনা করব।

ছগনলালবাবু কোন কথা কহিবার পূর্বে মঞ্জুশ্রী বেল

(শেষাংশ ৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গল্পসল্প *

গল্পের রাজত্ব আর বাস্তবের রাজত্ব আলাদা। যে রাজত্বে রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশ পার হয়ে রাজকন্যার খোঁজ করতে যায়, তা' এই পৃথিবীর দেশ নয়, কবির কল্পলোকের রাজত্ব। বাস্তব জগতের বাঁধাধরা নিয়ম যদি সেখানে না চলে, তাতে আপত্তি করলেই আপত্তির কারণ ঘটবে।

মানুষ সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে অনেক দূর পার হয়ে এসেছে। তার রুচি আপাতদৃষ্টিতে গেছে অনেকটা বদলে। কিন্তু তার বাইরের ছদ্মগাম্ভীর্যের আবরণ খুলে ফেল্‌লেই দেখা যাবে, তার মধ্যে রয়েছে চিরন্তন শিশু, যে গল্প শোনার খাতিরে নানারকম অসম্ভব উদ্ভট কল্পনা অক্লেশে স্বীকার করে নেবে। এই মানুষদের জন্যই লিয়ার তাঁর "গ্রম্বুলিয়ান প্লেইনের" গল্প লিখেছিলেন, আর লিউইস্ ক্যারল লিখেছিলেন "অ্যালিস্ ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড।"

রবীন্দ্রনাথের "গল্পসল্প" অবশ্য ঠিক এ ধরণের জিনিস নয়। এতে যাদের কথা আছে তারা মোটামুটি পৃথিবীরই মানুষ, শুধু কবির চোখে ধরা পড়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অতিরঞ্জন। তাবলে কোনো ব্যক্তিবিশেষের পরে কটাক্ষ এতে নেই, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে তা থাকেও না।

এ বই-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর ভাষা। বাঙলা ভাষা যে স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের এই রচনা পড়লে। হীরে যখন খনির ভিতর থেকে বের করে আনা হয় তখন তা থাকে মলিন পাথরের নুড়ি। দক্ষ শিল্পী তাই ঘষেমেজে কেটেকুটে তার ভিতরের রূপ যখন বাইরে নিয়ে আসে, তার রূপে চোখ যায় ঝল্‌সে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে যখন তা পড়ে, তখন দেখি কোহিনুর—মণির শ্রেষ্ঠ মণি। অনেক কৃতী লেখক বাঙলা ভাষার উপর অনেক কারিকুরি করেছেন, তার বাইরের মলিন আবরণ সরে গিয়ে ভিতরের উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ পেয়েছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু তার পরে সেই ভাষা পড়ল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে, জীবনের সায়াহ্নে তিনি যখন এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শে ভাষার উজ্জ্বলরূপ হল উজ্জ্বলতর, "গল্পসল্পের" ভাষা বাঙলা ভাষার কোহিনুর। এ ভাষার সঙ্গে তুলনা চলে বেগবতী পাহাড়ী ঝরণার, যার দৈর্ঘ প্রস্থের আড়ম্বর নেই, কিন্তু বাধাহীন গতি আছে, আর আছে চোখজুড়ানো মনভুলানো রূপ।

নীলমণি বাবু অঙ্কশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত, কিন্তু সাংসারিক কাজে নেহাৎই অগোছালো। তিনি তাঁর অতি সূক্ষ্ম গণিতের সাহায্যে কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব অনেক জিনিসই বের করেছেন, কিন্তু হাতের কাছে ১৩নং শিবু সমাদ্দারের গলি সম্বন্ধে আর তার বাড়ি ভাড়া সম্বন্ধে নেহাৎই অজ্ঞ। এমনকি যে নোট বইএ তিনি ঠিকানা লিখে রাখবেন তাও কলকাতায় নেই, আছে এলাহাবাদে। তার থাকাই ভালো, না হলে হয়ত তার মারফৎ তিনি অনেক কথাই প্রমাণ করতে বসে যেতেন, যার যুক্তি তাঁর নিজের কাছে অকাট্য হলেও অন্য লোকের পক্ষে অসুবিধাজনক।

চণ্ডীবাবু ডাকসাইটে নিন্দুক এবং ছিদ্রান্বেষী। তিনি পৃথিবীর কারো সাধুতায় বিশ্বাস করেন না, তার কারণ সম্ভবত তাঁর মগ্নচৈতন্যে তাঁর নিজের সম্বন্ধে তাঁর পরম অবিশ্বাস আছে। নিন্দুক অল্পবিস্তর সবাই, কেউ কম, কেউ বেশী। কিন্তু চণ্ডীবাবু খাঁটি আর্টিষ্ট, সেরা নিন্দুক, সম্পূর্ণ ভেজালবিহীন। সাধারণ লোকের অন্তত নিজের শালার সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা থাকে, চণ্ডীবাবুর সাতকেলে পুরোণো ছেঁড়া একটা গামছা পাওয়া না গেলে তিনি ধরে নেন সেটা চুরি গেছে এবং চুরি করেছে সম্ভবত শালাই। দোষ অবশ্য সম্পূর্ণ মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অহিংস্র নীতির। কারণ "ধড়াধড় না পিট্‌লে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে?" ভাগ্যিস্ চণ্ডীবাবুর হাতে গভর্নমেণ্ট বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেয়নি, দিলে চোরের দল অপঘাতে মরত, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধুরাও। কারণ তাঁর কথা যদি বিশ্বেস করতে হয়, তাহলে দুনিয়ায় তিনি ছাড়া আর সবাই চোর। তফাতের মধ্যে কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ সিঁধেল চোর, আর কেউ বা অনাথ হাসপাতালের জন্যে চাঁদা আদায় ক'রে সেই টাকা মেরে দিয়ে চোর। এই সব ইতরামি দেখে চণ্ডীবাবুর লজ্জা হয়, আমাদেরও।

মুনশীজি, ম্যা[illegible]শিয়ান্ হরীশ হালদার, আর বাচস্পতি, এঁরা হলেন সমগোত্রীয় লোক। [illegible] সত্যিকারের আজব দেশের লোক, কেউ নিজের বিশ্বাসে, কেউ পরকে বিশ্বাস করিয়ে, আর কেউ বা ভাষা সৃষ্টির বাহাদুরীতে। মুনশীজির বিশ্বাস তিনি সেরা গাইয়ে, যদিও গান তিনি আদপেই গাইতে পারেন না। সাধারণ লোক যারা গান গাইতে পারে না, তারা পারেই না। নিজেরাও তারা সেকথা জানে অন্যেও। কিন্তু মুনশীজির নিজের সংগীতের পরে অটল বিশ্বাস তাঁকে সংগীতজ্ঞ ক'রে তুলেছে, বাইরের দুষ্টুলোকে যাই বলুক কেন।

শুধু গান নয়, ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর জ্ঞান অসাধারণ আপনার আমার এই দুটো জ্ঞান থাকলেই মোটামুটি খুশি থাকা চল্‌তে কিন্তু মুনশীজি, যিনি গান এবং ইংরাজী ভাষায় সকলের সেরা, তি[illegible] লাঠিখেলাতেও শীর্ষস্থানে। তিনি লড়াই করতেন তাঁর ছায়ার স[illegible] যেটা হারবেই হারবে। ফলে তাঁর ভুল আর ভাঙতো না; সবা[illegible] ...ভূই বার সাবাস। বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার [illegible]

ম্যাজিশিয়ান্ হরীশ হালদারকে আপনারা "হ[illegible]
করতে পারেন, কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে
কেননা তাঁর অসাধারণ ম্যাজিক দেখানোর [illegible]
হয়, সে দ্রব্য জোগাড় করতেই সম্ভবত ...ন ছায়ায় নিষ্প্রভ হইয়া
বাচস্পতি পণ্ডিত, যদিও অত... ছাড়িয়া প্রশান্তকে ডাকিয়া
তিনি হচ্ছেন খাঁটি "গ্রম্বু... ভৃত্যকে আদেশ করিল।
পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া
আর শুনতে হবে অসম... তাহার নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন
"সম্মম্মরাট সমু... না দেখিয়া বলিল, "কই, সুলেখা এখনও
উথ্লুংসিত—" ক[illegible]
আসে। একটা
বেশী সেং...ঠ লাবণ্য বলিল, "না। তবে আসতে দেরী হবে।"
অর্থ "উঃ্ন?"
জোর কে... কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রশান্তর সম্মুখে চায়ের
আগেরটার
কতকটা কথাপন করিয়া লাবণ্য প্রশান্তর পাশে নিজের
ইরুমাসিবেশন করিল।
সত্যি যে কে... থত লাবণ্যকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা
কারণ আছে
ঠিক কোন্ ...বীচীন মনে করিল না। সে ভাবিল, গতকল্য
নেই। কা... সহিত যে অপ্রীতিকর আলোচনার উদ্ভব হইয়া-
তাদের খ...
সে খবর ...আজ প্রত্যুষেও হয়ত তাহা দুই ভগ্নীর মধ্যে পুনরায়
বলা চলে... তেন উগ্রতার সৃষ্টি করিয়া থাকিবে, তাই সুলেখা
আছে "...র সহিত একত্রে চা-পান করিতে আসে নাই।
চুপ ক...
শুন্‌লে... তাড়াতাড়ি কোনপ্রকারে চা-পান শেষ করিয়া লাবণ্য
না। পড়িল। তাহার পর প্রশান্তর দিকে চাহিয়া বলিল,
...এরা খাও, আমার একটু কাজ আছে।"
ঘেরা
পড়লে প্রশান্ত বলিল, "এ কি! সমস্তই যে প'ড়ে রইল। ভাল
সেখা... খেলে না কেন লাবণ্য।"
কোথা "খেতে কেমন ভাল লাগছে না।" বলিয়া লাবণ্য কক্ষ
ম্যানে...
তিনি ...ত নিষ্ক্রান্ত হইল।
সে কে... একতলার যে স্নান-ঘর প্রত্যূষে সুলেখা প্রতিদিন
দেবে,
সেটা ...র করে তথায় তাহার বাসি পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি পড়িয়া
...ছে কি না দেখিবার জন্য লাবণ্য প্রবেশ করিল। দেখিল,
মধ্যেই।
পাং... এত সকাল-সকাল পরিচারিকারা ছাড়া-কাপড় কাচিয়া
ক্যা...
ক্যা... কাইতে দেয় না, তথাপি, সুলেখার বস্ত্রাদি যে কাচিয়া
দিলে...

* গল্পসল্প—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শুকাইতে দেওয়া হয় নাই, কাপড় শুকাইবার স্থানে উপস্থিত হইয়া সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

তাহার পর দোতলায় আরোহণ করিয়া তথাকার বাথরুমের দ্বারটা ঠেলিয়া ভিতরে কেহ নাই দেখিয়া সুলেখার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

দূর হইতেই টেবিলের উপরে রাখা সুলেখার চিঠিখানা দেখিতে পাইয়া লাবণ্য ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া গিয়া সেটা তুলিয়া লইল। তাহার পর নিরুদ্ধশ্বাসে খাম ছিঁড়িয়া চিঠির প্রথম ছত্রের উপর দৃষ্টি দিয়াই সে আঁৎকাইয়া উঠিল। সুলেখা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,—

ভাই দিদি, তুমি যখন এ চিঠি পড়বে, তখন আমি তুফানবেগে এলাহাবাদ ছেড়ে দূরে চ'লে যাচ্ছি। হয়ত বা তখন আমার তুফানগতি বিরাম লাভও করেছে। এমন কিছু দূরে যাচ্ছিনে ভাই, তোমাদের কাছাকাছিই থাকব।

তোমার মনে আছে কি না জানিনে, তুমি যখন বি-এ পড়তে, তখন পশ্চিমের এক শহর থেকে অমলা পাল নামে একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে স্কুল ডিপার্টমেন্টে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়। ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই তার চেহারার জোরে এক ধনশালী পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। তার পর সে আর লেখাপড়া করে নি, কিন্তু আমার সঙ্গে সে বরাবর একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা রেখে এসেছে।

পশ্চিমের সেই শহরে অমলার মামার গালার কারবার আছে। এই বড়দিনের সময়ে অমলা তার মামাত' ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে মামার বাড়ি বেড়াতে এসেছে। আমি এলাহাবাদ আসব শুনে অমলা আসবার আগে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে এসেছিল, যাতে আমি দিন-কয়েকের জন্যে তার মামার বাড়ি বেড়াতে যাই। সেই মতো আমি অমলার নিমন্ত্রণ রাখতে তার মামার বাড়ি চলেছি।

তোমাদের না জানিয়ে আসবার প্রধান কারণ, তাহ'লে তোমরা কখনই আমাকে আসতে দিতে না; বিশেষত, উপস্থিত আমাদের মধ্যে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে, তার কথা ভেবে। অথচ, ঠিক সেই কারণেই আমি, অন্তত পাঁচ-ছয় দিনের জন্যে (অর্থাৎ যতদিন না দাদারা এলাহাবাদে আসছেন), এলাহাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

গত দিন দুই থেকে কিছুই ভাল লাগছিল না ভাই। তার ছিঁড়ে গেলে সে যন্ত্র আর বাজাতে নেই। উপস্থিত আমার এলাহাবাদের তার ছিঁড়ে গেছে।

আমিও তোমাদের আর আনন্দ দিতে পারতাম না। এখন থেকে তোমাদের মনের মধ্যে আমি একটা ভারের মতোই হ'য়ে থাকতাম। সেরকম থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, এ কথা তুমিও বোধ হয় স্বীকার করবে।

আর একটা কথা তুমি বেশ বিবেচনা করে দেখো। আজ দুপুরবেলা আমার ঘরে এসে গৌরহরিবাবুর সম্বন্ধে তুমি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে, তা শোনবার পর আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। যে সন্দেহ তুমি করেছিলে তা সত্য হ'লে, গৌরহরিবাবুর সান্নিধ্য থেকে আমার অবিলম্বে সরে যাওয়াই উচিত; মিথ্যা হলে, গৌরহরিবাবুর কাছাকাছি থেকে তাঁকে তোমাদের মনে সেই সন্দেহটা বাড়িয়ে তোলবার সুযোগ দিয়ে রাখা উচিত নয়। গৌরহরিবাবু অত্যন্ত অবুঝ আর খেয়ালী লোক। সিঁড়ি মাড়াতে বারণ আছে বলে যে লোক ফুলগাছের টব টপকে লাফ দিয়ে একতলার বারান্দার উপর তোমার কাছে আসতে পারে, সে যদি আইভি গাছের লতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে দোতলার বারান্দায় আমার কাছে হাজির হয়, তা হলে তুমিই আশ্চর্য হবে, না আমিই আশ্চর্য হব, তা বল?

রাত অনেক হল, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আবার পাঁচটার আগে জেগে তৈরী হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। সে সময়ে যদি গেট খোলা পাই তা হলেই ভাল, নইলে পুনর্মূষিক হয়ে আবার নিজের বিবরে ফিরে আসতে হবে।

তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো দিদি। সব কথা তোমাকে এখন বলবার সময় নেই, সব কথা তোমাকে বলাও যায় না। তুমি নিজে স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকের যে কত জ্বালা, সে কথা তোমাকে আমার বোঝাবার দরকার নেই। কত জিনিস আমাদের সহ্য করতে হয়; কত জিনিস উপেক্ষা করতে হয়; এমন কি, কত জিনিস আমাদের চেপে যেতেও হয়, সে কথা শুধু আমরাই জানি।

জামাইবাবুর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করে যাচ্ছি তা আমার মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে রইল। তিনি আমার ভগ্নীপতির বাড়া। তিনি আমার পরম আত্মীয়—বড় ভাই। তোমার মারফৎ আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব না। আবার যেদিন তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হবে, সেদিন নিজে থেকেই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো। কিন্তু এ আমি স্থির জানি, সে চাওয়া সেদিন নিরর্থক হবে এই জন্যে যে, আমার প্রতি তাঁর যে অপরিসীম স্নেহ আছে, তা আমার ক্ষমা চাওয়ার জন্যে কখনই অপেক্ষা করে থাকবে না, চাইবার আগেই আমাকে তা দিয়ে রাখবে।

তোমরা দুজনে আমার প্রণাম নিয়ো, আর জয়ন্ত দীপুকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—

তোমার ক্ষমাপ্রার্থিণী ভগ্নী

সুলেখা

চিঠি পড়া শেষ হইলে লাবণ্য ধীরে ধীরে সুলেখার শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। (ক্রমশ)

কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা

শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার অবকাশ নাই। দেশের কৃতবিদ্য সাহিত্যরসিকগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "কপালকুণ্ডলাতত্ত্বে" হোমারের নসিকেয়া, কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্সপীয়রের মিরান্ডা ও পার্ডিটা, মিলটনের ইভ, বায়রণের হেইডি, জর্জ ইলিয়টের এপির সহিত কপালকুণ্ডলার অল্পাধিক সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র "পূর্বগামী কবিগণের কাব্য হইতে কোন কোন ভাব ও উপাদান গ্রহণ করিলেও তাঁহার মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই," ইত্যাদি। কিন্তু এ সব হইল রস ও সৌন্দর্য বিচারের কথা, কপালকুণ্ডলার বাইরের দুই চারটি কথা লইয়া আমরা আলোচনা করিব।

'কপালকুণ্ডলা' নামটি বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ও পরে আর কোন সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ নামটি ব্যবহার করেন নাই, ব্যবহার করিলে তাহা সদ্ব্যবহার হইত কিনা সন্দেহ। কপালকুণ্ডলার বাল্য ইতিহাস ও পরিবেশের সঙ্গে এবং পরবর্তী বিবাহিত জীবনে সংসারের প্রতি তাহার নির্মম ঔদাসীন্যের সঙ্গে কপালকুণ্ডলা নামটি বড় চমৎকার খাপ খাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্বজন-সমাদৃতা প্রিয়তমা নায়িকার এই অপূর্ব নামকরণ বাঙলা সাহিত্যে অননুকরণীয় রহিয়া গেল। সপ্তগ্রামে আসিয়া স্বামীগৃহে প্রবেশ করিবার পর কপালকুণ্ডলার নূতন পরিজনবর্গ 'কপালকুণ্ডলা' নামটিতে বৈরাগ্যের উগ্র গন্ধ পাইয়া উহা বদলাইয়া নূতন নাম রাখিয়াছিল 'মৃণ্ময়ী'—স্নেহপ্রেমময়ী শ্যামলা কোমলা ধরিত্রী। মৃণ্ময়ী নামটি কপালকুণ্ডলার ঠিক বিপরীত। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কপালকুণ্ডলা কপালকুণ্ডলাই রহিল, কোন দিন মৃণ্ময়ী হইতে পারিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা নামটি ভবভূতি রচিত মালতী মাধব নাটক হইতে লইয়াছেন। ভবভূতির কপালকুণ্ডলা কাপালিক অঘোরঘণ্টের অনুরক্তা শিষ্যা, সর্বতোভাবে গুরুর আজ্ঞানুবর্তিনী, গুরুর আদেশ পালন করিবার জন্য অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় প্রবৃত্ত হইতেও অকুণ্ঠিতা। মাধবের হাতে গুরুর শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার দৃঢ়সংকল্প ও হৃদয়হীন আচরণ পাঠকের মনে তাহার প্রতি যুগপৎ সম্ভ্রম এবং ভয় ও ঘৃণা জাগাইয়া তোলে। মালতীমাধব নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই দেখি—ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন ভীষণোজ্জ্বলবেশা কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলার বেশভূষার পরিচয় তাহার আপন উক্তি হইতেই চমৎকার পাওয়া যায়ঃ—

বিষ্কগ্বৃত্তিজটানাং প্রচলতি নিবিড় গ্রন্থিনদ্ধোঽপি ভারঃ
সংস্কারক্কাণ দীর্ঘং পটুরটতি কৃতাবৃত্তি খট্টাঙ্গ ঘণ্টা।
ঊর্ধ্বং ধূনোতি বায়ু বিধৃত শবশিরঃ শ্রোণকুঞ্জেষু গুঞ্জন্
উত্তালঃ কিঙ্কিণীনামনবরতরণৎকার হেতুঃ পতাকাম্॥

(সর্বতোভাবে অবস্থিত আমার জটাসমূহ দৃঢ়গ্রন্থিবদ্ধ হইয়াও গতিবেগবশত কম্পিত হইতেছে। আমার ত্রিশূলের ঘণ্টা সংস্কার-জনিত শব্দে দীর্ঘ ও সুস্পষ্টভাবে তালে তালে বারবার শব্দ করিতেছে। আমার গতিবেগজনিত বায়ু কণ্ঠমালাস্থিত কিঙ্কিণী-গুলিকে বাজাইতে বাজাইতে কণ্ঠমালাস্থিত মাংসহীন নরমুণ্ড-শ্রেণীরূপ কুঞ্জে অব্যক্তমধুর শব্দ করিতে করিতে ত্রিশূলের পতাকাকে ঊর্ধ্বে উঠাইয়া কম্পিত করিতেছে)।

কপালকুণ্ডলা বলিতেছে—"যত্র পর্যবসিত মন্ত্র সাধনস্য অস্মদ্-গুরোঃ অঘোরঘণ্টস্য আজ্ঞয়া সবিশেষ মদ্য পূজাসম্ভারো ময়া সন্নিধাপনীয়ং, কথিতঞ্চ মে গুরুণা, বৎসে কপালকুণ্ডলে! অদ্য ময়া ভগবত্যাঃ করালায়াঃ প্রাগুপযাচিতং স্ত্রীরত্নমুপহর্তব্যম্। তদত্রৈব নগরে বিদিতমাস্ত, ইতি তদ্বিচিনোমি।"

(করালাদেবীর মন্দিরে আমার গুরু অঘোরঘণ্ট পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আমাকে বিশেষরূপে পূজোপহার উপস্থিত করিতে আদেশ দিয়াছেন। গুরুদেব আমায় বলিয়াছেন—বৎসে কপালকুণ্ডলে! আজ ভগবতী করালাদেবীর নিকট পূর্বপ্রতিশ্রুত স্ত্রীরত্ন উপহার দিতে হইবে। সর্বান বিদিত সেই স্ত্রীরত্ন এই পদ্মাবতী নগরেই আছে। সুতরাং, আমি অন্বেষণ করিয়া দেখি)।

এই স্ত্রীরত্ন মালতী। মাধব অঘোর ঘণ্টকে বধ করিয়া মালতীর উদ্ধার সাধন করিল। নবম অঙ্ক হইতে বোঝা যায়, গুরুহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কপালকুণ্ডলা সদ্যো বিবাহিতা মালতীকে শ্রীপর্বতে চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং সেখানে তাহার প্রাণবধের আয়োজন করে। ঠিক সেই সময় কামন্দকীর সখী অলৌকিক যোগশক্তিসম্পন্না সৌদামিনী আসিয়া মালতীর উদ্ধার সাধন করিয়া পুনর্বার তাহাকে মাধব ও অন্যান্য পরিজনবর্গের নিকট লইয়া যায়। ইহাই মালতীমাধব নাটকে কপালকুণ্ডলার উপাখ্যান।

ভবভূতি রচিত কপালকুণ্ডলা উপাখ্যান অলৌকিকত্বে পরি-পূর্ণ। শ্মশানে মাধবের মহামাংসবিক্রয়, মহামাংসলোভী পিশাচ-গণের আবির্ভাব, আকাশপথে কপালকুণ্ডলার বিবরণ, মালতীহরণ ইত্যাদি ব্যাপার সবই অলৌকিক। মালতী ও মাধবের পরস্পরের প্রতি প্রেমের প্রগাঢ়তা ও একনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্যই নাট্যকার নাটকে এই অলৌকিক ব্যাপারগুলিকে এতখানি স্থান দিয়াছেন, নতুবা নাটকের মূল ঘটনার সহিত ইহাদের বিশেষ সম্পর্ক নাই। আরও একটি সংগত কারণ থাকিতে পারে। প্রস্তাবনায় সূত্র-ধারের মুখ দিয়া নাটকের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভূম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ ইত্যাদি। কপালকুণ্ডলা-ঘটিত অলৌকিক ব্যাপারটি নাটকে রসবৈচিত্র্য আনিয়াছে, পর পর বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও করুণ রস সৃষ্টি করিয়াছে।

এ জাতীয় অলৌকিকত্ব অন্যান্য সংস্কৃত নাটকেও বিরল নয়। রত্নাবলীতে ঐন্দ্রজালিক সগরসিদ্ধি মায়া-অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করিয়া-ছদ্মবেশিনী সাগরিকার প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত করিল। প্রাকৃত-নাটক কর্পূরমঞ্জরীতে কাপালিক ভৈরবানন্দ একটি মুখ্য চরিত্র। তাহার উক্তি হইতে বোঝা যায়, নৈতিকতার দিক দিয়া ভৈরবানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের কাপালিক অপেক্ষা নিম্নস্তরের চরিত্র। প্রথম যবনিকান্তরে ভৈরবানন্দ নিজ ধর্মের পরিচয় দিতেছেঃ—

মন্তোণ তন্তোণ অ কিংপি জাণে
জ্ঝাণং-চ ণ কিংপি গুরুপ্পসাদা।
মজ্জং পিবামো মহিলং রমামো
মোক্খং-চ জামো কুলমগ্গলগ্গা॥

(মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না, গুরুর নিকট জ্ঞানও শিখি নাই। মদ্যপান করি ও স্ত্রী সহবাস করি। এইরূপে কৌলমার্গে সাধনা করিয়া মোক্ষলাভ করিব)।

ভৈরবানন্দই অলৌকিক যোগবল প্রয়োগ করিয়া সদ্যঃস্নাতা কর্পূরমঞ্জরীকে আনিয়া রাজার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটাইল, শেষে রাজার সহিত কর্পূরমঞ্জরীর বিবাহও ভৈরবানন্দের অলৌকিক কৌশলেই ঘটিল। নাটকের মুখসন্ধি ও নির্বহণসন্ধির মূলে রহিয়াছে কাপালিক ভৈরবানন্দ।

নাটকীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অলৌকিকের অবতারণা শুধু সংস্কৃত নাটকে নয়, ইংরেজি নাটকেও যথেষ্ট দেখা যায়। সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ ট্রাজিডি ও কমেডিগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে অলৌকিকত্ব প্রচুর পরিমাণে আছে। ম্যাকবেথ ও হ্যামলেটের মুখসন্ধিতে নাটকের বীজবপন করিতেছে ডাইনীগণ ও হ্যামলেটের

মৃত পিতার প্রেতাত্মা—দুই-ই অলৌকিক। সমালোচকগণ এইরূপ অলৌকিকের অবতারণাকে সেক্সপীয়রের একপ্রকার নাট্যকলা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কাপালিক একটি মুখ্য চরিত্র। কাপালিক নবকুমারবধের আয়োজন করিল, তাহার ফলে ঘটিল নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহ ও পলায়ন। এই অংশকে কপালকুণ্ডলার মুখসন্ধি বলা যাইতে পারে। উপন্যাসের শেষ-ভাগে নিবর্হণসন্ধিতে নবকুমারের মন যখন কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসে জর্জরিত তখন কাপালিক আসিয়া নব-কুমারকে কপালকুণ্ডলাবধে উত্তেজিত করিতে লাগিল, তাহার ফলে ঘটিল ভাগীরথীগর্ভে দম্পতীর প্রাণ বিসর্জন। সুতরাং কাপালিক ও কাপালিক সংক্রান্ত ব্যাপারটিকে শুধু বঙ্কিচন্দ্রের আর্ট বলিলে চলিবে না, উপন্যাসে বর্ণিত প্রধান ঘটনার অন্তর্গত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কপালকুণ্ডলা ট্রাজিডির climax ও catastrophe দুইএর পক্ষেই কাপালিক অপরিহার্য।

সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের যে অলৌকিকত্বের কথা আলোচিত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের কাপালিক সে-জাতীয় সৃষ্টি নয়। ইহা তিন শত বৎসর আগেকার বাঙলাদেশের একটি বাস্তব চিত্র। বাঙলাদেশে ও বাঙলা সাহিত্যে কাপালিক কিছুমাত্র নূতন নয়। কাপালিক তান্ত্রিক সাধক। তন্ত্র যে কত প্রাচীন সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, খৃস্টপূর্ব যুগেও ভারতে তন্ত্রের প্রতিপত্তি ছিল এবং তন্ত্রের মূল অথর্ব বেদ। পরবর্তীকালে তন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম হইতে বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তি। হিন্দুতন্ত্রের তিন শাখা—শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব। ভারতবর্ষে "তন্ত্রের চারিটি প্রধান পীঠ ছিল—কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি ও উড়িয়ান। উড়িষ্যার গজপতিরাজ-গণ তামিল ভাষায় উড়িয়ান নামে আখ্যাত।" (উৎকলে তন্ত্রচর্চা, উদ্বোধন, মাঘ ১৩৪৭)। উড়িষ্যায় তন্ত্রচর্চার এক সুবিস্তৃত ইতিহাস আছে, বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়বিধ তন্ত্রের চর্চাই বহু-শতাব্দী ধরিয়া উড়িষ্যায় চলিয়াছিল। উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর অভাব নাই, উড়িষ্যা অনেক সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুর জন্মস্থান ও সাধনক্ষেত্র। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে লুইপাদ, শবরীপাদ, দারিকপাদ, ডম্বি হেরুণ (চর্যাপদের হেরুক), জালন্ধরিপাদ বা কৃষ্ণাচার্য প্রভৃতি তান্ত্রিকগণ রচিত দোহা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা নাকি সকলেই উড়িষ্যার লোক ছিলেন। কিন্তু মনে হয়, তন্ত্রচর্চা বিষয়ে উড়িষ্যা অপেক্ষা কামাখ্যার প্রভাবই বাঙলাদেশে বেশি ছিল। ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্ররাজার গান প্রভৃতিতে "কাভুরের কামিষাদেবী"র উল্লেখই পাওয়া যায়। বিষ-ঝাড়া, ভূতপ্রেত ঝাড়ানোর মন্ত্রেও "কাভুরের কামিষা দেবী দিয়া গেল বর।" রূপকথা ও সত্যপীরের কথাতেও "কাভুরের কামিষা দেবী"র সভয় সসম্ভ্রম উল্লেখ। সুপ্রাচীন চর্যাপদে—"রাতি ভইলে কামরু জাঅ।" 'কামরু', 'কাভুর' সংস্কৃত 'কামরূপে'র অপভ্রংশ। কামরূপের তন্ত্রসাধনার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই কামরূপ হইতেই তান্ত্রিকধর্ম একদিন সারা বাঙলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কামরূপ শাক্ত পীঠস্থান, সুতরাং ইহা শাক্ত-তন্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তিন প্রকার হিন্দু তন্ত্রের মধ্যে—শৈব তন্ত্রই প্রাচীনতম, ঋগ্বেদে "শিশ্নদেব" অর্থাৎ লিঙ্গোপাসকদের উল্লেখ আছে। লিঙ্গোপাসনা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও পৃথিবীর সর্বত্র আনর্যজাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শৈব তন্ত্র হইতে শাক্ত তন্ত্রের উদ্ভব। খৃঃ সপ্তম-অষ্টমশতকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হইয়া বজ্রযান ও সহজযান তন্ত্রে পর্যবসিত হইল। খৃঃ একাদশ-দ্বাদশশতক হইতে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল এবং শেষে বৈষ্ণবধর্মের দুর্জয় প্রভাবের চাপেই শৈব, শাক্ত ও বৌদ্ধ তন্ত্র বিলুপ্তপ্রায় হইল। বৈষ্ণবধর্ম হইতে সহজিয়া বৈষ্ণব তন্ত্রের উৎপত্তি। বাঙলাদেশে বৈষ্ণব তন্ত্রের উৎপত্তি সম্ভবত চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে, বৈষ্ণব সহজিয়াগণ রূপগোস্বামীকেই তাঁহাদের আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকল শ্রেণীর তন্ত্রের মধ্যে নানাবিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। একটি বিষয়ে তাহাদের সাদৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হইতেছে বামাচার। "কর্মানুষ্ঠান অনুসারে তান্ত্রিকগণ ভিন্ন ভিন্ন আচারে বিভক্ত—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণা-চার, সিদ্ধান্তচার, বামাচার, অঘোরাচার ও কৌলাচার। বেদাচার তন্ত্রের প্রথম সোপান এবং যথাক্রমে কৌলাচার সর্বশেষ অবস্থা।" (উৎকলে তন্ত্রচর্চা, উদ্বোধন, মাঘ ১৩৪৭)। শাক্ত তান্ত্রিকগণই কাপালিক নামে পরিচিত।

বঙ্কিচন্দ্রের কাপালিক বামাচারী শাক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র বামা-চারের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করেন নাই, হয়তো তাঁহার রুচি তাঁহাকে এ বিষয়ে বাধা দিয়াছিল, কিংবা অনাবশ্যক বোধে তিনি স্বেচ্ছায় বাদ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বামাচারের ইঙ্গিত কপাল-কুণ্ডলায় যথেষ্ট আছে। প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারী কপালকুণ্ডলার সবিশেষ পরিচয় নবকুমারকে দিতেছেন—"ইনি ব্রাহ্মণ কন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। "ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃস্টান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ-প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্র তীরে ত্যক্ত হন।............ কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন।" এই "আত্মপ্রয়োজন" যে কি, অধিকারী আগেই তাহা কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাহ ও স্থান ত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়া কপালকুণ্ডলা বলিতেছে, "... তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতি-পালন করিয়াছেন।"

"অধিকারী। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।"

এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিলেন না, কিন্তু তাঁহার বড় ভয় হইল।"

উপন্যাসের শেষ দিকে চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম-চন্দ্র কাপালিকচরিত্রে কিছু কলঙ্কক্ষেপণ করিয়াছেন। "তান্ত্রিক-সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ" অধিকারী আগে কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইয়াছেন তান্ত্রিকসাধকের পক্ষে তাহা মোটেই নিন্দনীয় নহে বরং ইহা সিদ্ধিলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। তন্ত্র মতে "মদ্য, মাংস, মৈথুন প্রভৃতিতে দোষ হয় না, যদি মন কোনটায় আসক্ত না হয়।" (উৎকলে তন্ত্রচর্চা; উদ্বোধন)। কাপালিক নবকুমারকে তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনাইতেছে, "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তা-শুদ্ধিহেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে! তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্বকৃত ফল বিনষ্ট হইল।'......" উপন্যাসে কাপালিক চরিত্রে এই একমাত্র দুর্বলতা। নারী সাহচর্যে তান্ত্রিক সাধনার কথা বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে তান্ত্রিকগণের মতে আধ্যাত্মিক সাধনার অত্যুচ্চ সোপান তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই; সম্ভবত তাঁহার সুরুচিপূর্ণ উচ্চশিক্ষিত মন ইহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করে

নাই। সর্বাঙ্গ সুন্দর ও বলিষ্ঠ কাপালিক চরিত্রে এই একটি মাত্র ছিদ্র তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে কাপালিক ও ইন্দ্রজাল বিশারদ যে সকল যোগীর সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় তাহাদের কোনটিই চরিত্র মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটে নাই। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য কিন্তু যোগীদিগকে উচ্চ স্থান দিয়াছে। গোপীচন্দ্রের গানের হাড়ি সিদ্ধা একটি উন্নত চরিত্র, সন্দেহ নাই। গোরক্ষবিজয়ের তান্ত্রিক যোগী গোরক্ষনাথ ত্যাগ, গুরুভক্তি, চরিত্র গৌরব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পদে অতুলনীয়। বাস্তবিক বাঙালী সমাজ ভয় সম্ভ্রমের সহিত চিরদিন ইহাদের পূজা করিয়া আসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিক চরিত্র আঁকিতে গিয়া বাঙলার এই লৌকিক সংস্কারের অমর্যাদা কোথাও করেন নাই। এখানে পাঠকের পূর্ণ সহানুভূতি—নায়িকা কপালকুণ্ডলার উপর, আর এই কপালকুণ্ডলার মর্মান্তিক পরিণতির সহিত কাপালিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অতি সহজেই পাঠকের মনে কাপালিকের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু কাপালিক চরিত্রটি আগাগোড়া এরূপ গাম্ভীর্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং স্বধর্মনিষ্ঠার এরূপ জ্বলন্ত মূর্তিরূপে ফুটিয়াছে যে তাহার প্রতি পাঠকের চিত্তে সসম্ভ্রম ভয়ের ভাবই জাগিয়া উঠে। বাস্তবিক, কপালকুণ্ডলার মৃত্যুর জন্য প্রকৃত দায়ী কাপালিক নয়, পদ্মাবতী ও নবকুমারও নয়, কপালকুণ্ডলার আশৈশব শিক্ষা ও সংস্কারই তাহাকে মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কাপালিক চরিত্রে নিষ্ঠুরতা আছে; কিন্তু সে জাতীয় নিষ্ঠুরতাকে সে নিজের ধর্ম বলিয়াই জানে, ভৈরবীর সেবায় যাহার মাংসপিণ্ড অর্পিত হয় কাপালিক চক্ষে সে ব্যক্তি যথার্থই ভাগ্যবান। কাপালিকচরিত্রে প্রতিহিংসা আছে কিন্তু সে প্রতিহিংসার মূলে আছে দেবীর আদেশ ও তাহার একান্ত ধর্মনিষ্ঠা। কাপালিক নবকুমারকে বলিতেছে—"কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে একজন সহকারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমন কার্যে সহচর হয় না।......কলরাত্রে ......স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।

বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সেও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা......"

কাপালিক যে কপালকুণ্ডলাকে বিশ্বাসঘাতিনী, সুতরাং নবকুমারের বধযোগ্যা ভাবিয়াছিল তাহাতে অপরাধ ও অসঙ্গতি কিছুই নাই। সে জানিত না, ব্রাহ্মণকুমার ছদ্মবেশিনী নারী। উপন্যাসের গোড়ার দিকে কাপালিকচরিত্র বঙ্কিমের একটি উৎকৃষ্ট Classical সৃষ্টি হইয়াছে। কাপালিকের উক্তিতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া লেখক ইহাকে প্রাকৃতভাষী নরনারী হইতে স্বতন্ত্র গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন। গভীর রজনীতে লতাগুল্মবহুল বন্ধুর সমুদ্রতটে এই বিরাট পুরুষের "নিবাত নিষ্কম্প" ধ্যানমূর্তি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার সে সময়কার বর্ণনা যেমন বাস্তব, শিল্প হিসাবে তেমনই নিখুঁত, তাহা একদিকে যেমন চমৎকার, অপরদিকে তেমনই লোমহর্ষক।

উপন্যাসে কাপালিকের সহিত কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধ একদিকে যেমন নিবিড়, অপরদিকে তেমনই একান্ত শিথিল। এই শিথিলতার কারণ স্নেহের অভাব। কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে 'আপন যোগসিদ্ধিমানসে' প্রতিপালন করিয়াছিল, কিন্তু কোন দিন ভালবাসে নাই। একমাত্র লক্ষ্যের সাধনায় সে তাহার প্রাণমন অর্পণ করিয়াছে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃত্তির দাসত্ব করিবার অবকাশ তাহার নাই। যদি পালক ও পালিতার মাঝখানে স্নেহ-প্রেমের কোন মধুর বন্ধন থাকিত, তাহা হইলে গল্পের ধারা একেবারে বদলাইয়া যাইত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহা চান নাই। দ্বিতীয় শকুন্তলার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে ভালবাসিত না সত্য, কিন্তু কপালকুণ্ডলার উপর তাহার প্রভাব অপরিসীম। নির্জন বন্য প্রকৃতি ও উদাসীন কাপালিকের সংসর্গে কপালকুণ্ডলা নিতান্ত শৈশব হইতে জীবনের সুদীর্ঘ সতেরো বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতির নিকট হইতে শিখিয়াছে বন্য হরিণীর মত অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আর কাপালিকের কাছ হইতে পাইয়াছে তাহার তান্ত্রিক সংস্কার। গার্হস্থ্য জীবনে এ সব শিক্ষার কোন উপযোগিতা নাই। প্রকৃতির শিক্ষায় সংসারের মধুর বন্ধনের প্রতি অনুরাগ নাই, কাপালিকের শিক্ষায় জীবনের প্রতি মমতা নাই। বিবাহের পর কপালকুণ্ডলা স্বামীকে, স্বামীর সংসারকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না, আবার মৃত্যুর আহ্বান যখন আসিল, তখন মরিতে কোন ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না, বরং স্বেচ্ছায় নিজেকে মরণের হাতে সমর্পণ করিতেছে। কাপালিক ছাড়া আর এক পুরুষ, কপালকুণ্ডলা কুমারীজীবনে যাহার সাহায্য পাইয়াছিল, সে হইতেছে মন্দিরের অধিকারী। অধিকারীর সহিত পাঠকের স্বল্পমাত্র পরিচয় হয় প্রথমখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, কখনও বা আদর করিয়া 'কাপালিনী' বলিতেন এবং কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে জানা গেল, "কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র; পড়িতে পারিতেন।" অধিকারীর সহিত স্বল্প পরিচয় হইতে বেশ বোঝা যায়, বাহিরের লোকের সঙ্গে তাহার যথেষ্ট মেলামেশা ছিল এবং লৌকিক ব্যাপারে তাহার অভিজ্ঞতা বাঙলা দেশের কোন সমাজপতির অভিজ্ঞতা হইতে কম ছিল না। যেখানে নিবিড় স্নেহের সম্বন্ধ, যেখানে ভাবের আদান-প্রদান, সেখানে কপালকুণ্ডলার মনের উপর অধিকারীর প্রভাবই সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। সেরূপ হইলে 'কপালকুণ্ডলা' এতখানি মূঢ়া ও অনভিজ্ঞা হইত না, একথা নিশ্চিত। সুতরাং উপন্যাসের মধ্যে অধিকারী একটি অতি গৌণ চরিত্র, পেষমন জাতীয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র গঠন ও চরিত্র বিকাশের সহিত অধিকারীর কোন সম্পর্ক নাই। উপন্যাসের গল্পাংশে কোন এক ভাবী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কপালকুণ্ডলাকে লেখাপড়া শিখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, মূঢ়া বন্যহরিণী কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের বিবাহ দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই দুইটি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর একমাত্র পুরুষ, যাহার প্রভাব কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে স্থায়িভাবে কাজ করিয়াছে, সে হইতেছে কাপালিক, নবকুমারও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান"; কপালকুণ্ডলা-চরিত্র সম্বন্ধে ইহাই সবচেয়ে বড় সত্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র না লিখিলেও একথা বুঝিতে পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হইত না।

"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান", তাই পতিগৃহে স্নেহ ও প্রেমের সুমধুর আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও তাহার মনে সুখ নাই। ভাবিয়া ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। তাহার পতিগৃহে আসার সময় ভবানীর পাদপদ্ম হইতে বিল্বপত্রটি পড়িয়া গিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় কপালকুণ্ডলা উৎকণ্ঠিত হইয়া

উঠিতেছে। চতুর্থ খন্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে লুৎফউন্নিসা কপালকুন্ডলার নিকটে আগে নিজের পরিচয় দিয়া পরে কাপালিকের কথা বলিতেছে, "কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুন্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন।" ইহার পর লুৎফউন্নিসার অনুরোধ রক্ষিত হইতে বেশি দেরী হইল না—

কপালকুন্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায়ও নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফউন্নিসাকে কহিলেন,—"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন-সম্পত্তি, দাস-দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

কপালকুন্ডলা কিন্তু আয়েষা নয়। আয়েষার ত্যাগ যথার্থই ত্যাগ। কপালকুন্ডলার ইহা ত্যাগ নয়, পরিত্যাগ, ইহা তাহার হৃদয়ের প্রেরণা।

কপালকুন্ডলার আপন প্রকৃতি এইবার উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে যেন নিজেকে এতদিন হারাইয়া ফেলিয়াছিল, আজ আবার খুঁজিয়া পাইল। "যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতিরোধ করে?" আজ সে যাহা শুনিল, যাহা দেখিল, তাহা অদ্ভুত—অলৌকিক বঙ্কিম-প্রতিভার অলৌকিক সৃষ্টি ।

"যেন ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল,—"বৎসে—আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুন্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশমন্ডলে নবনীরদ-নিন্দিত মূর্তি! গলবিলম্বিত কপালমালা হইতে শোণিত-শ্রুতি হইতেছে; কটিমন্ডল বেড়িয়া নর-কর-রাজি দুলিতেছে—বামকরে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা—ললাটে বিষমোজ্জ্বল জ্বালা-বিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুন্ডলাকে ডাকিতেছেন।"

পথে কাপালিক ও নবকুমারের সহিত কপালকুন্ডলার দেখা হইল। কপালকুন্ডলা কাপালিককে বলিল, "পিতা, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?"

ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মত ঘনান্ধকার প্রেতভূম। নবকুমার হাত ধরিয়া কপালকুন্ডলাকে লইয়া যাইতেছে কাপালিকের আদেশে তাহাকে স্নান করাইবার জন্য। নবকুমারের হাত কাঁপিতেছে; "কপালকুন্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।" পানোন্মত্ত হইয়াও নবকুমার বুঝিল, সে "আপনার হৃৎপিন্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে" আসিয়াছে। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কপালকুন্ডলার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। নবকুমারের সন্দেহভঞ্জন হইল, যাহা লইয়া এত গোলযোগ তাহার নিষ্পত্তি ঘটিল, কিন্তু কপালকুন্ডলা আর ফিরিল না। "নবীন করিকরম্ভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?" সে বলিল, "আমি আর গৃহে যাব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।" কপালকুন্ডলা মরিল, নবকুমার মরিল। প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরও বিসর্জন ঘটিল। ঘটনা-পরম্পর ঘাত-প্রতিঘাতে নবকুমার ও কপালকুন্ডলার মৃত্যু হইল, কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? অদৃষ্ট!

তটভাগের যে অংশে কপালকুন্ডলা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে পড়িল। ইহা অদৃষ্টের খেলা, না ঔপন্যাসিকের ছলনা?

কপালকুন্ডলা বঙ্কিমপ্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি, একথা একবার বলিয়া সাধ মিটে না, শতবার, সহস্রবার বলিয়াও সাধ মিটে না। ইহার পাশে রাখিয়া তুলনা করিবার দ্বিতীয় গ্রন্থ সারা ভারতীয় সাহিত্যে বোধ হয় নাই, সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যে নাই। "কাব্যাংশে কপালকুন্ডলা বঙ্কিমের চরম সৃষ্টি"—আলঙ্কারিক নির্দিষ্ট সব কয়টি গুণ—

> 'শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সুকুমারতা
> অর্থব্যক্তিরুদারত্ব মোজঃ কান্তিঃ সমাধয়ঃ।'

ইহার মধ্যে ফুটিয়াছে, অনায়াসে আপনা হইতে ফুটিয়াছে, অযত্ন-লালিত বনফুলের মত স্তবকে স্তবকে ফুটিয়াছে। কষ্টকল্পনার ছায়াপাত মাত্র কোথাও নাই। "নাট্যাংশেও কপালকুন্ডলা বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি"—ট্রাজিডির মধুর-গম্ভীর বিস্ময়কর ভয়াবহ ভাব ইহার আগাগোড়া জুড়িয়া রহিয়াছে। এই উৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম কপালকুন্ডলা, সংসারের কোন প্রলোভনই যাহাকে ভুলাইতে পারিল না, কোন শিক্ষাই যাহাকে শান্তসমাহিত গৃহলক্ষ্মী করিয়া তুলিতে পারিল না। কপালকুন্ডলা আগে যেমন ছিল, শেষ পর্যন্ত তেমনই রহিয়া গেল। নবকুমার সমুদ্রতটে প্রথম তাহাকে দেখিল—"সৈকতকূলে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি, কেশভার অবেণী সম্বন্ধে, সংসর্পিত রাশিকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্র-পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।" যখন সে শেষবারের মত নবকুমারের গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তখন ঠিক এই মূর্তি। চিঠি খুঁজিতে গিয়া কপালকুন্ডলা তাহার সুবিন্যস্ত কবরী খুলিয়া ফেলিল, আবার নূতন করিয়া বাঁধিবার অবকাশ তাহার ছিল না। কপালকুন্ডলা আজ আবার "অনূঢ়াকালের মত কেশ-মন্ডলমধ্যবর্তিণী" হইয়া স্বামীগৃহ ছাড়িয়া গেল।

অলসক্ষণে

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

মনেরে থামায় অলসক্ষণের কাদা,
মাথার উপরে আলোরা চাহিয়া থাকে,
কত ঢেউ এসে সেখানে বুনিল বাসা,
চাকার মতন কঠিন চিহ্ন আঁকে।
অবকাশ যায় ধুলির মতন উড়ে,
ক্লান্ত সূর্য ডুব দেয় বহু দূরে,
কলের ভেঁপুতে দিনেরে বিদায় দিল,
আমার নিরালা গরম পিচের মতো,
কথারা গলিয়া পথেই মিশিয়া থাকে
প্রহর গুড়ায়ে ধুলিতে মিশিল কতো।

হিংস্র নখর মিটাতে পারে না ক্ষুধা
মরুচে ধরেছে পুরানো বিলাসী দাঁতে
সবুজ ভাবনা উঁকি দিয়ে ফিরে যায়
ক্লান্ত হয়েছে যুঝিয়া পশুর সাথে।
নামুক রাত্রি, ঠান্ডা তারার চোখে
ছাই দেখা দিক্ শবযাত্রার শোকে,
ঢেউ মরে যায়, মাটিরে পেল না খুঁজে,
আমার নিরালা গরম পিচের মতো,
কথারা জ্বলিয়া নিবে যায় ধীরে ধীরে,
প্রহর গুড়ায়ে ধুলায় মিশিল কতো।

সম্রাট

—প্রজেশকুমার রায়

ক্ষমতার ক্ষুধা
তৃপ্তি কখনো জানে?
ওগো সম্রাট,
এ পৃথিবী ছোট কত!—
জ্বলে অনন্ত জ্যোতিষ্ক লোকে
দুরাশার ইঙ্গিত!
ওগো সম্রাট,
দুরাশা কি জানে ঘুম?
তার তরে শুধু অগ্নিশয্যা,
অনন্ত জাগরণ!

অবাধ্য আর উদ্দাম চির
অশ্ব কল্পনার?
পৃষ্ঠে আরোহী
তুমি তার অসহায়!—
মুক্তির দ্বার
খোলে অখ্যাত
মৃত্যুর পরিখায়?

বিজয়ের ক্ষুধা
তৃপ্তি কখনো জানে?
ওগো সম্রাট,
এ জীবন ছোট কত!
তবু অনন্ত জ্যোতিষ্কলোকে
দুরাশার ইঙ্গিত!

কলিকাতায় হিন্দু মহাসভায় সর্বভারতীয় কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনে বীর সাভারকর বক্তৃতা করিতেছেন

আহিরীটোলা ফেরী ঘাটের পন্টুন জেটী গঙ্গার জোয়ারের বেগে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

নিষ্প্রদীপ ও সিনেমা চিত্রগৃহ

কলিকাতায় নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা কয়েকদিন হইতে ব্যাপকরূপে প্রবর্তন করা হইয়াছে; যুদ্ধের মেঘ কলিকাতার দিকচক্রবালে ঘনাইয়া উঠিয়াছে কিনা জানি না। কিম্বা মধ্যপ্রাচ্য হইতে সমরতরঙ্গ ভারত সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে কিনা তাহাও আমাদের পক্ষে নিশ্চয়তার সহিত বলা সম্ভব নহে। আমরা এইটুকু মাত্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে যখন কোন দেশের উপর শ্যেনের মত বোমারু বিমানবহর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করে, তখন দেশের নগর, ঘাট, বন্দর, কারখানাসমূহের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে আলোক নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্প্রদীপ প্রথা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করিয়া রক্ষার প্রয়োজন যুদ্ধোপকরণের আড়ত ও কারখানাগুলিকে, কারণ আধুনিক যুদ্ধনীতিতে শত্রুর শকুনি দৃষ্টি ও সংহারপর্বের লক্ষ্য হইল এই সব কলকারখানা, অস্ত্রাগার ও যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর আড়তগুলি। স্কুল, হাসপাতাল, গির্জা, থিয়েটার ও সিনেমা নিকেতন ধ্বংস করা আধুনিক যুদ্ধরীতির প্রত্যক্ষ কার্যপন্থা কি না আমরা জানি না। তবে যে সকল ঘটনার সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি তাহাতে জানা যায় যে, এই সকল নিরীহ বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি শত্রুর আক্রমণের আশংকা হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু এই সকল আশংকা ও ব্যবস্থার কথা বিবেচিত হয় যখন সত্যই শত্রু ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পূর্বে শুধু আয়োজন (preparedness) সম্পূর্ণ করিয়া রাখাই যথেষ্ট।

নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থায় প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর অসুবিধাগ্রস্ত হইতে হয় এবং বর্তমান ক্ষেত্রে হইয়াছে। প্রয়োজন থাকিলে এই অসুবিধারও অন্য দিক দিয়া সার্থকতা আছে। তাহার উপর আর একটি বিষয় বিবেচ্য। নিষ্প্রদীপের ব্যাপারে যাঁহারা অসুবিধাগ্রস্ত হইতেছেন তাঁহারা বাধ্য হইয়াই তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্মতালিকা যথাসাধ্য দিবাভাগেই সারিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সংকীর্ণতর সময়ের পরিসরের মধ্যে কর্তব্য সুসম্পূর্ণ করা অসম্ভব।

অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দিবাভাগেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এই সংকুচিত সময়ের মধ্যে তাহারা একপ্রকার কাজ চালাইয়া যাইতে সক্ষম। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি চলচ্চিত্র শিল্পের কথা।

সিনেমা থিয়েটার প্রভৃতি প্রমোদাগারগুলি কর্মক্লান্ত মানুষের অবসর রঞ্জনের আশ্রয়। বর্তমান ব্যস্ততাবিড়ম্বিত নাগরিক জীবনের পক্ষে এই প্রমোদাগারগুলি অপরিহার্য বলিলেই হয়। সমাজ সেবায় ইহাদের দান কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করিয়াও বলিবার যে, সমাজে উপযুক্ত রকম অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকিলে তাহা লোকসমাজের মনস্তত্ত্বে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ফলে অপরাধ, (crime) ও মানসিক আধিব্যাধির প্রসার ও [illegible] অসম্ভব নহে।

কিন্তু এই প্রমোদাগারগুলির ব[illegible]র সময় ও পালা একমাত্র সন্ধ্যা ও রাত্রিকাল। দিবসব্যাপী প্রখর কর্মব্যস্ততার পর অপরাহ্ণে যখন ছুটির ঘণ্টা [illegible] উঠে, তখন আরম্ভ হয় প্রমোদাগারের কক্ষে কক্ষে [illegible]রেফারী[illegible]বার সাড়া। সুতরাং নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা চলচ্চিত্র [illegible] করিয়া দিয়াছে যেভাবে আঘাত করিয়াছে, অন্য কোন ব্যবসা [illegible] মহমেডান [illegible]ভাবে আহত হয় নাই। একমাত্র রাত্রিকালেই সিনেমাগুলি তাহাদের আনন্দের পণ্য জনসমাজে বিতরণ করে। দিবাভাগে চলচ্চিত্র প্রদর্শন সম্ভব নহে; তাহার প্রয়োজনীয়তাও নাই এবং উহা আকর্ষণীয়ও হইতে পারে না। কারণ সিনেমা মূলত অবসর বিনোদনের আশ্রয়। দিনের অন্যান্য কাজের পরই সিনেমার কাজ আরম্ভ হয়।

আমরা দেখিতেছি, নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় একদিকে চলচ্চিত্র শিল্পের আর্থিক হানির সম্ভাবনা এবং অপর দিকে নাগরিক মানুষের নির্দোষ প্রমোদ আহরণের সুযোগ খর্ব করিয়া মানসিক স্থৈর্যের ব্যাঘাত সৃষ্টির আশংকা ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

আরও একটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্য। ইহা গভর্নমেণ্টের পক্ষে বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয়। প্রমোদ-কর (Amusement Tax) গভর্নমেণ্টের আয়ের অন্যতম উপায়। সিনেমা দর্শকদিগের সংখ্যার লঘুত্ব ও গুরুত্বের উপর গভর্নমেণ্টের এই আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। গত কয়েক দিবস হইতে দর্শকের সংখ্যা রীতিমত হ্রাস পাইয়াছে। প্রত্যেক প্রমোদাগারের হিসাব ধরিলে গড়ে দর্শকের সংখ্যা এক্ষণে দাঁড়াইয়াছে পূর্বের এক তৃতীয়াংশ। ইতিমধ্যেই এতদূর বিপর্যয় যখন হইয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা আরও মন্দমুখী হইবে বলিয়া আমরা স্বভাবতঃ অনুমান করিতেছি।

আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা আরও কঠোর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা দর্শকের সংখ্যা বিরল হইতে বিরলতর হইতে থাকিবে।

নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা চলচ্চিত্র শিল্পকে এবং তৎসঙ্গে নাগরিক সাধারণ এবং গভর্নমেণ্টের আয়ের পন্থাকে মোটামুটি কিভাবে ক্ষুণ্ণ করিবার উপক্রম করিয়াছে, আমরা তাহাই আলোচনা করিলাম। এই অবস্থা হইতে একটি মুক্তি ও প্রতিবিধানের পথ শীঘ্রই নির্ণীত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীতে—'শকুন্তলা'

শ্রীতে গত ৬ই জুন মুক্তিপ্রাপ্ত ইন্দ্র মুভীটোনের 'শকুন্তলা'র চলচ্চিত্র রূপ দেখিবার দুর্ভাগ্য আমাদের হইয়াছে। 'দুর্ভাগ্য' এই কারণে যে, ১৯৪০ সালেতে পঁচিশ বৎসর আগের স্টাণ্ডার্ডের একখানি ছবি দেখিতে হইয়াছে এবং শুধু তাই নয়, তাহার সমালোচনাও লিখিতে হইতেছে। কালিদাসের অমর কাব্যখানির যে কিরূপ অমর্যাদা করা হইয়াছে, তাহা অবশ্য দেখিবার বিষয়! পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও যদি রস পরিবেশনে অপারগ হন তাহা হইলে আর বলিবার কি থাকিতে পারে! অথচ 'শকুন্তলা'-র চিত্রে রূপায়িত হইবার সম্ভাবনা প্রচুরই ছিল। চিত্রনাট্য, আলোকচিত্র, শব্দনিয়ন্ত্রণ, সুরযোজনা, গান, অভিনয়—কোন বিষয়েই ছবিখানিতে প্রশংসা করিবার মত কিছু পাওয়া গেল না। বেশভূষায় অসামঞ্জস্য ও দৃশ্য-সজ্জাদির ব্যাপারেও ত্রুটির অন্ত নাই।

ছবিখানির নামভূমিকায় ও দুষ্মন্তের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন জ্যোৎস্না গুপ্তা ও ধীরাজ ভট্টাচার্য এবং ভূমিকালিপিতে আছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুশীল রায়, কার্তিক রায়, সত্য মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অহী সান্যাল, মীরা দত্ত, উমাতারা, সন্ধ্যারাণী, মাধবী, পূর্ণিমা প্রভৃতি। ছবিখানি এই শনিবারে তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

ছায়ালোকের টুকিটাকি

শনিবার। স্থান—ট্রেনের তিসরা দরজার কামরা। তাতে সবজান্তা ডিবেটিং ক্লাবের জোর আসর বসেছে। সভ্যবৃন্দ—ঘরমুখী ডেলিপেসেঞ্জার কেরাণীকূল। হাতে তাঁদের নগদ চার চার পয়সায় কেনা সিনেমা সাপ্তাহিক। তর্কের বিষয়—দুঃখিনী বঙ্গভাষার ভলাণ্টিয়ার সাহিত্যিকগণ কর্তৃক সিনেমা তরণীর কর্ণধারণ।

* * * * * *

শ্রীমান্ পদ্মাপারের বাঙাল ঃ—'আরে কও কি? এত মহাভাগ্য কি অইব? নিজ চউখ দিয়া দেইখা জাইবার পারুম—হাউসে বইসা! সিনেমা-ছবির উপর দিয়া আপ্-বড়া সাহিত্যিক্-গ উপন্যাসগুলান্ ঝর্-ঝরাইয়া জিলিক্ মাইর‍্যা মাইর‍্যা বইয়া জাইবার লাগ্‌চে?

দমদমের কল্কি অবতার ঃ—(উচ্চারণ—'স' ও 'ছ'র মাঝে) যা' কই বাঙ্গাল্, সোন্! জেনে লিস্! সিনেমা আর সিল্‌পো থাক্‌বোনি। সাহিত্যের মজ্‌লিসে এসে এক এক দমে চিল্‌ম্ ফাটাবে! যাঁরা এত-দিন ডাইরেক্টর ছেলোনি বলে ওটা সিল্‌পো ছেলো—তাঁরা এবার্‌কে এসে গেলেন!

* * * *

তিন নম্বর ডিবেটার—বীরভূমের বীর-বাহাদুর তর্কবীর আফিংচি ঃ—কি কইচিস্ কি? জায়েঁচিস্! শৈলজাবাবুর বীর-ভূমকে ঘর! ও সিনেমা শিল্পটাকে সাহিত্যে সেজে চাল্‌বে না কেনে? বাহাদুর বটেক! কলমের ডগা দিয়েঁ, চিল্লিয়েঁ তোদের হারিয়েঁ দিলেক। এবার ডাইরেক্‌টর হইঁকে তোদের উইড়িয়েঁ দিবেক্!

চৌঠা, শান্তিপুরী রামদাদা ঃ—আহা, জিতা রহো বীরভূমি চাঁদ! তিন্ তিরিক্কা একুশ সপ্তমে গলা চড়িয়ে কহো—ছোঃ, নীৎনে বোস্! বোসে পড়্! ভো! ভো! হলিউড্—কালিফোর্নিয়ার সরু গলি-উড়ে গলে পড়ো! বাংলা সিনেমা ছবির সাথে আর পাল্লা দিতে হচ্চে না।

এ হেন সময়ে বরিশাল-গান (gun) হাঁক ছাড়্‌ল ঃ—'কেডারে লাফায়? আমি যা কইবাম, শুন্‌বা গে সবারে বোগলদাবা কোরে লংকা ডিংগাবা, জান্‌তি পারচো? বার্নাড শো হইতে গিন্নীর হাতাবেড়ী, কচি ছাওয়ালের ইসে ল্যাথন্‌দর সব-সাহিত্য-জান্তা নৃপেন চাটুর্জ্যা স্বয়ং কালিদাস অবতার হইয়ে অবতীর্ণ হোতেচ্যান্?'

নোয়াখালীর নোআমিঞা ঃ—'এরিয়, কিডা কন্! নোআ খবর হুন্‌চ্যান! বুড়া হাইত্যিক—মরা বারতীর (মৃতা ভারতীর) বুড়াদা—আতথী মশয়—নেউ থাটার্সে ফিন্ আইচে। এত বছর্ দিকশূল অই (হয়ে) দিগ্‌বিদিগ্ ঘুরিফিরি অদ্য নেউ থাটার্সের অ-হাইত্যিক ডাইরেক্‌টরগণ্ 'দিকশূল' দেখাইচে।

* * * * * *

উলোর পাকা মুলোর ঝাঁঝ বেশী, গ্যাঁজও বেশী। তিনি বাঙ্কের উপর এক লাফে উঠে লেক্‌চার সুরু করলেন ঃ—বলিহারি, অধুনা বাংলার অ-সাহিত্যিক ডিরেক্‌টার কুষ্মাণ্ডদের। ছবি তুলে যা 'পরিচয়' দিলেন?—হ্যাঁ, কেউ চলেছেন পাপের পথে। কেউ মালিকের খরচায় 'প্রতিশোধ' তুলচেন! কেউ ভাব্‌চেন 'অপরাধ' করাটাই বুঝি বাহাদুরী! কেউ আবার, প্রডিউসারের নিকট সময়-মত ছবি দেবার 'প্রতিশ্রুতি' ভঙ্গ ক'রে বেহায়ার মত তর্‌ফাচ্ছেন

ফিল্ম কর্পোরেশনের নূতন চিত্র 'প্রতিশো[illegible]'এর বিশিষ্ট ভূমিকায় রমলা

যে, দর্শকদের নিকট এ[illegible] নূতন ধরণের মজাদার 'প্রতিশ্রুতি' দেবো যে, তা' ছবির "অম[illegible]আঠার মত লেপ্‌টে রইবে।

* * * * *

পেসেঞ্জার ট্রেনে থা[illegible]ং ক্লাবে সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হ'ল যে, এবার নিশ্চয়ই[illegible] বোমার হাত হতে বাঙলা সিনেমা-তরণীখানি, আপ্‌বড় শি[illegible]ত্যিক, ডাইরেক্‌টর ও অভিনেতাদের কৃপায় স্বখাদ সলিলে[illegible] ডুবে মর্‌বে না।

—দূরবীণ।

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের খেলা শেষ হইয়া দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমার্ধের শেষভাগে এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে যেরূপ আলোচনার উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, বর্তমানে তাহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপ হইবার একটি বিশেষ কারণ আছে। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে যেরূপ "অপরাজিত" নাম অর্জন করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। ফলে লীগ তালিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ হইতে অনেক অধিক পয়েন্ট পাইয়া শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতে পারিবে না। দুই এক পয়েন্টেরই মাত্র ব্যবধান থাকিবে। সুতরাং দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় লীগ তালিকার দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকারী দল যদি খেলায় উন্নতি করে ও মহমেডান দলের যদি খেলার অবনতি হয়, তবে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য দুইটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে খেলাও উচ্চাঙ্গের হইবে ও খেলা দেখিয়াও আনন্দ পাওয়া যাইবে। কিন্তু ভাগ্যদেবী মহমেডান স্পোর্টিং দলের উপর এতই সুপ্রসন্না যে, ক্রীড়ামোদিগণের ঐ কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল না। মহমেডান স্পোর্টিং দল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথমার্ধের শেষ খেলাটি পর্যন্ত "অপরাজিত" নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

মহমেডান ও মোহনবাগানের খেলা

মহমেডান স্পোর্টিং দলকে প্রথমার্ধের শেষ খেলায় মোহনবাগান দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। এই খেলাটি প্রকৃতই দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা ভাল খেলা হইয়াছিল বলিলেও অন্যায় হইবে না। মহমেডান ও মোহনবাগান উভয় দলের খেলোয়াড়গণই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়। উভয় দলের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ খেলার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। মোহনবাগান দল অপেক্ষাকৃত ভাল খেলে এবং তাহারাই অধিকবার অব্যর্থ গোলের সুযোগ পায়। এই দলের ফরোয়ার্ড অমিয় ভট্টাচার্য এইদিন খুবই ভাল খেলেন। তিনি দুই দুইবার তীব্রভাবে হেড করিয়া গোল করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। বল গোলবারে লাগিয়া ফিরিয়া আসে। ইহা ছাড়া মোহনবাগান দলের অপর ফরোয়ার্ড রামচন্দ গোলরক্ষকবিহীন ফাঁকা গোল সম্মুখে পাইয়াও গোল করিতে পারেন না। মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগ ভাল খেলায় মহমেডান দল কোন সময়েই তীব্রভাবে গোলে সট করিবার সুযোগ পায় না। কিন্তু সৌভাগ্য তাঁহাদের কপালে সেইদিন বিজয়ের টীকা পরাইয়া দেয় খেলার একেবারে শেষ সময়। হঠাৎ একটি কর্ণার সট হইতে মোহনবাগান দলের বিরুদ্ধে একটি গোল হয়। তখন খেলা শেষ হইতে মাত্র ৪ মিনিট বাকী। মহমেডান দল এইদিন খেলায় প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ এই দলের খেলোয়াড়গণের অহেতুক নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে খেলিবার ইচ্ছা হইতেই পাওয়া গিয়াছে। এইদিন রেফারীকে এই দলের তিনজন খেলোয়াড়কে পর পর সতর্ক করিয়া দিতে হয়। এমন কি খেলা শেষ হইবার দুই মিনিট পূর্বে মহমেডান স্পোর্টিং দলের অধিনায়ক মাসুমকে রেফারী মাঠ হইতে বাহির পর্যন্ত করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই সময় এই খেলোয়াড়টি মোহনবাগান দলের ব্যাক টি চৌধুরীকে অযথা একটি ঘুসী মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মহমেডান স্পোর্টিং দল এইদিন বিজয়ী হইল বটে, কিন্তু খেলোয়াড়গণের আচরণ দলের জয়লাভের সম্মান অনেকখানি ম্লান করিয়া দিল। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, মাসুমের ঐ আচরণ বিচার করিবার জন্য আই এফ এর ফুটবল লীগ সাব-কমিটির এক বিশেষ সভা হয়। ঐ সভায় মাসুমকে সভাপতি সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং এই বলিয়া অব্যাহতি দেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার দলের কোন খেলোয়াড় যদি ঐরূপ নীতিবিরুদ্ধ প্রথা অবলম্বন করে, তবে আই এফ এ লীগ সাবকমিটি অতি গুরুতর শাস্তি দিতে বাধ্য হইবেন। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব গত ছয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে, এইবারও হয়তো লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ, ডুরান্ড কাপ প্রভৃতি ভারতের সকল বিশিষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছে। এইরূপ একটি ভারতবিখ্যাত কীর্তিসম্পন্ন দলের অধিনায়ক খেলায় নীতিবিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করায় সতর্কিত হইলেন, ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। আমরা আশা করি, মহমেডান স্পোর্টিং দলের পরিচালকগণ দলের খেলোয়াড়গণ ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ আচরণ না করে, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দল প্রথমার্ধের শেষ খেলাগুলিতে যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সূচনায় তাহা বর্তমান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে এই দুই দলের মধ্যে কোন দলেরই চ্যাম্পিয়ান হইবার আর সম্ভাবনা নাই। মোহনবাগান ৫ পয়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল ৬ পয়েন্টে মহমেডান স্পোর্টিং দলের পশ্চাতে পড়িয়াছে। একমাত্র অঘটন যদি ঘটে, অর্থাৎ মহমেডান স্পোর্টিং দল পর পর যদি তিনটি খেলায় পরাজিত হয়, তবেই ইহাদের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং দল বর্তমানে যেরূপ খেলিতেছে, তাহাতে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে এই দুইটি দলের মধ্যে লীগ প্রতিযোগিতার রাণার্স আপ লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে, সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এরিয়ান্স, ভবানীপুর ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন

এরিয়ান্স, ভবানীপুর ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন এই তিনটি দলের খেলা পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। এই সকল দল বর্তমানে যেরূপ খেলিতেছে, তাহাতে লীগ তালিকায় ইহাদের স্থান উপরিভাগে শেষ পর্যন্ত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এই সকল দলের স্থান উপরিভাগে হইলে ভারতীয় খেলোয়াড়গণেরই সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। কারণ তাহা হইলে লীগ তালিকার নিম্নভাগে কেবল ইউরোপীয় বা ইউরোপীয় পরিচালিত দলসমূহেরই স্থান হইবে। এই বিষয় ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র কালীঘাট দল সুবিধা করিতে পারিবে বলিয়া সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই দলের খেলোয়াড়গণ কেন যেন খেলায়

বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। ভারতীয় দলের সম্মান বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া ইহাদের উচিত খেলায় উন্নতি করা।

ভারতীয় খেলোয়াড়গণের বুট ব্যবহার

গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণের মধ্যে বুট ব্যবহার করিবার ইচ্ছা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। বর্তমানে বর্ষার দিনে কর্দমাক্ত মাঠে সকল বিশিষ্ট দলের খেলোয়াড়গণই বুট পরিয়া থাকেন। প্রথম প্রথম বুট ব্যবহার করায় খেলায় সুবিধা করিতে পারিতেন না। কিন্তু এই বৎসরে বুট ব্যবহার করায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ স্বাভাবিক খেলা প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইতেছেন বলিয়া কেহই দোষারোপ করিতে পারিবেন না। নিয়মিত অনুশীলন করার ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ বুট ব্যবহারে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, নগ্নপায়ে খেলার সহিত বুট পায়ে খেলার তারতম্য করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মাঠে ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের অপেক্ষা ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলাই অপেক্ষাকৃত ভাল হইতেছে। পূর্বে ভীষণ বৃষ্টির পর ভারতীয় বনাম কোন ইউরোপীয় দলের খেলা থাকিলে স্বভাবত ক্রীড়ামোদিগণ ইউরোপীয় দল বিজয়ী হইবে বলিয়াই আশঙ্কা মনে পোষণ করিয়া খেলার মাঠে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই আশঙ্কা কোন ক্রীড়ামোদীর প্রাণে স্থান পায় না। ইউরোপীয় দলের সহিত ভারতীয় দল যে কর্দমাক্ত মাঠে সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, এই ভরসা সকলেই করেন এবং ইহা ভরসা করা সম্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড়গণের বুট পরিহিত অবস্থায় স্বাভাবিক খেলা দেখিয়া। কলিকাতার মাঠে ভারতীয় খেলোয়াড়গণের মধ্যে বুট পরিধানের প্রচলন যেরূপ হইয়াছে, অদূরভবিষ্যতে বাঙলার সকল খেলোয়াড়-গণের মধ্যেই তাহা প্রসারলাভ করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। নিম্নে লীগ প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

লীগ খেলার ফলাফল

	খেঃ	জঃ	ড্র	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
মহমেডান স্পোর্টিং	১৫	১৪	১	০	৩২	৪	২৯
মোহনবাগান	১৪	১০	২	২	১৮	৬	২২
ইস্টবেঙ্গল	১৪	১০	১	৩	২৮	৯	২১
পুলিশ	১৪	৭	৩	৪	১৬	৯	১৭
রেঞ্জার্স	১৪	৫	৫	৪	১৯	১০	১৫
এরিয়ান্স	১৪	৭	০	৭	১৯	২৩	১৪
ভবানীপুর	১৪	৫	৩	৬	১২	১৬	১৩
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	১৫	৩	৬	৬	১০	১৭	১২
কাণ্টমস	১৪	৩	৬	৫	১০	২০	১২
ই বি আর	১৪	৪	৩	৭	১৯	১৮	১১
কালীঘাট	১৪	৫	১	৮	১৩	১৮	১১
ডালহৌসী	১৫	৪	৩	৮	১৪	২৪	১১
নর্থ স্ট্যাফোর্ডস	১৪	২	২	১০	১৩	৩০	৬
ক্যালকাটা	১৫	২	২	১১	১০	২৯	৬

যুক্তপ্রদেশ হার্ড কোর্ট টেনিস

যুক্তপ্রদেশ হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি মুসৌরীতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। গউস মহম্মদ, ইফ্‌তিকার প্রভৃতি বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়গণ এই খেলায় যোগদান করেন। উক্ত খেলোয়াড়গণ ক্ষমা প্রার্থনা করায় নিখিল ভারত টেনিস ফেডারেশন উহাদিগকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার অনুমতি দিয়াছেন। প্রতিযোগিতাটি বেশ দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের প্রায় সকল বিশিষ্ট খেলোয়াড় ইহাতে যোগদান করেন। গউস মহম্মদ সিংগলস ফাইনালে ইফ্‌তিকার আমেদকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। ইফ্‌তিকার আমেদ গউস মহম্মদকে মিক্সড ডাবলস ফাইনালে পরাজিত করিয়াছেন। এমন কি পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে প্রেম গান্ধীর সহযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে পুরুষদের ডাবলস ফাইনালের খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল। এই খেলার শেষ মীমাংসা হয় পঞ্চম সেটে ও উভয় দলের খেলোয়াড়গণকে ৬০টি গেম খেলিতে হইয়াছে। খেলাটি শেষ হইতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। প্রতিদ্বন্দ্বী বলবন্ত সিং ও কুনার কৃষ্ণ জোর প্রতিযোগিতা করিয়া পরাজয় বরণ করিয়াছেন। কি পুরুষ, কি মহিলা বিভাগে কোন ইউরোপীয় খেলোয়াড় সাফল্য লাভ করেন নাই। মিস্ ভরদ্বারের খেলা দেখিয়া অনেককেই বলিতে হইয়াছে যে, তিনি ভবিষ্যতে কুমারী লীলা রাওর স্থান অধিকার করিতে পারিবেন। মহিলাদের ডাবলস বিভাগে মিসেস রাঠোরের খেলাও অনেককে আশ্চর্য করিয়াছে।

বোম্বাই মিস্ লীলা রাওকে, করাচী মিস্ ডুবাসকে, যুক্তপ্রদেশ মিস্ ভরদ্বার ও মিস্ আজিজকে লাভ করিয়া ভারতীয় টেনিস ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রদেশের মহিলাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইতেছেন; কেবল বাঙলাপ্রদেশ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। ইহা বাঙলার মহিলা সমাজের সম্মান নিশ্চয় বৃদ্ধি করিতেছে না? টেনিস মাঠে বাঙালী মহিলাগণের ভীড় দেখিয়া মনে হয় এই খেলা বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট উৎসাহ আছে। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা এখনও পর্যন্ত দর্শকের আসন ছাড়িয়া খেলার মাঠে অবতীর্ণ কেন হইতেছেন না ইহাই আমাদের নিকট আশ্চর্য মনে হয়?

খেলার ফলাফলঃ—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল

গউস মহম্মদ ৬—৩, ৬—১, ৬—৪ গেমে ইফ্‌তিকার আমেদকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল

মিস্ ভরদ্বার ৬—৩, ৬—৩ গেমে মিস্ এঞ্জেলোকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

ইফ্‌তিকার আমেদ ও প্রেম গান্ধী ৯—৭, ৪—৬, ৩—৬, ৬—১, ১০—৮ গেমে বলবন্ত সিং ও কুনার কৃষ্ণকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

ইফ্‌তিকার আমেদ ও মিস্ আজিজ ৬—২, ২—৬, ৬—৩ গেমে গউস মহম্মদ ও মিস্ হামিদা জাফরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল

মিসেস রাঠোর ও মিস্ খান্না ৮—৬, ৬—১ গেমে মিস্ আজিজ ও তদীয় সঙ্গিনীকে পরাজিত করেন।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রই পৃথিবীর রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখে গেল। মহাভারত কোন্ যুগের—তারপর কত শত বংশ লোপ পেয়ে গেল—কত নূতন বংশ পৃথিবীতে আবির্ভাব হ'য়ে কত রকম ঘটনাকেই না চিরস্মরণীয় ক'রে গেল। কিন্তু শত পুত্রের আবির্ভাব আর সম্ভব হ'ল না। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী পুত্র কন্যার জননী হিসাবে জনৈকা জার্মান মহিলার নাম আছে। ১৯৩৫ সালে ঐ মহিলাটির বহু দিনের বিধ্বস্ত সমাধিগহ্বরের উপর একটি সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ ক'রে সেই গুণাবতী মহিলাকে সম্মান দান করা হয়। মহিলাটি ৫৩টি পুত্র কন্যা রেখে পঞ্চদশ শতাব্দীতে গতায়ু হন। ৫৩ পুত্রকন্যার মধ্যে ৩৮ পুত্র এবং ১৫ কন্যা ছিল।

* * * * *

১৯২৬ সালে স্পেনের কোন একটি পল্লীতে ৬৮ বৎসরের জনৈকা বয়ীয়সী মহিলা তাঁর ঊনত্রিংশ পুত্র প্রসব করেন। ঘটনাটি স্বাভাবিক বলতে হবে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, গণনায় দেখা গেছে, প্রতি ৩,৩০০ জন মহিলার মধ্যে মাত্র একজন মহিলার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সন্তান ধারণ করবার সম্ভাবনা থাকে। ১৯২৮ সালে ইজিপ্টের জনৈকা মহিলা এককালীন চার কন্যা এবং দুটি পুত্র প্রসব করেন।

* * * *

প্রাণীর জীবনে দাঁতের ক্রমবিকাশ সব থেকে দেরীতে। দাঁতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার নয়। কয়েক শ্রেণীর ক্ষুদ্র কীট দাঁত দিয়ে পায়ের কাজও চালায়। কোন জিনিসকে ধরে নিয়ে যেতে, শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ চালাতে এবং খাদ্য-বস্তুকে ভাগ করতে তাদের দাঁত ব্যবহার করতে হয়। কেবল-মাত্র খাদ্যবস্তু উত্তমরূপে চর্বণ করবার জন্য মানুষের দাঁতের প্রয়োজন বেশী। অনেক জীবের তুলনায় মানুষের দাঁতের সংখ্যা বোধ হয় সেই জন্যই কম। শামুকের দাঁত খুব বেশী। এত বেশী যে তা শুনলে ভয় পায়। এক জাতীয় শামুকের দাঁতের সংখ্যা হিসাব নিয়ে দেখা গেছে প্রায় ১৪,১৭৫। এই দাঁতগুলি ১৩৫টি সারিতে সাজান। শামুক খুবই নিরীহ জীব। এতগুলি দাঁতের সঙ্গে যদি সেই পরিমাণ বিক্রম থাকত, তাহলে পল্লীগ্রামের পুকুরের জলে আর নামা চলত না।

* * * * *

জীব বিশেষে দাঁতের গঠন ভিন্ন এবং শক্তি ভিন্ন। সরীসৃপ শ্রেণীর জীবের দাঁত প্রায় একই রকম বলা যায়। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবজন্তুদের দাঁত সব ভিন্ন গঠনের। দাঁতের এত অদ্ভুত আকার এবং তাদের শক্তিও এমন যে আমাদের নিজেদের দাঁতের কথা স্মরণ করে হতাশ হ'তে হয়। হাতীর দাঁত লম্বায় দশ ফিট আর ওজনে আধ টন হতে দেখা গেছে।

* * * * * *

সাপের দৈহিক দৈর্ঘ্য যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছায় সে সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর সংবাদ থাকলেও আরব্য উপন্যাসের মতই তা অদ্ভুত মনে হয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে জলবোড়া দৈর্ঘ্যে ৫৪ ফিট ছিল। বর্তমানের জীবিত সর্পবংশের মধ্যে আফ্রিকার পাইথন এবং ব্রেজিলের জলবোড়া দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ ফিট পর্যন্ত পৌঁছায়।

* * * * * *

বন্য জীবজন্তুদের কি পরিমাণ বাজার দাম তা সকলের জানা সম্ভব নয়। লন্ডন পশুশালায় সর্বাপেক্ষা দামী পশু—বৃহৎ পান্ডা, গরিলা, ওকাপী এবং ভারতীয় গন্ডার। তাদের দাম ১,০০০ পাউন্ড। ভারতীয় হাতীর দাম ৬০০ পাউন্ড। নাইল হিপ্পোপোটামাসের দাম ৮০০ পাউন্ড। একশ' বছর আগে একটি সিংহের দাম ছিল ২০০ পাউন্ড। এখন সর্বাপেক্ষা বেশী দাম হচ্ছে ৪০ পাউন্ড। পৃথিবীর নানা জাতীয় পাখীও বেশী দামে পশুশালায় আমদানী করা হয়। ছোট বড় হরেক রকমের পাখী তাদের অভ্যস্ত কৃত্রিম জলবায়ুর উপর বাসা তৈরী ক'রে পালন করা হয়। অনেক সুখী জীব থাকে যারা নিজের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য কোন জলহাওয়ায় বাঁচতে পারে না। পশুশালার চিকিৎসকদের শত চেষ্টায় কৃত্রিম বাসার মধ্যে থেকেও তারা বার বার তাঁদের নিরাশ করে।

* * * * *

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পাখী 'হামিং বার্ড'। এরা রাণী-মৌমাছির থেকে বড় নয়। ফুলের মধু পান করে জীবন ধারণ করে।

* * * * *

কুম্ভকর্ণের ঘুমের তুলনা নাকি পৃথিবীতে আর নেই। কেউ একটু বেশী ঘুমুলে আমরা তাকে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তুলনা ক'রে তার নামে অপবাদ রটিয়ে বেড়াই। আমেরিকায় সেন্ট চার্লসের সন্নিকটে হার্মস নামে জনৈক ভদ্রলোক তাঁর কুঁড়েতে পড়ে ক্রমান্বয়ে ৩০ বৎসর ঘুমিয়ে ছিলেন। যখন তিনি বিছানায় শুতে যান তখন দেহের ওজন ছিল ১৪ স্টোন—দীর্ঘ ৩০ বৎসরের নিদ্রাভঙ্গের পর দেহের ওজন দাঁড়িয়েছিল

৬ স্টোনে। আর কিছুদিন ঘুমিয়ে থাকলেই তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে যেতেন আর কি! এ ছাড়া একজন রেলের পয়েণ্টস্‌-ম্যান এক দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ ১৮ বছর সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিল। ১৮৯৯ সালে তার মৃত্যু হয়।

* * * * *

পৃথিবীতে ১৩,০০০ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীব, ২৪,০০০ শ্রেণীর পাখী এবং ৭,০০০ শ্রেণীর সরীসৃপ আছে।

* * * *

গরু কখনও কখনও প্রতিদিন ২৫বার জলপান করে।

* * * *

বিষাক্ত 'বেলেডোনা' গাছের নামকরণ হয়েছে ইটালী ভাষা থেকে। ইটালী ভাষায় এর অর্থ 'Beautiful Lady—সুন্দরী তন্বী'। চক্ষু উজ্জ্বল করবার জন্য বেলেডোনার নিষ্কাশন বহু প্রাচীনকাল থেকেই নাকি ব্যবহার করা হ'ত।

* * * *

আধুনিক একটি মোটরকারে কি পরিমাণ রবার থাকে তার একটি হিসাব করা হয়েছে। হিসাবে দেখা গেছে সাধারণত ৫০ থেকে ৮০ পাউণ্ড পর্যন্ত (টিউব এবং টায়ার নিয়ে) রবার থাকে।

* * * *

বিশেষভাবে ছবি তুলে দেখা গেছে, কাচে আঘাত লেগে কাচের উপর যে ফাটল ধরে তার গতিবেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে এক মাইল।

* * * *

আমেরিকাতে ব্যবসার দিক থেকে হোটেলের ব্যবসা সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। এ ব্যবসায় ৫৫০,০০০ লোক নিযুক্ত রয়েছে আর ঐ লোক প্রতি দিন ২০০,০০০,০০০ সভ্যদের পরিবেশন এবং তদারক করছে।

* * * *

বাড়ি, গাড়ি এমনি আরও কত জিনিষ ভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু সাংহাইয়ে খবরের কাগজ বিক্রী করার থেকে বেশী ভাড়া দেওয়া হয়। খুব সকালে হকার এসে কাগজ দিয়ে যায় তার পর নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে এসে ভাড়া চুকিয়ে কাগজ ফেরত নিয়ে যায়। সেখানে এমনিভাবে মাত্র একখানা কাগজ ১২জনের কাছে রোজ ভাড়া খাটে।

* * * * * *

ইউরোপের মধ্যযুগে সব দপ্তরীই ছিল সন্ন্যাসী (Monk)। সে সময়ে বই বাঁধানোর কাজ সৎবৃত্তি হিসাবে গণ্য করা হত।

* * * *

দীর্ঘ দিন ধরে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্যদের কেবল ছদ্ম নাম (Nicknames) দেওয়া হয়নি। বহুবার পার্লামেণ্টেরও ছদ্ম নাম দেওয়া হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ছদ্ম নাম দেওয়া হয়েছিল 'Mad'। ১৩৭৬ সালে পার্লামেণ্টের নাম ছিল 'Good'। এর বার বৎসর পর 'Wonderful' এই ছদ্ম নামে পার্লামেণ্টকে অভিহিত করা হত। ১৪৫৪ সালে পার্লামেণ্টের ছদ্ম নামকরণ হয় 'Unlearned'। এই নামের একটা কারণও ছিল। ঐ সময়ে পার্লামেণ্টে একজনও আইনজ্ঞ সভ্য ছিলেন না। পার্লামেণ্টের যেসব ছদ্ম নাম রাখা হয়েছিল তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছদ্ম নাম হচ্ছে 'Cadeal'। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বে যাঁরা মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের নামের আদ্য অক্ষর নিয়ে এই ছদ্ম নামটির উদ্ভব হয়। এর অর্থ—রাজনৈতিক দল অথবা Junta'. সে সময়ে মন্ত্রী ছিলেনঃ—Sir Thomas Clifford, Lord Ashby, the Duke of Buckingham, Lord Arlington, and the Earl of Landerdale.

পার্লামেণ্টের সভ্যদের যে সব চমৎকার ছদ্ম নাম রয়েছে তা তালিকায় শেষ করা সময় সাপেক্ষ। দু'একটার কথা উল্লেখ করছি। Lord Palmerston চুলের উপর এবং প্রসাধনে বেশী রকম যত্ন নিতেন। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'Cupid'. বিখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড মেকলের ছদ্ম নাম ছিল 'Dictionary in Breeches'. ডেনিয়েল ও'কোনেল 'Big Beggar' নামে পরিচিত ছিলেন। গ্লাডষ্টোনের নাম ছিল 'An old man in a hurry'. পরে তাঁকে 'Grand old man' এই নামেও ভূষিত করা হয়েছিল। ইংলণ্ডের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী চার্চিলকে 'Winnie' এই নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে দু'একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিরও এই ধরণের নাম আছে। তবে নামকরণে ত্রুটি থাকায় সেগুলি বেশ জমেনি।

পুস্তক পরিচয়

ধূসর ধরণী:—(উপন্যাস) শ্রীগোতম সেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানা আমাদের ভালো লাগিয়াছে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী মুগ্ধকর। অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা আছে। চরিত্রগুলি সরস, উজ্জ্বল এবং জীবন্ত করিয়া তুলিবার মত কারিগরির পরিচয় উপন্যাসখানার বর্তমান জগতের সভ্যতার পিছনে হাজার হাজার বৎসরের যে আগাগোড়া পাওয়া যায়। সমঝদার সমাজে এ বইয়ের আদর হইবে।

সভ্যতার জয়যাত্রা:—শ্রদ্ধানন্দ শর্মা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। ইতিহাস আছে, বিভিন্ন জাতির উঠাপড়ার ভিতর দিয়া এই সভ্যতা কিভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এই ছোট বইখানা পড়িলে ছেলেমেয়েরা মোটামুটি তাহা ধারণা করিতে পারিবে। বইখানাতে ভারতবর্ষ, সুমের, এসিরিয়া, বেবিলন, মিশর, চালদিয়া, মহাচীন, পারস্য, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের সভ্যতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। কয়েকখানা প্রয়োজনীয় ছবি থাকাতে বইখানা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। বইখানা ছেলেমেয়েদিগকে পড়িতে দিলে তাহারা অনেক বিষয় জানিতে এবং শিখিতে পারিবে।

নৃত্য:—সাময়িক পত্র। প্রতি ঋতুতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—ব্রহ্মানন্দ শর্মা। কার্যালয়—৫, কৃষ্ণ কুণ্ডু স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।

গ্রীষ্ম সংখ্যায় নৃত্যশিল্প সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা রহিয়াছে। লেখাগুলি সবই সুচিন্তিত এবং তথ্যপূর্ণ। নৃত্যকলা সম্বন্ধে যাঁহারা আগ্রহশীল এবং নৃত্যশিল্পের রসমর্মের সমজদার, তাঁহাদের মধ্যে এ পত্রের আদর হওয়া উচিত। পত্রিকাখানা ছোট হইলেও নৃত্য রসতত্ত্বের দিক হইতে সারবান আলোচনার দ্বারা ইহা সমাজের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিতে পারে।

নাচঘর (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)—সম্পাদক সুশীল রায়, পরিচালক ধীরেন সেন, ৮ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা মূল্য চার আনা।

আমরা নাচঘর মাসিক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পত্রিকাটি সর্বদিক হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার বাহিক সৌন্দর্য এবং রচনাবলী প্রশংসা দাবী করে। শ্রীযুত বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্তা গায়ত্রী রায় প্রভৃতি লিখিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য লিখিত গল্পটি সুখপাঠ্য। ইহা ছাড়া বিভাগীয় লেখাগুলি সুনির্বাচিত ও সুলিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুশীল রায় লিখিত 'চক্র' কবিতাটির প্রশংসা বিশেষভাবে করা প্রয়োজন, কবিতাটির বিষয়ভঙ্গী, ছন্দনৈপুণ্য এবং বিষয়বস্তুর অপূর্ব সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীযুত গোপাল ভৌমিক ও স্বর্গীয় সরোজকুমার মজুমদারের লিখিত অনুবাদ ও মূল উপন্যাস দুইটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা নাচঘরের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া প্রীত হইলাম।

প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

ঢাকার 'সাহিত্য-সংসদ'-এর পক্ষ হইতে আমরা যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলাম, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুণ উহার ফলাফল প্রকাশ করিতে একটু বিলম্ব হইল।

উপযুক্ত প্রবন্ধ না আসায় কাহাকেও পুরস্কৃত করা হয় নাই।

কবিতা:—প্রথম—'বন্দীর বেদনা'—সোমেশ দাস (নোয়াখালী)। উল্লেখযোগ্য—'শান্তি'—শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী (আসাম), 'হায় মোর দেবতা কোথায়'—শ্রীঅমূল্য চক্রবর্তী (বগুড়া)।

ছোট গল্প:—প্রথম—'প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল'—রেণু দাস (কুমিল্লা)। উল্লেখযোগ্য—'রাতের দুর্যোগে'—মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (চব্বিশ পরগণা), 'মৃত্যুক্ষুধা'—শ্রীনরেশ চক্রবর্তী (কলিকাতা —ভবানীপুর)।

সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এমন রচনা কতক বাতিল করা হইয়াছে।

ইতি—

—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, ২নং ঢাকেশ্বরী মিলস্, "দেশবন্ধু বিল্ডিংস" পোঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মিলস্, ঢাকা।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতে:—ডাকমাসুল সহ ৬।৷০ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশে:—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে:—ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫।৷০ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ:—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	১ মাস	এক সংখ্যার জন্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এক-কালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

৬০০০ নিয়মিত গ্রাহক এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ

বাঙ্গলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম সংবাদপত্র

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

পাঠ করিয়া থাকেন।

যেখানে প্রত্যহ ডাক যায় না, যেখানে দৈনিক পত্রিকা পাওয়া সম্ভব নহে এবং যাঁহাদের দৈনিক পত্রিকা রাখিবার সামর্থ্য নাই—সেখানে এবং তাঁহাদের পক্ষে

অর্দ্ধসাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকাই

একমাত্র অবলম্বনীয়।

এই পত্রিকা পাঠে বালক-বালিকারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে—যুবক-যুবতীরা অনেক বিষয় জানিতে পারে—বয়স্কদের কাজের সুবিধা হয়।

প্রতি সোমবার ও শুক্রবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।
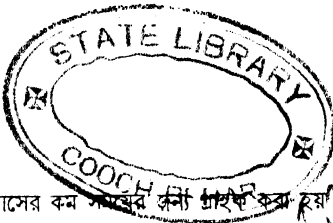
মূল্য ডাকমাশুল সমেত

বার্ষিক	৬৲ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩৲ টাকা

ছয় মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে এক সংখ্যা নমুনা গ্রহণ করুন এবং পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলে গ্রাহক হউন।

ম্যানেজার—আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ

১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮ম বর্ষ] ১৪ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৪৮ Saturday, 28th June, 1941 [৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

যুদ্ধের আদর্শ—

মিসেস পার্ল বাকের নাম অনেকেই জানেন, কয়েক বৎসর আগে ইনি সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিতা হইয়াছেন। তিনি সুলেখিকা, বিশেষত সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার সুযশ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই উদারহৃদয়া মহিলা সম্প্রতি যুদ্ধের আদর্শের প্রতি তথাকথিত গণতান্ত্রিকতা-বাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিয়াছেন,—"কাহাদের স্বাধীনতা এবং সমাধিকারের জন্য আমরা লড়াই করিতেছি, যদি সকলের অধিকারের জন্য লড়াই না হয়? আমরা গণতন্ত্রের সমর্থন করিয়া থাকি, কিন্তু যদি সকলকে রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে কাহাদিগকে আমরা রক্ষা করিতেছি! যদি লড়াইয়ের সমস্যাটির আমরা এইরূপে সমগ্রভাবে সম্মুখীন না হই, তাহা হইলে হিটলার পরাজিত হইলেও আমরা হারিব।" মিসেস পার্ল বাক মানবতার দিক হইতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, আমেরিকার ১ কোটি ২০ লক্ষ নির্যাতিত নিগ্রোদের জন্য তাঁহার প্রাণে বেদনা বাজিয়াছে। ভারতের প্রকৃত গণতন্ত্রের অধিকারকে তিনি স্বীকার করিয়া লইতে বলিয়াছেন এবং ইহা জানাইয়াছেন যে, বিগত মহাসমরের সময় মানুষের মনের অবস্থা যেমন ছিল, এখন তেমন নাই। বিগত মহাসমর কতকটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে হঠাৎ দেখা দিয়াছিল; কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ বাধিয়াছে বহু বৎসরব্যাপী দুঃখকষ্ট এবং আর্থিক অসুবিধার মধ্যে। বর্তমান যুদ্ধে ভাবপ্রবণতার চেয়ে জীবন-যাত্রার বাস্তবতার দিকে মানুষের ঝোঁক বেশী পড়িয়াছে। শুধু বড় বড় কথা না আওড়াইয়া তিনি মানুষের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে বলিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, তাহা হইলে গণতন্ত্রের জয় কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কংগ্রেসও ভারতের পক্ষ হইতে ঠিক এই কথাই বলিতেছে; কিন্তু সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ করিবার মত রাজনীতিক দূরদর্শিতা কর্তাদের কোথায়?

ভারত নারীর উত্তর—

কতিপয় ব্রিটিশ মহিলা ভারত নারীদের উদ্দেশে যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন, নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজওয়াড়ে, শ্রীযুক্তা রাধাবাঈ সুব্বারায়ণ, শ্রীযুক্তা আম্মু স্বামীনাথম্ এবং রাজকুমারী অমৃত কাউর তাহার একটা জবাব দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, 'নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিস্টবাদ সম্পর্কে তাঁহারা কোন প্রীতির ভাব পোষণ করেন না। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতনারীরা কি করিতে পারেন? ব্রিটিশ প্রভুদের দ্বারা ভারতের নীতি পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারত একটি অধীন দেশ মাত্র, কাজেই বৃটেনের ইচ্ছায় ইহাকে কাজে লাগান যাইতে পারে এবং লাগান হইতেছে। ব্রিটেনের রাজনীতিকগণ সংগ্রাম পরিচালনা সম্পর্কে চিন্তাশীল ভারতীয় নরনারীর সম্মতি বা সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না।' স্বাধীন যে, স্বাধীন জাতির সহযোগিতা সেই করিতে পারে, অধীনের পক্ষে সহযোগিতার কোন প্রশ্নই উঠে না। ভারত নারীরা মর্যাদাদৃপ্ত ভাষায় উপসংহারে বলিয়াছেন,—"ক্রীতদাসের মালিককে পূর্ব পাপের সংশোধন করিয়া তাঁহার নিজের কাজ যে ন্যায্য, তাহা প্রদর্শন করিতে না বলিয়া ব্রিটিশ নারীরা বিপন্ন প্রভুকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট অসঙ্গত মনে হয়।' ভারত নারীদের অন্তরের এই বেদনাকে ব্রিটিশ নারীরা সংস্কারশূন্য চিত্তে মর্যাদা দিতে পারিবেন কি? আমাদের সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

কথা নহে কাজ চাই—

ব্রিটিশ নারীদের আবেদনের উত্তরে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের উপর যে অসহায়ত্ব এবং মনুষ্যত্বহীনতার গ্লানি

পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—"আমরা যতদিন ক্রীতদাস থাকিব, ততদিন আপনাদের উদ্দেশ্য সার্থক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আপনাদের সমকক্ষ হিসাবে স্বেচ্ছায় যদি আমরা আপনাদিগকে সাহায্য করিতে পারি, তবেই তাহার মূল্য থাকিবে। ব্রিটিশের ঘোষণা হইতে আমরা আর তাহাকে বিচার করিব না—তাহার কার্য দ্বারাই বিচার করিব।" ব্রিটিশ নারীগণ যুদ্ধের পর ভারতের যে সুখ-সম্পদময় ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মতিগতি দেখিয়া ভারতের তেমন ভবিষ্যতের আশা ভারতবাসীদের চিত্তে উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব হইতে পারে কি? ভারতবাসীদের প্রকৃত সহযোগিতা লাভ করা যদি ব্রিটিশ রাজনীতিকরা প্রয়োজন বোধ করিতেন, তবে কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইবার পক্ষে যে সব অবান্তর অন্তরায়ের প্রশ্ন তাহাদের মনে উঠিতেছে, সেগুলি উঠিবারই অবসর ঘটিত না।

দুর্দিনের ঘনঘটা—

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ, বরিশালে এবং নোয়াখালীতে ঝঞ্ঝাপীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর হাহাকার দিন দিন বাঙলা দেশের আকাশকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, ইহার মধ্যে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার অবস্থাও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে যে পরিমাণ জল হয় যমুনার প্লাবনে এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই বৃষ্টির ফলে সেই পরিমাণ জল হইয়াছে এবং তাহার ফলে আউস ধানের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। জল যদি না নামে, তাহা হইলে আমন ধান এবং পাটের ফসলও নষ্ট হইবে। টাঙ্গাইল মহকুমার বাসাইল থানা, কালীহাতী থানা, গোপালপুর এবং নাগরপুর থানা এবং মির্জাপুর ও ঘাটাইল থানায় অন্নকষ্ট দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকেও আমরা বারংবার এই নিবেদন করিতেছি, এই-সব অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন দেশবাসীদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা প্রত্যেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। যিনি যেমন পারেন, সেইরূপ সাহায্যই করুন। এ কর্তব্য আমাদের সকলের কর্তব্য, পরের ভরসায় আমরা যেন সেই কর্তব্য প্রতিপালনে উদাসীন না থাকি।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দশা—

ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি ভোলা, চাঁদপুর, নোয়াখালি প্রভৃতি বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি একটি বিবৃতিতে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা কি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। মুখুজ্যে মহাশয় ঝড়ের তিন সপ্তাহ পরে ভোলা গমন করেন, তিনি তখনও এখানে সেখানে মৃতদেহ পড়িয়া আছে দেখিয়াছেন এবং অসংখ্য জায়গায় দেখিয়াছেন গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুর হাড়ের গাদা। লোকের অর্থনীতিক দুর্দশা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, জীবনযাত্রার ধারা ঠিক করিয়া লইতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইবে। মুখুজ্যে মহাশয় বলিয়াছেন, দুঃখ-দুর্দশা যে কেবল যাহারা কৃষক তাহাদেরই ঘটিয়াছে, এমন নহে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাও বর্ণনাতীত। ছোটখাটো জমীদার, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, দোকানদার ইহারাও আজ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ সরকার হইতে ইঁহারা কোন সাহায্যই পাইতেছেন না। নোয়াখালি এবং ভোলার অর্থনীতিক অবস্থার কতটা বিপর্যয় এই ঝঞ্ঝাবাতে ঘটিয়াছে বাহির হইতে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। এইসব জায়গায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা প্রধান আয় হইল সুপারীর বাগিচার, মুখুজ্যে মহাশয় লিখিয়াছেন, ঝড়ের ফলে একটি সুপারীর গাছও খাড়া নাই। ঘর-বাড়ি পাকা ইমারত ছাড়া সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি,সরকারী সাহায্যের আরও বেশী ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং সেই সাহায্য যাহারা বিপন্ন, জাতি, ধর্ম এবং শ্রেণীনির্বিশেষে সকলে যাহাতে পায়, কর্মচারীদের প্রতি সেইরূপ নির্দেশ থাকা কর্তব্য।

কলিকাতায় দীপ-নির্বাণ—

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট, চিত অতি শঙ্কিত পঙ্কিল বাট'—এই বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য কলিকাতাবাসীদের সৌভাগ্য যে, তাঁহারা কিছুদিন হইল কর্তাদের দীপ-নির্বাণ ব্যবস্থার কল্যাণে মর্মে মর্মে উপভোগ করিতে পারিতেছেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—এ দেশের ধারা, বিশেষভাবে এই বাঙলা দেশে। এখানে কর্তাদের ইচ্ছা যদি থাকে ডাকিয়া আনা কর্মীরা বাঁধিয়া লইয়া আসে। উড়োজাহাজ হইতে শত্রু পক্ষের বোমা পড়িবার সম্ভাবনা কলিকাতা শহরের উপর কতখানি, এদেশের সামরিক কর্তারাই বলিতে পারেন; কিন্তু কর্তাদের আদেশ প্রতিপালনে কর্মীদের উৎকট আগ্রহের ফলে শহরবাসীদের যে নিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। শুনিতেছি জ্যোৎস্নার আলোকের সময় শহরের যে অবস্থা থাকে দীপ-নির্বাণ ততখানি করাই কর্তাদের উদ্দেশ্য; কিন্তু কাজে দেখিতেছি শহরব্যাপী সূচিভেদ্য অন্ধকার, এ উহার ঘাড়ে পড়িলেও দেখিবার উপায় নাই। গাড়ী ঘোড়া কখন উপরে আসিয়া চাপে এই ভয়ে সন্ধ্যার পরে শহরের রাস্তায় পা বাড়াইতেও ভয় হয়; ইহার উপর চোর পকেটমার ইহাদের ভয় তো আছেই। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সম্প্রতি এক ইস্তাহার জারী করিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন যে, সন্ধ্যার পরে কেহ যেন বেশী টাকা-পয়সা বা মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া পথে বাহির না হন। পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের এই সুবিবেচনার জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু কথা হইল এই যে, চোর বা পকেটমার প্রভুরা জ্যোতির্বিদ্যায় এতটা সুপণ্ডিত নহে যে, এই গভীর অন্ধকারে মুখ চিনিয়া বুঝিয়া লইবে, কাহার কাছে টাকা-কড়ি আছে আর না আছে। তাহাদের কৃপায় পড়িলে আগে নিগ্রহ কিঞ্চিৎ ভোগ পরে নিষ্কৃতি। কলিকাতার মত বড় শহরে

এই সব ব্যবস্থায় জনসাধারণের অসুবিধা দূর হইবে না; আসল কথা হইল এই যে, যাহাতে জনসাধারণের অসুবিধা না হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া তেমন উপায় অবলম্বন করা। বোম্বাই শহরেও দীপ-নির্বাণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে জনসাধারণের এমন অসুবিধা হয় নাই। শুনিতেছি এই সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কর্পোরেশনের কর্তাদের কথাবার্তা হইতেছে। চন্দ্রালোকের আস্বাদ শহরবাসীকে দিবার ব্যগ্রতায় যাঁহাদের অত্যধিক আগ্রহে অমাবস্যার আঁধার রজনীর আতঙ্ক শহরবাসীদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। এই সঙ্গে এ আর পি'র অতি উৎসাহীদের খেয়াল হইতে শহরবাসীদিগকে নিশ্চিন্ত করিবার দিকেও কর্তারা একটু দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। এ, আর পি'র সরকারী উপদেষ্টা শ্রীযুত অতুলকুমার সুর মহাশয় স্বয়ং এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, সরকারী আদেশের মর্মের অজ্ঞতাবশত এ আর পি'র লোকেরা অনেক সময়ে গৃহস্থকে অনাবশ্যক উত্যক্ত করিয়া থাকে। আমরা নিজেরাও উহাদের মিলিটারী মেজাজের সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিযোগ পাইয়াছি। খাকি উর্দি গায়ে চড়াইয়া ইহারা কেহ কেহ মনে করে, না জানি কত বড় কি হইয়া পড়িয়াছি। রাস্তায় কতখানি আলো পড়িলে আদেশ লঙ্ঘিত হয়, ইহাদের সে জ্ঞান অনেকেরই নাই। বাহির হইতে বাড়ীর আলো দেখা গেলেই ইহারা গৃহস্থকে আসিয়া ধমকায়। কর্তাদের হুকুমের বাড়াবাড়ি বাঙলা দেশের সব ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী ঘটিয়া থাকে; কিন্তু অনাবশ্যক বাড়াবাড়ির জন্য গোটা শহরের অধিবাসীদিগকে অসুবিধায় ফেলিবার তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারি না। এ ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্ততপক্ষে বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেও বাঁচা যায়।

বিধির বিধান—

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ সেদিন ললিতচন্দ্র হাইত নামক যুবককে তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্রকে হত্যা করিবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ডাদেশ দান করিতে গিয়া বিচারক বলেন,—'দারিদ্র এবং মর্যাদাহানির সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দুইটি নরহত্যা করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, যদি কোন স্বামী পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া তাহার উপর পোষ্যবর্গকে হত্যা করে, তাহা অপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না। আইন কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না যে, দারিদ্র ও পারিবারিক সম্মান হত্যার যৌক্তিকতার সমর্থক।' 'বুভুক্ষিতং কিং ন করোতি পাপং'—পেটের দায়ে মানুষ কোন্ পাপ না করিতে পারে? এদেশের নীতিশাস্ত্রে এমন একটা কথা আছে, কিন্তু যে পেটের দায় সকল পাপের প্ররোচনা যোগায়, তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা আইনের দ্বারা এদেশে নাই; সুতরাং আইনের বিধান যাহা আছে, অপরাধীকে তাহা ভোগ করিতে হইবেই; কিন্তু আইনের বিধান মানুষের তৈয়ারী। যে সমাজ মানুষের পেটের দায় দূর করিবার মত মনুষ্যত্ব দেখাইতে চায় না, বুভুক্ষিতে অন্নমুষ্টির ব্যবস্থা রাখার সম্বন্ধে যে এমন নির্মম ও উদাসীন এবং প্রকৃতপক্ষে সেই উদাসীনতা ও নির্মমতার ফলে পাপকে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিতেছে যে সমাজ, সেই সমাজের উপর ভগবানের বিধান কি রুদ্রমূর্তিতে অবতীর্ণ হইবে না?

ক্রীতদাসের বিধিলিপি—

স্যার হরি সিং গৌড় একজন যে-সে লোক নহেন; তিনি একজন বড় ব্যবহারবিদ্; তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রেও অন্তত মডারেট মহলে তিনি নাম করিয়াছেন, সকলের উপরে তিনি একজন স্যার; কিন্তু তাঁহার সকল গুণ শ্বেতাঙ্গের বর্ণমর্যাদার কাছে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার স্যার খেতাব অসার হইয়াছে তাঁহার কালো চামড়ার জন্য। স্যার হরি সিং কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, বোমা বর্ষণের ফলে তাঁহার আবাসস্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি বিলাতের এক হোটেলে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া আশ্রয় পান নাই। পার্লামেণ্টে এ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মুখপাত্রগণ ভারতবাসীর এই অমর্যাদার কোন প্রতীকার করিতে তাঁহারা যে অক্ষম, মোটের উপর সেই কথাটাই শুনাইয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীদিগের উপর কার্যত এমন ব্যবহার করা যে শাসনে সম্ভব হয়, সেই শাসন-তন্ত্রের কর্ণধারদের মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবাসীদের সমানাধিকার, স্বাধীনতা, স্বায়ত্ত-শাসন এই সব কথা যখন আমরা শুনি তখন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাই পড়ে। এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই, কহিবার কিছু নাই এবং অনুরোধ উপরোধের কর্মও নয়—ভারতবাসীরা যতদিন স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতেই হইবে।

ভারতের জাহাজ নির্মাণের কারখানা—

গত ২১শে জুন ভিজাগাপট্টম বন্দরে ডাক্তার রাজেন্দ্র-প্রসাদ ভারতের প্রথম জাহাজ নির্মাণের কারখানার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা। কারখানাটি প্রথমে কলিকাতার কাছে খুলিবার কথা হয়, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ প্রভাবাধীন কলিকাতার পোর্ট কমিশনার প্রতিষ্ঠান বিরূপ হওয়ায় মাদ্রাজে স্থান নির্বাচন করিতে হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই কারখানা অঞ্চলটির নাম গান্ধী গ্রাম রাখা হইয়াছে। সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত বালচাঁদ হীরাচাঁদ এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে তিনি বিদেশী শাসনের অধীনতার জন্য ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতির প্রতি-কূলতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—'রাজনীতিক ক্ষমতা লাভ না করিলে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের প্রকৃত সম্প্রসারণ কখনই সম্ভব হইবে না, ইহা সহজ, সরল ও পরিষ্কার সিদ্ধান্ত।

আমি আপনাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দান করা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি যে, ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের মহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে যথাসাধ্য সমর্থন করা কর্তব্য মনে করুন। এই প্রতিষ্ঠান রাজনীতিক অধিকার লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহাতে ব্যবসায়ী সমাজ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবে।' ভারতীয় নৌশিল্পের অতীত ইতিহাসের কথা এখানে আমরা আর তুলিতে চাহি না, তুলিতেছি না কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত বাঙালীদের নৌসাধন-শৌর্যের কথা। শুধু এই দুঃখের কথাই বলিতে চাই, এদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জন্য ভারতীয় নৌ-শিল্পের ধ্বংসসাধনেই সকল দিক হইতে সাহায্য করা হইয়াছে, ভারতীয় আইনসভায় হাজির বিল হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যত চেষ্টা হইয়াছে, ভারত গভর্নমেণ্ট কোনটিই অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেন নাই, বরং প্রতিকূলতাই করিয়াছেন। এই সব প্রতিকূলতার আবহাওয়ার মধ্যে সিন্ধিয়া কোম্পানী যে মঙ্গল ব্রতের উদ্বোধন করিলেন, সমগ্র ভারত আগ্রহের সহিত তাহার ক্রমিক উন্নতি লক্ষ্য করিবে।

মিথ্যা প্রচার—

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া পার্লামেণ্টের সদস্যেরা যাহাতে ভুল না করেন, এ জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগের দপ্তর হইতে 'ভারত সংক্রান্ত বক্তৃতার উপাদান' শীর্ষক পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছিল, পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেনসেনের একটি প্রশ্নে এই তথ্যটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই মূল্যবান্ পত্রিকার একখানা মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের চেষ্টায় ভারতে পৌঁছিয়াছে। এই পুস্তিকার আগাগোড়া ভারতবাসীদের গ্লানিতে পূর্ণ। ইহার এক স্থলে বলা হইয়াছে,—"আত্মীয় স্বজনে অনুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন ব্রিটিশের মতে একটা পাপ; কিন্তু ভারতবাসীদের মতে পুণ্য।" আর এক জায়গায় আছে, "ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতের জনসাধারণ চিরকালই হতদরিদ্র ছিল, প্রাচুর্য তাহাদের কখনও ছিল না।" প্রথমোক্ত গ্লানির জবাব কি দিব? দুই শত বৎসরের ভারত শাসনই ব্রিটিশ জাতির আত্মীয় স্বজনের প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শনে স্পৃহাহীনতার প্রমাণ এবং অকৈতব প্রেমেরই আগাগোড়া পরিচয়; দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, ভারতবর্ষ যদি ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে হতদরিদ্রই ছিল, তবে বর্তমান ব্রিটিশ মহিমা প্রচারক প্রভুদের পূর্ব পুরুষেরা সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়া ভারতের উপকূলে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল কোন দায়ে, ভারতের মাটি চাটিয়া খাইবার জন্য নিশ্চয়ই নয়? ভারতবাসীরা এখন পরাধীন অবস্থায় পড়িয়াছে সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে যাহার যাহা খুসী বলিয়া যাইতেছে এবং নিজেদের কাজ বাগাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু মিথ্যা প্রচারেরও একটা মাত্রা আছে। ভারতবাসীদের সহিষ্ণুতার মাত্রা অসীম, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও ধৃষ্টতা এবং নির্লজ্জতার যদি মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে জগতের কাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। এই সব মিথ্যা প্রচারকদের সে আক্কেলটুকু পর্যন্ত নাই, ইহাই আশ্চর্য।

পরলোকে গুরুসদয় দত্ত—

গত ২৫শে জুন সকাল ৬ ঘটিকার সময় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যু আমাদিগকে আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথায় মর্মাহত করিয়াছে। বাঙলার শিক্ষা, বাঙলার সভ্যতা, বাঙলার শিল্পকলা, বাঙলার সাহিত্যের সর্বতোভাবে সাধক ছিলেন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। বাঙলার ভাবে তিনি বিভোর ছিলেন এবং বাঙলা দেশের উন্নতি কামনাই ছিল তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। বাঙলার নৃত্য-শিল্পকে তিনি তাঁহার সাধনায় সমৃদ্ধ করেন, এবং সেই নৃত্যের ছন্দ জাগাইয়া বাঙলার সাহিত্যকে তিনি করিয়াছেন সম্পন্ন। তাঁহার সকল কাজের মূলে ছিল দেশের প্রতি মমত্ববুদ্ধির পরিপূর্ণ একান্ততা। মনে মুখে সমান, সহজ, অমায়িক এবং অনহঙ্কারী ছিলেন তিনি। বাঙলার পল্লীর প্রতি ছিল তাঁহার অপরিসীম প্রীতি। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শিক্ষাব্রতের ভিতর দিয়া বাঙলার মায়েদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধাবুদ্ধি পুষ্পিত এবং পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলা দেশের দৈন্য এখনও চারিদিকে। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর দত্ত মহাশয়ের কর্মপ্রতিভা এই দৈন্য দূর করিবার দিকে অখণ্ড-ভাবে প্রযুক্ত হইতে সুবিধা পাইবে, আমরা ইহাই আশা করিতেছিলাম। বিগত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির আসনে তিনি বৃত হইয়াছিলেন; সরকারী চাকুরিয়া জীবনের বাহিরে আমরা তাঁহাকে বেশী দিন পাই নাই। কিন্তু দেশসেবার অনন্যসাধারণ স্বাধীন চিন্তা তাঁহার সেক্ষেত্রেও ছিল; তাঁহাকে কত অন্তরায়ের ভিতর দিয়া কাজ করিতে হইত ভবিষ্যতে তাহা হয়ত প্রকাশ পাইবে। এমন একজন দেশপ্রেমিক, এমন একজন কর্মীকে হারাইয়া বাঙলার যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পরিপূরণ হইবার নহে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।
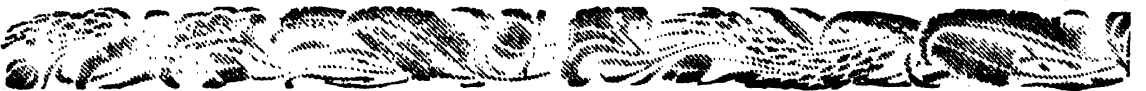
বেমানান

শ্রীশান্তি দেবী

প্রত্যেক দিনের মত সকাল বেলায় নিমগাছটার তলায় পাঁচসিকের চেয়ারে বসে সদ্য খবরের কাগজের ভাঁজ খুলেছি, এমন সময় শ্রীবিলাস এসে হাজির।

"আজকের খবর কি বাবু, যাচ্ছিলাম ঘি আনতে, ভাবলাম বাবুর কাছে একবার খবরটা শুনে আসি।" শ্রীবিলাস গাছটায় ঠেস দিয়ে বসে।

বলি, "খবর আর কি, রোজ যা তাই।" বিরক্ত বোধ হলো, কি রোজ রোজ "খবর কি বাবু," ভাল লাগে না। কবে থেকে যে শ্রীবিলাস আমার খবরের কাগজ পাঠের অংশীদার হয়ে গেল তা আজ আর মনে নেই। প্রথম প্রথম তার আগ্রহ খুব ভাল লাগতো, এখন কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্তি বোধ হয়।

তবু, যুদ্ধ বুঝি এবার খুব জোর হবে, না? আচ্ছা বাবু কৃষকরা নাকি খাজনা মকুব করবার দাবী জানিয়ে ধরা পড়েছে কোথায়, দেখুন না সে খবরটা আছে নাকি। শ্রীবিলাসের স্বরে অনুনয় ফুটে ওঠে।

শ্রীবিলাসের কৃষক মন দুলে উঠেছে। এককালে নাকি ওর ক্ষেত খামার ছিল। দেনার দায়ে মহাজন নীলামে ডেকে নেয়, সে শোক ও ভুলতে পারে না। সেদিনের গ্রেপ্তারের খবরগুলো পড়ে ওকে বলি। শুনতে শুনতে চোখ দুটো ওর ছলছল করে ওঠে।

"কত কষ্টে পড়ে যে এসব করতে হয় বাবু যাদের আছে তারা তা বোঝে না।" তারপর একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ কোঁচড় থেকে বের করে বলে, এখানা একবার দেখবেন বাবু।

ওর ধারণা ইংরেজী কাগজে আরও বেশী জানা যাবে। কিন্তু অবাক করলো আমাকে! আমি ছাপোষা লোক, হয়ত দুচারজন মক্কেল এসে বসেছে, আমার দেরী দেখে তারা হয় বিরক্ত হবে নয় অন্য উকিলের কাছে চলে যাবে। আর কি সেকাল আছে যেকালে মক্কেল উকিল পাকড়াতো, এখন উকিলরাই মক্কেল পাকড়ে বেড়ায়। বললাম, "না এখন দেখবার সময় নেই, সন্ধেবেলা একবার পারতো এসো।"

শ্রীবিলাস একটু বিমর্ষ হয়ে বলে, "আজ্ঞে বৌমা আসবার পর থেকে বেরোনো একটু মুস্কিল হয়ে পড়েছে। মেম ইস্কুলে পড়া কিনা মেজাজটা তাই কড়া।" তারপর কাগজখানা সাবধানে কোঁচড়ে জড়িয়ে চলে যায়।

অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। আমার মত অবস্থার লোক তো আর রোজ দুখানা করে কাগজ নিতে পারে না। এমনি দুই পয়সার কাগজ তিন পয়সা হয়েছে, এই তিন পয়সাই গরীবের সংসারে সাবু মিছরীতে টান দেয়। তাড়াতাড়ি এসে কাছারি ঘরে বসি, কিন্তু মক্কেল নেই। মুহুরীর সঙ্গে পুরোনো কেস নিয়ে দুচারটি কথা বলে, বাড়ীর ভেতর চলে আসি। এখনি আবার নাকে মুখে গুঁজে আদালতে হাজির হতে হবে। নূতন মুন্সেফের বয়স অল্প, এখনও নিয়ম মানবার ঝোঁক দারুণ, কাজেই কোর্ট বসতে দেরী হয় না।

খেতে বসে রমাকে বলি, "তোমার শ্রীবিলাসকে নিয়ে তো আর পারি না। রোজ কাগজ পড়ে বলা কি কম ঝকমারি?"

হেসে রমা বলে, "তা বেচারী দেশের খবরবার্তা শুনতে একটু ভালবাসে, সবাই যদি মুখঝামটা দেয় তবে যায় কোথায়?"

"যাকগে যে চুলোয় ইচ্ছে, ভারী দেশপ্রেমিক!" রেগে গেলে হাতের কাজ তাড়াতাড়ি করা আমার স্বভাব।

রমা ব্যস্ত হয়ে বলে, "আহা তা বলে অত তাড়াতাড়ি খাবার দরকার কি হলো? শ্রীবিলাসের একটা ব্যবস্থা না হয় পরে হবে। এখন খাবার গতিটা একটু আস্তে করো, নইলে গলায় আটকে একটা বিপরীত কান্ড বাধবে যে—"

একটু অপ্রতিভ হয়ে বলি, "যেমন হয়েছে মুন্সেফ, কোর্ট বসবার এদিক ওদিক হবার যো নেই। আবার প্রথমেই যদি আমার মামলার ডাক পড়ে তবেই তো গেছি।"

একটু পরে রমা কিন্তু কিন্তু করে বলে, "দেখ শ্রীবিলাসের সেই পাওনাটা কিন্তু দিয়ে দিতে হয় এইবার।"

সত্যি, মনে পড়লো এইবার, শ্রীবিলাসের উপকারের কথা। সাহায্য বেশী নয় কিন্তু সেই সাহায্যটুকু না পেলে বড় মেয়ে পুটুকে সেই কঠিন অসুখের সময় বাঁচান অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য হতো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিজের কাছেই নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হলো। বললাম "হ্যাঁ এইবার দিয়ে দিতে হবে।" তারপর আঁচিয়ে পোষাক পরতে পরতে বললাম, "কিন্তু হাকিম তো এইবার মেমসাহেব নিয়ে এসেছেন, শ্রীবিলাসের এই পাঠানুরাগ আর পরোপকারের সুবিধে হয়ে উঠবে কি তেমন?"

রমা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "তা জানি না, তবে হাকিম লোক ভাল আর শ্রীবিলাস পুরোনো লোক বলে ওর ওপর মমতাও আছে।"

ছোট টেবিল ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখি কোর্টের সময় প্রায় আসন্ন। তাড়াতাড়ি একটা পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

ছোট শহর। এখানে পান থেকে চুণ খসলেই বাতাসের আগে আগে তা একেবারে তিল থেকে তাল হয়ে ফেটে পড়ে।

কোর্টের পর চৌমাথায় আমলা মণি সেন, জুনিয়র উকিল বলাই বোস, আর মোক্তার রসিক দত্তর যুগপৎ আক্রমণে ধূমায়িত আলোচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন পেলাম।

রসিক দত্ত তাঁর মেদবহুল শরীর নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "কি সুরেনবাবু, এস ডি ও'র ওখানে যাচ্ছেন টাচ্ছেন নাকি আজকাল, সুবিধে কিছু করতে পারলেন?"

বললাম, "না মশাই, বড় লোকের দরজায় ধন্না দিতে পারি না।"

"তা ওঁর সেই চাকরটার সঙ্গে আপনার বাড়ির খুব খাতির দেখতে পাই, আমার স্ত্রীও বলছিলেন যে আপনার

বাড়ির বাজার হাট নাকি ওই করে দেয়।" হেঃ হেঃ—মণি সেন আকর্ণ বিস্তৃত দন্তরাজি বিস্ফারিত করে হাসেন।

বলাই বোস তাঁর সার্টের কলারটা ঠিক করে নিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, ও নাকি আবার আপনার কাছে খবরের কাগজের পাঠ নেয় শুনলাম।"

বললাম, "হ্যাঁ খবর বার্তা শোনবার ওপর ওর একটু ঝোঁক আছে তাই যায় কখন কখন।"

"কখন কখন কি মশাই, রোজই তো যায় শুনি," রসিক দত্ত তাড়াতাড়ি করে বলেন।

প্যাণ্টটা একবার ঝেড়ে নেয় বলাই বোস। টাইটার অবস্থান ঠিক করে দেয়; তারপর ব্যাকব্রাস করা চুলের ওপর হাত বুলিয়ে বলে, "কাল দেখি কৃষকসভার পাণ্ডা পীযূষ রায়ের সঙ্গেও খুব আলাপ জমিয়েছে চাকরটা।" তারপর রিস্টওয়াচটার ওপর নজর পড়তেই বলে, "ও বড্ড লেট হয়ে গেল, সাবডেপুটির সঙ্গে আবার পাখী শিকারে যাবার এনগেজমেণ্ট আছে।" মিলিটারী কায়দায় প্রস্থান করে বলাই বোস।

মণি সেনও চলে যান ডাক্তারখানার দিকে, তাঁর স্ত্রীর পেটের ব্যথার ওষুধ নিতে, এটা তাঁর রোজনামচার অন্যতম কাজ; স্ত্রীর পেটের ব্যথার জন্যে ভদ্রলোকের স্বস্তি নেই।

ওরা চলে গেলে রসিক দত্ত রসিকতা করে বলেন, "দেখবেন মশাই, মেয়েছেলেদের সব লোকের সঙ্গে মিশতে দেবেন না।"

ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করি। তার ওপর রসিক দত্তই দায়ে পড়লে টাকাটা সিকেটা ধার দেয়, যদিও সে ধার বিনা সুদে নয়। শহরে যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ ওর কাছে ঋণী। তার মধ্যে আমিও একজন। তাই প্রতিবাদ করবার বিষয় হলেও অবস্থা নয়। চুপ করে থাকি।

"কি মশাই রেগে গেলেন নাকি; আজকাল আবার লোককে ভাল কথা বললেও মন্দ ধরে। এই রকমই দিনকাল পড়েছে।" রসিক দত্ত গম্ভীর হয়ে ওঠেন।

"বলি না না, রাগারাগির কি আছে এতে?"

"হ্যাঁ মশাই ভালর জন্যেই বলা। ওই যা, কি ভুলো মন দেখেছেন, যতীনবাবুকে টাকার তাগাদাটা দিতে ভুলেই যাচ্ছিলাম। আপনি এগোন, আমি একবার ঘুরে আসি।" থপ থপ করে পা ফেলে রসিক দত্ত পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যান।

সবই বুঝলাম। পরশ্রীকাতর মধ্যবিত্ত মন আমার পরিবারের নৈতিক অবনতির জন্যে ব্যাকুল হয় নি। হয়ত আমি সাহায্য পেলেও পেতে পারি, সেই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়েছে।

বাড়িতে ঢুকে শুনি শ্রীবিলাস রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রমাকে বলছে,—"মাঠেই সভা হবে, পীযূষবাবু, আরও বাবুরা সব বক্তৃতা দেবে, যাবেন না মা একবার আপনি?"

রান্নাঘর থেকে রমা জবাব দেয়, "সভায় গিয়ে আমি আর কি করবো বল—"

রমার কথার মাঝখানেই জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের সভা, কোথায় যাবার কথা হচ্ছে?"

অপ্রতিভ হয়ে বলে শ্রীবিলাস, "আজ্ঞে এই কৃষকদের সভা," তারপর বাজারের থলিটা হাতে করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

মেজাজটা উষ্ণ ছিল, রমাকে বললাম, "দেখ শ্রীবিলাসের যা ধার দেনা আছে, শোধ করে দিয়ে ওকে আমার বাড়িতে আসতে বারণ করে দিও।"

বিষণ্ণ মুখে রমা বলে, "আচ্ছা," তারপর আপন মনেই বলে, "বাইরের লোকের তো চক্ষুশূল হয়েছেই ওর যাওয়া আসা, ঘরেও।"

হাত পা ধুয়ে জলখাবার খেয়ে মাথা খানিকটা ঠাণ্ডা হবার পর মোলায়েম গলায় রমাকে ডেকে বলি, "সভার কথা কি বলছিল শ্রীবিলাস?"

রমা গম্ভীর মুখ আরও একটু গম্ভীর করে বলে, "কি আর বলবে, ওর যেমন কথা তাই। নিজের 'জমির কথা ভুলতে পারে না তো, তাই কৃষাণরা সব নিজেদের দাবীর জন্যে একজোট হয়ে লড়ছে শুনে ভারী খুসী। পীযূষের কাছ থেকে কি সব শুনেছে তাই বলছিল, কাল মাঠে সভা হবে, তাতে নাকি মেয়েরাও যাবে। এই আর কি, মা আপনিও চলুন। শ্রীবিলাসের কথা শুনলে এক এক সময় ওকে পাগল বলে মনে হয়।"

যদিও হাঙ্গাম পছন্দ করি না, তবুও ওই হাঙ্গামের প্রতি একটা অন্তরের টান আছে। দুর্বল মানুষের মারামারি করবার ইচ্ছের মত, মুখচোরা মানুষের স্পষ্ট কথা বলবার আগ্রহের মত, যা নিজেও হয়ত বুঝতে পারিনে, বললাম, "যাচ্ছ নাকি তুমি? কাবেরী দেবী বক্তৃতা দেবেন শুনলাম।"

রমা বললে, "দেখি, সভা তো তিনটের—সব সেরে উঠতে পারলে যাব একবার ভাবছি।" তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে, "তুমি যাবে না?"

বল্লাম, "না ওসবের মধ্যে আর যেতে ভাল লাগে না। তুমি বরং পুটুদের নিয়ে যেও।"

পরদিন বেলা তিনটের আগেই শ্রীবিলাস এসে উপস্থিত, আমার বাড়িতে সভায় যাবার সাড়া পড়ে গেল; রমা মেয়েদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসে বললো, "শ্রীবিলাসের সঙ্গেই যাচ্ছি, ও যখন যাচ্ছেই সেখানে।"

বললাম, "যাও, সভা ভাঙবার আগেই চলে এসো, সে সময় বড্ড ভিড় হয়।"

শ্রীবিলাস এগিয়ে এসে বলে, "সে আপনাকে ভাবতে হবে না বাবু, আমি ঠিক নিয়ে আসবো।"

শ্রীবিলাসের কথার জবাবে শুধু বললাম, "আচ্ছা।"

রমার দিকে চেয়ে শ্রীবিলাস বলে, "চলুন মা, সময় হয়ে গেল," বেরিয়ে পড়ে ওরা।

শূন্য বাড়ি; আকাশে সূর্যাস্তের রাঙা রেখাও ম্লান হয়ে এসেছে। উঠোনের ছায়া ক্রমশ ঘন হয়ে এলো। বহু-দিনের পুরানো একখানা ইজিচেয়ার পেতে সেই ঘনায়মান ছায়ায় বসলাম। সভা হচ্ছে বাড়ির কাছেই, বেশি দূরে

নয়। মাঝে মাঝে তার সম্মিলিত ধ্বনি ভেসে আসছিল বাতাসে। এখনও উত্তেজনা বোধ করি। আশ্রয় আর অন্নের চিন্তায় স্নায়ুগুলি যদিও হিম হয়ে এসেছে, তবু উষ্ণতা একেবারে মরে যায় নি, এখনও উত্তপ্ত হয়। প্রথম যৌবনে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন তা মিলিয়ে গেছে, তবু সে সুপ্ত পারাবারে বাতাস লাগলে এখনও তরঙ্গ জাগে।

"তুমি এখনও বসে আছ?" রমা ফিরে এলো। সঙ্গে তার সাঙ্গপাঙ্গ আর শ্রীবিলাস।

বললাম, "তোমাদের সভা হয়ে গেল?"

উত্তর দেয় শ্রীবিলাস, "সভা আর হলো কোথায় বাবু, অর্ধেক হতে না হতেই তো বাবুরা সব গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।"

"তারপর অবিশ্যি কাবেরী দেবী কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু লোক তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।" রমা বলে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীবিলাস বলে, "বাবুরা যা বলে গেলেন, তা একবর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাদের ভাগবত শোনা অভ্যেস কিনা, এই দুঃখু।" ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীবিলাস।

শ্রীবিলাসের কৃষাণ রক্তে চাঞ্চল্য এসেছে। কিন্তু ভাগবত শোনা মানে? শ্রীবিলাসকে বললাম, "ভাগবত শোনা অভ্যেস মানে?"

"তবে শুনুন বাবু একটা গল্প বলি।" শ্রীবিলাস আরম্ভ করে—"এক বুড়ি তার এক বিধবা ছেলের বৌকে নিয়ে থাকতো, বৌটি ছেলেমানুষ। সামান্য যা জমিজমা ছিল, তাইতেই দুটি প্রাণীর চলে যেত, খাবার ভাবনা বেশী ভাবতে হতো না। বুড়ি তাই পাড়া বেরিয়ে ভাগবত শুনে দিন কাটাতো, বৌ করতো সংসারের কাজ; একদিন বৌ বললে, 'মা, আমিও ভাগবত শুনতে যাব।' বুড়ি ভাবলে চলুক ধর্মকথা শুনলে মনও ভাল থাকে, গুরুজনে ভক্তিও বাড়ে। তারপর বৌকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা ভাগবত শুনতে গেল। ভাগবতের আসর তখন সরগরম। পাঠক ঠাকুর ভারি সুন্দর সুর করে বলছেন, 'সর্বজীবে ভগবান আছেন, সুতরাং কাউকেই আঘাত করো না, আঘাত করলে সে আঘাত ভগবানের গায়েই লাগে।' বৌটির খুব ভাল লাগলো। তারপর পাঠ শেষ হলে যে যার মত বাড়ি চলে এল; পরদিন খাওয়া দাওয়ার পর বুড়ি বেরিয়েছে পাড়া বেড়াতে, বৌটি উঠোনে ধান শুকুতে দিয়ে দাওয়ায় বসে আছে। কিছুক্ষণ পরে একটি গরু এসে ধান খেতে লাগলো। বৌটি অনেক বলল কইল, কিন্তু গরু কিছুতেই গেল না। ধান যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন বুড়ি ফিরে এলো। 'আ-লো আবাগীর বেটী কচ্ছিস কি, গরুটাকে মেরে তাড়াতে পারিস নি? ধান যে সব খেয়ে গেল।' বৌ বললে, 'কেমন করে মারবো মা, ঠাকুর যে কাল বললেন, সর্বজীবে ভগবান আছেন, কাউকে আঘাত করো না।' বুড়ি একেবারে অবাক হয়ে গেলে, 'ও সব্বোনাশী! ভাগবতের কথা কি বাড়িতে নিয়ে আসে, ও যে সেইখানেই রেখে আসতে হয়, নইলে কি আর সংসার চলে?'" শ্রীবিলাস হাসে।

আমিও হাসি। ভাবি সত্যি, শুধু কি যারা শুনতে যায় তারাই রেখে আসে, যাঁরা বলেন, তাঁদের মধ্যেও তো অনেক আছেন, যাঁরা বলেই খালাস—হাততালি আর উল্লাস-ধ্বনির পর তা আর মনে থাকে না, নইলে—না থাক, আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজ না করাই ভাল।

আকাশের দিকে চেয়ে রমা বলে, "আজ ঝড় বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে।"

শ্রীবিলাস কি একটা বলতে যাচ্ছিল, চাপরাশি এসে বলে, "চলো শ্রীবিলাস, মেমসাহেব তলব করেছেন।"

তাড়াতাড়ি সে চাপরাশির সঙ্গে চলে যায়।

রমা বলে, "আজ ওর কপালে কিছু আছে।"।

আমিও তাই ভাবছিলাম, দাসত্ব না করে যাদের উপায় নেই, তাদের এসব ভাবের বিলাসিতা কেন? রাজ্যের চিন্তা এসে জড় হয় একে একে। কতক্ষণ চোখ বুজে বসেছিলাম জানি না। রমার ডাকে সচকিত হয়ে উঠি।

"ওঠো, ঘরে চলো, দেখছ না, কেমন মেঘ করেছে, এখনি হয়ত ঝড় উঠবে।"

বাতাস আরম্ভ হয়েছে, বৃষ্টিও আসতে পারে; দরজাটা বন্ধ করে ঘরে এসে বসলাম। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় রমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল—বললাম, "শুয়ে পড় রমা, আমার খাবার ঢাকা থাক, পরে খাব এখন।"

"দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে না?" রমাকে বললাম।

"না, বাতাস বোধ হয়।" রমা শুয়ে পড়ে।

"উঁহু বাতাস নয়।" লণ্ঠনটা হাতে করে দরজাটা খুললাম। "একি! তুমি শ্রীবিলাস?"

ধড়মড় করে উঠে আসে রমা, "ওসব কি? পোঁটলা-পুঁটলি কিসের?"

শ্রীবিলাস হাসে। সে হাসি ঠিক কান্নার মত। বলে, বললাম মা, মেমসাহেব আর রাখবেন না। চুরি করে পরকে দান করি, লুকিয়ে যতসব বই, খবরের কাগজ শুনি, তার ওপর আবার সভায় যাওয়া। ছোটলোকের এ আস্পর্ধা তিনি সইবেন না। অন্য কেও হলে আরও বেশী শাস্তি দিতেন, নেহাৎ আমি পুরানো লোক তাই রেহাই পেলাম।

আমি চিন্তিত হলাম, "কিন্তু যে রকম দেখছি, তাতে এখনি ঝড় বৃষ্টি এলো বলে, এখন তুমি যাবে কোথায় শ্রীবিলাস, আজ না হয় এখানেই থাক।"

"না বাবু তা হয় না, মেমসাহেবের হুকুম আজই শহর ছেড়ে যেতে হবে। কাল আমাকে এখানে দেখা গেলে শুধু যে আমারই বিপদ হবে তা নয়, আপনিও বিপদে পড়বেন।" শ্রীবিলাসের গলা ধরে আসে।

রমা বলে, "আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে তোমাকে এই দুর্যোগে কিছুতেই যেতে দিতাম না শ্রীবিলাস। রমার মুখখানা ম্লান হয়ে যায়।

(শেষাংশ ৩৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম ও আধুনিকতা

বৈষ্ণব ধর্ম আদর্শবাদী; কিন্তু এই আদর্শবাদ মায়াবাদ নহে; বৈষ্ণব ধর্ম আদর্শবাদী এই হিসাব যে পার্থিব কাম ভোগের উপর বৈষ্ণব জোর দেয় না, বলে যে, প্রকৃত আনন্দ উহার মধ্যে নাই, আছে ত্যাগ এবং সেবার মধ্যে। এ জগতে থাকিলে টাকা-পয়সা, বসন-ভূষণের প্রয়োজন আছে সকলেরই, কিন্তু সেই প্রয়োজন নিজের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি একান্ত করিয়া তোল, তবে সুখ তো পাইবেই না. তোমার ভয় দুর্বলতা এবং অস্বস্তি-উদ্বেগই সকল দিক হইতে বাড়িবে। দশের সেবাতেই তোমার সুখ, তোমার সুখ, বিরাট রূপী এই যে মানবসমাজ, ইহারই সেবাতে; কারণ এই বিরাট হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন নহ, হইতেও পার না—বিরাটের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গী সেই সম্বন্ধ। আপনাকে অখণ্ড এক বিরাট সত্তার সঙ্গে যুক্ত করিয়া এই যে অনুভূতি, ইহা বৈষ্ণবের সাধ্য এবং সাধনা; বৈষ্ণবের মতে এই জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু স্বার্থের খণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে যেমন দেখিতেছ, তাহাও নয়; এ জগতের একটা সত্তা আছে,ইহারও বস্তুত্ব আছে: ক্ষুদ্র স্বার্থকে অতিক্রম করিতে পারিলে তবে জগতের সেই স্বরূপ দেখা যায় এবং সে দর্শন দেয় যোগ, ভাব, লাভ, বল এবং সহায়ত্ব। জগৎকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছ না বলিয়াই তুমি দুর্বল এবং তুমি অসহায়; অভাবের রাজ্য হইতে ভাবের রাজ্যে যাইতে পারিলেই তোমার জীবনের সার্থকতা, তোমার প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধি হইবে সেই পথেই। জগৎকে স্বীকার করিলেই কেহ দুর্বল হয় না এবং জগৎকে অস্বীকার করিলেই কেহ সবল হইতে পারে না, সামঞ্জস্যই সবলতার ভিত্তি। 'ইহৈব তৈর্জিতো সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'—যাহাদের মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারাই সংসারের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারে, পক্ষান্তরে সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গেলেই সংসারকে অতিক্রম করা যায় না। ভাগবতে ঋষভ দেব তাঁহার ছেলেদের বলিলেন— বনে গেলে কি হইবে, এক স্ত্রী ছাড়িয়া বন যাইতেছ, বনে গেলে জুটিবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ছয় স্ত্রী; যদি সেবার ভাব জীবনে লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এই সংসার তোমার অনিষ্ট তো করিবেই না বরং তোমাকে শান্তি লাভের পথে সাহায্য করিবে।

কিন্তু মায়াবাদ এ কথা বলে না, সংসার পাপের জায়গা, অনিষ্টের জায়গা, এখানকার সকল কর্ম ত্যাগ করাই ধর্ম, এই কথাই মায়াবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছে। আগাইয়া যাইতে পারিলে এই পথে সত্য লাভ, অর্থাৎ জীবনে সুখের সন্ধান সম্ভব হয় না এমন কথা কেহ বলিবে না; কিন্তু এই মতবাদ প্রচারের ফলে সমাজে এবং সাধারণের স্তরে সংসার এবং সমাজের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব আসিয়া পড়িল, ধর্ম আসিল না, আসিল ধর্মের নামে নৈষ্কর্ম, আলস্য, নিদ্রা এবং অবসাদ। সমাজে দুঃখ, কষ্ট এবং দৈন্য বাড়িল, অলস এবং ভীরুর দল মায়াবাদের সূত্র আওড়াইয়া ফলাইতে লাগিল বাহাদুরী এবং ধার্মিকের মান যশের মজা লুটিতে লাগিল। যাহারা সংসারে থাকিল, সমাজে থাকিল কিংবা নিরক্ষরতার প্রভাবে মায়াবাদের বড় বড় বুলি কপচাইতে পারিল না, তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতে লাগিল ধিক্কার এবং লাঞ্ছনার যত গ্লানি। মানুষের প্রতি প্রেম বিলুপ্ত হইল, বড় হইয়া পড়িল নীরস একটা বৈরাগ্যবাদ।

বৈরাগ্যবাদ অবশ্য নিন্দনীয় নহে, কিন্তু বৈরাগ্য বলিতে যে ধারণাটা দেশে এবং সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িল, তাহার অসত্যতাই ঘটাইতে লাগিল যত রকমের অনর্থ। প্রকৃত বৈরাগ্য অন্তর্নিষ্ঠা ব্যতীত সম্ভব নহে, এই অন্তর্নিষ্ঠার অর্থ নিজের ভিতরে অনপেক্ষ একটা আনন্দ পাওয়া; যে আনন্দসত্তার সন্ধান পাইলে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস আর থাকে না, তাহার জীবনে সত্য হইয়া উঠে প্রেম এবং সেবা; প্রকৃতপক্ষে বিয়োগের পথ এ পথ নয়, যোগের পথ. ক্ষুদ্র রাগ অর্থাৎ কামের পথ কাটাইয়া বড় রাগের অর্থাৎ প্রেমের পথ এবং এই পথেই ঘটে বিরাট সত্তার উপলব্ধি. প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা সাধনায় লাভ হয় অমরত্ব, জীবনে এই পথেই সত্য হয় উপনিষদের আদর্শ।

বৈরাগ্যের নামে সংসার এবং সমাজের প্রতি উপেক্ষা এবং তাহার অনিবার্য ফলে সংসার এবং সমাজ জীবনে যে অভাব ও গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িতেছিল, বাঙলা সে বেদনা দীর্ঘদিন সহ্য করিতে পারিল না। সেই বেদনার মূর্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। তিনি উপনিষদের বাণী জাতিকে আবার শুনাইলেন নূতন করিয়া, তিনি শুনাইলেন গীতার সেই সনাতনী বাণী; সকলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার।' কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন তাঁকে জগৎ মিথ্যা, এই জগতের জন্য কাজ করা সব অসত্য এবং ভ্রান্তি এই কথা বলিলেন, তখন মহাপ্রভু গীতার বাণীই উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'সর্ব যজ্ঞময় মোর অঙ্গ এ পবিত্র।' যজ্ঞের জন্যই এখানে কর্ম, কর্ম সেখানেই বন্ধন যেখানে কর্মের মূলে যজ্ঞের প্রবৃত্তি নাই, অর্থাৎ সেবার ভাব নাই। এই সেবা রসকে জীবনে আস্বাদন করিবার জন্য জগৎ। যিনি যজ্ঞপুরুষ, তিনি এই বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। কে বলে ইহা মিথ্যা—অজ ভববিধি গায় যাহার মাহাত্ম্য—'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।'

'আজি হৈতে কারো না রাখিব দুঃখ শোক', প্রেমের দেবতা গর্জন করিয়া উঠিলেন, প্রচণ্ড তাড়নে প্রেমের সমুদ্র যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, কোন বাঁধ আর মানে না, সমাজের ভেদ বিভেদ, বৈষম্যের উপর আঘাত পড়িতে লাগিল সেই তরঙ্গের। ধর্মের ধ্বজা ধরিয়া যাঁহারা অপ্রেমকে জিয়াইয়া রাখিতেছিল, সমাজদেহকে শোষণ করিয়া পরগাছার মত মান, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তিতে হইতেছিল পুষ্ট, তাহাদের আর্তনাদ উঠিল —'এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়' 'চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি'- এই দৃশ্য দেখিয়া। শ্রীবাস অঙ্গনে যে নৃত্য আরম্ভ হইল, সেই নৃত্যের তালে বাঙলায় দেখা দিল বিপ্লবের একটা যুগ। ধনের আভিজাত্য, মানের আভিজাত্য এবং সেই আভিজাত্যের ফলে সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত মানুষকে উপেক্ষা এবং ভেদের যুগান্ত সঞ্চিত যত গ্লানি সব যেন ভাসাইয়া বহিতে আরম্ভ করিল প্রচণ্ড প্রেমের একটা প্লাবন। এই প্রেমের প্লাবনে সংসার এবং সমাজকে আরও সত্যভাবে নাড়া দিবার জন্য, সমাজদেহে ইহার কর্ম-সাধনাকে জীবন্ত রূপ দান করিবার জন্য, শ্রীমন্মহাপ্রভু এক অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাঙলার ইতিহাসে তাহা এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার; ইহা হইল নিত্যানন্দ প্রভুকে সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়াইয়া পুনরায় সংসার এবং সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। সংসার যে তুচ্ছ নহে, সমাজ সেবা অধর্ম নহে, ভ্রান্ত বৈরাগ্যবাদে অভিভূত জাতিকে বুঝাইবার জন্য ইহা প্রয়োজন ছিল। সংসার এবং সমাজ জীবনের মধ্যে থাকিয়া ভেদ বিভেদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল নিত্যানন্দের মত কর্ম-সন্ন্যাসীর। মানব প্রেমের কাছে সন্ন্যাসের মর্যাদাকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু তুচ্ছ করিলেন। গার্হস্থ্যের এই মর্যাদা হিন্দুর সমাজজীবনে আগেও ছিল, সন্ন্যাস গার্হস্থ্যের সে মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, কিন্তু সন্ন্যাস গার্হস্থ্যের এই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যে দুর্দৈব সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইতে জাতিকে রক্ষা ক[illegible]ার ভার নিত্যানন্দ প্রভুর উপর ছিল। উদ্ধব যে প্রার্থনা [illegible] করিয়া-

ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে, সেই প্রার্থনাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সত্য করাইলেন বৈষ্ণব-সাধনার মধ্যে—'বাতবসন সন্ন্যাসী যাঁহারা, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, কিন্তু হে দেবতা, আমি ব্রহ্মলোকে যাইতে চাহি না, সকলকে সেবার প্রবৃত্তি আমার মধ্যে সত্য করিয়া এখানে এই সংসারেই কাজ করিতে দাও।' নিত্যানন্দ প্রভু বাঙলার সমাজদেহকে সেবা এবং প্রেমের স্পর্শে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলেন। তাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব সাধক গাহিলেন—'মূর্খ দরিদ্রেরে দেখি সুজনে যে হাসে, কুম্ভিপাকে পড়ে সেই নিজ কর্ম দোষে'—'শ্রদ্ধা করি মূর্তি পূজে ভক্তে না আদরে মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে দয়া নাহি করে'—এ সব লোকের সাধন, ভজন সব বৃথা। 'এক হাত দিয়া বিপ্র চরণ পাখালে, আর হাতে ঢিল মারে মাথা ও কপালে, এ সব লোকের কি কল্যাণ কোন দিনে হইয়াছে, হইবেক, ভাবি দেখো মনে।'

নিত্যানন্দ প্রভু বাঙলা দেশে যে কত বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, এ পর্যন্ত তাহার প্রকৃত কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই এবং বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এত বড় একজন মানবপ্রেমিকের ভাল একখানা জীবনচরিত এ পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় লিখিত হইল না। নিত্যানন্দ প্রভু যে বিপ্লবের প্রেরণা দিয়াছিলেন, বাঙলার জাতীয় জীবনে তাহা অব্যাহতগতিতে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। গোঁড়ার দল নানা পাকেচক্রে নিজেদের ঘাঁটি পাকা করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাতে সফলতা লাভ যে না করিয়াছে, ইহা বলা যায় না; কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রেমের গতি স্থায়ীভাবে প্রতিহত হয় না; অমোঘভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত হয় তাহার কাজ। সে ধারা ক্ষীণ হইয়াছে বাঙলাদেশে, যতটা জোরের সঙ্গে চারিদিক কাঁপাইয়া উঠিয়াছিল তাহা আর নাই; কিন্তু না থাকিলেও বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে সেবার সংস্কার যতটা আছে, বাঙলাদেশের আবহাওয়ায় এখনও যতটা আছে, উদারতার ভাব ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তাহা নাই। এই বাঙলাদেশে যাহারা জনসাধারণ, তাহারা সোনার মানুষ। একবার একটু ভালবাসা পাইলে ইহাদের ভিতর এখনও প্রবল শক্তি জাগাইয়া তোলা যায়; ভালবাসার দায়ে এখনও ইহারা প্রাণ দিতে পারে এবং অন্য সব বিচার বিবেচনা তুচ্ছ করে। ভেদ-বিভেদ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে, আভিজাত্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব জাগাইয়াছিল বাঙলার বৈষ্ণব, সেই বিপ্লবের শক্তি বাঙলার সংস্কৃতির ভিতর দিয়া সকল স্তরে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে এবং বাঙলার অন্তরের উৎসকে যদি স্পর্শ করিতে হয়, তবে যাইতে হইবে সেই সাধনার পথ ধরিয়াই, বাঙলার গণচিত্তের সঙ্গে সুযুক্ত হইবার ধারা হইল সেইটি।

আধুনিকতার সঙ্গে বিরোধ কোথায়,—বাঙলার এই বিশিষ্ট সাধনায়! সিদ্ধান্তের কথা ছাড়িয়া দিলাম, প্রথমে যদি ধরা যায়, কর্মের দিকটা, তাহা হইলে বিরোধ বিশেষ কিছুই নাই। বাঙলার বৈষ্ণব সংস্কৃতি জাতি, ধর্ম কিংবা বর্ণের বিচার করে নাই, বড় করিয়া দেখিয়াছে মানুষের সেবাকে এবং ধন বা ঐশ্বর্যের আভিজাত্যকে উপেক্ষা করিয়া এই সেবার মর্যাদাকে দৃঢ় করাই এই সংস্কৃতির বাণী। এই সংস্কৃতি, সংসার এবং সমাজের সেবার জন্য যে সব কর্ম, সেগুলিকে তুচ্ছ করে নাই, বরং মোক্ষের উপরে স্থান দিয়াছে সেই সব কর্মকে; কর্মকে সেবার স্তরে উন্নীত করিয়া কর্মের আভিজাত্য, অর্থাৎ ছোট শ্রেণীর কাজ, বড় শ্রেণীর কাজ, এগুলির মধ্যে ভেদকে পর্যন্ত সে অস্বীকার করিয়াছে; সে পরিচর্যাকে করিয়াছে মহৎ, সেবককে দিয়াছে বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বড় সম্মান। বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়া মজা লুটিব বাঙলার বৈষ্ণব ইহা চাহে নাই। মানুষের যত দুঃখকষ্ট আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দাও—মহাপ্রভুর কাছে সে এই বরই যাচিয়া লইয়াছে। বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মের নাম লইয়া যাহারা সংস্কারান্ধ স্বার্থের দৃষ্টি কাটাইয়া উঠিতে পারে না, পরোক্ষভাবে ভেদ-বিভেদ এবং বৈষম্যকেই প্রশ্রয় দেয়, তাহারা বৈষ্ণব ধর্মকে অমর্যাদাই করিয়া থাকে; জীবে দয়া নামে রুচি এই কথা যাহারা মুখে আওড়ায় অথচ জীবে দয়া করিতে হইলে যেটুকু ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন, নামে রুচি না থাকার জন্যই দুর্বল বলিয়া তেমন কাজ করিতে ভয়ে কাঁপে, সেই সব ভীরুদের জন্য বৈষ্ণবের মহাবল প্রেমের আদর্শ নয়; প্রকৃতপক্ষে সে আদর্শকে তাহারা পরিম্লান করিতেছে। পরের জন্য তাপ বোধ এবং সেই তাপ দূর করিবার জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণা যাঁহাকে পাগল করিয়াছে তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব এবং এই তাপ যেখানে সত্য কর্মের গতি সেখানে অপ্রতিহত। বৈষ্ণব এমন কামরাগবিবর্জিত কর্মকেই সর্বোচ্চ আদর্শ স্বরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বিরোধ তবে কি নাই, কোন দিক হইতেই আধুনিক কর্মবাদীদের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের? নাই এমন কথা বলা যায় না আছে; বিরোধ আছে একদিক হইতে, তাহা হইল অনুভূতির দিক। বৈষ্ণব অন্তর্জগতের যে রসলোককে উপলব্ধি করিয়া বাস্তব জীবনে এই সেবাকে সত্য করিবার পথ দেখাইয়াছেন, আধুনিকতাবাদীরা সেই রসলোকের স্বীকৃতি অবান্তর, অনাবশ্যক, এমন কি, অনেক ক্ষেত্রেই একটা ভ্রান্ত কুসংস্কার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আধুনিকতাবাদীদের মতে রসলোকের ঐ সাধনার উপর জোর দেওয়া মনের দুর্বলতা মাত্র।

এই প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব আদর্শের দিক হইতে এই যে, অন্তর্জগতের রসসূত্রের উপলব্ধি করা যাহার পক্ষে প্রয়োজন নাই, অথচ যিনি জীবনে সেবাকে আচরণে সত্য করিয়াছেন বৈষ্ণব তাঁহাকেই বড় করিয়া দেখিবেন, পরন্তু আধ্যাত্মিকতার ফাঁকা কথা আওড়াইয়া ভেদ-বিভেদ এবং বৈষম্যকেই যে কাজে করিবে বড়, বৈষ্ণবতার মর্যাদাকে সে লঙ্ঘন করিবে এবং আধ্যাত্মিকতার করিবে ধর্মের অবমাননা, সে ভণ্ড, সে মিথ্যাচারী। বৈষ্ণব ধর্মের নামে বাঙলাদেশে সংকীর্ণচেতা ভণ্ডের দল বাড়িয়া চলিয়াছে ইহা সত্য। বিজাতীয় সভ্যতার মোহের বশে সংস্কারান্ধ না হইয়া এবং দেশের নরনারীর প্রতি প্রকৃত বেদনাবোধে আধুনিকতাবাদীদের চিত্তে ঐ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যদি বিক্ষোভ ঘটে, তবে তাহা অভিনন্দনেরই যোগ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিকতাবাদীদের অনেকেরই মনের কোণ খুঁজিলে এ দেশের নরনারীর জন্য প্রকৃত বেদনার প্রচণ্ড জ্বালা পাওয়া যাইবে না, পাওয়া যাইবে বিজাতীয় প্রভাবের মোহসংস্কারসমাচ্ছন্ন এ দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব। এই যে অশ্রদ্ধা, ইহা বল নহে, কিংবা মর্যাদাও নহে, অনেক স্থলেই চিত্তের একটা লঘুতা এবং দাসসুলভ মনোবৃত্তির অসুস্থ একটা বিকার মাত্র। কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার মত শক্তি বা সামর্থ উহার মূলে খুব কম আছে। ধোপে ঐ জিনিস টিকে না, সামান্য পরীক্ষাতেই পস্তাইয়া যায়, তুচ্ছ প্রলোভনেই পাল্টা পথ ধরে।

বৈষ্ণবের আদর্শ ও সেবা, প্রগতির প্রচণ্ড গতি সেবারই দিকে। বৈষ্ণব চাহেন জগৎকে মধুময় করিতে, প্রগতিবাদীরাও ভেদ-বৈষম্যের জ্বালা প্রশমিত করিয়া চাহেন সাম্যেরই রাজত্ব। বৈষ্ণবের কথা শুধু এই যে, সেবাকে সিদ্ধান্ত বা বিধিস্বরূপে অবলম্বন করিলেই জীবনে সেবা সত্য হয় না; পার্থিব ভোগের সাধনাই যদি একমাত্র সাধ্য করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ব্যক্তির জীবনে তুচ্ছ স্বার্থ বা কাম চিন্তাই প্রবল হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্র ব্যক্তি ছাড়া কখনই চলিতে পারে না, তাহা সে রাষ্ট্রের পিছনে

(শেষাংশ ৩৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শহরটা নাকি লোকনাথবাবুর, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতুম।

লোকনাথবাবু কি দোষ করলেন।

এমন rotten মিউনিসিপ্যালিটি আমি আর দেখি নি। মিল ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা শোষণ করে নিচ্ছে অথচ যাদের দিয়ে এত টাকা লাভ করছে, তাদের সুবিধের জন্যে এক পয়সাও ব্যয় করছে না। আপনিই বলুন, কত বড় অন্যায়। অবশ্য আপনি এতটা feel করতে পারেন না, কারণ আপনি বড়লোক, গাড়ি রয়েছে, আমাদের মত গরিব পথিকদের গরমের দিনে ধুলো দিয়ে আর বর্ষায় কাদা ছিটিয়ে ভস্ করে চলে যেতে পারেন।

অত চটলেন কেন?

চটব না! আর একবার এখানে এসেছিলুম, উঃ সেবার রাত্রে অন্ধকারে কী নাজেহাল না হয়েছিলুম। সেবারের কথা মনে করে সন্ধ্যার আগে পেঁছবার জন্য তাড়াতাড়ি করে বেরুলুম, অদৃষ্ট মন্দ, সারা শহর ঘুরে মরলুম শুধু।

সত্যি লোকনাথবাবুর ভারি অন্যায়।

নিশ্চয়। তবে ভুল রাস্তায় ঘুরেছি বলে নয়। আমি বলছিলুম, এ প্রগতির যুগে রাস্তাঘাট, ঘরদোর সব কিছুর উন্নতি ও সংস্কার হওয়া উচিত।

এখানে সভা ক'রে বক্তৃতা করুন না।

সেজন্যই ত এখানে এসেছি।

কলকাতায় থাকেন বুঝি?

আমাদের স্থায়ী বাড়ি জেলখানা, তা ছাড়া সর্বত্রই থাকি।

আপনারা কি criminals?

What? আপনি না ভদ্রমহিলা?

তাই ত'! মঞ্জুশ্রী উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বুঝলেন, criminals ছাড়াও বহু লোক আছে, যারা জেলখানাকে বাড়িঘর করে ফেলেছে এবং দেশের লোকের কাছে তারা সম্মানিত, ছেলেবুড়ো তাদের একডাকে চেনে—ভক্তি করে।

ও আপনি দেশপুজ্য ব্যক্তি। আপনার নামটা জানা থাকলে কিন্তু এমন গুরুতর অপরাধ করতুম না।

না, আমি দেশপুজ্য লোক নই, তবে জেলঘুঘু আসামীও নই। চন্দ্রনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ লোক ত' আপনি, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলেন, পথও বলে দিলেন না, এখন আমি যাই কি ক'রে। কৃষ্ণপক্ষের রাত নাকি?

আমার গাড়ি রয়েছে।

সে ত' দেখতেই পাচ্ছি। বড়লোকদের অবশ্য আঁধার-আলোকে কিছু যায় আসে না।

সে কথা বলছি না, আপনাকে পেঁছে দিতে পারি, সেই কথা বলছি।

ধন্যবাদ! আমরা ক্যাপিটালিস্টদের গাড়িতে উঠি না।

আমি ত' capitalist নই।

শুনে সুখী হলুম। সে যা হোক, এবার দয়া করে রাস্তাটা দেখিয়ে দিন, আমিও যেতে পারি, আপনাকেও ভদ্রতা করে কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।

কষ্ট মোটেই হবে না, আমার যাবার পথেই বাড়ি পড়বে।

তাহ'লে আপনি বাড়িটা চেনেন।

বাড়িটা ঠিক চিনিনে, তবে জায়গাটা চিনি। আসুন গাড়িতে।

চন্দ্রনাথ বিনা সঙ্কোচে মঞ্জুশ্রীর পাশে আসিয়া গাড়িতে বসিল।

মঞ্জুশ্রী গাড়িতে স্টার্ট দিলে চন্দ্রনাথ বলিল, আপনি বেশ up-to-date.

গাড়ি চালাই বলে?

না। ব্যবহারে! এখন যদি কেউ দেখে, ভাববে আমরা বিশেষ পরিচিত, অথচ আমরা কেউ কারও নাম পর্যন্ত জানিনে।

সে কথা সত্য, তবে আমার মনে হয়, লোকে কিছু ভাববে না, কারণ কেউ ত' আর আমাদের প্রশ্ন করছে না। বরঞ্চ লোকে আমায় হিংসে করবে।

হিংসে করবে—কেন?

কারণ আপনার মত দেশপুজ্য বিখ্যাত ব্যক্তি, যিনি জেল-খানাকে ঘর করেছেন, ছেলেবুড়ো সকলেই এক কথায় চেনে, ভক্তি করে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ত' সামান্য কথা নয়।

আপনি ভারি ফাজিল।

চন্দ্রনাথের কথায় মঞ্জুশ্রীর চঞ্চল রক্ত যেন নাচিয়া উঠিল, মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ অতিরিক্ত সারল্যবশত অপরিচিত এক তরুণী মহিলাকে এমনভাবে এমন কথা অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছে, কিন্তু তাহার কথার উত্তর দেওয়া মঞ্জুশ্রীর পক্ষে সম্ভবপর হইল না, তাহার মনের মাঝে যে রঙ ছড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উত্তেজনায় সে শুধু ঘামিয়া উঠিল।

অন্ধকারে চন্দ্রনাথ মঞ্জুশ্রীর চোখ মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না এবং পারিলেও বোধ হয় সে এ রাগের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম হইত না। মঞ্জুশ্রী চুপ করিয়া যাওয়ায় চন্দ্রনাথ মনে করিল, ফাজিল বলাতে মঞ্জুশ্রী চটিয়াছে, তাই তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, রাগ করলেন। দেশপুজ্য লোক বলে গর্ব করি, এমন মিথ্যে ঠাট্টা করায় না ফাজিল বলেছি, সিরিয়াসলি ত' বলিনি।

তথাপি মঞ্জুশ্রী কোন কথা বলিল না।

বাঃ রে! তবু রাগ পড়ল না। আমাকে ক্ষমা করবেন কি? চন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে মঞ্জুশ্রীর হাত তুলিয়া লইল।

চন্দ্রনাথের পরশে মঞ্জুশ্রীর শরীর যেন বারবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মঞ্জুশ্রীর মনে কোন্ কথা বাজিতে লাগিল জানি না, কিন্তু চন্দ্রনাথের সারল্যকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় এবং সে সারল্যের মর্যাদা যে সে আর রক্ষা করিতে সক্ষম নয়, তাহা সে বুঝিতে পারিল। তবু মঞ্জুশ্রী স্টিয়ারিং

ছাড়াইবার ছলে হাতখানি টানিয়া লইতে পারিল না। চন্দ্রনাথের হাতের মুঠায় তাহার কোমল হাতখানি শুধু থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

খানিকদূর গাড়ি অগ্রসর হইলে চন্দ্রনাথ বলিল, আর কতদূর? লোকনাথবাবুর নিন্দে করেছি বলে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছেন না ত'। চন্দ্রনাথ নিজের রসিকতায় উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ক্যাপিটালিস্ট আর ক্যাপিটালিস্ট ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জানেন ত', কাজেই বাগে যখন পেয়েছি—

মঞ্জুশ্রী কথা শেষ করিতে পারিল না, চন্দ্রনাথ বলিল, ভয় পাবার ছেলে আমি নই, দেশপূজ্য ব্যক্তি নই সত্য, কিন্তু দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ—নির্ভীক, নির্মম। এই দেখুন না, ভয়ে আপনার হাত কেমন কাঁপছে।

মঞ্জুশ্রী ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইল।

বস্তির মোড়ে আসতেই চন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, এই যে স্বর্গধাম দেখা যাচ্ছে। সাধে কি লোকনাথবাবুর দুর্নাম করি, একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখুন। থাক্ আর পরনিন্দা নয়—আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, অশেষ ধন্যবাদ। আপনাখানা দয়া চিরকাল মনে থাকবে। ...ত টাকা।

মঞ্জুশ্রী গাড়ি থামাইলে চন্দ্রনাথ গাড়ি হইতে ...র সাত টাকা ... লক্ষ কি সাড়ে

চন্দ্রনাথ গাড়ির দরজা বন্ধ করিতে করিতে ... খাটাইবার মত দিতে গেলে সহসা সম্মুখে একখানা গাড়ি আনন্দ। যে ব্যক্তি

গাড়িটি হইতে যে যুবকটি নামিল সেই হাজার লোকের চিনে না, কিন্তু মঞ্জুশ্রী তাহাকে দেখিয়াও তিন লক্ষ টাকা ব্যয় যুবকটি আর কেহ নয়—রাজেন্দ্র। ...বে না, সে জাতীয় নৈতিক

রাজেন্দ্র একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি... ষী।

মঞ্জুশ্রীকে বলিল, I'm ashar... মল সৃষ্টি হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ...মে যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে

এ লোকটি কে? কি, কথা ...তেছে স্লাম অর্থাৎ বস্তি ভাঙ্গিবার

রাজেন্দ্রের ঔদ্ধত্যে ...র বাঁধিয়া বস্তি সৃষ্টি করিতেছি।

একবার ভাবিল, এ অ... এইরূপ হয় না। এই যে লক্ষ লক্ষ

কঠিন উত্তর দেয়, কিন্... বাস করিতেছে, ইহাদের আছে কি?

...নাই, পুত্র নাই, এমনকি আপনার বলিতে ...কুমড়া গাছ পর্যন্ত নাই। ইহাদের মত ...ন আগাছা পৃথিবীর আর কোথাও আছে ...ইবার কিছুই নাই, তাহাকে হুজুগে মাতান ...মানুষেও পারে।

...ক জীবনের অতিশয় নিম্নস্তরে নামিলেও ...ংকরহিত হয় না। এই সকল লোককে সুদূর ...জীবনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার প্রলোভন ...লবের সৃষ্টি করা যায়। ইহাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া

অস্ত্রবল যতই ...চেষ্টা করা নিকৃষ্টপন্থা। আমি আরও বলিয়াছি, বাধ্য রাষ্ট্রের ...ভাবের জীবনযাপন করে, ইহা আমাদেরই জাতীয় সম্বন্ধেরই স...ঙ্ক। এই কলঙ্ক দূর করিবার উপায় আছে যেমন, হয়, তাহা হ...এক আধ বিঘা জমিতে লাউ গাছ, কুমড়া পড়ে, দরকা...ন করিতে শেখান, তাহাদের ঘরে তাহাদের মাধুর্যকে উ...্রীকে গৃহিণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহাদের পক্ষে যিনি ...ন্যার হাসিকলহে মুখরিত করা। একটা নরক, যজ্ঞ, তিনিই ...স্বর্গ। ত্রিশঙ্কুর মত অনির্দিষ্টকালের জন্য শূন্যে

এ জা...

বিশ্রী কলহ সৃষ্টি হইবে মনে করিয়া আত্মসংবরণ করিয়া লইল।

রাজেন্দ্র কিন্তু থামিল না। মঞ্জুশ্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া কণ্ঠস্বরে আরও শ্লেষ ঢালিয়া বলিল, তোমার কি বুদ্ধি বল ত? কোন খবর নেই, ইদিকে লোকনাথবাবু অস্থির হয়ে পড়েছেন, চারদিকে লোক ছুটেছে তোমায় খুঁজতে। রাত্রি ত' কম হয় নি। তুমি যে বন্ধু নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ, তা' বলে আসবার মত courage থাকলে সবাইর এমন কষ্ট পেতে হ'ত না।

...হইল।

মঞ্জুশ্রী রাজেন্দ্রের কথায় কোন ক... আদায়ীকৃত ... না, চন্দ্রনাথকে নমস্কার করিয়া বলিল, ... ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা

এত বড় উপেক্ষায় রাজেন্দ্র ... ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা

না, বিদ্রূপ করিয়া বলিল, সব ... ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা

মঞ্জুশ্রী বলিল, কেন ...ক্সের পরিমাণ সামান্য নয়। কিন্তু ...য়াও কাপড়ের কল টিকিয়াছিল। আমি

ভাল মুন্দ ...রা শুধু টিকিয়াছিল নয়, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই প্রকারের ট্যাক্স কয়েক বৎসর আদায় করিলে এবং এই টাকা মজুরদের উপযুক্ত গৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ব্যয়িত হইলে সমগ্র গৃহহীন বেপরোয়া মজুরকে কয়েক বৎসরে গৃহস্থ বানাইয়া ফেলা যায়। বাঙলা দেশে সমস্ত পাটকলে কত টাকার মাল প্রস্তুত হয়, সেই সংবাদ নীচে দিলাম। তুলনার সুবিধা হইবে বলিয়া উপরে উক্ত তিন বৎসরেরই হিসাব দেওয়া হইল। বস্তুত মোট যত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল, তাহার হিসাব দিলাম। মোট উৎপন্ন মালের দাম ইহা হইতে নিশ্চয়ই বেশী।

বৎসর	রপ্তানিকৃত চটের দাম
১৯২২-২৩	প্রায় ৫০ কোটি টাকা
১৯২৩-২৪	প্রায় ৪২ কোটি টাকা
১৯২৪-২৫	প্রায় ৫২ কোটি টাকা

আপনারা দেখিবেন ইহা বোম্বাই প্রদেশের সমগ্র মিলে উৎপন্ন কাপড়ের দাম অপেক্ষা বরং কিঞ্চিৎ বেশী। যদি কাপড়ের কল প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটি টাকা আবগারী ট্যাক্স দিয়াও টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল, তাহা হইলে পাটকলইবা এই পরিমাণ ট্যাক্স দিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না কেন? বাঙলা দেশের পাটকলের অধিকাংশ মালিকই সাহেব। সুতরাং আমার এই কথাতে অনেকে হয়ত সাম্প্রদায়িক আভাস দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা দেখিবেন তাঁহারা ভুল করিবেন। পাটকল ইত্যাদিতে যেই ধরণের বিদেশী মজুর কাজ করে, তাহাদিগকে সখ করিয়া ঘরবাড়ি দিয়া বাঙালী বানাইতে আমি বাঙালী হিসাবে রাজী নই। কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে, এই সব লোক অবাঙালী হইলেও মানুষ ত বটে। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া যেই প্রকারের নৈতিক জীবনযাপন করিতে হয়, আমি তাহার বিরোধী। যাহারা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া এই সব বড় বড় কারখানা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মজুর বা কুলি সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ গৃহস্থ শ্রমিক সৃষ্টি করেন নাই, সেই সব কারখানার মালিকরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। সময় থাকিতে এ অবস্থার প্রতিকার করা আবশ্যক। এই মজুরদিগকে গৃহস্থ বানান আবশ্যক। গৃহস্থ শ্রমিকের মনোবৃত্তি এবং বেপরোয়া মজুরের মনোবৃত্তি বিভিন্ন। এই মূল সত্যকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। এই মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া কারখানার মালিকদেরই উচিত এই বিষয়ে অবহিত হওয়া। শুধু অবহিত হওয়া নয়, উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাওয়া উচিত, নহিলে শীঘ্রই প্রাণ বাঁচান দায় হইবে।

এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে তাহাদেরই মঙ্গল। পাটকলের অনুকারক যে সকল সুতার কল, চিনির কল ইত্যাদি বাঙালীদের পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ঘটাইতেছে, তাহাদিগকেই বা আমরা দয়া করিব কেন?

পাটকল ইত্যাদির মালিক এই প্রকার আবগারী ট্যাক্স দিতে আপত্তি করিয়া অবশ্যই কাঁদুনী গাহিবেন। যাহারা কাঁদিয়া বলিবেন যে, এই ট্যাক্স দিতে হইলে পাটকল ইত্যাদি বন্ধ হইয়া যাইবে, এক কথায় তাহাদিগকে জবাব দিতে হয়—থাক, গেলেই বাঁচি। কত যুগ ধরিয়া বাঙলাদেশে পাটকলের সৃষ্টি হইয়াছে, তবু এখন পর্যন্ত বাঙালী চাষী দলে দলে পাটকলে মজুর হইতে আসে না, হিন্দুও আসে না, মুসলমানও আসে না। কেন আসে না, তাহা খোঁজ করিয়া দেখিয়াছেন কি? এখনও এই সকল কারখানায় অবাঙালী মজুরেই বেশী কেন আসে তাহা খোঁজ করিয়া দেখিয়াছেন কি? বাঙালী চাষী একবেলা শাকান্ন খাইয়া কোনও প্রকারে বাঁচে, তবু কুড়ি টাকা বেতনে পাটকলে কুলি হয় না, কিম্বা হইলেও টিকিতে পারে না। বাঙালী চাষীর রুচি অপেক্ষাকৃত মার্জিত বলিয়াই আসে না। যাহারা বলিবেন, বাঙালী কষ্টসহিষ্ণু নয় বলিয়াই আসে না, তাহারা ভুল করিবেন। কলিকাতার বাহিরে অনেক জেলাতে জনবহুল গ্রামের নিকটে অবস্থিত যেই সকল কলকারখানা আছে সেই সকল কলকারখানাতে হাজার হাজার চাষী নিকটবর্তী গ্রাম হইতে কাজ করিতে আসিয়া থাকে। কর্মান্তে তাহারা আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যায়। বাঙালীরা স্বভাবতই গৃহী, কিন্তু তাহাদিগকে ঘোরো বলিলে অন্যায় করা হয়। আসামের জঙ্গল কাটিয়া লক্ষ লক্ষ বাঙালী চাষী ঘরবাড়ি করিয়াছে। বিহার অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বাঙালী বসবাস করে। ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতবর্ষের বাহিরে বহুস্থানে বাঙালী সাধারণ লোক বসবাস করে, কিন্তু গৃহহীন বেপরোয়াভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া বসবাস করিতে বাঙালী রাজী নয়, এমনকি শাকান্নভোজী চাষীও নয়। কিন্তু কারখানা শিল্পের বহুল প্রচার হইলে আস্তে আস্তে এই নিষ্ঠাবান্ বাঙালী চাষীরও নিষ্ঠা অন্তর্হিত হইবে। তখন সাধু সাবধান।

আপনারা কেহও বাঙালী কুলি দেখেন নাই, দেখিতে পারেন না, কারণ বাঙালী চাষী এখনও কুলি হইতে চাহে না এবং হয় না। লাইনবন্দী বস্তিতে বাঙালী চাষী বাস করিতে রাজী নয়। কৃষ্টিগত এই সত্যকে উপেক্ষা করিয়া যিনি জোর করিয়া এই বাঙলা দেশের বুকের মধ্যে বস্তি সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে এই ভুল বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিককে গৃহস্থালী করিবার উপযোগী এক আধ বিঘা জমি দিতে তাহাকে বাধ্য করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে কেহও জমি সম্বন্ধে অনুকূল ব্যবস্থা না করিয়া কারখানা খুলিতে না পারে, তাহার জন্য আইন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে দেখিবেন বাঙলা দেশের কারখানাতে বাঙালী শ্রমিক দলে দলে কাজ করিতে আসিবে। তখন বরং স্বীকার করিব যে, কারখানা শিল্প বাঙলা দেশের কিছু উপকারে আসিয়াছে। আপনারা কি চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারেন না? বাঙলা দেশে যে সকল কারখানা শিল্প আছে, তাহার লাভের কত অংশ বাঙালী অংশীদারগণ পায়? কারখানা চালাইতে মোট যে মজুরি খরচ হয়, তাহার কত অংশ বাঙালী মজুর পায়? বাঙালী চাষীর পাট ইত্যাদি কাঁচামাল বিক্রয় হইতেছে, ইহা কথার প্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাটকল গঙ্গার তীরে না হইয়া সাইবেরিয়াতে হইলেও আমাদের পাট বিক্রয় হইত।

পাটকল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সুতার কল সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে বরং বেশী খাটে, কারণ এই প্রকার কারখানার অধিকাংশ মালিকই ভারতীয়। হাজার হাজার পুরুষ শ্রমিককে জোর করিয়া সন্ন্যাসী বানাইবার অথবা দুর্নীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য করিবার অধিকার তাহাদিগকে কে দিয়াছে?

[লেখক কৃষক ও শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত তাঁহার নিজস্ব। আমরা সর্বত্র তাঁহার সহিত একমত নহি।

—সঃ 'দেশ'।]

বেমানান

(৩৫৫ পৃষ্ঠার পর)

"আপনার একটু কষ্ট হবে মা। আপনি আমায় বড্ড স্নেহ করেন। আমার বাবুর জন্যেও আমার কষ্ট হচ্ছে মা, হাজার হলেও অনেকদিন কাটিয়েছি।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে, "অনেক বিরক্ত করেছি বাবু মনে কিছু রাখবেন্ না। জল এসে পড়বে, এইবার চলি তাহলে—" চোখেও তার জল এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি মাঠের পথে বেরিয়ে পড়ে সে।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে রমা ফিরে এসে বলে, "আহা বেচারা যেতে যেতে অনবরত চোখ মুছছিল।" রমার চোখও শুকনো থাকে না।

একটু পরেই ধুলো উড়িয়ে ঝড় উঠলো সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গেলাম কিন্তু শ্রীবিলাস তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

খানিকক্ষণ পরে ঝড় থেমে গেল। বর্ষণের বেগও ক্রমে কমে এল। শুধু ঝির ঝির করে একটানা মৃদু বৃষ্টির শব্দ কানে আসতে লাগলো। অক্ষম আক্রোশে' আর আকুলতায় ঘরের আবহাওয়াও কিছুক্ষণ হুটোপুটি করে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে এল।

সকাল বেলা উঠে অভ্যেস মত কাগজ হাতে করে নিম গাছের তলায় গেলাম। দেখি কালকের ঝড়ে গাছের একখানা ডাল একেবারে খানিকটা বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে ভেঙে পড়েছে। কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিরিবিলিতেও আজ আর খবর জানবার আগ্রহ বোধ করলাম না। কাগজখানা হাতে করে আহত গাছটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

সতীর্থ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীনাথ দাস লেনে অনেক কাল পরে হরলালের সঙ্গে সেদিন দেখা হয়ে গেল। হরলালের এক হাতে দুখানা তালের পাখা আর হাতে কিসের একটা মোড়ক। অন্যমনস্কভাবে মাথাটা ডান দিকে একটু হেলিয়ে কি ভাবতে ভাবতে হরলাল সামনের দিকে চলেছে। দেখতে পেয়ে আমিই আগে ডাকলাম, "হরলাল, হরলাল!" প্রথমে যেন একটু চমকে উঠল, তারপর আমাকে লক্ষ্য করতেই সোল্লাসে বলল, 'আরে সুনীল, তুমি!' বললাম, 'কি খবর? এদিকেই থাক না কি কোথাও?'

হরলাল বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো মলঙ্গা লেনে বাসা। এস, এস, কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। অনেক দিন ভেবেছি তোমার কথা, শুনেছিলাম তুমি তোমার পুরানো মেস ছেড়ে কোথায় উঠে গেছ। তারক, কালীগোপাল ওরা সব এখন কলকাতার বাইরে থাকে, তবু ওদের সকলের সঙ্গেই একবার না একবার দেখা হয়ে গেছে, অথচ তুমি কলকাতায় আছ তবু একবার এসে দেখা কর না।'

বললাম, 'তুমি যে মেস ছেড়ে কবে বা কোথায় বাসা করেছ তাও জানি না। তাছাড়া কলকাতার এই গুণ। এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষাই করতে হয়, দেখা করা আর হয়ে ওঠে না।' হরলাল হেসে বলল, 'তুমি ঠিক একই রকম আছ সুনীল, সেই সাহিত্যিক ভাষায় কথা বলা—'

একই রকম কি আর আছি। একই রকম কি আর লোকে থাকতে পারে। তবু অনেক দিন পরে, অনেক দিনের পুরানো বন্ধুর মুখে কথাটা শুনতে বেশ লাগে। হরলালকেও ভারি ভালো লাগল। চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে, হরলালের সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে শরীর, কপালের রেখাগুলি আর গালের শীর্ণতা স্পষ্ট চোখে পড়ে। তবু এই হরলালকে সেই হরলাল বলে মনে করতে ভালো লাগল। এই উপলক্ষে ভুলে যাওয়া অনেকগুলি বছরকে একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। অনেকখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় যেন হঠাৎ লম্বালম্বিভাবে টর্চের আলো গিয়ে পড়েছে।

মলঙ্গা লেনে ঢুকে একটু দক্ষিণে এগিয়েই হরলালের বাসা। একতলায় মাঝামাঝি সাইজের একখানা ঘর। তারই সংলগ্ন ছোট একটু খোপের মধ্যে রান্না করার জায়গা। ঢুকতেই সেই রান্নাঘরটুকুই আগে চোখে পড়ল। তার মধ্যে হরলালের স্ত্রী রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। আর তাঁর পিঠের কাছে ছোট্ট একটি মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কান্নার আয়োজন করছে, আমাদের আসতে দেখে বিস্মিতভাবে এদিকে তাকাল। বোঝা গেল আপাতত কান্না তার স্থগিত রইল। মেয়ের বিষন্ন মুখ হরলালের চোখ এড়াল না। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওকে আবার মেরেছ বুঝি? কতদিন বলেছি এই রোগা মেয়েটাকে —এস লতু, তুমি আমার কাছে এস।' হরলালের স্ত্রী ঘোমটাটা টেনে দিয়ে এদিকে একটু তাকালেন। অপরিচিত লোকের সামনে স্বামীর এই ঈষৎ তিরস্কারে বুঝি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

পাখা দুখানা আর মোড়কটি রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে রেখে মেয়েটির হাত ধরে হরলাল বড় ঘরখানায় ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এস সুনীল।'

দুখানা ছোট ছোট চৌকি মিশিয়ে পাতা হয়েছে ঘরের মধ্যে, তাতে ঘরের সবটাই প্রায় জুড়ে গেছে। চৌকির ওপর গিয়ে উঠে বসলাম। একপাশে এগার বার বছরের একটি ছেলে সশব্দে ইংরেজী কবিতা মুখস্ত করছিল। হরলাল ঘরে ঢুকেই একটি ভুল উচ্চারণ সংশোধন করে দিল। আমার দিকে চেয়ে বলল, ছেলে। বউবাজার হাইস্কুলে পড়ছে। ক্লাস সেভেনে এবার ফার্স্ট হয়ে উঠেছে। শেষের কথাটা বেশ একটু পরিতৃপ্ত গর্বের সুরে বলল হরলাল। আমার মনে পড়ল ক্লাসে হরলাল থার্ড ফোর্থ হত, চেষ্টা করেও তার ওপরে উঠতে পারে নি। এজন্য ওর ভারি ক্ষোভ ছিল মনে মনে। সেই ক্ষোভ যেন ওর সম্পূর্ণে মিটে গেছে।

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি খোকা।'

পড়া থামিয়ে ছেলেটি বলল, 'বিমলেন্দু সান্যাল।'

হরলাল বলল, 'ইনি তোমার কাকাবাবু হন, নমস্কার কর বিমল। আর যাও রান্নাঘরের সামনে থেকে পাখা দুখানা নিয়ে এস, কেউ হয়তো পাড়া দিয়ে ভেঙে টেঙে ফেলবে।'

তারপর হরলাল বলতে লাগল, 'আমাদের মত লোকের কি আর কলকাতায় বাসা করা পোষায় সুনীল, কিন্তু কি আর করি, মেসের রান্না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেলে, শরীর ক্রমেই পড়তে লাগল ভেঙে, এদিকে খরচও লাগে বেশী, মেসের খরচ বাড়ির খরচ, কম নয় কোনটাই, ছেলের পড়াশুনাও তেমন হয় না বাড়িতে তার চেয়ে দেখলাম'—

হরলাল যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।

হেসে বললাম, 'বেশ করেছ, ঘরভাড়া কত দিতে হয়?'

হরলাল গলা একটু খাট করে বলল, 'সে হিসাবে বেশ সস্তাতেই পেয়েছি ভাই। বার টাকা, কিন্তু ঘরখানা বেশ বড়ই বলতে হবে। আর এমন পূব দক্ষিণ খোলা ঘর কলকাতা খুব বেশী পাবে না। বেশ চমৎকার হাওয়া লাগে, এই চৈ মাসেও রীতিমত শীত শীত করে রাত্রে।'

সংসারের নানা টুকটাক আসবাবে ঘর একেবারে ভরতি দেয়ালগুলির পর্যন্ত কোথাও একটু ফাঁক নেই। ছো একটা কেরোসিনের বাক্সে আসন নিয়ে লক্ষ্মী দেওয়ালের এ জায়গায় ঝুলে রয়েছেন। তার পাশে হরলালের অফিসের স কর্মীদের খান দুয়েক গ্রুপ ফটো। বিভিন্ন ব্যবসা কোম্পানীর অনেকগুলি সচিত্র ক্যালেন্ডার। প্রত্যেকখান ওপরে লেখা, 'বিমলেন্দু সান্যাল, ক্লাস সেভেন।' আর এ দিকের দেয়ালে হরলালের স্ত্রীর সূচিশিল্পের কয়েক নিদর্শন। জলের মধ্যে পদ্মফুল আর হাঁস, নিচে লে কমলা। পাশে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী থে চারটি লাইন রঙীন সুতোর সুন্দর হস্তাক্ষরে বাঁধিয়ে র হয়েছে।

'তোমার হৃদয় কম্প্র অঙ্গুলির মত
আমার হৃদয় তন্ত্রী করিবে প্রহত
সংগীত তরঙ্গ ধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি থর থর করি।'

কিন্তু লক্ষ্মীর আসনের দিকে চেয়ে হরলাল বলল, 'তৃণ হতে কার্য হয় রাখিলে যতনে।' কথাটা বলতেন আমার ঠাকুরদা, ঐ ছোট কেরোসিনের বাক্সটা অফিসের বারান্ডায় পড়ে পড়ে পচছিল দেখেই আমার মনে হল এর খানিকটা দিয়ে কয়েকখানা পিঁড়ি তৈরী করা যাবে, আর বাকিটুকুতে লক্ষ্মীর আসন। নিয়ে এলাম। তোমার বন্ধু-পত্নী দেখেই জ্বলে উঠলেন, 'ও জঞ্জালগুলি আবার বয়ে এনেছ কেন?' বললাম, 'জঞ্জাল! মেয়ে মানুষের বুদ্ধি আর কত হবে, দেখো এ দিয়ে কি করি?'

বুঝলাম এদের প্রেমালাপ এখন আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নয়, তা এখন 'তৃণ হতে কার্যে'র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, এই তো স্বাভাবিক, ভালোবাসার ভাষাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়।

খানিকক্ষণ পরে অবগুণ্ঠিতা বন্ধু-পত্নী চা আর জলখাবারের প্লেট নিয়ে এলেন। হরলাল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক, এখন আর অতবড় ঘোমটা দিতে হবে না। এ সুনীল, আমার বন্ধু। ওর কথা অনেক দিন তো বলেছি তোমাকে, ওর কাছে লজ্জা কি।'

বন্ধুপত্নীর বোধ হয় মনে পড়ল না, আমার কথা ওঁর কাছে অনেক দিনই হয়ত হরলাল বলেছে কিন্তু সে অনেক দিন, নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে।

চা খেতে খেতে হরলাল অনেক কথাই বলল। কথা অনেক কিন্তু বিষয় একই। সবই তার সংসার সম্বন্ধে, ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে। বাসা করায় কত সুবিধা হয়েছে, মেসে যে সব বাজে খরচ হত সেই পয়সায় সংসারের কত কাজের জিনিস হয়, এক চায়ের পিছনে যা ব্যয় হত হরলালের তা দিয়ে সংসারের সকলের জলখাবার হয়। হিসাব করে না চললে কি থাকা যায় কলকাতায়।

ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে যে ছোট্ট অপরিসর পৃথিবী হরলাল গড়েছে তার বাইরে আর তার যাওয়ার দরকার হয় না। এ স্বয়ং সম্পূর্ণ মহাযুদ্ধের তরঙ্গ এর দেয়ালে ঠেকে ফিরে যায়। সেই আগের হরলালের কথা ভেবে আর কি হবে। তার ছিল সমুদ্র আর এর চায়ের পেয়ালা। কিন্তু এই বা মন্দ কি, এও কি কম উপভোগ্য। সমুদ্রের বিশালতা আর বৈচিত্র্য এতে অবশ্য নেই। না-ই বা রইল। কিন্তু চায়ের পেয়ালায়ও মাঝে মাঝে নাড়া লেগে, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে; সে বিক্ষোভ আমার কাছে তুচ্ছ হলেও এদের কাছে হয়ত মহাসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসেরই মত।

হঠাৎ বিমল উঠে গেল রান্নাঘরে। একটু পরে ফিরে এসে তার বাবার কাছে চুপে চুপে বলল, "বাবা, মা জিজ্ঞেস করছেন ওঁর দাদা কি ডিঙামাণিকের চাটুয্যে বাড়িতে বিয়ে করেছেন?"

আমি ছেলেটিকে হেসে বললাম, "হ্যাঁ।" ডিঙামাণিকের চাটুয্যেদের সঙ্গে হরলালের স্ত্রীর কি সম্পর্ক আছে জানি না, হয়ত কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা থাকতে পারে। তবু মনে হ'ল স্বামীর বাল্যবন্ধুত্বের চেয়ে সেই দূর আত্মীয়তার সম্বন্ধেই হরলালের স্ত্রী আমাকে মনে মনে বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবতে পারলেন। ক্রমে ক্রমে আলাপের আরও অনেক প্রসঙ্গ উঠল। পুরান বন্ধুবান্ধব থেকে আধুনিক সাহিত্য সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোচনা করলাম আমরা। কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। কিছুতেই তা আর ভরে উঠছে না, কিছুতেই জমে উঠছে না আলাপ। কোথায় সেই আগ্রহ আর কৌতূহল, সেই উত্তাপ আর উত্তেজনা। তার অভাব আমরা দুজনেই টের পাচ্ছি, কিন্তু তার জন্য কোন ক্ষোভ করছি না, আমরা জানি এমনি হয়। এই-ই যে নিয়ম এ কথা আমরা এতদিনে মেনে নিয়েছি। সেসব দিন যে শুধু নেই তাই নয়, তা নিয়ে ভাবালুতা প্রকাশের বয়স পর্যন্ত আমরা পিছনে ফেলে এসেছি।

হঠাৎ হরলাল কি ভেবে বলল, "যা হোক, তুমিই কিন্তু বেশ আছ সুনীল, বিয়ে থা করনি, কোন হাঙ্গামও নেই, ঝঞ্ঝাটও নেই, বেশ আছ।"

হেসে বললাম, "হঠাৎ তোমার এই বৈরাগ্যের কি কারণ ঘটল হরলাল? হাঙ্গাম ঝঞ্ঝাট থাকলেও তুমি যে খুব অ-সুখে আছ, তা তো মনে হয় না।"

হরলাল বলল, "বাইরে থেকে তাই মনে হয়। সংসার তো করলে না, এর আবিলা বুঝবে কি করে। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে নিত্য ত্রিশ দিন। ওষুধপত্রে কি কম পয়সা ব্যয় হয়। আর নিজে গেলাম দাঁতের যন্ত্রণায়। গোটা দুই পড়েছে, আর একটা নড়ছে, ভারি যন্ত্রণা পাচ্ছি।"

"তোমার বোধ হয় এ-সব কোন বালাই নেই?" হরলাল অনেকটা ঈর্ষান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

হেসে বললাম, "না হে, সংসারের ঝঞ্ঝাট এড়ালেও দাঁতের যন্ত্রণা এড়ান যায় না। এই দেখ, বলে দু'পাটি দাঁত খুলে হরলালকে দেখালাম। 'পাইওরিয়ায় কি কম ভুগেছি! শেষে একেবারে সব তুলে ফেলে তবে নিষ্কৃতি।'"

হরলাল সোল্লাসে বলল, "ও তাই বল। আমি ভেবেছিলাম--

তোমার তা হলে সবই তুলে ফেলতে হয়েছে? ভারি কষ্ট পেয়েছ, না?" শেষের দিকে হরলালের কণ্ঠ সহানুভূতিতে সিক্ত হ'য়ে এল।

যন্ত্রণা আমার দাঁতে আর ছিল না, মন থেকেও প্রায় সবটুকুই মুছে গিয়েছিল। তবু অতীত দুঃখের সবিস্তার বর্ণনায় একরকম আনন্দ পাওয়া যায়। দাঁতের যন্ত্রণায় কি ভাবে ভুগেছি, তার সকরুণ বর্ণনা একটু একটু ক'রে হরলালকে শোনালাম।

হরলাল বলল, "আমারও তো দেখছি ভাই সেই দশা! উঃ এককেটা দাঁত নড়ে, আর সে কি যন্ত্রণা। কি করব, তোমার

(শেষাংশ ৩৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২৩

চা-পানের পর প্রশান্ত অফিস-ঘরে ফিরিয়া গিয়া প্রথমে অর্ধপঠিত সংবাদপত্রটা খুলিয়া বসিল। মিনিট পাঁচ-সাত পরেই কিন্তু চায়ের টেবিলে লাবণ্যর স্তব্ধগভীর মূর্তির কথা ভাবিয়া সে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

সংবাদপত্র পাঠ স্থগিত রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সে অবগত হইল, লাবণ্য দ্বিতলে গিয়াছে। দ্বিতলে প্রথমে সুলেখার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে ধীরে ধীরে টোকা মারিয়া ডাকিল, "সুলেখা, ঘরে আছ?"

কক্ষের অভ্যন্তর হইতে লাবণ্যর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "ভেতরে এস।"

দ্বার ঠেলিয়া প্রশান্ত ভিতরে প্রবেশ করিল। সে মনে করিয়াছিল তথায় সুলেখাও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "সুলেখা কোথায় লাবণ্য?" পরমুহূর্তে লাবণ্যকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "একি লাবণ্য! তোমার চোখে জল কেন? কি হয়েছে বল ত'।"

মৌখিক কিছু না বলিয়া লাবণ্য সুলেখার চিঠিখানা প্রশান্তর দিকে আগাইয়া ধরিল।

ব্যস্ত হইয়া লাবণ্যর হস্ত হইতে চিঠিখানা লইয়া প্রশান্ত একটা চেয়ারে উপবেশন করিল; তাহার পর আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া গভীর ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "অন্যায়! ভারি অন্যায়! এমন ছেলেমানুষী সে কেন করলে! কিন্তু তুমি এর জন্যে এত উতলা হচ্ছ কেন লাবণ্য?—তোমার অপরাধ কোথায় বল? গৌরহরি সম্বন্ধে কি সন্দেহের কথা তুমি তাকে বলেছিলে তা আমি জানিনে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় জানি যে, যা-ই তুমি ব'লে থাকনা কেন, সুলেখা তার নানা রকম অবিবেচনার আচরণের দ্বারা তোমাকে তা বলতে নিতান্তই বাধ্য করেছিল।"

স্বামীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া লাবণ্যর দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া এক রাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

প্রশান্ত বলিল, "তা ছাড়া, তুমি তাকে যত রূঢ় কথাই বলে থাকনা কেন, আমাকে না জানিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। সে ত' শুধু তোমার কাছেই ছিল না লাবণ্য, আমার কাছেও ত' ছিল।"

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আর্তকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "তোমার কাছেই ত' সে ছিল। ছি, ছি! কি লজ্জার কথা! যে কদর্য কাণ্ড সে করে গেল, তোমার কাছেই মুখ দেখাতে আমি লজ্জা পাচ্ছি, আর অন্য লোকদের কাছে কি ক'রে দেখাব, বল দেখি!"

প্রশান্ত বলিল, "আমার কথা যা বলছ তা বাজে; অন্যলোকদের বিষয়েও কতকটা তাই। কিন্তু অবনীশ আসবার আগে সুলেখা যদি ফিরে না আসে তা হ'লে অবনীশের কাছে সত্যিসত্যিই লজ্জায় পড়তে হবে। সে এসে যদি শোনে, শুধু আমাদের মত না নিয়েই নয়, আমাদের একেবারে না জানিয়ে, কোন অজানা শহরে অজানা পরিবারের মধ্যে সুলেখা একা বেড়াতে গেছে,—তা হ'লে কতটা উদারতার সঙ্গে সে কথা সে নিতে পারবে তা বলতে পারিনে;—কিন্তু এখানে এসে সুলেখাকে দেখতে না পেয়ে, খুসি যে হবেনা, তা নিশ্চয় বলতে পারি।"

লাবণ্য বলিল, "কোন পুরুষমানুষই স্ত্রীর, বিশেষত নতুন বিয়ে করা স্ত্রীর এতটা স্বেচ্ছাচারিতা উদারতার সঙ্গে নিতে পারে না। আর, সে উদারতার কোন মানেও নেই। তা ছাড়া, কি কৈফিয়ৎ তাকে তুমি দেবে বল দেখি? যে কথার জন্যে রাগ ক'রে সে চ'লে গেছে, সে কথা তাকে বলা যায় না; আবার, যে চিঠি সে লিখে রেখে গেছে, সে চিঠিও তাকে দেখান যায় না। গৌরহরিকে জড়িত করে যেভাবে যে কথাই তুমি বলনা কেন, অবনীশের কানে তা কখনই ভাল লাগবে না।"

প্রশান্ত বলিল, "আমার মনে হচ্ছে লাবণ্য, গৌরহরিকে উপস্থিত বরখাস্ত করে বিদায় করাও ঠিক হবে না। সুলেখার বিয়েতে গৌরহরি অনেক কাজকর্ম করেছিল, সুতরাং অবনীশের তাকে জানা অসম্ভব নয়; তা ছাড়া, সে যে আমাদের এখানে চাকরী করতে এসেছে, সে কথাও হয়ত' সে তোমার দাদার কাছে শুনে থাকবে, কিম্বা গাড়িতে আসতে আসতে শুনবে। অবনীশ যদি এখানে এসে গৌরহরিকেও না দেখতে পায় তাহলে ব্যাপারটা তার কাছে হয়ত আরও একটু গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া ভয়ে লাবণ্যর মুখ শুকাইল; উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলিল, "দেখ, গৌরহরি আছে কি না তা ঠিক বলতে পারিনে!"

চমকিত হইয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আছে কি-না, বলতে পার না?"

লাবণ্য বলিল, "আমাদের বাড়িতে; হয়ত বা এলাহাবাদে।"

"কি করে জানলে?"

যে সন্দেহের বশবর্তিনী হইয়া লাবণ্য কিছু পূর্বে জয়ন্তকে দিয়া অবনীশের অনুসন্ধান করাইয়াছিল, সমস্তই সে প্রশান্তকে বলিল।

শুনিয়া প্রশান্ত ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সুলেখা ক্রমশ ভাবিয়ে তুললে দেখছি! গৌরহরিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সত্যিসত্যিই সুলেখা ভাবিয়ে তুললে!"

ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্য-জ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ির উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো ক'রে রাখেন,—নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ্ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাড়িতে পানের পিক্ ও থুথু ফেলেন,—তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়, জাতির স্বাস্থ্যেরও করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয় তেমনি তাঁদের কুৎসিৎ আচরণের কুআদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের মধ্যে আর একদল আছেন যাঁরা কলাচর্চাকে বিলাসী ও ধনীর একচেটিয়া সম্পত্তি ব'লে প্রতিদিনের কার্যক্ষেত্র থেকে তাকে অবজ্ঞাভরে নির্বাসিত করতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে, সুষমাই শিল্পের প্রাণ, টাকার মূল্যে শিল্পের বিচার চলে না। গরীব সাঁওতাল তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছিয়ে, মাটির বাসন, ছেঁড়া কাঁথা গুছিয়ে রাখে। আবার কলেজপড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদতুল্য হোস্টেলের বা মেসের ঘরে দামী কাপড়-জামা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে জবরজঙ্গ ক'রে রাখে; এখানে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্যবোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবন্ত, আর ধনী সন্তানের সৌন্দর্যবোধ পোষাকী এবং প্রাণহীন। আর্টের উপাসনার নামে ক্যালেন্ডারের মেমসাহেবের ছবি শিক্ষিত লোকের ঘরে ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে সত্যিকারের ভালো ছবির পাশে স্থান পেয়েছে দেখতে পাই। ছাত্রমহলে দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে, পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আর্সি চিরুণী ও কোকোর টিনে কাগজের ফুল সাজানো। প্রসাধনে কাপড়ের উপর বুক-খোলা কোট, শাড়ির সঙ্গে মেমসাহেবের ক্ষুর-ওলা জুতো—এইরূপ সর্বত্রই সুষমার অভাব, আমাদের অর্থ সত্ত্বেও, সৌন্দর্যবোধের দৈন্য সূচিত করে।

আবার একদল লোক আছেন—যাঁরা বলেন, "আর্ট ক'রে কি পেট ভরবে?" এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার যেমন দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক এবং একটা অর্থলাভের দিক্ তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ দেয় এবং একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সঙ্কুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়—আমাদের অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। কারুশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক দুর্গতির আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া দেশের পক্ষে আর্থিক দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বসন্ত উৎসবের আয়োজন

শিল্পশিক্ষার অভাবে যে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার পথকে অসুন্দর ক'রে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীতের রসস্রষ্টাদের (সৃষ্ট) সম্পদ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয়নি, তাই দেশের অতীত গৌরব—যে চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, একদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার দরকার হোলো সেগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিতে। আধুনিক যুগের শিল্পসৃষ্টি আজও বিদেশের বাজারে যাচাই না হোলে আমাদের দেশে আদৃত হয় না—এ আমাদের লজ্জার কথা। এর প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে এইবার মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা যাক।

শিল্পশিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে—প্রকৃতিকে এবং

ভালো ভালো শিল্পবস্তুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা, এবং যাঁর সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে অপর শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষার স্থান রাখা, শিল্পকে পরীক্ষাক্ষেত্রে অবশ্যশিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যাতে পরিচয় ঘটতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও অবকাশ রাখা। অঙ্কন পদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়বে, ফলে তা'রা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সত্যদৃষ্টি লাভ করবে। বিদ্যালয়ে কাব্যচর্চার ব্যবস্থা দের পরিচয় ঘটাতে হবে। চতুর্থত, মাঝে মাঝে নিকটবর্তী কোনো যাদুঘর, চিত্রশালা এবং অতীত কীর্তির নিদর্শন উপযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে দল বেঁধে ছেলেরা গিয়ে দেখে আসবে। বিদ্যালয় থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে ট্রেন ভাড়া দিয়ে ছেলেরা যখন গিয়ে থাকে তখন ট্রেন ভাড়া দিয়ে কোনো ভালো চিত্রশালা বা যাদুঘর দেখে আসাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না। একথা মনে রাখতে হবে—একটা ভালো শিল্পবস্তু নিজে চোখে দেখলে এবং বুঝলে শিল্পদৃষ্টি যতটা জাগ্রত হয়, দশটা বক্তৃতায় তা' হয় না। ভালো জিনিস ছোটোবেলা থেকে দেখতে দেখতে কিছু বুঝে কিছু না বুঝে ছেলেদের চোখ তৈরি হবে, পরে তাদের ভালোমন্দ

স্কুলের ছাত্রদের শিল্পপ্রদর্শনী

আছে, কিন্তু কাব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করলেই কেউ বড়ো কবি হন না, তেমনি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকলেই যে সকল ছেলেই শিল্পী হবে এবং ভালো শিল্পসৃষ্টি করতে পারবে, এমন আশা করা ভুল হবে।

প্রথমত ছেলেদের বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে কিছু কিছু ভালো ছবি, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন (অভাবে ঐ সকলের ভাল ফটো বা প্রিন্ট) সাজিয়ে রাখতে হবে; দ্বিতীয়ত ভালো ভালো শিল্পনিদর্শনের ছবি ও ইতিহাস-দেওয়া সহজবোধ্য ছেলেদের বই উপযুক্ত লোক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখাতে হবে; তৃতীয়ত, ছায়াচিত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বদেশের ও বিদেশের বাছাই করা ভালো ভালো শিল্পবস্তুর সঙ্গে ছেলে-জিনিস বিচার করবার শক্তি আপনি জন্মাবে এবং ক্রমশ সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে। পঞ্চমত, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যোগসাধন করবার জন্য। সেই আয়োজনের মধ্যে থাকবে সেই সেই ঋতুর ফুলফলের সংগ্রহ এবং শিল্পে ও কাব্যে সেই সেই ঋতু সম্বন্ধে যে সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি আছে তার সঙ্গে ছেলেদের যতদূর সম্ভব পরিচয় ঘটাবার ব্যবস্থা। ষষ্ঠত, প্রকৃতিতে যে ঋতু উৎসব চলছে তা'র সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করাতে হবে; শরতের ধানক্ষেত ও পদ্মবন, বসন্তে পলাশ শিমুলের মেলা তা'রা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে নগরবাসী ছেলেদের জন্যে এটা অত্যাবশ্যক, গ্রামের ছেলেদের কেবল এইদিকে

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই চলবে। তাদের এইসব ঋতু উৎসবের জন্য বিশেষভাবে ছুটি দিয়ে বন-ভোজনের এবং ঋতু উপযোগী বেশভূষা, খেলা-ধূলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকৃতির মুক্ত প্রাংগণে চিত্রাঙ্কণরত ছাত্রদল

...ধনার মুখপত্রস্বরূ... ...একাখানা প্রকৃতির সংগে যোগসাধন হইলাম। সংহতি ভিন্ন বর্তমান জগতে কার ভালোবাসতে কিবার উপায় নাই, প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা। কখনও শুকো... প্রচারে ব্রতী হইয়াছে। ভারতের কৃষি ও শিল্পের ...রণতি, 'রবীন্দ্র সাহিত্যে শিক্ষার আদর্শ', দুইটি সারগর্ভ শিল্পসৃ...ন্তিত লেখা বর্তমান সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ছোট গল্প

স্কবিতা কয়েকটি বেশ ভাল।

পরিচয়

তুর্কী বীর কামাল পাশা—মৌলবী রেজাউল করিম। প্রকাশক—নূর লাইব্রেরী, ১২।১, সারংগ লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

মৌলবী রেজাউল করিম সাহেবের পরিচয় বাঙলার পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার উদার মনোভাব, প্রগাঢ় রাজনীতি জ্ঞান এবং গভীর স্বদেশপ্রেমের জন্য বাঙালী সর্বসাধারণের তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নবীন তুরস্কের জন্মদাতা মহাপ্রাণ কামাল পাশার জীবনীর ভিতর দিয়া মৌলবীসাহেব যে আলোকপাত সম্প্রতি করিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগীয় অন্ধ সংস্কার হইতে বাঙলা দেশকে মুক্ত করিতে সাহায্য করিবে এবং ইতর সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে স্বদেশপ্রেমের আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। এমন বই বাঙলার ছেলেমেয়েদের সকলকে পড়িতে দেওয়া হয়, আমরা ইহাই চাই। তাহারা কামালকে চিনুক, জানুক এবং তাঁহার আদর্শ জীবনে সত্য করিতে অনুপ্রেরণা লাভ করুক। দীর্ঘ পরাধীনতার জীর্ণ সমাজের অনেক গ্লানি তাহাতে কাটিয়া যাইবে।

পরিচয়—রবীন্দ্র-সংখ্যা—রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বাঙলা দেশের যে কয়খানি সাময়িক পত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে পরিচয়ের রবীন্দ্র-সংখ্যাখানি তাহাদের অন্যতম। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে এই সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছেন হীরেন দত্ত, শচীন সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, জীবনময় রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায়, বসুধা চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রলাল রায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, এজরা পাউন্ড প্রভৃতি। জীবনময় রায়ের "শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্মৃতি" রচনাটি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি, কারণ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এবং সেখানকার পরিবেশে মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটি নূতন পরিচয় লাভ করা যায়। "গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ" "রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি" "রবীন্দ্রনাথের ছবি" "মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ" ইত্যাদি বিষয়গুলি বহু আলোচিত হইলেও আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধ-লেখকগণ নূতন দৃষ্টিভংগী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে "সম্পাদকী" মন্তব্য পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। লেখকদের আমন্ত্রণ করিয়া রচনা আনিয়া সম্পাদকীতে তাহাদের অপমান করা শালীনতাবিরুদ্ধ ও অশোভন বলিয়াই জানি, বিশেষভাবে সংখ্যাটি যখন রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

মাতৃভূমি (আষাঢ়)—সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। ৪৪নং আমহার্স্ট রো হইতে প্রকাশিত।

'মাতৃভূমি' মাসিক পত্রিকাখানির আয়ু মাত্র তিন বৎসর, কিন্তু এই অল্প সময়ে পত্রিকাখানি যে পরিমাণ উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহাতে যে কোনো প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্রের সহিত স্থান পাইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'আফগানদের পরিচয়' ও অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় চিত্রকলা' প্রবন্ধ দুইটি মৌলিক রচনা ও উৎকৃষ্ট। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কেদার রাজা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। জ্ঞানেন্দ্র-কুমার ভট্টাচার্য লিখিত 'আসামের বনে-জংগলে শিকার কাহিনী' কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর। বিবিধ প্রসংগে সম্পাদকের মননশীলতা ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

নব-ভারতী (আষাঢ়)—সম্পাদক শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনিল-চন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪, কলেজ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

নব-ভারতী পত্রিকাখানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। জ্ঞানানুসন্ধিৎসু কিশোরদের নিকট পত্রিকাখানি পৌঁছানো দরকার, কারণ সাম্প্রতিক চিন্তাধারার সহিত যোগ রাখিয়া কিশোরদের জন্য নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি সরস ও সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিতদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে এই পত্রিকাখানি সহায়তা করিবে।

ভাই-বোন (আষাঢ়)—সম্পাদক শ্রীপ্রভাবতীকিরণ বসু। ৭, রাজা-বাগান স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ভাই-বোন ছোটো ছেলেমেয়েদের পত্রিকা; গুরুগম্ভীর রচনায় ইহা ভারাক্রান্ত নহে। কিশোর বয়সের অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক জোগাইবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সরস রচনা সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই পত্রিকা খানিতে প্রকাশিত হয়। ভ্রমণ, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ম্যাজিক, ভৌতিক কাহিনী, সরস গল্প ধারাবাহিক উপন্যাস ইত্যাদি সব কিছুই পত্রিকায় আছে—যাহা শিশুমনকে সহজেই আনন্দ দিতে পারে।

একটি কুসুম—মৃগেন্দ্রলাল খান প্রণীত। শ্রীধরিত্রী দেবী কর্তৃক ৫।১৬, বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

লেখক পল্লীর পটভূমিকায় এই গাঁথার ভিতর দিয়া করুণ সুর বাজাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এবং কবি জসিম উদ্দীনের 'সুজন বাদিয়ার ঘাটে'র ছাপ তাঁহার লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। লেখকের ভাষা-সম্পদ আছে; কিন্তু বৈচিত্র্য এবং বিভংগীর অভাবে যে সুরটি তিনি বাজাইতে চাহিয়াছেন, তাহা তেমন করিয়া বাজে নাই। গাঁথার নায়িকা কুসুম ও নায়ক কানাইয়ের প্রেম ভাবময় রূপ পায় নাই, তাহার এক কারণ কানাইয়ের অন্তরের ছাপ পাঠকের মনে গভীররূপে ফেলিতে হইলে যে কারিগরির দরকার, লেখায় তাহার অপ্রতুলতা রহিয়াছে। পল্লী প্রকৃতির সংগে কুসুমের প্রাণের সুরের ঝংকার জাগাইয়া করুণ রসটিকে জমাট করিবার কৃতিত্বেও ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। লেখকের প্রথম উদ্যম হিসাবে লেখাটি মন্দ হয় নাই; অনেকের কাছেই ভাল লাগিবে।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু লিখিত 'শিল্পকলা ও শিক্ষা' প্রবন্ধটি New Education Fellowship-এর Bulletin হইতে সংগৃহীত।

পূরবীতে—"এপার ওপার"

পরিচালক—**সুকুমার দাশগুপ্ত**
কাহিনী—**শ্রীকান্ত সেন**
প্রধান ভূমিকায়—**অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, মেনকা, সুপ্রভা মুখার্জি, মণিকা গাঙ্গুলী, পান্না প্রভৃতি**

নিউ টকীজের প্রথম ছবি 'এপার ওপার' গত শুক্রবার হইতে 'পূরবী' চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইতেছে। চিত্র পরিচালনা ক্ষেত্রে সুকুমার দাশগুপ্তের আবির্ভাব নূতন নহে, ইতিপূর্বে একাধিক চিত্র তিনি পরিচালনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে 'রাজকুমারের নির্বাসনে' তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের ছবির পরিচয় দিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় যে, তাঁহার অধিকাংশ ছবি কাব্যধর্মী, সেন্টিমেন্ট ও মেলোড্রামার প্রাধান্য বেশী। ঘটনা ও অবস্থান তৈয়ারী করার দুরূহ কাজকে তিনি সংলাপের মধ্য দিয়া সহজেই সারিয়া ফেলিতে চান এবং সে সংলাপ সহজ স্বাভাবিক হইলে চলিবে না, তাহা পুরামাত্রায় কবিত্বমণ্ডিত ও কৃত্রিম হওয়া চাই। সহজ কথাকে ঘুরাইয়া বলিবার মোহ তাঁহার প্রচণ্ড; তাই তাঁহার চিত্রের নায়ক নায়িকারা সহজ ভাষায় কথা বলেন না, কাব্যিক ভাষায় উপমার অন্তরালে নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখিতেই তাঁহারা ভালবাসেন। 'রাজকুমারের নির্বাসনে' সংলাপের এই অস্বভাবিকতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, 'এপার ওপার' চিত্রে তাহা আরও একমাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে 'এপার ওপার' চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপে বলিয়া লওয়া ভাল। এপারে মিল ওপারে কলোনী। এই মিল ও কলোনীর মধ্য দিয়া যান্ত্রিকতা ও পল্লীজীবন, অর্থলোলুপ ধনীর অত্যাচার ও নিপীড়িত জনগণের সেবা এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সংঘাত লইয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। মিলের মালিক রমেন দত্ত যশ, অর্থ, খ্যাতি সবই পাইয়াছেন, কিন্তু তথাপি লোভ তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। একমাত্র পুত্র প্রবীর তাঁহার মিলের সেক্রেটারী; মালিক ও কর্মচারীর সম্বন্ধ আসিয়া পিতা পুত্রের স্নেহ ভালবাসার সম্বন্ধটুকু দূর করিয়া দিয়াছে। ওপারে কলোনীর প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করবাবু এপারে মিলে তিনি কাজ করিতেন, দুর্ঘটনায় পা কাটা যায়। ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়া তিনি গরীব কুলি মজুরদের অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কলোনীর প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানার একজন কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী কল্যাণী ও তাঁহার দুই মেয়ে সুতপা ও বিনীতা শঙ্করের সঙ্গেই থাকে, শঙ্করের এই মহৎ কার্যে সহায়তা করে। কুলীদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইতে গিয়াই রমেন ও শঙ্করের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িয়াই চলিয়াছে। এদিকে রমেনের পুত্র প্রবীর শঙ্করের আশ্রিতা সুতপাকে ভালবাসে, কিন্তু এপার ও ওপারের দ্বন্দ্বে তাহাদের ভালবাসাও বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়। মিলের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য রমেন দত্ত শঙ্কর কলোনী কিনিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। শঙ্করবাবু তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে দুষ্টলোকের সাহায্যে একরাত্রে কলোনীতে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। এই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র প্রবীর ওপারে কলোনীতে চলিয়া গেল। পুত্রকে হারাইয়া রমেন দত্তর ভুল ভাঙিল, অনুতপ্ত চিত্তে একদিন তিনি শঙ্কর কলোনীতে আসিয়া দশজনের মাঝে দেখা দিলেন, শঙ্করবাবুর কাছে পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইলেন, সেই সঙ্গে সুতপাকেও, কাহিনীর এইখানেই সমাপ্তি।

সারকো প্রডাকসন্সের "মধুসূদন" চিত্রে শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি। ছবিখানি গণেশ টকীজে চলিতেছে।

কাহিনীর মধ্যে অসংলগ্নতার আধিক্য থাকা সত্ত্বেও গল্পের বলিষ্ঠ রূপ আছে। পরিচালনার দোষে সে বলিষ্ঠতা সর্বত্র সুরক্ষিত হইতে না পারিলেও, কাহিনীর মূলগত আদর্শটি ঢাকা পড়ে নাই। শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্বকে ঘটনার মধ্য দিয়া বেশী না দেখাইয়া সংলাপের আশ্রয়েই পরিচালক তাহা সারিতে চাহিয়াছিলেন এবং যেখানে ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। পারাণীর জন্য যে দাঙ্গার দৃশ্যটি দেখানো হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ছেলেমানুষী হইয়াছে। দাঙ্গার ভাব ত আসেই নাই, মনে হইতেছিল কয়েকটা লোক লাঠি হাতে মজা

এম পি প্রোডাকসন্স-এর বাংলা সামাজিক চিত্র 'মায়ের প্রাণ'-এ প্রমথ বড়ুয়া, সরযূবালা ও তপন মুখার্জি (মাস্টার বুলু)। ছবিখানি ২৮শে জুন হইতে উত্তরা চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইবে

করিতেছে। তাহার পর কলোনীতে আগুন লাগার দৃশ্যটি মনে কোন ছাপ রাখে না। অত বড় কলোনী অথচ দেখানো হইয়াছে কয়েকটি স্টুডিও-সজ্জিত কুঁড়ে ঘর, আর আগুন লাগা ত নয়, যেন Bon fire· যে সব ঘটনাগুলি দর্শকদের চিত্তে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিফলিত হইয়া মনকে সাড়া দিতে পারিত, তাহা নিতান্ত কৃত্রিম ও হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্করের সহিত কল্যাণীর পূর্বপ্রেমজনিত যে মধুর সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝিতে হয় চিত্রপরিবেশকদের মুদ্রিত কাহিনী পড়িয়া। ছবি দেখিয়া ধরিবার উপায় নাই। প্রবীরের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী অজয়ের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। কোথাও কিছু নাই সুতপা বলিয়া উঠিল "অজয় দা-ও আছেন," আমরাও জানিলাম প্রবীরের একজন rivalও আছে। ইহার পূর্বে অজয়কে দেখিয়াছি পণ্ডিতের পাঠশালায় গো-বেচারার মতো বসিয়া থাকিতে, প্রবীরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই।

ছবিখানিকে পদে পদে বাধা দিয়াছে একঘেয়ে সুরের দশখানি গান। গান না থাকিলে বাঙলা ছবি চলে না এই ধারণা লইয়াই বোধ হয় এতগুলি গান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু গানগুলির জন্য উপযুক্ত Situation তৈরী হয় নাই বলিয়া তাহা কেবল বেমানান নয় বিরক্তিকর হইয়াছে। climaxএর মুখে আনিয়া হঠাৎ একখানি গান—এ যেন পুরাকালের যাত্রার ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে চারণের অথবা নিয়তির গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশের মতো। ছবির শেষে অনুতপ্ত রমেন দত্ত যেখানে শঙ্করের কাছে আত্মাভিমানের মোহ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুরূপে দেখা দিয়াছে হঠাৎ সেখানে গানের মধ্য দিয়া উপদেশ বাণী শুনিতে হইলে আৎকাইয়া উঠিতে হয়।

অভিনয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয় ছবি বিশ্বাসের কথা। মিল মালিক রমেন দত্তর ভূমিকায় তিনি অভিনয় করিয়াছেন এবং সুঅভিনয় করিয়াছেন। এই একটি চরিত্রই তাহার দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার গুণে কাহিনীকে কোথাও ঢিলা হইতে দেয় নাই।• শঙ্করবাবুর ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় সাধারণ শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। এক পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তাঁর অভিনয়ে পাওয়া গেল না। নায়িকা সুতপার ভূমিকায় মেনকাকে বহুকাল পরে সিনেমায় দেখা গেল এবং বহুকাল বাদে অভিনয় দেখিলাম বলিয়াই বোধহয় তাহা ভাল লাগিয়াছে। রমেন দত্তর পুত্র প্রবীরের ভূমিকায় ধীরাজের অভিনয় চলনসই, তাঁহার অভিনয়ে জড়তা নাই, কিন্তু মেয়েলিপনা অসহ্য হইয়া ওঠে। পল্লী পাঠশালায় যে ভাঁড়ের দল দেখা গেল তাহাদের স্থূল রসিকতাগুলি বাদ দিলেই ভাল হইত। ফোটোগ্রাফী মাঝে মাঝে খুবই খারাপ হইয়াছে, মুখই চেনা যায় না। ছবির বহির্দৃশ্যগুলি মনোরম। মাঝ নদীতে মাঝির নৌকা বাহিয়া চলা ও ভাটিয়ালী সুরের গানখানি ভাল লাগিয়াছে।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘের ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্র

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘের পরিচালিত দশম বার্ষিক ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্র সম্প্রতি কাঁকুড়গাছিস্থ বাঙলা সরকারের ব্যায়াম কলেজে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৯শে মে এই শিক্ষা কেন্দ্রের কার্য আরম্ভ হইয়া ১৯শে জুন শেষ হইয়াছে। এই ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রে বাঙলার বিভিন্ন জেলার ৪১ জন স্কুল শিক্ষক যোগদান করেন। শিক্ষা কেন্দ্রের পরিসমাপ্তি দিবসে যোগদানকারী শিক্ষকগণ সম্মিলিত ব্যায়াম, খালি হাতে ব্যায়াম, বিভিন্ন খেলাধুলার কৌশল প্রদর্শন করেন। ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনী সমবেত দর্শকগণকে বিশেষ আনন্দ দান করে। মাত্র এক মাসের শিক্ষালাভ করিয়া যোগদানকারী শিক্ষকগণ যেরূপ সুন্দরভাবে নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা না করিয়া যদি পূজার ছুটির সময় ও বড়দিনের ছুটির সময়ও এইরূপ ব্যায়াম কেন্দ্র খুলেন, তবে উক্ত শিক্ষকগণ আরও অধিক কিছু শিক্ষা করিতে পারেন। আমরা জানি ইহা ব্যয় স্বাপেক্ষ। তাঁহারা যদি এইজন্য নিয়মিতভাবে সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা করেন, তবে কিছু অর্থ যে তাঁহারা পাইতে পারেন এই বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এই ব্যায়াম শিক্ষক কেন্দ্র সাধারণ শিক্ষকগণকে আধুনিক ব্যায়াম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সাহায্য করিতেছে। বাঙলা সরকারের পরিচালিত ব্যায়াম কেন্দ্রে সাধারণ শিক্ষকগণ শিক্ষা করিতে পারেন না। কেবলমাত্র সরকারের পরিচালিত স্কুলসমূহের শিক্ষকগণই শিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু বাঙলাদেশের স্কুলের সংখ্যা সম্বন্ধে আলো-

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘের পরিচালিত ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রের এই বৎসরের যোগদানকারী শিক্ষকগণ ও পরিচালকগণ
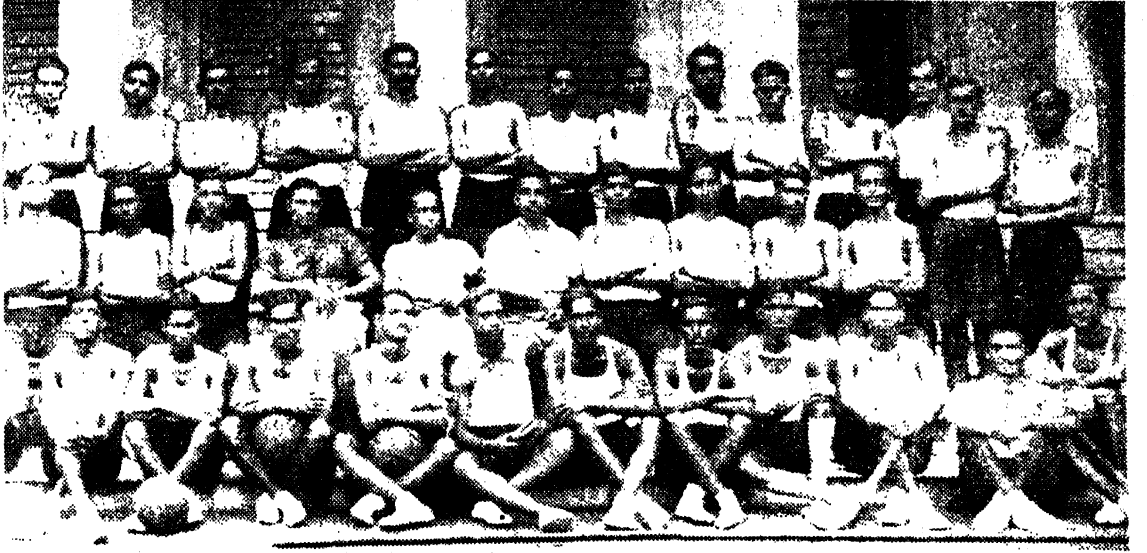
ব্যায়াম ও খেলাধুলার কৌশলাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা আরও অধিকদিন শিক্ষা কেন্দ্রে থাকিতে পারিলে আরও উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিতেন ইহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু জ্ঞান আছে, তাঁহারা জানেন, এক মাসের মধ্যে উক্ত ব্যায়াম প্রণালীর সকল কিছু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। বাঙলা সরকারের পরিচালিত ব্যায়াম শিক্ষা কলেজে ৯ মাস শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও উক্ত ব্যায়ামের পূর্ণ জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নহে; কেবল সাধারণ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। সুতরাং নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক মাস ব্যাপী ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালনা করিয়া যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে যোগদানকারী শিক্ষকগণকে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইতে বঞ্চিত করিবেন। এইজন্য মনে হয় উক্ত সমিতি যদি বৎসরের মধ্যে একবার গ্রীষ্মকালে এইরূপ কেন্দ্র খুলিয়া যেভাবে প্রতি বৎসর চনা করিলে দেখা যাইবে সাধারণের পরিচালিত স্কুলের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং সাধারণের পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকগণ যাহাতে অধিক সংখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম কৌশলের কিছু শিক্ষা করিতে তাহার ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ দরকার। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘ যে ব্যবস্থা গত দশ বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন, তাহার সাহায্যে সাধারণের পরিচালিত সকল স্কুলের শিক্ষকগণকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। কারণ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘ প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির সময় বাঙলার কোন না কোন অঞ্চলে একটি মাত্র কেন্দ্র খুলিয়া থাকেন এবং তাহাতে মাত্র ৪০।৫০জন শিক্ষকই যোগদান করিতে পারেন। এই সময় বাঙলার সকল জেলায় যদি একটি করিয়া কেন্দ্র খোলা হয়, তবেই ব্যায়াম শিক্ষা কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। বাঙলার সাধারণ স্বাস্থ্য বর্তমানে যেরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে দ্রুত ব্যায়াম শিক্ষার

ব্যাপক ব্যবস্থার দ্বারা দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা হওয়া ব্যতীত এই শোচনীয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন অল্প সময়ের মধ্যে করা একরূপ অসম্ভব। আমরা আশা করি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘ তথা বাঙলার ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠন ও উন্নতিকারী সকলে এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। স্কুলের ছাত্রগণের উপরই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। এইজন্য ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে স্কুলের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। বাঙলার ছাত্রমণ্ডলী কিরূপে স্বাস্থ্যোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, যদি তাহাদের এই দিকে নির্দেশ দিবার মত শিক্ষকগণ প্রতি স্কুলে বর্তমান না থাকেন?

নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধা জো লুই

পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধা জো লুই সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে অল্পের জন্য নিজ অর্জিত গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একরূপ প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্তে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বিলি কনকে নক আউট করেন। এই প্রতিযোগিতা ১৫ রাউন্ড পর্যন্ত হইবে বলিয়া স্থির ছিল। ১২ রাউন্ড পর্যন্ত বিলি কন পয়েন্টে জয়লাভ করেন। ১৩ রাউন্ডের শেষ সময় হঠাৎ জো লুই বিলি কনকে নক আউট করেন। জো লুইর সহিত এই পর্যন্ত যতজন লড়িয়াছেন কেহই এত অধিকক্ষণ লড়িতে পারেন নাই। এই বিষয়ে বিলি কনের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়; বিলি কনের ওজন ১২ স্টোন ৬ পাউন্ড ও জো লুইর ওজন ১৪ স্টোন ৩ পাউন্ড। এইরূপ ওজনের ব্যবধান হওয়া সত্বেও বিলি কন যেরূপ লড়িয়া পরাজিত হইয়াছেন, তাহাতে সকলকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছে।

জো লুইর কৃতিত্ব

জো লুই ১৯৩৭ সালের ২২শে জুন জেমস ব্রাডককে অষ্টম রাউন্ডে পরাজিত করিয়া প্রথম হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হন। ইহার পর জো লুইকে এই পর্যন্ত ১৬ বার লড়িতে হইয়াছে। উক্ত ১৬ বারের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—টমি ফার, ন্যাথান ম্যান, ম্যাক্স স্মেলিং, জন হেনরী লুই, টনী গ্যালেন্টো, ম্যাক্স বেয়ার ও বেন সিমন। ইহার পর জো লুইকে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে লুয়ো নোভা নামক একজনের সহিত লড়িতে হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

বিলি কনের পরিচয়

বিলি কনের আসল নাম উইলিয়াম ডেভিড কন। ইতিপূর্বে ইনি পৃথিবীর লাইট হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের ৮ই অক্টোবর ইস্ট লিবার্টি নামক গ্রামে বিলি কনের জন্ম হয়। ইহার বর্তমান বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। জলী রে নামক একজন মুষ্টি যোদ্ধা বিলি কনকে পিট্‌সবার্গের এক জিমন্যাসিয়ামে আবিষ্কার করেন। একদিন জলী রে একটি জিমন্যাসিয়ামের পাস দিয়া যাইতেছিলেন। সেইখানে তিনি দেখেন কয়েকটি বালক ভীষণ গণ্ডগোল করিতেছে; তাহাদের মধ্যে বিলি কন ঘুসি পাকাইয়া দাঁড়াইয়া তিনি ঐ দৃশ্য দেখিয়া বালক বিলিকে তাঁহার জিমন্যাসিয়ামে লড়িবার জন্য আহ্বান করেন। বিলি রাজী হন। উভয়ের মধ্যে মুষ্টি যুদ্ধ হইলে জলী দেখিতে পান যে বিলি ভবিষ্যতে বড় মুষ্টি যোদ্ধা হইতে পারিবেন। বিলিকে তিনি নিজ জিমন্যাসিয়ামে লইয়া রীতিমত মুষ্টি যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দিতে থাকেন। দুই বৎসর নিয়মিত শিক্ষা দিবার পর জলী জেফী নামক একজনের হেফাজতে বিলিকে দান করেন। জেফী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিবার ব্যবস্থা করেন। ফলে বেবী রিস্কো, ভিনীস ডান্ডী, টেডী যারোজ, অস্কার রাঙ্কিন, ইয়ং কর্বেট ইহাদের প্রত্যেককে বিলি সহজে পরাজিত করেন। সলী ক্রিগার নামক একজনের নিকট বিলি পরাজিত হন। তবে কয়েক মাস পরেই তিনি ক্রিগারকে পরাজিত করেন। ইহার পর পৃথিবীর লাইট হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হইবার ইচ্ছা ধিলি কনের জাগে। ফলে মেলিয়া বেটীলার সহিত বিলিকে লড়িতে হয়। ১৯৪০ সালে বিলি পর পর লি স্যাভোল্ট, অল ম্যাক কয়, বব পেস্টার, হেনরী কুপার প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া লাইট হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হন। ইহার পর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হইবার ইচ্ছায় বিলি জো লুইর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিলেন না। তবে অনেকেই আশা করে বিলি কন দুই এক বৎসরের মধ্যেই জো লুইকে পরাজিত করিতে পারিবেন।

পৃথিবীর কয়েকটি নূতন রেকর্ড

সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ায় একজন নিগ্রো এ্যাথলীট ডিসকাস ছোড়ায় পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইঁহার নাম আর্চি হ্যারিস। ইনি ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইনি ১৭৪ ফিট ৮½ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস নিক্ষেপ করিয়া রেকর্ড করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে জার্মান এ্যাথলীট ডবলিউ সোডার ১৭৪ ফিট ২½ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড করিয়াছিলেন। আর্চি হ্যারিস সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন।

সম্প্রতি লস এঞ্জেলসের একজন তরুণ এ্যাথলীট উচ্চ লম্ফনে পৃথিবীর রেকর্ড করিয়াছেন। ইঁহার নাম লেস স্টিয়ার্স। ইনি ৬ ফিট ১১ ইঞ্চি অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অনেকে আশা করেন স্টিয়ার্স শীঘ্রই ৭ ফিট অতিক্রম করিতে পারিবেন। ইতিপূর্বে যিনি উচ্চ লম্ফনে পৃথিবীর রেকর্ড করেন, তিনি ৬ ফিট ৯¾ ইঞ্চি অতিক্রম করিয়াছিলেন।

আষাঢ়ের এমনি এক বর্ষামুখর সন্ধ্যায় গল্প জমেছিল। সন্ধ্যা মজলিসে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা হাজির হয়েছে; প্রবল বারিপাতকে মাথায় ক'রে আশপাশের বাড়ী থেকেও দু' পাঁচজন ছেলে গল্পের লোভে এসে কান পেতেছে। বৃদ্ধা ঠানমা'কে মাঝে রেখে চারপাশের শ্রোতার দল ঘন হয়ে বসেছে। যারা আদুরে তারা বুড়ী ছুঁইয়ে বসে আছে। শহুরে নবাগত শ্রোতাটি লাউড স্পীকারের অভাব অনুভব করছিল। গল্প আরম্ভ হ'ল।

এক ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়ের রূপ ছিল শাঁকচুন্নির মত কিন্তু দেবতার বরে তালপুকুরের জলে একদিন ডুব দিয়ে সে পরীর মত রূপ, আর এক ডুবে সারা অঙ্গে দামী অলঙ্কার এমনি আরও কত কি পেল। ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়ের বরাত ফিরে গেল। সেই শুনে হিংসুটে রাণী তার মেয়েকে পাঠাল তালপুকুরে ডুব দিতে। দেবতার অভিশাপে রাণীর মেয়ে নিজের রূপকে কিভাবে হারিয়ে মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিতে গেল—ঠানমার এ গল্পই সকলে এক মনে শুনছিল।

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি চোখে আরও অন্ধকার রেখে তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হ'ল। ঠানমা গল্প ছেড়ে রাম নাম জপতে আরম্ভ করলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে অদূরে বজ্রপাতের বিকট শব্দ গল্পের সূত্র ছিন্ন করল। গল্প আর জমল না। শহুরে ছেলেটি বললে, ঠানমার যত সব আষাঢ়ে গল্প। সব থেকে আদুরে নাতী বললে, ঠানমা, তুমি সেই পুকুরে ডুব দিয়ে পরীর মত হয়ে এস। তোমাকে আর বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

ঠানমা হতাশ হয়ে বললে, হায়রে আমার কপাল,—সে তালপুকুর কি আর আছে! রাণী মেয়ের রূপ দেখে রাগে দুঃখে এক রাতেই অত বড় পুকুরটা বুজিয়ে দিলে। লোকে বলে এখনও নাকি সেখানটায় রাণীর মেয়েটা চারদিকে কেঁদে বেড়ায়। কবে মেয়েটা মরে ভূত হ'য়ে গেছে কিন্তু লোকে তার কান্নার শব্দও নাকি শুনেছে।

নাতী গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

তালপুকুর বহুদিন মজেছে—আফশোষ নেই। কিন্তু ঠানমা আর নেই; তা নাহ'লে ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়ের মতনই তার রূপের জৌলুস এনে দিতাম। পাশ থেকে কে যেন বললে, পুকুরের সন্ধান পেয়েছেন নাকি? পুকুর নয় একজন ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া গেছে। নাম তাঁর—Sir Harold Gillies. তিনি একজন Plastic Surgeon. ছায়াচিত্রে রূপসী তারকার সন্ধান করা এক সমস্যা। অথচ অভিনয়ে রূপের প্রয়োজন প্রথমই। যারা ভাল অভিনয় করতে পারে তাদের রূপ নেই বলে শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করতে দেওয়া যায় কি করে! আবার যারা অসামান্য রূপের অধিকারী তাদের অভিনয়ে হয়ত যথেষ্ট জড়তা রয়ে গেছে। ছায়াচিত্র জগতের এ সমস্যা বহুদিন ছিল। মেজর গিলিজ সে সমস্যার সমাধান করে আজ প্রচুর অর্থ [illegible]

যাদের চলনসই মুখশ্রীও নেই তারা প্লাসটিক সার্জনের পরামর্শে অপূর্ব রূপশ্রী লাভ ক'রে ছায়াচিত্রে অভিনয় ক'রে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করছেন। মুখমণ্ডলের এতখানি পরিবর্ত্তনেও তার দোষ খুঁজে বার করবার কিছু থাকে না। সুন্দরীর স্বাভাবিক রূপ বলেই দর্শকদের ভুল হয়। সার্জন গিলিজের এই আবিষ্কারে কেবল ছায়া জগতের অভিনেত্রীরাই উপকৃত হয় নি। মুষ্টিযোদ্ধাদের নাক প্রচণ্ড আঘাতের ফলে খুব বেশী নষ্ট হয়। সার্জন গিলিজ সেই ভাঙ্গা সমতল নাকের উপরই বেশ দর্শনীয় একটি কৃত্রিম ছোট নাকের পিরামিড তৈরী করে দিয়ে মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করেন। আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে যাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যায় তাদের বাকি জীবনটুকু কতখানি দুর্বিসহ তা ভুক্তভোগীর অনুমেয়। আজ সেই সব হতভাগ্যরা সার্জন গিলিজের কল্যাণে মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে আবিষ্কারককে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। পোড়া মুখের উপর এমনভাবে মেরামত করা হয় যে, খুব বিশেষ পরীক্ষা ক'রেও নাকি কেহ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না।

গত মহাযুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যদলের বহু সৈন্য বিজয়ের আনন্দও ভাল করে উপভোগ করতে হয়ত পারত না। বারুদের আগুনে নিজেদের কদাকার মুখের ছবি বার বার তাদের নিরাশ করত। কিন্তু সার্জন গিলিজের করুণায় তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিল। প্রত্যাগত সৈন্যগণ প্রিয়জনের সুদৃঢ় আলিঙ্গনে দীর্ঘ দিনের বিরহ ব্যথা প্রফুল্ল মনেই উপশম করবার সুযোগ পেয়েছিল। সার্জন গিলিজ, তাঁর সাধনা—কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দে তাদের দু' চোখ জলে ভরে এসেছিল।

* * * *

চীনারা লিখে উপর দিক থেকে নীচের দিকে এবং ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। জাপানীরাও উপর দিক থেকে নীচের দিকে লিখে কিন্তু তাদের গতি আবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে।

* * * *

৩২শ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় উল্লিখিত জার্মান মহিলাটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ৫৩টি পুত্র কন্যা রেখে গতায়ু হন। প্রকাশিত পুত্রকন্যার সংখ্যাগুলি নির্ভুল আছে।

৬৮ বৎসরের বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর ঊনত্রিংশ পুত্র প্রসব করেন। ঘটনাটি অস্বাভাবিক বলতে হবে।' কিন্তু, ছাপার ভুলের দরুন 'অ' লুপ্ত হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বে পার্লামেণ্টের ছদ্মনাম ছিল 'Cabal'—এই ছদ্মনামের উৎপত্তি কোথায়, তার বিস্তারিত সমাধান দেওয়া ছিল। কিন্তু 'Cabal'এর স্থানে Cadeal হওয়ায় যা কিছু বিপত্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু সমাধানের সূত্র ধরে ছাপার এ বিভ্রাটকে সংশোধন করতে বুদ্ধিমান পাঠকদের [illegible]

দেশ

দেশ
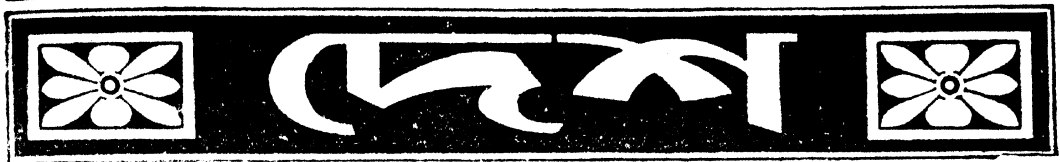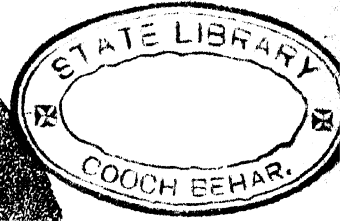
৮ম বর্ষ] ২১শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 5th July, 1941. [৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকায় পুনরায় অশান্তি—

ঢাকায় আবার দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং স্যার নাজিমউদ্দীন আমাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, ঢাকার অশান্তি সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছে এবং সেখানে পুনরায় অশান্তি দেখা দিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তাঁহাদের এই আশ্বাসের মূল্য যে কিছুই নাই, ঢাকার গত কয়েক দিনের ব্যাপারেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা তদন্ত কমিটির অধিবেশন চলিতেছে, অন্তত এই সময়টার জন্য আইন ও শান্তিরক্ষার কর্তা ব্যক্তিদের দৃষ্টি ঢাকার সম্বন্ধে সজাগ থাকিবে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আইন ও শান্তিরক্ষার মাতব্বরদের বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া গুণ্ডার দল বাঙলার দ্বিতীয় শহরে ছোরাছুরি চালাইয়া দুরন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাঙলার মন্ত্রীদের পক্ষে লজ্জার বিষয় ইহা অপেক্ষা আর কিছুই অধিক হইতে পারে না। দেশের শান্তিরক্ষায় তাহাদের অযোগ্যতার মাত্রা এই অবস্থার মধ্য দিয়া একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রীদের অবলম্বিত নীতিতে উপদ্রবকারীরা যে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এসব সন্দেহ করিবার অবসর নাই। রাজাবাজার এবং কুলটীর কাণ্ডই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। ইহা সত্য যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব দেশেই ঘটে, কোন দেশের গভর্নমেণ্টই একেবারে এমন ব্যাপার অসম্ভব করিতে পারেন না; কিন্তু দীর্ঘকাল ক্রমাগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত চলিবে, ঢাকার মত শহরেও অধিবাসীরা অরাজকতার আতঙ্কে দিনরাত কাটাইবে, তবু লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতে হইবে শাসকেরা বড় যোগ্য ব্যক্তি! এমন ভীরু কে আছে জানি না। আমরা স্পষ্টভাষায় বলিব এবং একশত বার বলিব, বাঙলার মন্ত্রীদের নীতিতে গুণ্ডার দল প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং শুধু গুণ্ডার দলই যে ঢাকার দাঙ্গার পিছনে আছে এমন নহে, ইহার পিছনে ঢাকার ধাড়ীদের মধ্যেও কেহ কেহ যে আছে এবং পিছনে থাকিয়া তাহারাই এই সব গুণ্ডাকে উস্কাইয়া দিতেছে—এসব বিষয়েও আমাদের সন্দেহ নাই। সেই রকম উস্কানি যদি পিছনে না থাকিত, তাহা হইলে গুণ্ডার দল এতটা সাহস পাইত না। ঢাকা তদন্ত কমিটির সম্মুখে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির বিরুদ্ধে এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, যাহাতে বর্তমান অশান্তির দায়িত্ব অনেকটাই মন্ত্রিমণ্ডলের উপর চাপান হইয়াছে। সেই সব সাক্ষ্য-প্রমাণে সিদ্ধান্ত কমিটি কি করিবেন, সেকথা এখানে বিবেচ্য নহে; বিবেচ্য হইল এই যে, এই সময়ে দাঙ্গা বাধাতে সেই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিতি লোকের স্বভাবতই আতঙ্ক উপস্থিত হইবে। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি দেশকে চরম দুর্দশার মধ্যে লইয়া ফেলিয়াছে। দেশের লোকের পক্ষে এই অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় মন্ত্রীদের উচিত পদত্যাগ করা; এবং তাঁহাদের যদি সে আক্কেল না থাকে, তাহা হইলে উচিত তাঁহাদেগকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করান। যে প্রকারেই হউক, বাঙলার মন্ত্রীদের অযোগ্যতাজনিত এই উপদ্রবকে অবিলম্বে রুদ্ধ করিতে না পারিলে বাঙলার সর্বত্র যে বিভীষিকার সৃষ্টি হইবে, তাহা স্মরণ করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

মন্ত্রীদের যোগ্যতার নিরিখ—

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু সম্প্রতি বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যের সমালোচনা করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে অবস্থা যেরূপ সঙ্কটজনক হইয়া হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট হইতে কোন সুফল আশা করা বৃথা। এই মন্ত্রিমণ্ডলী সব জায়গায় তাঁহাদের অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন, সঙ্কটকালে তাঁহাদের অযোগ্যতা অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে যতদিন পর্যন্ত দেশের শাসনকর্তৃত্ব থাকিবে এবং প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন

মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা কিছুতেই নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারি না।' বসু মহাশয়, মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, এদেশের কল্যাণকামী মাত্রেই তাহার সত্যতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিবেন এবং তাঁহার উক্তি সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়া এই কথা স্বীকার করিবেন যে, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার দিক হইতে মন্ত্রীরা শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন। এ পর্যন্ত যে সব ব্যবস্থা প্রবর্তন তাঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে দেশের লোকের মধ্যে উদ্বেগ এবং ভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বসু মহাশয় বলিয়াছেন, আইন এবং শান্তিরক্ষার অজুহাতে জাতির আশা-ভরসাস্থল রাজনীতিক কর্মী এবং সমাজসেবককে, যুবকদিগকে বিনাবিচারে প্রত্যহ জেলে পুরা হইতেছে, এদিকে তিন মাস ধরিয়া আইন ও শান্তিরক্ষকদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ঢাকা শহরে গুণ্ডাদের চলিতেছে তাণ্ডব নৃত্য। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কি করিয়াছেন এই সব গুণ্ডাদের কঠোর হস্তে দমন করিবার জন্য? মন্ত্রিমণ্ডলী যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা সত্যই অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে একবার এমন একটা দাঙ্গা হইয়া যাইবার পর ঢাকায় আবার দাঙ্গা বাধিত না—শুধু দাঙ্গা বাধাই নয়—দিবা দ্বিপ্রহরে কলিকাতার রাজাবাজারে গুণ্ডার দল যেভাবে মন্ত্রীদের উপর পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল, ঢাকা শহরে সেরূপ শ্বেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ধাওয়া করিতে সাহস পাইত না; পুলিশের হাত হইতে বন্দুক ছিনাইয়া লইতে পারিত না। রাজাবাজারের গুণ্ডারা যখন উপদ্রব করিয়াও উপযুক্ত দণ্ড পায় নাই, তখন ঢাকার গুণ্ডারাই বা ডরাইবে কেন? সুতরাং বাঙলার মন্ত্রীদের আইন ও শান্তিরক্ষার যত কেরামতি শুধু বাঙলার যাহারা প্রকৃত কর্মী তাঁহাদিগকেই দলন করিবার বেলায়।

রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা—

রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদে দেশবাসী সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন; কিছুদিন হইতেই তাঁহার শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না, অপরাহ্নকালে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইত, চিকিৎসকদের অনেক চেষ্টার ফলেও তাহা বন্ধ হয় নাই। ইহার উপর কিছুদিন হইল অগ্নিমান্দ্য দেখা দিয়াছে এবং আহারে তাঁহার রুচি নাই। রোগশয্যায় থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথ দেশের কথা ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এখন তাঁহার অধিকতর অসুস্থতার সংবাদে সর্বত্র যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে ইহা স্বাভাবিক। কিছুদিন পূর্বে অসুস্থ অবস্থাতেও দেশবাসীকে তিনি যে অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনাইয়াছেন, সকলের অন্তরের তারে তাহা এখনও সমানতানে বাজিতেছে। জগতের লোকও বুঝিয়াছে যে, বিদেশীর দীর্ঘ পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতের অন্তরের মহামনীষার আগুন আজও নিভিয়া যায় নাই, বিশ্বের পশুবলস্পর্ধীদের বিরুদ্ধে আজও তাহা জ্বলিয়া উঠে। পরাধীন ভারত, পতিত ভারত আরও দীর্ঘ দিনের জন্য চায় এমন সাগ্নিক সাধককে। প্রয়োজন রহিয়াছে ভারতের, শুধু ভারতের নহে, পশুবলে উপদ্রুত সমস্ত জগতের মানবসমাজে রবীন্দ্রনাথের তপঃপরামর্শ-প্রবুদ্ধ অগ্নিশিখা স্পর্শের। ভগবান কবিকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পুলিশ ও গুণ্ডা—

শ্রীযুত মহাদেব দেশাই কিছুদিন আগে আমেদাবাদে শান্তি সেবক সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে এক বক্তৃতায় দাঙ্গাহাঙ্গামায় অহিংস স্বেচ্ছাসেবকদের কর্তব্যের নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৯৩০ সালে ধারসানায় লবণের গোলায় সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া শত শত সত্যাগ্রহী যদি নির্বিবাদে পুলিশের লাঠির সম্মুখীন হইতে পারে, তবে সাম্প্রদায়িক শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্যই বা কেন তাহা সম্ভব হইবে না। আমরা শ্রীযুত দেশাইয়ের যুক্তি সমর্থন করিতে পারি না। পুলিশের লাঠি এবং গুণ্ডার ছোরা এক জিনিস নয়। পুলিশের পিছনে সমাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোক রহিয়াছে। অহিংসার সাফল্য অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রবজনিত একটা নীতিবোধের উপর নির্ভর করে, মানবের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার বিকাশের বড় বড় কথা অনেক উপরে। যাহারা গুণ্ডা, সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দায়িত্ববোধ তাহাদের নাই, তাহাদের নাম গোত্র থাকে অজানা। এমন ক্ষেত্রে সমষ্টির সংশ্লিষ্ট নৈতিক দায়িত্ববোধের কোন প্রশ্ন তাহাদের সম্পর্কে উঠিতেই পারে না। তাহারা চোরাগোপ্তা ছোরা চালায়। তাহারা কে, যখন তাহাই জানিবার উপায় নাই, তখন তাহাদের সামনে ধর্ণা দিয়া তাহাদের অন্তরের সুপ্ত স্বভাবগত শুভবুদ্ধিকে জাগাইবার মত চেষ্টা করাও সত্যাগ্রহীদের পক্ষে সম্ভব নহে। কোন ভদ্রসমাজই গুণ্ডাকে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে প্রশ্রয় দিতে পারে না, গুণ্ডাও চোরা চাল চালিয়া সমাজকে অস্বীকারই করে; কিন্তু পুলিশ অপ্রিয় যতই হউক, ভদ্র-সমাজের সঙ্গে সংস্রব রাখিয়া তাহাদিগকে চলিবার চেষ্টা করিতেই হয়, লাঠি চালাইলেও সে প্রকাশ্যভাবেই চালায় এবং সমাজের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করিয়াই তাহাকে কাজ করিতে হয়। লৌকিক নীতি-বুদ্ধির ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজ; অবশ্য এই লৌকিক নীতি-বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যিনি গুণাতীত স্তরে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, গুণ্ডারা অবশ্যই সে স্তরের জীব নয়।

রুশিয়ার যুদ্ধ ও ভারত—

রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানি যুদ্ধে নামাতে, আদর্শের দিক হইতে যুদ্ধের মধ্যে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিল। ভারতের রাজনীতির উপর ইহার প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। সংবাদপত্রে দেখিতেছি, রুশিয়া যুদ্ধে নামিবার ফলে বাঙলা দেশের পাট রুশিয়ায় রপ্তানি হইবার সুবিধা হইবে এবং তাহার ফলে পাটের দর চড়িবার সম্ভাবনা আছে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষের পরিস্থিতির গুরুত্ব এই যুদ্ধে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া অনেকেই বলিতেছেন। বিলাতের 'ডেলি স্কেচ' পত্র লিখিয়াছেন, "জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধে নামাতে ভারতের জনমত আমাদের স্বপক্ষে জোর বাঁধিবে। কংগ্রেসের বামপন্থীরা কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তন করিয়া যুদ্ধে যোগদানের পক্ষ লইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা পারস্যের ভিতর দিয়া নাৎসীরা ভারত আক্রমণ করিতে পারে, এই ভয় করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী সত্বরই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং তাহার পরে তিনি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইহার পর একটি সর্বদল সম্মেলন আহূত হইতে পারে।" এই সংবাদের মূলে কতটা সত্য আছে আমরা জানি না, তবে একথা ঠিক যে, কর্তাদের ভারত সম্পর্কিত মূল নীতির পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর দেখা-সাক্ষাতেও যেমন লাভ নাই, সেইরূপ সর্বদল সম্মেলন আহ্বান করাও নিরর্থক। কর্তারা যদি কংগ্রেসের দাবী প্রতিপালনে রাজী থাকিতেন, তাহা হইলে রুশিয়া যুদ্ধে যোগদান না করিলেও তাঁহারা যুদ্ধে ভারতবাসীদের সহযোগিতা পাইতেন। তার পর বামপন্থীদের কথা। শুনিতেছি, বিলাতের কয়েকজন বামপন্থী নেতা নাকি গান্ধীজীর কাছে নূতন কি প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের মতে গান্ধীজীর নিকট প্রস্তাব না করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে প্রস্তাব করা তাঁহাদের উচিত ছিল, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের নীতির পরিবর্তন সাধন করেন। রুশিয়া যুদ্ধে নামিবার পরে ভারতের বামপন্থীদের সম্বন্ধে নীতির যে পরিবর্তন ঘটিবে, ইহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বরং বামপন্থীদের উপর—স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে সোভিয়েটের আদর্শবাদের উপর যাহাদের একটু টান আছে, ভারতের সেই সব তরুণ কর্মীদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের নীতি দিন দিনই কঠোর হইতেছে; এ বিষয়ে বাঙলা দেশের কর্তারা তো সকলের উপরে। কৃষক এবং শ্রমিক কর্মীদিগকে সাংঘাতিক অপরাধীর দৃষ্টি ছাড়া অন্যভাবে এ দেশের কর্তারা দেখিতে পারেন বলিয়া তো মনে হয় না। ভারতের কমিউনিষ্ট দল বেআইনী প্রতিষ্ঠান, রুশিয়ার আদর্শের প্রতি যাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁহারা কর্তাদের বিষদৃষ্টিতে পতিত। আকোলার সংবাদে দেখা যাইতেছে, ওখানকার কমিউনিষ্টরা রুশিয়ায় গিয়া রুশিয়ার পক্ষে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাহিয়াছেন। রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি আছে এদেশে, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ যদি ভারতবাসীদের সেই সহানুভূতি নিজেদের কাজে সত্যই লাগাইতে চান, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদের সংস্কার হইতে তাঁহাদের নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে; কিন্তু তাহা কি সম্ভব?

অহিংসা ও আত্মরক্ষা—

"যদি মানুষের জীবন, ধর্মস্থান, গৃহ ও নারীর মর্যাদা গুণ্ডাদিগের দ্বারা বিপন্ন হয়, তাহা হইলে আত্মরক্ষার্থ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বা যে কোন প্রকারেই হউক না কেন তাহাতে বাধা দেওয়া আমি সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করি এবং হিংস আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দেওয়ার নীতিকে সাহায্য করা, উহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা বা উহা প্রচার করা অন্যায় এরূপ প্রতিশ্রুতিতে আমি কখনও আবদ্ধ হইতে পারি না"—বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এই কথা বলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী পুরাপুরি শ্রীযুত মুন্সীর এই উক্তির যুক্তিবত্তা যে স্বীকার না করেন তাহা নহে, তিনি একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, যেখানে উপায়ান্তর নাই এবং লোকে অহিংসার প্রয়োগ কৌশলে শিক্ষিত নহে, সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগে প্রতিরোধ নিন্দনীয় নহে বরং তাহাই কর্তব্য; কিন্তু ইহা সাধারণের পক্ষে, কংগ্রেসকর্মীর পক্ষে নহে। যাঁহারা কংগ্রেস-কর্মী, ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে অবস্থায় এবং যাহার বিরুদ্ধেই হউক অহিংসার প্রয়োগকৌশলে তাঁহারা শিক্ষিত। বলা বাহুল্য, মহাত্মা গান্ধীর এই মত রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযুক্ত কতটা তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে; প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ অহিংসা নীতি হিসারে প্রয়োগের একটা বস্তু নয়, অধ্যাত্ম সাধনার সর্বোচ্চ অনুভূতি যে অভেদ দর্শন, তাহারই উহা পরিণতি। এ অবস্থায় উঠিতে পারে খুব কম লোকেই; মহাত্মা গান্ধীর যাঁহারা অন্তরঙ্গ পুরুষ, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয়জন যে উঠিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এই সমস্যার ফলে মহাত্মাজীর নীতি ক্রমে ক্রমে সর্ব-জনীনতা হারাইয়া জনকয়েকের মধ্যে নিবদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং আমাদের মনে হয়, কংগ্রেসকর্মী এবং জন-সাধারণের মধ্যে নীতির এই বিভেদ সৃষ্টি করিয়া মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের মধ্যে যে জনমতের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই শক্তি হইতেই কংগ্রেসকে বঞ্চিত করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার নীতি ক্রমেই আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম স্তরে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। কংগ্রেস আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান নহে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনীতি বাস্তবকে অস্বীকার করিতে পারে না। এই বাস্তব সমস্যার ভিতর পড়িয়া শ্রীযুক্ত মুন্সীকে কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে; দিল্লী-প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ইন্দ্রও পদত্যাগ করিয়াছেন। এমন ক্ষেত্রে কর্তব্য কি? আমাদের মনে হয়, মহাত্মাজীর কতকটা উচ্চ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র হইতে নামিয়া আসা উচিত এবং আত্মরক্ষা, দেশরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ যে নিন্দনীয় নহে, এই মতকে কংগ্রেসের নীতিতে প্রাধান্য দান করা কর্তব্য; প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের মূল অহিংস নীতির উহাতে যে হানি ঘটে, আমরা ইহা মনে করি না। মহাত্মাজী নিজে পূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী হইয়াও সর্বক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ যে নিন্দনীয় এমন মনে করেন না এবং তাহা মনে না করিয়াও অহিংসায় বিশ্বাস যখন তাঁহার দৃঢ় আছে, তখন কংগ্রেসকর্মীদেরই বা কেন থাকিবে না?

সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশের বড়

একটা বাস্তব সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে; এমন অবস্থায় কংগ্রেসের কি কোন কর্তব্য নাই, গান্ধীজীর অনুগামী অন্তরঙ্গের দল কি দূরে দাঁড়াইয়া শুদ্ধ অহিংসার মহিমা আওড়াইবেন কিংবা আচার্য কৃপালনী এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেমন শান্তি প্রচেষ্টা করিতে ঢাকায় গিয়া দাঙ্গা দেখিয়া সরিয়া আসিয়াছেন তেমনই তাঁহারা বেগতিক দেখিলে সরিয়া যাইবেন, আর গুণ্ডার ছোরায় নির্দোষের রক্তপাত চলিবে, বিপন্ন নরনারী ঘরবাড়ি ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাইতে থাকিবে এবং কবে মহাত্মাজীর সমর্থিত শুদ্ধ অহিংসবাহিনী গুণ্ডার বাহাদুরী বাড়াইয়া বুক পাতিয়া মরিতে থাকিবে সেই আশায়?

স্যার আশুতোষের দান—

স্যার আশুতোষের জন্মবার্ষিকী সভার সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সেদিন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন; কথা কয়েকটি বর্তমানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "দেহ যেখানে পিঞ্জরাবদ্ধ, আত্মাও সেখানে কতকটা সুপ্ত থাকিতে পারে, আশুতোষ তাহা তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইয়া দিয়াছেন। ঐ গুপ্ত মন্ত্রের ফলে বাঙলার অসংখ্য যুবক মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হোমানলের ধূমে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে পাইয়াছে। আজ তাহারই প্রতিক্রিয়া জাগার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতনভাবে গড়িয়া আশুতোষ যে স্বাধীনতার দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আজ তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আশুতোষের এই আনন্দমঠকে আর না ভাঙ্গিলে চলিতেছে না।" আমলাতন্ত্র বাঙলার যুবকদিগের অন্তরে বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম যাহাতে গড়িয়া উঠিতে না পারে, সেজন্য চেষ্টা কম করে নাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর দিয়াও সে চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী বাছিয়া বাহির করিয়াছেন, বাঙলার বলিষ্ঠ এই স্বদেশপ্রেমের প্রাণশক্তির মূল কোথায় এবং সেই মূলদেশে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী বুঝিয়াছেন, স্যার আশুতোষ বাঙলার ভাষা, বাঙলার সংস্কৃতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন সেই প্রাণশক্তি, সুতরাং বলিষ্ঠ জাতীয়তার ভাব ধ্বংস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার মারফতে যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে পাকা করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আগে ধ্বংস করিতে হইবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার বিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাণশক্তিশূন্য করিবার সেই প্রচেষ্টা বাঙলার মন্ত্রীদের তাঁবেদার কোয়ালিশনী দলের কল্যাণে সিলেক্ট কমিটির হাতে অধিকতর নির্লজ্জ আকার ধারণ করিয়াছে। এই অনিষ্ট হইতে দেশকে যদি রক্ষা করিতে হয়, বড় ঝুঁকি সেজন্য লইতে হইবে, সেজন্য চাই সুদৃঢ় সঙ্কল্পশীলতা। বাঙালী সেই সঙ্কল্পশীলতা সহকারে অন্যায়ের প্রতিরোধে প্রস্তুত হউক। বাঙালী প্রতিপন্ন করুক যে, পরাধীনতা তাহাদিগকে পশু করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া—

সমগ্র বাঙলার উপর দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। ভোলা মহকুমার স্থানে স্থানে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং অনাহারে মৃত্যুর সংবাদও কয়েকটি স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। যে ভীষণ দুর্বিপাক বরিশালের উপর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতীকারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হইলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। গভর্নমেণ্ট যে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং করিতেছেন ভোলা কি নোয়াখালী, কোন স্থানের জন্যই তাহা কোনদিক হইতে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; তাহা ছাড়া সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা সুপরিচালিত হইতেছে না বলিয়াও খবর পাওয়া যাইতেছে। নোয়াখালী, বরিশাল তো বিশেষভাবে, তাহা ছাড়া ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার বিপুল অঞ্চলে অকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে প্রবল আর্থিক কষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সরকারের দূরদর্শিতা যদি থাকিত, তাহা হইলে এদিকে পূর্ব হইতেই তাঁহারা অবহিত হইতেন এবং এখনও হওয়া উচিত। দেশবাসীদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, বিপন্ন এবং আর্তের রক্ষার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হউন। মানুষ হিসাবে এই দিকে আমাদের যে কর্তব্য রহিয়াছে, আমরা একদিনের জন্য যেন তাহা বিস্মৃত না হই। যিনি যেরূপভাবে পারেন, অন্নহীনের মুখে এক মুষ্টি অন্ন দিন এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করুন, আর্তের সেবা করিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করুন।

পরলোকে স্যার যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি—

গত মঙ্গলবার "লীডার" পত্রের সম্পাদক স্যার যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি পরলোকে গমন করিয়াছেন। ভারতের সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যে স্যার যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণির স্থান অতি উচ্চে ছিল; কিন্তু শুধু সংবাদপত্র সেবার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে চিন্তামণি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনীতিক মতে তিনি মডারেট ছিলেন, ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহার মধ্যে একটা প্রখর আত্মমর্যাদা বুদ্ধি, স্বাধীনচিত্ততার যে পরিচয় পাওয়া যাইত, মডারেট নেতাদের অনেকের মধ্যে তাহা দুর্লভ। কাহারও মন যোগাইয়া নিজের বিবেককে বিসর্জন দেওয়া, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে কি সংবাদ-পত্রসেবার ক্ষেত্রে—কোথায়ও চিন্তামণির ধর্ম ছিল না। তিনি যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে দেখিলেন যে, গভর্নর তাঁহার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অমনই তিনি মন্ত্রীপদে জবাব দিয়া পুনরায় সংবাদপত্রসেবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। অকাট্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া নির্ভীকভাবে কর্তৃপক্ষের কার্যের সমালোচনা করা তাঁহার সংবাদপত্রসেবার বিশিষ্টতা ছিল। তাঁহার পরলোক গমনে দেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

টে এবং ইউরোপে এখন ইংরেজের সমস্যা অনেকটা সুবিধাজনক হবে, এবং ইহার ফলে আমেরিকাকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে বোধ হয় আর যোগ দিতে হইবে না।' রুষিয়া অবশ্য মার্কিনের কাছে এখনও সমরোপকরণের জন্য স্বারস্থ হয় নাই, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জার্মানী কি ছাড়িয়া কথা কহিবে, কিংবা জার্মানী যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জার্মানী কর্তৃক পৃথিবী জয়ের যে আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা কি কিছু কমিবে? মোটেই নয়। প্রকৃতকথা হইতেছে এই যে, জার্মানী কাবু হয়, এ পক্ষের ইহা সকলেই চাহেন: সেই সঙ্গে রুষিয়ার কমিউনিস্টদের প্রতি ঘৃণার ভাবও উঁহাদের অনেকের মনে মনে একান্তভাবেই রহিয়াছে। ব্রিটিশ এবং মার্কিন রাজনীতিকগণ রুষিয়ার সঙ্গে জার্মানীর লড়াই বাধিবার

পুরা ইউনিফর্ম পরিহিত সোভিয়েট সৈন্যদল সুশৃঙ্খলার সহিত সাঁতরাইয়া নদী পার হইতেছে

[illegible] হইতেই সে কথাটার উপর সকলেই, প্রসঙ্গটা অপরের দৃষ্টিতে একটা অবান্তর হইলেও জোর দিতে কসুর করেন নাই। রুষিয়ার সঙ্গে জার্মানির লড়াই বাধিবার পরই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব ভাষায় ছন্দের বহর ছুটাইয়া যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতার কয়েকটা কথার উপর অনেকেরই বিশেষভাবে নজর পড়ে। তিনি বলেন, "আমার মত কমিউনিস্ট-বিরোধী কেহ নাই, গত ২৫ বৎসর হইতে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কমিউনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছি এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমি যে সব কথা বলিয়াছি, এখনও তাহার একটি কথা ঘুরাইয়া লইতে প্রস্তুত নহি।" সেই সঙ্গে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদের উপর তাঁহার ঘৃণার ভাবটা অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া বলেন, নাৎসীদের শাসন অতি ঘৃণার্হ, ঘৃণার্হ তাহার কারণ এই যে, ঐ শাসনপদ্ধতিতে কমিউনিস্টবাদের কতকগুলি অতি নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।' এণ্টনী ইডেন তাঁহার বক্তৃতায় এ বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন, 'রুষিয়ার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রনীতির বিরোধ রহিয়াছে, আমাদের উভয় দেশের জীবনধারা বিভিন্ন, কিন্তু তাহাতে বর্তমান রাজনীতিক উদ্দেশ্যটা ঘুলাইয়া ফেলা যায় না।' ইহার পরের এক বক্তৃতায় ইডেন সাহেব বলেন,—'আমি কমিউনিস্ট মতবাদকে সব সময় ঘৃণা করি, কিন্তু বর্তমানের প্রশ্ন তাহা নয়' ইত্যাদি। সুতরাং আমেরিকা এবং ব্রিটিশ উভয় রাজনীতিকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রুষিয়ার কমিউনিস্ট মতবাদের উপর তাঁহাদের সকলেরই ঘৃণার ভাব সমান। মতবাদের উপর যখন ঘৃণার ভাব রহিয়াছে, তখন সেই মতবাদের যাঁহারা ধারক, বাহক এবং পোষক তাঁহাদের প্রতিও যে তাঁহাদের মনে অকৃত্রিম প্রীতির ভাব নাই, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ, মানুষের জীবনে অনুষ্ঠিত মতবাদ ছাড়া কোন মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা সম্ভব হয় না এবং ইহাও সত্য যে, কার্যের সাফল্য এবং অসাফল্যের ওজন করিতে হয় আন্তরিকতার বিচারে। যুদ্ধ একটা খেলাখেলি ব্যাপার নয়, এ জীবনমরণ লইয়া খেলা এবং সেই খেলায় মনে মুখে এক না হইলে জোর বাঁধে না। যাহার সঙ্গে মনের প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক নাই, বিশেষভাবে, যাহার মতবাদকে ব্রিটিশ ও মার্কিন রাজনীতিকগণ ঘৃণা করেন এবং জগতের পক্ষে না হউক, নিজেদের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন, জার্মানির ন্যায় জগজ্জয়ী শক্তিকে চূর্ণ করিয়া সে আজ বড় হইয়া উঠুক—কাজে তাহাকে সেইভাবে সাহায্য করা—তাঁহাদের আপাতত প্রয়োজনের দিক হইতে প্রীতিকর হইলেও, মনের কোণে রুষিয়ার আদর্শের প্রতি তাঁহাদের অপ্রীতি কর্মোদ্যমকে শিথিল করিবে। বাহিরের আপাত-প্রয়োজন মনের আগুন কর্মোদ্যমের মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে না। যুদ্ধ কতকটা সাময়িক প্রয়োজনানুগ নীতির ব্যাপার হইলেও তাহার মূলে মনস্তত্ত্বের এই গতির রীতিকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

জার্মানি ব্রিটিশ এবং মার্কিন পক্ষের এই মনস্তাত্ত্বিকতার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড দখল করিবার পর সে মিত্রপক্ষের কাছে একটা সন্ধির প্রস্তাব করে, হিটলার রাইখস্টাগের বক্তৃতায় সেকথা প্রকাশও করিয়াছিলেন। রাইখস্ট্যাগের সেই বক্তৃতায় হিটলার ইংরেজকে শাসাইয়া বলেন, "জার্মান-রুষ মৈত্রী কোনদিন শিথিল হইবে এমন আশা ইংরেজ যদি করিয়া থাকে, তবে সে তাহার নেহাৎ ছেলেমানুষী হইবে। জার্মানি এবং রুষিয়ার মধ্যে নূতন কোন সমস্যার সৃষ্টি হইবে ইংরেজ বাঁচিয়া যাইবে, এমন কল্পনাও অলীক।" একথা হিটলারের মুখেরই কথা মাত্র, মনের নয়। ইংরেজ যদি তখন হিটলারের সুবিধাজনক সর্তে হিটলারের ধাপ্পায় পড়িয়া সন্ধিতে রাজী হইত, তবে হিটলার তখনই রুষিয়ার দিকে মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইতেন, ইহা জানা কথা; কিন্তু ইংরেজ তাহাতে রাজী হয় নাই—হইতেও পারে নাই। এদিকে হিটলার যে সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড অধিকার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন, আমেরিকা ইংরেজের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়ানোতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। জার্মানির নিজের মধ্যেও সংকট দেখা দিল, কারণ, সে কতকগুলি দেশ দখল করিল বটে, কিন্তু দখল করিতে হইল সর্বস্বান্ত করিবার পর। ইউরোপের যে সব দেশ জার্মানি দখল করিয়াছে—নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, রুমেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ইহার কোন দেশই আমাদের দেশের

মত দীর্ঘ পরাধীনতায় মেরুমজ্জাহীন জাতির দেশ নয়। ইহাদের কাছে স্বাধীনতা সত্যই মূল্যবান এবং রক্তের বিনিময়ে তাহারা যে কোন সময় স্বধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত। জার্মানির স্বজাত্য-মর্যাদা এবং আভিজাত্যের পীড়নে এই সব দেশের লোকের মনে যে প্রতিকূলতা জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা স্বাভাবিক পথে সোভিয়েট-প্রীতির আকার ধারণ করিতেছে এবং সোভিয়েট বিপ্লবের পথ হইতেছে সর্বত্র পরিষ্কার। যুদ্ধের জন্য চাষবাস বন্ধ হওয়াতে অন্নাভাব দেখা দিয়াছে সর্বত্র, ইহাতেও সৃষ্টি হইতেছে একটা বিপ্লবের আবহাওয়া, এমন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের আপাত সমর-সাফল্যের দিক হইতে যেমন রুষিয়ার খাদ্য ও শস্য জোর করিয়া দখল করা দরকার, তেমনই সোভিয়েট মতবাদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জাগানও জার্মানির কাছে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল, কারণ সে বুঝিল, জার্মান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া অধীন দেশগুলিতে জাগিতেছে, তাহাই অদূর ভবিষ্যতে একদিন নাৎসী-বাদকে ধ্বংস করিবে কমিউনিস্ট বিপ্লবের আকারে; সুতরাং নাৎসীবাদকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন সোভিয়েট-বিদ্বেষ জাগান: সুতরাং হিটলার দেখিলেন, তাহার পক্ষে ইংরেজ এবং আমেরিকা হইতে বড় শত্রু হইয়া পড়িয়াছে সোভিয়েট। তাঁহাকে এখন ভিন্ন পথ বাছিয়া লইতেই হইবে; নহিলে স্বখাত সলিলেই তাঁহাকে ডুবিয়া মরিতে হইবে। সুতরাং রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল এবং জিগীর তুলিতে হইল কমিউনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে দন্তকড়মড়ি করিয়া, নতুবা সমূলে সব ধ্বংস হয়, শুধু গায়ের জোরে বাস্তব পরিস্থিতিকে কয়দিন এড়ান যাইবে, ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। লাগিল যুদ্ধ রুষিয়ার সঙ্গে।

কমিউনিস্ট দলনে জগৎকে জাগাইবার জন্য হিটলারের চেষ্টা সফল হয় নাই। এখনও হিটলার সেই চেষ্টাই করিতেছেন, কমিউনিস্ট শত্রুদলনে তিনি জগৎকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার সে ডাকে মহাযুদ্ধের পর আধমরা স্পেন পর্যন্ত লাফাইয়া উঠিয়াছে। আবিসিনিয়ায় আক্কেলসেলামী পাইবার পর যে মুসোলিনী একটু মাজমরা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন সেই মুসোলিনীর মনেও নাকি রণরঙ্গ রস উথলিয়া উঠিয়াছে। রুষিয়া অবশ্য বলিতেছে যে, সে একাই লড়াই চালাইবে; কিন্তু যাঁহারা রুষিয়াকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার জন্য আজ জার্মান বধের খাতিরে উৎসাহ বোধ করিতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহ বাস্তব রণনীতিতে কতটা ফলোপাধারক হইবে, সেই কথাই আমরা মনে করিতেছি।

সোভিয়েট জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধে নামাতে ইংরেজের সঙ্কট অনেকটা হাল্কা হইয়াছে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, কিন্তু সোভিয়েটকে যদি জার্মানি সত্যই পরাজিত করিতে পারে, তবে জার্মানির প্রতাপ অপরিসীম হইয়া উঠিবে এবং নাৎসীরা পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে, ইহা সুনিশ্চিতভাবেই বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং জার্মানির নাৎসীবাদকে সত্যই ধ্বংস করিতে হইলে আজ রুষিয়াকে সমগ্রভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন। জার্মানিও শত্রু এবং সোভিয়েটও আমাদের মনের মানুষ নয়, এই কথার উপরও যাঁহারা জোর না দিয়া এখনও পারিতেছেন না, সোভিয়েট নীতির উপর মনের বিদ্বেষ যাঁহাদের রহিয়াছে এতখানি, তাঁহাদের দুর্বলতা কোথায় জার্মানি তাহা বুঝিতে পারিয়াছে এবং তাহা বুঝিয়াই আজ হয়ত সে সোভিয়েটকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সে সেই দুর্বলতার সুযোগ লইতে চেষ্টা করিবে। এই পরস্পর-বিরোধী দুই মতবাদের সংঘর্ষ পাকেচক্রে জগৎকে কোথায় লইয়া যাইতেছে কে বলিবে?

রিক্ত ও অতিরিক্ত

অশোকা দেবী

সবশুদ্ধ দশটি ছেলে মেয়ে লইয়া অতীশের সংসার। মিনি বলে,—"আর পারি না বাপু এদের নিয়ে, হাড় জ্বলে পুড়ে গেল!

অতীশ বলে,—'কেন, ওরা কি দোষ করল?

মিনি ঝাঁঝালো স্বরে উত্তর দেয়, "তুমি কি করে বুঝবে বল? সেই দশটায় বেরিয়ে যাও, ফের সন্ধ্যে সাতটায়। আমি সারাদিনটা এদের নিয়ে মরি। একে আটকাই ত' ও চলে যায়, ওকে ভুলোই তো এ কাঁদে।"

অতীশ চুপ ক'রে থাকে। জানে, মিনির কোন কথাটাই মিথ্যে নয়। আজ এত বছর বিবাহ হয়েছে, এ পর্যন্ত মিনিকে সে কোনদিন আনন্দ দিতে পারে নি। সেই বা কি করবে; মাত্র তো ৩৫ টাকা মাইনের কেরাণী সে!

ই আই আরের ছোট লাল ঘর। একটি ভাঁড়ার, একটি শোবার আর একটি অতীশ নিজে প্রস্তুত করে নিয়েছে। ন'মেয়েটা তার ছোট ভাইকে নিয়ে টিনের ঘরটায় শোয়। অতীশ তার বোবা ছেলেটাকে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরটায় শোয়, আর মিনি তার ফুল মেয়েটা আর কোলের ছেলেটাকে নিয়ে শোবার ঘরটাতে শোয়।

মিনি বেচারীর ভাগ্য বড়ই খারাপ। সকালবেলায় সেই যে ঘানিতে জোড়ে, রাত্রি দশটা এগারোটার কম ছাড়া পায় না। ন'মেয়েটা মায়ের দুঃখ বোঝে ব'লে তাই রক্ষে। কুটনো কোটা, মাছ বেছে দেওয়া, এটা ওটা হাতের কাছে এনে দেওয়া এ সবে সে ভারী চটপটে। তাছাড়া ছোট ভাইকে তেলমাখানো, স্নান করিয়ে দেওয়া, দুধ খাওয়ানো এগুলো তো আছেই। মিনি বলে, মা যেন আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। মুখে কেউ হাসি ছাড়া কান্না দেখতে পাবে না। এ জন্মে যা হোল তা হোল, আর জন্মে যেন রাজার ঘরে জন্ম নিস্; এ কষ্ট আর পেতে হবে না।

মেজছেলেটা বোবা। তার জন্যে মিনির বড় দুঃখ। সে না পারে চেয়ে খেতে, না পারে কানে শুনতে। দশ বছর তার বয়েস, লোকে বল্‌ল, চিকিৎসা করাও সেরে যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা তো হোল; সারল কই? মিনিকে হরদম্ ওকে চোখে চোখে রাখতে হয়। বড়দাদারা তাকে গাঁট্টা মারে, সে বেচারী না পারে ভাল ক'রে কাঁদতে। শুধু দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে। মিনি ভগবানকে কত ডেকেছে, বলেছে,—ওকে কথা বলতে দাও ভগবান। কিন্তু ভগবান শুনেন নি, মিনি/কিন্তু কিছু করতে বাকী রাখে নি।

বড়, মেজো, সেজোর বিয়ে হ'য়ে গেছে। বেঁচেছে তারা। মাঝে মাঝে তারা আসে, কিন্তু কি করবে তারা! মায়ের মতই ওদের অবস্থা, এর মধ্যেই দুটো তিনটে করে ছেলে তাদের হয়ে গেছে। তবু মেয়ে ত, যতটা সাধ্যি ততটা করে। মাঝে মাঝে ভাইদের নিয়ে গিয়ে নিজেদের কাছে রাখে।

ন'মেয়েটার বিয়ের বয়েস না হ'লেও বড্ড বেড়ে চলেছে। মিনি ভাবে, গরীবের কি সবই বিশ্রী! তাকে সর্বদা কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে হয়। কেননা, দিনকতক আগে কে একটা ছোঁড়া তাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। তার মেয়ের কিছু দোষ নেই, মিনি একথা বেশ ভাল করেই জানে। সেই ছোঁড়াটাই যত নষ্টের গোড়া, ভদ্রলোকের মেয়েকে লুকিয়ে চিঠি দিতে লজ্জা লাগে না তার!

বড়ছেলে তিনবার ফার্স্ট ক্লাসে ফেল ক'রে সখের থিয়েটার ক'রে দিন কাটাচ্ছে। সেই সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে দুপুরে। আবার খেয়েদেয়েই ছুট দেয়, অর্থাৎ খাবার জন্যেই সে ঘরে আসে। অতীশ কিছুই বলে না, কারণ বললেই ছেলে বলে আত্মহত্যা করব, পালিয়ে যাব। মেজোটা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। তার আবার মেজাজ কি! একটু ভাল খেলতে পারে, তাই সব সময়েই খেলা নিয়ে ব্যস্ত। মা বলে,—'হ্যাঁরে, দোকানটা ক'রে নিয়ে আয় ত।' মেজো উত্তর দেয়,—'কেন, থিয়েটার বাবুকে বল না!' কাজেকাজেই মাকে অন্যত্র যেতে হয়। কিন্তু দোকানে যাবে কে? ছোট মেয়ে নিনাকেই পাঠাতে হয়।

অতীশ সন্ধ্যায় ফেরে। সবকটা ছেলে কোথা থেকে ছুটে আসে। কেউ গলা জড়িয়ে ধরে, কেউ কাঁধে চাপে, কেউ বা বলে কই পয়সা দাও বাবা। বোবা ছেলেটা হাসতে হাসতে কাপড়ের খুঁটটা টানতে থাকে। অতীশ তাকে কোলের কাছে জোর ক'রে টেনে নেয়।

মিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে মিছরির সরবৎ আর পাখাটা নিয়ে। ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখে বলে,—'এখন যা, বাবু তেতেপুড়ে এলেন।'

অতীশ খাওয়া দাওয়া সেরে ছেলেগুলোকে নিয়ে পড়াতে বসে। বড়ছেলের বাসন্তী পুজোয় থিয়েটারের নেমন্তন্ন আছে, তাই রিহার্সাল দিতে গেছে। মেঝ বিকেলেই বাড়ি ফিরছে—খেলতে খেলতে হকি স্টিকে মাথায় লেগেছে, তাই। তার মাথা আর ডান চোখটা ফুলে উঠেছে। অতীশ দেখে বলে,—'কই ওষুধের বাক্সটা দেত'। এক ডোজ ওষুধ দিয়ে আবার পড়াতে বসে। পড়ল ত' পাঁচ মিনিট, অতীশও জোর করল না। তার শরীরও আর খাটতে চায় না।

একটু লঙ্কাবাটা দরকার পড়েছে ন মেয়ে তাই বাটতে বসেছে। মিনি রাঁধছে। এমন সময় কোলের ছেলেটা উঠে পড়ল। মিনি রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল,—ওরে তোরা কেউ ধর, আমি তরকারীটা নামিয়ে মাছটা চাপিয়ে যাচ্ছি। কেউ ধরতে উঠল না। অবশেষে অতীশ উঠল।

কোলের ছেলে কাঁদেত থামে না। কোলে ক'রে নিয়ে অতীশ তাকে দোলাতে দোলাতে বাইরে মাঠে এসে বসল।

চাঁদিনি রাত, ফুরফুরে বাতাস এসে মাতিয়ে দিচ্ছে। পাশের বাড়িতে নবজীবনের স্ত্রী কার সংগে গল্প করছে। অতীশ নবজীবনের কথা মনে মনে ভাবতে থাকে।

নবজীবন তরুণ। স্ত্রীকে নিয়ে অতীশের পাশেই থাকে। বছর পাঁচেক বিয়ে হয়েছে, এখনও পর্যন্ত

নেই। বউটি বেশ, নাম রমা। অতীশের ছেলেপিলেদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, মাঝে মাঝে মিষ্টি খাবার তৈরী ক'রে খাওয়ায়। শুধু তাই নয়, রাত্তিরে কেষ্টটাকে নিয়েও শোয়। কেষ্ট মিনির ন' ছেলে, বছর তিন তার বয়স। রমার সঙ্গে তারই ভাবটা একটু বেশী।

নবজীবন বিকেলে কাজে যায়। রাত্রিতেই তার কাজ। সারাদিনটা তাস পিটিয়ে, গল্পগুজব ক'রে কাটায়। বেশ আছে সে, বাপের পয়সাও কিছু আছে। তা নইলে কি বত্রিশ টাকা মাইনেয় চলে!

অতীশ হাসতে হাসতে বলে,—যত কি আমার ঘরে আসবে!

মিনি বলে ষাট ষাট, কি যে বল তুমি!

ছোট মেয়েটা একটু পাকাটে ধরণের। বলে,—আর ছেলে হয়োনা ভগবান। অতীশ তার বলার ভঙ্গীমা দেখে হেসে ওঠে। মিনি বলে,—ফের জেঠামী!

২

রাত্রি বেলা অতীশ বিছানায় শোয়, মাথায় থাকে যত রাজ্যের চিন্তা। নবজীবনের কথা ভাবে। কেন ওর ছেলে পিলে হয় না, কেন তার ঘরেই যত ছেলের ভিড়। এইরকম কত আজে বাজে কথা ভাবে। মাঝে মাঝে নিজের মনেই ব্যর্থতার হাসি হেসে ওঠে।

মিনি কোলের ছেলেটাকে নিয়ে শুয়ে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ভাবে সেই প্রথম ছেলে হওয়ার কথা। কি নাম রাখা হবে এই নিয়ে বই ঘাঁটাঘাঁটি, একে ওকে শুধানো, আর আজ? একবার এধার ওধার আলো নিয়ে দেখে নেয়। যা ছারপোকা হয়েছে, ছেলেগুলোর রক্ত আর রাখবে না।

ডাক্তারের কথা ভাবে। বলে কিনা দুধ খাও বুকে দুধ হবে! মিনি হেসে ওঠে। মনে তার চিন্তার জোয়ার। ন মেয়েটার বয়স হয়েছে, আর ঘরে রাখা যায় না।

ন' মেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবে—। অশান্ত যৌবনে তার বান এসেছে। কত মধুর স্বপ্ন সে দেখে, আবার সেগুলো তখুনি মিলিয়ে যায়। ছোট ভাইটা ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে ওঠে,—'মা, দাদা মারলে'। ন মেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসে,—শুধোয়, কি হোলোরে? ঘুমো, ঘুমো আমি আছি।

মেঝ, সেজ এবং অতীশ তিনজনে মিলে ভাঁড়ারটাতে শোয়। মাঝে মাঝে মেজটা চীৎকার ক'রে ওঠে,—'ঠেলে দাও না হে'! মানে, ঘুমুতে ঘুমুতে সে বলখেলার স্বপ্নে মস্গুল। অতীশ আলোটা নিয়ে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে দেখে ব্যাপার কি। মিনিরও সজাগ ঘুম, সেও আসে। মেঝোর ঘুম ভেঙ্গে যায়, লজ্জায় সে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলে।

মিনি বলে,—কি হয়েছিল রে?

ন মেয়েটা বলে,—দাদার আবার যত সব—

বোবা ছেলেটা জেগে ওঠে। যা ঠেলাঠেলি! গভীর বিস্ময়ে সে এদের কাণ্ডকারখানা দেখে, হঠাৎ কি ভেবে হেসে হাততালি দিয়ে ওঠে। মিনি তার দিকে সজল চোখে তাকিয়ে, অতীশকে বলে,—নাও শোও এখন।

ভোর হ'য়ে আসে।

আবার তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। মিনি ভাবে,—কেন দিন হয়, দিন মানেই ত কাজ। উনুনে আঁচ দিয়ে কাপড় কেচে মিনি প্রস্তুত হ'য়ে নেয়। তা করতে করতে সব উঠে পড়ে। এ বলে, চা দাও—ও বলে, মা ক্ষিদে। মিনি চুপ করতে ব'লে ঠাকুর প্রণাম সেরে নেয়।

মেঝ ছেলেটা ইতিমধ্যে পড়তে বসেছে। চীৎকার ক'রে বলে,—'বলি এটা কি ভেড়ার গোয়াল পেয়েছ'?

অতীশ বলে,—এই চুপ কর, তোর দাদা পড়ছে। এর বেশী সে কি করতে পারে?

পাশের বাড়ির নবজীবনও চা খেতে বসে রমাকে নিয়ে। রাঁধতে বাড়তে হয় না, সবই ঠাকুরে করে। চা খেয়ে নবজীবন বেরিয়ে যায় একটু খেলতে। আবার সেই বিকেলে ছুটতে হবে ত।

রমা কলতলায় গিয়ে এ'টো হাত ধুয়ে নেয়। কলতলা থেকে তার আসতে ইচ্ছে হয় না। অতীশের ছেলেপিলের কান্নাহাসি শুনতে নাকি ওর ভাল লাগে। অতীশের পাঁচিলের কাছে সে আরও সরে যায়। শোনে,—আমায় আর একটু দাও না মা, আবার কেউ বলে,—ওকে অতটা দিলে! রমা গভীর তৃপ্তির হাসি হাসে। মিনি ওদের ব্যাপার দেখে রেগে উঠে বলে,—এই নে, যা আছে সব নে তোরা!

অতীশ বলে,—দাও, দাও বিশুকে আর একটু দাও।

ঠাকুর ডাকে, মা কি রাঁধব বলে যান। রমা শুনতেই পায় না। আত্মতৃপ্তির হাসিতে মুখ তার উজ্জ্বল।

তার নাকি ছেলেপিলের গোলমাল ও ঝগড়া শুনতে বড় ভাল লাগে!

বেলজিয়াম রাজপরিবারের কাহিনী

রেজাউল করীম এম এ, বি এল

বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই বেলজিয়াম প্রবল নাৎসীবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। আজ বেলজিয়ামের হতভাগ্য রাজা নাৎসীদের হস্তে বন্দী। তিনি কিভাবে বন্দী জীবন যাপন করিতেছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। হয়ত অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার প্রিয় দেশ শত্রু কর্তৃক দলিত, পিষ্ট ও শোষিত হইতেছে। তিনি অসহায়, তাঁহার কোন উপায় নাই যে ইহার প্রতিকার করেন। হয়ত সুদিনের আশায় ভগবানকে আশ্রয় করিয়া সব সহিয়া যাইতেছেন। বেলজিয়ামের উপর এই প্রথম বিপদ নহে। ইহার পূর্বে বহুবার বেলজিয়ামের ভাগ্য পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার রাজ পরিবারকে বহু বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আজ এই প্রবন্ধে বেলজিয়ামের রাজ পরিবারের দুঃখময় কাহিনীর দু-একটা অধ্যায় আলোচনা করিব।

শত বৎসর পূর্বে বেলজিয়ামের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতি হিসাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রে বেলজিয়ামের কোন স্থান ছিল না। আরও আগেকার কথা,—যখন জুলিয়াস সিজার খৃঃ অব্দ ৫১ সালে বেলজিয়াম জয় করেন, তখন তিনি উহাকে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু তিনি সহজে বেলজিয়াম জয় করিতে পারেন নাই। বেলজিয়ামের অধিবাসীরা তাঁহাকে প্রচন্ড বাধা দিয়াছিল। তাঁহাদের বীরত্ব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেনঃ "of all the Gauls the Belgians are the bravest" অর্থাৎ গলজাতিদের মধ্যে বেলজিয়ামগণ সবচেয়ে সাহসী। ইহার পর এক জাতির পর অন্য জাতি এই ভাবে বিভিন্ন জাতি বেলজিয়ামকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার স্বাধীনতা অপহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বেলজিয়াম শত্রুকে বাধা দিতে ত্রুটি করে নাই। কখন শত্রুকে পরাজিত করিয়াছে, আবার কখনও পরাজিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন স্পেনের বাহুবল হইতে হল্যান্ড মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন বেলজিয়ামেরও সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু একতার অভাবে বেলজিয়াম সে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অবশেষে ১৮৩০ সালে বেলজিয়াম জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং অসাধ্য সাধনার পর নেদারল্যান্ডের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। পর বৎসর লন্ডন সম্মিলনীতে বেলজিয়াম স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজার অধীনে বেলজিয়াম স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামীর একজন নিকটতম আত্মীয়—লুপোল্ড, বেলজিয়ামের প্রথম রাজা নির্বাচিত হন। ইংলন্ডের ভূতপূর্ব রাজা ৪র্থ জর্জের একমাত্র কন্যার সহিত লুপোল্ডের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরে রাণী একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বিবাহ হইয়াছিল লুপোল্ডের রাজ্য প্রাপ্তির পূর্বে। পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের কন্যা মেরি লুইকে বিবাহ করেন। মেরি লুই সহৃদয়া ও দয়াবতী রাণী ছিলেন। তাঁহার প্রথম সন্তান মাত্র এক বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তাহার পর যুবরাজ লুপোল্ড ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন। প্রথম লুপোল্ডের মৃত্যুর পর এই যুবরাজ দ্বিতীয় লুপোল্ড নাম লইয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার রাজ পরিবারের আর্ক ডাচেস মেরী হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। দ্বিতীয় লুপোল্ড

বেলজিয়মের রাজা তৃতীয় লিউপোল্ড

খুব হিসাবী ও দূরদর্শী রাজা ছিলেন। তিনি বেলজিয়ামের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রজাদের গণতান্ত্রিক আদর্শকে সমর্থন করিতেন এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীকেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সামরিক বিভাগে নানা পরিবর্তন আনয়ন করেন। এবং বাধ্যতামূলকভাবে সর্ব শ্রেণীর লোককে সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার বিধান প্রবর্তন করেন। এই দূরদর্শী রাজা ১৮৭৪ সালে বিখ্যাত পরিব্রাজক স্ট্যানলীকে আফ্রিকার গভীরতম প্রদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। স্ট্যানলী আফ্রিকার বহু অজ্ঞাত অঞ্চল আবিষ্কার করেন। পরে যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিবর্গ ১৮৮৫ সালে বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত হন, তখন আফ্রিকার কিয়দংশ তিনি দাবী করিয়া বসিলেন। তদনুসারে তিনি কংগো ফ্রি স্টেটের রাজা মনোনীত হইলেন। এই প্রদেশের পরিধি বেলজিয়াম অপেক্ষা প্রায় আশি গুণ অধিক। ইহার অধিবাসী ছিল দুই কোটির অধিক। রাজা লুপোল্ড এই অঞ্চলের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করেন এবং দাসপ্রথা রহিত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করেন। লুপোল্ডের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় নাই। কারণ তাঁহার চরিত্র নানা কলঙ্ক কালিমায় কলঙ্কিত ছিল। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার গুজব লোকমুখে প্রচারিত হইত। কিন্তু তিনি ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে ১৯০৯ সালে দেহ ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় লুপোল্ডের মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালে প্রথম লুপোল্ডের পৌত্র আলবার্ট রাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি

১৯০০ সালে বাভারিয়ার ডাচেস রাজ কুমারী এলিজাবেথকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের তিনটি সন্তান হয়।—(১) প্রিন্স লুপোল্ড (২) প্রিন্স চার্লস (৩) প্রিন্সেস মেরী জোম্। দ্বিতীয় সন্তান কিছুদিন ইংলন্ডের নৌ বিভাগে কাজ করেন। এবং এখনও অবিবাহিত। রাজ কুমারী জোম ইতালির রাজকুমার আমবারটোকে (Umberto) ১৯৩০ সালে বিবাহ করেন। রাজা আলবার্ট বেলজিয়ামের তৃতীয় রাজা। তিনি খুব শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির রাজা বলিয়া সর্বত্র বিদিত ছিলেন। ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞান, গণিত বিদ্যা এবং সামরিক বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি রাজ্যে বহু সংস্কার আনয়ন করেন। এবং তেজস্বিতার জন্য সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে জার্মানির সম্রাট কাইজার ফ্রান্স আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে বেলজিয়ামের মধ্যদিয়া পথ চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু রাজা আলবার্ট তাঁহার ভ্রূকুটিতে ভীত হইলেন না। তিনি গর্ব-

বেলজিয়মের রাণী আস্ট্রিড

ভরে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার দেহের উপর দিয়া আমি কাহাকেও পথ দিব না। কাইজার যখন বেলজিয়াম আক্রমণ করিলেন, তখন আলবার্ট তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। জার্মানির প্রবল আক্রমণের প্রথম ধাক্কা তিনি নিজের বুক পাতিয়া লইলেন। এই ভাবে সীমান্তে জার্মানি দুই সপ্তাহকাল পর্যন্ত বাধা পাইতে লাগিল। অবসর পাইয়া ফরাসীগণ সৈন্য সমাবেশ করিবার যথেষ্ট সময় পাইল। এই বিলম্ব বৃটেনের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল, কারণ ইহার পর জার্মানির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অতীতকালে ১৮৭১ সালে জার্মান আক্রমণের ফলে ফরাসীগণ যেমন সহজে পরাভূত হইয়া পড়ে এবার সেরূপ হইল না। ১৯১৮ সালে জার্মানির পরাজয়ে বেলজিয়মের অনেকটা হাত ছিল।

রাজা আলবার্ট খুব ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। মহাসমরের পরিসমাপ্তির পর তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন। এমন কি ভারতবর্ষও পরিদর্শন করেন। শীতকালে তিনি সুইজারল্যান্ডের পর্বত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পাহাড়ে পর্বতে বেপরওয়াভাবে ভ্রমণ করিতে কাতর হইতেন না। কখন নির্জন জনপদহীন অঞ্চল ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেন। এই-সব বিপদপূর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সময় দুইবার দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। একদিন একটি সংকীর্ণ পাহাড়ে পা পিছলিয়া যায়। তিনি কোনক্রমে অন্য একটা স্থান হাত দিয়া ধরিয়া রাখিয়া শূন্যে ঝুলিতে লাগিলেন। তাঁহার চালক আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে। আর একবারের ঘটনা তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়। ১৯৩৪ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাজা আলবার্ট বেলজিয়ামের একটি পর্বত ভ্রমণে বহির্গত হন। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় উঠিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার পায়ের নীচের প্রস্তরগুলি সরিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি গহ্বরে পতিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে দেশব্যাপী বিষাদের করাল ছায়া পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার প্রথম পুত্র প্রিন্স লুপোল্ডের বয়স তেত্রিশ বৎসর। শৈশবকালে তিনি ইংলন্ডের ইটন কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এবং গত মহাযুদ্ধে পদাতিক বেশে পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাইতেন। মহাসমরের পর ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করেন। এবং বেলজিয়ামের সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করেন। সৈন্য বিভাগে কাজ করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৯২৬ সালে সুইডেনের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রী অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারী এসট্রিডকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে রাজ্যের সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পিতার মত ইনিও খুব ভ্রমণপ্রিয়, নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। এমন দম্পতি খুব কম দেখা যায়। তাঁহার ক্রীড়ামোদিতা, রসালাপ, বিনয় ও পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করিত। স্বামী স্ত্রী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, স্বামী কখন অশ্বপৃষ্ঠে, আর স্ত্রী সাইকেলে, কখন উভয়েই অশ্বপৃষ্ঠে, আবার কখন পদব্রজে—এইভাবে যখন তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। ১৯৩৩ সালের রাজকুমার লুপোল্ড রাজপাটে উপবিষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রজারঞ্জক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজা। স্বেচ্ছাচারিতা ভালবাসেন না। আইনসভার একপার্শ্বে বসিয়া সদস্যদের বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক শ্রবণ করিতে ভালবাসিতেন। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানা পরিকল্পনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোঁড়া ক্যাথলিক হইলেও ধর্মবিষয়ে উদার মত পোষণ করেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজ ন্যায়, নিষ্ঠা ও সমতার দ্বারা পরিচালিত হইত। বেলজিয়ামের সংহতি ও স্বার্থরক্ষা—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। নানা জাতির বাসস্থান বলিয়া বেলজিয়ামের ভাষা সমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি কৌশলের সহিত এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহার মন্ত্রী ও

রামর্শদাতাগণ তাঁহার উদার আদর্শ পালন করিয়া দেশে ান্তি সুখ আনয়নের সতত চেষ্টা করিতেন। ১৯২৭ সালে াঁহার প্রথম সন্তান রাজকুমারী জোসেফাইনশারলটি জন্মহণ করেন এবং তিন বৎসর পরে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী াজকুমার বাডোইন জন্মগ্রহণ করেন। চারি বৎসর পরে দ্বিতীয় ুত্র আলবার্টের জন্ম হয়। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন ক বৎসর, তখন রাজপরিবারের উপর একটা ভীষণ দুর্ঘটনা টিয়া গিয়াছে। কারণ এই সময় একটা দুর্ঘটনায় রাণীর ৃত্যু হয়।

১৯৩৫ সালে ২৯শে আগস্ট রাজা ও রাণী মোটর াড়িতে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহারা খন কুইসনট নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, সেই সময় একটি র্মবিদারক ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাজা একটি উন্মুক্ত াড়িতে স্ত্রীকে পার্শ্বে রাখিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া িয়াছেন, তাঁহারা এইভাবে কোন সঙ্গী বা চালক না লইয়া ইতেছিলেন। পথে একটা বাঁকের নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্তু রাজার দৃষ্টি তখন মানচিত্রের দিকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। কিন্তু ইহাই চরম দুর্দশার বিষয় হইয়া গেল। বাঁকের পার্শ্বে গাড়িতে ধাক্কা লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেই গাড়ি হইতে পড়িয়া গেলেন এবং পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া গেলেন। রাজার পাঁজরের দুইটি হাড় ভাঙিগয়া গেল, আর রাণী এসট্রিডের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এই আঘাতেই রাণীর প্রাণবিয়োগ হইল। এই নিদারুণ দুর্ঘটনা দেশে বিষাদের করালছায়া বিস্তার করিল। রাজার মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্জনে বাস করিতেছিলেন। পুত্রের এই বিপদে সান্ত্বনা দিবার জন্য নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া পুত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাতৃহীন শিশুদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রাজার শোক অবর্ণনীয়, রাণীর সৎকার না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তিনি নীরবে রোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু অহর্নিশ শোক করিলে রাজকার্য পরিচালন করা যায় না; সুতরাং তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। এই সময় ইউরোপীয় রাজনীতি একটা ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল, আর ভীষণ যুদ্ধের মহড়া হইতেছিল। এই ভীষণতা হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্সের সহিত সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে, যদি আবার বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে বেলজিয়াম সকল অবস্থাতেই নিরপেক্ষ থাকিবে। এই সিদ্ধান্ত ইংলণ্ড মানিয়া লইল এবং তাঁহাকে নিশ্চয়তা দিল যে, যদি কোন শক্তি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হয়, তবে ইংলণ্ড তাহাকে সাহায্য করিবে। রাজা নিষ্ঠার সহিত এই নিরপেক্ষতার নীতি পালন করিয়া চলিতে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিনা কারণে জার্মানী বেলজিয়াম আক্রমণ করিয়া বসিল। হিটলার বেলজিয়াম আক্রমণ করিবার সময় রাজাকে একটি চরম পত্র দিয়াছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে জার্মান সম্রাট কাইজারের এই প্রকার চরম পত্রের উত্তরে বর্তমান রাজার পিতা যে দৃঢ়তার ভাব দেখাইয়াছিলেন, আজ তাঁহারই পুত্র রাজা লুপোল্ড সেইরূপে দৃঢ়তা দেখাইলেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য রাজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বদেশ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু স্বদেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কয়েকদিন যুদ্ধ করার পর রাজা জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়াও তিনি তাঁহার বংশমর্যাদার অবমাননা করেন নাই। হিটলার কতকগুলি সর্তে তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হিটলারের সে দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ যেন বেলজিয়ামের রাজাদের ভাগ্যে নাই। নানা দুর্ঘটনায় বেলজিয়ামের রাজপরিবার বহুবার প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। এই রাজবংশের ভাগ্যে আরও কোন বিপদ সঞ্চিত আছে কি না, তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারে।
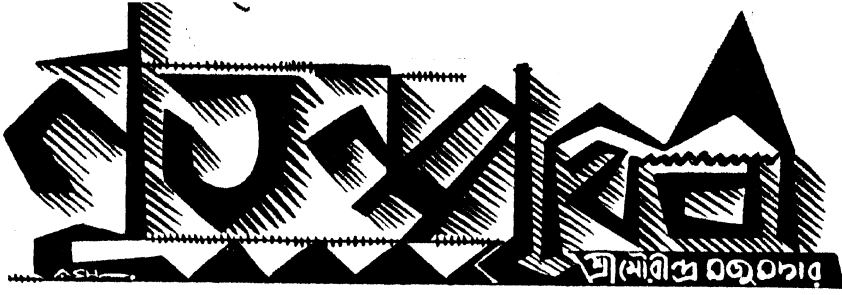
[৩]

লোকনাথবাবু একটু স্বতন্ত্র ধরণের লোক। সচরাচর এমন লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্বদা গবেষণাগারে কিংবা গ্রন্থাগারে সময় কাটানটা তাহার স্বাতন্ত্র্য নয়, স্বাতন্ত্র্য তাহার অদ্ভুত খেয়ালে, সরলতায়, চিন্তাধারায় ও কথাবার্তায়। তাহার কোন ব্যক্তিত্ব নাই, অথচ তাহার দৃঢ় ব্যক্তিত্বটাই মস্ত বড় সম্পদ বলিয়া তাহার ধারণা। কেহ আসিয়া অর্থ সাহায্য চাহিলে তিনি চটিয়া যান এবং অর্থ রোজগারের অদ্ভুত অদ্ভুত পন্থা বাৎলাইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অনুগ্রহপ্রার্থী ভয়ে সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হয় কিন্তু লোকনাথবাবু লোকটিকে অবাক করিয়া দিয়া বলেন, 'ভিক্ষা চাওয়া পাপ, অন্তর দেবতাকে জুতো মেরে অপমান করা হয়। ২৫ টাকা চেয়েছিলেন, এই নিন ৫০ টাকা, যেভাবে বলে দিলুম ঠিক সেভাবে ব্যবসায় করবেন, prospective বুঝলে আরও এক শ' টাকা দেব।'

লোকনাথবাবু রসিকও। নীরস য়্যাসিড লইয়া ঘাঁটা-ঘাঁটি করিয়া একেবারে শুষ্ক প্রকৃতির লোক হইয়া যান নাই। রসায়নাগারে কাজ করিতে করিতে সারাক্ষণ বকিয়া থাকেন। লোকে মনে করে মাথার দোষ আছে, গবেষণাটা শুধু ফাঁকি নয়, পাগলামিও। লোকনাথবাবু হয়ত কয়েকটি য়্যাসিড, এলকালি ও পদার্থ একত্র করিয়াছেন, ফল পাইতে কিছুকাল বিলম্ব হইবে। তখন এই অবসরে হাতে অন্য কোন কাজ না থাকিলে লোকনাথবাবু চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না, প্রিয় পুরাতন ভৃত্য শ্রীনিবাস আয়ারের সহিত নানাপ্রকার কথা কহেন। লোকনাথ শ্রীনিবাস আয়ারের সহিত সাধারণত যে ধরণের কথা কহিয়া থাকেন তাহা লোকে তাঁহার সারল্য বলিয়া মনে করে না, মস্তিষ্ক বিকৃতি বলিয়া সন্দেহ করে। লোক-নাথবাবুর সকল সময় পাত্র-অপাত্র জ্ঞান থাকে না। আয়ারের শক্তি পরীক্ষার জন্য কখনও কখনও আয়ারকে ঘুসি মারিয়াও থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সনদ লইয়া লোকনাথবাবু গবেষণা করিতেছেন না, কারণ তিনি বি এস-সিও পাশ করিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁহার কোন মূল্য নাই। এ কথা তিনি জানেন। য়্যাসিড প্রভৃতি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা তাঁহার আন্তরিক প্রেরণা, গবেষণায় তন্ময় হইয়া থাকিতে তিনি আনন্দ পান, সুকুমার ও সংস্কৃতিমূলক রোম্যান্স বলিয়া উপলব্ধি করেন।

রসায়নাগার করার পশ্চাতে একটি ছোট ইতিহাস রহিয়াছে। প্রথম জীবনে তিনি সাহিত্য অধ্যয়নেই সময় কাটাইতেন। ব্যাঙ্কে বহু টাকা গচ্ছিত ছিল, লাভজনক ব্যবসার শেয়ারের আয় এবং জমিদারীর আয় ব্যয়ের চেয়ে বেশী হইত। তাঁহার কোন কালেই কোন খারাপ নেশা ছিল না, বন্ধুরা বরাবর বোকা ও দুর্বল বলিয়াই জানিত। লোকনাথবাবুও কোন দিন কোন মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন নাই। জমিদারী সংক্রান্ত কাজ কর্ম করিয়া লেখা পড়া লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন--নেশা করিবার মত সময় মিলিত না। বই পড়া আর দেশ ভ্রমণ এত মারাত্মক নেশা ছিল যে, অপর কোন নেশা কাছে ঘেঁসিতে সাহস পায় নাই।

লোকনাথবাবুর আধুনিক কাপুরুষতা পরিপূর্ণ আনন্দ-লাভ ও জীবন উপভোগ হইতে তাহাকে কতখানি বঞ্চিত করিয়াছে জানি না, তবে তাঁহার তথাকথিত কাপুরুষতা দেশের বহু কল্যাণ করিয়াছে। উদ্দাম আনন্দস্রোতে কখনও ভাসিয়াছেন কি না জানি না তবে তাঁহাকে কখনও দুঃখ করিতে হয় নাই, অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। দেশ ভ্রমণ, সাহিত্য রস, দাম্পত্য প্রণয় ও দেশের কল্যাণকর কাজ তাহার মনকে সারাক্ষণ এমন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, তিনি কখনও বুভুক্ষার কথা স্মরণ করিতে পারেন নাই।

শিল্পোন্নতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়িয়া তাহার মাথায় মিল স্থাপনের পরিকল্পনা ঢোকে। মিল প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং বহু নোট লিখিয়াছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দেশত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং মিল স্থাপন করেন। পত্নীর নামানুসারেই মিলের নাম হইয়াছে জগৎধাত্রী কটন মিলস লিমিটেড। জগৎধাত্রী মিলই বিরহী প্রেমিকের অব্যক্ত অন্তরের প্রতিচ্ছবি "তাজমহল"!

মিলের দুর্ঘটনা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি, নানাবিধ ব্যাধি প্রভৃতি লোকনাথবাবুর কোমল হৃদয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি ডিনামাইট, এরোপ্লেন, টর্পেডো প্রভৃতি সম্ভবপর হইতে পারে তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে শ্রমিক-দের স্বাস্থ্যোন্নতি, দুর্ঘটনা দমনও সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মে। হয়ত বিজ্ঞানের সাহায্যে অগণিত নরনারীর দারিদ্র্যজনিত চরম দুর্দশা একদিন মোচন করা সম্ভব হইবে।

এই আশা মনে উদিত হইবার পর লোকনাথবাবু আর বিলম্ব করিলেন না। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য এবং ধ্বংস-মুখী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য লেবরেটারী নির্মাণ করিলেন, বিজ্ঞানের কয়েকজন স্কলারকে মাহিনা দিয়া কাজে

নিয়োগ করিলেন। লোকনাথবাবু নিজে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এক বছর বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিলেন। ইহাই রসায়নাগার নির্মাণ ও গবেষণার পূর্বেকার কথা।

লোকনাথবাবু তাঁহার রসায়নাগারে কাজ করিতেছেন। আয়ার তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে।

মঞ্জুশ্রী মিলে গিয়াছে। লোকনাথবাবুর শরীর ভাল নাই। সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার জন্য ডাক্তার চ্যাটার্জি উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। লোকনাথবাবু ডাঃ চ্যাটার্জির কথা বিশেষ কানে তুলেন না, বলেন, 'বৃদ্ধ হয়েছি, ক'দিন আর বাঁচব। এখন কি অসুস্থ বলে সময়কে ফাঁকি দেবার সময় আছে।' মঞ্জুশ্রী শাসনের সুরে বলে, 'না তা' হবে না, অসুস্থ শরীরে তুমি কাজ করতে পারবে না। সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে তোমাকে complete rest নিতে হবে।'

লোকনাথবাবু মঞ্জুশ্রীকে ভয় করেন, হুকুম অমান্য করিতে সাহস পান না, সুশীল বালকের মত মাতৃ আদেশ পালন করেন। কিন্তু মঞ্জুশ্রী মিলে চলিয়া যাইবার পর লোকনাথবাবু আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না, গবেষণার নেশা তাহাকে রসায়নাগারে টানিয়া লইয়া আসিল।

আয়ার লোকনাথবাবুর নির্দেশ মত কাজ করিতেছিল, হঠাৎ লোকনাথবাবুকে আসিতে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল, কর্তা আপনি!

কর্তা আপনি, কেন আমি এলে বুঝি মাতব্বরি করবার সুবিধে হয় না। খালি বনে এরণ্ড বৃক্ষরাজ হয়েছেন—না।

না, তা নয় কর্তা, দিদিমণি। আয়ার শঙ্কিতভাবে দরজার দিকে তাকাইল।

দিদিমণি মিলে গেছে, ফিরতে দেরী হবে। শোন হর্ন বাজতেই আমায় খবর দিবি। ভুল হয়েছে কি চাকরি গেছে।

চাকরি গেলে খাব্ব কি হুজুর!

ইস! ব্যাটা বিনয়ের অবতার। দু'হাতে লুটে নিচ্ছে, বলে কিনা চাকরি গেলে খাব কি! তুই কি বাঙালী যে ঋণ করে চাকরকে মাইনে দিবি আর চাকর ব্যাটা সে টাকা পোস্ট অপিসে জমা দিবে।

লোকনাথবাবু যখন experiment করিতে থাকেন তখন পার্শ্বে লোক থাকিলে অনবরত কথা বলেন। কেহ না থাকিলে হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া আয়ারকে ডাকেন এবং জরুরী কাজে আয়ারকে পাওয়া যায় নাই বলিয়া ভর্ৎসনা করেন, ভবিষ্যতে এমন হইলে কাজ যাইবে বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন। লোকনাথবাবু যখন পড়িতে থাকেন কিংবা গবেষণা লইয়া তন্ময় হইয়া থাকেন তখন যদি আয়ার পূর্ব নির্দেশ অনুসারে আসিয়া বাধা দেয় তাহা হইলেও লোকনাথবাবু ভীষণ চটিয়া উঠেন। কখনও স্বয়ং আয়ার কাজে বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া ডাক দিতে সাহস না করে, তবে লোকনাথবাবু পরে বলেন, আমায় ডাকিসনি শেষ বুঝি স্রেফ্ ফাঁকি দিয়ে সময়টা কাটালি। আচ্ছা, এইসা দিন নাহি রহে গা।

আয়ার মুখ নিচু করিয়া বলে, সাহস পাইনি কর্তা। আপনি পড়ায় এত তন্ময় ছিলেন যে, চার পাঁচবার এসে ঘুরে গেছি।

ও, তাহলে তুই এসেছিলি, হলিডে করে ফাঁকি দিসনি।

তা' কি পারে।

পারে! এ কোন বাঙলা হল! তোর চেয়ে ম্যানেজার-বাবু ভাল বাঙলা বলে। তুই ত' মাঝে মাঝে আণ্ডে মাণ্ডে বলিস।

ম্যানেজার বাবু শিক্ষিত লোক আছেন। তবে আমার বউ ভাল বাঙলা শিখেছে। দিদিমণের সঙ্গে কত কথা বলে।

তোর বউ বাঙলা বলে! সর্বনাশ, দেখিস গদ্য কবিতা যেন না লেখে। যা টাকা জমিয়েছিস তা চা খেতে আর পত্রিকা ছাপাতেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর বলা যায় না সিনেমার গল্প লেখিকা ও সংলাপ রচয়িতাও হয়ে যেতে পারে। সাবধান আয়ার।

না কর্তা।

না কর্তা বললেই হল। তোর বউ যখন বলে আমার মাথার স্ক্রু ঢিলা তখন কবিতা লিখবে না, একটা কথা হল।

আয়ার জিব্ কাটিয়া বলিল, আমার বউ বলবে অমন কথা! মুখ ভেঙ্গে দেব না। আমার বউ বলে, আপনি দয়ার সাগর, মহাপণ্ডিত, ভোলানাথ।

থাক্ থাক্ আর চাটুকারি করতে হবে না। বেড়ে কথা কইতে শিখেছিস, বলি এখানে কেন মরতে এলি, মোসাহেবি করলে যে এদ্দিনে লাল হয়ে যেতিস।

মোসাহেবি কোথায় করব কর্তা। এ যুগের লোকদের কি রসজ্ঞান আছে। এরা না পারে হাসতে না পারে খেতে। সব যে হুজুর ম্যালেরিয়া দেশের পিলে রোগী।

মোক্তারী করলেও লাভ হত রে আয়ার।

তা কি আর হত। আপনার মত মহান—

হয়েছে বাবা, এবার কাজ করতে দে। ব্যাটাচ্ছেলের মোক্তারী প্যাঁচ যেন আমি বুঝিনে। নেহাৎ প্রাদেশিকতার দুর্নাম হবে নইলে কবে তোকে তাড়াতুম। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সব মরছিল দেখে মীরজাফরের রক্তে সিরাম তৈরী করে পূর্বপুরুষদের বাঁচান হয়েছিল- বিশ্বপ্রেমিক জাতি কি না। যাক্ এসব বড় কথা তুই বুঝবিনি, pherrophosphate-এর শিশিটা আন।

আয়ার শিশিটা আনিতে আনিতে বলে, আমি হলুম মুখখু মানুষ!

না, তুই মহাজ্ঞানী মহাজন। জানিস তোকে যে মাইনে দিই তাতে দেড়টা গ্র্যাজুয়েট রাখা যায়।

আয়ার একটু দূরে সরিয়া যাইয়া নিচু গলায় বলে, তা যায় বই কি কর্তা। কলেজ স্কোয়ারে হকাররা গণ্ডা দরে গ্র্যাজুয়েট বিক্রী করে। ওরা হল কর্তা dignity of labour, আলমারিতে sample রাখা চলে শুধু।

চুপ কর গাধা, শুনে শুনে দু'তিনটে ইংরেজি শব্দ শিখেছিস আর খুব ফরফর কচ্ছিস। সাবধান আর বলিসনি, ছাত্র ধর্মঘট হবে।

আজ লোকনাথবাবু কথা কহিবার সুযোগ পান নাই। একে দুই দিন কাজে করিতে পারেন নাই, তারপর কখন মঞ্জুশ্রী আসিয়া পড়ে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। দুই একবার যে বাক্যে কথা না কহিয়াছেন তাহা নয় কিন্তু পরক্ষণেই আয়ারকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন এবং ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, তুই একটা disturbing element, আর একটি কথা বলেছিস কি চাকরি খতম। ইস কতখানি সময় নষ্ট হয়ে গেল, time is more valuable than anything. জরিমানা না করলে আর সায়েস্তা হবি নে হতচ্ছাড়া!

গরিব মানুষ জরিমানা দেব কি করে, শেষ পর্যন্ত ত' আপনাকেই দিতে—

Stupid—এত বড় আস্পর্ধা, আমি জরিমানা দেব!

সেবার কিন্তু কর্তাই গরিবের জরিমানাটা দিয়েছিলেন।

বটে! সে হল আলাদা কথা। Word is word, জরিমানা যখন করেছি তখন দিতেই হবে, তুই হতভাগা যে আগাম মাইনে নিয়ে বসে আছিস তা' কে জানত।.........

লোকনাথবাবু আয়ারকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া সবে কাজে মন দিয়াছেন, এমন সময় আয়ার ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল কর্তা, সর্বনাশ।

সর্বনাশ—কেন?

দিদিমণি—

দিদিমণি এসে গেছে, কোথায়?

সিঁড়িতে।

সিঁড়িতে! Stupid, nonsense. গেট, বাগান, বারান্দার আগেই কি সিঁড়ি পড়ে হতচ্ছাড়া! হর্ন শুনিসনি কেন? ঘুমোচ্ছিলে না?

রাস্তায় কেবল হর্ন দিচ্ছেই কিন্তু দিদিমণির গাড়িতে মোটেই হর্ন দেয়নি কর্তা!

লোকনাথবাবু কি একটা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, মঞ্জুশ্রীকে দেখিয়া কথা আটকাইয়া গেল।

লোকনাথবাবুর অবস্থা দেখিয়া মঞ্জুশ্রীর হাসি পাইল কিন্তু হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, কি হচ্ছে এখানে ......কি কথা কইছ না যে বড়। আয়ারের দিকে তাকালে কি হবে। না তোমায় নিয়ে আর পারি নে। ডাক্তারবাবু বারবার মানা করে গেছেন, আমি বেরোবার সময় পই পই করে নিষেধ করে গেলুম আর তুমি দিব্যি বিছানা ছেড়ে এসেছ।

লোকনাথবাবু বলিলেন, একা একা ভাল লাগছিল না, হাতের কাছে কোন বই নেই, ভাবনা এলো, ব্যস ভাবতে ভাবতে কখন যেন উঠে এলুম। এবারটি ক্ষমা কর তোর পাগলা ছেলেকে, আর কখনও অবাধ্য হব না মা।

আমি ত' তোমায় বলেছি, কয়েকটা দিন rest নাও তারপর কাজ কর। এ বয়সে এত পরিশ্রম সয়না বাবা।

আজ যখন ক্ষমা করেছিস, আরও কয়েক মিনিট grace দিতে হবে মা। এ solutionটার effect দেখতে হবে।

কত মিনিট লাগবে, বাড়িয়ে বল না।

মাত্র কুড়ি মিনিট আর ধর অতিরিক্ত আরও তিন মিনিট। কি বলিস আয়ার ২৩ মিনিট না মোট ২৫ মিনিট। ঠিক ২৫ মিনিট, not a moment more. ২৫ মিনিট যথেষ্ট, না আয়ার?

Granted, মঞ্জুশ্রী মৃদু হাসিয়া গুণ গুণ স্বরে গাহিতে গাহিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

লোকনাথবাবু "Thank you darling" বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, বিস্মিতভাবে মঞ্জুশ্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুশ্রী পর্দা সরাইয়া দৃষ্টির বাহিরে সরিয়া গেল কিন্তু লোকনাথবাবুর মনের চোখে মঞ্জুশ্রীর ছবিটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাঁহার মনে হইল, অদ্ভুত এ নারী জাতি। মঞ্জুশ্রীর মা জগৎধাত্রী দেবী যখন মারা যান তখন মঞ্জুশ্রী ছোট্ট বালিকা মাত্র ছিল। মাতৃহারা শিশু সন্তানকে লইয়া তিনি কি বিপদে না পড়িয়াছিলেন, আজও তাহার সেকথা মনে পড়িলে চোখ সজল হইয়া উঠে, বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠে। পত্নীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এত গভীরভাবে বোধ হয় সাধারণ মানুষ ভাল বাসিতে পারে না। এত বড় হতভাগ্য তাহার, পত্নীর মৃত্যুতে তিনি রোদন করিতে পারেন নাই, চোখের জল বিসর্জন করিবার অবকাশ পান নাই। মাতৃহীন শিশু কন্যার অব্যক্ত বেদনা ও কঠিন সমস্যা তাহাকে স্তব্ধ ও বধির করিয়া তুলিয়াছিল। পত্নীপ্রেম তাহার অন্তরে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—নির্মম, কঠিন, দুর্বিনীত। তাহার কোন উচ্ছ্বাস নাই, ভাবালুতা নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। মঞ্জুশ্রীর জীবনের প্রারম্ভেই যে মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি আসিয়া আঘাত করিয়াছিল তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইতে গিয়া লোকনাথবাবুকে এত নিষ্ঠুর ও কঠোর সংযম অভ্যাস করিতে হইয়াছে। এ জন্য তার দুঃখ কম নয়।

ধীরে ধীরে মঞ্জুশ্রী বড় হইল। কি করিয়া মঞ্জুশ্রী বড় হইল? লোকনাথবাবুর নিকট যেন আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। মানুষ বড় হয়, মঞ্জুশ্রীর বন্ধুরাও বড় হইয়াছে কিন্তু মঞ্জুশ্রী, কি করিয়া বড় হইল? তাহার মায়ের প্রতিবিম্ব হইয়া কি হঠাৎ আসিয়া উদিত হয় নাই? সত্যই কি মঞ্জুশ্রী ধীরে ধীরে এত বড় হইয়াছে—ফুলটি কি অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠে নাই—এত রূপলাবণ্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য—এত স্নেহমমতা—এত মহত্ত্ব কি করিয়া সে পাইল? কেন সকল মানুষই তাহাকে এত ভালবাসে—এত প্রশংসা করে? তিনিই কি মঞ্জুশ্রীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন? বিপত্নীক অথর্ব মানুষ কি এত বড় কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে?

স্নেহান্ধ ভাবুক মনে কত কথা অলক্ষে আলপনা আঁকিয়া যায়—লোকনাথবাবুর সকল কথা স্মরণে থাকে না। তাহার শুধু মনে হয় নারী জাতি অদ্ভুত।

একটি বেয়ারা আসিয়া লোকনাথবাবুর চিন্তাধারায় বাধা দিল। লোকনাথবাবু প্লেট হইতে একটি কার্ডটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, কেবল visitor, প্রাইভেট সেক্রেটারী কোথায়—ও ম্যানেজারবাবু, পার্টি জন

বেয়ারা চলিয়া যাইতেছিল লোকনাথবাবু বাধা দিয়া

বলিলেন, শোন, দু মিনিট বসিয়ে রাখবি। তারপর এ ঘরে এসে আবার ফিরে গিয়ে এখানে আসতে বলবি। কি বলিস আয়ার, কিছুক্ষণ বসিয়ে না রাখলে বড়লোক মনে করবে না।

বেয়ারা চলিয়া গেলে লোকনাথবাবু বলিলেন, দেখেছিস সেক্রেটারীর বুদ্ধি।

ম্যানেজারবাবুকে আটকাতে সাহস করেন নি।

আরে, আমার সম্মান বৃদ্ধি ও কর্ম ব্যস্ততার বিজ্ঞাপন স্বরূপ ত' ম্যানেজারবাবুর খানিকটা সময় নষ্ট করতে পারত। তারপর একটু নাজেহালও তো করতে পারত। মানুষকে অযথা harass না করলে কেউ বড়লোক মনে করে না, লোকের নিকট গল্প করে ফেম ছড়ায় না।

তা' সত্যি। সেক্রেটারীবাবুকে বলে দেব।

হ্যাঁ বলে দিস। ওর কাজটা কি, চিঠিপত্র লিখে সই করিয়ে নেওয়া আর দর্শকদের খামাকা নাজেহাল করা। পত্রিকার প্রবন্ধ, সভার বক্তৃতা লিখবার জন্যে স্কলারদেরই মাইনে করে রেখেছি।' স্কলারগুলি লেখে ভাল, আমার দেশ-বিদেশে খুব পাণ্ডিত্য রটেছে। লোকে বলে অনেক বিষয়ে আমি authority.

তা' ত' হবেনই, আপনি যে ডাক্তার।

ডাক্তার সে আবার কি। গাধা, এ অষুদ দেবার ডাক্তার নয় ডক্টর।

তা কর্তা জানি। এতদিন যাবৎ আছি, কিছু কিছু শিখেছি। এ কি আর সোজা ডাক্তার। দিশী ডাক্তার আর বিলিতি ডাক্তারের মত পার্থক্য।

আরও সহজ করে বললে কবরেজি আর এলোপ্যাথি—কেমন।

হ্যাঁ, একেবারে যথার্থ বলেছেন কর্তা।

তোর মাথা! এই বিদ্যে নিয়ে আবার বলিস খুব শিখেছিস। থাক আর মিথ্যে বকতে হবে না। লক্ষ্মী-ছাড়াটার জন্যে একটু কাজ করবার উপায় নেই। যা, ম্যানেজার-বাবুকে পাঠিয়ে দে এখানে।

আয়ার চলিয়া গেল।

ছগনলাল ঝুনঝুনওয়ালা আয়ারের সংগে ভিতরে আসিলেন। লোকনাথবাবু লিথমাস পেপার দিয়া এ্যাসিডিটি পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, সুস্বাগতম—বসতে আজ্ঞা হোক।

ম্যানেজারবাবু একটু অপরাধের স্বরে বলিলেন, কাজের ক্ষতি করছি না ত'।

না, বসুন। তারপর কি মনে করে শুভাগমন হল? চেক্—ধর্মঘট—ক্ষতিপূরণ—এ্যাকসিডেণ্ট---না, দান না করলে আর মান থাকে না, বলুন, চুপ করে কেন।

মিল পরিচালনা নিয়ে দরকারি কথা ছিল, আপনি ব্যস্ত আছেন, অন্য সময় আসব।

কাজ হয়ে গেছে। শরীর ভাল নেই বলে মায়ের হুকুম মত তাড়াতাড়ি শেষ করতে হল। মিলের উন্নতির জন্যই কাজ করছিলুম।

আয়ার বলিয়া উঠিল, এক মুহূর্ত বিশ্রম করবার সময় নেই, কর্তা যা পরিশ্রম করছেন ম্যানেজারবাবু—

থাক্ থাক্ আর ডেপোমি করতে হবে না হতভাগা। ভেবেছিস flattery করলেই বকশিস মিলবে, তা হবে না। বলি চার আনা রেটের বটতলার মোক্তার হসনি কেন, তোর ত' মুনসেফ হবার ভয় ছিল না। এবার একটি গ্রাজুয়েট রাখবই।

লোকনাথবাবু আয়ারকে জিনিষপত্র গোছাইয়া রাখিতে বলিয়া ছগনলালবাবুকে সংগে লইয়া বসিবার ঘরে আসিলেন। আয়ারের মত ছগনলালবাবু লোকনাথবাবুর জীবনে জড়াইয়া পড়িতে পারেন নাই। আয়ার যদিও এ সংসারের কেহ নয় কিন্তু অনাবশ্যক নয়, অতিরিক্ত নয়। এ সংসারের সহিত জড়িত বহু লোকই রহিয়াছে কিন্তু কেহই এ আখ্যানভাগে উঁকিঝুঁকি দিবার কোন অবকাশ পায় নাই। যদি তাহারা সম্মুখে আসে তবে ভারাক্রান্ত করিয়া তাহারা আসিবে না, প্রয়োজনে আসিবে। আয়ার শুধু ভৃত্য নয়, এ সংসারে সে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সে আত্মীয়ের অধিক ঘনিষ্ঠ। তাহাকে বাদ দিয়া এ সংসার চলিবে সত্য কিন্তু তার গতি স্বচ্ছন্দ হইবে না, লোকনাথবাবু এবং মঞ্জুশ্রীর অন্তর স্বীকার করিবে না।

ছগনলালবাবুর সহিত এ সংসারের কোন বন্ধন নাই। তিনি অন্তরালে থাকিয়া গেলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, গল্পের আর্ট কিংবা সম্পদ হ্রাস পাইবে না। ছগনলালবাবু সরল, সাধাসিধে মানুষ, সামাজিক এবং হাস্য কৌতুকময়। লোকনাথবাবুর সহিত মনিব-কর্মচারী সম্পর্কের চেয়ে বন্ধুত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বেশি। লোকনাথবাবু তাহার সান্নিধ্য কামনা করেন, ভালবাসেন। আয়ার অন্তরে বন্ধনগ্রন্থি আঁটিয়াছে—তাই তাহার সান্নিধ্য স্বতপ্রবৃত্ত—প্রয়োজনীয়ের কিংবা কামনার প্রতীক্ষায় থাকে না।

আয়ার জগতধাত্রী দেবীর আবিষ্কার। মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে এক সন্ধ্যায় তিনি তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। আয়ার তখন ছিল নিঃস্ব—আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুহীন। জগতধাত্রী দেবী তাহাকে সংগে করিয়া লইয়া আসেন। জগতধাত্রী দেবীই তাহাকে দেশে বাড়ি ঘর করিয়া দিয়াছেন এবং বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন। জগতধাত্রী দেবীর মৃত্যুর পর যখন এ সংসারে ভাংগন ধরিবার উপক্রম হয় এবং অশান্তি, বিশৃংখলা ও ক্লৈব্য আসিয়া যখন জীবন করিয়া তুলিতেছিল পংগু, বিষণ্ণ ও ব্যর্থ তখন আয়ারই সকলকে আড়াল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। মঞ্জুশ্রীর সেবা শুশ্রূষা শিক্ষা দীক্ষায় আয়ার দম্পতীর দান তুচ্ছ নয়। মাতৃহীন শিশুর দুঃখ, ব্যথা, অভাবমোচন করিবার জন্য এবং সকল আঘাত উপেক্ষা করিয়া লালনপালন করিতে আয়ার দম্পতী যে আন্তরিকতার সহিত প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছে তাহা মঞ্জুশ্রী কখনও ভুলিতে পারিবে না।

লোকনাথবাবু বসিবার ঘরে আসিয়া বসিতে বসিতে বলিলেন, মঞ্জুশ্রী মিলের কাজ দেখাশোনা করছে বলে নাকি

রাজেন একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে। মঞ্জু অবশ্য বিশেষ কিছু বলেনি, তবে কথাবার্তায় আমার এমনি সন্দেহ হল।

অসন্তুষ্ট হওয়া ত' উচিত আছে না। এক সঙ্গে যাদের সংসার করতে হবে তাদের ত' এমন হওয়া ভাল হবে না—ছাগনলালবাবু মন্তব্য করিলেন।

লোকনাথবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, Dignityতে বোধ হয় বাঁধছে। কিন্তু রাজেনের এ ছেলেমানুষি। আমার স্ত্রীকে আপনি দেখেননি, তিনি লেখাপড়ায় পণ্ডিত ছিলেন না, বিদ্যাবুদ্ধিও তেমন ছিল না, কিন্তু সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে ভারি বুদ্ধি ছিল। আমায় উনি মাস্টারের মত শাসন করতেন—কৈ আমি ত' কখনও রাগ করিনি বরঞ্চ ভারি আনন্দ লাগত।

আপনি ভাবিবেন না, আপনি ঠিক হয়ে যাবে। মনের মিল যখন আছে কড়া principle ও false dignity বোধ বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না।

মিলে এত গোলমাল চলছে, কাগজে দুর্ণাম রটছে—এ ত' ভাল কথা নয়। আমার ত' জানেন অবসর খুবই কম, মঞ্জুও সারাক্ষণ কাজ কাজ করে তাই ওর কথায় রাজি হলুম। একটা কাজে লিপ্ত থাকা ভাল।

মঞ্জুমার যা বুদ্ধি আমরাও হার মানে যাই। মঞ্জুকে পেয়ে আমি ত' বেঁচে গেছে। শ্রমিক সঙ্ঘের নেতা সঞ্জিত পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গেছে। এখন বেশ peaceful অবস্থা।

এ চেষ্টাই সর্বদা করবেন। যাদের পরিশ্রমে মিলের এত উন্নতি হল এবং প্রচুর লাভ হচ্ছে, তারা যেন না বঞ্চিত হয়, পীড়িত হয়। আপনাকে ত' বলেছি, আমার নিজের জন্য কিছুই ভাববার নেই—সংসারে একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা। মঞ্জুরও ভোগ বিলাসের তেমন কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। ব্যাঙ্কে যা টাকাকড়ি আছে তার সুদে আমাদের খাওয়াপরা চলবে।

আপনাকে শ্রমিকরা দেবতা মনে করে।

না, না আমি দেবতা হতে চাইনে। আমি চাই আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। আমার যথেষ্ট আছে, মিল থেকে যা লাভ হবে তা আমি চাইনে, মিলের উন্নতি, শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যে তা' ব্যয় করবেন। মঞ্জুকে আমি বলেছি। এ সকল কাজে ও আনন্দ পায় এবং ওর ভারি উৎসাহ।

আপনি শ্রমিকদের জন্য বড় ভাবেন, মঞ্জুও সে গুণ পেয়েছে।

কাজ নেই কর্ম নেই, বয়স গেল গড়িয়ে, মেয়েও উপযুক্ত হয়েছে, মায়ের মত আমায় সারাক্ষণ আগলিয়ে থাকে—এরপর যদি পরের জন্যে না ভাবি তবে চলে কি করে। এত যে পেয়েছে, সে যদি একটু পরকে বিলোতে না পারে তবে অপরাধের যে সীমা থাকবে না।

আপনি শুধু দানবীর নন, ভাবুক, দার্শনিক, সংস্কারক।

লোকনাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, এ আপনার প্রীতির কমপ্লিমেণ্ট। তবে এ কথা সত্যি, আমি অনেক কিছু করতে চাই, কিন্তু সফল হতে পারছিনে। বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি এরোপ্লেন, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি সম্ভবপর হতে পারে তবে গবেষণা করলে হয়ত বিজ্ঞানের সাহায্যে কোটি কোটি দুঃস্থ নরনারীর অভাব মোচন করা সম্ভব হবে। ছোট্ট ডিনামাইটের সাহায্যে যদি পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে বিজ্ঞানের চেষ্টায় কেন মরুভূমিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত করতে পারা যাবে না, বন্ধুর প্রান্তরকে উর্বর চাষভূমি করা যাবে? নিশ্চয় যাবে। আমি আশাবাদী, আমি সফল নাও হতে পারি কিন্তু অপর কোন লোক যে কৃতকার্য হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা যদি হয় তবে যে জগতে দুঃখ থাকবে না।

সুখ দুঃখ মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা। যারা অভাবের তাড়নায় মানুষ হতে পারছে না, সুন্দর ও পবিত্র জীবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের আমি বাঁচাতে চাই। জগতের এ কলঙ্ক, এ গ্লানি দূর করাই আমার সাধনা। অভাব যেমন মানুষকে বড় করে তেমনি অভাবই মানুষকে পশু করে। উদরের বুভুক্ষার সংস্থান হলে, মানসিক বুভুক্ষার সংগ্রাম হবে—তখন মানুষই মানুষ হবার পাবে পথ, বিরাট হতে বিরাটতর হবার জন্যে হবে মহাযুদ্ধ।

You're not only a great thinker but economist.

লোকনাথবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন, But out and out a scientist. বিজ্ঞান ব্যতীত আমার স্বপ্ন সফল হবে না। চলুন লাইব্রেরীতে আমার নতুন গবেষণার প্রবন্ধটা শোনাব।

লোকনাথবাবু ছগনলালবাবুকে সঙ্গে লইয়া গ্রন্থাগারে প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশ)

কলিঙ্গরাজ খারবেল

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের সকল ছাত্রই জানে যে, প্রাচীন ভারত হিন্দু সাম্রাজ্যের এক গৌরবময় যুগ। এ সময়ে অনেক খ্যাতনামা প্রতাপশালী সম্রাট্ বিভিন্ন শতাব্দীতে রাজত্ব করে গিয়েছেন। মৌর্য যুগে চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক, কুষাণ যুগে কণিষ্ক, তারপর গুপ্তবংশের সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য আর সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ হর্ষবর্ধন তাঁদের রাজ্য-বিস্তারে, শাসন-সুশৃঙ্খলায় আর শিল্পকলার উন্নতি-চর্চায় অমর কীর্তি অর্জন করেছেন।

দক্ষিণ ভারতেও অনেক বড় বড় পরাক্রান্ত রাজার অভ্যুদয় হয়েছিল। বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাঁদের রাজত্ব-কাল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজো চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে একটা পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে যে, উত্তর ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যের যে রকম পারম্পরিক লিপিবদ্ধ কাহিনী পাওয়া যায়, দক্ষিণ ভারতে সে রকম ধারাবাহিক ইতিহাসের একান্ত অভাব। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস কেমন যেন স্বতন্ত্র, অসংলগ্ন—যেন কয়েকটি প্রথিতযশা বংশের, যেমন অন্ধ্র, পহ্লব, চালুক, চোল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের, উত্থান-পতনের কাহিনী মাত্র। আর্যাবর্তের ইতিহাসে আমরা যেমন একচ্ছত্র আধিপত্য অথবা সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ও নমুনা পাই, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে সে রকম মূলে ঐক্য-সূত্রের সন্ধান পাই না। এর মানে এ নয় যে, দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা অথবা রাষ্ট্রীয় প্রগতি অনেকটা নিম্ন-স্তরের। কিংবা ঐশ্বর্যে পরাক্রমে সেখানকার রাজারা উত্তর ভারতীয় রাজাদের চেয়ে হীনবল ছিলেন। বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই সত্য। শাতবাহন বংশের নৃপতি গৌতমী-পুত্র শাতকর্ণি, চৌত বংশের রাজা খারবেল অথবা চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁদের প্রতাপে ও প্রতিভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

আজ আমরা দাক্ষিণাত্যের কলিঙ্গরাজ খারবেলের কাহিনী বলব। পুরাতন ভারতের ইতিহাসে তাঁর রাজত্ব অনেকটা অবহেলিত, পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাতেও তাঁর সম্বন্ধে এ যাবৎকাল অবিচার করা হয়েছে। কারণ, বোধ করি—পরীক্ষায় তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে না, আর দ্বিতীয় কারণ খারবেলের রাজত্বকাল একটি অমীমাংসিত সমস্যা। খারবেল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য অনেক, কিন্তু নির্ণীত অবধারিত তথ্য বড়ই কম। তবু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় যে মাল-মশলা সংগ্রহ করা হয়েছে, তা থেকে আমরা কলিঙ্গরাজের একটা মোটামুটি ঐতিহাসিক পরিচয় পেতে পারি। উড়িষ্যা প্রদেশে হাথি-গুম্ফা নামক গুহায় উৎকীর্ণ যে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে, তার প্রকৃত তারিখ নির্ণয় নিয়ে অবশ্য অনেক পণ্ডিতী তর্ক ও মতভেদ আছে। কিন্তু ১৯১৭ খৃঃ অব্দে বাঙলার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাটনার ৺কাশীপ্রসাদ জয়সবল মহাশয় এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আমাদের সেই মত মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

কলিঙ্গ দেশ এককালে একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। কলিঙ্গ দেশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, যেহেতু খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস্ কলিঙ্গ দেশের এবং সেখানকার বিভিন্ন অধিবাসীদের স্পষ্ট নামোল্লেখ করে গিয়েছেন। তারপর সম্রাট্ অশোকের শিলালিপি থেকেও আমরা কলিঙ্গ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ পেয়েছি। শিশুনাগ অথবা নন্দ বংশের রাজত্বকালে কলিঙ্গ যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, অশোক সে দেশ জয় করে তা খর্ব করেন। কিন্তু যুদ্ধকালে অজস্র ও অযথা রক্তপাত দেখে এবং নিষ্ঠুর নরহত্যার দৃশ্যে তাঁর মনে ভাবান্তর আসে এবং তারি ফলে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বনের প্রেরণা লাভ করেন। কলিঙ্গ—দেশের আয়তনও বৃহৎ ছিল। সাধারণ অবস্থায় মহানদীর মোহানা থেকে গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত এর বিস্তার ছিল। তারপর নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ জয় করে একদা এই কলিঙ্গ-রাজ্য সমগ্র উড়িষ্যা এবং বাঙলা দেশের মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এহেন কলিঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন রাজা খারবেল।

আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ২০৭ অব্দে খারবেল জন্মগ্রহণ করেন এবং চব্বিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর জীবনী এবং রাজত্বকালের বিশিষ্ট ক্রমিক ঘটনাগুলি আমরা জানতে পারি হাথি-গুম্ফা শিলালিপি থেকে। ঐতিহাসিকগণের মতে এ শিলালিপি খোদিত হয়েছিল খারবেলের রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে। অতএব প্রথম তেরো বছরের ঘটনার মোটামুটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ আমরা এ থেকে পেতে পারি। (খৃঃ পূঃ ১৮৩-১৭০)

যখন খারবেলের বয়স মাত্র পনর বছর, তখন তিনি সেকালে বড় বংশের রাজপুত্রদের যে রকম শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হ'ত তা সমাপ্ত করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। খারবেল নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন কেবল যুদ্ধ-ব্যসন নিয়েই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন না। আইন, গণিত, অর্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল এবং সেই অনুপাতে নৃত্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রে সুনিপুণ শিক্ষাও ছিল।

সিংহাসন লাভ করে তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল দ্বিতীয় বছরে পশ্চিম দিকে এক বিরাট্ অভিযানের আয়োজন। পদাতিক, রথী, অশ্বারোহী প্রভৃতি সৈন্য নিয়ে তিনি এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে। কৃষ্ণানদীর উৎপত্তি-স্থলে সমৃদ্ধিশালী মুষিকনগরী আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হল। তার পরের বছর আনন্দ-উৎসবে অতিবাহিত করে চতুর্থ বছরে আবার তিনি যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। এবারে তাঁর প্রবল সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যের

মধ্য ও উত্তর ভাগে রাঠিক ও ভোজক জাতিদের পরাজিত করে কলিঙ্গরাজের বশ্যতা স্বীকার করায়।

পঞ্চম বছরে খারবেল পূর্ত বিভাগের উন্নতিকল্পে একটি খাল খনন করেন। এটি পুরাতন নন্দ বংশের কোনো এক রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু একশত তিন বছর যাবৎ (কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, তিনশত বছর) তার আর সংস্কার করা হয়নি। খারবেল এই পয়ঃপ্রণালীটিকে মেরামত করে তাঁর রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কথিত আছে, ঐ বছরেই তিনি সার্বভৌম আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করেন। এ মহাযজ্ঞ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের বিখ্যাত রাজন্যবর্গ করে আসছেন। মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কাহিনী সবাই জানে। বাহুবলে যাঁরা বিভিন্ন দেশ জয় করে একচ্ছত্র সম্রাট্ বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল শাস্ত্রমতে এ যজ্ঞ আচরণের অধিকারী। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে যুগে পূর্ব ভারতে কলিঙ্গরাজ খারবেল অপ্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি বলে গণ্য হয়েছিলেন।

অষ্টম বর্ষে খারবেল পুনরায় যুদ্ধ ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। এবার হল মধ্যদেশে তাঁর অভিযান। উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বিহারের মধ্যবর্তী ঘোর অরণ্য অতিক্রম করে গয়ার সন্নিকটে গোরথ গিরি নামক স্থানে তিনি মগধের রাজসৈন্যকে পরাজিত করেন এবং মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এ সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বাক্ট্রিয়ার গ্রীক রাজা ডিমিট্রিয়স্ চিতোরের অন্তঃপাতী মধ্যমিকা এবং সাকেত অথবা অযোধ্যা জয় করে পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু খারবেলের প্রকাণ্ড বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে প্রাচ্য দেশ অধিকারের আশা ত্যাগ করে তিনি মথুরায় ফিরে যেতে বাধ্য হন।

মগধের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান সমাপ্ত করে খারবেল এক বিরাট দানসাগরের আয়োজন করেন। সুযোগ্য ব্যক্তিকে অশ্ব, হস্তী, রথ প্রভৃতি নানা বহুমূল্য সামগ্রী দান করে তিনি একটি বিপুলায়তন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর নামকরণ হয়েছিল 'মহাবিজয়'। কথিত আছে এই প্রাসাদের জন্য আটত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হয়েছিল। দশম বছরে খারবেল পুনর্বার 'ভারতবর্ষ' অর্থাৎ উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। পর বৎসরে খারবেল স্বয়ং কলিঙ্গ-সেনানীর অধিনায়ক হয়ে মগধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। মগধ-রাজ বহসতিমিত (কারুর মতে ইনিই সুঙ্গ বংশীয় পুষ্যমিত্র আবার কেউ কেউ বলেন, ইনি মগধাধিপতির একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা) ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে নানা উপহার দিয়ে কলিঙ্গ রাজকে শান্ত ও আপ্যায়িত করেন। মোটকথা পাটলিপুত্র এ সময়ে কলিঙ্গ রাজের হস্তগত হয়েছিল। তার পর মগধের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনা করে খারবেল প্রাচীনকালের অপহৃত জৈন তীর্থঙ্করের একটি সুন্দর মূর্তি উদ্ধার করে বিজয় গর্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মগধ জয়ের পর তিনি আর একটি মাত্র অভিযান করেন—সেবারে সুদূরে দক্ষিণে পাণ্ড্য দেশের বিরুদ্ধে। এখানেও তাঁর বিজয় যাত্রা সফল হয়েছিল।

খারবেল দানশীল ও স্বধর্মনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী হলেও অন্য ধর্মের উপর বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। নানা দেশ জয় করে যে প্রচুর ধনরত্ন তিনি আহরণ করেছিলেন সেগুলি তিনি অযথা অপব্যয় করেন নি। জৈন সন্ন্যাসীদের বাসকল্পে 'কুমারী পর্বতে' (উদয়গিরি) তিনি কয়েকটি গুহা নির্মান করে দেন। এর মধ্যে যেটি সব চেয়ে প্রশস্ত ও সুন্দর তার নাম হল 'রাণী-নুর-গুম্ফা', এ গুহা-গুলি এখনো বর্তমান। ইতিহাসের ছাত্রগণের উচিত এ সব প্রাচীনকালের নীরব সাক্ষ্যগুলি স্বচক্ষে দেখে আসা।

খারবেল কলিঙ্গ দেশের অধিবাসী ও জাতিতে দ্রাবিড় ছিলেন। বাহুবলে তিনি উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অনেক শক্তিশালী রাজ্য জয় করে আপনার প্রতাপ ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেন। অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর তাঁর দেশ স্বাধীনতা হারিয়ে বহুদিন আপনার ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছিল। একমাত্র খারবেলের চেষ্টায় ও বিক্রমে তার হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার হয়েছিল, যদিও কলিঙ্গ দেশের এ সমৃদ্ধ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।

ভারতের ইতিহাসে যে সব স্বনামধন্য নরপতি আজও সম্মানিত হন, খারবেল তাঁদেরই সমগোত্র। আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক অনুশীলনের ফলেই এই প্রাচীন বিজয়কীর্তি রাজার সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা পূর্বে লোকচক্ষুর অগোচরে গুহাভ্যন্তরে প্রস্তর সীমায় আত্মগোপন করেছিল। পরিশেষে রাজা খারবেলের সম্বন্ধে আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, তিনি সে কালের ভারতীয় রাজন্যবর্গের অগ্রণীস্বরূপ ছিলেন এবং সমকালীন দুজন পরাক্রান্ত নরপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ আর অন্ধ্র বংশীয় শ্রী শাতকর্ণিকে পরাস্ত করে তিনি দ্রাবিড় দেশের কলিঙ্গ রাজ্যকে একটি প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এ সমৃদ্ধি হ'ল সাময়িক। তাঁর মৃত্যুর পরে কলিঙ্গ দেশের কেন যে অবস্থা-বিপর্যয় ঘটল, সে কাহিনী ভিন্ন এবং তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

রমেনের রোমান্স

শ্রীরেবতীমোহন সেন

'রোমান্স' শব্দটার সঙ্গে "রোমান্ আর্ট স্টুডিও"র রমেন বোসের প্রথম পরিচয় হয়েছিল ইংরেজী স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়বার সময়, কিন্তু তখন সে ঐ শব্দের মানেটা ঠিক ধরতে পারে নি। পরে কলেজের বই পড়ে ও সিনেমার চিত্রাদি দেখে তার অর্থ-বোধ তো হ'লই, উপরন্তু রোমান্সের একটা নেশা এসে তার মাথাটাকে বেশ একটু গুলিয়েই দিয়ে গেল। তার পর আর্ট স্কুলে চারুশিল্পের চর্চা করতে গিয়ে সেই নেশাটা উঠল আরও চাগাড় দিয়ে। ঐ নেশার প্রেরণায় তারই সন্ধানে সে যে কত মধুর প্রভাতে সোনালি সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনে ও ঢাকুরিয়া লেকের মুক্ত বিহারপথে আকুল উৎসুকচিত্তে ঘুরে বেড়িয়েছে, তার নিষ্ফল করুণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হ'য়ে ছিল শুধু তারই হৃদয়ের নিভৃত কোণে। কিন্তু কোন নিষ্ফলতাই তাকে নিরাশ বা নিরুৎসাহ করতে পারে নি, সিদ্ধিলাভে ছিল তার এমনই অটুট বিশ্বাস।

সে দিন শনিবারের অপরাহ্ণ। দুটো বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী-বেসরকারী বড় বড় অফিসগুলোর বেশির ভাগই প্রায় বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। রমেনও তার স্টুডিও সেদিনের জন্য বন্ধ ক'রে বেরুবার জন্য মাত্র প্রস্তুত হয়েছে, এমনি সময় অকস্মাৎ তাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত ক'রে ঐ ঘরের প্রবেশ-পথের সম্মুখে এসে দাঁড়াল একজন তরুণী এবং তাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করল,— "আসতে পারি কি?"

রমেনের মুখের জবাবের প্রতীক্ষা না ক'রেই তরুণী কামরায় ঢুকে প'ড়ে তাড়াতাড়ি দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে একটু উদ্বিগ্নভাবে বলে উঠল:—"আমি যে এখানে ঢুকে পড়লাম, ভরসা করি, কেউ তা দেখতে পায় নি।"

রমেন তখনও নিরুত্তর। তরুণী কামরার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ছবি আঁকবার Easel, মডেল বসবার seat ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দেখে বলল,—"আপনার কাজে বোধ করি বাধা জন্মালাম এইরকম আকস্মিকভাবে এসে?"

রমেন এতক্ষণ ছিল ঠিক যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত একদৃষ্টে ঐ তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে। ঐ প্রশ্নে সচকিত হ'য়ে সে উত্তর করল,—"না, না, তা কেন, কোন অপরিচিতা দেবীর এরকম আকস্মিক আবির্ভাব, বাধা তো নয়ই বরং অচিন্তনীয় সৌভাগ্য। বসুন।"

ব'লেই সে মখমলের গদিআঁটা একখানা চেয়ার তরুণীর সম্মুখে এগিয়ে দিল। তরুণী সুন্দরী, তাকে দেবীরূপে সম্বর্ধনা করায় রমেনের মোটেই ভুল বা অন্যায় হয় নি।

আসন গ্রহণ ক'রেই তরুণী পাশের ঘরের ও এই ঘরের মধ্যবর্তী পর্দার দিকে একটি অঙ্গুলি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল,— "ঐ কামরায় কেউ........"

"—না, কেউ নেই এখন। আমার এসিস্ট্যান্টরা সবাই রেসে চ'লে গেছে।"

ঐ কথা বলেই রমেন অসম্পূর্ণ ছবিগুলো দেয়ালের গায়ে উল্টোপিঠ ক'রে রেখে দিতে লাগল।

তরুণী বলল,—"বাঁচা গেল, কেউ নেই ওখানে, কিন্তু ঐ ছবিগুলো ঘুরিয়ে রাখছেন কেন? আপনার আঁকা ছবিই তো সব? তা লুকোবার প্রয়োজন তো কিছু দেখছি না, তাছাড়া আপনি জেনে রাখতে পারেন, চিত্র-সমালোচনা করার যোগ্যতা আমার আদৌ নেই।"

—"ছবিগুলো অসম্পূর্ণ,—এখনও দেখাবার মত অবস্থায় আসে নি, এমনকি, কোন কোনটায় outline-এর ওপর তুলির দাগও পড়েনি।"

—"তা হ'লই বা,--চিত্রকরের কাজ করবার ঘরে ওরূপ বিভিন্ন অবস্থার ছবিই তো থাকবার কথা। যাক্ সে কথা, এখন একটু কাজের কথা বলতে চাই, কিন্তু আপনি হয়তো এখুনি বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এ অবস্থায় আমার কাজের কথা শোনবার জন্য আপনাকে আটকে রাখা অসঙ্গত হবে না কি?"

ব্যগ্রতার সহিত বাধা দিয়ে রমেন বলল,—"না, না, মোটেই অসঙ্গত হবে না—আমার এমন কোন জরুরি কাজ নেই যে, এখনই না গেলে নয়। আপনার বক্তব্য আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।"

তরুণী তখন হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বলল,—"দেখুন, একটা ভীষণ অবস্থায় প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি, এরকম সংকটাপন্ন অবস্থা আমার জীবনে আর কখনও হয়নি। তাই, আপনার সাহায্য পাবার ভরসায় এসেছি। ঐ সাহায্যটুকু ক'রে এই সংকট থেকে আমায় রক্ষা করবেন না কি রমেনবাবু? সম্পূর্ণ অপরিচিতা হ'য়েও আপনার নামটা কি ক'রে জানতে পারলাম, এতে হয়তো আশ্চয্যি বোধ কচ্চেন?"

—"কিছুটা আশ্চর্য হয়েছি বই কি। তবে এবারের Art Exhibition-এ আমার আঁকা কয়েকখানা ছবিতে আমার ও এই স্টুডিওর নাম লেখা ছিল,—সম্ভবত ঐ ছবি দেখে আমার নামটা জেনে নিয়েছেন।"

Exhibition-এ আমি যাই নি, সুতরাং আপনার অনুমান ঠিক হ'ল না। নিকটেই এক বোর্ডিংয়ে আমি থাকি এবং আপনাকে প্রায়ই ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখতে পাই। আপনার চেহারা বেশ সৌম্য ও প্রীতিকর।"

বহুকালের ঈপ্সিত রোমান্সের সূত্রপাত দেখে রমেনের অন্তরতল ভিতরে ভিতরে স্পন্দিত হ'য়ে উঠল। সে শুধু মন্তব্য করল,—"আপনার কথায় আপ্যায়িত হ'লাম।"

—"আপনার চেহারা দেখেই আমার মনে হয়েছে আপনাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে এবং আপনি নির্ভরযোগ্য লোক। এজন্যই আপনার সাহায্য চাইতে সাহস পেয়েছি।"

রমেন উত্তর করল,—"আহ্লাদের সহিত তা করব, যদি সাধ্যে কুলায়। বলুন কি রকম সাহায্য চাই।"

আনতবদনে স্থিরকণ্ঠে ধীরে ধীরে তরুণী বলল,— "রমেনবাবু, আমার একজন স্বামীর প্রয়োজন।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত মুখমণ্ডল যেন আরক্ত হ'য়ে উঠল। সাহায্য প্রার্থনাটা যে এই রকমের আকার নিয়ে উপস্থিত হবে, রমেন তা কল্পনার মধ্যেও আনতে পারে নি। সুতরাং ঐ উক্তিতে তার মুখ চোখ থেকে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে বেরুল। তরুণী তা লক্ষ্য ক'রেই আবার বলল,—

—"তা স্থায়ীভাবে নয়। কথাটা যে কি ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বো, ঠিক করতে পাচ্ছিনা—একজন স্বামী সাময়িকভাবে ধার চাচ্ছি।"

—"অর্থাৎ অপর কারো স্বামী?"

—"না, আমারই, অথচ আদতে স্বামী ঠিক নয়।"

রমেন গম্ভীরভাবে বল্‌লো, 'বুঝলাম', আসলে সে এক বর্ণও বুঝতে পারে নি। তরুণী ক্রমেই তার কাছে মোহিনী হয়ে উঠছিল। রমেনের দিকে একটুখানি মুচকি হাসির প্রহরণ নিক্ষেপ করে তরুণী বল্‌লো:—

—"আপনি পারবেন কি দয়া করে..............?"

—"কি পারবো?"

—"আপনার মস্তিষ্কটা দেখচি রীতিমত নিরেট।"

বিরক্তির ভিতর দিয়েও রমণী রমেনের চোখে রমণীয়তায় ভরপুর হয়ে উঠলো,—তাই ঐ মন্তব্যের সমর্থন করেই সে

বলল ঃ—"আপনি ঠিকই বল্‌ছেন, তবে এই নিরেট মস্তিষ্ক নিয়েও এ অভাগা বিশ্বাসযোগ্য ও প্রীতিকর হবার মত যোগ্যতার আধার।"

—"আমার কথায় রাগ করলেন বুঝি? যাক্‌ তা হলে সে কথা প্রত্যাহার করলাম। কিন্তু,—কিন্তু আমার যে একজন স্বামী চাই-ই রমেনবাবু, তা নইলে আমার স্বাধীনতা যে সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভেবে দেখুন কি ভীষণ বিপদেই পড়েছি।"

—"তাই নাকি? আমার তো ধারণা ছিল, স্বামী থাকলেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অধিকাংশ স্থলেই খর্ব ও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। আপনার অবস্থাটা যদি exception-এর ভিতর পড়ে থাকে, সে আলাদা কথা।"

"আমি ওরকম খাঁটি স্বামীর কথা বলছিনা,—আমার দরকার হয়েছে একজন temporary husband-এর, শুধু আজ বিকেলের জন্য।"

—"শুধু আজ বিকেলের জন্য? তারপর আর তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না?"

—"আমার অবস্থাটা আপনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না। এত সব বাধা ও নির্যাতনের ভিতর আমার জীবন কাটাতে হয়েছে যে এখন মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল। অবস্থাটা তাহলে একটু খুলেই বলি।"

—"সেটাই বোধ করি ভালো।"

—"আসল কথা, কি জানেন, আমি এক সঙ্গে দু'রকমের জীবনযাপন করছি।..........."

কথায় বাধা দিয়ে রমেন বল্‌লোঃ—"তার মানে কি এই যে, আপনার একজন স্বামী রয়েছেন এবং তিনি শান্তি কামনায় প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব মেরে আছেন?"

—"না, না, তা নয়। আমার কোন স্বামী নেই, কখনও ছিল না এবং আমি তা চাইও না।"

—"সে কি? আপনার একজন স্বামীর একান্তই প্রয়োজন। এ কথাই ত আপনি এতোক্ষণ আমায় বোঝাতে চেষ্টা করেছেন?"

"হাঁ, তা করেছি,—আবারও সে কথাই বলছি অর্থাৎ এমন অবস্থায় আমি পড়েছি যে, এখন যে কোন একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। কি বিশ্রী অবস্থা বলুন দেখি, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও যে দেখ্‌ছিনা। আপনি কি মনে করেন, অন্য কোন উপায় আছে?" কথাটার মর্ম্ম অনুমাত্র বুঝতে না পারলেও তরুণীর বাক্যে সায় দিয়ে রমেন বললোঃ—"তাইত, অন্য উপায় আর কি থাক্‌বে।"

—"আমার ইতিহাসটা তাহলে শুনুন। বারো বছর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হই। তখন সেকেলে ধরণের এক বৃদ্ধ হলেন আমার অভিভাবক, কিন্তু তিনি আমাকে নিজের কাছে না রেখে রাখলেন আমারই এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার কাছে তাঁর বাড়িতে। ঐ আত্মীয়ার কঠোর শাসন ও অতিরিক্ত কড়া নিয়মের বাঁধনে এতকাল যে ভীষণ নির্যাতন ভোগ করেছি, তা শুনলে আপনিও বিদ্রোহী হয়ে ওঠবেন। তবে বছর-খানিক হল তিনি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন।"

—"তার পরই বুঝি আপনি সেই বুড়ো অভিভাবকের কাছে চলে গেলেন?"

একটু বক্র হাসির ঢেউ খেলিয়ে তরুণী বলল,—"না, তাঁর কাছে যাইনি এবং যেতে চাইওনি। নিত্য নির্যাতনে জর্জ্জরিত মন তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল; সুতরাং ঐ সুযোগ আমি ছাড়তে পারলাম না। বছরে দশ-বারো দিনের জন্য একবার সেই বুড়ো অভিভাবকের কাছে গিয়ে আমার থাক্‌তেই হত। সেই ক'দিনের অবস্থার কথা কি আর বলব,—একে ত তিনি বাস করেন দূর পল্লীগ্রামে, তার ওপর তাঁর সব ideas হলো হাজার বছরের পুরণো। বুড়োর দেখাশোনা করবার জন্য তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তাঁর কাছে থাকেন। অতিরিক্ত খিটখিটে মেজাজের এই আত্মীয়াটিও আমার ওপর কর্তৃত্ব ও জুলুম করতে ছাড়েন না। ভদ্রলোক নিজে যেমন বুড়ো, তেমনি একেবারেই মনভোলা, তবে খুব উঁচুদরের পণ্ডিত—a great Scholar."

—"তাহলে তাঁর কাছে..........."

—"যাওয়াই আমার উচিত ছিল, এ কথা ঠিক, কিন্তু দীর্ঘকাল খাঁচায় বদ্ধ পাখীর ন্যায় ছিলাম বলে আমি চাচ্ছিলাম মুক্তি অন্তত কিছুকালের জন্য ইচ্ছামত বিচরণের স্বাধীনতা। তাই এই রাস্তারই অপর প্রান্তে ছোট একটা Flat ভাড়া নিয়ে সেই অবধি বাস কচ্ছি।"

—"একেবারে একা বাস কচ্ছেন।"

—"কি আর করব এবং কার সঙ্গেই বা থাকব? আমি কাউকে চিনি না, জানি না এবং জানবার সুযোগও কখনও পাইনি।

"কিন্তু আপনার বুড়ো অভিভাবক কি এই ব্যবস্থা অনুমোদন কচ্ছেন?"

—"সেই ত কথা। তিনি তা অনুমোদন করেন না।"

—"তাহলে, তাঁর ইচ্ছার বিরোধী হয়েই.........."

—"না, না, তা নয়। এই ব্যবস্থার কথা তিনি জানেনই না, বস্তুত সেই অভিভাবকের জন্যই স্বামী খুঁজছি?"

মাথাটা একবার চুলকিয়ে রমেন জিজ্ঞেস করলঃ—"যে মহিলা ঐ বুড়োর সংসার দেখেন, তাঁর স্বামীর প্রয়োজন, আপনি বোধ হয় সে কথাই বল্‌ছেন। কোন পুরুষ লোকের স্বামীর প্রয়োজন হওয়া সম্ভবপর নয়।"

তরুণী এ কথায় হেসে ফেলল। রমেনও হাসল। অবশেষে তরুণী বললঃ—"আমার মনে হয়, কোন কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আমার আদৌ নেই। আমার বাবা আমার জন্য কিছু টাকা রেখে গেছেন ঐ অভিভাবকের কাছে, কিন্তু সেই টাকাটা আমার হাতে আসবে না যতদিন আমার বয়স তেইশ বছর পূর্ণ না হবে অর্থাৎ এখনও আরো চারটি বছর আমার অপেক্ষা করতে হবে। যে মহিলার কঠোর তত্ত্বাবধানে আমি এতোকাল কাটিয়ে এসেছি, আমার বুড়ো অভিভাবক প্রতি তিন মাস অন্তর তাঁর নামে একখানা চেক পাঠিয়ে দিতেন আমার খরচার জন্য। ঐ মহিলার মৃত্যুর পর যখন আমার মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ উপস্থিত হল, তখন থেকে আমার দারুণ লোভ হলো ঐ চেকের ওপর। তাই একজন স্বামীর কল্পনা করে নিলাম।"

—"স্বামীর কল্পনা করলেন? সে আবার কি রকম?

—"খুব সহজ ব্যাপার। আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবককে জানতেই দিলাম না, ঐ মহিলাটি মারা গেছেন। তিনি ও-সব খোঁজ-খবর নিতেন না, তাছাড়া মাঝে মাঝে তাঁর এমন বিস্মৃতি এসে যায় যে, মাসের পর মাস ধ'রে তিনি কিছুই মনে রাখতে পারেন না, শুধু যে কাজ নিয়ে দিন-রাত লিপ্ত থাকেন, ঐটি ছাড়া। তবে ঠিক সময়ে চেক্ পাঠাতে তাঁর কখনও ভুল হয় না। সেই চেক্ এখন আমার হাতেই পেঁৗছে, যদিও তিনি তার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। কাজেই আমি এখন দু'রকমের জীবন যাপন করছি। আমার বাড়ীওয়ালা ও তাঁর স্ত্রী জানেন, আমি অবিবাহিতা।"

—"আপনি কি তবে বলতে চান, বিয়ে না ক'রেও আপনি বিবাহিতা?"

—"হাঁ। পাছে বুড়ো অভিভাবকের কাছে গিয়ে আবার বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকতে হয়, সে আশঙ্কায় এই ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাঁকে জানিয়েছি, আমি শুধু বিবাহিতা নই, বিয়ের পর থেকে নানা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। নারীপ্রগতির এরূপ চিত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি না থাকলেও, তিনি এটা অগত্যা মেনে নিয়েছেন। তাঁকে জানান হয়েছে, আমি এখন

বিবাহিতা এবং আমার স্বামী একজন চিত্রশিল্পী।"

—"চিত্রশিল্পী?"

তরুণী এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে তার আয়ত চোখ দুটি আনত ক'রে মেজের কার্পেটের ফুল-লতাগুলো দেখতে লাগল। রমেনের মনে হ'ল, স্বর্গের অপ্সরা ভিন্ন অপর কারও চোখের ভাব এমন চিত্তাকর্ষক হ'তে পারে না। মুহূর্ত পরেই চোখ তুলে তরুণী বলল,—"কল্পিত স্বামীকে নিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করবার কেন সুবিধে হ'য়ে উঠছে না, একথা বোঝাতে গিয়ে তাঁকে জানাতে হ'ল, বিয়ের পরই আমরা দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছি, কেননা, আর্টিস্ট স্বামী ভারতের রমণীয় জায়গাগুলো আমায় না দেখিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। তখন অভিভাবক চাইলেন, যে সব জায়গায় গিয়েছি তার ছবি দেখতে। কি করি, তাড়াতাড়ি নিউম্যানের দোকানে গিয়ে কয়েক প্যাকেট পিক্‌চার পোস্টকার্ড এনে তাঁকে সেগুলো পাঠিয়ে দিলাম। বোম্বে, হায়দরাবাদ, এলোরা, অজন্তা, পুরী, ভুবনেশ্বর, দিল্লী, আগ্রা ও কাশ্মীরের ছবি দেখে তিনি লিখলেন, দশ-বার দিনের ভিতর আমরা কি ক'রে এত সব জায়গা দেখতে পারলাম, তা ভেবে তিনি আশ্চর্য হ'য়ে গেছেন। আসল কথা, ভৌগোলিক জ্ঞানটা আমার একান্তই অল্প, তাই ঐ বিভ্রাট ক'রে ফেলেছিলাম। শ্রদ্ধেয় অভিভাবক তবু খুসি হ'য়ে খুব মিষ্টি চিঠি দিলেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতায় এসেছেন।"

—"সর্বনাশ! একেবারে কলকাতায়?"

—"শুধু তাই নয়, আজ রাত্রে তাঁর ওখানে আমাদের খাবার নিমন্ত্রণ। তিনি নিজেই আমার Flat-এ আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাতে বাধা দিয়ে জানিয়েছি, নানা কারণে আমার এখানে তাঁর আসা ঠিক হবে না।"

—"আবার আপনিও তাঁর কাছে যেতে পারছেন না কল্পিত স্বামীটিকে নিয়ে; কাজেই আপনার দেখাতে হবে একটা ওজর, যেমন হঠাৎ মাথা-ব্যথায় স্বামী ভয়ানক রকম কাতর হ'য়ে পড়েছেন।"

—"এ চালাকি খাটবে না। তিনি বিশেষভাবে তাঁকেই দেখতে চাচ্ছেন। বিস্মৃতির অবস্থাটা কেটে গিয়ে এখন তাঁর বেশ স্বাভাবিক অবস্থা,—ফাঁকি দেবার যো নেই এখন।"

—"আপনার কল্পিত স্বামী বেচারার যখন সশরীরে হাজির হবার সম্ভাবনা নেই, তখন আপনাকে এই অভিভাবকের সঙ্গেই হয়তো চলে যেতে হবে।"

তরুণী দৃঢ়তার সহিত বলে উঠল,—"কখনও যাব না তাঁর সাথে। আমার এখানের বাসা-বাড়ি যতই নিরানন্দময় হোক, তাঁর ওখানের জেলখানার চাইতে হাজার গুণে ভাল। তাছাড়া, এই বিরাট শহরে বন্ধুবান্ধবহীন হ'য়েও ভরসা করি, একটা কিছু ক'রে নিতে পারবই, কেননা আমি শুধু যে কলেজের পাশ-করা মেয়ে তা নয়, আমি একজন লেখিকা,—কয়েকখানা বইও লিখেছি।"

—"নভেল?"

—"হাঁ, নভেল, নাটক, ছোটগল্প ইত্যাদি। তবে একখানাও এখন পর্যন্ত শেষ করতে পারিনি—একই idea বার বার এসে আমায় এমনভাবে চেপে ধরে যে, তাকে এড়িয়ে চলতে পারি না, কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন............ সেকথা এখন থাক্। খুব খুসি হ'লাম যে, আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন।"

—"রাজি আছি, আমি?"

—"হাঁ, আমি ঠিক জানতাম, আপনি অমত করবেন না। বিশেষত, আপনি চিত্রশিল্পী বলে ব্যাপারটা আরও সহজ হ'য়ে গেল।"

—"কোন্ ব্যাপার সহজ হ'ল?"

একটু মুচ্‌কি হেসে তরুণী বলল,—"এই স্বামী হ'বার ব্যাপারটা।"

রোমান্সের স্বপ্নে বিভোর রমেন এবার সোৎসাহে বলল,—"তা হ'তে পারলে তো ধন্য হ'য়ে যেতাম।"

—"শুধু আজ বিকেলের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য।"

রমেনের উৎসাহটা আবার দমে গেল, তবু সম্পূর্ণ হতাশ না হ'য়ে সে বলল,—"আজ অল্প কিছুক্ষণের আলাপ-পরিচয়েই যে তিনি তৃপ্তিলাভ করবেন, তা না হ'তেও পারে। তিনি হয়তো চাইবেন আমাদের নিয়ে একদিন মিউজিয়মে কিংবা ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে যেতে, কেননা এগুলোই হ'ল তাঁর মত পন্ডিত লোকদের সময় কাটাবার জায়গা।"

—"তা সত্য, কিন্তু তিনি যে কালই দেশে ফিরে যাচ্ছেন।"

—"তাইতো স্বামীপনাটা তাহ'লে মাত্র দু'-এক ঘন্টার জন্য! কিন্তু আমার প্রেয়সী পত্নীকে কি নামে ডাকব?"

—"অমিয়া বা সংক্ষেপে মিসেস্ বি বর্ধন।"

—"বি বর্ধন? নামের initialটা হ'ল বি? আশ্চর্য, আমারও যে ডাক নাম বিজু বা বিজয়?—সেটা না হয় একটুখানি বেড়ে গিয়ে বিজয়-বর্ধন হোক্, ক্ষতি কি?"

—"আপনার নাম রমেন নয়?"

—"রমেন হ'ল পোষাকি নাম। আত্মীয় বন্ধুরা আমায় বিজু বা বিজয় বলেই ডাকে। যাই হোক্, 'বি বর্ধন'টা বেশ মানিয়েই যাবে অমিয়া।"

—"এখনই একেবারে অমিয়া? এ কিন্তু আপনার বাড়াবাড়ি রমেনবাবু।"

—"কিছু মনে করবেন না—আমি শুধু একটু রিহার্সেল দিচ্ছিলাম। কিন্তু কদ্দিন হ'ল আমাদের বিয়ে হয়েছে?"

—"এই ধরুন, এক বছরের কিছু ওপর।"

—"বেশ, ক'টার সময়, কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে?"

—"রাত আটটার সময় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের...হোটেলে। ঠিক পৌনে আটটায় আপনি যদি এসপ্লানেড ট্রামওয়ে জংশনে আমার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহ'লে সেখান থেকে ট্যাক্সি ক'রে দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারব।"

—"বেশ, তাই করব অমিয়া।"

—"রমেনবাবু, আবার সেই 'অমিয়া'?"

—"আর 'রমেনবাবু' নয়, শুধু 'বিজু'। স্বামীকে বার বার 'বাবু' বা 'আপনি' ব'লে সম্বোধন করলে অভিভাবক মশায় ফাঁকিটা চট্ ক'রে ধরে ফেলবেন, সুতরাং সেটা একেবারেই বর্জন করতে হবে। তাই সনাতন রীতি অনুসারে আমিও আপনাকে, না, না, তোমায় শুধু অমিয়া ব'লেই ডাকব।' এখন 'বিজু' নামটা খানিকক্ষণ রিহার্সেল দিয়ে নাও, তা নইলে সেখানে গিয়ে মুস্কিল বাঁধাবে যে।"

—"মুস্কিল কিছুই হবে না। স্বামীর নাম ধরে ডাকা চিঠিপত্রে চললেও, বাঙালী সমাজে সাধারণ কথাবার্তায় তার এখনও চলতি নেই, সুতরাং ওটার রিহার্সেলের আমার মোটেই প্রয়োজন হবে না, মিঃ বোস্।"

—"ওঃ, একেবারে নিরামিষ মিঃ বোস? কলেজের পাশ-করা অতি আধুনিকা, উপরন্তু লেখিকা মেয়ের পক্ষে স্বামীর নামোচ্চারণবিদ্বেষ যে একান্ত অশোভন হবে অমিয়ারাণী।"

—"বাঃ, এ যে আরও এক ধাপ উপরে উঠলাম দেখছি। বেশ, তাই হোক্, আজকের বিপদটা কোনরকমে কেটে গেলেই বাঁচি।

তাহ'লে পৌনে আটটায় এসপ্লানেড জংশনে 'বিজুর' প্রতীক্ষা করব।"

সহাস্য কটাক্ষপাত ক'রে ও আনত মস্তকে ছোট একটি নমস্কার জানিয়ে তরুণী আধুনিকা তখনই সেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

(খ)

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজবার মিনিট কয়েক পরেই চিত্র-শিল্পী শ্রীমান রমেন বোস এসপ্লেনেড জংশনে হাজির হ'য়ে অমিয়ারাণীর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো। একে জানুয়ারী মাস, তার ওপর উত্তরের কনকনে হাওয়া, তাই শীতের প্রকোপটা ছিল বেশ তীব্র। গলার মাফলারটা এ'টে দিয়ে ও জামার দু'পকেটে দু'হাত রেখে ট্রাম-লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রমেন একান্ত উৎসুক চিত্তে বালিগঞ্জের গাড়ী থেকে যে সব মহিলা নামছেন তাঁদের ওপর নজর রাখছিল, আর ভাবছিল; আধুনিকা যদি কোন কারণে শেষটায় মত পরিবর্তন ক'রে বসে ও কথামতো হাজির না হয়, তা হ'লে তার অস্থায়ী স্বামী-পণা করার রোমান্সটা একান্তই মাঠে মারা যাবে। কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ ভাবতে হ'লো না, মিনিট কয়েক মধ্যেই তরুণী এসে নামলো এবং রমেনকে সামনে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললোঃ—"ভয় হচ্ছিল পাছে আপনি না আসেন, এখন চলুন একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ি।"

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে রমেন বললোঃ— "আসুন, চলুন, আপনি, এগুলো যদি হোটেলেও চলতে থাকে.........

—"কিছু ভয় নেই, সেখানে গিয়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

তার পর ট্যাক্সিতে ব'সে তরুণী একটু চিন্তিতভাবে বলতে সুরু করলো,—"মিঃ বোস।"

রমেন উৎসাহ দিয়ে বললোঃ—"বিজু বলতে যদি বাধো বাধো ঠেকে তবে মিঃ বোসই চলুক। সেখানে গিয়ে কথা-প্রসঙ্গে যদি তোমায় কোনো আদরের সম্বোধন করে ফেলি, তাতে যেন ক্ষুণ্ণ-বোধ করো না, কেননা স্বামী-স্ত্রীতে যে রকম ভাষা-ব্যবহার করা হয় আমার কথা-বার্তায় ঐ আদর্শটা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে হবে তো।"

—"ওঃ, তাই?"

"তা নইলে অভিনেতার অভিনয় স্বাভাবিক হবে কি ক'রে?"

—"স্বাভাবিক না হ'লেই যে ধরা পড়বার আশংকা। সে যাই হোক, আপনি যে এসেছেন, এ আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব বলতে হবে।"

"তাই নাকি? আমি কিন্তু মহত্ত্বের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তবে এইমাত্র বুঝছি যে, এই ব্যাপারে বেশ একটু আমোদই অনুভব কচ্ছি। আমি অবিবাহিত, সুতরাং এটা হবে আমার সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।"

—"দেখবেন অভিজ্ঞতার নূতনত্ব যেন আপনাকে বিভ্রান্ত ক'রে না ফেলে। ধরা পড়লেই সর্বনাশ! বুড়ো তা হ'লে আমায় আর একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করবেন না, এমন কি পৈত্রিক সম্পত্তি থেকেও হয়তো বঞ্চিত ক'রে দেবেন।"

—"আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করো, সন্দেহ করবার কোনো সুযোগই দেবো না।"

অবশেষে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো হোটেলের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার মুখেই একজন ভৃত্য তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে চললো। তরুণী তার কানে কি একটা কথা বলতেই সে একটু অতিরিক্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁদের নিয়ে গেল একটা বসবার ঘরে এবং তার পর পাশের কামরায় গিয়ে তরুণীর অভিভাবককে সংবাদ দিল। সকল রকম উৎকণ্ঠার ভাব চেপে রেখে রমেন ও অমিয়া বৃদ্ধের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই তিনি এলেন, কিন্তু তাঁকে দেখেই রমেনের চক্ষু স্থির! ইনি যে তারই মামা বৈকুণ্ঠনাথ! উভয়ে আসন ছেড়ে উঠে বৃদ্ধের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলো।

প্রফেসার বৈকুণ্ঠনাথ ছিলেন একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। তিনি চিরকুমার এবং রমেনই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। রমেন বছরে একবার এই মামার আশ্রয়ে গিয়ে দু'এক সপ্তাহ ক'রে থাকতো এবং জানতো তিনি তাঁর এক বন্ধু-কন্যার অভিভাবক, কিন্তু সেই বন্ধু কন্যার সঙ্গে কখনো তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি, এমন কি তার নামটি পর্যন্ত রমেনের জানা ছিল না। এই অমিয়াই যে সেই বন্ধু-কন্যা, এটা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। তাই সে তার মুখখানা মামার চোখ থেকে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বুড়ো তাদের আশীর্বাদ ক'রে বসতে বললেন ও তার পর রমেনের দিকে চেয়ে তরুণীকে বললেনঃ—"অমি, ইনিই তোমার স্বামী? বাবাজি, তোমায় দেখে খুব খুসি হলুম। শুনেছি, তুমি নাকি একজন চিত্রকর, বেশ ভালো কথা। আমার একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাগে, তারও এই ছবি আঁকবার ব্যবসা।"

তার পর চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে রমেনের দিকে একটু তীব্র নজর দিয়েই তিনি হঠাৎ ব'লে উঠলেনঃ—"একি, এ যে বিজু!"

অমিয়া তাড়াতাড়ি বললোঃ—"হাঁ, জ্যেঠামশায়, তাঁরই ঐ নাম। আপনাকে তো আমি লিখে জানিয়েছিলাম, আমার স্বামী হচ্ছেন মিঃ বি বর্ধন। আপনার কি তা মনে পড়ছে না?"

বুড়ো রমেনের দিকে আবার কটমট ক'রে তাকিয়ে বললেনঃ —"কিন্তু এ যে আমাদের বিজু, মিঃ বর্ধন কোথায়?"

—"জ্যেঠামশায়, ইনিই মিঃ বিজয় বর্ধন। এ'র কথাইতো আপনাকে লিখেছি। বিজু হলো ওঁর ডাক নাম।"

—"আমি তো ওকে বিজু বলেই জানি, ওর মাও ওকে ঐ নামেই ডাকতো, কিন্তু......বিজু তো বোস, সে 'বর্ধন' হ'লো কি ক'রে?"

রমেন জানতো বৈকুণ্ঠনাথ সহজেই রেগে ওঠেন। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হ'য়ে উঠবে এবং অমিয়াও অপ্রস্তুত হবার মতো অবস্থায় এসে পড়বে দেখে, রমেন মধ্যবর্তিতা ক'রে শান্তভাবে বললোঃ—

—"মামা, আমায় দেখে আপনি আশ্চর্য্য হবেন তা জানতাম এবং সে কথাটা অমিয়াকে আগেই ব'লে রেখেছিলাম। কি ব'লো অমিয়া, বলি নাই কি?"

অমিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে রমেন চুপি চুপি তাকে বললো—"তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, প্রতিবাদ না ক'রে আমার সব কথায় সায় দিয়ে যাবে। ভাগ্যিস বুড়ো কানে কম শোনেন, তা না হ'লে কি ফ্যাসাদই হ'তো বুঝতে পাচ্ছো না, ইনি আমার আপন মামা।"

নীল ডাগর চোখ আরো বিস্তৃত ক'রে বিরক্তির সহিত অমিয়া বললোঃ—"কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না।"

—"তা পারবে না,—তোমায় কতো ব'লেছি কিন্তু তোমার সরলপ্রাণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি, মামা কখনো রাগ করবেন বা করতে পারেন।"

(ক্রমশ)

সামরিক বলে সোভিয়েট রুশিয়া

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাইয়া সত্যই এতদিনে রুশ-জার্মান সংঘর্ষ বাধিয়াছে। এই সংঘর্ষ আচম্বিত হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। দুই রাষ্ট্রের আদর্শ পৃথক—প্রত্যক্ষভাবে একটি অপরটির বিরোধী। এই পরস্পর বিরোধী মতবাদের গলাগলি করিয়া বেশী দূর অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা—নিষ্ক্রিয়ভাবে বেশীদিন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকাও কঠিন। একের অস্তিত্ব অপরের পক্ষে অকল্যাণকর ও পীড়াদায়ক। একের শক্তিবৃদ্ধি অপরের পক্ষে শ্বাসরোধকর। অতএব সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য। শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষা মাত্র। হইয়াছেও তাহাই। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জার্মানদের অভিযোগে তাহার কতকটা ইঙ্গিত মিলিয়াছে। সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিকে কিন্তু যাহা অনিবার্য তাহাকে জোড়াতালি দিয়া রোধ করা সম্ভব হয় নাই। প্রায় সমগ্র ইউরোপকে করতলগত করিয়াও হিটলার নিশ্চিত হইতে পারেন নাই, ইউরোপে নববিধান প্রবর্তনে অন্তরায় সোভিয়েট রুশিয়া। রাইখের অভিজাত মার্ক মুদ্রা যখন ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট—তখন মস্কোর অনভিজাত রুবল মুদ্রা যেন তাহাকে ভ্রূকুটি করিতে সমুদ্যত। বহু মূল্যে লব্ধ বিজয়ের ফল অনায়াসে সোভিয়েটের করতলগত হইবে—ইহা জার্মানীর পক্ষে অসহ্য এবং পরম অনিষ্টকর। অতএব বিজিত ভূখণ্ডে অখণ্ড জার্মান আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে সোভিয়েট রুশিয়াকে পর্যুদস্ত করা চাই; নচেৎ সমগ্র ইউরোপে সোভিয়েটের অনুকূল আবহাওয়া গড়িয়া উঠিতে কতক্ষণ?
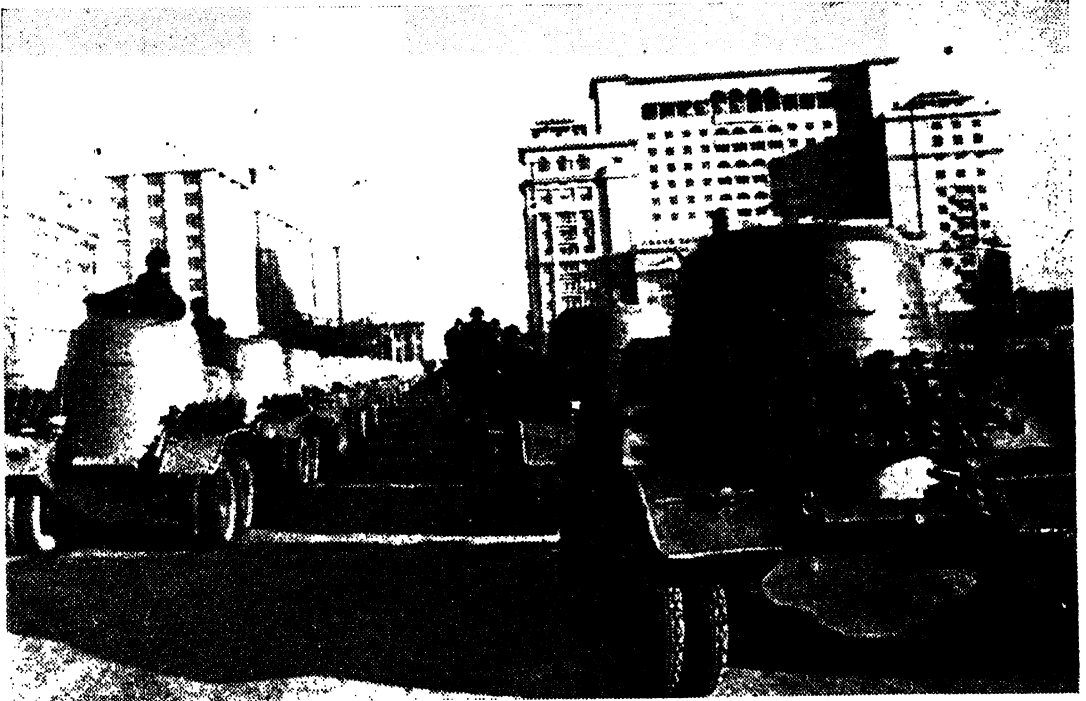
রুশিয়ার রাস্তায় শ্রেণীবদ্ধ সোভিয়েট ট্যাঙ্কবহর

উপলক্ষ্য করিয়া কত লোকই না একদিন বিজ্ঞের মত বলিয়াছিলেন গেল, গেল, সবই গেল। আদর্শচ্যুত হইয়া সোভিয়েট রুশিয়া এবার ফাসিস্তচক্রেই ভিড়িয়া পড়িল—অর্থাৎ নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ায় আর পার্থক্যই যেন বড় বিশেষ কিছু রহিল না। কিন্তু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে আদর্শচ্যুত না হইয়া ক্রমশ অবস্থার সুযোগ লইয়া তাঁহাদের লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এবার অতিশয় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার বহু পূর্ব হইতেই প্রায় সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থাকে সমরায়োজনে নিয়োজিত করিবার ফলে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ জীবনে যে দৌর্বল্য ও বিশৃঙ্খলা আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহারই সুযোগ লইয়া সোভিয়েট রুশিয়া ক্রমশ আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—এই আশঙ্কাতেই সে আজ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বসিয়াছে বা অভিযান করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা এই অভিযানের বিপদ যে কতখানি সে তাহা ভাল ভাবেই জানে এবং জানে বলিয়াই শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে এই সংঘর্ষ এড়াইতে।

সোভিয়েট-জার্মান সংঘর্ষের ফলে বর্তমান যুদ্ধে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। ইহার পরিসমাপ্তি যেখানে এবং যেভাবেই হোক, আদর্শগত পার্থক্য থাকিলেও আপাতত বৃটেন যে ইহা দ্বারা লাভবান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জার্মানীকে এখন দুই শত্রুর মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত থাকিবে কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ঘটনাচক্র অন্যভাবেও গড়াইতে পারে। কিন্তু তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিন জার্মানী যে সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে এমন মনে হয় না; কারণ, সামরিক বলে সোভিয়েট রুশিয়া জার্মানীর অপেক্ষা হীন ত নয়ই, বরঞ্চ কাহারও কাহারও মতে সে জার্মানীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যুদ্ধে জার্মানী ও রুশিয়ার সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমেই উভয় দেশের অর্থনীতি, শিল্প ও জনবলের কথা বলিতে হয়। শিল্প সম্পদে উভয় দেশ প্রায় সমকক্ষ হইলেও জনবল ও কাঁচামাল বেশী থাকার দরুণ

এ দিক দিয়া জার্মানী সোভিয়েট রুশিয়ার পশ্চাতে, কারণ জার্মানীতে খাদ্যের অভাব রহিয়াছে এবং শিল্পোপযোগী কাঁচা মালও তাহার কম। অথচ আধুনিক যুদ্ধে প্রচুর কাঁচা মালের প্রয়োজন। সোভিয়েট রুশিয়ার তাহা আছে। তদুপরি রুশিয়ার জনবলও বেশী। কাজেই শিল্পক্ষেত্রে সমকক্ষ হইলেও জনবল এবং কাঁচামাল বেশী থাকার দরুন সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক ভিত্তি অধিকতর দৃঢ় এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে সে সক্ষম। সোভিয়েট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ফলে তাহার সামরিক জীবনে এমন আমূল পরিবর্তন আসে, যাহার ফলে সমগ্র ইউরোপের পারস্পরিক সামরিক সম্পর্ক বদলাইয়া যায়।

অবশ্য অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হইলেই যে কোন দেশ সামরিক বলে শ্রেষ্ঠ হইবে এমন ধারণা করা ভুল; কারণ, বৃটেন ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও সমরায়োজনের দিক দিয়া তাহারা জার্মানীর পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। কাজেই যুদ্ধের জন্য চাই প্রস্তুতি। যুদ্ধে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগের জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়া না থাকিলে শত আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রচুর জনবল লইয়াও পরে সহজে কিছু করিয়া ওঠা যায় না। আধুনিক যুদ্ধে প্রথম দিকেই প্রয়োজন হয় যথেষ্ট সুশিক্ষিত সৈনিক এবং প্রচুর সমরোপকরণ। যুদ্ধের প্রারম্ভেই যথাসাধ্য শক্তি নিয়োজিত করিতে না পারিলে যুদ্ধের সময় শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ আজকাল বড় মিলে না। বর্তমান যুদ্ধের মুখে সামরিক বলে দুর্বল থাকিয়াও বৃটেন যে পরে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করিবার অবসর পাইয়াছে তাহা তাহার সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু বৃটেনের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ফ্রান্সের পক্ষে তাহা হয় নাই। অতি অল্পকালের মধ্যেই ফ্রান্সের পতন ঘটিয়াছে। গত মহাযুদ্ধেও কিন্তু সমর-সম্ভার বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ এবং অবসর যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলি পাইয়াছিল, কারণ ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধিলেও যথার্থ শক্তিশালী কামান, গোলা ও এরোপ্লেনের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল ১৯১৭-১৮ সালে। ১৯১৪ সালে একশত ডিভিশন জার্মান সেনার ২৫ শতের বেশী মেশিন গান ছিল না—আজকাল পাঁচ ডিভিসন জার্মান সেনারই প্রায় সেই সংখ্যক মেশিনগান থাকে। কাজেই তখনকার তুলনায় আজকাল অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন হইয়াছে—বর্তমানকালে প্রয়োজনের জন্য দেশের সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে সমরার্থক করিয়া না রাখিলে যুদ্ধকালে শক্তি সঞ্চয়ের অবসর ঘটে না। অতএব সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক শক্তির কথা বিবেচনা করিলে দেখিতে হইবে, গত কয় বৎসরে তাহার সমরপ্রস্তুতি কতখানি অগ্রসর হইয়াছে।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিশিষ্ট সমর বিশেষজ্ঞ স্মিয়েৎশিন্ বলিয়াছেনঃ—

"Modern weapons must be flung into the battle at once and in great numbers. They represent a force which must not be expended in driblets. In this sense there must be no 'economy' and no experiments in battle."

অর্থাৎ—আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে অবিলম্বে যুদ্ধে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেইগুলি সংখ্যায় প্রচুর হওয়া দরকার। ঐ গুলি এমন শক্তির আধার যাহা ছোট ছোট কিস্তিতে খরচ করিলে চলিবে না। অতএব যুদ্ধে 'ব্যয়সংকোচ' বা পরীক্ষা করিয়া দেখার অবসর নাই।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট রুশিয়ার আধুনিক সামরিক শক্তি এই নীতিকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। জার্মানীর ন্যায় সেও যুদ্ধের সময় যাহাতে অনতিবিলম্বে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা যায়, পূর্বাহ্নেই তেমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। সমরায়োজনও সে জার্মানীর পূর্বেই আরম্ভ করে। তাহার যত রিজার্ভ সৈন্য আছে, ইউরোপের আর কোন রাষ্ট্রেরই তত রিজার্ভ সৈন্য নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তাহার সুশিক্ষিত রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। তাহাদের অধিকাংশই অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালনায় সুনিপুণ। ইউরোপে সোভিয়েট রুশিয়ার মত সামরিক সম্পদরাশিও আর কাহারও নাই। তাহার উন্নত প্রণালীর শিল্প ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সমরশিল্প এবং সুপরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবই যুদ্ধের অনুকূল। এই সমস্তে মিলিয়া যুদ্ধশক্তিতে যে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে—শত্রুমিত্র অনেকের মুখ হইতেই তাহা প্রকাশ হইয়াছে।

লালফৌজের প্রধান নায়ক মার্শাল ভরশিলোফ

মেশিনগান দাগিবার মহড়ায় সোভিয়েট সৈন্য

ফ্রান্সের রক্ষণশীল দলের অন্যতম মুখপত্র "Revue des Deux Mondes"তে এক সময় লেখা হয়ঃ—

"The military strength of the Soviet Union represents a factor of decisive importance in the power relations of Europe."

অর্থাৎ—ইউরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে সামরিক সম্পর্ক নিরূপণ করিতে হইলে সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক বল অবশ্য ধর্তব্য।

উপরোক্ত পত্রিকাখানিতে মার্শাল পেতাঁ, জেনারেল ওয়েগাঁ,

জেনারেল দেকেলী প্রভৃতি ফ্রান্সের বিশিষ্ট সমরবিশারদগণ লিখিয়া থাকেন, কাজেই উহার মতামত হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

১৯৩২ সালে জাপ নৌদপ্তরের মুখপত্র "ইয়েস্"তে জাপ নৌ-বিভাগীয় প্রতিনিধি মিঃ মেহদী লিখেনঃ—

"It is not merely the great number of tanks which is important, but the fact that an enormous number of them are of the most modern types. The mechanisation of the Red Army astonishes all the foreign attaches who are present at its parades."

অর্থাৎ—কেবল যথেষ্ট সংখ্যক ট্যাঙ্ক আছে বলিলেই হইল না—বৈশিষ্ট্য এই যে, সেইগুলির অধিকাংশই হইল আধুনিক ধরণের ট্যাঙ্ক। সামরিক কুচকাওয়াজে যে সকল বিদেশী প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলেন লাল ফৌজের যন্ত্রসজ্জা তাঁহাদিগকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে।
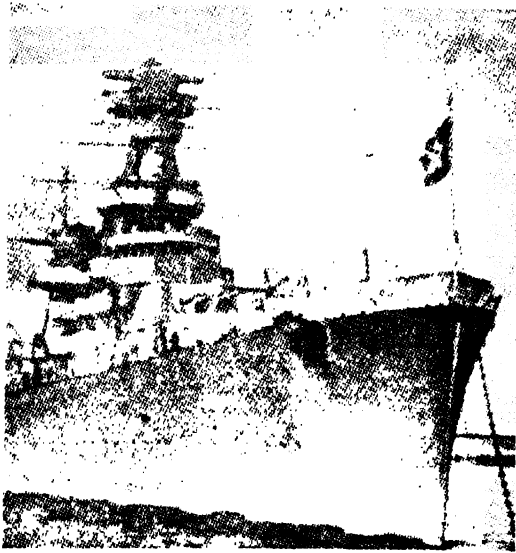
রুশিয়ার ক্রুজার কিরভ (৮০০০ টন)

শুধু ইহাই নয়। ১৯৩৪ সালে বিশিষ্ট সমর বিশেষজ্ঞ জেনারেল ব্যারেটিয়ার "টেম্পস্" পত্রিকায় লিখেনঃ—

"In the event of mobilisation the Red Army will prove a powerful weapon for victory. The Red Army possesses an even greater number of mechanised weapons than the best armies in Europe."

অর্থাৎ—যুদ্ধের জন্য ডাক পড়িলে লাল ফৌজ যুদ্ধ জয়ের পক্ষে একটি শক্তিশালী অস্ত্ররূপে আত্মপরিচয় দিবে। লাল ফৌজের মত এমন যন্ত্রসজ্জা ইউরোপের আর কোন শ্রেষ্ঠ সেনাদলেই নাই।"

১৯২৯ সালে যে লাল ফৌজের যন্ত্রসজ্জা আরম্ভ হইয়াছে, সোভিয়েট সমর নায়ক মার্শাল ভরোশিলফ ১৯৪১ সালে তাহাকে কোথায় আনিয়া ঠেকাইয়াছেন, আর কোটেসন কণ্টকিত না করিলেও বোধ হয় তাহার একটা অনুমান করা চলে। ১৯৩৩ সালে যেখানে সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১·৫ মিলিয়ার্ড রুবল, ১৯৩৮ সালে সেখানে তাহার সামরিক ব্যয়বরাদ্দ আসিয়া দাঁড়ায় ৩৪ মিলিয়ার্ড রুবলে অর্থাৎ ৬ বৎসরে তাহার সামরিক ব্যয় ২২ গুণ বাড়িয়া যায়। ১৯৩১—৩৪ সালে সে সামরিক প্রয়োজনে মোট খরচ করিয়াছে ৯ মিলিয়ার্ড রুবল—আর ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৮ সাল এই চারি বৎসরে সে একই প্রয়োজনে মোট খরচ করিয়াছে ৭৯ মিলিয়ার্ড রুবল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, গত কয় বৎসরে তাহার সামরিক বল কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্মানীও পূর্ণোদ্যমে সমরায়োজনে মন দেয় ১৯৩৫ সাল হইতেই। কাজেই দেখা যায়, জার্মানীর সহিত পাল্লা দিয়াই সোভিয়েট রুশিয়া তাহার সমরোপকরণ বৃদ্ধি করিয়াছে—বৃটেন বা ফ্রান্সের মত গড়িমসি চালে চলিয়া সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই।

সোভিয়েট রুশিয়া একদিকে যেমন সুশিক্ষিত সৈন্যসংখ্যা বাড়াইয়াছে অপরদিকে তেমনই প্রচুর পরিমাণে মারণাস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে, কারণ অস্ত্র না থাকিলে সৈন্য বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। ম্যাক্স বার্নার (ছদ্মনাম) তাঁহার The Military Strength of the Powers নামক পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ

"We may assume that in the years 1935-38 the Red Army doubled the number of modern weapons of offence at its disposal and that in 1937-38 it had between 15,000 and 20,000 tanks and over 10,000 aeroplanes."

অর্থাৎ—আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ১৯৩৫—৩৮ সালে লাল ফৌজ উহার আধুনিক মারণাস্ত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়াছে। ১৯৩৭—৩৮ সালে উহার বিমান সংখ্যা ১০ হাজার এবং ট্যাঙ্কের সংখ্যা ১৫ হাজার হইতে ২০ হাজারের মধ্যে।

তারপর জার্মানী কখনও আক্রমণ করিলে তাহা প্রতিরোধ এবং পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থাও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পশ্চিম সীমান্তে ভালভাবেই করিয়া রাখিয়াছেন। ম্যাক্স বার্নার তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ

"The military achievement of the Soviet Union in the years 1935-38 culminated in the formation of a powerful mobile shock army on its Western frontier, an army capable of delivering a rapid counter-blow."

অর্থাৎ—১৯৩৫—৩৮ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে সামরিক প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে, তাহার ফলে উহার পশ্চিম সীমান্তে দ্রুত পাল্টা ঘা দেওয়ার উপযোগী একটি শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন সেনাদল গড়িয়া ওঠে।

কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, কি শৈল্পিক প্রচেষ্টায় সর্বক্ষেত্রেই সোভিয়েট রুশিয়া সমরশিল্পকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছে; আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সে কখনও গাফিলতি করে নাই। ১৯২৮ সালে সোভিয়েট রুশিয়ার একখানি শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক পত্রিকায় লেখা হয়ঃ

"In drawing up our five-year economic plan we must pay great attention to the rapid development of those branches of our economic system in general and of our war industries in particular which will pay the main role in consolidating the defensive powers of our country and ensure economic stability in time of war. Industrialisation also means the development of our war industries."

অর্থাৎ—আমাদের অর্থনৈতিক পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক পদ্ধতির এমন সব শাখা, বিশেষত আমাদের সমরশিল্পের দ্রুত উন্নতির দিকে আমাদিগকে এমন ভাবে মন দিতে হইবে, যাহার ফলে আমাদের দেশরক্ষার ব্যবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় হইবে এবং যুদ্ধের সময় আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা অবিচলিত থাকিবে। শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির অর্থও হইল সমরশিল্পের উন্নতি।

তারপর ১৯৩৭ সালে জার্মান সমরদপ্তরের মুখপত্র "Borsen—Zeitung" পত্রিকায় লেখা হয়ঃ

(শেষাংশ ৪২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(২৪)

অবনীশের লিখিত পোস্টকার্ড পাঠ করিয়াই লাবণ্য এবং প্রশান্তর মন অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর হরিপদর নিকট হইতে এলাহাবাদ রওয়ানা হওয়ার টেলিগ্রাম আসার পর উৎকট দুশ্চিন্তায় এবং অশান্তিতে লাবণ্য বিহ্বল হইয়া পড়িল। আর্ত বিমূঢ়কণ্ঠে বলিল, "পোড়ারমুখী না মজিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না দেখছি! নিজেও মজলো, আমাদেরও মজালে! এখন কাল সকালে অবনীশ এসে দাঁড়ালে তাকে কি বলব বল দেখি!"

চিন্তিতমুখে প্রশান্ত বলিল, "বলবে, তোমার দাদার চিঠিতে অবনীশের আসা পাঁচ-ছ' দিন পেছিয়ে গেল জেনে সুলেখা তার এক বন্ধুর কাছে দিন দুত্তিনের জন্যে বেড়াতে গেছে।"

লাবণ্য বলিল, "তারপর যখন সে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় গেছে, কার সঙ্গে গেছে, তখন কি বলবে বল?"

"তখন বলতেই হবে, গৌরহরির সঙ্গে মির্জাপুরে গেছে।"

লাবণ্য বলিল, "মির্জাপুরে সুলেখার সন্ধান পেলেও মথুরা ত' কাল দশটার গাড়ির আগে ফিরছে না। অবনীশ যদি মির্জাপুরের কথা শুনেই সেখানকার ঠিকানা চেয়ে বসে, তাহ'লে কি বলবে তাকে?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "এ-সব গোলযোগের ভয় ত' আছেই। কিন্তু কি আর করা যাবে বল, যখন যেমন অবস্থা হবে, তাই বুঝে কাজ করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

আর্তকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "সে তুমি যা করতে হয় কর; আমি কিন্তু, অবনীশ যখন এখানে আসবে, কিছুতেই এ বাড়িতে থাকছি নে! কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যেখানে হয় একদিকে চ'লে যাব। আমাদের না ব'লে, না জানিয়ে আমাদের অজানা জায়গায় সুলেখা চ'লে গিয়েছে, আর গৌরহরি পরমাত্মীয় হ'য়ে তার অনুসরণ করেছে, এ কথা মানিয়ে-গুছিয়ে কোন রকমেই আমি অবনীশকে বলতে পারব না!"

বেদনায় এবং উত্তেজনায় লাবণ্যর দুই চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

লাবণ্যর কাতর অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া প্রশান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "এত বিচলিত হচ্ছ কেন লাবণ্য, চা খাওয়ার পর দু'জনে স্থির হ'য়ে ব'সে ভেবেচিন্তে একটা যা-হয় পরামর্শ স্থির করা যাবে অখন।"

কিন্তু পরামর্শ করা হইয়া উঠিল না। প্রশান্ত এবং লাবণ্যর চা-পান তখনো শেষ হয় নাই, এমন সময়ে সহসা বিনয় ও লতিকা বেড়াইতে আসিল। শুধু সেই পরামর্শটাই নহে, সুলেখার অনুপস্থিতির বিষয়ে অভ্যাগতদের নিকট কি বলা হইবে, সে পরামর্শটুকুরও সময় পাওয়া গেল না।

আহার কক্ষের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিনয় বলিল, "কি হচ্ছে বউদিদি? যদি অনুমতি করেন ত' দুজনে প্রবেশ করি।"

প্রশান্ত বলিল, "এস, এস। তোমাদের আবার অনুমতির কবে দরকার হয়?"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিনয় বলল, "দেখছ লতিকা, কি অব্যর্থ সন্ধান! হিসেব ক'রে ক'রে বাড়ি থেকে ঠিক এমন সময়টিতে বেরিয়েছি যে, এখানে একেবারে চা-পানের মধ্যে এসে হাজির! এই নিদারুণ শীতের দিনে শুধু চা খেয়েই নয়, চা খাওয়া দেখেও একটা আনন্দ পাওয়া যায়।"

প্রশান্ত বলিল, "বোস, বোস। শুধু দেখারই নয়, খাওয়ার আনন্দও তোমার পক্ষে দুর্লভ না হ'তে পারে।" বলিয়া চা ও খাবার দিবার জন্য পরিচারকের প্রতি ইঙ্গিত করিল।

চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লতিকা বলিল, "এর চেয়ে সোজা কথায় চেয়ে নেওয়া অনেক ভাল দাদা।"

তাহার পর চায়ের টেবিলে সুলেখার অনুপস্থিতি সহসা উপলব্ধি করিয়া লাবণ্যর দিকে চাহিয়া বলিল, "সুলেখা কোথায় দিদি?"

এই প্রশ্নের অপেক্ষায় লাবণ্য মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া ছিল; মৃদু গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "সে এখানে নেই।"

সবিস্ময়ে লতিকা বলিল, "এখানে নেই? তাহ'লে কোথায় আছেন তিনি? কলকাতায় চ'লে গেলেন নাকি?"

লতিকার প্রশ্নের উত্তর দিল প্রশান্ত; বলিল, "না, কলকাতায় যায় নি। অমলা পাল নামে তার এক বন্ধুর কাছে দু'-চার দিনের জন্যে বেড়াতে গেছে।"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "একটু ছেলেমানুষি করেছে সুলেখা। আজ খানিক আগে টেলিগ্রাম এল কাল সকালে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে অবনীশরা আসছে, আর আজ সকালে তুফান এক্সপ্রেসে সে চ'লে গেল।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বিনয় যেন আকাশ হইতে পড়িল; বলিল, "তুফান এক্সপ্রেসে চ'লে গেলেন? তাহ'লে এলাহাবাদের বাইরে নাকি?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, এলাহাবাদের বাইরে বই কি।"

"কোথায় দাদা?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশান্ত বলিল, "তা ঠিক বলতে পারি নে। হয় ত' মির্জাপুরে।"

প্রশান্তর উত্তর শুনিয়া মনে মনে যথেষ্ট পুলকিত

হইয়া বিনয় বলিল, "কেন? কোথায় যাচ্ছেন, তা' ব'লে যান নি না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "না।"

"তাহ'লে কি ক'রে মনে করছেন, মির্জাপুরে?"

একটু ইতস্তত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "যাবার সময়ে তার দিদিকে একটা চিঠি লিখে গেছে, তা থেকে সেই রকমই মনে হয়।"

আর অধিক প্রশ্ন করা অনুচিত হইবে বলিয়া বিনয় মনে করিল। ব্যাপারটা অভিনয় না হইয়া সত্য ঘটনা হইলে মার্জিত রুচির অনুরোধে ইহার পূর্বেই বিরত হইবার কথা; তথাপি অভিনয়েরই প্রয়োজন স্মরণ করিয়া আর একটা প্রশ্ন তাহাকে করিতে হইল; বলিল, "কার সঙ্গে গেছেন?"

কি বলিবে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "গৌরহরির সঙ্গে গেছে।"

বিনয় আর কোন প্রশ্ন করিল না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। তাহার পর মৌন ভঙ্গ করিল লাবণ্য; রুদ্ধ ব্যথিত স্বরে সে ডাকিল, "ঠাকুরপো!"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "বলুন বউদিদি!"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া লাবণ্য বলিল, "অবনীশ তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু?"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, খুব অন্তরঙ্গ।"

"তাহ'লে তার ওপর তোমার খানিকটা জোর খাটে?"

বিনয় বলিল, "খানিকটা নয়, অনেকটা।"

"তোমার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ ঠাকুরপো, অবনীশ যাতে সুলেখাকে সহজে ক্ষমা করতে পারে, তার সাহায্য তুমি কোরো। শালী ব'লে সুলেখার এই আচরণকে তোমার দাদা ছেলেমানুষি বলছিলেন; আমি কিন্তু তা বলিনে।"

বিনয় বলিল, "আপনার অনুরোধ আমি আদেশের মত ক'রে পালন করব। কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সুলেখা দেবী কি কাল অবনীশ আসছে জেনে আজ সকালে বন্ধুর কাছে গেছেন?"

লাবণ্য বলিল, "না, সে কথা জেনে যায় নি। বরং অবনীশদের আসা পাঁচ-ছ' দিন পেছিয়ে গেছে জেনেই গেছে।"

বিনয় বলিল, "তাহ'লে আমি কিন্তু তাঁর আচরণকে ছেলেমানুষিও বলিনে। অবনীশের আসা কয়েকদিন পেছিয়ে যাওয়ায় তিনি যদি ইত্যবসরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকেন, তাহ'লে এমন কিছু গর্হিত কাজ করেছেন ব'লে আমি মনে করি নে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, শুধু যদি এইটুকুই হ'ত, তাহ'লে আমিও মনে করতাম না, কিন্তু সব কথা ত' খুলে বলা যায় না! মুখে বলিল, "তুমি যেমন মনে করছ ঠাকুরপো, অবনীশও কি তেমনি মনে করবে?"

বিনয় বলিল, "যতদূর তাকে জানি, তাতে ত' করবে ব'লেই মনে হয়। তবে বিয়ের পর কোন কোন লোকের কিছু কিছু মত পরিবর্তন হ'তেও দেখা যায়, বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের পরস্পরের মতিগতি সম্বন্ধে।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল।

প্রশান্ত বলিল, "এ বিষয়ে তোমার কি কিছু আত্মদর্শন আছে বিনয়?"

বিনয় বলিল, "সে কথার মীমাংসা করতে হ'লে লতিকাকে সাক্ষী তলব করতে হয় দাদা।" বলিয়া লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সুলেখার কথা শুনিয়া এবং লাবণ্যর অবস্থা দেখিয়া লতিকার মন যথেষ্ট ভারি হইয়াছিল; সে এই পরিহাসে যোগ দিতে পারিল না।

ক্ষণকাল কথোপকথনের পর স্থির হইল, পরদিন প্রাতে অবনীশ ও হরিপদকে নামাইয়া লইবার জন্য প্রশান্ত ও বিনয় স্টেশনে উপস্থিত থাকিবে।

বিনয় বলিল, "কিন্তু বউদিদি, আপনিও স্টেশনে গেলে ভাল হ'ত।"

মিনতিপূর্ণকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "না, ঠাকুরপো, আমাকে তুমি স্টেশনে যেতে বল না। স্টেশনে আমার পাশে সুলেখাকে না দেখে সে কি ভাববে বল দেখি?"

বিনয় বলিল, "আপনি শুধু আপনার নিজের পাশের কথাই ভাবছেন; কিন্তু আর একজনের পাশে আপনাকে না দেখে অবনীশ কি ভাববে, সে কথা আপনি একেবারেই ভাবছেন না।"

লাবণ্য বলিল, "তা সে যাই ভাবুক না কেন, স্টেশনে আমি কিছুতেই যেতে পারব না ঠাকুরপো। বাড়িতে, তার কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব ভেবে বাড়ি ছেড়েই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।"

প্রশান্ত বলিল, "থাক্ বিনয়। তোমাতে আমাতে গেলেই হবে। লাবণ্যর যখন অত অনিচ্ছে, তখন গিয়ে কাজ নেই।"

আর অধিক বিলম্ব না করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য বিনয় ও লতিকা উঠিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল, "কাল স্টেশন থেকে অবনীশের সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে যেও ঠাকুরপো।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা।"

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লাবণ্য বলিল, "তুমিও যদি সেই সময়ে এখানে উপস্থিত থাক লতিকা, তাহ'লে ভাল হয় ভাই।"

লতিকা বলিল, "নিশ্চয় থাকব।"

স্টেশনে যাইবার পথে লতিকাকে লাবণ্যর নিকট নামাইয়া দিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিনয় লতিকাকে লইয়া প্রস্থান করিল। (ক্রমশ)

জীবতত্ত্বে তর্কের ঝড়

ভাস্করাচার্য

ডারুইনের মোট কথাটা তবে দাঁড়াল এই যে, বহুকাল ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন বিবর্তনের ফলে প্রাণবস্তু থেকে জীবের উৎপত্তি হ'য়েছে এবং ঐ একই বিবর্তনের ফলে অতি সামান্য সামান্য রূপান্তর হ'তে হ'তে প্রজাতির মহা মহীরুহ দেখা দিয়েছে। বিবর্তন অবিচ্ছিন্ন, রূপান্তর অচ্ছেদ্য এবং নব নব প্রজাতির উৎপত্তি অপ্রতিহত। এরই মধ্যে একদিন লেমার জাতীয় এক প্রজাতির উদ্ভব হ'ল; তারই একশাখা গেল বানরে, একশাখা এল নরে।

প্রাণবস্তু কিভাবে উদ্ভূত হ'ল এ তত্ত্ব নিয়ে ডারুইন কোন প্রশ্ন করেন নি। প্রজাতির রকমারিই তাঁর তত্ত্ব কথার সূত্রপাত; তাইতেই "প্রজাতির উৎপত্তি"র কথা তিনি অবতারণা করেছেন। রকম ভেদের কারণটা তিনি স্পষ্ট বলতে পারেন নি এবং এ কথা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন; কিভাবে রকম ভেদটা হ'চ্ছে তাই তিনি দেখাতে চেষ্টা পেয়েছেন। সে প্রণালীর মধ্যে স্থিতির লড়াই ও প্রাকৃতিক নির্বাচন জীবতত্ত্বে প্রবাদ বাক্যের মত চালু হ'য়ে গেছে।

ডারুইনের মতে অতি সামান্য সামান্য পরিবর্তন সঞ্চিত হ'য়ে যখন স্তূপীকৃত হয় তখন আর তাকে মূল আকৃতি থেকে চেনা যায় না—মূল থেকে সে হ'য়ে পড়ে পৃথক্; তখন তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার ক'রতে হয়। বাস্তবিক পরিবর্তন ও রূপান্তর যদি না হবে তবে পৃথিবীতে আজও সেই আদি রূপ যে অ্যামিবা তারই রাজত্ব চ'লত—মাছ থেকে মানুষ কারুরই দেখা পাওয়া যেত না।

পিতা থেকে সন্তানের আকৃতি (প্রকৃতি?) পৃথক্ হয়। কিন্তু সন্তানের এ পার্থক্য যে কেবল সুবিধেরই হবে এমন কোন কথা নেই। এ পার্থক্য সন্তানের পক্ষে বিপুল অন্তরায় হ'তে পারে। যদি সুবিধে হয়, তবে সন্তানের স্থিতির সংগ্রামে অধিকতর শক্তিমান হবে এবং অন্তত অনুরূপ সন্তানের জন্ম দেবে। তার মানে দাদুর চাইতে নাতি অনেকাংশেই হবে পৃথক এবং আরও দাপটে রাজত্ব চালিয়ে যাবে। আর যদি পিতা থেকে সন্তানের পার্থক্য সন্তানের পক্ষে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে তবে সে সন্তান নিস্তেজ তো হবেই তার বংশধারাও লুপ্ত হ'তে পারে; অন্তত তার হাত থেকে রাজদণ্ড তো যাবেই।

বড় কথা হ'চ্ছে বিনাশোত্তীর্ণ হওয়া এবং এই বিনাশোত্তীর্ণ হওয়াটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন। এইচ জি ওয়েলস ডারুইনের ব্যবহৃত চরম শব্দ—survival of the fittest—**সর্বাধিক** উপযুক্তের বিনাশোত্তীর্ণ পরিবর্তন ক'রে fitter **'অপেক্ষাকৃত'** শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। প্রস্তাবটা যুক্তিহীন নয়। সর্বাধিক শব্দটি শীর্ষস্থানীয় এবং একান্তভাবে একটিকে বোঝায়। কিন্তু বাস্তব সংসারে এককের স্থানই কেবল নয়—বহুর সমাবেশ আছে। অথচ এতে ডারুইনের মূলতত্ত্বের কোন হানি হয় না।

এই পরিবর্তনের জন্য ডারুইনকে তাই অনেকখানি দৈবের উপর নির্ভর ক'রতে হ'য়েছে। পরিবর্তন বা রকমভেদটা দৈব। দৈবানুগ্রহে (ভগবানানুগ্রহে নয়) একবার যে পরিবর্তন সূচিত হ'ল, তাই কালক্রমে ও পুরুষানুক্রমে স্পষ্টতর হ'তে লাগল। এভাবে প্রাচীন আকৃতির মধ্যেই নবতর আকৃতির উদ্ভব হ'চ্ছে।

ডারুইনের মৃত্যুর পর 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রস্তাবের একটা উল্লেখযোগ্য সংশোধনী এসেছে। একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তানের আকৃতিগত পার্থক্য ও পরিবর্তন এক জিনিস; আর সমগ্র প্রজাতির পরিবর্তন ও রূপান্তর পৃথক্ জিনিস। সন্তানের আকৃতিগত তারতম্যই প্রজাতির তারতম্য নয়। পাঁচ ছেলে পাঁচ রকম কিন্তু তাতে পাঁচটা প্রজাতির সৃষ্টি হয় না—প্রজাতির পরিবর্তন একটা এবং একমুখীই হয়। দুটো কথা দাঁড়ায়ঃ ব্যষ্টিগত তারতম্য আর প্রজাতির রূপান্তর। ব্যষ্টিগত তারতম্য বিবর্তনের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। প্রজাতির রূপান্তর মৌলিক, অবিচ্ছিন্ন, বংশানুক্রমিক এবং সেটা শুরু হয় প্রজাতির বীজে। বীজের এই রূপান্তর জীবে প্রবর্তিত হ'লে তা হবে প্রজাতির রূপান্তর এবং তা যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের চালুনি দিয়ে গলে যেতে পারে, তবে পুরুষানুক্রমে এ রূপান্তর হস্তান্তরিত হ'তে থাকবে।

আমরা ব'লেছি রকমভেদ কেন হয় তার জবাব ডারুইন দেন নি এবং এই ফাঁক দিয়েই বহু দার্শনিক তত্ত্ব এসে ঢুকে পড়েছে; কেননা এর যে কোন একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ওপরই ভগবানকে ছাড়ব না রাখব তা নির্ভর ক'রছে; তত্ত্বের রকমারি সত্ত্বেও এ দুটোর একটাতে যোগ দিতে হবেই। এই ফুটো দিয়েই নীৎশের অতিক্রান্তির ইচ্ছা প্রবেশ ক'রেছে, বেরিয়েছে বেয়র্গ্‌সঁ'র প্রাণপ্রবাহ।

হেকেল খুব বেশী হ'য়ে ডারুইনের তত্ত্বে সায় দিয়েছিলেন। তাঁর "বিশ্বের রহস্য" বইয়ে তিনি একথার উল্লেখ ক'রে ব'লেছেনঃ

চল্লিশ বছর আগে চার্লস ডারুইন যখন বিবর্তনবাদ প্রয়োগ ক'রলেন তখন মনস্তত্ত্ব ও জীবতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের পরিপুষ্টির পক্ষে একটি নূতন ও উর্বর যুগের সূচনা হ'ল। তাঁর যুগান্তকারী "প্রজাতির উৎপত্তি"তে জন্তুদের সহজ জ্ঞান যে অন্যান্য মৌলিক প্রণালীর মতই ঐতিহাসিক ও সর্বজনীন নিয়মের অধীন তার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। কোন একটা বিশেষ প্রজাতি সবিশেষ সংস্কার-সংস্কৃতির ফলেই পরিপুষ্ট হ'য়েছে এবং তাতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত হ'য়েছে। তাদের গঠনে ও সংরক্ষণে এবং অন্যান্য আঙ্গিক আচরণের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন যে ক্রিয়া ক'রে থাকে এখানেও সেই ক্রিয়া। ডারুইন এ তত্ত্বটি বহু প্রকার গবেষণায় জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন, মানসিক বিবর্তনের একই নিয়ম সমগ্র দেহীজীব জগতে ক্রিয়াশীল। মানব বা জান্তব জগতে এর ব্যতিক্রম নেই; এমন কি, গাছপালার পক্ষেও সেই কথা। সমস্ত জীবের একই উৎপত্তিতে দেহী জগতের যে একত্বের

আভাস পাওয়া যায়, তা সমগ্র আত্মিক জীবনেও সত্য—অনাড়ম্বর একীকোষ জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত কেউ বাদ পড়ে না।

মানুষের ধৃতিমূলক চিন্তা ও গ্রন্থন তার নিকটতম জ্ঞাতিপশুর ধৃতিহীন ও কল্পনাশূন্য স্তর থেকে ক্রমশ পুষ্ট হ'য়েছে। যুক্তি, কথা, বিবেক ইত্যাদি মানুষের সর্বোচ্চ মানসিক শক্তি মানুষের পূর্বপুরুষ বানর বা বানর সদৃশ জন্তুর নিম্নতর মনোবৃত্তির উন্নতি মাত্র। মানুষের এমন কোন একটা বৃত্তিও নেই যা তার একান্ত নিজস্ব। তার মানসিক জীবনের ধারা ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি পশুর চাইতে পৃথক্—কিন্তু সে পাথক্য শুধু মাত্রায় রকমে নয়, শুধু সংখ্যায় গুণে নয়।

হেকেলের এই সমর্থন আমাদের সেই রকমভেদের কারণানুসন্ধানে মোটেও সাহায্য করে না।

জীববিবর্তনে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যামার্ক যে তত্ত্বটি দিয়েছেন সেটি ডারুইনের তত্ত্বকে পুরোপুরি বদ্‌লে না দিয়েও এমন রঙ্ দিতে চায় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিযোগী-দার্শনিক প্রশ্ন তাতে না জেগেই পারে না। তিনি বলেন, প্রজাতির যে রকমভেদ হয় তার কারণ পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রজাতির পরিবর্তিত পরিবেষ্টনীর উপযোগী নয়া অভ্যাস। নয়া অভ্যাসে কোন এক বিশেষ অঙ্গের নবতর ব্যবহার। স্বভাবতই কোন কোন অঙ্গ অব্যান্তর হ'য়ে পড়ে। এভাবে ক্রমশ জীবটির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, লাভ ক্ষতির একটা পৃথক্ খতিয়ান রচিত হয়। ল্যামার্কের মতে এই খতিয়ানের হিসাবটাই সন্তানে বর্তায়। তাঁর মতে গলা বাড়াবার প্রয়োজন না হ'লে জিরাফের গলা লম্বা হ'ত না; অর্থাৎ অভ্যাস-অনভ্যাসের ফলটা সন্তানে পায়।

কথাটা ভাববার। কেননা আমরা যে গ্রহে বাস ক'রছি, তার খবর আমরা জানি যে এ গ্রহ চিরকাল এমন ছিলও না, থাকছেও না। আমার পায়ের নীচের মাটীই যদি অস্থির থাকে তবে আমি স্থির থাক্‌ব কি ক'রে। অপসৃয়মান মাটীই আমাকে অস্থির ক'রে তুল্‌বে, আমি তাল সাম্‌লাতে চেষ্টা করব। আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, মোটা লেপ শীতকালে আরামপ্রদ ও অপরিহার্য হ'লেও গরমকালে গায়ে চাপালে তাই হ'য়ে ওঠে প্রাণান্তকর। ড্যাম্প লাগ্‌লে দে'য়ালে একরকম শ্যাওলা থেকে শুরু ক'রে উইয়ের আবির্ভাব হয়। এমন নয় যে, সারাটা শীত গর্তে পড়ে' থেকে গ্রীষ্মবর্ষাটায় সাপ বেরোলো। বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন বীজাণু বা জীবাণুর উদ্ভব হয়। তাই যদি হবে সেই বরফের দিন জীবের এই রকমভেদের এমন বিস্তীর্ণ অবসর ছিল না—যা ছিল [illegible] একান্ত পৃথক। মাটীর স্তর বদলাচ্ছে, ভৌগোলিক [illegible]নের পরিবর্তন (সমুদ্র থেকে মরুভূমি) হ'চ্ছে, সময় ও [illegible] মত বহু প্রজাতির জন্ম ও লয় হ'য়েছে। আপাত-[illegible] একথাই যেন সত্য মনে হয় যে, পরিবেষ্টনীর সঙ্গে [illegible]াপ খাওয়াতে পারে নি তারাই লুপ্ত হ'য়েছে।

মনে হয়, সত্যি, ডারুইনের তত্ত্বে এখানে বেশ খানিকটা ফাঁক থেকে গেছে। তিনি বলেছেন, জীবের সঙ্গে জীবের সম্পর্কটা সর্বাগ্রগণ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা গৌণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব'ল্‌তে ডারুইন ঠিক কি বুঝেছেন বোঝা যায় না। এটা বোঝা যায় যে, তিনি জীবকে পারিপার্শ্বিক অবস্থিতি থেকে বাদ দিয়েছেন। জীবের সঙ্গে জীবের লড়াই যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থিতির বাইরে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু আমি যখন রামের সম্পর্কে যাচ্ছি তখন রাম কি আমার অন্তর্গত, না আমার বাইরের জগতের? যদি আমরা অভিন্ন-হৃদয় হই তাহ'লে রামের সম্পর্কে আমার যাওয়ার কোন মানে হয় না; তাই রামকে পৃথক্ জেনেই যাচ্ছি। তাই যদি হয়, তাহ'লে আমার বাইরেকার জগৎটা আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থিতি; তার ভেতর রামও আছে। সমগ্র পদার্থজগতের মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত। দ্বৈতবাদে আমার অহংই ক'রেছে আমাকে জগৎ থেকে পৃথক্, কথাটা তা নয়; দ্বৈতাবস্থাই আমার অহংকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এই আমি আর আমার বাইরেকার জগৎ, এদের পারস্পরিক আদানপ্রদান, আন্তঃক্রিয়াই জীবন। জীবন স্থাবির নয়, প্রবাহই এর মূল কথা। বাইরের জগৎ যেখানে নেই সেখানে যোগপ্রক্রিয়ায় আমি নিরুদ্ধ থাক্‌তে পারি, কিন্তু জীবন ব'লে সেখানে কিছু নেই। নেহাৎ আঙ্গিক সম্পর্ক। জীবন যেখানে নেই সেখানে জীবতত্ত্বও নেই; জীবতত্ত্ব এই বাইরের জগৎকে না মেনেই পারে না। মানে, তাহ'লে আমা থেকে পৃথক্ যা' কিছু তাই আমার বাইরের জগৎ; আমি এখানে দেহী জীব; আমার দেহই এখানে সম্পর্কের মূল আধার। অতএব আমার সম্পর্ক মানে আমার জীবদেহের সম্পর্ক। জগৎ না থাক্‌লে যদি আমি নিষ্ক্রিয় হই, তবে জগৎই আমাকে উত্তেজিত বা কর্মরত করে। সেদিক থেকে জগৎই উদ্বোদ্ধা; এর প্রভাবই আমার ওপর প্রাথমিক। আমার প্রতিক্রিয়া গৌণ, অনুসৃত ও পরিণতি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হ'চ্ছে, আমিও পরিবর্তিত হ'চ্ছি। আরও যে সব "আমি" আছে তারাও ঐ নিয়ম মেনে চল্‌ছে। অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফলে আমার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘট্‌ছে, আমি রূপান্তরিত হ'চ্ছি। আমার রূপান্তর আমার সন্তানে হস্তান্তরিত ক'রছি। আমার সঙ্গে অন্য "আমি"র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'চ্ছে; প্রবল দুর্বলকে মেরে প্রবলের অস্তিত্ব কায়েম করছে। এভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর আকৃতি ও প্রকৃতির জীব দেখা যাচ্ছে।

ল্যামার্কের মতে পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনীর সঙ্গে জীব যে তাকে মানিয়ে নেয়, সেটা সজ্ঞানেই ক'রে। এই সজ্ঞান প্রচেষ্টা থেকেই জীব বা জীবদেহে পরিবর্তন ঘটে। ল্যামার্কের শিষ্যেরা বলেন, জীবদেহের পরিবর্তনটা অজ্ঞানকৃত। ল্যামার্কের শিষ্যেরা বলেন, সমস্ত ব্যাপারের উৎপত্তিটা পরিবেষ্টনীর পরিবর্তনে। জীব মানিয়ে নিতে পার্‌লে বাঁচল, না হয়তো মর্‌ল।

আমাদের মতে পরিবর্তনটা যখন সর্বজনীন তখন জীব বা জীবের পরিবেষ্টনী কেউই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়;

পরিবর্তনটাই প্রথম ও চিরন্তন নিয়ম। এক এই পরিবর্তনের নিয়মটারই কোন পরিবর্তন নেই। সমগ্র জগৎকে দু' ভাগ ক'রে ফেললে জীব আর তার পরিবেষ্টনীকে পাই। পরিবর্তনটা পারস্পরিক অসামঞ্জস্য মাত্র। জীবের এই সক্রিয় ভাবটি উল্লেখযোগ্য। জীবের পরিবেষ্টনী জীবের ওপর ক্রিয়া করে; জীব জীবন্ত ব'লে তার ভেতরেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়; সে তার পরিবেষ্টনীর উপর প্রত্যাঘাত করে; পরিবেষ্টনী যায় বদ্‌লে; সেই পরিবর্তিত পরিবেষ্টনী আবার জীবের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রতে চায়। আমরা তাই ব'লেছিলাম এই আন্তঃক্রিয়াই জীবন। পরিবেষ্টনী—ক্রিয়া—জীব; জীব—ক্রিয়া—পরিবেষ্টনী।

যাই হোক্, ল্যামার্ক আর ডারুইনের মধ্যে একটা সাধারণ ভূমি আছে; তা' হ'চ্ছে, প্রজাতির রকমভেদই অ্যামিবা থেকে মানুষকে পৃথক্ করবার কারণ। এই রকমভেদেই পাওয়া যাবে প্রাণপুষ্টির ও মানুষাকৃতির উদ্ভব কারণ; পাওয়া যাবে কি ক'রে মনোজগতের বিবর্তন হ'ল।

অধ্যাপক হ্যালডেন জীবকে পদার্থ-রসায়ন-যন্ত্রের ঊর্ধে দেখ্‌তে চান। প্রথমত, উপযুক্ত আকৃতি ও গঠন পাবার জন্য জীবের মধ্যে একটা অন্তঃপ্রেরণা এবং আদর্শ উপলব্ধির পর তাকে রক্ষা ক'রবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে কার্যক্রমের জন্য উপযোগী পরিবেষ্টনী সৃষ্টি ও তা রক্ষার একটা অনুরূপ প্রেরণা প্রকাশ পায়।

কাঁকড়ার পা ভেঙে ফেলে দিলে, আবার পা গজাবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। ভ্রূণের আকৃতিহীন কোষাবস্থায় জার্মান জীবতাত্ত্বিক ড্রিস তাকে কেটে দু' ভাগ ক'রেছিলেন। দুটো টুক্‌রোই সম্পূর্ণ দুটো ভ্রূণে পরিণত হ'য়েছিল। যন্ত্রের নিয়ম এখানে হার মানে। ফলে, ড্রিস জীবকে একটা অন্তঃপ্রেরণার বাহন ব'লে স্থির ক'রেছেন। উপযোগী পরিবেষ্টনী সৃষ্টি ও রক্ষার অন্তঃপ্রেরণার উদাহরণও তাঁরা দিয়েছেন।

এঁদের উপসংহারটা দাঁড়ায় এই যে, ব্যাপারটা মোটেই একতরফা নয়, দু'রতফা। যন্ত্র থেকে জীবজগতের পার্থক্য এখানেই। কেবল পরিবেষ্টনীর প্রভাব ও ক্রিয়াই সব কিছু নয়। পরিবেষ্টনী যেমন জীবদেহ (মন)কে তার ছাঁচে তৈরী ক'রতে চায় এবং করে; জীবও তেমনি পরিবেষ্টনীকে আপন ছাঁচে ঢাল্‌তে চায়। কাজেই জীবতত্ত্বকে বুঝ্‌তে হ'লে সমগ্রটাকে বুঝ্‌তে হবে; জীব ও তার পরিবেষ্টনী নিয়েই সমগ্র; এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা এতই অচ্ছেদ্য যে, একটাকে ছেড়ে আর একটাকে বুঝ্‌তে গেলেই গোলমাল।

ঠিক এইখানটাতেই ডায়লেক্‌টিক্সের দরকার। হাত পা কান নাক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক জায়গায় স্তূপীকৃত ক'র্‌লে দেহের মোট সমষ্টি সংখ্যা ঠিক হ'লেও তা কেবলই মৃত অঙ্ক—মোট সংখ্যা মাত্র—সমগ্র মানুষ নয়। মানুষ কেবল তখনই যখন এদের পারস্পরিক সম্পর্ক চালু অবস্থায় একটা সমগ্রের সৃষ্টি ক'রবে। মোট সংখ্যা আর সমগ্রের মধ্যে এই তফাৎ; যন্ত্র ও জীবের মধ্যে এই পার্থক্য। তেমনি জীব প্লাস পরিবেষ্টনীর যোগফল বা মোটসংখ্যাটাই বড় কথা নয়—বড় কথা এদের আন্তঃক্রিয়া এবং সেই আন্তঃক্রিয়াই সমগ্র। সেই আন্তঃক্রিয়াই জীবন।

দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা ক'রে বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁ জীবতত্ত্বের ওপর সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোকপাত ক'রতে চেয়েছেন। ল্যামার্ক ব'লেছেন জীব কেবলই পরিবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁ তারই প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, তাই যদি সত্য হবে তবে বিবর্তন বন্ধ হয় নি কেন? দেহকে মানিয়ে নেয়াই যদি একমাত্র সত্য হয় তবে বিবর্তনের ফলে এমন অনেক দেহীজীব লুপ্ত হ'য়েছে যারা বর্তমানে জীবের চাইতে ঢের বেশী শক্ত ও সমর্থ ছিল। মানুষের চাইতে কচ্ছপ বা হাতী বেশী বাঁচে; ছাগলের যক্ষ্মা বা জন্তুদের হার্ণিয়া হয় না। শীত থেকে বাঁচতে পশুর চাম বা লোমই মানুষের আশ্রয় হ'য়ে পড়ে। কেবলমাত্র মানিয়ে চলাই যদি নিয়ম হ'ত তবে তো অমন কোন একটা জন্তুতে এসেই বিবর্তন থেমে যেতে পার্‌ত। মানুষের মত দুর্বল প্রাণীর সৃষ্টি ক'রে এ বিড়ম্বনা কেন?

বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁ এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্নিবার উপসংহারে পৌঁছে বল্‌ছেনঃ—এই দুর্গম পথাতিক্রম দেখে মনে হয়, বিবর্তন কোন একটা শক্তির বিকাশ মাত্র; সে শক্তি আপেক্ষিক নিরাপত্তাকে গ্রাহ্য করে না। সে কোন একটা উচ্চতর উপলব্ধির অভিযানে বেরিয়েছে।

যেন কুমোরের পুতুল গড়ার নেতি নেতি ভাব। একটা তৈরী ক'রে উহুঁ ঠিক হ'ল না ব'লে ফেলে দিচ্ছে। এমনি ক'রে অ্যামিবা থেকে ম্যামথ, ম্যামথ ফেলে মানুষ। যা পড়ে আছে তা উচ্ছিষ্ট। এদের সব্বাইকে পেছনে ফেলে এই প্রবাহ চ'লেছে অপ্রতিহত। তাই বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁ'র জিজ্ঞাসা হ'য়েছে কাব্য এবং জীবনকে প্রবাহের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌তে গিয়ে বস্তুকে ক'রেছেন মায়াময়। বস্তু আমাদের অহং বুদ্ধির সৃষ্টি। অহংকে ছাড়িয়ে উপলব্ধির স্তরে না গেলে সেই অদৃশ্য প্রবাহকে জানা যায় না, অর্থাৎ যুক্তি সেখানে অচল। যুক্তি যে অচল একথাও বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁকে যুক্তি দিয়ে বা বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝাতে হয়েছে। তাতে তিনি যুক্তি বা বুদ্ধিকেই আবার প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। জীবতত্ত্বের দিক থেকে বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁ'র মত হ'চ্ছেঃ—

Life does not proceed by the association and addition of elements, but by dissociation and division.

দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'র্‌লেও বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁ'র প্রশ্নগুলো উল্লেখযোগ্য; কেননা, মূর্তবাদের বিরুদ্ধে মনবাদীরা কতদিক থেকে কত রকমের আক্রমণ ক'[রে]ছেন তা' তলিয়ে না দেখলেই নয়। সেদিক থেকে [ম]নবাদী বেয়্‌র্গ্‌স্‌ঁ'র প্রতিষ্ঠা অসাধারণ।

কই
তব
সেই
যে এক

আজ-কাল

ঢাকার দাঙ্গা

ঢাকার দাঙ্গা এক মাসেরও উপর বন্ধ ছিল। গত ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার রাত্রিতে তা' আবার আরম্ভ হয়েছে এবং খুব গুরুতর আকার ধারণ করেছে। যতদূর জানা গেছে তাতে দাঙ্গা সূত্রপাতের অজুহাত অতি সামান্য—একজন পকেটমারকে [illegible]তে ধরে মারপিট করা থেকে নাকি এই শোচনীয় ব্যাপারের সূচনা। দাঙ্গা অবশ্য প্রায়ই সামান্য কারণ থেকেই হয়। কারণ দাঙ্গাতে কারণটা বড় নয়, মনোভাবটাই বড়। এবার দাঙ্গার ফলেও একদিকে যেমন প্রচুর সম্পত্তিহানি হচ্ছে, তেমনি লোক নিহত-আহতও হচ্ছে বহু। ১লা জুলাই মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট ২২জন নিহত ও ৫২জন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে একজন পুলিশ কনেস্টবলও আছে। এই দাঙ্গা সম্পর্কে পুলিশকে ২১৩ বার গুলী চালাতে হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা একজন পুলিশ কনেস্টবলের রাইফেল কেড়ে নিয়েছে। তারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও একদল পুলিশকেও আক্রমণ করেছিল বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। সমস্ত শহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে। কিন্তু দাঙ্গার প্রকোপ হ্রাসের কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নি। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই অবস্থার গুরুত্ব বোঝা যাবে। পারস্পরিক দোষ অনুসন্ধানের সময় এ নয় এখন প্রয়োজন সকলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উপায় উদ্ভাবনের। এই আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটাবার কল্যাণকর পথ উদ্ভাবনের দায়িত্ব উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদেরই নয় কি?

শ্রীযুক্ত মুন্সীর কংগ্রেস ত্যাগ

বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রী কে. এম মুন্সী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। গান্ধীজী শ্রীভোগীলাল লালার নিকট এক পত্রে লেখেন যে, যে সব কংগ্রেসকর্মী হিংসভাবে প্রতিরোধ করবার পক্ষপাতী, তাঁদের কংগ্রেস ত্যাগ করে নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা মত কাজ করতে হবে। তা ছাড়া হিংসভাবে বাধা দেওয়ার কৌশল যে সব ব্যায়ামশালায় শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গেও কোন কংগ্রেসকর্মী সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। শ্রীযুক্ত মুন্সী এই সব বিধিনিষেধ মেনে চলতে অক্ষম বলে জানিয়েছেন এবং কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন—"যদি প্রাণ, ধর্মস্থান, গৃহ ও নারীর সম্মান গুণ্ডাদের হাতে বিপন্ন হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্যে যে কোনভাবেই হোক না কেন, তাতে বাধা দেওয়া আমি সবচেয়ে বড় কর্তব্য বলে মনে করি।" খবর পাওয়া গেছে দিল্লীর কংগ্রেসকর্মী পণ্ডিত ইন্দ্রও অনুরূপ কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। গান্ধীজীর অহিংসার এই সব কড়াকড়ি সর্তে বিশ্বাসী কংগ্রেস সভ্য কতজন আছেন জানি না। "পশম বাছতে কম্বল উজাড়" হবে না তো? সে যাই হ'ক, অহিংসার চালুনীতে কংগ্রেসকে যেভাবে ছাঁকা হচ্ছে তাতে আশঙ্কা হয়, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত একটা "সাধু সঙ্ঘে" পরিণত না হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য

শান্তিনিকেতন থেকে খবর পাওয়া গেছে, গত কয়েকদিন থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রত্যহই জ্বর হচ্ছে, ক্রমেই বেশী দুর্বল হয়ে পড়ছেন। পুষ্টিকর পথ্যাদি খেতে পারছেন না। তিনি এখন শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন। কবি পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠুন এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ভারতের ভাগ্য

মিঃ সোরেনসেন কমন্স সভায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যুদ্ধের পর ভারতের শাসনকর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতে স্থানান্তরিত করা হবে, এইরকম যে একটা প্রস্তাব হয়েছে, তার সঙ্গে শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত বা অন্য কোনরূপ রাজনীতিক প্রস্তাব করা হয়েছে কি না। আর ঐসব ব্যাপার সম্পর্কে শীগ্‌গির কোন আলোচনা আরম্ভ হবে কি না। মিঃ আমেরী সাফ জবাব দিয়েছেন, প্রশ্নের প্রথমভাগে যে প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে, এমন কোন নূতন প্রস্তাবই করা হয় নি, কাজেই শেষাংশের জবাব নিষ্প্রয়োজন। কথাগুলো আমাদের কাছে মোটেই নতুন নয়, তবে শুনতে হয় নতুন করে এই যা দুঃখ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের মৃত্যু

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস (অবসর প্রাপ্ত) গত ২৫শে জুন বুধবার ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। গত তিন মাস তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। তিনি অনেক জনহিতকর কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি" তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

উদারনীতিক দলের বিখ্যাত নেতা ও এলাহাবাদের "লীডার" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি ১লা জুলাই মঙ্গলবার বিকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬১ বৎসর বয়স হয়েছিল। সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনায় তাঁর অসাধারণ নিপুণতা ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

আন্তর্জাতিক

রুশ-জার্মান সমর

রুশ-জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সোভিয়েট ইস্তাহার ও "রয়টারের" মারফৎ যুদ্ধের খবর আমরা পাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু জার্মানির সরকারী বক্তব্য শোনবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকদিন হয় নি। এরূপ নীরবতা অবশ্য জার্মান-প্রথা নয়। কাজেই জার্মান সরকারী ইস্তাহারের মর্ম জানবার জন্য খানিকটা ব্যগ্রতা স্বভাবতই হওয়া সম্ভব। তা ছাড়া অন্য কারণও ছিল। যুদ্ধের অবস্থা বুঝতে হলে দু'পক্ষের কথাই শোনার প্রয়োজন আছে। অবশেষে ২৮শে জুন (যুদ্ধারম্ভের সপ্তম দিনে) ফুয়েহ্বারের হেড কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হয় যে, পরদিন তাঁরা "পূর্ব রণাঙ্গনের মহান সাফল্যের" বিবরণ প্রকাশ করবেন। এই সরকারী ইস্তাহার দিনপঞ্জিকার আকারে লেখা আর তার মোটামুটি বক্তব্য হল—প্রথম দিনের যুদ্ধেই সোভিয়েট বিমান ধ্বংস হয় ১৮১১ খানা আর জার্মান বিমান নষ্ট হয় ৩৫ খানা। দ্বিতীয় দিনে বিধ্বস্ত সোভিয়েট বিমানের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২৫৮২তে। দ্বিতীয় দিনে কোন জার্মান বিমান ধ্বংসের কথা ইস্তাহারে নেই। ঐদিন গ্রড্‌নো দুর্গও জার্মানরা অধিকার করে। তৃতীয় দিনে অধিকৃত হয় ব্রেস্ট লিটভস্ক দুর্গ আর ভিলনা এবং কভ্‌নো। চতুর্থ দিবস পর্যন্ত ১২৯৭টি সোভিয়েট ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়েছে। জার্মান ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়েছে কি না তার কোন উল্লেখ নেই।

পঞ্চম দিনে জার্মানরা ডুইনা নদী পার হয়, ডুভনাবুর্গ শহর দখল করে, পূর্ব-বাল্টিক সাগরে ৪টা সোভিয়েট ডেস্ট্রয়ার, ১টা টর্পেডো বোট, ১টা সাবমেরিন ধ্বংস করে। তারপর ২৭শে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ষ্ঠ দিবস পর্যন্ত যে মোট হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, অভিযানের প্রথম কয়দিনেই ৪০ হাজারেরও বেশী রুশ সৈন্য বন্দী হয়েছে, ৪৬খানি বিরাট আকারের ট্যাঙ্কসহ ২২৩৩টি সোভিয়েট ট্যাঙ্ক হস্তগত করেছে এবং প্রথম সাত দিনে ৪১০৭টি সোভিয়েট বিমান ধ্বংস হয়েছে। জার্মান বন্দীর ও ট্যাঙ্ক ধ্বংসের কোন সংবাদ দেওয়া হয় নি। অন্যান্য অঞ্চলের যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা কথা থাকলেও বেসারেবিয়া অঞ্চলের যুদ্ধের যে কি ফলাফল সে সম্বন্ধে ইস্তাহার নীরব। বিয়ালিস্টকের পূর্ব অঞ্চলে তারা দুটো রুশ সৈন্যদলকে বেষ্টন করেছে এ দাবীও তারা করেছে। ঐ দিনের জার্মান নিউজ এজেন্সী জানিয়েছেন, জার্মানরা মিনস্ক দখল করে মস্কোর দিকে যাত্রা করেছে।

এর প্রতিবাদে সোভিয়েট ইনফরমেশন বোর্ড একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তাতে তাঁরা বলেন, যুদ্ধের প্রথম সাত দিনে ২ হাজারের বেশী সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও ৬০০ কামান হস্তগত বা ধ্বংস করার কথা জার্মানরা প্রচার করেছেন। ৪ হাজারের বেশী সোভিয়েট বিমান ধ্বংসের এবং ৪০ হাজার লাল ফৌজের সৈন্য বন্দী করার কথা তাঁরা বলেছেন। আর বলেছেন ঐ সময়ে তাদের ধ্বংস হয়েছে মাত্র ১৫০টি বিমান। তাদের ট্যাঙ্ক ও কামান কত নষ্ট হয়েছে এবং কত বন্দী তাদের হয়েছে সে সবন্ধে তাঁরা একেবারে নীরব। সোভিয়েট ইস্তাহারে মন্তব্য করা হয়েছে—"এ রকম নির্জলা মিথ্যা আর *হামবড়াইপণার প্রতিবাদ করতেও আমাদের ইচ্ছা যায় না।" তাঁরা বলেন যে, সাতদিনের যুদ্ধে জার্মানরা কমপক্ষে ২৫০০ ট্যাঙ্ক আর ১৫০০ বিমান হারিয়েছে। তাদের সৈন্য বন্দী হয়েছে ৩০ হাজারের বেশী। ঐ সময়ে সোভিয়েট রুশের নষ্ট হয়েছে ৮৫০টি বিমান আর প্রায় ৯০০ ট্যাঙ্ক, তা ছাড়া তাদের সৈন্য নিখোঁজ হয়েছে পনের হাজার।* জার্মানদের বিয়ালিস্টক, গ্রোড্‌নো, ব্রেস্ট, ভিলনা আর কোভনো দখলের দাবী তাঁরা স্বীকার করেছেন, কিন্তু বলেছেন যে. জার্মানরা যুদ্ধ ঘোষণা না করেই অকস্মাৎ আক্রমণ করাতে সোভিয়েট সৈন্যদল তৃতীয়-চতুর্থ দিনের আগে সীমান্তে পে'ছিতে পারেনি বলে এরূপ হয়েছে। ট্যাঙ্ককামান-বিহীন সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জার্মানরা ঐগুলো দখল করেছে। তাঁরা আরও বলেছেন লাল ফৌজ সব জায়গায়ই জার্মান সৈন্যদের দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করছে।

দু'পক্ষের ইস্তাহারে দাবীর সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতার বিষয়-গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই—ইস্তাহারগুলো পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবুও একটা কথা আমরা না বলে পারছি না। তা'হল এই যে, মাত্র দেড়শ জার্মান বিমান খুইয়ে যদি চার হাজারের বেশী সোভিয়েট বিমান ধ্বংস করা হয়ে থাকে তবে বলতেই হবে সোভিয়েট বিমানগুলো ছিল কাগজের তৈরী।

যা হ'ক যে খবর পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় এক মিনস্ক অঞ্চল ছাড়া ১৫০০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রের আর কোন অঞ্চলে জার্মানরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারে নি। বেসারেবিয়া অঞ্চলে জার্মান বাহিনীর আক্রমণ সোভিয়েট সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করেছে। সোভিয়েট বোমা বর্ষণের ফলে বুখারেস্ট থেকে রুমানিয়ার রাজধানী অপসারিত হয়েছে। জার্মানরা লেনিনগ্রাডে প্রবল বোমাবর্ষণ করেছে এবং অপরদিকে কনস্টাঞ্জা, গালাঞ্জ আর প্লোয়েটিতে সোভিয়েট বিমান থেকে প্রচুর বোমা বর্ষিত হয়েছে। জার্মানদের মিনস্ক দখলের দাবী সোভিয়েট রুশিয়া স্বীকার করে নি। মুরমানস্ক অঞ্চলেও প্রবল যুদ্ধ হচ্ছে বলে' সংবাদ পাওয়া গেছে। ১লা জুলাইয়ের এক ইস্তাহারে জার্মানরা দাবী করেছে যে, তারা লুক দখল করেছে। ৩০শে জুন মস্কোতে প্রথম বিমান আক্রমণ সংকেতধ্বনি করা হয়েছিল। কিন্তু কোন বোমা বর্ষণের খবর পাওয়া যায় নি।

যুদ্ধের এখন আরম্ভ মাত্র। তা ছাড়া বিনা নোটিশে আকস্মিক আক্রমণ করার সুযোগ জার্মানরা পেয়েছে। কাজেই কোথাও কোথাও স্বভাবতই তাদের সাফল্য হওয়া সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধের গতি থেকে এ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সোভিয়েট বাহিনী প্রবলভাবে তাদের বাধা দিচ্ছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রুশ দখলের যে স্বপ্ন জার্মানি দেখেছিল তা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

প্যাডেরিউস্কির মৃত্যু

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত সংগীতাচার্য ও রাজনীতিক নেতা প্যাডে-রিউস্কি গত ৩০শে জুন নিমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। শেষ জীবনে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে' কালিফোর্নিয়াতে সংগীতচর্চা করতেন। সংগীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর স্থান খুব উচ্চে ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ছিল।

জাপান ও সোভিয়েট

সোভিয়েট সম্পর্কে জাপানের মনোভাব এখনও ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। জাপ গভর্নমেণ্ট জাপ নারী ও শিশুদের মস্কো ত্যাগ করতে আদেশ দিয়েছেন আর জাপানী সামরিক মিশন ইতালী ও জার্মানিতে যাত্রা করেছে সত্য, কিন্তু অনেকে মনে করছেন যে, জার্মানির পূর্বাভিমুখী অভিযান জাপানকে ভাবিয়ে তুলেছে। এক্সিস চক্রের বাইরে চলে আসাও তার পক্ষে অসম্ভব নয় বলে' কেউ কেউ বলছেন এবং তার সঙ্গে যুক্তিসংগতভাবেই মাৎসুওকার পদত্যাগের কথা বলছেন। চীন সমস্যা-বিব্রত জাপান প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েট বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হবে বলে মনে হয় না।

টুকরো সংবাদ

ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আর ফিন সৈন্যেরা প্রবলভাবে রুশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়ছে বলে সংবাদ এসেছে।

ইতালি, হাঙ্গারী, আলবেনিয়া, শ্লোভাকিয়া রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বীরত্ব বটে! কিন্তু প্রভুর হুকুম তামিল না করে উপায় কি?

সুইডিস সরকার সুইডেনের মধ্য দিয়ে জার্মান সৈন্য চলাচলের অনুমতি দিয়েছেন।

ভূতপূর্ব ফরাসী প্রধান সেনাপতি গ্যামেলাঁ বন্দিশালা থেকে পলায়ন করেছেন বলে এক সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ভিসি গভর্নমেণ্ট সে সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন।

আঙ্কারাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত ফন প্যাপেন তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্মান সৈন্যের পথ ছেড়ে দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন বলে' রয়টারের কূটনীতিক সংবাদদাতা খবর দিয়েছেন। কিন্তু লণ্ডন থেকে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় নি।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ মস্কোতে ফিরে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ সামরিক মিশন মস্কোতে গিয়েছে। স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে মঃ মলোটোভের সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয়েছে। আলোচনার বিবরণ এখনও কিছু জানা যায় নি।

ভিসি গভর্নমেণ্ট রুশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, নাৎসী অনুরাগী সেনর সুনেরের চেষ্টায় যদি স্পেনও যুদ্ধে ভিড়ে পড়ে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

২-৭-৪১ —শ্রীবিষ্ণুশর্মা

উত্তরায়—'মায়ের প্রাণ'

এম পি প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্র 'মায়ের প্রাণ'। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া। শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী ও গান। সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীঅনুপম ঘটক। প্রধান ভূমিকা-গুলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া, রাজলক্ষ্মী, স্বর্ণা, সরযূ প্রভৃতি।

কুমারী জীবনের একটি প্রগল্‌ভ ভ্রান্তির বশে, কপট প্রেমের আহ্বানে আত্মসমর্পণ করিয়া নীলার দেহশোণিতে মাতৃত্বের ডাক আসিয়া পৌঁছিল। যাহাকে সে দয়িত ভাবিয়া ভুল করিয়াছিল, সেই পুরুষের নিষ্ঠুরতার কাছে সকল নিষ্ফল আবেদনের দুঃখ লইয়া ও আশ্রয়লাভের আশা বিসর্জন দিয়া নীলাকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। প্রথম আরম্ভ হইল ভিখারিণীর জীবন, তাহার সকল গ্লানি, অপমান, দৈন্য ও রিক্ততার সহিত সংগ্রাম করিয়া শিশুকে মানুষরূপে গড়িয়া তোলার কর্তব্য। কিন্তু শিশুর প্রাণ মায়ের সামর্থ্যের উপর ভর করিয়া আর থাকিতে চাহিল না। দৈন্য মোচনের উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অদৃষ্টের স্রোতে নামিয়া গেল—নীলা রূপোপজীবিনী হইল। ভিখারিণী নীলা, নীলা বাঈজী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার পূর্বে এই দূষিত ভবিষ্যৎ হইতে তাহার শিশুর মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিবার জন্য নীলা একদিন শিশুকে একটি ভোজনশালার বাহিরে কোন একটি মোটরগাড়িতে রাখিয়া চলিয়া আসিল। সতীশ হঠাৎ পথে প্রতীক্ষারত এক নির্জন মোটরগাড়িতে শিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে তুলিয়া লয়। শিশুর মাতার কোন খোঁজ না পাওয়াতে, অগত্যা সেই স্বয়ং শিশুর পালক পিতা হইয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘ ছয় বৎসর পর সতীশ ফিল্ম ব্যবসায়ী হইয়াছে, 'মাতৃস্নেহ' ছবিতে মায়ের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সুযোগ্য অভিনেত্রী খুঁজিতেছে। হিরোইন খুঁজিতে গিয়া সতীশকে অবশেষে 'অসাধারণ' বাঈজী নীলার শরণাপন্ন হইতে হইল। মায়ের ভূমিকায় নীলার অভিনয় দেখিয়া সতীশ বিস্মিত হয়। তা ছাড়া নীলার সান্নিধ্য ক্রমে অন্তরঙ্গতা ও তারপর প্রণয়ে পরিণত হয়। নীলা তাহার বিগত জীবনের কাহিনী সতীশের কাছে খুলিয়া বলিল। নীলা জানিল সতীশের পালিত খোকাই তাহার সন্তান। এদিকে সতীশের মা চিন্তিত হইয়া সতীশের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন এবং ব্যর্থ হইয়া ক্ষোভে কাশীবাসের সংকল্প করিলেন। নীলা তাহার পুত্রের কাছে তাহার বর্তমান পরিচয় লইয়া মাতৃত্বের দাবী আর করিল না। সে ছবিতে 'খোকার মা' হইয়াই তৃপ্ত থাকিল। সতীশের মায়ের সঙ্গে নীলাও কাশী যাইবার সংকল্প করিল।

বিদায়ের দিন ঘটিল একটি ট্রাজেডি। স্টুডিওতে অগ্নিকাণ্ড। 'মাতৃস্নেহ' পুড়িয়া যাইতেছে; নীলা নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ছবির রিলগুলি স্টুডিওর বাহিরে নিরাপদ স্থানে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু নীলা নিজে পুড়িল। মাতৃস্নেহের পরিচয় ছবির বুকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

ইহাই 'মায়ের প্রাণের' আখ্যান বস্তু। আখ্যানের মধ্যে কোথাও আর্টিষ্টের হাত নাই। সাইকোলজির ধার দিয়াও গল্প ঘেঁসে নাই। উৎকট কষ্টকল্পনা এবং সস্তায় কতকগুলি অঘটন ঘটাইয়া কাহিনীটি রচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সংলাপের ভাষা নিতান্ত দুর্বল ও রূঢ় হইয়াছে। এই ধরণের সংলাপের ভাষা লইয়া যোগ্যতম অভিনেতাকেও নাট্যরস জমাইতে গলদঘর্ম হইতে হয়।

আখ্যান বস্তুর বিচার করিলে অভিনেতাদিগের কৃতিত্বে ত্রুটি নাই বলিতে হয়। এই কাহিনীকে যেভাবে বলা সম্ভব, সেইভাবেই তাঁহারা বলিয়াছেন। সতীশের ভূমিকায় শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয় ভাল হয় নাই, মন্দও হয় নাই। নীলার ভূমিকায় সরযূ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে।

মাঝে মাঝে নিতান্ত বিসদৃশ কতকগুলি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে। পার্কে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট বিমর্ষ সতীশের মুখে হঠাৎ বন্ধু কর্তৃক 'ওরে ও বেকার' বলিয়া [illegible] করা দর্শকের রুচির পক্ষে যেমনই এক দুঃসহ ব্যাপার। কোন রেস্টুরাণ্টে তরুণীদের বিশ্রম্ভালাপের জন্য প্রাইভেট কামরা পাওয়া যায় কি না, এই বিজ্ঞাপন নায়ক-নায়িকার কথোপকথনের ভিতর ঘোষণা করিয়া দেওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। একটি স্টুডিওর রূপ ছবিতে প্রকাশ করিতে গিয়া এক ডজন Clownish কর্মচারীর সমাবেশ কি সার্থকতা আনিয়াছে, বুঝিতে পারা গেল না। ইঁহাদের অভিনয়ও স্থূল ও মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে।

প্রধান ভূমিকাগুলির অভিনয় ভালই হইয়াছে। শব্দ, আলোক প্রভৃতির যান্ত্রিক সংযোজনাগুলি ত্রুটিহীন হইয়াছে বলিতে হইবে।

রঙ্গজগতের রঙ্গ

ঘুরঘুট্টি আঁধিয়ার। ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধের অশরীরি প্রেতাত্মা বাহিনী বুঝিবা কলিকাতা শহরে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। আকাশে জলদদল, জাপানী এরোপ্লেন চমু সাজিয়া কাল আস্তরণে আত্মগোপন করিয়া সদম্ভে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের জলদ গম্ভীর নিনাদে চলিতে চলিতে চমকিয়া উঠিতেছি। 'অথির বিজুরী' শূর্পনখা বেশে বিকট দন্তবিকাশ করিতেছে।

বৈষ্ণব কবিরা এহেন সময়ে, এহেন পথে বাহির হইতেন বিরহ যামিনী উপলব্ধি করিতে; কিন্তু অকবি আমাকে বাহির হইতে হইয়াছিল মিলনের বোঝাটিকে টানিয়া।

Blackout-এর রাত্রি। চলিতেছিলাম রসা রোড বাহিয়া। থির বিজুরীর আবাস 'বিজলী' উদ্দেশে। আঁধারে পদাঙ্ক না চিনিয়াও অনুসরণ করিতেছিলেন আমারই গজগামিনী প্রিয়া। কোঁচার খুটে ও চাবিবিলম্বিত আঁচলে পুরাতন গাঁট-ছড়া দৃঢ়ভাবে বাঁধা রহিয়াছে। চাঁদিনী রচনা প্রয়াসিনী রাস্তার বাতি-গুলি নাকে মুখে ঠুলি আঁটা মিশরীয়া বোরকাধারিণীদের মত মিটমিটে চোখে পিট্ পিট্ করিয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানিতেছিল।

ঘোরা তমসায় বঙ্গশ্রীদের জীবন আচ্ছন্ন। পুরুষ জাতির নাৎসীবৎ অত্যাচারে সে জীবন জর্জরিত—ঝর্ঝরিত। এই দুর্বিসহ জীবনের অভিশাপ হইতে খানিকক্ষণের জন্য কাঁদিয়া মুক্তি পাইবার অভিপ্রায়; ভামিনী গোঁসাখানায় গিয়া খুঁট্ ধরিয়াছিলেন —অদ্যই মৃত্যুর গ্রাহস্পর্শে শুদ্ধ 'শাপমুক্তি' তাহাকে দর্শাইতে হইবেই—নতুবা—? .....

চলিতেছিলাম—দুই বাহু দিয়া জমাট্ অন্ধকার ঠেলিয়া। Light post গুলিতে কপাল ঠুকিয়া ঠুকিয়া। চলিতে চলিতে মাঝপথে কেমন্ করিয়া যে গাঁট-ছড়া খুলিয়া গেল, বুঝিলাম না। তাড়াতাড়ি খুলিয়া-যাওয়া আঁচলখানি ফিরিয়া পাইবার অভিপ্রায়ে পিছনে হাত বাড়াইলাম। মিলিয়া গেল—আঁচলের বদলে নোয়া-ধারিতা সুডৌল হাতখানা।

কিন্তু? একটু যেন বেশী স্বল্পালঙ্কৃতা! ......হয়তো বা জীবনের খেদে অলঙ্কাররাজী গৃহেই খুলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়াছেন। গুণ্ডার ভয়ে কদাপি নহে।

সে সুডৌল করপরশে—আজিকার এই আঁধার নিশায়—জাগিয়া উঠিল বিবাহিত জীবনপথে চলার সেই প্রথম প্রেমের স্মৃতি।

মিটমিটে আলোর পিটপিটে চাহনীর নীচে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছি, হঠাৎ পিছন হইতে কোমল কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ! এ কণ্ঠ গৃহিণীর নহে। কাল বোর্‌কা পড়া মিশরীয়ানীরও নহে। ফিরিয়া দেখি—মাথায় ঘোমটা নাই, মুখে বোরখা নাই, চোখে বর্ষীয়সী গৃহিণীর ঝাঁঝ নাই, মিশরিয়ানীর স্নিগ্ধ জ্যোছনাও নাই, আছে তরুণীর ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি।

গৃহিণীর তরুণী বয়সের সহিত আদল রহিলেও, ইনি আমার গৃহিণী নহেন, ইনি কিশোরী।

ইংরেজ বাহাদুর সহায়! তাই Blackout ছিল। তাই ভিড় জমিবার পূর্বেই আঁধারে গা ঢাকা দিতে পারিলাম।

কিন্তু গৃহিণীর কি হইল? ঐ গজবপু কোন্ কোণে লুকাইল? ......ভাবিতে ভাবিতে ছুটিতেছি, এহেন কালে কোথা হইতে লুইস গানের ধ্বনিতরঙ্গ কানে আসিয়া বিঁধিল—

'মর্ মিন্সে! ঢং দেখো। রাস্তার মাঝে শুয়ে পড়েছেন! ওঠ!'

সে ধ্বনি অনুসরণ করিয়া চলিলাম! অহো! নিকটে গিয়া কি দেখিলাম!—দেখিলাম, মহিষমর্দিনী এক শায়িত কৃষ্ণ বৃষের কর্ণ আকর্ষণ করিয়া বেচারাকে দাঁড় করাইবার কোশিশ করিতেছেন। ধন্য রে বৃষভপুঙ্গব! তুই-ই আজ আমাকে রক্ষা করিলি!

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি—আগাইয়া যাইব, না এই দৃষ্টিভ্রম বজায় রাখিয়া সরিয়া পড়িব।

আচমকা কাঁধে একখানা হাতের কঙ্কাল আসিয়া পড়িল। আঁধার হইলেও ভূতের ভয়! গগনভেদী একটা কাতর আওয়াজ আমার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া পলাইল। গৃহিণী সচকিতে ফিরিয়া তাকাইলেন, দ্রুত নিকটে আসিয়া সুচারুরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কাঁসা দিয়া বাঁধানো গলায় হাস্য করিয়া উঠিলেন—কহিলেন, 'আঃ পোড়াকপাল! তুমি হেথা! আমি ভাবছিনু—মিন্সে রাস্তায় ঢং ক'রে পড়ে কেন গা!'

গৃহিণীর কাংস্যধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই পিছন হইতে এক ত্রিলোক বিকম্পিত ভূতুড়ে হাসি।

—হেঁ—হেঁ—হেঁ—!......

হাসিয়াছিল মদনা পাগলা। দিগম্বর বেশে, কৃষ্ণ-বৃষাসনে বসিয়া গঞ্জিকাধূমে শ্মশানেশ্বরের আরাধনা করিবার কালে মদীয় গৃহিণীর হুঙ্কারে আসন পরিত্যাগ করিয়া কোন এক স্তম্ভের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল।

আঁধারে মুখ না দেখা গেলেও, সে হাসি শুনিয়া গৃহিণী তিন হাত ঘোমটা টানিয়া ফেলিলেন। নবরস অবতার পাগলা মদনা করজোড়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ করিয়া কহিল—'জয় মা চণ্ডী গো! তোমায় একটা মজার খবর শুনাই মা! তোমার ঐ রুদ্র দৃষ্টি স্নিগ্ধ হবে মা!'

অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই মদনা বকিয়া চলিল—'জান গো মা দুর্গে! শীলা-জ্যোতির কালীঘাটের হাঁড়িকাঠে অপূর্ব পরিণয়!' কিন্তু অভাগা মদনা, গৃহিণী প্রসন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার তর্জনে ঊর্ধ্বের মেঘগর্জন সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

ভ্যালা! মজার খবর! (আমাকে উদ্দেশ করিয়া) পুরুষ জাতটাই অমনি বেইমান! হাঁড়িকাঠ! হাঁড়িকাঠে চড়েছে ছোঁড়ার আগের পক্ষের কচি বৌটা।

কিন্তু মদনা নাছোড়বান্দা। মা চণ্ডীর দৃষ্টি সে সুপ্রসন্ন করিবেই। মজার খবর, গোপন খবর, ফেল মারিয়া গেল—কুছ পরোয়া নেই।

নানা রসের খবর তাহার stock-এ জমা আছে। যেমন—সাংঘাতিক খবর—পি এন রায় নিউ থিয়েটার্স হইতে ছুটি লইয়াছেন। কিন্তু পি এন রায় আমাদের অফিসের বড়সাহেব নহেন যে গৃহিণীর মানসিক পরিবর্তন ঘটিবে।

সাংঘাতিক খবরটা প্যাকাটির মত ভাঙ্গিয়া যাইতেই মদনা উদ্ভট খবর আমদানী করিল—

'Light করবার সময়—সাধনা বসুর duplicate set-এ দাঁড়িয়ে lighting খায়।'

এতক্ষণে যেন গিন্নী একটু মেজাজান্তর হইলেন—'এ্যা পাগলা বলে কি গা! সাধনা বোস সেটে দু প্লেট লাটিম খান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লাটিম কেউ খায় গা!'

মদনাকে পাগলা বলায় সে বিষম বিক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—'আমার প্রাণে দাগা দিলে মা! 'মায়ের প্রাণে' কটা মৃত্যু আছে, তা শুনিয়ে তোমার প্রাণেও আমি দাগা দেব মা! ছেড়ে দেব নি—

মদনাকে আর সে খবর শুনাইতে হইল না, তৎপূর্বেই গৃহিণী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে আমার খাঁদুরে!

পনের বৎসর আগে দেড় মাসের খাঁদু আমার কোলে চড়িয়া কেওড়াতলা শ্মশানে গিয়া শুইয়াছিল। আজ পুনরায় 'মায়ের প্রাণ' তাঁহাকে স্মরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি আমায় টানিয়া লইয়া গৃহাভিমুখীন হইলেন। 'শাপমুক্তি' দেখিয়া পয়সা খরচ করিয়া কাঁদিবার প্রয়োজন তাঁহার আর নাই।

—দূরবীণ
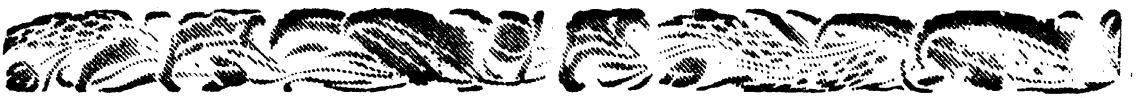
কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সকল খেলা শেষ হইবে।

প্রথম ডিভিসনে মহমেডান স্পোর্টিং দল যে চ্যাম্পিয়ান হইবে সে বিষয় আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এই দলটি এই পর্যন্ত কোন খেলাতেই পরাজিত হয় নাই। অবশিষ্ট যে সাতটি খেলা আছে তাহার একটিতেও পরাজিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি একটি অথবা দুইটি খেলাতেও পরাজিত হয় তাহা হইলেও এই দলকে চ্যাম্পিয়ানশিপ হইতে কোন দল বঞ্চিত করিতে পারিবে না। লীগের সূচনায় এই দল যেরূপ খেলিতেছিল বর্তমানে সেইরূপ খেলিতে না পারিলেও এই দল লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহনবাগান দল অপেক্ষা এখনও পাঁচ পয়েণ্ট অগ্রগামী আছে। সুতরাং এই পাঁচ পয়েণ্টের ব্যবধান এই দলের চ্যাম্পিয়ানশিপের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। মোহন-বাগান দলের রানার্স আপ হইবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় এই দল যেরূপ নৈরাশ্যজনক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে শেষ পর্যন্ত এই সম্মানলাভ মোহনবাগান দলের পক্ষে সম্ভব হইবে কি না ইহাও বলা কঠিন। কারণ ইস্টবেঙ্গল দলের রানার্স আপ হইবার সম্ভাবনা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ইস্টবেঙ্গল দল একটি খেলা কম খেলিয়া ৪ পয়েণ্টে মোহনবাগান দলের পশ্চাতে পড়িয়াছে। এই চারিটি পয়েণ্ট মোহনবাগান দল যে অবশিষ্ট ৬টি খেলায় হারাইবে না এবং ইস্টবেঙ্গল দল যে অবশিষ্ট ৭টি খেলায় উক্ত পয়েণ্টের ব্যবধান অতিক্রম করিবে না ইহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। এই দুই দলের সকল খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানার্স আপ কোন্ দল হইবে এখনও বলা যায় না।

এরিয়ান্স দল লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার সূচনায় যে অবস্থায় ছিল বর্তমানে তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছে। এই দল লীগ তালিকায় শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থান অধিকার করিবে বলিয়া মনে হয়। ভবানীপুর ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলা পুনরায় নৈরাশ্যজনক হইতেছে। এই দুইটি দল খেলায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন না করিলে লীগ তালিকায় যে স্থানে অবস্থান করিতেছে সেই স্থানেই থাকিবে। কালীঘাট দলের খেলা পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইতেছে। তবে এই দল লীগ তালিকায় যে স্থানে আছে তাহা হইতে অধিক উন্নততর স্থান শেষ পর্যন্ত পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

রেঞ্জার্স ও পুলিশ দল লীগ তালিকার মধ্যভাগেই অবস্থান করিবে। এই দুইটি দলের খেলা পূর্বাপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে। ক্যালকাটা ও নর্থ স্ট্যাফোর্ডস সৈনিক দল লীগ তালিকার সর্বনিম্ন স্থান দুইটির জন্য এই পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ইহারা এই দুইটি স্থানেই অবস্থান করিবে এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। নিম্নে প্রথম ডিভিসন লীগ খেলার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান

	খেঃ	জ	ড্র	প	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
মহমেডান	১৯	১৮	১	০	৭৪	৬	৩৭
মোহনবাগান	২০	১৪	৪	২	৩১	১২	৩২
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১২	৪	৩	৩৩	১২	২৮
রেঞ্জার্স	১৮	৭	৭	৪	২৩	১২	২১
পুলিশ	১৮	৯	৩	৬	২০	১৩	২১
এরিয়ান্স	১৯	১০	১	৮	২৯	২৫	২১
কাস্টমস	১৯	৫	৮	৬	১৯	২৫	১৮
ই বি আর	১৯	৬	৫	৮	২৯	২৬	১৭
ভবানীপুর	১৯	৬	৫	৮	১৬	২১	১৭
স্পোর্টিং ইউঃ	২০	৫	৭	৮	১৪	২১	১৭
কালীঘাট	১৯	৫	৪	১০	১৭	৩১	১৪
ডালহৌসী	১৯	৪	৩	১২	১৬	৩৩	১১
ক্যালকাটা	২১	৩	৩	১৫	১২	৪১	৯
নর্থ স্ট্যাফোর্ডস	২১	২	৩	১৬	২০	৪৯	৭

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ

দ্বিতীয় ডিভিসনে অরোরা ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া ধারণা। এই দল ১৫টি খেলিয়া ২৩ পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়াছে। ইহার পরবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছে ট্রপিক্যাল স্কুল। তবে এই দল ১৭টি খেলিয়া ২২ পয়েণ্ট পাইয়াছে। এই দলের সহিত সমান পয়েণ্ট পাইয়াছে মেসারার্স ক্লাব। কিন্তু মেসারার্স ক্লাব ১৯টি খেলা খেলিয়া ঐ পয়েণ্ট পাইয়াছে। অরোরা ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ানশিপ বিষয় যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়, তবে ট্রপিক্যাল স্কুল দলের সহিতই করিতে হইবে।

তৃতীয় ডিভিসন লীগ

তৃতীয় ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া তিনটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। এই তিনটি দলের নাম যথাক্রমে মাড়োয়ারী, রবার্ট হাডসন ও বেনিয়াটোলা ক্লাব। এই তিনটি দলের পয়েণ্ট বর্তমানে ২১। ইহাদের মধ্যে বেনিয়াটোলা ক্লাব অপর দুইটি দল অপেক্ষা দুইটি খেলা বেশী খেলিয়া ঐ পয়েণ্ট পাইয়াছে। সুতরাং মাড়োয়ারী ক্লাব ও রবার্ট হাডসন ক্লাব এই দুইটি দলই চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করিবে। ইহাদের মধ্যে কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা এখনও বলা যায় না।

চতুর্থ ডিভিসনেও তিনটি দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব, ইণ্টার-ন্যাশনাল ক্লাব ও উত্তরপাড়া ক্লাব। এই তিনটি দলের মধ্যে ইণ্টারনাশনাল ক্লাবের খেলা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নততর হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে এই দলই চ্যাম্পিয়ান হইবে।

পাতিয়ালায় প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা

সম্প্রতি পাতিয়ালায় এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় পাতিয়ালা মহারাজাদলের সহিত লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাটি দুইদিন ব্যাপী হয়। পাতিয়ালা মহারাজার দলে অমরনাথ, আমীর ইলাহি, দলীপ সিং, ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্ট প্রভৃতি বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন। পাতিয়ালার মহারাজা নিজে দলের অধিনায়ক

ছিলেন। লাহোর কলেজ দল খেলায় পাঁচ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। তবে কলেজ দলের তরুণ খেলোয়াড়গণ আজমৎ হায়াৎ খাঁ, বলবীর, জালালুদ্দিন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

খেলার বিবরণ

লাহোর কলেজ দল প্রথম খেলা আরম্ভ করেন। ২৭ রাণে তিনটি উইকেট পড়িয়া যায়। সকলে চিন্তা করিতে থাকেন লাহোর দলের সকলে ১০০ রাণের মধ্যেই উইকেট হারাইবেন। কিন্তু জালালুদ্দিন ও আজমৎ হায়াৎ খাঁ একত্রে খেলিতে আরম্ভ করিয়া সকলের ধারণা পরিবর্তন করেন। পাতিয়ালা মহারাজাকে ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন করিতে হয়। আজমৎ হায়াৎ খাঁ ৬৮ রাণ ও জালালুদ্দিন ৮৫ রাণ করিয়া আউট হন। লাহোর কলেজ দলের প্রথম ইনিংস ২৮০ রাণে শেষ হয়। পাতিয়ালার মহারাজা ৪৭ রাণে ৪টি উইকেট দখল করেন।

পরে পাতিয়ালা দলের অমরনাথ ও দলীপ সিং খেলা আরম্ভ করেন। এই দুইজনের খেলায় অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অমরনাথ ৪২ রাণ করিয়া আউট হন। পাতিয়ালা দলের ৯৫ রাণ হয়। দলীপ সিংহও ৫২ রাণ করিয়া আউট হন। পাতিয়ালা দলের ৭টি উইকেট ১৪০ রাণে পড়িয়া যায়। ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্ট খেলায় যোগদান করিয়া অবস্থার পরিবর্তন করেন। পাতিয়ালা দলের প্রথম ইনিংস ২৩৯ রাণে শেষ হয়। তরুণ বোলার বলবীর ৩৬ রাণে ৪টি উইকেট পান।

কলেজ দল ৪১ রাণে অগ্রগামী হইয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ১৯১ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। কে কৃষ্ণ ৬৮ রাণ, দালজিন্দার ৩৭ রাণ, সুলতান ৩৪ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আমীর ইলাহি এই ইনিংসে ৪৫ রাণে ৫টি উইকেট পান। পরে পাতিয়ালা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। মাত্র তিন ঘণ্টা খেলা শেষ হইতে বাকী। পাতিয়ালা দলের সকলে পিটাইয়া খেলিতে আরম্ভ করেন। ফলে ৫টি উইকেট ১৪০ রাণে পড়িয়া যায়। এই সময় আমীর ইলাহি খেলায় যোগদান করেন। তিনি ভীষণ পিটাইয়া খেলিয়া ৭০ রাণ করেন। ইহার পরে ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্ট ও রাজা বালীন্দর সিং দ্রুত রাণ তুলিতে আরম্ভ করেন। রাজা বালীন্দর সিং ৪৫ মিনিটে ৬৩ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ট্যারাণ্ট ২৬ রাণ করিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। পাতিয়ালা দল ৫ উইকেটে ২৪০ রাণ করেন। লাহোর কলেজ দল ৫ উইকেটে পরাজিত হয়।

লাহোর কলেজ দল পরাজিত হইলেও বিশিষ্ট অভিজ্ঞ খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত পাতিয়ালা দলের সহিত যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। অদূর ভবিষ্যতে এই কলেজ দলের কয়েকজন খেলোয়াড় ভারতীয় দলে যে স্থান পাইবেন সেই বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

বেঙ্গল ওয়াটার পোলো লীগ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতা গত দুই মাস হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই লীগ পরিচালনার জন্য যে কমিটি আছে তাহার সভ্যগণ গত দুইমাসের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে দশ দিনের অধিক প্রকাশ করেন নাই। যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় অধিকাংশ খেলার মীমাংসা একতরফা হইয়াছে। অর্থাৎ অধিকাংশ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দল উপস্থিত না হওয়ায় উপস্থিত দলকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে এইরূপ অনুপস্থিত দলের সংখ্যা এত অধিক কখনই শুনিতে বা দেখিতে হয় নাই। এই বৎসর এইরূপ অনুপস্থিত দলের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিচালকগণের মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাঁহারা কোনরূপে প্রতিযোগিতা শেষ করিবার জন্যই ব্যস্ত। প্রচার অথবা উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এই দিকে তাঁহাদের কোনরূপ দৃষ্টি নাই। অথচ আমরা জানি প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতা বিষয়টির প্রচার ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা। কিন্তু বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের ওয়াটার পোলো লীগ পরিচালকগণ যেভাবে চলিয়াছেন তাহাতে ঐ উদ্দেশ্য উপেক্ষা করা হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। এইরূপ উপেক্ষা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। পরিচালকগণ যদি সাধারণের অবগতির জন্য এই বিষয় বিশদভাবে প্রকাশ করেন তবে খুবই ভাল হয়। ইহা প্রকাশিত না হইলে পরিচালকগণেরই বিশেষ ক্ষতি। ইতিমধ্যেই অনেকে অনেক প্রকার আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, "বেঙ্গল এমেচার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণের নিজেদের মধ্যে ভীষণ গোলমাল চলিতেছে। তাঁহারা প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবেন কি করিয়া?" কেহ কেহ বলিতেছেন, "কতকগুলি রেফারী এসোসিয়েশন নিযুক্ত করিয়াছেন যাঁহারা ওয়াটার পোলো খেলার সাধারণ নিয়মকানুন পর্যন্ত জানেন না। এই সকল রেফারীগণের অধীনে খেলিয়া দুর্নাম কিনিয়া কি হইবে?" কেহ কেহ বলেন, "খেলা কোন দিন হইবে তাহা পূর্ব হইতে জানান হয় না। হঠাৎ নোটিশ পাইয়া কি খেলায় যোগদান করা যায়?" এই সকল উক্তির মধ্যে সত্যতা আছে কি না সে বিষয় আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। তবে এই সকল আলাপ আলোচনা বন্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যদি নীরব থাকেন তবে ইহা বন্ধ হইবে কি করিয়া?

৪০০ মিটার দৌড়ের নূতন রেকর্ড

আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কোর অলিম্পিক ক্লাবের সভ্য গ্রোভার লেমনার ন্যাশনাল ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার দৌড় ৪৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা এই বিষয়ের নূতন পৃথিবীর রেকর্ড। তবে অনেকে বলিতেছেন যে, ১৯৩৯ সালে জার্মান এ্যাথলেটিক আর হার্বিয়া উক্ত ৪০০ মিটার দৌড় ৪৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়াছিলেন। হার্বিয়ার ঐ কৃতিত্ব যদি সত্য হয় তবে লেমনার ঐ রেকর্ডের সমান করিয়াছেন।

সমস্ত বার্তা

২৫শে জুন—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—ভিসির সংবাদে প্রকাশ, জার্মান সৈন্যগণ লিথুয়েনিয়ার প্রাচীন রাজধানী ভিলনায় প্রবেশ করিয়াছে। জার্মানরা দাবী করে যে, তাহারা রুশ সীমান্ত ভেদ করিয়া ৭৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু লালফৌজের ইস্তাহারে এই দাবী স্বীকার করা হয় নাই। লিথুয়ানিয়া ও দক্ষিণ পোল্যান্ডে তুমুল সংগ্রাম হয়। রণক্ষেত্রে সর্বত্র রুশ সৈন্য জার্মান আক্রমণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে বলিয়া লালফৌজের ইস্তাহারে দাবী করা হয়। উভয় পক্ষই প্রবলভাবে বিমান আক্রমণ চালায়। জার্মানরা লেনিনগ্রাড ও সেবাস্টাপুলে এবং সোভিয়েট বিমান হেলসিঙ্কি, ওয়ারস, লুবলিন ও ডানজিগে প্রবল বোমা বর্ষণ করে। রুশ ইস্তাহারে বলা হয় যে, এ পর্যন্ত সোভিয়েট পক্ষে মোট ৩৭৪টি বিমান ও জার্মান পক্ষে মোট ৩৮১টি বিমান ধ্বংস হইয়াছে। জার্মান হাই কম্যান্ডের ইস্তাহারে বলা হয় যে, হের হিটলার রুশ রণাঙ্গনে তাঁহার সৈন্য দলের সঙ্গে আছেন।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, সুইডেনের পথে ফিনল্যাণ্ডে জার্মান সৈন্য লইয়া যাইবার জন্য জার্মানীর অনুরোধে সুইডেন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে।

সিরিয়া-বৃটিশ বাহিনী মার্জ্জ আয়ুন দখল করিয়াছে। দামাস্কাসের উপর জার্মান বিমান আক্রমণের ফলে ৩০ জনের বেশী লোক নিহত হয় এবং বহুলোক আহত হয়।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়াকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দিবে।

২৬শে জুন—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—পূর্ব প্রুশিয়া হইতে বুকোভিনা পর্যন্ত জার্মানরা রুশ ব্যূহের বিরুদ্ধে আটটি বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। লালফৌজের ইস্তাহারে বলা হয় যে, সোভিয়েট সৈন্যেরা সর্বত্র প্রবল প্রতিরোধ করিতেছে; তাহারা দক্ষিণে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া প্রজেমিসল পুনরাধিকার করিয়াছে। ফিনিশ শহর ও গ্রামসমূহের উপর সোভিয়েট বিমান বোমা বর্ষণ করে।

ফিনল্যাণ্ড জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে।

২৭শে জুন—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—জার্মানরা রিগা ও লাও দখলের দাবী করে। কনস্টাঞ্জা ও প্লোয়েস্টির উপর সোভিয়েট বিমান প্রবল বোমা বর্ষণ করে। সোভিয়েট বিমান আক্রমণের ফলে রুমানিয়ান গভর্নমেণ্ট বুখারেস্ট ত্যাগ করেন। জার্মানরা হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক অভিমুখে অগ্রসর হয়। ভিলনা ও বারোনোভিচ এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী নূতন ঘাঁটিতে স্থান গ্রহণ করে। লাওয়ের উত্তর-পূর্বে লুক অঞ্চলে ভীষণ ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়।

বৃটিশ রাজদূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস লণ্ডন পরিদর্শনের পর মস্কো প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

২৮শে জুন—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা মেরু অঞ্চলে রুশ এলাকার উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। লালফৌজের ইস্তাহারে বলা হয় যে, সোভিয়েট সৈন্যেরা দানিয়ুব নদীর মোহনা পার হইয়া কতকগুলি ভাল জায়গা দখল করে। মস্কো রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, ইতিমধ্যেই রুশ বিমান বহর ৪৫৭খানি জার্মান বিমান ধ্বংস করিয়াছে। মিনস্ক এলাকায় যুদ্ধে একজন জার্মান জেনারেল নিহত হইয়াছে। উত্তর রণাঙ্গনে ভিলনা ও বারনোভিচ অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যেরা নূতন ঘাঁটিতে সরিয়া আসিতেছে।

প্রকাশ আনকারাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত হের ফন প্যাপেন, সিরিয়ার বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্মান বাহিনীকে পথ দিবার দাবী জ্ঞাপন করিয়াছেন। লণ্ডনের ওয়াকিবহাল মহলে তাহার কোনরূপ সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না।

জার্মানীর 'ট্রান্স ওশান নিউজ এজেন্সীর' এক সংবাদে প্রকাশ—ফরাসী সৈন্য বাহিনীর ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁ বুরাজোর এক বন্দী শিবির হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

২৯শে জুন—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—গত ২২শে জুন হইতে ২৭শে জুন পর্যন্ত রুশিয়ায় জার্মান অভিযান সম্পর্কে জার্মান সরকারের এক সুদীর্ঘ ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। উহাতে দাবী করা হয় যে, জার্মানরা কাউনাস, ভিলনা এবং গ্রডনো দখল করিয়াছে। বিয়ালিস্টকের পূর্ব অঞ্চলে দুইটি রুশ সৈন্যদলকে বেষ্টন করা হইয়াছে। তদুপরি জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী মিনস্ক অতিক্রম করিয়া মস্কো যাইবার প্রধান রাস্তায় উপস্থিত হইয়াছে। সাতদিন-ব্যাপী সংগ্রামে চারি সহস্র রুশ বিমান ও ১৩ শত ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে। জার্মানদের ১৫০টি বিমান খোয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েটের এক ইস্তাহারে ঘোষিত হয় যে, মিনস্ক ও লুকের দিকে জার্মান ট্যাঙ্ক বহরের অগ্রগতি সোভিয়েট সেনাদলের আক্রমণে প্রতিহত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্ক বহরের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের মূলবাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

৩০শে জুন—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—জার্মানরা মিনস্ক, লাও ও লিবাউ বন্দর দখলের দাবী করে। সোভিয়েট ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, যুদ্ধের প্রথম ৭৮ দিনে জার্মানদের ন্যূনপক্ষে ২৫০০ ট্যাঙ্ক, ১৫ শত বিমান এবং ৩০ হাজারের বেশী জার্মান সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে। বলা হয় যে, মুরমানস্ক হইতে মিনস্ক এবং মিনস্ক হইতে লুটস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে সংগ্রাম চলিতেছে। ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে, লুক অঞ্চলে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর আক্রমণে জার্মান ট্যাঙ্কদল ও মোটর আরোহী সৈন্যগণের অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে।

সিরিয়া—ভিসি নিউজ এজেন্সীর এক বর্ণনায় দামাস্কাসের ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক নেবেক দখলের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

ভিসি সরকার সোভিয়েটের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

১লা জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—জার্মানীর এক ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, জার্মান বাহিনী মিনস্কের ৪০ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং বল্টিক অঞ্চলসমূহে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। মিনস্কের পতনের সংবাদ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মানিয়া লন নাই। মস্কোর ইস্তাহারে তিনটি জার্মান সাবমেরিন ধ্বংসের দাবী করা হয়। গত রাত্রে মস্কোতে সর্বপ্রথম বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনি হয়; কিন্তু কোন বোমাবর্ষনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মস্কোর রেডিওতে একটি সোভিয়েট দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।

জেনারেল স্যার এ ওয়াভেল ভারতের প্রধান সেনাপতি এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্তমান প্রধান সেনাপতি স্যার রুড অচিনলেক জেনারেল স্যার ওয়াভেলের স্থলে মধ্য প্রাচ্যের বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৫শে জুন—

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ অন্ত্রের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুক্ত কে এম মুন্সী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আত্মরক্ষার নীতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর সহিত মতভেদই তাঁহার পদত্যাগের কারণ।

কংগ্রেস জাতীয় সপ্তাহে আপত্তিকর বক্তৃতা করার অভিযোগে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর পুত্র ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে আরও ছয় মাস জেল খাটিতে হইবে।

২৬শে জুন—

আজ রাত্রে ঢাকায় পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গার ফলে একজন দারোগাসহ কয়েকজন আহত হইয়াছে।

২৭শে জুন—

গতকল্য রাত্রে ঢাকায় পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে একব্যক্তি নিহত এবং এগারজন আহত হয়। প্রকাশ, রথযাত্রার মেলায় একজন মুসলমান পকেট কাটার গ্রেপ্তারের পর হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। পুনরায় হাঙ্গামা বাধায় অদ্য দাঙ্গা তদন্ত কমিটির অধিবেশন হয় নাই।

২৮শে জুন—

প্রেস পরিবর্তনের ফলে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নামজারীর দরখাস্ত করায় শ্রীযুক্তা লীলা রায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা "জয়শ্রীর" নিকট হইতে ৫শত টাকা জামানত দাবী করা হইয়াছে।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সের বিরুদ্ধে এবং রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত নিছলদাস ভাজিরাণীর বিরুদ্ধে দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৫ই জুন জাহানারা বেগম চৌধুরীকে বন্দুকের গুলীতে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ জাহানারা বেগমের স্বামী পাঞ্জাবের লোহারু ষ্টেটের আলমগীর মীর্জার বিরুদ্ধে আলীপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ রহমানের এজলাসে চার্জসীট দাখিল করিয়াছে।

সেনেটের বিশেষ সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ করা হয়; উহাতে প্রায় ৪॥ লক্ষ টাকা ঘাটতি প্রকাশ পায়।

ঢাকার দাঙ্গার অবস্থা গুরুতর। নারিন্দাতে একজন পুলিশ কনেষ্টবল ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছে। কলতাবাজারে জনৈক ভদ্রলোকের বন্দুকের গুলীতে একজন দাঙ্গাকারী নিহত হইয়াছে। লক্ষ্মীবাজারে দাঙ্গাকারী জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ গুলী চালনা করে, ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়। ২৬শে জুন ঢাকায় দাঙ্গার পুনরারম্ভ হইতে এ পর্যন্ত ১১ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় শ্রমিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত দেবেন সেনকে কলিকাতায় ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৯শে জুন—

শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যহই তাঁহার জ্বর হইতেছে। তিনি পুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন এবং শয্যাশায়ী আছেন।

ঢাকার দাঙ্গার অবস্থা গুরুতর। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতস্তত আক্রমণ চলে। ছুরিকাঘাতে দুইজন নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে। গতকল্য রাত্রে উচ্ছৃঙ্খল জনতা ছত্রভঙ্গ করার সময় পুলিশকে আবার কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। বাস সিণ্ডিকেটের অফিস ভস্মীভূত হইয়াছে। গত রাত্রে এক জনতা মালীটোলা আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। এ পর্যন্ত মোট ১৬জন নিহত ও ৪৮ জন আহত হইয়াছে।

৩০শে জুন—

ঢাকা শহরে দাঙ্গার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই; সকল মহল্লা হইতেই মারপিট ও ছোরা মারার সংবাদ ক্রমাগতই পাওয়া যাইতেছে। দয়াগঞ্জে জনৈক লেডী ডাক্তারের বাড়ীতে জনতা লুঠতরাজ করিয়াছে। দাঙ্গাকারিগণ ঐ অঞ্চলের জনৈক পুলিশ কনেষ্টবলের রাইফেল কাড়িয়া লয়। এ পর্যন্ত ১৯ জন মৃত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে। গত পাঁচ দিনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে জনৈক প্রবীণ উকীল সহ ৩১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির সুপারিশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য বাঙলা সরকার কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কমিটির অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে স্যার যদুনাথ সরকার, কলিকাতা ও ঢাকা এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ভাইস চ্যান্সেলার ও ডাঃ জেঙ্কিন্স থাকিবেন এবং সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে তাঁহারা সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির মতামত আহ্বান করিবেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই এক ঘোষণা প্রচার করা হইবে।

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ প্যাডেরিউস্কী পরলোকগমন করিয়াছেন।

১লা জুলাই—

হুগলীর জেলা ও দায়রা জজ মিঃ কে সি দাশগুপ্ত আই সি-এস কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মামলার রায় দিয়াছেন। আসামী শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীযুত ধরানাথ ভট্টাচার্য বেকসুর খালাস পাইয়াছেন এবং অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

ঢাকার দাঙ্গার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। আজ দুইজন বালককে ছুরি মারা হয়। এ পর্যন্ত ২২ জন নিহত হইয়াছে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও উদারনৈতিক দলের অন্যতম নেতা স্যার সি ওয়াই চিন্তামণি এলাহাবাদে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে যে বঙ্গীয় বিক্রয় কর বিল পাশ হইয়াছিল। বড়লাট ঐ বিলে 'সম্মতি দিয়াছেন। অদ্য ১লা জুলাই হইতে ঐ আইন বলবৎ হইবে। এই আইন অনুসারে যে সকল আমদানীকারী, প্রস্তুতকারী ও উৎপন্নকারীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ মোট দশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য যে সকল ব্যবসায়ীর বার্ষিক মোট আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা, তাঁহাদিগকে প্রতি টাকায় এক পয়সা হারে কর দিতে হইবে। কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্যসমেত ৩১ রকমের জিনিস এই আইনের আমলে আসিবে না বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আমার ডুবেছে রবি, অমার অম্বরে
জলদ গুণ্ঠনে ঢাকা নক্ষত্র দীপালি
শূন্য মনে শূন্য পানে চেয়ে আ
কাঁদে আঁখি নিদ্রাহীন আলোকে

তুমি নাই, একদিন ছিলে এই
নাই গিরিনির্ঝরিণী ধূ ধূ ক

আরণ্যক কাফ্রী মোর মনে দিল হানা
নিবিড় অরণ্যতলে জেগে থাকা স
হিংস্র পাশবিক দৃঢ় মুক্ত পদে
জীবন ফিরিয়া আসে মৃত্তিকা

ব্যাঘ্র-বরাহের দল বিষ দাঁ
বন্দী হয় কাফ্রীদের দৃষ্টি
নিরুদ্ধ কণ্ঠের দ্বারে আ
হুংকার-স্ফুলিঙ্গ নিভে

৮ম বর্ষ] ২৮শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 12th July, 1941. [৩৫ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলার দুঃখদুর্দশা—

বাঙলার গভর্নর সম্প্রতি বরিশাল জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। বাঙলাদেশ যদি ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান হইত, তাহা হইলে এ কর্তব্য তাঁহাকে অনেক আগেই প্রতিপালন করিতে হইত। তাঁহার পরিদর্শনের ফলে দুর্গত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা প্রতীকারের ব্যবস্থা যে যথোপযুক্ত হইবে, এমন আশা আমরা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কারণ সরকারী তহবিলে অর্থাভাব—এ সব ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রী আমল হইতে এ পর্যন্ত সমানভাবেই রহিয়াছে। অন্নাভাব এবং তাহার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট শুধু বরিশাল কিংবা নোয়াখালীর মধ্যেই নিবদ্ধ নাই, বাঙলাদেশের সর্বত্র আজ দেখা দিয়াছে। চাউলের দর ক্রমেই চড়িতেছে এবং শহর অপেক্ষা মফঃস্বলেই চড়িতেছে বেশী। চাউলের এই দর চড়ার ফলে বাঙলার চাষীর ঘরে যদি দুইটা পয়সা যাইত, তবুও সান্ত্বনার একটা বিষয় ছিল; কিন্তু বাঙলার চাষীর ঘরে এখন আর চাউল নাই। যাহারা চাউল গুদামে আটক রাখিয়াছিল, চাউলের দর চড়াতে মোটা হইতেছে সেই সব আড়ৎদার এবং মহাজনেরা। বাঙলা সরকার সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে ইস্তাহার জারী করিয়াছেন তাহাতে ভরসার কথা কিছুই তো নাই-ই, বরং আছে ভয়ের কথা। সরকার বলিতেছেন, চাউলের দর ঠিকই বাড়িয়াছে, অন্যায় কিছু বাড়ে নাই এবং চাউলের বাজারে ফাটকাবাজীও চলিতেছে না। সরকার এই ঘোষণা করিয়া নিজেরা খালাস পাইতে পারেন; কিন্তু দেশের অন্নকষ্টপীড়িতদের সমস্যা তাহাতে মিটে না এবং সে সমস্যা মিটাইবার দায়িত্ব সরকারের যে কিছুমাত্র আছে সরকারী ইস্তাহারে তাহার আভাষ পাইবার উপায় নাই। সরকারী ইস্তাহারে চাউলের দর বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি কারণ এই যে, ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিবার মত যথেষ্ট-সংখ্যক জাহাজের অভাব ঘটিয়াছে। দেশের লোকের অন্নকষ্টের জন্য সরকারের যদি বাস্তবিক চিন্তা থাকিত, তাহা হইলে এই যুক্তি তাঁহারা উপস্থিত করিতে পারিতেন না। জাহাজের অভাব যদি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর জন্য যথেষ্টসংখ্যক জাহাজ পাওয়া যায়, সেজন্য তাঁহাদের ভারত সরকারকে অনুরোধ উচিত এবং ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানি চাউলের উপর যে কর ধার্য আছে, তাহা অন্তত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম সরকারকে অনুরোধ করা কর্তব্য।

ঢাকার অবস্থা—

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখনও থামে নাই। একদিনের খবরে যদি একটু আশ্বস্তির ভাব মনে আসে, পরদিনের খবরে আবার পাওয়া যায় ছোরাছুরি মারার বহরের কথা, মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয় এবং নির্দোষের রক্তপাতে বেদনাহত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিমুদ্দিন কিছুদিন পূর্বে আমাদিগকে এ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ঢাকার অশান্তি দমনের জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাঁহারা কোনই ত্রুটি করিবেন না, পরে বাঙলা পুলিশের বড়কর্তারা কয়েকজন ঢাকা গিয়াছেন, দেখা যাইতেছে, কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা এখনও প্রশমিত হয় নাই। কর্তার দল কঠোর ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝেন জানি না, আমরা তাঁহাদিগকে আবার বলিতেছি, যে সব গুণ্ডা নির্দোষের বুকে ছুরি মারিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহাদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছাড়া নিশ্চয়ই কঠোর ব্যবস্থা নয়। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, যাহাতে দণ্ডের বিষয় চিন্তা করিয়া গুণ্ডার দলের দস্তুরমত হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সব ক্ষেত্রে যাহারা দৌরাত্ম্য করে, তাহাদের মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে না, মনে ভয় ঢুকাইয়া দিতে পারিলে, তবে ইহারা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইবার পথে আসে। সাধারণভাবে মনের উপর কঠোর দণ্ডের প্রভাব বিস্তার করা এসব ক্ষেত্রে প্রধানত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, এই দাঙ্গার পিছনে ঢাকার ধাড়ি গোছের কেহ কেহ

রহিয়াছে, কর্তাদের উচিত তাহাদের পদ, মান বা প্রতিষ্ঠার দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া ঢাকা হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে তেমন কিছু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কর্তৃপক্ষ যদি তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের মনের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব হইবে সবচেয়ে বেশী। তাহারা বুঝিবে যে, যাহাদের খুঁটার জোরে তাহারা লড়িতে যাইতেছে, শান্তি স্থাপনের কর্তব্যানুরোধে তাঁহাদের উপরও দণ্ড প্রয়োগ করিতে কর্তৃপক্ষ স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং সেক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম কিংবা পদ, মান প্রতিষ্ঠার কোন বিচার তাঁহারা করিবেন না। বাঙলা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ডি গর্ডন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় বলিয়াছেন যে, ইতস্তত যে ধরণের আক্রমণ চলিতেছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারাই শুধু সেগুলি বন্ধ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদেরও দ্বিমত নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সে সহযোগিতার আকার হইবে কিরূপ? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনকতক লোক এক জায়গায় বসিয়া পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীমূলক প্রস্তাব পাশ করিলে, ইহার যে কোন প্রতিকার হইবে, আমরা ইহা মনে করি না। জাতিধর্মনির্বিশেষে গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য দমনে সতর্কতা এবং প্রয়োজন হইলে কাজে তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে যে সহযোগিতা, সেই সহযোগিতাই এমন ক্ষেত্রে সার্থক হইতে পারে। ঢাকার মহল্লায় মহল্লায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে লইয়া তেমন সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে কি? এখন সব ক্ষেত্রে যুবকেরাই কাজের মত কাজ করিতে পারে; কারণ অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ তাহাদের মধ্যেই সমধিক প্রবল এবং ঝুঁকি লইয়া কাজ করিবার মত আদর্শ-নিষ্ঠা তাহাদের মধ্যে আছে সবচেয়ে বেশী। ঢাকার কর্তৃপক্ষ যুবকদিগকে গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য হইতে শহর রক্ষার কাজে তেমনভাবে আহ্বান করিয়াছেন কি? কিছুদিন পূর্বে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং শ্রীযুত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি আবেদনপত্র প্রচার করেন; এই আবেদনপত্র কাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতেছে, যদি তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই হয়, তাহা হইলে ঐ আবেদনে কতটা ফল হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, কারণ যাহারা অসংকোচে পরের বুকে ছুরি মারিতে পারে, অপরের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দেয়, জাতীয়তাবাদের মহিমা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না। যাহারা জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐরূপ আবেদন শুধু তাহাদের মনেই কাজ করিতে সক্ষম এবং প্রধানত ইহারা যুবক ও তরুণের দল। এই আবেদনে বলা হইয়াছে, 'ঢাকা জাতীয়তার জন্মভূমিরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ঢাকাবাসী কি নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া সাম্প্রদায়িকতার ঘনান্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিবেন; ঢাকা পুরোভাগ হইতে পশ্চাতে পতিত হইবে?' আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বাঙলার মন্ত্রী একজন। তাঁহার মুখে ঢাকার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের এই প্রশংসায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু মুখের কথায় আমরা সুখী হইতে পারিতেছি না। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে নিরাশ করিতেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার ঢাকায় এই নূতন নহে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বলিব যে কর্তৃপক্ষ কোন ক্ষেত্রেই দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রশমন করিতে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত ঢাকার যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; সাহায্য গ্রহণ তো দূরের কথা, তাহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক রকমে জাতীয়তাবাদী যুবকদের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের অবলম্বিত নীতিতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ জোর পায় নাই, বরং সাম্প্রদায়িকতার ভাবই প্রশ্রয় পাইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী যদি অতীতের ভ্রম সত্যই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শুধু মুখের কথায় ঢাকার জাতীয়তাবাদের প্রশংসা না করিয়া জাতীয়তাবাদকে সন্দেহ এবং ভীতির দৃষ্টিতে দেখিবার যে সংস্কার সরকারী নীতির মধ্য দিয়া এতকাল আকার ধরিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের নিজেদিগকে মুক্ত করুন। ঢাকার যুবকদের অন্তরে জাতীয়তাবাদের আদর্শে দৃঢ়তা আছে এবং সে আদর্শকে অপরিম্লান রাখিবার মত শক্তি প্রয়োগের প্রেরণাও তাহাদের মধ্যে আছে, এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নই; কিন্তু কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত সেই তরুণদিগকে কতটা বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারিবেন, এই বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে।

অনিষ্টকর উদ্যম—

পাপ ব্যবসায় নিবারণ বিল যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন বাঙলার তৎকালীন গভর্নর কলিকাতার টাউন হলে আহূত এক জনসভায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—'দুর্বৃত্ত রাক্ষসদের কবল হইতে অসহায়া বালিকাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙলা দেশে এই সব বালিকার জন্য অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা দরকার।' সে অভাব বাঙলা দেশে এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। অসহায়া বালিকা এবং নিরাশ্রয়া বিধবাদের জন্য বাঙলা দেশে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে, প্রয়োজনের অনুরূপে তাহা অতি সামান্য। দুর্গতা নারীর দুঃখ-কষ্টে যাঁহাদের বুকে বেদনা বাজে, তাঁহারা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে, নানা আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে সেগুলি কোন রকমে আগুলিয়া রাখিতেছেন; কিন্তু বাঙলা দেশের বরাতই পড়িয়াছে এমন যে, এখানে ভাল কিছু না হউক, মন্দ হইবার পথটাই সকল দিক হইতে পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। বেগম ফারহাৎ বানু সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বঙ্গীয় অনাথাগার তত্ত্বাবধান এবং বিধবাগার বিল নামে একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলে দুর্গতা রমণীদের এখানে

যেটুকু আশ্রয় আছে, তাহা ভাঙিগয়া ফেলিবার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। এই বিলের প্রতিবাদ করিয়া বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত শনিবার কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙলার মনীষিবৃন্দ সকলে একবাক্যে এই বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ইহার প্রত্যাহার দাবী করিয়াছেন। এই বিলের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাষা আমরা পাইতেছি না। বেগম ফারহাৎ বানু নিজে একজন মহিলা; দুর্গতা নারীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; তিনি কেমন করিয়া এই বিল বিধিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই কথাই শুধু ভাবিতেছি। এই বিল বিধিবদ্ধ হইলে কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পক্ষে অনাথাশ্রম বা বিধবাগারের সহিত সম্পর্ক রাখা কঠিন হইবে। তাঁহারা রীতিমত সন্দিগ্ধ চরিত্র ব্যক্তিদের পর্যায়ে গিয়া পড়িবেন এবং প্রকারান্তরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে তাঁহাদিগকে থাকিতে হইবে। দেশের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় এবং মহানুভব ব্যক্তি, তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে ঐসব প্রতিষ্ঠান যদি বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেগুলি কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ এদেশের সমাজ দুর্গতা নারীর বেদনায় এখনও সচেতন নহে এবং সরকারের তো এজন্য মাথা ব্যথা আছে সামান্যই। বিলের একটি ধারায় এই নির্দেশ করা হইয়াছে যে, যে প্রতিষ্ঠানের হাতে দুই বৎসর কাজ চালাইবার মত টাকা না থাকিবে, সে প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। বাঙলা দেশে যাঁহারা এই সব নারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারাই জানেন এই প্রতিষ্ঠানগুলি এদেশের মাটিতে টিকাইয়া রাখা আর্থিক দিক হইতে কত কঠিন। ইহা সুনিশ্চিত যে, বিলের ঐ আর্থিক বিধান প্রযুক্ত হইলে বাঙলা দেশের অধিকাংশ নারী-প্রতিষ্ঠানই বিলুপ্ত হইবে। দুর্গতা নারীর সেবার মহদাদর্শকে ধ্বংস করিবার এই উদ্যম সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের দ্বারাই নিন্দিত হইবে। বেগম সাহেবার কাছে আমাদের এই নিবেদন যে বিলের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া তিনি এখনও উহা প্রত্যাহার করুন।

চীন যুদ্ধের পঞ্চম বার্ষিকী—

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপান চীন আক্রমণ করে, সুতরাং চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের চতুর্থ বার্ষিকী উত্তীর্ণ হইল এবং সংগ্রাম পঞ্চমবর্ষে পড়িল। প্রবল পররাজ্যলিপ্সু শক্তির বিরুদ্ধে চীনের স্বাধীনতাপ্রিয় সন্তানগণ এই চারি বৎসর যেরূপ বিক্রম সহকারে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। চীনের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণের আত্মোৎসর্গের অপরিম্লান মহিমায় জগতের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এই চারি বৎসর বীরের উষ্ণ শোণিতধারায় চীনের দুর্গম গিরিকান্তার সিক্ত হইয়াছে, মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া চীনের স্বাধীনতাপ্রিয় সন্তানগণ চীনকে নূতন জীবন দিয়াছেন। দেশপ্রেমিকের আত্মদান কখনও ব্যর্থ হয় না, চীনেও হইবে না। আত্মদানের অনির্বাণ হোমশিখা পররাজ্যগ্রাসীদের স্পর্ধাকে ভস্মীভূত করিবে। পররাজ্যগ্রাসী শক্তি যতই যন্ত্রবলে সমন্বিত হউক না কেন এবং চাতুর্যপূর্ণ নীতির প্রয়োগে বিশ্বাসঘাতকদিগকে সৃষ্টি করিবার পটুতা তাহাদের যতই থাকুক না কেন, স্বাধীনতার জন্য সত্যকার আগ্রহ জাতির মধ্যে যদি একবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, কোন শক্তিরই সাধ্য নাই যে তাহাকে নির্বাপিত করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী দলের রক্তলিপ্সু নারকীয় গৃধ্নুতাকে দুরপনেয় কলঙ্ক টীকা ললাটে পরিয়া সেই সত্যকে একদিন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এই সত্যকে যে, স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শে যাহারা প্রাণ দেয়, তাহারা মরে না, মৃত্যুঞ্জয়ী মানবমহিমাকেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত করে। যাহারা দস্যুবৃত্তির দ্বারা অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত হয়, পরকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া নিজেদের পুষ্টি যাহাদের পাপ-ব্যবসা, মৃত্যুর গ্লানিভারে আচ্ছন্ন হয় তাহারাই। চীনের স্বাধীনতাপ্রিয় সন্তানগণের আত্মদানের সাধনা জগতের নিপীড়িত, দলিত এবং পরাধীন জাতির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সংবর্ধনা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। চীন স্বাধীনতা সংগ্রামের পঞ্চম বার্ষিক স্মৃতিদিবসে আমরা আবার তাঁহাদিগকে সংবর্ধিত করিতেছি।

অহিংস ও কংগ্রেস

বারানসীতে হিন্দু নেতৃ সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন,—"মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, আত্মরক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও সহিংস আচরণ করা যাইবে না। এই বিষয়ে সর্বদাই তাঁহার সহিত আমি ভিন্ন মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি। মনু, বেদব্যাস প্রমুখ প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বহু শতাব্দী পূর্বে এই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে, হিংস আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষই হিংস প্রতিরোধ করিতে পারে।" পণ্ডিত মালব্যজী অহিংসার আদর্শের কম অনুরাগী নহেন; কিন্তু তিনি জানেন রাজনীতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজ-জীবনে মহাত্মাজীর নির্দেশিত কায়মনোবাক্যে অহিংসার আদর্শ কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না; পক্ষান্তরে উহা সমাজ-জীবনকে মিথ্যাচার এবং ভীরুতার গ্লানিভারেই আড়ষ্ট করিয়া ফেলিবে। পণ্ডিত মালব্যজীর ন্যায় দেশপ্রেমিক পুরুষ, দেশ-সেবায় যাঁহার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী দান অনবদ্য, দেশের কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তিনিও মহাত্মাজীর সঙ্গে অহিংস-নীতি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিতেছেন। মহাত্মাজীর অবাস্তব আদর্শের সার্থকতা সম্বন্ধে কংগ্রেসকর্মীদের অনেকের মনেই এইরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছে। পাকিস্থান আন্দোলন

রহিয়াছে, কর্তাদের উচিত তাহাদের পদ, মান বা প্রতিষ্ঠার দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া ঢাকা হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে তেমন কিছু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কর্তৃপক্ষ যদি তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের মনের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব হইবে সবচেয়ে বেশী। তাহারা বুঝিবে যে, যাহাদের খুঁটার জোরে তাহারা লড়িতে যাইতেছে, শান্তি স্থাপনের কর্তব্যানুরোধে তাঁহাদের উপরও দণ্ড প্রয়োগ করিতে কর্তৃপক্ষ স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং সেক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম কিংবা পদ, মান প্রতিষ্ঠার কোন বিচার তাঁহারা করিবেন না। বাঙলা পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ ডি গর্ডন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় বলিয়াছেন যে, ইতস্তত যে ধরণের আক্রমণ চলিতেছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারাই শুধু সেগুলি বন্ধ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদেরও দ্বিমত নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সে সহযোগিতার আকার হইবে কিরূপ? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনকতক লোক এক জায়গায় বসিয়া পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীমূলক প্রস্তাব পাশ করিলে, ইহার যে কোন প্রতিকার হইবে, আমরা ইহা মনে করি না। জাতিধর্মনির্বিশেষে গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য দমনে সতর্কতা এবং প্রয়োজন হইলে কাজে তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে যে সহযোগিতা, সেই সহযোগিতাই এমন ক্ষেত্রে সার্থক হইতে পারে। ঢাকার মহল্লায় মহল্লায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে লইয়া তেমন সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে কি? এখন সব ক্ষেত্রে যুবকেরাই কাজের মত কাজ করিতে পারে; কারণ অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ তাহাদের মধ্যেই সর্বাধিক প্রবল এবং ঝুঁকি লইয়া কাজ করিবার মত আদর্শ-নিষ্ঠা তাহাদের মধ্যে আছে সবচেয়ে বেশী। ঢাকার কর্তৃপক্ষ যুবকদিগকে গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য হইতে শহর রক্ষার কাজে তেমনভাবে আহ্বান করিয়াছেন কি? কিছুদিন পূর্বে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং শ্রীযুত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি আবেদনপত্র প্রচার করেন; এই আবেদনপত্র কাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতেছে, যদি তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই হয়, তাহা হইলে ঐ আবেদনে কতটা ফল হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, কারণ যাহারা অসঙ্কোচে পরের বুকে ছুরি মারিতে পারে, অপরের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দেয়, জাতীয়তাবাদের মহিমা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না। যাহারা জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐরূপ আবেদন শুধু তাহাদের মনেই কাজ করিতে সক্ষম এবং প্রধানত ইহারা যুবক ও তরুণের দল। এই আবেদনে বলা হইয়াছে, 'ঢাকা জাতীয়তার জন্মভূমিরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ঢাকাবাসী কি নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া সাম্প্রদায়িকতার ঘনান্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিবেন; ঢাকা পুরোভাগ হইতে পশ্চাতে পতিত হইবে?' আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বাঙলার মন্ত্রী একজন। তাঁহার মুখে ঢাকার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের এই প্রশংসায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু মুখের কথায় আমরা সুখী হইতে পারিতেছি না। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে নিরাশ করিতেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার ঢাকায় এই নূতন নহে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বলিব যে কর্তৃপক্ষ কোন ক্ষেত্রেই দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রশমন করিতে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত ঢাকার যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; সাহায্য গ্রহণ তো দূরের কথা, তাহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক রকমে জাতীয়তাবাদী যুবকদের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের অবলম্বিত নীতিতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ জোর পায় নাই, বরং সাম্প্রদায়িকতার ভাবই প্রশ্রয় পাইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী যদি অতীতের ভ্রম সত্যই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শুধু মুখের কথায় ঢাকার জাতীয়তাবাদের প্রশংসা না করিয়া জাতীয়তাবাদকে সন্দেহ এবং ভীতির দৃষ্টিতে দেখিবার যে সংস্কার সরকারী নীতির মধ্য দিয়া এতকাল আকার ধরিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের নিজেদিগকে মুক্ত করুন। ঢাকার যুবকদের অন্তরে জাতীয়তাবাদের আদর্শে দৃঢ়তা আছে এবং সে আদর্শকে অপরিম্লান রাখিবার মত শক্তি প্রয়োগের প্রেরণাও তাহাদের মধ্যে আছে, এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নই; কিন্তু কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত সেই তরুণদিগকে কতটা বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারিবেন, এই বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে।

অনিষ্টকর উদ্যম—

পাপ ব্যবসায় নিবারণ বিল যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন বাঙলার তৎকালীন গভর্নর কলিকাতার টাউন হলে আহূত এক জনসভায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—'দুর্বৃত্ত রাক্ষসদের কবল হইতে অসহায়া বালিকাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙলা দেশে এই সব বালিকার জন্য অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা দরকার।' সে অভাব বাঙলা দেশে এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। অসহায়া বালিকা এবং নিরাশ্রয়া বিধবাদের জন্য বাঙলা দেশে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে, প্রয়োজনের অনুরূপে তাহা অতি সামান্য। দুর্গতা নারীর দুঃখ-কষ্টে যাঁহাদের বুকে বেদনা বাজে, তাঁহারা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে, নানা আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে সেগুলি কোন রকমে আগুলিয়া রাখিতেছেন; কিন্তু বাঙলা দেশের বরাতই পড়িয়াছে এমন যে, এখানে ভাল কিছু না হউক, মন্দ হইবার পথটাই সকল দিক হইতে পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। বেগম ফারহাৎ বানু সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বঙ্গীয় অনাথাগার তত্ত্বাবধান এবং বিধবাগার বিল নামে একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলে দুর্গতা রমণীদের এখানে

যেটুকু আশ্রয় আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। এই বিলের প্রতিবাদ করিয়া বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত শনিবার কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙলার মনীষিবৃন্দ সকলে একবাক্যে এই বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ইহার প্রত্যাহার দাবী করিয়াছেন। এই বিলের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাষা আমরা পাইতেছি না। বেগম ফারহাৎ বানু নিজে একজন মহিলা; দুর্গতা নারীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; তিনি কেমন করিয়া এই বিল বিধিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই কথাই শুধু ভাবিতেছি। এই বিল বিধিবদ্ধ হইলে কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পক্ষে অনাথাশ্রম বা বিধবাগারের সহিত সম্পর্ক রাখা কঠিন হইবে। তাঁহারা রীতিমত সন্দিগ্ধ চরিত্র ব্যক্তিদের পর্যায়ে গিয়া পড়িবেন এবং প্রকারান্তরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে তাঁহাদিগকে থাকিতে হইবে। দেশের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় এবং মহানুভব ব্যক্তি, তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে ঐসব প্রতিষ্ঠান যদি বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেগুলি কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ এদেশের সমাজ দুর্গতা নারীর বেদনায় এখনও সচেতন নহে এবং সরকারের তো এজন্য মাথা ব্যথা আছে সামান্যই। বিলের একটি ধারায় এই নির্দেশ করা হইয়াছে যে, যে প্রতিষ্ঠানের হাতে দুই বৎসর কাজ চালাইবার মত টাকা না থাকিবে, সে প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। বাঙলা দেশে যাঁহারা এই সব নারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারাই জানেন এই প্রতিষ্ঠানগুলি এদেশের মাটিতে টিকাইয়া রাখা আর্থিক দিক হইতে কত কঠিন। ইহা সুনিশ্চিত যে, বিলের ঐ আর্থিক বিধান প্রযুক্ত হইলে বাঙলা দেশের অধিকাংশ নারীপ্রতিষ্ঠানই বিলুপ্ত হইবে। দুর্গতা নারীর সেবার মহদাদর্শকে ধ্বংস করিবার এই উদ্যম সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের দ্বারাই নিন্দিত হইবে। বেগম সাহেবার কাছে আমাদের এই নিবেদন যে বিলের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া তিনি এখনও উহা প্রত্যাহার করুন।

চীন যুদ্ধের পঞ্চম বার্ষিকী—

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপান চীন আক্রমণ করে, সুতরাং চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের চতুর্থ বার্ষিকী উত্তীর্ণ হইল এবং সংগ্রাম পঞ্চমবর্ষে পড়িল। প্রবল পররাজ্যলিপ্সু শক্তির বিরুদ্ধে চীনের স্বাধীনতাপ্রিয় সন্তানগণ এই চারি বৎসর যেরূপ বিক্রম সহকারে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। চীনের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণের আত্মোৎসর্গের অপরিম্লান মহিমায় জগতের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এই চারি বৎসর বীরের উষ্ণ শোণিতধারায় চীনের দুর্গম গিরিকান্তার সিক্ত হইয়াছে, মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া চীনের স্বাধীনতাপ্রিয় সন্তানগণ চীনকে নূতন জীবন দিয়াছেন। দেশপ্রেমিকের আত্মদান কখনও ব্যর্থ হয় না, চীনেও হইবে না। আত্মদানের অনির্বাণ হোমশিখা পররাজ্যগ্রাসীদের স্পর্ধাকে ভস্মীভূত করিবে। পররাজ্যগ্রাসী শক্তি যতই যন্ত্রবলে সমন্বিত হউক না কেন এবং চাতুর্যপূর্ণ নীতির প্রয়োগে বিশ্বাসঘাতকদিগকে সৃষ্টি করিবার পটুতা তাহাদের যতই থাকুক না কেন, স্বাধীনতার জন্য সত্যকার আগ্রহ জাতির মধ্যে যদি একবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, কোন শক্তিরই সাধ্য নাই যে তাহাকে নির্বাপিত করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী দলের রক্তলিপ্সু নারকীয় গৃধ্নুতাকে দুরপনেয় কলঙ্ক টীকা ললাটে পরিয়া সেই সত্যকে একদিন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এই সত্যকে যে, স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শে যাহারা প্রাণ দেয়, তাহারা মরে না, মৃত্যুঞ্জয়ী মানবমহিমাকেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত করে। যাহারা দস্যুবৃত্তির দ্বারা অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত হয়, পরকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া নিজেদের পুষ্টি যাহাদের পাপ-ব্যবসা, মৃত্যুর গ্লানিভারে আচ্ছন্ন হয় তাহারাই। চীনের স্বাধীনতাপ্রিয় সন্তানগণের আত্মদানের সাধনা জগতের নিপীড়িত, দলিত এবং পরাধীন জাতির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সংবর্ধনা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। চীন স্বাধীনতা সংগ্রামের পঞ্চম বার্ষিক স্মৃতিদিবসে আমরা আবার তাঁহাদিগকে সংবর্ধিত করিতেছি।

অহিংস ও কংগ্রেস

বারানসীতে হিন্দু নেতৃ সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন,—"মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, আত্মরক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও সহিংস আচরণ করা যাইবে না। এই বিষয়ে সর্বদাই তাঁহার সহিত আমি ভিন্ন মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি। মনু, বেদব্যাস প্রমুখ প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বহু শতাব্দী পূর্বে এই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে, হিংস আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষই হিংস প্রতিরোধ করিতে পারে।" পণ্ডিত মালব্যজী অহিংসার আদর্শের কম অনুরাগী নহেন; কিন্তু তিনি জানেন রাজনীতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজ-জীবনে মহাত্মাজীর নির্দেশিত কায়মনোবাক্যে অহিংসার আদর্শ কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না; পক্ষান্তরে উহা সমাজ-জীবনকে মিথ্যাচার এবং ভীরুতার গ্লানিভারেই আড়ষ্ট করিয়া ফেলিবে। পণ্ডিত মালব্যজীর ন্যায় দেশপ্রেমিক পুরুষ, দেশ-সেবায় যাঁহার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী দান অনবদ্য, দেশের কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তিনিও মহাত্মাজীর সঙ্গে অহিংস-নীতি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিতেছেন। মহাত্মাজীর অবাস্তব আদর্শের সার্থকতা সম্বন্ধে কংগ্রেসকর্মীদের অনেকের মনেই এইরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছে। পাকিস্থান আন্দোলন

সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অবলম্বিত নীতিও সেইরূপে অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি পাকিস্থান প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন, ইহা সত্য; কিন্তু কার্য্যত পাকিস্থানী উদ্যমের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন আন্দোলন আরম্ভ করিবার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। এই দিক হইতে তাঁহার মতিগতি কতকটা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের অবলম্বিত 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতিরই সমতুল্য। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না বর্জনের' দুর্বল মনোভাবে যেমন সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দলই প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেইরূপ পাকিস্থানী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কার্যত ঔদাসীন্যে দেশে জিন্নাই দলেরই জোর বাড়িয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। রাজনীতিক-ক্ষেত্রে যে নীতির দৃঢ়তা নাই, তেমন নীতি কখনই সফল হইতে পারে বলিয়া অমরা মনে করি না। বোধ হয় এই সব কারণে বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী 'অখন্ড হিন্দুস্থান' এই নাম দিয়া সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে ব্রতী হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে—পাকিস্থানী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার নিমিত্ত জনমত গঠন করা। শ্রীযুক্ত মুন্সী যে উদ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেশের পক্ষে তাহা সত্যই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অবাস্তব উচ্চ আধ্যাত্মিকতার স্তর হইতে কংগ্রেসের নীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগোপযোগী করিবার গুরুত্ববোধ যে নেতৃবৃন্দের মনে ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে, ইহাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ভারতের স্বাধীনতা এবং অবিলম্বে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার দ্বারা বৈদেশিক শোষণনীতিকে রুদ্ধ করিয়া দেশবাসীর প্রবল দারিদ্র্য এবং তজ্জনিত দুঃখকষ্টের প্রতীকার সাধন। উচ্চ আধ্যাত্মিক অহিংসার মহিমা প্রচারের জন্য জগৎ এতদিন অপেক্ষা করিয়াছে, আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে পারে; কিন্তু রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্য তাহার অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই।

কংগ্রেসের শক্তি ও নীতি—

পাকিস্থান আন্দোলনের সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, আমরা ইহা স্বীকার করি এবং সে দিক হইতে কংগ্রেসের নীতির সংস্কারও আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া থাকি; কিন্তু সেজন্য কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান গঠনের যৌক্তিকতা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। শ্রীযুত মুন্সী যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি সবই সাম্প্রদায়িক অপ্রীতির ভাব হইতে উদ্ভূত এবং সেজন্য শ্রীযুত মুন্সী তাঁহার নূতন প্রতিষ্ঠানের কর্মতালিকায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূরীভূত করিবার প্রচেষ্টার উপরও জোর দিয়াছেন। কিন্তু এ বিরোধ দূর করিবার উপায় কি? দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ রহিয়াছে তাহারই মধ্যে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা যতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, এই বিরোধের কারণও ততদিন পর্যন্ত দূর হইবে না। সাম্প্রদায়িকতাকে ভাঙ্গাইয়া একশ্রেণীর লোক বর্তমানে শাসনক্ষেত্রে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাহাদের এই ব্যবসায়ে সুবিধাই হয়। নেতৃত্বের আবরণে আবৃত থাকিয়া ইহারা হিংস্র জন্তুর মত ওৎ পাতিয়া থাকে, কখন একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধ পাকাইয়া উঠিবে এবং ইহাদের মাতব্বরীর মরসুম পড়িবে সেই আশায়। ছোরাছুরি চালাইয়া মরে নিরক্ষর ধর্মান্ধের দল, আর তাহাদের দুঃখ দুর্দশায় বাড় বাড়ে এইশ্রেণীর সুবিধাবাদীদের। সাম্প্রদায়িকতা যতদিন পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ নীতির অংগীভূত রহিবে, ততদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা কর্তাদের দৃষ্টিতে আতঙ্কের বিষয় হইয়াও থাকিবে এবং সে বিরুদ্ধতা দমন করিতে ক্ষমতাধিকারীদের দ্বারা ভারতরক্ষা বিধানের অবাধ অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাও সুনিশ্চিত সুতরাং এ প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান তখনই হইবে, যখন বিদেশীর কর্তৃত্ব এবং শোষণ নীতি প্রয়োগের সুবিধা ভারতের উপর থাকিবে না; কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল তাহাই। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যও কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র দল গঠনের আমরা কোন সার্থকতা দেখি না। কংগ্রেস পুণার প্রস্তাবে সরকারকে তেমন সহযোগিতা করিতে অগ্রসরই হইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের মর্জিকেই বড় বুঝেন এবং এ দেশবাসীর সহযোগিতা লাভের জন্য তাঁহাদের মতিগতি পরিবর্তনের কিছুমাত্র প্রয়োজনই বোধ করেন না; এরূপ অবস্থায় বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে তাহা কতদূর আগাইবে? এ দেশের লোককে লাঠিগাছা দিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তেমন শাসকদের আওতায় দেশরক্ষার কার্যকর কোন উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। শ্রীযুত মুন্সীর লক্ষ্য যাহা, তাহাতে আমাদের সঙ্গে তাঁহার মতের বিশেষ কোন ভেদ নাই; কিন্তু সেই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার পক্ষে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের যৌক্তিকতা আমরা উপলব্ধি করি না। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া এবং কংগ্রেসের নীতির সংস্কার সাধনের দ্বারাই ঐ সব উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে।

[৪]

সঞ্জিত পুনরায় কাজ পাইয়াছে এবং কিছুকালের মধ্যে তাহার পদোন্নতি হইয়াছে। সঞ্জিতের পদোন্নতির কারণে যে মঞ্জুশ্রী, তাহার যদিও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই কিন্তু মঞ্জুশ্রীর যে প্রভাব রহিয়াছে এ কথা সকলেই জানে এবং বিশ্বাস করে। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে একদল খুশী হইয়াছে এবং অপর দল অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তবে সকলেরই বিশ্বাস, সঞ্জিত মঞ্জুশ্রীর নজরে পড়িয়াছে, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এবং মঞ্জুশ্রী যখন প্রীতির চোখে দেখিয়াছে, তখন রাজেন্দ্র শত চেষ্টায়ও তাহার উন্নতি রোধ করিতে পারিবে না।

বিষয়টি বড় নয়, অতি সাধারণ। সর্বত্র এমন হইয়া থাকে। কিন্তু এই সামান্য বিষয়টি অতি বড় হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল—ঘরে-বাইরে ঝড় সৃষ্টি করিল।

ছগনলালবাবু বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, কাজটি মা ভাল হোবে না। রাজেনবাবু অপমান মোনে করে বিবাদ করিবেন।

মঞ্জুশ্রী ভাল করিয়াই জানে যে, কাহারও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিলে সহজে কেউ মানিয়া লয় না, বিশেষ করিয়া রাজেন্দ্রের মত দাম্ভিক ও ক্ষমতালোভী যুবক। মঞ্জুশ্রী ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিয়াছে এবং উহার পরিণাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সে জ্ঞাতসারে তাহার পিতার মিলে অবিচার হইতে দিবে না, পিতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। অনিবার্য সংঘাতকে সে জানিয়া শুনিয়াই গ্রহণ করিয়াছে।

তাই মঞ্জুশ্রী উত্তরে বলিয়াছিল, অন্যায় অবিচারের প্রতিকারে অপমান হয় না, গৌরব তাতে বাড়ে কাকাবাবু। বাবা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

কিন্তু রাজেনবাবু—

রাজেনবাবুর অজ্ঞাতে কিছু করিনি।

তিনি সম্মতি দিয়েছেন?

কোন সম্মতি দেননি, তবে আপত্তিও করেন নি।

কাজটা মা ভাল হোবে না, রাজেনবাবুর তাতে "পজিসন" নষ্ট হোবে, শ্রমিকরা মানবে না।

সে ভয় নেই। রাজেনবাবুর সম্মান যাতে নষ্ট না হয় সে ভাবেই করেছি। এটা রাজেনবাবুর ব্যবস্থা বলেই এরা জানে।

ছগনলালবাবু সরল মানুষ, চিরকাল গোলযোগ এড়াইয়া চলিয়াছেন। মঞ্জুশ্রীর কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। কোন কথা লোকনাথবাবুকে জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রাজেন্দ্র যদি একেবারে নির্বাক না হইয়া যাইত তবে বোধ হয় তিনি মীমাংসার জন্য লোকনাথবাবুকে সংবাদ জানাইতেন। ছগনলালবাবু রাজেন্দ্রকে ভুল বুঝিয়াছেন। রাজেন্দ্র চুপ করিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রতিশোধ নিতে ভুলে নাই এবং পাকে ফেলিয়া সকল ক্ষমতা নিজের হাতে লইবার উদ্দেশ্যে মঞ্জুশ্রীকে জড়াইবার জন্য ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে মাকড়সার জাল বুনিয়া চলিয়াছে। সে জালে রাজেন্দ্র সঞ্জিতকে নিষ্পেষিত করিতে চায় আর মঞ্জুশ্রীর মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতে চায়।

সঞ্জিতের পদোন্নতিতে এবং মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় রাজেন্দ্রের মনে শুধু বিষের আগুন জ্বলে নাই, শ্রমিকসঙ্ঘকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, অলকনন্দাকেও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

সঞ্জিত শ্রমিক সঙ্ঘের মস্ত বড় শক্তি। সঞ্জিত প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। প্রথমেই যদি বাধা না দেওয়া যায় তবে সঞ্জিত পুঁজীবাদীদের ক্রীড়নক হইয়া পড়িবে এবং সদলবলে শ্রমিক সঙ্ঘকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতে যথাশক্তি নিয়োজিত করিবে। মঞ্জুশ্রীর সদিচ্ছা আন্তরিক নয়—কৌশল মাত্র এবং ধনতন্ত্রবাদের একটা আধুনিকতম অস্ত্র। ইহাই সঙ্ঘের দৃঢ় বিশ্বাস।

সঞ্জিতকে লইয়া যে সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছে তাহা সঞ্জিতের কানে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সঞ্জিত গায়ে পড়িয়া কোন প্রতিবাদ করিতে গেল না।

সঞ্জিতের সহিত অলকনন্দাও এ বিষয়ে কোন কথা বলে নাই। অলকনন্দা শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদিকা। তাহার হয়ত একটা দায়িত্ব আছে। তাহারই এ বিষয়ে প্রথমে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, প্রতিকারের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সভা আহ্বান করা উচিত ছিল। সকলে 'গেল' 'গেল' বলিয়া রব তোলা সত্ত্বেও অলকনন্দা সঞ্জিতকে কোন কথা বলিল না এবং ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশও করিল না। এ বিষয়ে আর একজন বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না, তিনি সঙ্ঘের সভানেত্রী কমরেড প্রভাতী দেবী।

প্রভাতী দেবীর বয়স খুব বেশী না হইলেও পঞ্চাশের নিকটবর্তী। প্রায় পঁচিশ বছর ধরিয়া তিনি দেশের সেবা করিতেছেন। এ পঁচিশ বছরে তাঁহার উপর দিয়া ছোট বড় বহু ঝড় ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। বহুবার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছে, বহু শ্রমিক ধর্মঘট তাহাকে পরিচালনা করিতে হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী জীবনে যৎসামান্য যে অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তাহা বহু পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে যে তাহাকে নিঃস্ব, গরীব

ও বুভুক্ষিত কুলি মজুরদের সাহায্য করিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়। প্রভাতী দেবীর অর্থ নাই, অতি কষ্টে তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হয়। তবু তিনি শ্রমিকদের নেত্রী। খুব বড় ত্যাগ করিবার তিনি সুযোগ পান নাই, এমন কি সুখের সংসারও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় নাই। জননায়িকার জীবনের পূর্বকার ইতিহাস কেহ জানে না, তবে তাহা সুখের ছিল না, দুঃখময়ই ছিল। ঐশ্বর্য নাই, বিরাট আভিজাত্য নাই, উচ্চ শিক্ষার নিদর্শনও নাই, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ত্যাগের মহিমাও নাই তবু তিনি এদের নেত্রী। শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রেমের আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত, তাই কোন ঐশ্বর্য, সম্মান ও আভিজাত্য তাঁহাকে একটু নীচে নামাইতে পারে নাই। কোন কলঙ্কের ছিটা জননীর পবিত্র বিমল জ্যোতি একটু ম্লান করিতে পারে নাই।

প্রভাতী দেবীকে বহু বড় বড় ঝড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাই তিনি সঞ্জিতের বিষয়ে কোন উদ্বেগই বোধ করিলেন না। কিন্তু অলকনন্দা প্রভাতী দেবীর মত একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। যদিও সে মুখে কোন কিছু প্রকাশ করিল না, কিন্তু মনে মনে চিন্তিত হইয়া পড়িল। পুরুষের চোখকে সে বিশ্বাস করিতে পারে না, পারিলেও সকল সময় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। যৌবনের প্রান্তে আসিয়া মানুষ পশ্চাতে ফিরিয়া তাকায়, যৌবনের জৌলুস তাহাকে বিভ্রান্ত করে। তাই অলকনন্দার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

কি এক ছুটি উপলক্ষে শ্রমিক সভা আহবান করা হইয়াছিল এবং প্রধান বক্তার সম্মান সঞ্জিতকেই দেওয়া হইয়াছিল। সকলে আশা করিয়াছিল, সঞ্জিত মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিলেও অন্তত সভায় যোগদান করিবে। কিন্তু সঞ্জিত সভায় যোগদান করিল না, এমন কি কোন অজুহাত দেখাইয়া কোন সংবাদও পাঠাইল না।

অলকনন্দার সঙ্গে সভা সম্পর্কে সঞ্জিতের কথা হইয়াছিল। সঞ্জিত স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলে নাই সত্য কিন্তু তাহার কথার ভাবে এ কথাই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, সে সভায় যোগদান করিবে।

সঞ্জিত না আসায় অলকনন্দাকেই প্রধান বক্তার অংশ গ্রহণ করিতে হইল। সঞ্জিতের ব্যবহারে অলকনন্দার মন স্বাভাবিক নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সঞ্জিত আসে নাই, আর কখনও আসিবে না। সঞ্জিতকে সে হারাইল।

ঐশ্বর্য কি এতই বড় যে, সঞ্জিতের মত এত বড় একজন শক্তিমান কর্মী এত সহজে বিকাইয়া যাইতে পারে? যে জীবনে এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, এত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে সে এত সহজে কি করিয়া আপনাকে এত তুচ্ছ বিষয়ে বিলাইয়া দিতে পারে, এত বড় গ্লানি মাথায় তুলিয়া লইতে পারে? শুধু কি অর্থ, শুধু চাকুরীর চাকচিক্য এত বড় ব্যক্তিত্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে পারে? তাহার ভালবাসা কি এর ঊর্ধ্বে নয়?

নিজের ভালবাসার কথা ভাবিতে গিয়া অলকনন্দার মঞ্জুশ্রীর কথা মনে পড়িয়া যায়। মঞ্জুশ্রী কি অপরূপ রূপসী, তাহার কণ্ঠস্বর কি মাদকতায় পূর্ণ? অলকনন্দা ভাবিতে পারে না, চাপা ঈর্ষা তাহার মনে আগুন ছড়াইয়া দেয়।

কমরেড চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি প্রভাতী দেবীকে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিয়া সংক্ষেপে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করিলেন।

প্রভাতী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, আজ কমরেড সঞ্জিতকুমার লাহিড়ীর বক্তৃতা করবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি এখনও পর্যন্ত সভায় যোগদান করেন নি। জগৎধাত্রী মিলের দুর্ঘটনা, ডায়মণ্ড মিলের গোলযোগ, কয়েকজন সদস্যের পদত্যাগ প্রভৃতি কতকগুলি জরুরী বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা হবে। কাজেই আমরা সঞ্জিতবাবুর জন্য আর অপেক্ষা করতে পারিনে। কমরেড অলকনন্দা দেবী আজ শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন।

অলকনন্দা পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। জড়তা কাটাইবার জন্য এবং বক্তৃতায় স্বাভাবিক গতি আনিবার জন্য পুস্তকের কথা পাড়িয়া বলিল, শ্রমিক কাহারা? শ্রমিক হল ওরাই, যারা প্রকৃতি ও আপনার বস্তুতান্ত্রিক সম্বন্ধকে নিজের ইচ্ছানুসারে চালনা, নিয়ন্ত্রণ ও দমন করে। মানুষ ও প্রকৃতির কার্যকরী সংযোগই শ্রম।

যাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলা, তাহারা অলকনন্দার একটি কথাও বুঝিতে পারিল না। সহজ করিয়া বলিবার জন্য সকলে চেঁচাইয়া উঠিল।

অলকনন্দা লজ্জিত হইয়া বলিল, আমার মন আজ স্বাভাবিক নয়, আশা করি কমরেডগণ আমার অক্ষমতার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।

প্রভাতী দেবী অলকনন্দাকে বলিলেন, ভাবপ্রবণ বক্তৃতা কর, বড় বড় কথা বলে এঁদের জড় প্রাণ সজীব করে তোল, এরা যুক্তি তর্ক বোঝে না, সহজ করে এদের অবস্থা এদের বুঝিয়ে বল।

অলকনন্দা বলিয়া চলিল, কমরেড, আমি বলতে চাই কোন শ্রমই হীন নয়। শ্রমিক জাতিই সভ্যতা গড়েছে, যুগ যুগ ধরে সভ্যতার আলোকবর্তিকা বহন করে নিচ্ছে। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে তা কাদের? শ্রমিকদের। কিন্তু শ্রমিকরা ত' কিছু পেলে না। মানসিক ও কায়িক শ্রমিকরা শুধু দিলেই, পেলে না কিছু। ধনতন্ত্রবাদের নাগপাশে পৃথিবী এমনিভাবে জড়িয়ে গেছে যে, ন্যায্য অধিকার পাওয়া ত' দূরের কথা সহজ ভাবে বেঁচে থাকবার কোন পথ আর খোলা রইল না। আমরা খেতে পাচ্ছিনে অথচ ক্রোড়পতিরা ঐশ্বর্যের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

শুনে আপনারা আশ্চর্য হবেন, দুর্ভিক্ষের দিনেও ক্রোড়পতিরা শস্য পুড়িয়ে দেয়। যুদ্ধ যতো বাধে সেজন্যে ব্যবসায়ীরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না।

চন্দ্রনাথ অলকনন্দাকে কানে কানে জগৎধাত্রী মিল ও অন্যান্য মিলের গোলযোগ সম্পর্কে বলিতে বলিল।

সঞ্জিত যে সভায় আসিয়াছে তাহা বিশেষ কেহ লক্ষ্য করে নাই। সঞ্জিত আজ আর সভামঞ্চের দিকে যায় নাই, চুপচাপ শ্রোতাদের পাশে বসিয়া পড়িল।

অলকনন্দা হয়ত সঞ্জিতকে লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু অলকনন্দা যখন মিল পরিচালনার, বিশেষ করিয়া জগৎধাত্রী মিলসের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিল তখন সঞ্জিত মনে করিল, অলকনন্দা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাণগুলি নিক্ষেপ করিতেছে।

কৃত্রিম সভ্যতা ও পুঁজিবাদ ধ্বংসের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিবার জন্য আবেদন জানাইয়া অলকনন্দা বলিল, কমরেডগণ, যারা শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য তাদের মিল কর্তৃপক্ষ বিতাড়িত করে দিচ্ছেন। জগৎধাত্রী মিলেই অত্যাচার চরমে উঠেছে। আপনাদের অনেকেরই চোখের ওপর শঙ্করলালের মিল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। শঙ্করলাল সঙ্ঘের সদস্য ছিল বলে কর্তৃপক্ষ তার বিধবা স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ দিতে চায় নি। আমরা খরচপত্র দিয়ে যখন শঙ্করলালের স্ত্রীকে দিয়ে মামলা করাই তখন কর্তৃপক্ষ নানা প্রকার ভয় ও লোভ দেখিয়ে মামলা প্রত্যাহার করিয়ে নিতে শঙ্করলালের স্ত্রীকে বাধ্য করেন। আপনারা জানেন একটি মূল্যবান জীবনের পরিবর্তে বিধবা স্ত্রী ও অনাথ পুত্রকন্যাগণ সামান্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এ অন্যায় ও অবিচার—জুলুম আর কতকাল চলবে।

মজুরেরা প্রতিকারের জন্য চীৎকার করিয়া উঠিল।

অলকনন্দা বলিল, কর্তৃপক্ষকে আমরা বহুবার অনুরোধ করেছি। ওঁরা আমাদের শেষ অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন ধর্মঘট ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই।

সঞ্জিত উঠিয়া দাঁড়াইতেই অলকনন্দা থামিয়া গেল। সঞ্জিত বলিল, বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিচ্ছি বলে সভানেত্রী ও কমরেড অলকনন্দা দেবী আমায় ক্ষমা করবেন। জগৎধাত্রী মিল সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা' সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

ঠিক নয়! অলকনন্দা আক্রমণের সুরে বলিল, শ্রমিক সঙ্ঘকে জব্দ করবার জন্যে শঙ্করলালের বিধবা স্ত্রীর কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়নি? কমরেড কি বলতে চান, শঙ্করলালের মৃত্যু সংবাদ জানাবার জন্যে মালিকরামের কাজ যায়নি? কমরেড কি অস্বীকার করতে চান যে, সঙ্ঘকে ধ্বংস করবার জন্যে সদস্যদের সামান্য অজুহাতে জরিমানা ও কর্মচ্যুত করা হচ্ছে না?

চন্দ্রনাথ অলকনন্দাকে প্রম্‌ট করিয়া চলিল, আর অলকনন্দা একটির পর একটি করিয়া বহু প্রশ্ন করিল।

সঞ্জিত অভিযোগ অস্বীকার করিতে চায় নাই, সে চাহিয়াছিল মীমাংসার পথ খুঁজিবার জন্য অনুরোধ করিতে। অলকনন্দা চন্দ্রনাথের প্রম্‌ট শুনিয়া শুনিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যখন একটার পর একটা করিয়া মামুলী অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল তখন সঞ্জিতের মনে একটু ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। অলকনন্দা যে প্রকাশ্য সভায় তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া এমনভাবে আক্রমণ করিতে পারে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

প্রভাতী দেবী বলিলেন, কমরেড বোধ হয় এ সকল অভিযোগ ও সত্য ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন না।

সঞ্জিত কোন জবাব না দিয়া বসিয়া পড়িল।

শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। সঞ্জিত আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বলিল, আপনারা মস্ত বড় ভুল করছেন এবং এ ভুলের জন্যে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হবে। ধর্মঘট বন্ধ রাখুন, আমি অনুরোধ করছি।

প্রভাতী দেবী প্রশ্ন করিলেন, কারণ?

সঞ্জিত বলিল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচার করে কখনও মঙ্গল হয় না এবং আংশিক স্বার্থ সিদ্ধ হলেও তা' স্থায়ী হয় না। রাজেনবাবু অত্যাচার পীড়ন করেন সত্য কিন্তু মিলের মালিক এবার হস্তক্ষেপ করেছেন। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি লোকনাথবাবু ও তাঁর কন্যা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং দয়ালু। আপনারা হিংসাত্মক প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

অলকনন্দা বলিল, আপনার মত একজন নিষ্ঠাবান ও আদর্শ কর্মীর মুখে প্রতিক্রিয়াশীলদের কথা শোভা পায় না।

—আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন। আমি নিশ্চিত জেনেই এ কথা বলেছি। মঞ্জুশ্রী দেবী নিজে এখন দেখাশোনা করছেন। আমি জোর করে বলতে পারি, শীঘ্রই এ মিলের পরিচালনা আদর্শ বলে গণ্য হবে। মঞ্জুশ্রী দেবীর সঙ্গে আমার নিজের কথা হয়েছে, তিনি বিশেষ আগ্রহ করে আমার পরামর্শ শুনেছেন এবং আমায় আশ্বাস দিয়েছেন।

মঞ্জুশ্রীর নাম উল্লেখ করায় অলকনন্দা ক্ষেপিয়া গেল সে সাধারণত কখনও চটিয়া যায় না, উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও উত্তেজিত হয় না, ধীরে সুস্থে বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক কথা বলে ও কাজ করে। আজ সে বাক্‌সংযম করিতে পারিল না, আভ্যন্তরীণ উত্তেজনাকে চাপিয়া রাখিতে পারি না; অলকনন্দা একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, লোকনাথবাব কিংবা তার তরুণী কন্যার এত প্রশংসা করবার কি আ আমরা জানিনে, অন্তত কখনও পরিচয়ও পাইনি। কমরেডে হাতের মুঠায় নেবার জন্যে যে এ জাল ফেলা হয়েছে তা' কি কমরেড বুঝিতে পারেন না? সামান্য প্রলোভন, তাও এক পরিচয়, একটু পদোন্নতি এটা কি এত বড় হয়ে গেল কমরেড মহলানবিশের মত এত বড় একজন আদর্শ কর্মী পুঁজিবাদীদের জন্য ওকালতি করতে পারেন? এ শু লজ্জার কথা নয়, দুঃখের কথা, অপমানের কথা।

সঞ্জিত রাগে অপমানে কোন কথা বলিতে পারিল না। অলকনন্দা যে তাহাকে ভুল বুঝিয়া এমনভাবে আঘাত করিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

সভায় ধর্মঘট করাই স্থির হইল এবং কমিটির সভায় দিন স্থির হইলে সদস্যদের জানান হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

মজুররা শ্রমিক ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেলে কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণ অপিস গৃহে গেলেন। প্রভাতী দেবী কমিটি গৃহে যাইবার কালে সঞ্জিবকে বৈঠকে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু সঞ্জিত সম্মত হইল না।

সঞ্জিত মাথা নত করিয়া বসিয়াছিল। অলকনন্দা সঞ্জিতকে ক্রুদ্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যাইতে পারে নাই, কি কথা বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ যেন সঞ্জিত জাগিয়া উঠিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিল, চল।

অলকনন্দা বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায়?

বাড়ি চল।

বাড়ি—মানে, এখন যে কমিটির জরুরী সভা হবে।

আমার চেয়ে জরুরী নিশ্চয় নয়।

তোমার আজ হল কি, এমন ত' কখনও করনি।

সঞ্জিত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, চল।

ছিঃ অমন ছেলেমানুষি কর না। আমাদের মতবিরোধ আজ নতুন নয় চিরকালের। যখন আমরা কিছু বুঝতুম না —অবোঝ বালক-বালিকা ছিলুম তখনও ঝগড়া করেছি, বড় হয়েও করেছি—এখনও করছি। আমরা ভীষণ কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, এখন ত' মিথ্যে অভিমান করা শোভা পায় না।

আমি বাজে কথা শুনতে চাইনে, তুমি বাড়ি যাবে কিনা?

এ তোমার অন্যায় হুকুম। তোমার কাছে এ রকম জুলুম আমি কখনও আশা করিনি।

স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে জুলুম করব এত হীন আমি আজও হইনি অলকা।

তবে?

জগত্ধাত্রী মিলে ধর্মঘট হোক এ আমি চাইনে, এমন কি আমি প্রয়োজন হলে বিরোধিতাও করব।

বিরোধিতা করবে! তুমি কি মনে কর, তোমার স্ত্রী বলে আমাকেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে?

সঞ্জিত শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, না অমন পতিভক্তির আমি প্রশংসা করিনে, এ যুগে এ কোন standard নয়। কিন্তু যা ক্ষতিকর এবং যা ভুল তার প্রতিবাদ জানানর অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা নয়। আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত দেওয়া অন্যায়, বিশেষ করে যেখানে সংশোধনের পথ খোলা রয়েছে।

এ অন্যায়! এ ভুল! এ আঘাত! যারা যুগ যুগ ধরে অন্যায় করছে, অবিচার করছে, শোষণ করছে, যারা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে অতি সামান্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবীটুকু স্বীকার করে নিচ্ছে না তাদের হয়ে তুমি ওকালতি করছ! তোমার যে এত বড় পতন হবে তা' কেউ ভাবতে পারিনি। আমি জানি কেন তুমি সর্বহারাদের ত্যাগ করে ওদের দলে ভিড়েছ।

চমৎকার বক্তৃতা! করতালি পাবার যোগ্য বটে! সত্যি এর পর তোমার আর কুলির স্ত্রী বলে মানায় না। ভুল করছ অলকা, এ কথা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে, তোমার স্বামী তোমার তুলনায় যত বড় অপদার্থই হোক না কেন কখনও ঘুস খায় না।

শিশু বয়স থেকেই তোমায় আমি জানি, তোমার কোন কথাই আমার কাছে অজ্ঞাত নয়। তুমি assistant weaving master হয়েছ বলে কিংবা ঘুস খেয়ে যে দল ত্যাগ করবে না তা আমি জানি। আমি এ কথাও ভাল করে জানি, তুমি সরল, তুমি দুর্বল। তাই মঞ্জুশ্রী অত সহজে তোমায় বিভ্রান্ত করতে পেরেছে—তাই ত' আমার এত ভয়, এত উৎকণ্ঠা।

সঞ্জিত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, অলকা।

না, না আমার এ অনুমান মিথ্যে নয়। যুবতী নারীর পরোক্ষ প্রভাবেই এ চিত্ত চাঞ্চল্য। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এ দুর্বলতা কেন? এত ঘাতপ্রতিঘাতেও কি মন দৃঢ় হয়নি? চাঞ্চল্যের বয়স কি আর তোমার এখনও রয়েছে?

সাধারণ নারীর মত তোমার এ ইতর সন্দেহ মানায় না— এর জন্যে তোমার দুঃখ করতে হবে, অনুতাপ করতে হবে অলকা।

দুঃখ করব তোমার জন্যে আর আমার অদৃষ্টের জন্যে।

ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছ অলকা।

আঘাত খেলে দুর্বল মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। অলকনন্দা সঞ্জিতের হাত ধরিয়া বলিল, তোমায় মিনতি করছি, এত বড় ভুল কর না।

কি সব বাজে বকছ। তোমার এ নোংরামি—

নোংরামি! তুমি মনে কর, তোমার সকল কথা আমি জানিনে। তুমি গোপন করতে পার, কিন্তু আমি জেনেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে তোমার কথা হয়, একত্রে চা'ও খেয়েছ, কাজ দেখবার ছল করে রোজ মঞ্জুশ্রী তোমার কাছে আসে—কত হাসি ঠাট্টা হয়—অস্বীকার করতে পার। বলি, লোকেই বা বলে কি?

তাতে দোষটা কি হল?

শুধু দোষ নয়, একজন কম্যুনিষ্টের পক্ষে এ অপরাধ। তা' ছাড়া এ ত' ক্ষণিকের মোহ। মানুষের মাঝে মাঝে এমনি মোহ হয়, কিন্তু তা' সফল হয় না, সফল হলেও সুন্দর হয় না, মঙ্গলও হয় না। এ কথা সর্বদা মনে রেখো— একদিন তার বংশমর্যাদা, ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য তোমায় মাড়িয়ে যাবে। আগুন নিয়ে খেলা ক'র না।

তোমার এ নীচতা ও হীনতার উত্তর আমি দিতে

পারছ না। দেশসেবাই কর আর নারীত্ব নিয়ে লড়াই কর শেষ পর্যন্ত তোমরা শুধু নারী। যে মুখোসই পর না কেন স্বার্থের সংঘাতে নারীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে তোমাদের আসতেই হয়।

হয়ত আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য নয়, কিন্তু তোমাদের অচেতন মনের আকর্ষণ ভুল নয়। এ মোহ—

তবু বলবে মোহ। দেশসেবিকা হয়ে একটি ভদ্র মহিলার সম্মান রেখে কথা বলবার মতও তোমার ভদ্রতা নেই। এই সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে করবে দেশোদ্ধার আর এই সম্পদ নিয়ে চাও নারীর সমান অধিকার? তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তোমার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন মতামতের ওপর আমি কখনও হস্তক্ষেপ করিনি, করতে চাইও না।

সঞ্জিত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অলকনন্দা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

প্রভাতী দেবী আসিয়া সস্নেহে অলকনন্দার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, ছিঃ কাঁদিসনি, খামকা ঝগড়া করলি। একটু বুঝিয়ে বললেই হত। কাল আমি যাব'খন, ধমকে দেব দেখিস আর কখনও তোকে কাঁদাতে সাহস পাবে না। নে চোখ মোছ।

না, তুমি কিছু বল না দিদি।

সে পরে বুঝব'খন, চ'!

প্রভাতী দেবী অলকনন্দার হাত ধরিয়া ভিতরে গেলেন।

সঞ্জিত কুলি বস্তিতে থাকে। টালির ছাদ, ভিটা ও দেওয়াল পাকা। বহু পুরাতন বাড়ি, স্যাঁৎসেতে। টালির বহু বাড়ি লইয়া কুলি কোয়াটার করা হইয়াছে। যে সকল শ্রমিক শিক্ষিত ও বেশী রোজগার করে তাহারা এই কোয়াটারে বাস করে। এখানে ভাড়া বেশী দিতে হয়। প্রত্যেক ভাড়াটের জন্য দুটি করিয়া ঘর, একটি বড়, অপরটি ঝাড়ুদার রহিয়াছে কিন্তু কোয়াটারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য মেথর, পাহারা দিবার জন্য দ্বারবান। ছোট একটি হাসপাতাল এবং হাসপাতালের ডাক্তারখানা প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবস্থাই আছে। প্রতি ভাড়াটের জন্য পৃথক পৃথক জলের কল নাই, কয়েক ঘর মিলাইয়া এক একটি কল। প্রত্যহ কলের জল লইয়া বিবাদ হয় না তবে মাঝে মাঝে হয়, এর কারণ কলের জল দুপুরে ও রাত্রে অল্প অল্প করিয়া পড়ে, একেবারে বন্ধ হইয়া যায় না। যদিও মেথর ঝাড়ুদার রহিয়াছে কিন্তু কোয়াটারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। বাড়ি-ঘর, উঠান, রাস্তা সমস্তই অপরিষ্কার। কুলিরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না—স্বভাবও নয়। কাজ ও খাওয়াপরা ভিন্ন এরা আর কিছু জানে না, চায়ও না।

এ কোয়াটারে সঞ্জিতের বাড়িটাই শুধু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সঞ্জিতের এক পাশে থাকে চন্দ্ররাও ও তাহার স্ত্রী পিয়ারী বাঈ আর অপর পার্শ্বে এক বাঙালী ভদ্রলোক স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বাস করেন। বাঙালী ভদ্রলোকের পাঁচটি সন্তান, ভবিষ্যতে আরও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা রহিয়াছে। পঞ্চাশ টাকা মাসিক আয়, কাজেই তিনি শ্রমিক কর্মীদের এড়াইয়া চলেন। একে সংসারে টানাটানি তারপর মেয়ের সংখ্যাও অধিক এবং বড় মেয়েটি বিবাহযোগ্য হইয়াছে, কাজেই তিনি শ্রমিক কর্মীদের ছায়া মাড়ান না এবং কাজটি বহাল রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট তোয়াজ করিয়া থাকেন। রাজেন্দ্রের সুনজরে পড়ায় এবং শ্রমিক আন্দোলন দমন ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করায় ভদ্রলোকটি সাধারণ শ্রমিকের পদ হইতে উচ্চ-স্তরে উঠিয়াছেন, মাহিনাও নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই দুই পরিবারের মধ্যে পূর্বে যথেষ্ট ঘনিষ্টতা ছিল। ভদ্রলোকটি যখন জানিতে পারেন যে সঞ্জিত ও অলকনন্দা শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য তখন হইতে তিনি তাহাদের সহিত সম্পর্ক চ্ছেদন করিয়াছেন, কখনও বাক্যালাপও করেন না; এমন কি স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সঞ্জিতের বাড়িতে যাইতে দেন না।

চন্দ্ররাও অন্য প্রকৃতির লোক। সে চোখ চাহিয়া চলে না, কান খুলিয়াও কালের গতির শব্দ শুনে না। গতিশীল পৃথিবী তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত। কে আসে কে যায় তাহার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, কাহাকেও সে চায় না, প্রয়োজনও বোধ করে না।

পূর্বে সে এরূপ ছিল না। তাহার শক্তি ছিল, বুদ্ধি ছিল। তাহার সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও পৌরুষ ছিল। আজ তাহার কিছুই নাই। একমাত্র সে মদকেই চিনে। মদের প্রতি তাহার অনুরাগ পুরুষ ও প্রকৃতির অনুরাগের চেয়ে দৃঢ়। পিয়ারী যুবতী এবং রূপসী। দারিদ্র্য ও অতৃপ্ত যৌবন বুভুক্ষায় রূপটা যেন ভয়ঙ্করভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে জিঘাংসার শত শত জিহ্বা যেন সারাক্ষণ নৃত্য করিয়া চলে। ক্রমশ

ক্যালিফোর্ণিয়া

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, ভূপর্যটক

[২]

ক্যালিফোরনিয়ার মত আবহাওয়া পৃথিবীর অনেক স্থানেই আছে, কিন্তু ক্যালিফোরনিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষের হাতেই গড়া, তাই তার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষের নিয়মই হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রে বেঁচে থাকা। ক্যালিফোরনিয়ায় আঙ্গুরের বাগান মাইলের পর মাইল চলেছে। নূতন পল্লব তাতে যখন গজায়, দূরে থেকে মনে হয়, গভীর নীল সাগরের নীল জলে মৃদুমন্দ তরঙ্গ বয়ে চল্‌ছে। স্টকটন (stockton) হতে বের হয়ে প্রশস্ত পথে সাইকেলে ধীরেধীরে যাবার সময় সে দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু আমেরিকার লোক কেউ গজেন্দ্র গমনে চল্‌তে ভালবাসে না। সবাই মোটর হাঁকিয়ে চলছে—আপন মনে আপন কাজে। মাঝে মাঝে দু'একটা ইণ্ডিয়ান কাউবয় প্রকৃতির আদেশ গ্রাহ্য করে, আঙ্গুর বাগানের মাঝে ঘোড়ার উপর বসে হয় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, নয় ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে আছে। তারা হ'লো প্রকৃতির পুত্র। প্রকৃতিকে তারা পদানত করে না, প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থান নেয় মাত্র।

মাঝে মাঝে দু-একটা যাযাবর আমেরিকান একটি ছোট-খাটো সংসার নিজের ঘাড়ে ব'য়ে নিয়ে চলেছে চাষার বাড়িতে কাজ খুঁজতে। মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা বাতাস যদিও বইছে, তবুও তার সর্বশরীর ঘামে ভিজে গেছে পরিশ্রমে। সে চল্‌ছে কাজের খোঁজে, ভাগ্যের অন্বেষণে। এই ধরণের পথিকের অনেক সময়ই অনুসরণ করেছি। মাঝে মাঝে যুবকদেরও দল বেঁধে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছি, তারাও চলেছে অন্নের অন্বেষণে। তাদের চলার মধ্যে উদ্দাম উল্লাস নেই, তারা চলেছে মাথা নত ক'রে, কম্পিত কলেবরে। কখনো বা পথে দাঁড়িয়ে পথিকের কাছে lift পাবার জন্য ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে, কখনো বা তাতে অকৃতকার্য হয়ে পথিককে গালাগালি করছে। এই ধরণের যুবকদের আমি অত্যন্ত ভয় করি। ওরা পথিকের যথাসর্বস্ব অপহরণ ক'রে আঙ্গুর ক্ষেতে, আপেল গাছের আড়ালে, জমির আলে লুকিয়ে থাকে। এরোপ্লেন ছাড়া এদের সন্ধান নেওয়া কষ্টকর হয়। যখনই পথচলার সময় এইসব ছোকরাদের দেখেছি, হয় প্রবলবেগে সাইকেল চালিয়ে ওদের হাত হতে রক্ষা পেয়েছি, নতুবা সাইকেল হতে নেমে ওদের কাছ হতেই কিছু ভিক্ষা চেয়েছি। ওরা বুঝেছে, আমিও তাদের মতই বুভুক্ষু, ওদেরই সম-গোত্রীয়। সমানে সমানে কি বিরোধ হতে পারে?

কিন্তু এসব ঘটনা ঘটবার আগেই আমি এসেছিলাম সানফ্রান্সিস্‌কোতে, মিঃ মোহিত ঘোষের সঙ্গে। মোটর গাড়িতে ভ্রমণ ক'রে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখি নি, অনেক কথা ভাল করে বুঝি নি, তাই পুনরায় বের হয়েছিলাম সাইকেল নিয়ে ক্যালিফোরনিয়া ভ্রমণ করতে। যেদিন বিকালে সানফ্রান্সিস্‌কোতে আসি, সেদিন বড়ই পরিশ্রান্ত ছিলাম। কিন্তু "ট্রেজার আয়লেণ্ড", "ওকলেণ্ড", "বার্কলি" এবং অন্যান্য স্থান যেন আমাকে পেছন দিক হতে টানছিল।

মোহিতবাবু আমাকে ক্লেম্প্টিটের মোড়ে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন,—"এবার আপনারটা আপনি দেখে নিন।" এই কথাটার অর্থ বড়ই গভীর। যদিও মোহিতবাবু আই-সি-এস ফেল করেছেন, তিনি আমাদের দেশের একজন বড় জজের ছেলে; তাঁর কাছেও বৃটিশ পাসপোর্ট আছে, কিন্তু তাঁর ধমনীতেও আমারই মত দ্রাবীড় রক্ত বইছে। রঙ তাঁর ফর্সা নয়। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি পৈতৃক আভিজাত্য, আমেরিকার সাদাদের কাছে কিছুই নয়। আমেরিকার শ্বেতকায়রা জানে, শ্বেতকায়ই হলো মনুষ্যত্বের একমাত্র নিদর্শন। তারা যখন বলে "World" তখন মনে করতে হবে ইউরোপ এবং আমেরিকা; তারা যখন বলে 'International' তখন বুঝতে হবে, ইউরোপীয় জাতের একের সঙ্গে অন্যের মিলন; তারা যখন বলে "man" তখন বুঝতে হবে সাদা লোক। যেখানে মানুষের ধারণা এই ধরণের, সেখানে আমি, তুমি কোথায়

ইণ্ডিয়ান বেশে মিঃ কালু ও তাঁহার পুত্র

দাঁড়াই। তাই বড় দুঃখ পেয়েই বোধ হয় মোহিতবাবু বললেন, "আপনারটা আপনি দেখুন।" ফিলিপাইনো, জাপানী এবং সাদাদের হোটেল ঘুরে এলাম, কিন্তু জায়গা কোথাও মিলল না। ফেরবার বেলা আর একটা পথের মোড়ে দেখলাম, একটা সাদা গরিব লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ শুকনো, শরীরে যে বস্ত্র তার রঙ বদলে গেছে, জুতোর চামড়া ছিঁড়ে আঙ্গুলগুলি বেরিয়ে আছে। মাথায় যে টুপি, তা অনেকদিন হয় ব্রাস করা হয় নি, কিন্তু তার হাতে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র, তার নাম Peoples world. এখানে ভুল করা উচিত নয়। এই Peoples worldএর অর্থ সর্ব-সাধারণের পৃথিবী। তাতে সাদা, কালো, বাদামী, পীত সকলকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে People মানে শুধু সাদা নয়, সবাই।

লোকটি ডেকে বলল, "কি খুঁজছেন?"

"একটু মাথা রাখার স্থান কমরেড, আর কিছুই নয়, তার বিনিময়ে অর্থ দিতেও অক্ষম নই।"

লোকটি মাত্র বল্‌ল, "চলুন।" তার পেছনে চললাম। নিয়ে গেল আমায় International Hotelএ। এই হোটেলের মালিক একজন ফরাসী। বিনা বাক্যব্যয়ে হোটেলের

মালিক একখানা ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরে উজ্জ্বল বিজলী বাতি, ঝকঝকে শুভ্র বিছানা, শীতল এবং গরম জল বেসিনে আসছে, যে সব আসবাবপত্র পড়ে আছে, তা দেখলেই মনে হয় এইমাত্র মেজে ঘসে রাখা হয়েছে। ফরাসী লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘরটিতে আমার যথাসর্বস্ব রেখে দিয়ে মোহিত-বাবুকে বিদায় দিতে গেলাম।

মোহিতবাবু বললেন, "পূর্বজন্মের পাপের ফলে এরা কত কষ্ট পাচ্ছে দেখছেন ত? আমি বললাম, "আপনার পূর্ব-জন্মের পাপের ফলে কি কায়স্থ কুলে জন্ম হয় নি? আপনার ব্রাহ্মণের পদরেণু বইতে হয় দেশে, আর বিদেশে আপনি অচ্ছুৎ।" আমার কথা শুনে মোহিতবাবু চুপ করে রইলেন। আমরা সেই সময়টার মত একে অন্যের নিকট বিচ্ছিন্ন হই বটে, কিন্তু সেদিনই আবার দেখা হয়।

আংর্জাতিক হোটেলের বাসিন্দা যতরাজ্যের পাপী। তাতে ইউরোপের নবাগত ইমিগ্রেণ্ট, দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো, এশিয়ার চীনা এবং জাপানীতে সব সময়ই ভর্তি। মাঝে মাঝে দু-একজন আধপাগলা আমেরিকানও এসে আস্তানা গাড়ে। এই আমেরিকানরা সবাই মনুষ্যতত্ত্ববিদ। আমার আসার পরই দু-একজন আমাকে বিশেষভাবেই নানা কথায় বিরক্ত করেছিল বটে, কিন্তু আমি ওদের কথা বাড়াতে দিই নি। আমি মনে করি, অজ্ঞ হয়ে থাকা যেমন কষ্টের কারণটাকে জানতে দেয় না, তেমনি মানবজাতির ঘরের কথা জেনে অনেকেই দুঃখ ছাড়া সুখের সন্ধান বড় পান না।

স্নান করে খাবারের জন্য একটা ছোট জাপানী হোটেলে গিয়ে বসলাম। জাপানী আমার পরিচয় চাইল খাবার দেবার পূর্বে। আমার পরিচয় পেয়ে সে বলল, "আপনি ভয়ানক কালো হয়ে গেছেন।" আমি বললাম, "আমাকে অনেক সময়ই রোদ বৃষ্টির মাঝে ভ্রমণ করতে হয়।" জাপানী হোটেলে আমাকে বসা দেখে অনেক আমেরিকানই আমার দিকে চাইতে লাগলেন। জাপানী এতে ভয় খেয়ে গেল। সে সকলকে জানিয়ে দিল যে, এই ভদ্রলোক একজন ভূপর্যটক এবং জাতে হিন্দু, ভয় করবার কিছু নেই। জাপানীর কথা শুনে অনেকেরই মুখ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমিও হোটেলে খেতে পাচ্ছি বলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

আমাদের দেশে অনেক অপেরা গৃহ আছে। আমেরিকায়ও তার অভাব নেই। অপেরাতে লোক সমাগম হয় অতি কম। অপেরা যেন মান্ধাতার আমলের। কিন্তু মাঝে মাঝে এই অপেরা গৃহগুলিতে রীতিমত নাটক না হয়ে চলচ্চিত্রে ও রীতিমত নাটক হয়। সেই নাটক বা চলচ্চিত্র নিউইয়র্ক হতে চালান হয়।

অপেরা সমাপ্ত হবার পর অপেরার মালিক মুখে মুখে বলে দেন,'অমুক দিন রাশিয়ার ফিল্ম দেখান হবে। এতেই এত লোক সমাগম হয় যে অনেক সময় টিকিট কেনাও মুস্কিল হয়ে পড়ে। রাশিয়ার ছবিতে সত্যিকারের আর্টের যে পরিচয় পাওয়া যায় আমেরিকার ছবিগুলিতে তা' পাওয়া যায় না। এরকম একটি ছবি দেখার সময়ই মিঃ কাল্লু ব'লে এক ভারতীয় চিত্রাভিনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তারই কল্যাণে সেদেশের অনেক ছায়াচিত্রাভিনেতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার অটোগ্রাফ বইএ আমেরিকার লোকের অটোগ্রাফ মোটেই নেই, তার একমাত্র কারণ হলো, আমি ক্রমাগত নিজের অটো-গ্রাফই দিয়েছি। যারা অটোগ্রাফ দেয় তারা অপরের অটোগ্রাফ নিতে তত আগ্রহান্বিত হয় না।

দুদিন ক্রমাগত বেড়িয়ে এবং সিনেমা দেখে কাটালাম। দিনগুলি আমোদ-আহ্লাদে বেশ জমে উঠেছিল। যদি পকেটে টাকা থাকে, শরীরে শক্তি থাকে তবে আনন্দকে আনন্দ বলেই মনে হয়। এসবের অভাবে আনন্দ অনুভব করা যায় না। কিন্তু যখনই মিঃ এটকিনসনের মত লোকের কথা মনে হতো তখনই ভাবতাম, এদের আনন্দের সময় নির্ধারিত, কারণ ওরা শরীরের দিকে মোটেই চায় না। এজন্যই এদের অকাল বার্ধক্য এসে দেখা দেয়।

মিঃ এটকিনসন কোন্ জাত তা ঠিক করা ভয়ানক কষ্টকর। তার শরীরে নানা রক্তের সমাবেশ, গ্রীক, জার্মান, ইংলিশ ইত্যাদি; সেজন্য তিনি পাক্কা আমেরিকান। পাক্কা আমেরিকানরা আমেরিকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। অতএব তাদের রাষ্ট্রনীতির ধরণও অন্য রকমের। প্রকৃত-পক্ষে পাক্কা আমেরিকানদের এবং নিগ্রোদের মানসিক ভাব অনেকটা একরূপই। রোজগার কর, খাও-দাও আর দুনিয়ার মজা লুটে বেড়াও, তাদের জীবনের এইটিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। মিঃ এটকিনসন সেই ধরণের লোক। তিনি আমাকে ক্যালি-ফোর্নিয়া সম্বন্ধে দু'একটি কথা বললেন। আমাদের দেশের লোকের সম্বন্ধেই সেই কথা। কথাগুলি শুনে প্রথম বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না, পরে যখন স্টকটন (Stockton) গিয়ে-ছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম মিঃ এটকিনসন সত্য কথাই বলেছেন। আপাতত কথাটা না বলে অন্য কথা বলা দরকার।

ফ্রিস্ক সুন্দর শহর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব নেই। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে যখন শুয়ে পড়লাম, তখন দেখলাম, কালো কালো একরূপ পোকা শরীরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সুযোগ পেলেই কামড় বসাচ্ছে। এই পোকার কামড় ভয়ানক কষ্টকর। সারারাত্রি মোটেই ঘুম হলো না। মনে হলো বোধ হয় ঘরটারই দোষ। কিন্তু সকাল বেলায় বিছানা ছেড়েই বাড়িওয়ালীকে কথাটা বললাম। তিনি বললেন, পূর্বের রাত্রে পরিশ্রান্ত থাকার জন্যই নিদ্রাধিক্য হয়েছিল এবং কিছুই টের পাইনি, আজ মাত্র টের পেয়েছি। এটা বাড়ির দোষ নয়, এটা আমার অস্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণের দোষ। পূর্বের দিন কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম তাই তাকে বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, হোটেলের বাথরুমে এরকম ছোট ছোট পোকার জন্মস্থান। যা হ'ক তিনি পোকাগুলি দূর করার বন্দোবস্ত করে দিবেন আশ্বাস দিলেন। পরদিন আর পোকার কামড়ে কষ্ট পেতে হয় নি।

ফ্রিস্ক শহর হচ্ছে নাবিকদের আড্ডা। তারাই নানাস্থান থেকে এই জাতীয় কদর্য পোকার আমদানী করেছিল ব'লেই সকলের অনুমান। কিন্তু এই পোকা এখন সুযোগ পেলেই

কোথা হতে এসে বিছানা দখল ক'রে বসে। এই পোকার ধ্বংসের জন্য ফ্রিস্ক শহরে মাসে মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচ হয়ে থাকে। পোকার রং কালো। আমাদের দেশে কুকুরের শরীরে এই ধরণের পোকা হয়ে থাকে। পোকাগুলি এত শীঘ্র চলে যে, সহজে এদেরে ধরতে পারা যায় না, ধরতে পারলেও মারা অত সহজ নয়।

ফ্রিস্ক শহরের Down Town হলো মার্কেট স্ট্রীট। মার্কেট স্ট্রীটটা লম্বায় হবে হ্যারিসন রোডের দ্বিগুণ। ইচ্ছা হলো একবার ঐ স্ট্রীটটায় বেড়িয়ে আসি। এই রাস্তার কাছে ফোর্থ, ফিফ্থ এবং সিক্সথ স্ট্রীট—যেখানে হাওয়ার্ড স্ট্রীট 'কাট' করেছে সেখানে অনেক বদ্ লোক থাকে। মার্কেট স্ট্রীটে যাবার বেলা হাওয়ার্ড স্ট্রীট দেখলাম। বুঝে নিলাম হাওয়ার্ড স্ট্রীট মানে কি।

এই নগরের Down Town মার্কেট স্ট্রীটের বাস্তবিকই নূতনত্ব আছে। অন্তত তিনটা দোকানের সামনে তিনদল যুবক পাহারা দিয়ে লোককে বলছে, এই দোকানে প্রবেশ করবেন না। দোকানের মালিক মজুরদের মাইনে ভাল দেয় না। দোকানী আমেরিকার শত্রু। সঙ্গে সঙ্গে পুস্তিকাও বিলি করছে।

আমেরিকার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যদি কোন লোক দোকানের বেচাকেনায় বাধা দেয় তবে আইন-মতে সে দোষী তাই যুবকগণ দোকানের সামনে দাঁড়ায় না—পায়চারী করে আর লোককে দোকানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। লোকও তাদের কথা মেনে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এরূপ ক'রেই ফ্রিস্ক শহরে মজুরগণ আপন আপন প্রাপ্য মালিকদের কাছ হতে আদায় করে নিচ্ছে। এই নগরে "হ্যাম এন্ড এগ" আন্দোলনের জোর প্রচার চলছে। কমিউনিস্টরা আড্ডা গেড়েছে বললেও দোষ হয় না। এখানেই ভারতীয় গদরদল পাঁচ নম্বর উড স্ট্রীটে তাদের হেড কোয়ার্টার করেছে। বাস্তবিক এখানের লোকের যেন প্রাণ আছে। প্রত্যহ এরা নূতন কিছু করছে।

হলিউড থেকেও এখানে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের ইউনিয়ন হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে। এদের ইউনিয়নটি অন্য রকমের। এখানে নানারূপে আমোদ-প্রমোদ সকল সময়ই চলছে। অন্যান্য ইউনিয়নের লোক শুধু সিগারেট ফুঁকেই সময় কাটায়, কিন্তু এদের মাঝে অর্থের প্রাচুর্য থাকায় খাদ্যদ্রব্যেরও আমদানী হয়ে থাকে। কলকাতার মেস এবং বোর্ডিংএ ছাত্রেরা চাকরকে চা, পান, এবং সিগারেট এনে দিতে চীৎকার ক'রে আদেশ করে, কিন্তু আমেরিকায় এরকম বাহাদুরী করবার ভাগ্য অনেক বড় লোকেরও হয়ে ওঠে না। এরকম করে যদি কোনও হোস্টেল বয়কেও কিছু আদেশ করা হয় তবে তার জবাব বড় সুবিধার হয় না। সেজন্যই হলিউড ইউনিয়নে খাবার আসার কথাটা বলতে বাধ্য হ'লাম।

একদিন সেখানে গিয়ে বসে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইউনিয়ন গঠনের কারণ কি? "ও সে লম্বা কথা, আমাদের ইউনিয়ন করার দরকার হয়ে পড়েছে ব'লেই ইউনিয়ন করতে বাধ্য হয়েছি।" এর বেশি আর কোন জবাব পাই নি, কিন্তু হলিউডে গিয়ে দেখলাম এরূপ ইউনিয়ন করতে আর্টিস্ট-গণ বাধ্য হয়েছে। আজকালকার দিনে অনেক অভিনেতা এবং অভিনেত্রী নিনচ্‌কার মত বইএ অভিনয় করতে রাজি হয় না। এদিকে ধনীর দল যাকে তাকে ধরে অভিনেতা বানিয়ে অভিনয় করিয়ে নেয়। এর ফলে অনেক অবাঞ্ছিত ছবি বাজারে চলছে। ইউনিয়ন গঠনের পর হতে এসব আর হতে পারে না। ইউনিয়ন বোর্ডও আজকাল নূতন বই পাঠ ক'রে দেখে পৃথিবীর মজুরের পক্ষে বইখানি অনিষ্টকর কি না।

নিউইয়র্কএর "ব্রডওয়ে" পথটার যেমন নাম আছে, সান্-ফ্রান্সিস্কোর মার্কেট স্ট্রীটও তেমনি নাম করেছে। লস্ এঞ্জেলস্ ফ্রিস্ক শহর হতে তিনগুণ বড় হয়েও সেখানে এমন কোন পথ আজ পর্যন্ত মার্কেট স্ট্রীটের মত নাম অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। পথে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। বিকালে একটি সিনেমা গৃহে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো। আমি ভাবিনি সিনেমাগৃহে সিনেমা ছাড়া আর কিছু দেখানো হয়। অনেকের হয়ত জানতে ইচ্ছা হতে পারে, সিনেমাগৃহে আর কি আছে? এসব কথা বলতে আমি পারব না, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, আঙ্কেল স্যাম পাঠ করলে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

সিনেমাগৃহ হতে বের হয়ে এসে কতকগুলি বীভৎস দৃশ্য দেখে মনে হলো, পুঁজিবাদীরা এই পৃথিবীতে কত কুকর্মই করতে সক্ষম হয়। কি করতে সক্ষম হয় তাই বলছি। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এবং আলাবমা স্টেট্-এ অনেক ধনী কৃষক আছে। তাদের টাকার পরিমাণ কত তারাও অনেক সময় জানে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় আমাকে এক ব্যাঙ্কার বলেছিলেন, "আপনার কত টাকা আছে জানেন না ব'লেই পাঁচ পাউন্ড বেশি দিয়েছেন।" আমি তখন আমার প্রতি শ্বেতকায়দের অত্যাচারের কথা ভাবছিলাম। পাঁচ পাউন্ড বেশি চলে গেছে ব'লে চিন্তাও করিনি। কিন্তু এখানকার ধনীরা সেরূপ নয়। তারা শ্বেতকায়। তাদের অপমানিত হবার কারণ নেই। তারা যত মজুর খাটায় তাতে তাদের রাজা বললেও দোষ হয় না। আমাদের দেশের রাজারা কি রকমে সময় কাটান সেই সংবাদ অনেক সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু আমেরিকার ধনীদের কাজকর্ম ক্যালিফোর্নিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। আমি দেখেছিলাম, কয়েকজন ধনী "Dug out" হতে বের হয়ে এসেছেন মাত্র।

ফ্রিস্কোর হাওয়ার্ড রোড মদের দোকানের জন্যই খ্যাতি লাভ করেছে। অবিরাম এই রোডে খাবারের দোকান খোলা থাকে। মাতালরা মদ খেয়ে যখন বিভোর হয় তখন খাবারের দোকানে যায়। দোকানী অনেক সময়ই ডবল দাম পাবার জন্য তৈরী হয়ে থাকে, কিন্তু গোপনীয় পুলিশ যদি ডবল দাম নেবার বেলা দোকানীকে ধরতে পারে তবে শাস্তির ব্যবস্থা করে। এসব গোপনীয় পুলিশ বড়ই সৎলোক।

এখনও ঘুষ দিয়ে এদেরে বাধ্য করা যায় না বলেই এদের সুনাম।

মাতাল যখন মদের নেশায় বিভোর হয়ে পথে পড়ে থাকে, সেই অবস্থায় কেউ তাদের কাছেও যায় না, শুধু ফোন করে পুলিশ স্টেশনে জানিয়ে দেয়। পুলিশ এসে তাদেরে 'ভ্যানে' করে নিয়ে যায় পুলিশ স্টেশনে এবং যখন প্রকৃতিস্থ হয় তখন ছেড়ে দেয়। সেজন্য তাদের কোনওরূপে ফাইন দিতে হয় না কিংবা পুলিশের কাছ হতে প্রহারও খেতে হয় না।

মদ নানা রকমের, তবে 'ভিন' (Vino) মদেরই চল বেশি। যে মদে যত এলকহল তার দাম তত সস্তা। ভিন আঙ্গুরের তৈরি হয়। অনেকগুলি ভিন আছে যা চার হতে পাঁচ বোতল খেলেও নেশা হয় না। দোকানে নিগ্রোর প্রবেশ নিষেধ। এতে ভাল না হয়ে মন্দ হয়েছে। নিগ্রোরা ডজন ডজন বোতল কিনে আপন ঘরে নিয়ে যায় এবং ক্রমাগত পান করে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করে। এ অঞ্চলে অনেক পুর্তগীজ স্পেনিয়াল থাকায় আমার মদের দোকানে যেতে কষ্ট পেতে হ'ত না। মদের দোকান বড়ই আরামের। জগতের যত সংবাদ সব মদের দোকানেই পাওয়া যায়। মদ বড়ই সুখের জিনিস, মনকে একেবারে খুলে দেয়। সেজন্যই বোধ হয় মদের দোকানে প্রত্যেক দেশেই স্বদেশী এবং বিদেশী গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহকারীর সমাবেশ হয়ে থাকে। সামান্য একটু মদ মুখে ঢেলে মাতলামির ভাণ কর আর জগতের যত সংবাদ সংগ্রহ কর, এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ কি হ'তে পারে। বর্তমানে আমেরিকার প্রত্যেক মদের দোকানে আমেরিকার গোপনীয় পুলিশ বসে থাকে, কি জানি মাতাল মজুর এবং মাতাল সৈনিক স্বদেশের সংবাদ বিদেশীকে যদি দিয়ে দেয়।

মিঃ এটকিনসন লেকচারের বন্দোবস্ত করে যাচ্ছিলেন। মিঃ ক্রে সময় মত যথাস্থানে আমাকে নিয়ে সভাস্থলে হাজির করছিলেন। আমি একটা বক্তৃতা দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অন্যত্র যেতাম। ক্রমাগত লেকচার দেওয়া বড়ই কষ্টকর তাই ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম করতে হতো।

একদিন লেকচার দিতে গিয়ে আমাদের দেশের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা গোপন করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু আজ ভারতের কথা গোপন করার উপায় নেই। আমেরিকার নাবিক আজ আমাদের দেশ হতে যেসব সংবাদ নিয়ে যায়, তা বড় বড় জারনেলিস্টও পেতে পারে না। আমেরিকা হতে অনেক নাবিক আমাদের দেশের বন্দরে আসে। এসব লোক সাদা এবং কালোদের মাঝে অবাধে বিচরণ ক'রে আমাদের দেশের নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে আপন দেশে চলে যায়। দেশে গিয়ে তারা বই লিখে ঘরে ঘরে বিতরণ করে। ভারত সম্বন্ধে একখানা বই পেয়েছি যার নমুনা দেখলে মাথা নত না ক'রে থাকতে পারা যায় না।

একজন আমেরিকান কলকাতার একটা বড় হোটেলে এসেছে। তার নিদ্রাভঙ্গ হতে আরম্ভ করে শোওয়া পর্যন্ত কি ক'রে সময় কেটেছে, তাই চিত্রে দেখিয়েছে। আমাদের দেশের *হোমরা-চোমরারা সেজন্য দায়ী, অন্য কেউ নয়। যেরকমভাবে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে চিত্রকরকে আর দোষ* দিয়ে লাভ নেই, অবিকল চিত্রটি এ'কে দিয়েছে। আমরা কোন্ ধাতের লোক ব'লে দিয়েছে। আমাদের মাঝে সকলেই যে একরকম তা নয়, কিন্তু অন্য রকমের লোকের সংখ্যা এত অল্প যে তা একদম গ্রাহ্যের মাঝে আনা যেতে পারে না।

আমার লেকচার শেষ হবার পরই, ভারতপর্যটক একজন আমেরিকান দাঁড়াল গিয়ে স্ট্যান্ডে এবং যা বলিনি সেজন্য আমাকে দোষ দিয়েই, কি কি গোপন করে গেছি তাই বলতে লাগল। লোকটির কথায় আমি মোটেই দুঃখিত হলাম না, কারণ বুঝতে পারলাম তখনও আমি সত্য বলতে শিখি নি। মিথ্যা কথা বলার স্থান আছে, কিন্তু যে সভায় আমি লেকচার দিয়েছিলাম সেখানে মিথ্যা বলা যায় না। তারা পৃথিবীর উপকারই চায় অপকার চায় না। তাদের কাছে আমাদের সমাজের কোথায় কোন্ দোষ তা বলা উচিত ছিল, নতুবা ঔষধের ব্যবস্থা কি করে করতে সক্ষম হবে। আজকাল পৃথিবীতে নূতন মানব সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, তারা চায় না এককে ধ্বংস করে অন্যের মঙ্গল করে, তারা চায় সকলের মঙ্গল। সেই মত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দেশের কথা গোপন করা আমার অন্যায় হয়েছিল। এই লেকচারটির পর হতে আমি আর আমাদের দেশের কোন কথা গোপন করি নি।

মিঃ ক্রে অন্য ধরনের লোক। তিনি পয়সা রোজগারের জন্য তত ব্যস্ত নন। তাকে কোনদিনই আনন্দিত দেখি নি। একদিন জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিনি তাঁর দেশবাসীর প্রতি ভাল মত পোষণ করতে পারছেন না। যখনই কারো মাঝে অভাবের তাড়নায়, অভাবের কারণের নির্দেশ আসে; অমনি ধনীর দল তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কতকগুলি সুখের কল্পনা এনে দেয় এবং সেই সুখ যাতে কার্যকরী হয় তার বন্দোবস্তও করে। লোকটি যখন সুখের বোঝা বয়ে শরীর এবং মনকে দুর্বল ক'রে ফেলে, তখন সুখদাতা বন্ধু হাত গুটিয়ে ফেলে এবং লোকটি চিরতরে Bread Line-এর মেম্বর হয়। আমাকে আমাদের দেশেও সেরূপ করা হয় কি না তাই জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ধনিকদের নিয়ম এবং রীতি একই ধরনের সর্বত্র। এতে দুঃখ করার কিছুই নেই। রকফেলার জগতের মঙ্গলের জন্য যথাসর্বস্ব বিলিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি যে অপকর্ম ক'রে গেছেন তার জন্য তিনি দোষী নন। সোসিয়েলিজম্ তাঁর সময় আবিষ্কার হয়নি, যদি হতো তবে তিনি তাঁর টাকা অর্জনের জন্য দুঃখিত হতেন এবং হস্পিটালে টাকাটা না দিয়ে নবসাহিত্য প্রচারে তা খরচ করতেন। যে টাকা বিতরণ করতে পারে, সে সোসিয়েলিজমও গ্রহণ করতে পারে। মিঃ ক্রে সুখী হয়েছিলেন আমার কথা শুনে।

আমার লেকচার হতো প্রায়ই গির্জায়। গির্জার

(শেষাংশ ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৩

রমেনের রোমান্স

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীরেবতীমোহন সেন

রমেনের শেষ কথাগুলো বৈকুণ্ঠনাথের কানে গিয়েছিল। তিনি বিরক্তভাবে বললেন,—"ও সব জ্যেঠামো রেখে এখন একবার খাবার আয়োজন দেখো দেখি, কিন্তু মিঃ বর্ধন কোথায়?"

রমেন বল্‌লো—"আজ্ঞে, আমিই মিঃ বর্ধন।"

"কখ্‌খনো না, লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার। তুই কি মনে করিস্‌ আমি আমার আপন ভাগ্নে কে চিনি নে? তুই বিজু, বিজয় বোস।"

—"আজ্ঞে আমি বিজু এবং অমিয়ার স্বামী দুই-ই। অমিয়া তুমিই বলো, আমি তোমার স্বামী কি না।" (তার পর তার কানে কানে বললো, 'কি করি বলো, এই রকম প্রশ্নাদি না ক'রে উপায় নেই। খুব চটাপট্‌ আমার কথার জবাব দিয়ে যাবে')।

অমিয়া আস্তে আস্তে বল্‌লো—"হ্যাঁ, জ্যেঠামশায়, ইনিই আমার স্বামী।"

রমেন মুখ খিঁচিয়ে অমিয়ার কানে আবার বললো,—"কথাটা একটু জোর দিয়ে বলতে হয়।"

বৈকুণ্ঠনাথ বল্‌লেন,—"কিন্তু..........."

ব্যাপারটা পাছে আরো জটিল হয়ে পড়ে এই আশংকায় রমেন তাড়াতাড়ি মামার কথায় বাধা দিয়ে বললোঃ—

"আসল কথাটা কি জানেন মামা, এই কুমারী...অমিয়ার প্রতি আমি খুব আসক্ত হয়ে প'ড়েছিলাম, কিছুতেই তার আকর্ষণ এড়াতে পারিনি—এড়ানো একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়লো। অমিয়াই বলো, অসম্ভব হয়েছিল কি না।"

ঈষৎ হেসে অমিয়া উত্তর করলো—"তা হয়েছিল বইকি।"

—"তারপর আমরা বিয়ে করলাম সরাসর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে। কেমন, সত্যি নয় কি, অমিয়া?"

"হাঁ।" অমিয়ার কণ্ঠস্বর আবার মৃদু হ'য়ে পড়েছে।

—"অমিয়া বড্ড লাজুক, দেখছেন তো তার গলা থেকে যেন কথা বেরুতেই চায় না, কিন্তু তা হলেও মামা আপনার কাছে নিঃসংকোচে বলতে পারি, আমার ওপর তার প্রাণের টান অপরিসীম।"

মামার দৃষ্টির আড়ালে অমিয়া রমেনের দিকে একটু ভ্রূকুটি ক'রে রোষের ভাব প্রকাশ করলো।

রমেন তবুও বলতে লাগলোঃ—"এই বিষয়ে আপনার উপদেশ নিতে কিম্বা এ সংবাদটা আপনাকে দিতে ভরসা পাইনি, কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, আপনি হয়তো এই বিয়ে অনুমোদন করবেন না।"

বৈকুণ্ঠনাথ বললেন,—"কেন, অমিয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলবার আছে নাকি?"

—"আজ্ঞে না, তা নয়। আমার ভয় ছিল, আপনি হয়তো আমাকেই তার অযোগ্য ব'লে মনে করবেন, বস্তুত সেরূপ যোগ্যতা সত্যি আমার নেই। তাই অমিয়া আবিষ্কার করলো, মিঃ বর্ধন নামটি। নাম আবিষ্কার বিষয়ে তার দক্ষতার তুলনা নেই। কেমন অমিয়ারাণী, তা নয় কি?"

—"তোমার দক্ষতার তুলনায় সে কিছুই নয়, বিজু মহারাজ।"

বৈকুণ্ঠনাথ গর্জে বল্‌লেন,—"হতভাগা, বুঝতে পাচ্ছি, এ সমস্তই তোর কারসাজি। তোর মত কপর্দকহীন আর্টিস্ট নিশ্চয়ই অমিয়ার অযোগ্য।"

—"আমায় কপর্দকহীন বলছেন বটে, কিন্তু আমার গেল বছরের আয় ত বেশ ভালই হয়েছিল মামা। সত্যি কথাটা হ'ল এই, অমিয়ার আকর্ষণটা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত প্রবল,—মাসখানেক আগে তাকে যখন প্রথম দেখ্‌লাম........"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কঠোরস্বরে বৈকুণ্ঠনাথ বল্‌লেনঃ—"কি বল্‌ছিস্‌? মাত্র মাসখানেক আগে?"

—"আজ্ঞে, তা মাসখানেক কি একবছর কিংবা দুবছর আগে, তা নির্দেশ করে বলা কঠিন,—এ সব ব্যাপারে সময়ের ধারণা ঠিক থাকে না, কিন্তু এটা অতি ঠিক, অমিয়াকে যখন প্রথম দেখ্‌লাম তখনই তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। কেমন অমিয়া একথা সত্যি কি না বল।"

একটু ইতস্তত করে অমিয়া উত্তর করলঃ—"তোমার মুখে ত ওরকম কথাই বরাবর শুনে আসছি।"

—"তার পর আজকে যখন সর্বপ্রথম তার সঙ্গে কথা বললাম.........."

—"কি বল্‌ছিস্‌? এক বছরের ওপর তোদের বিয়ে হয়েছে, অথচ মাত্র আজই প্রথম তার সঙ্গে কথা বল্‌লি? তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা কচ্ছিস্‌, না নেশা করার অভ্যাস করেছিস্‌ হতভাগা?"

—"আজ্ঞে, এ ঠাট্টা নয় এবং নেশা করার অভ্যাসও করিনি। আপনি আমার কথা শেষ করতে দেন নি। আজ সকালে তার সঙ্গে প্রথমেই যে কথা হয়েছিল তাতে তাকে জোর করেই বলেছিলাম, চলো মামার কাছে যাই, এতে যে অমঙ্গলই হোক না, সব বরণ করে নিইগে।"

বজ্র-কঠোর স্বরে হুংকার করে বৈকুণ্ঠনাথ বল্‌লেনঃ—"বটে, আমি একটা দুষ্টগ্রহ, তাই আমার কাছে এলেই অমঙ্গল ঘটবে না?"

রমেন দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলঃ—"আপনি ভুল বুঝবেন না মামা। আমি বলেছি, আমাদের অমঙ্গল অর্থাৎ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছি বলে যা হওয়া উচিত সেই অমঙ্গলের কথা। এই বিষয়ে আলোচনার সময় অমিয়াকে আরও বলেছিলাম, মামার মত দয়ার আধার, যত অপরাধই করিনা কেন, তা স্বীকার করলে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষমা পাব। আমি যে একথা বলেছিলাম, সেটা মনে আছে ত অমিয়া?"

—"আছে বই কি, নিশ্চয় আছে।"

—"অমিয়া সে প্রস্তাবে তখনই রাজি হল।"

বৈকুণ্ঠনাথ সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন,—"বিজু, তা হলে তুইই হলি মিঃ বিবর্ধন অর্থাৎ বিজয় বর্ধন। নামটা যাহক বেশ মানিয়ে গেছে। আমি রাগ কচ্ছি না বরং খুসিই হয়েছি। একটু এগিয়ে আয় তোরা, তোদের আশীর্বাদ করব।"

রমেন ও অমিয়া তখনই বৃদ্ধের পায়ের কাছে এসে জানু পেতে প্রণাম করল। বৈকুণ্ঠনাথ উভয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু বিপদ তাদের তখনও কাটেনি। কিছুক্ষণ পরে পাশের ঘরে এক টেবিলে আহারে বসে রমেনকে সম্বোধন করে বৃদ্ধ বললেনঃ—"বিজু, অমি এখন তোর স্ত্রী। তার মাসোহারার টাকাটা তাহলে এখন থেকে তোর ব্যাঙ্কের একাউন্টেই জমা দেবার জন্য আমার ব্যাঙ্কারদের উপদেশ দেব। ভালই হল, টাকা পাঠাবার জন্য অমির ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আর হায়রান হতে হবে না। কেমন, এ ব্যবস্থা ঠিক হবে ত বিজু?"

—"আজ্ঞে, অতি চমৎকার ব্যবস্থা—এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারেনা।"

যে টাকার জন্য এত সব ষড়যন্ত্র, সেই টাকা সেই মুহূর্তে বিলকুল হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে একান্ত শঙ্কিত মনে অমিয়া বলে উঠলঃ—"কিন্তু জেঠামশায়, ও টাকাটা যে আমার। আমার নামে ঐ টাকা পাঠানই ভাল হয় না কি?"

রমেন বলল,—"তোমার টাকা আর আমার টাকায় কি এখন আর কোন তফাৎ আছে অমিয়া? তোমার কাছেই টাকা থাক কিম্বা আমার ব্যাঙ্কেই জমা হোক, একই কথা। কেমন, তা নয় কি? কিন্তু মামা, টাকা পয়সার ব্যাপারে অমিয়া একটু বে-হিসাবী। তার টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবু না বলে পাচ্ছিনা, বিয়ে হয়েছে অবধি এ পর্যন্ত তার টাকার একটি পয়সাও আমাদের সংসার খরচে ব্যয় হয় নি। এমন কি, আমি তা চোখেও দেখি নি। কেমন সত্যি কি না, মামাকে বল, অমিয়া।"

অমিয়া রাগে গর্জন করে বল্‌লে,—"নিশ্চয়ই হয় নি।"

বৈকুণ্ঠনাথ বললেন,—"না মা, এ তোমার উচিত হয় নি,—এতে তোমার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এই টাকাতে আইনত তোমার কোন অধিকারই হবে না, যতক্ষণ অভিভাবক হিসেবে আমি তাতে সম্মতি না দিই। সুতরাং বিজুর নামেই টাকাটা জমা দেওয়া সঙ্গত মনে কচ্ছি, বিশেষত আর্টিস্ট হিসেবে তার আয় যখন একান্তই সামান্য।"

গভীর তাচ্ছিল্যের সহিত অমিয়া বলল—"আয় ত ছাই!"

বৃদ্ধ বললেন,—"তা হলেও সে যে প্রাণপণে খাটছে, তা স্বীকার করতেই হবে। কাজের চেষ্টায় কষ্ট করে নানা দেশে তার মত ঘুরে বেড়াতে কাউকে দেখিনি,—বাস্তবিকই এ রকম শুনিও নি। ঐ সেদিন ঘুরছে মাইশোরে, তার পরদিন সে একেবারে অজন্তার গুহাতে! দিন পনের আগে স্টুডিও থেকে আমায় একখানা চিঠি দিয়েছিলে না, বিজু?"

—"আজ্ঞে হাঁ,—ঐদিন প্রচুর কাজের ভিতরেও কোনরকমে একটু সময় করে নিয়েছিলাম, আপনাকে লিখব বলে।"

—"কিন্তু ঐ সময় তুমি বোধ করি ছিলে অজন্তায়, কারণ অমিয়া সেখানের কতগুলো ছবি পাঠিয়ে দিয়ে আমায় লিখেছিল, তুমি অজন্তা গুহার ভেতরের আঁকা চিত্রাবলির নৈপুণ্য দেখে কেমন বিস্মিত ও উৎসাহিত হয়েছিলে, কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছিনা..."

রমেন একগাল হেসে তাড়াতাড়ি উত্তর করলঃ—"ও, ঐকথা! আপনি আশ্চার্য্য হয়েছেন ভেবে, একই তারিখে একই সময়ে আমি কেমন করে অজন্তায় এবং আমার এখানকার স্টুডিওতে থাকি,—না, তা একান্তই অসম্ভব। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই,—চিঠিখানা এক সপ্তাহ আগে লিখে রেখেছিলাম কিন্তু ভুলে তখন ডাকে দেওয়া হয়নি, স্টুডিওতে পড়ে থাকে। তারপর আবার চলে যাবার হপ্তাখানেক পরে বেয়ারা সেটা ডাকে ফেলে দেয়।"

অমিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে একটু স্বস্তি অনুভব করলো। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ—"বিজু, তোর আবার বোন্ এলো কোত্থেকে?"

—"বোন? কই, আমার তো কোনো বোন নেই?"

—"অথচ অমি আমায় লিখ্‌লো, তোর এক বোন্ এসেছে, যে তোদের বেবিকে দেখছে এবং এ জন্যেই তোরা আমায় নেমন্তন্ন করে নিতে পারিস্ নি।"

অমিয়ার দিকে চেয়ে রমেন দেখ্‌লো, সে ঠিক সোজা হয়ে বসেছে এবং তার মুখ-চোখ একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার ভাব দেখে কিছু বুঝতে না পেরে রমেন বল্‌লোঃ

—"ও অই কথা বল্‌ছেন? সেটা তেমন কিছু নয়, তবে অমিয়া যখন লিখেছে বোন, তখন সে বোনই বোঝাতে চেষ্টা করেছে। বাস্তবিক সে যে আমার রক্ত-মাংসের বোন্ নয় এবং হতে পারে না, তা আপনিই সকলের চেয়ে ভালো জানেন। অমিয়া বলেছে, নার্সের কথা।"

—"কি, নার্সের বোন? সেই বোন এসে তোদের সঙ্গে কেন থাকবে? আর যদিই বা আসে, তার জন্য আমার নিমন্ত্রণে বাধা পড়বে কেন?"

—"মামা, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। ঐ যে বোনের কথা লিখেছে, সে হলো একজন sister অর্থাৎ রোগী পরিচর্যাকারিণী ইংরেজ নার্স। নার্সদের sister বলা হয় জানেন তো?"

—"তাই বল, রোগটা আশা করি সংক্রামক ছিল না। মেয়েটি এখন ভালোই আছে, না?"

—"মেয়েটি মানে ঐ sister বেশ ভালো লোক, রোগীর জন্য প্রাণ দিয়ে খাটে। সেবার আমার যখন এপেণ্ডিসাইটিস্ হয়েছিল......"

—"সে আবার কবে রে? কই, তোর এই অসুখের কথা তো কখনো শুনিনি?"

রমেন আবার পড়লো মুস্কিলে, কিন্তু তার উপস্থিত বুদ্ধি তাকে তখনও ত্যাগ করে নি। সে বিনীতভাবে বললোঃ—

—"সে সংবাদ জানিয়ে আপনাকে নিরর্থক ভাবনায় ফেলতে চাইনি, কারণ ঐ অসুখটা হয়েছিল এমনি সময় যখন আপনি আপনার সেই বইখানা লিখায় ব্যস্ত ছিলেন—মানে যে বই লিখে আপনার এতো নাম ও সুখ্যাতি হয়েছে।"

বৃদ্ধ তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—"কোন্ বই-এর কথা বল্‌ছিস্?"

একটিবার ঢোক গিলে রমেন বললো,—"ঐ খানা, মানে সকলের শেষ বইখানার ঠিক আগে যে বই লিখেছেন সেইটে। তারপর ঐ যা বল্‌ছিলাম, আমার সেই অসুখের সময় ঐ sister আমার এতো যত্ন করেছিল যে, অমিয়া ঐ কথা স্মরণ করে তাকে লিখেছিল এখানে একবার বেড়িয়ে যাবার জন্য। তাই সে আর ঐ শিশুটি এলো।"

—"কেন, শিশুটি কি আগেই ওখানে ছিল না?"

অমিয়া টেবিলের নীচে তার পা দিয়ে রমেনের পায়ে একটা ঠোকর মারলো ও বুড়োর দৃষ্টির অগোচরে নানা রকম মুখভঙ্গী করে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু রমেন সে ইঙ্গিত গ্রহণ করতে পারলো না,—সে বলে ফেললোঃ—"আজ্ঞে না, সেই ছেলে গুপ্তিপাড়া থেকে পরে এসেছিল।"

—"কি বল্‌ছিস্ তুই? সে যে ছেলে নয় রে, আতুর ঘরের কচি মেয়ে।"

রমেন এবার হতাশ হয়ে অমিয়ার দিকে তাকালো, কিন্তু অমিয়া রইলো মুখ ঘুরিয়ে। তার মিস্‌মিসে কালো দীর্ঘ চুল-ঘেরা মাথাটির বঙ্কিম ভাব তখন রমেনের চোখে যথেষ্ট রমণীয় হলেও উপস্থিত সমস্যার মীমাংসার পক্ষে মোটেই সহায়তা করলো না। নিজের উপস্থিত বুদ্ধির উপরই সম্পূর্ণ ভরসা রেখে রমেন উত্তর করলোঃ—"আজ্ঞে সে তো মেয়েই। আমি কি বলেছিলাম ছেলে? তা হবে, কেননা ছোট ছোট শিশুদের অর্থাৎ কচি ছেলেমেয়ে সবাইকে আমি ছেলেই বলে থাকি। ঐ দেব প্রকৃতি শিশুরা কতোই না আনন্দ দিয়ে থাকে।"

—"বেশ, বুঝলাম, কিন্তু গুপ্তি-পাড়াটা আবার আন্‌লি কোত্থেকে?"

—"গুপ্তিপাড়া? দেখ্‌তে পাচ্ছি, আধুনিক যুগের অনেক চল্‌তি কথার গূঢ়ার্থ আপনার জানা নেই। মামা, রাগ করবেন না, আপনার ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিত লোকেরা এখনও যেন অতীত যুগেই বাস কচ্ছেন। বর্তমান যুগের ভাষায় গুপ্তিপাড়া শব্দটির মানে কখন কখন কচি শিশুদের জন্ম-গ্রহণের পূর্বের অধিষ্ঠান ধরে নেওয়া হয়। যুগে যুগে ভাষায় শব্দের অর্থ কেমন অদ্ভুত রকম বদলে যায়, সেটা বাস্তবিকই গবেষণার বিষয়।"

পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বল্‌লেন,—"তার আর সন্দেহ কি। এই রকম গবেষণায় আমার মনে হয় যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়।

যাক্, এ বিষয়ে একদিন বিশেষভাবে আলোচনা করা যাবে, সাম্নের মার্চ মাসে যখন তুই ও আমি তোদের শিশুটিকে নিয়ে আমার দেশের বাড়িতে যাবি।"

আতঙ্কের ভাবটা যথাসম্ভব চেপে রেখে অমিয়া বলে উঠ্‌লোঃ—

—"দেশের বাড়িতে?"

—"হাঁ, মার্চ মাসের মাঝামাঝি যাবার জন্য তোদের এখনই নিমন্ত্রণ করে রাখ্‌লাম।"

উৎসাহের সহিত রমেন বল্‌লো,—"নিশ্চয়ই যাবো, যাবো বৈকি মামা।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অমিয়া বল্‌লো,—"বিজু, তা কি ক'রে হবে? তখন যে আমাদের দার্জিলিং যাবার কথা। তুমি বলেছিলে, সেখানকার Scenery study করা তোমার ভয়ানক দরকার।"

—"মামার তৃপ্তির জন্য সেটা না হয় কিছুদিন স্থগিতই থাক্‌বে।"

—"স্থগিত রাখা অসম্ভব।"

—"না, অমিয়া অসম্ভব নয়। সেখানের বাড়ি এখনো ঠিক করা হয় নি, তা ছাড়া অন্য সব বন্দোবস্তেরও কিছু করা হয়নি। তবে তোমায় নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবো বটে, তা পরে যেখানে সুবিধে হয় যাওয়া যাবে।"

অমিয়া আবারও আপত্তি তুলে বল্‌তে আরম্ভ করলো,

—"কিন্তু..........."

বৈকুণ্ঠনাথ জোর গলায় বল্‌লেন,—"তোমার কোনো আপত্তিই শোনা হবে না। মোট কথা, আমার ওখানে তোমাদের যেতেই হবে, ব্যস্, আর একটি কথাও শুন্‌তে চাই না।"

বৃদ্ধ অভিভাবকের কাছে তারপর বেশ সদ্ভাবেই বিদায় নিয়ে তারা পুনরায় ট্যাক্সিতে রওনা হ'লো। গাড়ীতে উঠেই অমিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে রমেনকে বল্‌লোঃ—

—"কি অদ্ভুত ধৃষ্টতা ও সাহস আপনার! আপনাকে বিশ্বাস করে শেষটা......"

—"কিন্তু তুমি তো আমায় একটিবারও বলোনি তোমার বুড়ো অভিভাবকটি হচ্চেন আমারই মামা।"

—"আমি কি তা জানতাম যে বল্‌বো? এই ব্যাপারে লাভের মধ্যে এই হলো, তাঁর কাছ থেকে যে টাকাটা পাচ্ছিলাম, সেটা এখন যাবে আপনার তহবিলে,—আমি পাবো না একটা পয়সাও! কি সর্বনাশটা হ'লো বলুন দেখি।"

—"আমরা দু'জন যদি তাঁর বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণটা রক্ষা করে আসি, তবেই তো সব ঠিক হয়ে যায়।"

—"আপনি কি পাগল, তাঁর বাড়ি গিয়ে আবার এই স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করবো?"

—"অভিনয়ে আর প্রয়োজন কি? তখন খাঁটি স্বামী-স্ত্রী হয়েই না হয় যাবো। সত্যি বল্‌তে কি অমিয়া, এ সম্বন্ধটা খাঁটি হওয়াই যে চাই। তুমি জানোনা, কিন্তু তোমায় কতো দিন দেখেছি আমার ষ্টুডিওর সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে যেতে। তখন থেকেই আমি তোমায় মনে মনে ভালো বেসেছি। তারপর তুমি আমারই সৌভাগ্যক্রমে নিজে থেকে এসে আমায় মনোনীত করলে স্বামী হবার জন্য। এ কথাতো অস্বীকার করতে পারবে না। আর একটা কথা তোমার জানা দরকার,—আমি হচ্চি মামার একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং তিনি আমায় কিছুতেই ক্ষমা করবেন না যদি..........."

—"আপনার মাথা একদম বিগ্‌ড়ে গিয়েছে। যা কিছুতেই হবার নয়, তা-ই আপনি বল্‌ছেন।"

—"হতে না পারার কি আছে বলো। পনেরো দিনের নোটিশ দিয়ে বিয়েটা রেজিষ্ট্রি করে নিলেই সব গোল চুকে যায়।"

—"দেখতে পাচ্ছি, মস্তিষ্কটা আপনি হারাননি। সেটা ঠিক রেখেই কৌশলে আমায় এমন অবস্থায় এনে ফেলেছেন, যেখান থেকে আমার বেরোনো কঠিন। গোড়া থেকেই আপনার ওরূপ মৎলব ছিল।"

—"সত্যি অমিয়া, আমি মস্তিষ্ক হারাইনি, হারিয়েছি এই হৃদয়টা,—আর তোমায় পাবার জন্য ও রকম কৌশল অবলম্বন করলেও, যদিও আমি তা করিনি, নিশ্চয়ই দোষের হ'তো না।"

—"কিন্তু এমন অদ্ভুত অবস্থায় বিয়ের কথা কেউ কখনো শুনেছে কি?"

—"হয়তো কেউ শোনেনি, কিন্তু এর ভেতর যে নবীনত্ব আছে,—যে romance আছে, সাধারণত তা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অপর দিকে, তোমার বুড়ো অভিভাবককে তুমি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট করতে ইচ্ছে করো না।"

—"তা বটে,...তবু......"

—"আর তবু ব'লে কি হবে বলো। সবই জানবে অদৃষ্ট।"

রমেনের যুক্তি-প্রদর্শনের আর বেশি দরকার হ'লো না। তিন সপ্তাহ পরে রমেনের রোমান্সের স্বপ্ন সার্থক হ'লো।

(শেষ)

ক্যালি ফোরানিয়া

(৪৪৭ পৃষ্ঠার পর)

পাদরীগণ নিজেদের ভ্রষ্টচরিত্রের কথা যখন আমার মুখ হতে শুনত, তখন তারা মোটেই দুঃখিত হতো না, আনন্দিত হতো। অনেক পাদ্‌রী আমার লেকচার সমাপ্ত হ'লে সর্ব-প্রথমই এসে করমর্দন করত আর বলত, আমরা সেজন্য দোষী নই, আমরাও বেতনভোগী চাকর মাত্র। এরূপ ক'রে যখন তারা তাদের নিজের নিজের অসন্তুষ্টির কথা বলত, তখন সুখী না হয়ে পারতাম না। অনেক পাদরী বলেছে, যতদিন মজুরী ক'রে দিন কাটিয়েছে ততদিন তাদের মন ভাল ছিল, সুনিদ্রা হতো এবং চিন্তাধারা সকল সময়ই ভালোর দিকেই থাকত। এ যে পাদরী জীবন? শুধু কথা ব'লে যাওয়া, যেকথা সবই কাল্পনিক, যার সত্যতা মোটেই নেই, অথচ অসত্যকে কি করে সত্যরূপে অশিক্ষিতের সামনে ধরা যায়—তারই পুরা বন্দোবস্ত করতে হয়। সেই কাজটি যার বিবেক আছে সে করতে পারে না। বিবেককে ফাঁসিতে চড়িয়ে কাজে লাগতে হয়।

পাদরীরা অনেক সময় আমার লেকচার শুনে, কি বলেছি তাই নোট বইএ টুকে নিত। আমার লেকচার টুকে নেবার জন্য কোনও ধনী পরিচালিত সংবাদপত্রসেবী আসত না, কারণ তাদের সুবিধাজনক কোন কথা আমার মুখ হতে বের হতো না। যদি মনগড়া ভুতের গল্প, বাঘ ভাল্লুকের গল্প বলতাম তবে তারা সুখী হতো, আমাকে লুফে নিত আর আমার কথা বড় বড় অক্ষরে ছাপাত। কিন্তু কতকগুলি সংবাদপত্র যাদের ক্যাপিটেল মোটেই নেই তারাই আমার সংবাদ তাদের কাগজে ছাপিয়ে আনন্দ পেত ব'লেই আমার লেকচার কিনে নিত।

পারসীক শিল্পে উদ্যান

শ্রীগুরুদাস সরকার

পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্র (miniature paintings) পরিকল্পনায় অনেক স্থলেই উদ্যান পরিকল্পিত হইয়াছে। কোনও চিত্রে দেখিতে পাই দম্পতি পুষ্পিত বৃক্ষতলে সুখাসনে বসিয়া। কোথও বা কবি উদ্যান মধ্যে পানপাত্র হস্তে বসিয়া আছেন। অন্যত্র শিল্পী দেখাইয়াছেন শেবার রাণী বালকিস্ (Balkis, Queen of Sheba) নহরের পার্শ্বেই উদ্যানান্তে শষ্প শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। যে দেশে অধিকাংশ স্থানই অনুর্বর সে দেশে গাছপালা ও জলের আদর যে বেশীরকম হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? উত্তর পশ্চিম ইরাণ ও মাজেন্দেরাণ প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে পারস্যের অধিকাংশই লতাগুল্ম বৃক্ষাদিবিহীন ঊষর প্রান্তর; মাঝে মাঝে পাহাড় ও সমুচ্চ পর্বত আছে বটে, কিন্তু নিম্নভূমিতে যেখানে নদী, ঝরণা বা জলস্রোত বহিয়াছে, কেবল সেইখানেই সজীব শ্যামলতার আভাস পাওয়া যায়। দিবসের উত্তাপ ও শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিবার জন্য পারসীকেরা তাহাদের দেওয়ালে ঘেরা বাগানের বৃক্ষতলে আশ্রয় লয়, নিকটেই থাকে নহর বা ছোট একটি জলাশয়। কোথাও বা ফোয়ারা হইতে জল উৎসারিত হইয়া 'নহর' দিয়া বহিয়া যায়। কর্মকোলাহল দূরে রাখিয়া এরূপ বাগিচায় যে শান্তিটুকু পাওয়া যায় তাহা যেন মরজগতের পরপারে যে অনন্ত শান্তি বিরাজিত, তাহারই বারতা বহিয়া আনে। ধূলিময় রাজপথের পার্শ্বেই হয়তো বাগানের খাড়া দেওয়াল উঠিয়াছে, বাহির হইতে দেখিয়া ভিতরে কি আছে তাহা বুঝিবার যো নাই। প্রায়ই দেখা যায় এ বাগান তাহাদের বাসগৃহ হইতে পৃথক নয়, যেন বাসগৃহেরই অংশবিশেষ, তাই ইহার চারিদিক ঘিরিয়া সাধারণের দৃষ্টি হইতে ইহাকে তফাৎ করিয়া রাখা হয়। এই সকল বাগানে গৃহবাসী গৃহস্থেরা শুধু বিশ্রামের জন্যই আসে না, এখানেই বন্ধু বন্ধুর সহিত মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ আপ্যায়ন ও নানা বিষয়ের আলোচনায় নিমগ্ন হয়। আবার ভোগসুখে রত বিলাসী বাগানে বসিয়া অন্তরঙ্গগণের সহিত পানামোদে লিপ্ত হন সুপটু পারসী পটুয়া সে ছবিও আঁকিয়াছেন। এরূপ একখানি ক্ষুদ্রক চিত্রে অঙ্কিত বাগিচার সুমনোহর পুষ্পগুলি হঠাৎ দেখিলে মীনা করা বলিয়াই মনে হয়; শিল্পীর এইরূপেই অঙ্কণ পারিপাট্য ও বর্ণপ্রয়োগ কৌশল!

একটু জলের ধারা, অন্তত দুই চারিটি ছায়া ও পুষ্প বৃক্ষ যেখানে নাই, সে উদ্যান উদ্যানপদবাচ্যই নয়। কি প্রণালীতে গৃহপ্রান্তে বৃক্ষ ও বারির সমাবেশে বাস্তুখণ্ডটিকে সজীব রাখিতে হয়, পারসীকেরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। মরমী সুফী বা দরবেশ এইরূপ বাগানে বসিয়াই ভগবচ্চিন্তায় নিরত হন, এইখানেই তাঁহারা অপর মরমীদের সহিত মিলিত হইয়া গভীর দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন। বাগিচার বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের চিন্তার ধারা অনন্তে গিয়া পৌঁছায়। এরূপ সম্মেলন যে সত্যসত্যই ঘটিয়া থাকে পারসীক চিত্রকলায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। পারসীক ফিরদৌস্ (উদ্যান) হইতেই স্বর্গবাচক প্যারাডাইস শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, তাই সৌন্দর্য ইহার একটি প্রধান অঙ্গ। কোনও বাগানের প্রবেশ-মণ্ডপে কৃত্রিম উৎস, কোথাও বা 'সানবাঁধান' চেনার গাছের তলায় বহু কোণ বিশিষ্ট সুশোভন আসন রচনা করা হয়, কখনও বা এরূপ বসিবার স্থান গাছটিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে পারসীক রাজারা কোনও ছায়াশীতল চেনার (plane বৃক্ষের তলদেশে অধিষ্ঠিত রাজসভায় সুখে সমাসীন হইতেন এরূপও শুনা গিয়াছে। বৃক্ষটির কাণ্ডদেশ নাকি রৌপ্যপত্রে মণ্ডিত ছিল। এইপ্রকার বাঁধান বিশ্রামস্থান সিন্দুরিয়া রঙে রঞ্জিত সুদৃশ্য বৃতি দিয়া ঘেরা রহিয়াছে, পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রে এরূপও

শেবার রাণী (Queen of Sheba) বালকিস্ নহরের পার্শ্বে উদ্যান মধ্যে বিশ্রাম করিতেছেন।

দেখিতে পাই। চেনার ও সাইপ্রেস (সরভ) এই উভয় জাতীয় বৃক্ষই প্রাচীন চিত্রে যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। চেনারের আদর একিমিনীয় যুগ হইতে। প্রাচীনকালে সাইপ্রেস্ ছিল অমরত্ব দ্যোতক। আবার দেহযষ্টির ঋজুতা ও সৌন্দর্য বুঝাইতে হইলেও উহা সাইপ্রেসের সহিত তুলনা করা হইত।

নিতান্ত ছোট না হইলে গৃহোদ্যান বক্স, এলম (নাঘ), ওক্ (দিরিখ্তি বালুত), উইলো (আরব), মেপল প্রভৃতি বৃক্ষে সজ্জিত করা হইয়া থাকে। বক্স ও উইলো তরু না থাকিলে যে উদ্যানশোভা সম্পূর্ণ হয় না জনৈক পারসী কবির উক্তি হইতে এইরূপই মনে হয়। ফলবৃক্ষেরও আদর এ দেশে বড় কম নয়। পেস্তা, চেরী (উইশ্না), পীচ (সফতালু), অক্ষোট (আখরোট), খর্জুর, দাড়িম প্রভৃতি বৃক্ষ ও সুমিষ্ট ফলপ্রসূ আঙ্গুরলতা প্রায় অধিকাংশ উদ্যানেই সযত্নে পালিত হইয়া থাকে। ছায়াবৃক্ষ ও ফলবান বৃক্ষের এরূপ পাশাপাশি

সংস্থান হইতে পারস্যের রূপসজ্জায় সুপরিচিত একটি বিশিষ্ট নক্সার উদ্ভব হইয়াছে—সাইপ্রেস ও পুষ্পসমন্বিত তরুর একত্র সন্নিবেশে ইহার একটিতে জীবন এবং অপরটিতে অমরত্ব জ্ঞাপন করে। বড়লোকের বাগিচায় নহরের তলা কোথাও কোথাও চীনামাটির টালি দিয়া বাঁধান। উৎস-মুখ হইতে স্বচ্ছ জলের স্বল্পস্রোত বাঁধান নহরগুলির এই সুদৃশ্য খাত বাহিয়া চলিতে থাকে। নহরের জলে ছোট ছোট মাছ খেলা করিয়া বেড়ায়। যে সকল নহরে স্রোত নাই সেখানে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল এই ক্রীড়ারত মৎস্যগুলি জলে মৃদু সঞ্চালন উপস্থিত করে। উদ্যান মধ্যস্থ বাপীনীরে বিচিত্র বর্ণ দুই চারিটি পালিত হংস ভাসিয়া বেড়ায়। বড় বড় 'বাগ'গুলিতে শুধু মধ্যস্থলে একটি জলাশয় ব্যতীত বাঁধা নক্সায় সাজান আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জলাশয় থাকে; এগুলি প্রধান জলাশয়টির সহিত নহর দ্বারা সংযুক্ত। শুধু তাহাই নহে, নহর সমুদয় এরূপভাবে বিন্যস্ত যে সেগুলি ক্ষুদ্র জলাশয়ের একটিকে অন্যের সহিত সম্মিলিত করিয়া চারিদিকেই সরসতার সৃষ্টি করে এবং সমগ্র বৃক্ষবাটিকা মনোরম করিয়া তুলে।

ফুল না থাকিলে বাগানের কোন মর্যাদাই থাকে না এবং অল্প জায়গায় যেরূপ সুন্দরভাবে ফুলবাগিচা তৈয়ার করা যায় তেমন আর অন্য কিছুই করা চলে না। রক্তগোলাপ পারস্যের নিজস্ব পুষ্প তাই সর্বত্রই ইহার আদর। অন্য বর্ণের গোলাপের মধ্যে পীত ও শ্বেত গোলাপ যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে; শুনিতে পাই মিশ্রবর্ণের গোলাপও অপ্রতুল নয়। গোলাপ ব্যতীত অতি সুগন্ধ এক জাতীয় যূথিকা (ইং Jasmine, পারসী ইয়াস্‌মিন্‌) ইরাণের উদ্যান সুরভিত করে। যূথিকাকুসুম জোরোয়াস্ত্রীয় প্রধান দেবতা বহুমানের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট পবিত্র পুষ্প বলিয়া বিবেচিত। অপর পুষ্পের মধ্যে লিলি (সুসন), আইরিস, ভায়োলেট (বনফশা), পপি (খশখাশ্‌) এনিমোন, কার্ণেশন (করণফুল) প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে উদ্যান-শোভা বর্ধিত হয়; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি পুষ্প সুগন্ধ বিশিষ্ট। প্রাচ্যদেশে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে গন্ধ-পুষ্পেরই সমাদর অধিক, শুধু রঙের বাহার যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। গন্ধে বর্ণে সেরা পুষ্প গোলাপ, তাই কবির কাব্যে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মরমী কবি জালালুদ্দিন গাহিয়াছেন—

> না থাকিবে যবে গোলাপকুসুম,
> ফুলের বাগিচা রবে না আর,
> পাইবে কি শুধু গোলাপ সুবাস
> গোলাপ আসার করিয়া সার।

পারসীকেরা অনেক বিষয় চীনাদের অনুকরণ করিলেও উদ্যান রচনায় প্রাচীন ধারাই বজায় রাখিয়াছে। পারস্যে চীন উদ্যানবিদের অনুকরণে বাগানের ভিতর কৃত্রিম পাহাড় এবং তন্মধ্যস্থ জলাশয় ও প্রণালীর উপর নানা ছাঁদের বিচিত্রাকার সেতু নির্মিত হয় না। চীনা পদ্ধতিতে গাছের উপর ক্ষুদ্রাকৃতি বিরামগৃহ নির্মাণেরও রেওয়াজ নাই। তৎ-পরিবর্তে গাছের ডালে আড়াআড়িভাবে কাষ্ঠ বাঁধিয়া তাহার সহিত মই সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। অন্তত শাহ টামাস্‌পের (Tahmasp) আমলে (খৃঃ অঃ ১৫২৪-৭৬) এ প্রথা যে অপরিচিত ছিল না তাহা পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বিহজাদের নামাঙ্কিত একখানি চিত্র হইতে প্রতিপন্ন হয়। চিত্রনিহিত বিষয়টি এইঃ—রাজা (শাহ টামাসপ্‌ স্বয়ং) বাগানে বেড়াইতে গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াছেন; একটি ভৃত্য অশ্বটি ধরিয়া রহিয়াছে। জনৈক পার্শ্বচর গাছে মই লাগাইয়া উপরে উঠিতেছে; পার্শ্বস্থ সাইপ্রেস্‌ বৃক্ষের শাখায় ফিঙ্গা জাতীয় একটি পক্ষী বসিয়া।

মনে হয়, পারসীক সৌন্দর্যজ্ঞান কৃত্রিমতার পরিপন্থী ছিল। ছাঁটিয়া কাটিয়া, চারিদিক সমান করিয়া বাগানের বা বাস্তুর সীমানার মধ্যে "লন"(lawn) তৈয়ারী করার তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন না, তৎপরিবর্তে দূর্বাদল ও তৃণগুচ্ছ বর্ধিত হইয়া কিছুমাত্রায় 'বন্যতা'র আভাস আনিলে পারস্য-বাসীর চক্ষে তাহাই অধিকতর নয়নাভিরাম বলিয়া আদৃত হইত। এখন কালবশে রুচির কিছু ব্যত্যয় যে না ঘটিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বাহিরের ধারা এখনও বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। তাপক্লিষ্ট পথিক এখনও পপ্‌লার কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করে, এখনও নহরের জলে তাহাদের দেহ স্নিগ্ধ হয়, যদিও পারস্যের জলসেচন প্রথা যাহার উপর প্রধানত নির্ভর করে, বাহিরের সেই জল-প্রণালীগুলি বিদেশীর চক্ষে কুশ্রী বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে।

পারস্যে এই প্রকার উদ্যান রচনার প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করিবার চেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নহে। ইংরেজদিগের নিকট 'গার্ডেন কার্পেট' বলিয়া পরিচিত, বাগানের চিত্র-সমন্বিত এক শ্রেণীর গালিচা সাসানীয় যুগ (২২২-৬৫০ খৃঃ অব্দ) হইতে পারসীক কারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহাতে বৃক্ষপুষ্প, জলপ্রণালী, বাপীতড়াগ এমন কি সন্তরণশীল হংসগুলিও বাঁধা ছাঁচে পরিকল্পিত হইয়া শোভন অলঙ্কাররূপে, বিবিধ বর্ণে, গ্রথিত হইয়া থাকে। বিজয়ী আরব মুসলমানগণ যখন পারস্য দেশ অধিকার করে (খৃঃ অঃ ৬৩৮—৬৪২) তখন একখানি বাগিচার নক্সাযুক্ত সুবৃহৎ রত্নখচিত গালিচা তাহাদের হস্তগত হয়। কথিত আছে ইহা সাসানীয় বংশের দ্বিতীয় খসরুর (খসরু পারভেজের রাজত্বকালে (৫৯০-৬২৮ খৃঃ অব্দ) হইয়াছিল। সম্রাট খসরুর এই বিখ্যাত গালিচায় সন্নিবেশিত ছিল বসন্তকালীন উদ্যানের চিত্র। ইহাতেও পথ নহর, শ্যামল ক্ষেত্র, জলাশয় এবং ফল ও পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষাদি নক্সার বিচিত্র অলঙ্করণরূপে স্থান পাইয়াছিল। ফলগুলি সমস্তই রত্নবিনির্মিত। পথ ও নহর সমুদয় দৈর্ঘে প্রস্থে, আড়াআড়িভাবে, জ্যামিতিক নক্সার অনুকরণে পরস্পরকে ছেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রাচ্য কারুশিল্পে বাঁধা নক্সা একবার গৃহীত হইলে সহজে পরিত্যক্ত হয় না; বয়নকৌশলী পারসীক শিল্পী তাই বাগিচা কার্পেটের মনো-

(শেষাংশ ৪৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সস্তা

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

কলকাতায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকাটা পরিচয়ের সূত্র কখনো হয় না—সুধীরঞ্জনবাবুকে দেখি, তাঁর সুউচ্চ কণ্ঠ শুনি, কিন্তু মৌখিক পরিচয় হবার মতো কোনো কারণ ঘটে নি।

বরাবর আমার বসবার ঘরে এসে যখন ঢুকলেন, একটু শঙ্কিত হলাম। পাশের বাড়ির মালিকের অনাহুত আগমনের পেছনে প্রায়ই থাকে পড়শীর কোনো ত্রুটিজনিত উত্তেজনা।

আমাকে ভদ্রতা করবার সুযোগ না দিয়েই সুধীরঞ্জন-বাবু আসন গ্রহণ ক'রে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। কারণটা অবাঞ্ছনীয় কিছু নয়। তিনি তাঁর ভাড়াটে-মুখাপেক্ষী গ্যারেজ-ঘরটায় একটি মুদির দোকান খুললেন; পাড়া-পড়শীদের সহানুভূতি চান। দোকান প্রতিষ্ঠা হবে কাল। সে উপলক্ষে দস্তুরমত ছাপানো একখানি চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করলেন। হঠাৎ মুদির দোকান কেন খুলছেন তার কারণও জানালেন। মেয়ের বিয়ের সওদা করবার সময় পাইকিরি দরে জিনিস কিনে তিনি আবিষ্কার করেছেন, নিত্য দরকারি এই চাল ডাল নুন তেলে আমরা দিনের পর দিন কী অন্দাজ ঠকে আসছি। দোকানীরা সব নাকি জোচ্চোর। যাতে তিনি নিজে এবং পাড়ার অন্য দশজন ভদ্রলোক সস্তায় ভাল জিনিস পেতে পারেন তারই জন্যে এ ব্যবস্থা। দোকান চলে ভাল, না চলে জিনিস তো তাঁর ফেলা যাবে না।

দুটো গাড়ির আন্দাজ মস্ত গ্যারেজ ঘরটায় একটা কাণ্ড-কারখানা চলছে, আসতে যেতে আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেটা যে মুদির দোকানের জন্ম-পর্ব সেটা ভাবতে পারি নি। পারা সম্ভবও নয়।

বললাম, 'আমি তো ভেবেছিলাম ক্যাবিনেট ফারম খুলছেন।'

হেসে জবাব দিলেন, 'মুদিখানা ব'লে কি মনে করেছেন ব্যাটাদের মতো ন্যাসটি কিছু করবো! এ হবে একদম মডার্ন কায়দায়। বাঙলা দেশে এমনটি দেখেন নি। আসুন না, দেখুন এসে কেমন সব ব্যবস্থা করেছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আসুন—চলুন, দেখবেন, দেখে তারিফ না ক'রে পারবেন না।'

কাজ রেখে বাধ্য হয়েই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হলো। প্রৌঢ় হাসিখুসী লোকটি। দেখলেই মনে হয় মনে নিটোল একটি শান্তি আছে। দোকানে ঢুকেই সগৌরবে সবগুলো আসবাবের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'কেমন মুদিখানা ব'লে মনে হয়?' মাটিতে শোয়ানো প্রকাণ্ড সো-কেসটা দেখিয়ে বললেন, 'চিনি, ময়দা, ডাল, মসলা, সব ঝাড়পোঁছ ক'রে ঢেলে দেব এর খোপে খোপে—এই মস্ত কাচের জারটায় থাকবে তেল, কলের মুখ খুলেই বস্, নিট চলে আসবে বোতলে। দেখবেন মেয়েরা পর্যন্ত সখ ক'রে সওদা করতে আসবে। বাজার ঘুরে শাড়ি পাউডার কিনবে, বাড়ির পাশের দোকান থেকে নিজেদের ভাঁড়ারের জিনিস কিনবে না, স্টাইল নষ্ট হয় যে—' একটু মুচকি হেসে বললেন, 'এই দেখুন একটা বিলিতি কাঁটা কিনেছি, জিজ্ঞেস করবো, মুসুর ডাল ক' পাউন্ড—খুব একটা স্টাইল হবে, কি বলেন?' সুউচ্চ হাসি।

বুঝলাম উদ্দেশ্য ব্যবসা নয়, নেহাৎই খেয়াল। একটা কিছু বলা দরকার, বললাম, 'ভারি সুন্দর করেছেন কিন্তু দোকানটি।'

'আরে মশাই সুন্দরটা বড় কথা নয়, কথা হলো এমনটি করতে খরচাটা কি করেছি। সেখানেই তো ক্রেডিট। বলুন তো দেয়াল জোড়া এই সেলফ্‌টার দাম কত?' টক্ টক্ ক'রে সেল্‌ফের গায়ে টোকা মারলেন। 'পয়লা নম্বর টিক, সাহেব বাড়ির জিনিস—বলুন।' তিন চার সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন। 'পারলেন না তো। ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ—কিনেছি কততে জানেন, ওনলি ফরটি। সমস্ত কলকাতা চষে আসুন, পারবেন না জোটাতে এ দামে—ইমপসিবল্।'

একে একে কোন জিনিসটি কত সস্তায় কিনেছেন বা করিয়েছেন তার পরিচয় দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ড্যাম চিপ-এ হয়ে গেল বলেই তো এত সব করা, নইলে সত্যি কি আর স্টাইলের জন্যে করেছি। ওসব বাজে চালে আমি নেই মশাই।'

একটু পরেই যদিও মনে মনে স্বীকার করতে হলো বাজে চালে তিনি নেই, কিন্তু উপস্থিত কথাটায় সায় দিতে পারলাম না।

সুধীবাবু ব'লে চললেন, 'জিনিস কেনা মস্ত একটা আর্ট, ও সবার আসে না। ন্যাক থাকা চাই। আসুন আপনাকে দেখাচ্ছি আর দু'একটা জিনিস।'

পেছন পেছন বেরিয়ে এলাম। বাড়ির ভেতর ঢুকছেন দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

সুধীবাবু ডাকলেন, 'চলে আসুন। পাশের বাড়ি থাকেন, আপনি তো ঘরের লোক। লজ্জা কিসের।'

একেবারে উপর তলায় তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে হাজির। খুবই আদর আপ্যায়ন ক'রে বসালেন। ভারি মন খোলা লোক, গলাটি তার চেয়েও বেশি খোলা। সব সময়েই যেন হাজার লোকের উদ্দেশে কথা বলছেন। হাঁকডাক করে মেয়েকে দিয়ে এক তাড়া চাবি আনলেন। পাশাপাশি সাজানো আটটি বড় বড় ট্রাঙ্ক, পটাপট তালা খুলে ডালাগুলো তুলে দিলেন।

বললেন, 'বছর তিন আগে গিয়েছিলাম লাহোর আর কাশ্মীর। গরম কাপড় দেখলাম ড্যাম চিপ। আসুন এগিয়ে—এ সব কাপড়ের দর শুনলে আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অল্প মজুরীতে একটা ভালো দরজিও পাওয়া গেল—এক সঙ্গে বেশী করালে দেখলাম আরও কম খরচা, পনেরটা কমপ্লিট সুট আর সাতটা ওভার কোট করিয়ে ফেললাম। জিনিসগুলো দেখে আপনি দামটা আঁচ করুন, তারপর বলছি, আগে ফাঁস করবো না। ছ'টা থানে এখনও হাত

দেওয়াই হয় নি। এ দুটো ট্রাঙ্কে শুধু কাশ্মীরী শাল আর আলোয়ান।'

বললাম, 'এ্যাদ্দিন ধ'রে আছি, আপনাকে কখনো তো সুট পরতে দেখিনি।'

'পরি নে, হয়ত পরবও না। সে কথা নয়, পারচেজটা কেমন হয়েছে তাই দেখুন। আমার ওয়াইফও বলেন, সুট তুমি পর না, এত টাকা খরচ ক'রে এতগুলো তৈরী করাবার দরকারটা ছিল কি। আরে মশাই, খাঁটি দরকারের দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের যাট ভাগ জিনিসই তো বাদ দিতে হয়—কি বলেন? এমন জলের দরে জিনিসগুলি পাচ্ছি, হাত-ছাড়া হয়ে যাবে! মাথা খুঁড়লেও পারবো আমি এখানে জোটাতে এ দামে!

ব্যবসার বাইরে প্রয়োজন বা সখ ছাড়া এমন অদ্ভুত কারণেও যে মানুষ অর্থ ব্যয় ক'রে জিনিস কেনে, আমার জানা ছিল না। এক বেলার পরিচয়ে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে সায় দেওয়াটাই নিরাপদ। তা ছাড়া উপদেশরূপ বস্তুটি ওঁর মস্তিষ্কে ঢোকবার জন্যে এতদিন যাবৎ আমার অপেক্ষায় বসে আছে, এটা মনে করাও অর্বাচীনতা। একে একে অনেক জিনিস দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিস কেনার আর্টের তারিফ ক'রে প্রথম দিনের পরিচয় পর্ব শেষ করলাম।

পুরানো দোকান ছেড়ে সুধীরঞ্জনবাবুর দোকানের গ্রাহক হলাম। ভাল জিনিস সস্তা দরে দেবার প্রতিশ্রুতিটা তিনি ঠিকই রাখতে লাগলেন। মাঝেসাঝে সাক্ষাৎ হয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোকান সম্পর্কে প্রাণ ও গলা খুলে খানিকটা আলাপও করেন। অন্য দোকানীর চেয়ে অনেক ফিকির ফন্দিতে সস্তায় মাল কিনতে জানেন বলেই যে আমাদের এত কম দরে দিতে পারছেন, নানা নজির টেনে সেটাই আচ্ছা ক'রে বুঝিয়ে দেন।

একদিন রাত দশটায় সুধীরঞ্জনবাবুর মুক্তকণ্ঠ নিসৃত আমার নাম শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

বললেন, 'নেবে আসুন মশাই, দেখুন এসে কী কাণ্ড করেছি।'

সুধীরঞ্জনবাবুর পেছনে ছ' সাতটা কুলির মাথায় একটা বিরাট বস্তু। নেবে আসতেই অসাধারণ চেষ্টায় গলাটা একটু খাটো ক'রে বললেন, 'আমেরিকান পিয়ানো, টিপটপ কনডিসান, নিউ প্রাইস হাজার টাকা—মাত্র তিনশো টাকায় কিনে নিয়ে এলাম।'

খুসীর প্রাবল্যে কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন। কুলিদের উপর 'হায়' সম্বলের হিন্দিতে বকাঝকা ক'রে বিরাট বস্তুটিকে বাইরের ঘরে একপাশে বসালেন। আমাকেও বসতে হল। তিনি নিজে এসেছেন রিকসাতে। রিকসাওলার মতে চার পয়সা সুধীরঞ্জনবাবু কম দিচ্ছেন। মিনিট পনেরো হল্লা আর বিতণ্ডার পর সুধীবাবু 'নেই দেঙ্গা' বলে দরজার কাছ থেকে স'রে এলেন।

রিকসাওলা চলে যেতেই বললেন, 'আমার সঙ্গে চালাকি। মিথ্যে ব'লে চারটে পয়সা মেরে দেবার মতলব। কত সব ঘুঘু লোক কাণাকড়িটি ঠকাতে পারলে না আর—' কথা বলতে বলতে দরজার বাইরের কোনটায় হাত দিলেন। 'আমার ছাতা?'

ছাতা নেই। ছাতা দিয়ে কুলিদের কাছে পিয়ানোর স্থান নির্দেশ করেছেন, তাদের বিদায় দেওয়া পর্যন্ত হাতেই ছিল। অতএব বোঝা গেল সেটা রিকসাওলাকে পুষিয়ে দেবার জন্যে তারই সঙ্গে গেছে।

'চুরি করলে আর কি করা যায়। চোর ব্যাটারা পাক্কা চোর। আবার একটা ট্রাবল্, নয়তো বেটাকে—যাক্‌গে।' সুধীবাবু এগিয়ে এলেন।

এইমাত্র সাত শো টাকা লাভ ক'রে ফিরছেন। ছাতার কথাটা ভুলতে মুহূর্তও লাগলো না। পিয়ানোর সামনে বসে অনসুরো টোকা দিয়ে আমাকে দেখাতে লাগলেন যন্ত্রটা কি আন্দাজ সুরেলা। তারপর তার ক্রয়ের ইতিহাস। শেষ ক'রে বাড়ি ফিরতে এগারোটা।

এর কিছুদিন পর একখানাপুরেনো স্ট্যাণ্ডারড গাড়ি দেখা গেল দিন দুই ধরে সুধীবাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ধরণের গাড়ি, হর্ন ছাড়া যার সব অঙ্গই আওয়াজ করে। নিশ্চয়ই এমন একটা মূল্যে পেয়েছেন, না কিনে থাকতে পারেন নি। আস্তাবলে দোকান তাই চট মুড়ি দিয়ে ফুটপাতের গা ঘেঁষেই পড়ে থাকতে হ'ল। নূতন মালিকের কাছ থেকে খুব খানিকটা সেবা যত্ন আদায় করে দিন কয়েক পর কোথায় সরে পড়লো বলতে পারি নে। সুধীবাবুকে এটা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করতে শুনিনি—জিত সম্বন্ধে বোধ হয় নিজেরই সন্দেহ ছিল।

একদিন বাড়ির ভিতর হইতে নালিশ এল, দোকান থেকে ঠিক মতো জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। চিনি আছে তো ময়দা নেই, ময়দা আছে তো ঘি নেই। সুধীবাবুকে জানাতে গিয়ে যা জেনে এলাম তাতে বোঝা গেল, আমাদেরই উপকারার্থে এই সাময়িক অসুবিধার সূত্রপাত। সস্তায় ভাল গবাঘৃত আমদানীর জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে গ্রামে, ভয়সা ঘি আর আটা আসছে বিহার থেকে, চিনির জন্যে জাভা না হলেও ওরকমই একটা কিছু আয়োজন চলছে। অতএব ধৈর্য ধরতে হবে।

কিন্তু ধৈর্য অধিক দিন রাখা গেল না। রাখতে হলে রান্নাঘরের পাট ওঠাতে হয়। প্রশ্ন ক'রে সুধীবাবুকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না। দেখা হলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।

বিশেষ প্রয়োজনে কিছু দিনের জন্যে কলকাতা[illegible]রে যেতে হলো। ফিরে এসে দেখি মুদিখানার নোংরা[illegible]নস গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দোকানটা পুরনো আসবাবের [illegible]নে দাঁড়িয়ে গেছে। বিরাট বপুর পিয়ানোটাও এসে[illegible] জুটেছে। যার যা মূল্য, আঁটা রয়েছে কপালে।

আমাকে দেখতে পেয়ে সুধীবাবু ডাকলেন। ভিতরে যেতেই বলতে লাগলেন 'কিনবি না সে তো জানি, মিছিমিছি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৫

প্রয়াগ স্টেশন ছাড়িয়া আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস্ মধ্য-গতিতে এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিনিট দশেক পরেই গাড়ি এলাহাবাদ স্টেশনে উপস্থিত হইবে।

বিছানাপত্র নিজ নিজ হোল্ডলে ভরিয়া রাখিয়া হরিপদ এবং সুবিমল একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতেছিল। সে কামরায় তৃতীয় যাত্রী, একজন প্রৌঢ় ইংরেজ, অর্ধশায়িত অবস্থায় গলা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ মোটা রাগে ঢাকিয়া একটা ডিটেক্টিভ উপন্যাসে নিমগ্ন ছিল।

হরিপদ বলিল, "চতুরতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারলে একটা বেশ মূল্যবান পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সুবিমল।"

সুবিমল বলিল, "কার সম্ভাবনা আছে দাদা?"

হরিপদ বলিল, "অভিনয় করবে যদু আর পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা হবে মধুর, এ কখনো হয়? তোমার সম্ভাবনা আছে হে ভায়া, তোমার সম্ভাবনা আছে।"

মৃদু হাসিয়া সুবিমল বলিল, "কি জানি দাদা, আপনাদের অভিনয়ের প্লট এমন জটিল যে, এর পরিণতিতে কার ফল কে ভোগ করবে কিছুই বলা যায় না। আপনি বলছেন চতুরতার সঙ্গে অভিনয় করতে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমি হয়ত নিদারুণভাবে কাঁচিয়ে ফেলব! দশ বৎসর বিনয়বাবুকে 'বিনু দাদা' আর 'আপনি' ব'লে এসে আজ কি ক'রে 'বিনয়' আর 'তুমি' বলব বলুন দেখি?"

হরিপদ বলিল, "অভিনয়ের খাতিরে বাপকে দুরাত্মা বললেও দোষ হয় না। আমি ত' কয়েকদিন আগে তোমাকে 'সুবিমলবাবু' আর 'আপনি' বলতাম, এখন কি করে 'সুবিমল' আর 'তুমি' বলছি বল?"

যুক্তির অকাট্যতায় সুবিমল চুপ করিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি এলাহাবাদের ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল অতিক্রম করিয়া প্ল্যাটফর্মের নিকটবর্তী হইল।

ঈষৎ উদ্বেগের সহিত সুবিমল বলিল, "দাদা, মানসিক ভাবের অনুপাতটা আর একবার ব'লে দিন ত'!"

হরিপদ বলিল, "রাগ আট আনা, বিস্ময় চার আনা, অভিমান তিন আনা, নৈরাশ্য তিন পয়সা, আর দুঃখ এক পয়সা।"

"ষোল আনা হ'ল?"

"হ্যাঁ হ'ল। মনে রেখো, রাগ যেন সব সময়ে অভিমান মাখানো হয়;—চাপা, অথচ অদম্য।"

অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সুবিমল বলিল, "বুঝেছি।" তাহার পর সহসা মনোযোগী হইয়া বলিল, "কিন্তু এ-সব ব্যাপার ত' শুধু এলাহাবাদ স্টেশনের জন্যেই দাদা?"

হরিপদ বলিল, "স্টেশনের জন্যে ত বটেই; কিন্তু বিনয়ের বাড়িতে আর অন্যান্য জায়গায় তুমি মোটের ওপর ঐরকম অনুপাতই বজায় রেখে চোলো।"

বলা বাহুল্য, এলাহাবাদ স্টেশনে সুলেখার অনুপ-স্থিতির জন্য সুবিমলকে যে সকল মনোভাবের অভিনয় করিতে হইবে, উল্লিখিত আলোচনা তাহারই অনুপাত সংক্রান্ত।

জানলা দিয়া সুবিমল মুখ বাড়াইয়া ছিল। প্ল্যাটফর্মের উপর বিনয়কে দেখিতে পাইয়া সে বলিল, "সর্বনাশ! বিনুদাদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

সুবিমলের কানে কানে হরিপদ বলিল, "বিনুদাদা দাঁড়িয়ে নেই সুবিমল, বিনু দাঁড়িয়ে আছে।"

স্মিতমুখে হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুবিমল বলিল, "এখন থেকেই বলতে হবে নাকি?"

হরিপদ বলিল, "হ্যাঁ, এখন থেকেই।"

প্ল্যাটফর্মে আসিয়া গাড়ি থামিতেই দুইজন কুলিকে দ্রব্যাদি নামাইবার উপদেশ দিয়া হরিপদ এবং সুবিমল প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িল।

দ্রুতপদে আগাইয়া আসিয়া সুবিমলের হাত ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "আরে, এস এস অবনীশ! কেমন আছ বল?"

আরক্তমুখে সুবিমল বলিল, "ভাল। তারপর, এখানকার সব ভাল ত'?" পরমুহূর্তেই পিছন হইতে হরিপদর মৃদু চিমটির আঘাতে সচেতন হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তোমাদের সব ভাল ত?"

বিনয় বলিল, "সুখে-দুঃখে চ'লে যাচ্ছে ভাই।" তারপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান প্রশান্তকে দেখাইয়া বলিল, "প্রশান্ত দাদা।"

সুবিমল তাড়াতাড়ি নত হইয়া প্রশান্তকে প্রণাম করিতে গেল।

দুই হাত দিয়া সুবিমলকে ধরিয়া ফেলিয়া প্রশান্ত বলিল, "হয়েছে, হয়েছে। পথে কোনো অসুবিধে হয় নি ত ভায়া?"

সহাস্যমুখে সুবিমল বলিল, "না, কিছু না।" তাহার পর হরিপদর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দাদার আদর-যত্নে কোনো অসুবিধে হবার উপায় ছিল না।"

কুলি দুইজন হরিপদ এবং সুবিমলের দ্রব্যাদি মাথার উপর লইয়া প্রশান্তর চাপরাশির সহিত আগাইয়া চলিয়াছিল। তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে করিতে হরিপদ বলিল, "লাবণ্য কোথায়? গাড়িতে রয়েছে না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "না, লাবণ্য আসতে পারে নি, বাড়িতে আছে।"

হরিপদ বলিল, "কেন?—আসতে পারে নি কেন? অসুখ-টসুখ করে নি ত?"

প্রশান্ত বলিল, "না, অসুখ-টসুখ করে নি।"

"আর সুলেখা?"

প্রশান্ত ভাবিল, সুলেখার বিষয়ে শুধু 'সুলেখা আসে নি' বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হইবে না। সুলেখা সম্বন্ধে হরিপদ আর কোন প্রশ্ন না করিলেও, বাড়ি পেঁৗছিয়াই যখন তাহার কথা প্রকাশ করিতেই হইবে, তখন হরিপদর প্রশ্নের উত্তরে যতটুকু বলিবার কথা, তাহা বলাই ভাল। বলিল, "সুলেখা উপস্থিত এখানে নেই।"

এ কথার উত্তরে প্রশ্ন করিল সুবিমল; বিস্ময়চকিত কণ্ঠে বলিল, "তার মানে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "দাদার চিঠিতে তোমাদের আসা পাঁচ-ছয় দিন পেছিয়ে যাওয়ার কথা শুনে সে কাল সকালে অমলা পাল নামে তার এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছে।"

এবার হরিপদ কথা কহিল; বলিল, "অমলা পালের বাড়ি কোথায়?"

এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিলে অনেক অবাঞ্ছনীয় প্রশ্নের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। গৃহে পেঁৗছিবার পূর্বে আলোচনা সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে প্রশান্ত বলিল, "মির্জাপুরে।" মির্জাপুরের পূর্বে 'বোধ হয়' কথাটি ব্যবহার করিল না।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে কে গেছে?"

প্রশান্ত বলিল, "গৌরহরি,—আমার ড্রাইভার।"

একটু চিন্তা করিবার ভাণ করিতে করিতে সুবিমল আপন মনে বার দুয়েক বলিল, 'গৌরহরি', 'গৌরহরি!' তাহার পর সহসা যেন চিন্তা হইতে জাগ্রত হইয়া হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দাদা, তারও নাম ত' গৌরহরি?—বিয়ের সময়ে যে লোকটিকে সব জায়গায় সব কাজে-কর্মে খুব তৎপর দেখা যেত?"

হরিপদ বলিল, "হ্যাঁ।"

"তাহ'লে এই গৌরহরি আর সেই গৌরহরি একই লোক না-কি?" বলিয়া সুবিমল একবার হরিপদর দিকে এবং একবার প্রশান্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

হরিপদ এবং প্রশান্ত উভয়ে প্রায় সমস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

শুনিয়া নিমেষের মধ্যে সুবিমলের মুখে গাম্ভীর্যের ঘন ছায়া নামিয়া আসিল। গভীর কণ্ঠে সে বলিল, "ও! গৌরহরি সঙ্গে গেছে? তাহ'লে ঠিকই হয়েছে! তাহ'লে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। বেশ চমৎকারই হয়েছে!" তাহার পর হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি একদিন আপনার কাছে যে-কথা বলেছিলাম, এখন সে কথা মিলিয়ে নিন্ দাদা! কেমন, এখন আর আপনার মনে কোনো সন্দেহ আছে কি?"

মুখমণ্ডলে দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার প্রলেপ মাখাইয়া হরিপদ বলিল, "না, না, অবনীশ, তুমি যদি একটু ধৈর্য ধারণ ক'রে—"

হরিপদকে বাধা দিয়া সুবিমল বলিল, "ধৈর্য ধারণ করতে আমার আপত্তি নেই দাদা,—পাঁচ-ছ দিনের কথা বই ত নয়, এ ক'দিন আমি ধৈর্য ধ'রে থাকব। তখন যদি এ কথা প্রমাণ না হয়, তা হ'লে আমাকে—" তাহার পর সহসা সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "এই! গাড়ি পর চীজ্ মৎ রখ্খো, জমিন পর রখ্খো!"

অদূরে কুলি চাপরাশির নির্দেশ অনুযায়ী প্রশান্তর গাড়িতে সুবিমলের দ্রব্যাদি রাখিতে যাইতেছিল, সুবিমলের আদেশ শুনিয়া ভূমিতে নামাইয়া রাখিল।

সুটকেস খুলিয়া টাইম টেবল্ বাহির করিয়া দেখিয়া সুবিমল যেন কতকটা আপন মনেই বলিতে লাগিল, "বারোটা দশ,—বেশ সুবিধের সময়,—রাত্রি আটটার সময়ে পেঁৗছোনো যাবে—কোনো অসুবিধে হবে না।" তাহার পর টাইম টেবল্ তুলিয়া রাখিয়া সুটকেস বন্ধ করিয়া কুলিকে বলিল, "হমারা চীজ্ ওয়েটিং রুমমে লে চলো।"

সঙ্কেতে কুলিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে হরিপদ বলিল, "এ কি ব্যাপার অবনীশ!"

সুবিমল বলিল, "বারোটার দিল্লী এক্সপ্রেসে পাটনা ফিরে চললাম দাদা। তবে আপনাকে যা বলেছি, তা নিশ্চয় করব—পাঁচ-ছ' দিন ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকব; কিন্তু এলাহাবাদে নয়, পাটনায়। আপনি ত জানেন, পাটনায় আমার এখনো অনেক কাজ অসমাপ্ত আছে; সে সব কাজ ফেলে রেখে এখানে সময় নষ্ট করবার আমার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নেই।"

প্রশান্ত বলিল, "তুমি পাটনায় ফিরে গেলে আমি কিন্তু অতিশয় দুঃখিত হব অবনীশ! তোমার যে বিরক্ত হবার একটুও কারণ ঘটে নি, তা আমি বলিনে। কিন্তু তুমি আমাদের বাড়ি যেতে অসম্মত হয়ে আমাদের প্রতি অবিচার করছ।"

যুক্তকরে সুবিমল বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন দাদা,—অনধিকার প্রবেশ আমি পছন্দ করিনে।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি, তবুও অনধিকার প্রবেশ বলছ?"

সুবিমল বলিল, "হ্যাঁ, তবুও বলছি। হয়ত' আপনার দিক থেকে অনধিকার প্রবেশ হবে না; কিন্তু আমি যখন আপনাদের বাড়িতে আমার অধিকার ঠিক প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না, তখন আমার দিক থেকে নিশ্চয় হবে। আপনি বাড়ি গিয়ে এ কথা দিদিকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি নিশ্চয় আমাকে সমর্থন করবেন। তা না করবার হ'লে তিনি স্টেশনে আসতেন।"

প্রশান্ত বলিল, "আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করবার অধিকার কেন তুমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে না, এ কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে অবনীশ।"

সুবিমল বলিল, "আজ আমাকে ক্ষমা করবেন দাদা। সব কথা খুলে বলা আজ আমার পক্ষে সম্ভবও হবে না,

উচিতও হবে না। তাতে হয় ত' অনেককেই ক্ষুণ্ণ করা হবে। উপস্থিত আমাকে আপনারা অনাত্মীয় ব'লেই মনে করবেন; মনে করবেন আমি আপনাদের অবনীশ নই।"

সুবিমলের কথা কহিবার দুঃসাহসিক ভঙ্গী দেখিয়া বিনয় শঙ্কিত হইল। ইহা ত' একরকম স্পষ্ট করিয়াই প্রকৃত কথা বলিয়া দেওয়া! যে-কোনো মুহূর্তে প্রশান্তর চৈতন্য হইয়া সমস্ত প্রহসন ভাঙিয়া পড়িতে পারে। সুবিমলের প্রতি অর্থসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া সে বলিল, "শোন অবনীশ, আমি তোমার পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমার এই সমস্যায় আমি একটা মধ্যপথ প্রস্তাব করছি। তুমি যদি সেই মধ্যপথ গ্রহণ না কর, তা হ'লে আমিও তোমাকে অনাত্মীয় ব'লে মনে করব।"

সুবিমল বলিল, "কি তোমার মধ্যপথ শুনি?"

বিনয় বলিল, "মধ্যপথ হচ্ছে আমার বাড়ি। উপস্থিত তোমার প্রশান্ত দাদার বাড়ি গিয়েও কাজ নেই। পাটনা গিয়েও কাজ নেই;—আমার বাড়ি চল।" প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেমন দাদা?—অন্যায় কিছু বলেছি?"

প্রশান্ত দেখিল বর্তমান সংকটে পাটনা অপেক্ষা বিনয়ের গৃহ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়; বলিল, "যে সমস্যা হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে তার পক্ষে তোমার বাড়ি মধ্যপথ, এ আমি স্বীকার করি বিনয়।"

"আপনি তা হ'লে আমার এই প্রস্তাবে রাজি ত?"

মৃদু কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "আমার ত' রাজি অরাজি হবার অধিকার নেই বিনয়,—অবনীশকে যদি রাজি করতে পার, আমি খুশী হব।"

সুবিমল কিন্তু প্রথমটা কিছুতেই রাজি হইবার লক্ষণ দেখাইল না; অবশেষে বিনয়ের দৃষ্টির নিঃশব্দ সংকেত পাইয়া চুপ করিয়া গেল।

প্রশান্তর কানে কানে বিনয় বলিল, "আর দেরি করবেন না দাদা, হরিপদবাবুকে নিয়ে আপনি বাড়ি যান। আমিও অবনীশকে নিয়ে রওনা হই। যা বিগড়ে আছে মতি-গতি বদলাতে কতক্ষণ!"

প্রশান্ত ও হরিপদ প্রস্থান করিলে সুবিমলকে লইয়া বিনয় তাহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

স্টেশনের কম্পাউণ্ড ছাড়িয়া গাড়ি রাজপথে পড়িতেই সুবিমল বলিল, "তখন থেকে অনর্গল অপরাধ করছি বিনু দাদা, অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।"

মৃদু কণ্ঠে সুবিমলের কানে কানে বিনয় বলিল, "অপরাধের কথা তুলে কিন্তু সব চেয়ে বড় অপরাধ করছ। জান ত' Walls have ears।" তাহার পর সম্মুখে উপবিষ্ট ড্রাইভারের প্রতি অঙ্গুলি দিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "যারা wall নয় তাদের ত আছেই।"

অপ্রতিভ হইয়া সুবিমল বলিল, "নিশ্চয় আছে! একেবারে খেয়াল ছিল না!"

তাহার পর হইতে বাকি পথটুকু এমনভাবে এমন সব কথোপকথন চলিল যাহা বিনয় এবং অবনীশের মধ্যেও অনায়াসে চলিতে পারিত।

গৃহে পৌঁছিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া বিনয় একজন বেয়ারাকে সুবিমলের দ্রব্যাদি নামাইয়া লইবার জন্য আদেশ করিল। তাহার পর বাহিরের বারান্দায় উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "বসুধা! বসুধা!"

বসুধা পড়িবার ঘরে অধ্যয়নে রত ছিল। মোটরের শব্দ শুনিয়া আপনিই বাহিরের দিকে আসিতেছিল, বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা?" পর মুহূর্তেই বিনয়ের পশ্চাতে সুবিমলকে দেখিয়া একটু অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "লুকোচ্ছিস্ কি-রে বসুধা? —সামনে আয়। যার আসবার প্রতীক্ষায় প্রত্যহ দিন গুনছিস্, তাকে দেখে লুকোবার কী আছে?"

বিনয় যে অবনীশকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে গিয়াছিল সে কথা বসুধা জানিত; এবং যেভাবে বিনয় তাহার নিকট আগন্তুকের পরিচয় ইঙ্গিত করিল তাহাতে সে ইঙ্গিত যে অবনীশকেই নির্দেশ করে, একথাও তাহার মনে হইল। কিন্তু, তথাপি আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের টাইমের এত শীঘ্র বিনয়ের সহিত অবনীশের একা এ বাড়িতে আসা এমনই দুর্বিশ্বাস্য ব্যাপার যে, সেকথা নিঃসংশয়ে মনে করিতে তাহার সাহস হইল না। সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বিনয়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ডক্টর মিত্র না-কি?"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় মিত্র।"

শুনিয়া বসুধার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রথমে সে যুক্তকরে সুবিমলকে নমস্কার করিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সুবিমলের পদধূলি গ্রহণ করিতে গেল।

ক্ষিপ্র বেগে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া সুবিমল বলিল, "আহা করেন কি, করেন কি! পায়ে হাত দেবেন না।"

বিনয় বলিল, "বসুধা তোমার পায়ে হাত দিলে এমন-কিছু অন্যায় হ'ত না ভাই। কারণ, কুমারী বসুধা বসু আমার মামাতো বোন। কলকাতায় আই এসসি পড়ে, এবার পরীক্ষা দেবে।" তাহার পর বসুধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মিত্র মশায় উপস্থিত কয়েক দিন আমাদের বাড়িতে মিত্রতা করবেন বসুধা।"

সকৌতূহলে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

"তার মানে, উনি আমাদের বাড়িতে দিন কয়েক বসবাস করবেন।"

"দিবারাত্র?"

"দিবারাত্র।"

শুনিয়া বসুধা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে যে দীপ্তি প্রকাশিত হইল তাহার অর্থ করিতে বিনয় এবং সুবিমলের মধ্যে কেহই ভুল করিল না।

সুলেখা যে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে, লতিকার নিকট বসুধা সেকথাও শুনিয়াছিল। মনে করিল,

(শেষাংশ ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছবি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এই তো আছি বসে
বিনা-কাজের সকাল বেলায় আরাম-কেদারায়,
ক্লান্ত মন হঠাৎ খুসীর হাওয়ায়
তৃপ্ত হ'ল সৃষ্টিকালের আদিম সুধারসে।

বাগান-কোণে সবুজ জটলায়
মিঠে আলোর ঝলক খেলে যায়।
চঞ্চলতার ছায়া—
শিউলি ফুলের মাথায়

কাল্‌কে রাতের ঝরা শিশির দুল্‌ছে এতো বেলায়।
অনেক দূরের আকাশ কাঁপে
শূন্য পারের কল্পতাপে
দিনের আলোয় প্রস্ফুটনী মন্ত্র মধু-মায়া।

সবই কিছু চেনা লাগে তবুও নূতন,
এই পৃথিবী অনেক পুরানো
যেন নরম পালিশ-লাগানো

বহুদিনের ব্যবহারে মলিন পথের চাকা;
অসীম ব্যথায় জীর্ণ দেহ-মন
করুণ মেয়ে শান্ত অতি হৃদয় ক্ষত-ঢাকা।

অলস চোখে টুকিটাকি কতো
হাল্‌কা ছবি জেগে ওঠে আবার ভেসে যায়—
এক নিমেষে বদ্‌লে যায় এই পৃথিবীর মানে।

নিজেই স্বরূপ চেনে নাকো; অসহায়ের মতো
অর্জিত শ্রী দেখিয়ে বেড়ায়
বোকা মেয়ে সমজ্‌দারের হৃদয় ধ'রে টানে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের একটি খেলা মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় মহীশূরে দল শোচনীয়ভাবে ৩—০ গোলে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী মহীশূর দল আগামী ১৩ই জুলাই বোম্বাইতে বোম্বাই দলের সহিত খেলিবে। উত্তরাঞ্চলের দিল্লী বনাম রাজপুতানার খেলা গত ৬ই জুলাই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই। পূর্বাঞ্চলের বিহার বনাম যুক্তপ্রদেশের খেলা ১৩ই জুলাই লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হইবে। অপর খেলা ঢাকায় ঢাকা বনাম আই এফ এ দলের হইবার কথা ছিল। কিন্তু ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখনও চলিয়াছে। সেইজন্য ঢাকা দল খেলা কিছুদিন স্থগিত রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এইরূপভাবে খেলা স্থগিত রাখা সম্ভব হইল না। কারণ ২৬শে জুলাই কলিকাতায় এই আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা হইবে বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সকল অঞ্চলের খেলা শেষ করিতেই হইবে। সেইজন্য ঢাকার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় ঢাকা দলকে এই প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। কলিকাতার আই এফ এ দল ফলে ওয়াক-ওভার পাইল।

আই এফ এ দল নির্বাচন

এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সকল প্রাদেশিক দলের খেলোয়াড় নির্বাচন শেষ হইয়াছে। কেবল শেষ হয় নাই আই এফ এ দলের। অথচ আই এফ এ-র জন্যই এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। আই এফ এ-ই ইহার প্রথম উদ্যোক্তা। আই এফ এ এই প্রতিযোগিতার জন্য স্বর্গীয় সন্তোষের মহারাজার নামে একটি কাপ প্রদান করিয়াছে। প্রথম উদ্যোক্তা হিসাবে নিজ দলের সম্মান যাহাতে বজায় থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কি আই এফ এ-র উচিত ছিল না? দলের খেলোয়াড় নির্বাচন কার্য যদি শেষ না করেন ও নির্বাচিত দলের খেলোয়াড়গণকে একত্রে খেলিবার সুবিধা দান না করেন, তবে কেমন করিয়া ঐ দল প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করিতে পারিবে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। দল নির্বাচন হঠাৎ করিয়া খেলার মাঠে নামাইয়া দিলে খেলোয়াড়গণের মধ্যে বোঝাপড়া না থাকায় তাহারা যে স্বাভাবিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে না, ইহা কি তাঁহারা জানেন না? আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা ইতিপূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠানে যদি বাঙলার দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করে, তাহাতে আই এফ এ-র গৌরবই বৃদ্ধি পাইবে। ২০শে জুলাই আই এফ এ দলকে খেলিতে হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে খেলোয়াড় নির্বাচন কার্য শেষ করিতে আর বিলম্ব করা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত হইবে না।

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা

হঠাৎ বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গেল যে, আগামী ১লা আগস্ট হইতে কলিকাতায় নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতা তিন দিনব্যাপী হইবে। আগামী ১৯শে ও ২০শে জুলাই বাঙলার প্রতিনিধিগণের নির্বাচন উপলক্ষে এক বাছাই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। পুরুষ ও মহিলা এই দুই বিভাগের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। ওয়াটার-পোলো প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইবে। এই বাছাই প্রতিযোগিতায় বিনা প্রবেশমূল্যে সকল সাঁতারুই যোগদান করিতে পারেন। বাছাই প্রতিযোগিতায় যোগদনের শেষ দিন—১৩ই জুলাই।

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের এই বিজ্ঞপ্তি বাঙলার সাঁতারুগণের বশেষ উৎসাহের কারণ হইলেও, আমাদিগকে চিন্তিত করিয়াছে। আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না, কিরূপে এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে বাঙলার সাঁতারুগণ বাঙলার গৌরবরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের উচিত ছিল আরও কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা। তাঁহারা হয়তো বলিবেন, "প্রতিযোগিতা যে হইবেই, তাহা সম্প্রতি স্থির হইয়াছে। নিখিল ভারত সন্তরণ ফেডারেশন অনুমোদন না করা পর্যন্ত আমরা কিরূপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিব?" এই উক্তি যুক্তিপূর্ণ হইলেও, তাঁহারা এই বিষয় যে পূর্বে কিছু সংবাদ সাধারণ সাঁতারুগণের মধ্যে প্রচার করিতে পারিতেন, ইহা অস্বীকার তাঁহারা করিতে পারেন না। এই প্রতিযোগিতা যে হইবে, এই বিষয় আলোচনা আরম্ভ তাঁহারা সম্প্রতি নিশ্চয়ই করেন নাই। অন্ততপক্ষে একমাস পূর্বে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং সেই সময় তাঁহারা অনায়াসে প্রচার করিতে পারিতেন, "নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে।" তাহার পর যখন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, একরূপ ব্যবস্থা পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছে, তখন প্রচার করিতেন, "নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইবে।" ইহার পর যে বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেন। এইরূপ প্রচারের ব্যবস্থা করিলে বাঙলার সাঁতারুগণকে নিজ নিজ শক্তিমত কৌশলের উন্নতি করিবার বেশী সময় দেওয়া হইত। কারণ এই কথা ঠিক যে, হঠাৎ চেষ্টা করিলেই কোন কৌশলের উন্নতি করা যায় না, ইহার জন্য নিয়মিত সাধনার প্রয়োজন। দুই মাসে যাহা সম্ভব, তাহা এক মাসে আয়ত্ত করা যায় না। বাঙলার সাঁতারুগণ প্রতিবার নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ অধিকার করিয়াছেন। এইবারের অনুষ্ঠানে তাঁহারা সেই গৌরব অর্জন করিতে পারে, ইহা সকলেরই কাম্য। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনেরও যে তাহাই ইচ্ছা, এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রচার বিষয়ে তাঁহারা এইরূপ ভুল কেন করিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিংহল ভ্রমণ

আগামী বৎসরের মার্চ মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল সিংহলে কয়েকটি স্থানে ক্রিকেট খেলায় যোগদান করিতে যাইবে। এই দল কোন্ দিন কোন্ স্থানে খেলিবে, সেই সম্পর্কে সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা যে তালকা দিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় দল ১লা মার্চ যাত্রা করিয়া ২০শে মার্চের মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এই বিষয় আলোচনা করিবেন। তাঁহাদের আলোচনার উপরই এই ভ্রমণ তালিকার অদলবদল নির্ভর করিতেছে।

এই ভারতীয় দলে বাঙলার কোন খেলোয়াড়ের স্থান হইবে না, ইহা একরূপ জানা কথা। তবে এখন হইতে চেষ্টা করিলে হয়তো কোন স্থান হইতে পারে। ক্রিকেট মরসুমের সূচনা হইতে বাঙালী খেলোয়াড়গণ যদি স্থানলাভের আশায় আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তবেই ইহা সম্ভব।

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও প্রথম ডিভিসনের ফলাফল, যাহা জানিবার জন্য সারা বাঙলার ক্রীড়ামোদী উৎসুক হইয়া থাকেন তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই বিভাগে পুনরায় চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং দল এইবার লইয়া সাতবার এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হইল। ১৯৩৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া একমাত্র ১৯৩৯ সাল ব্যতীত এই দল কোন বৎসরই লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের সম্মানলাভ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মহমেডান স্পোর্টিং দল এইরূপে সাতবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া এক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিল। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় বা ইউরোপীয় দলের পক্ষে এত অধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্ভব হয় নাই।

এই বিভাগে রাণার্স আপ কোন দল হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। মোহনবাগান দল ইস্টবেঙ্গল দল অপেক্ষা দুই পয়েন্ট অধিক পাইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা বজায় রাখিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের খেলা এই বিষয়ের শেষ মীমাংসা করিবে।

শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স দল লীগ তালিকায় যেরূপ স্থানে অবস্থান করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই দল পূর্বাপেক্ষা খেলায় উন্নতি করিয়াছে। ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও কালীঘাট দলের লীগ তালিকায় যেরূপ স্থান লাভ করিবে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছিল তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে আনন্দের বিষয় যে, তিনটি দলের স্থান ডালহৌসী, ক্যালকাটা ও নর্থ স্টাফোর্ডস দলের ঊর্ধ্বে আছে ও থাকিবে।

দ্বিতীয় ডিভিসনে অরোরা ক্লাব, তৃতীয় ডিভিসনে মাড়োয়ারী ক্লাব ও চতুর্থ ডিভিসনে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। বিভিন্ন বিভাগে এই তিনটি দলই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দল অপেক্ষা অধিক পয়েন্টেও অগ্রগামী আছে। সেইজনাই ইহাদের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ হইতে কোন দল বঞ্চিত করিতে পারিবে না, অন্যত্র প্রথম ডিভিসন লীগের তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

আই এফ এর পরিচালিত ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় দলের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও অনুষ্ঠিত হইবে। এই খেলার উভয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন-কার্য শেষ হইয়াছে। ভারতীয় দল যে সকল খেলোয়াড়গণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আরও শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব ছিল। যাহা হউক, যে দল গঠন হইয়াছে, তাহা ইউরোপীয় দলের তুলনায় অনেক ভাল। সুতরাং ভারতীয় দল এই খেলায় বিজয়ী হইবে বলিয়া মনে হয়। গত বৎসর ভারতীয় দলই বিজয়ী হইয়াছিল। এই বৎসরও ভারতীয় দল বিজয়ী হউক ইহাই আমাদের কামনা।

প্রথম ডিভিসন (৮ই জুলাই পর্যন্ত)

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মহঃ স্পোর্টিং	২২	২০	২	০	৫০	৬	৪২
মোহনবাগান	২৩	১৪	৬	৩	৩১	১৪	৩৪
ইষ্টবেঙ্গল	২২	১৪	৪	৪	৪০	১৩	৩২
পুলিশ	২১	১০	৫	৬	২৫	১৫	২৫
এরিয়ান্স	২২	১০	৩	৯	৩২	২৯	২৩
কাষ্টমস	২২	৭	৯	৬	২৩	২৬	২৩
রেঞ্জার্স	২১	৭	৮	৬	২৫	১৭	২২
ই বি আর	২২	৮	৫	৯	৩৬	৩১	২১
ভবানীপুর	২২	৭	৬	৯	১৭	২০	২০
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	২৩	৬	৮	৯	১৫	২৬	২০
কালীঘাট	২২	৬	৫	১১	১৯	৩৪	১৭
ডালহৌসী	২১	৫	৩	১৩	১৭	৩৫	১৩
ক্যালকাটা	২৩	৩	৩	১৭	১৩	৪৭	৯
নর্থ স্ট্যাফোর্ড	২২	২	৩	১৭	২০	৫১	৭

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা আগামী ১৫ই জুলাই হইতে আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতায় এই বৎসর মোট ৬৪টি দল যোগদান করিয়াছে। এই ৬৪টি দলের মধ্যে স্থানীয় ৩০টি, বিভিন্ন জেলা হইতে ২২টি ও বাহির হইতে ১২টি দল যোগদান করিয়াছে। বাহিরের দলের মধ্যে ওয়েলচ রেজিমেণ্ট, কে ও এস বি, সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স, মহীশূর রোভার্স, স্যাণ্ডিমোনিয়ান্স ক্লাবের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল দলের মধ্যে ওয়েলচ রেজিমেণ্ট দলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। এই দলের খেলা সর্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য হইবে। এই দলে দুইজন ইংল্যাণ্ডের পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় আছেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে ল্যাংটন ও হিল। ল্যাংটন বোম্বাইতে হার্‌ড্‌স্‌ লীগ প্রতিযোগিতার খেলায় গত দুই বৎসর গোলদানে অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দল শীল্ড প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বিশিষ্ট দলের সহিত বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লীগ প্রতিযোগিতার খেলায় এই বৎসর স্থানীয় ক্রীড়ামোদিগণ ফুটবল খেলা বিষয় বিশেষ উৎসাহ লাভ করেন নাই। কিন্তু শীল্ড প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা দেখিয়া তাঁহারা আনন্দ পাইবেন। নিম্নে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী কতকগুলি দলের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স, ওয়েলচ রেজিমেণ্ট, কে ও এস বি, লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজ, তিলকমতী ইউনাইটেড ক্লাব (মাদ্রাজ), আনন্দ স্পোর্টিং (গয়া), এলায়েন্স ক্লাব (গয়া), ফ্রণ্ট হিল ক্লাব (পেশোয়ার), মহীশূর রোভার্স, মুলতান এসোসিয়েশন, স্যাণ্ডি-মোনিয়ান্স (কোয়েটা), তরুণ সঙ্ঘ (মধুপুর), মহারাণা ক্লাব (গৌহাটী), হবিগঞ্জ টাউন ক্লাব, গৌহাটী ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশন, জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব, কুচবিহার একাদশ, ফরিদপুর ক্লাব, কিশোরগঞ্জের কটীগির্দি ক্লাব, ইণ্ডিয়া ক্লাব (শিলচর), ওয়ারী ঢাকা, খুলনা টাউন ক্লাব, বরিশাল এফ সি, বর্নবিহারী এসোসিয়েশন (বর্ধমান), মোহনবাগান, এরিয়ান্স, মহমেডান স্পোর্টিং, কালীঘাট, ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি।
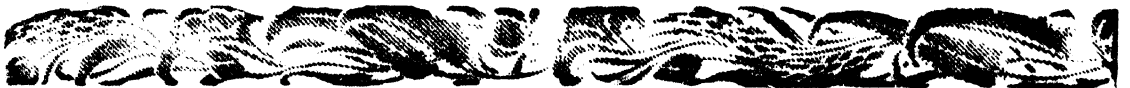
সমুদ্রের
সেখানের রং
মধ্যে নীল রং
বোঝায় তা উং
মহাসাগরের জং
ঘোর সবুজ।
ভূমধ্যসাগরেরর
পশ্চিমাঞ্চলের অং
গাঢ় নীল রং দেখে
সঙ্গে রংয়ের বেশ

জলের স্বচ্ছতা
রং ক'রে সমুদ্রের জ
দেখা গেছে, Sargass
এই সমুদ্রের ২১৬ ফি
ডিসের পরিধি ছিল ৬ .
মধ্যে উত্তর সাগরের জলে
মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়।
পৌঁছতে পারে এ নিয়েও এব
সাগরের জলে ১,২০০ ফিট পয
এটালাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যভ
পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গে
জলে ফটোর প্লেট একেবারে কাল হ

*　　　*　　　*

বাঙলা প্রদেশে ১,১৫০,০০০ ‹
ম্যালেরিয়াতেই ৪৬০,০০০ লোক
বেশী আর অন্য কোন কারণে লোকে

মানুষের সঙ্গে বুনো পশুর আ
চলেছে তার এখনও শেষ হয়নি। হি
শক্তির কাছে মানুষ সহজেই আত্মস
করেছিল। মানুষের শারীরিক শক্তি
কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বন্যপ
না। কিন্তু সুযোগ সুবিধা পেলে
মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়ে প্রাণ
ভয় পায় না।

তাদের প্রতিহিংসার কবলে প'ড়ে
,০০০ জন লোকের মৃত্যু হয়।

জঙ্গল পার হয়ে পথিক চলেছে।
থেকে সয়তান হুঙ্কার ছেড়ে পথিকের
টিকে নিয়ে গেল। অসহায় পথিকের
বিক্রমকে প্রতিরোধ করতে যারা সাহস
দিয়েছে, তাদের পুরস্কৃত করবার ব্য

পুস্তক পরিচয়

যোগ সাধনার ভিত্তি—শ্রীঅরবিন্দ। প্রথম সংস্করণ। কালচার পাব্লিসার্স, ২৫এ বকুলবাগান রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংকলন করিয়া ইংরেজী 'Bases of Yoga' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই বাঙলা অনুবাদ।

সাধনার অন্তর্নিহিত সত্যগুলিকে শুধু পান্ডিত্যের দ্বারা উপলব্ধি করা একরূপ অসম্ভব, এ জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এবং যাঁহারা সাধনার দ্বারা ঐ সব সত্যগুলিকে উপলব্ধি করিয়াছেন, অপরের অনুভবগম্যভাবে সেগুলিকে অভিব্যক্ত করা সম্ভব হয়, শুধু তাঁহাদেরই পক্ষে। এ পথ ধরিতে হইলে এই সব উপদেষ্টার আশ্রয় লওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। যোগ সাধনা অতি দুরূহ এবং সাধনায় ধীরভাবে অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রতিকূলতাও অনেক; কখনও স্থূলভাবে, এবং স্থূলে প্রতিকূলতার স্তর অতিক্রম করিতে পারিলেও সূক্ষ্মভাবে ঐ সকল প্রতিকূলতা সাধককে অভিভূত করিয়া ফেলিতে নিরন্তর চেষ্টা করে। স্থূল ও সূক্ষ্ম এই সব প্রতিকূলতার রীতি এবং গতি ঠিক মত ধরিয়া ফেলাও অতি কঠিন কাজ, সদ্গুরুর সাহায্য ভিন্ন সেই সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষ পায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানা সাধক জীবনে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি অনেক তফাৎ জিনিষ। ভারতের একজন মহাসাধক এবং যোগীর জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধির সম্পদ অধ্যাত্ম রস-পিপাসুদের পক্ষে সর্বত্র আদরণীয় হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

গীতার উপরই শ্রীঅরবিন্দের যোগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার নির্দেশিত যোগ একটা প্রাদেশিকতা নহে, অর্থাৎ চেষ্টাসাপেক্ষ চিত্ত-বৃত্তির নিরোধের দ্বারা মনকে সাময়িকভাবে একটা প্রশান্তির মধ্যে অবস্থিতির প্রতিক্রিয়া নয়, সমগ্র জীবনকে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিবার পথই হইল শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথ, মানুষের জীবনকে ভাগবত জীবনে রূপান্তরিত করিবার জন্যই তাঁহার তপশ্চর্যা।

বাস্তবিক পক্ষে ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কোন যোগই সত্যকার যোগ হইতে পারে না; উদ্‌যোগের স্তরে মাত্র থাকে। ভক্তিযোগের ফলেই খন্ডতা দূর হইয়া বিশ্বরূপিনী চৈতন্য-শক্তির সঙ্গে মানবের হয় অখন্ড যোগ, সকল অবীর্য কাটিয়া মানুষ লাভ করে দিব্য জীবনের উদার বীর্য; সে হয় সহ, ওজঃ এবং বলে সুদৃঢ়। শ্রীঅরবিন্দের সাধনাঙ্গে ভক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভাগবতী শক্তির কাছে একান্তভাবে আত্মনিবেদনই এই সাধনার প্রধান বস্তু। তাঁহার উপদেশের মধ্যে ভাগবতের সংকর্ষণ তত্ত্বের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়; চেতনার মানবের মানস জগতে অবতরণ এবং অতি মানস স্তরে অধিরোহণে সঙ্কর্ষণের কৃপা শক্তিই কাজ করিতেছে, মানুষ যদি সেই কৃপা শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে সে সমগ্র কর্ম বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া এক পরম আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয়। এই সংকর্ষণ দেবের কথা বলিতে গিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,—যং বৈশ্বসন্তং বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি যং চেকিতানং চিত্তয়ঃ উচ্চকন্তি, ভূমন্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্দ্ধি তস্মৈ নমো ভগবতেস্তু সহস্রমূর্দ্ধে।' সৃষ্টির অনুলোম এবং প্রতিলোম প্রক্রিয়ার মধ্যে এই ভাগবতী শক্তিই প্রধানা, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী। এই লীলাময়ী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইতে পারিলেই সকল দিক হইতে পূর্ণতা লাভ হয় এবং সেই শক্তিই সকল প্রত্যক্ষ অনুভবের একান্ত আশ্রয়, অন্য সবই পরোক্ষ, সুতরাং অজ্ঞান, অখন্ড এবং অন্তবান। এই যে শক্তি এই শক্তিই পরম নিবৃত্তি দিতে পারে এবং মানবের গুণতত্ত্ব বুদ্ধির অতীত উর্দ্ধস্তরে চলিতেছে এই শক্তির খেলা। তর্ক যুক্তি বা সিদ্ধান্তের সাহায্যে এই শক্তির স্বরূপকে উপলব্ধি করা যায় না, শুধু পাওয়া যায় আকুলতা বা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় অস্পৃহাপূর্ণ সাধনার আশ্রয়ে। ভাগবত জীবনের সকল গূঢ় রহস্য, অখিল সেই অধ্যাত্ম কর্মের স্বরূপ তিনিই লাভ করিতে পারেন, যিনি সেই শক্তির নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হন। গীতার ভাগবতী বাণীর এই নির্দেশই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। যোগ সাধনার ভিত্তি পাঠে পাঠক পাঠিকাগণ ভারতের একজন প্রধান যোগী এবং সাধকের সে উপলব্ধিকে আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন মূল গ্রন্থখানার ইংরেজী হইতে বাঙলায় অনুবাদ। গুপ্ত মহাশয় একজন সুপন্ডিত এবং এই-রূপ গভীর দার্শনিক বিষয়ের বিশ্লেষণে পারদর্শী ব্যক্তি, তাঁহার অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

অম্বিকাচরণ মজুমদার :—(জীবনী)। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী এম-এ প্রণীত। সংহতি পাবলিসিং হাউস, ৭নং মুরলী ধর লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা।

জননায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের জীবনী। রাজনৈতিক সাধনাক্ষেত্রে যে কয়েকজন সুসন্তান লাভ করিয়া বঙ্গভূমি গর্ব করিতে পারেন, ফরিদপুরের সুবিখ্যাত নেতা মজুমদার মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সিংহ সম বীর্য, অসামান্য বাগ্মিতা এবং সুতীব্র স্বদেশ প্রেমের জন্য তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হইয়া ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সহিত অম্বিকাচরণের স্মৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আলোচ্য জীবনী অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং লেখক অম্বিকাচরণের তেজস্বিতার দিকটা তেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, উপকরণের অভাবই ইহার কারণ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তেমন উপকরণ এখনও একটু অধ্যবসায়ের সঙ্গে চলিলে সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থখানা পাঠে পাঠকেরা মোটামুটি বাঙলার এই স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের জীবনী জানিতে পারিবেন। এরূপ গ্রন্থও বাঙলা ভাষায় ছিল না, লেখক এ দিকে অগ্রণী হইয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জ্ঞানশিখা :—ত্রৈমাসিক হাতে লেখা পত্রিকা। সম্পাদক—খগেন্দ্র সেনগুপ্ত, রেখা-শিল্পী—শঙ্কর শেঠ, লিপি-শিল্পী—সুরেন দাস। কার্যালয়—৫।২ডি, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

ছেলেদের হাতে লেখা এ ধরণের পত্রিকাগুলি আমাদের ভালো লাগে; কারণ, এ গুলির ভিতর দিয়া বাণী-পূজার যে শুদ্ধ শ্রদ্ধা বুদ্ধিটি সকল দিক দিয়া জাগিয়া উঠে, সেই শ্রদ্ধা বুদ্ধিই সাহিত্য সাধনার সার্থকতা আনিয়া দেয়। এ পত্রিকাখানায় সেই শ্রদ্ধাবুদ্ধির পরিচয় আমরা পাইলাম, প্রবন্ধে কবিতায়, ছবিতে এবং লেখার প্রত্যেকটির আঁচড়ের ভিতর দিয়া। সৌন্দর্যবোধই সাহিত্য-সাধনার মূল, এমন প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া সাহিত্য সাধনার পরম প্রয়োজন সেই সৌন্দর্যবোধ ফুটিয়া উঠে। রেখাশিল্পী শঙ্কর শেঠের ছবিগুলি খুবই সুন্দর হইয়াছে—'মাঠের পথে' ছবিখানা দেখিলে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। আমরা এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত :—মূল, পাঠান্তর, পয়ারের ব্যাখ্যা, মহাজন পদাবলী মুখে মাধুর্যাস্বাদন, সংস্কৃত শ্লোকের টীকা ও ভাব ব্যাখ্যা সংবলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-কুমার রায়, সম্পাদিত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য সম্পূর্ণ ১১, টাকা। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কার্যালয়, ৬৭।২০ ষ্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।

আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই সুন্দর এবং সুবিখ্যাত সংস্করণের প্রথম খন্ড পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর। প্রাঞ্জল সহজ, সরল গতিতে ভাষার প্রবাহ—সকলের পক্ষেই সমান উপভোগ্য। এমন গ্রন্থের সমাদর হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। সুসম্পাদিত এমন সদ্‌গ্রন্থ বাঙলা ভাষার গৌরবস্বরূপ হইয়া থাকিবে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর ভিতর দিয়া গোস্বামী মহারাজের কবিত্ব-প্রাচুর্যের যে মাধুর্য এই সংস্করণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার আস্বাদন অপূর্ব এবং রসিক পাঠক-সমাজ তাহাতে পরম প্রীতি লাভ করিবেন।

সাহিত্য সংবাদ

ঝরণা সাহিত্য চক্র

ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, গত মে মাসে "ঝরণা সাহিত্য চক্রের" সভাপতি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় চক্রের পক্ষ থেকে শিক্ষাব্রতী যশস্বী গ্রন্থকার স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষাকল্পে যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় 'দেশ' কাগজে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, গত ৩০শে মে উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ-প্রেরকদের নিকট হইতে অনুরোধ আসিয়াছে যে, ঐ তারিখের মধ্যে 'কলেজ ও স্কুলের পরিচয়-পত্র সহ প্রবন্ধ পাঠান অসম্ভব; কেন না, সকল স্কুল কলেজই এ সময় বন্ধ।'

অতএব চক্রের পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে, প্রবন্ধ-প্রেরকদের সুবিধা করিয়া আগামী ৩১শে জুলাই যোগদানের শেষ তারিখ ধার্য হইল। সুতরাং যাহারা স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার দরুণ পরিচয়পত্র পাঠাইতে পারেন নাই, তাঁহারা সত্বর পাঠাইবেন—নচেৎ উহা গৃহীত হইবে না।

(স্বাঃ) শৈলেন বিশ্বাস, সম্পাদক, ঝরণা সাহিত্য চক্র, ২২১।৪, রাসবিহারী এভেনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাসুল সহ ৬৷৷৹ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৷৹ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর টাকা	৬ মাস টাকা	৩ মাস টাকা	১ মাস টাকা	এক সংখ্যার জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এক-কালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্ম্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮ম বর্ষ। ৩রা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 19th July, 1941. [৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পীড়িত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ—

কয়েকদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের অবস্থা একটু ভালোর দিকে ফিরিতেছে শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ইহার পর, তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধির সংবাদে পুনরায় দেশের সর্বত্র দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত সোমবার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের অবস্থা পরীক্ষা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কবি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন এবং দীর্ঘকাল এইরূপ এক লাগোয়া অসুখ চলাতে উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। ভগবান কবিকে সত্বর নিরাময় করুন, আমাদের এই প্রার্থনা।

ভারতের অচল অবস্থা—

ভারতসচিব আমেরি সাহেবের মধুর বাক্য শুনিতে আমাদের কিছুমাত্র রুচি নাই; কিন্তু এদেশে একদল লোক আছেন যাঁহারা সমুদ্র পার হইতে কর্তাদের কথা শুনিবার জন্য দিন রাত কান পাতিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেনসেনের প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব যে জবাব দিয়াছেন তাহাতে ভারতের এই পরানুগ্রহপ্রত্যাশী দলের প্রাণের আবেগ অন্তত কিছুকালের জন্য ঠাণ্ডা হইবে বলিয়া আশা করি। ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব বলেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার উপর নূতন প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না এবং বর্তমানে এই বিষয়ে তিনি নূতন বিবৃতি দিতেও প্রস্তুত নহেন; অবশ্য বিষয়টি গভর্নমেণ্টের সাগ্রহ বিবেচনার অধীন রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত জলের মত পরিষ্কার। ভারতসচিব নিজের জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন; তিনি প্রকারান্তরে বড়লাটের বোম্বাইয়ের প্রস্তাবই স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, সেই প্রস্তাবের অতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই। তাহাই যদি না থাকে, তাহা হইলে আর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সাগ্রহ বিবেচনাধীন আছে কোন বিষয়? বড়লাটের সেই বোম্বাইয়ের প্রস্তাব, কংগ্রেস তো সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেনই, যাঁহারা মডারেট তাঁহারা পর্যন্ত সে প্রস্তাবে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এমন অবস্থায় বোম্বাইয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের জনমতের প্রতিক্রিয়া যদি কর্তাদের কোনরূপ সাগ্রহ বিবেচনাকে সত্যই উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে প্রস্তাবের পরিবর্তন বা সংস্কার সাধনের প্রশ্নই আসিয়া পড়ে; কিন্তু ব্রিটিশ কর্তারা সেরূপ মনে করিতেছেন না। তাঁহাদের অন্ধ অহমিকা কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরাধীন ভারতের জনমতের মর্যাদাময় রূপ দেখিতে দিতেছে না। বোম্বাইয়ের প্রস্তাবে শাসন-ব্যবস্থায় ভারতের জনমতের প্রকৃত কর্তৃত্ব কোন দিক হইতেই স্বীকার করা হয় নাই এবং ভারতের শাসন-রজ্জু সমগ্রভাবে ব্রিটিশ প্রভুত্ববাদীদের হাতেই রাখা হইয়াছে। ভারত সচিবের উক্তির স্পষ্ট অর্থ এই যে, এখনও তাহাই রাখা হইবে। এদিকে ওদিকে দুই একটি টোপ ফেলিয়া তাঁহারা নিজেদের কাজটা বাগাইয়া লইতে চাহিতেছেন মাত্র। তাঁহারা মনে করিতেছেন দীর্ঘ পরাধীনতায় ভারতবাসীরা প্রকৃত স্বাধীনতার মর্যাদা-বুদ্ধি এতটা হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাঁহাদের সেই অসার অনুগ্রহের টোপে বড় বড় রুই কাতলা গাঁথা পড়িবে এবং ইহা হইতেই তাঁহাদের কার্যোদ্ধার হইবে। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সাগ্রহ বিবেচনার ফলে এই টোপ ফেলার প্রক্রিয়াটা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণের উদাম হইল ইহার পরিচয়। শুনিতেছি, বড়লাটের এই সম্প্রসারিত শাসনপরিষদে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে। তিনজন আই-সি-এস সদস্য এবং বড়লাট ও জঙ্গীলাট, শ্বেতাঙ্গ পক্ষে থাকিবেন এই পাঁচজন, আর ভারতীয় সদস্য থাকিবেন ছয়জন। ছয়জন

ভারতীয় সদস্যের টোপে কে কে গাঁথা পড়িতে পারেন, ইহা লইয়া নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। স্যার জাফরউল্লা খানের দপ্তর দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্যার সুলতান আহম্মদ এবং স্যার হোমী মোদীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্যার রাঘবেন্দ্র রাও, স্যার আকবর হায়দরী, ডাক্তার আম্বেদকর ইঁহারাও যে কোন দিন গদী পাইয়া বসিতে পারেন। ইঁহাদের এই নিয়োগে নূতনত্ব কিছুই নাই, কারণ এই পথেই ইঁহাদের সাধ্য এবং সাধনা; শুনিতেছি, শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণে এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ইঁহাদের দুইজনকে শাসন পরিষদে লইবার চেষ্টা হইতেছে। যদি এই নিয়োগ সত্য হয়, তাহা হইলে নূতনত্ব কিছু দেখা দিবে বলা চলে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মডারেট; তাঁহার একাজে অরুচি থাকিবে না ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু বোম্বাইয়ের নেতৃসম্মেলনের তিনি ছিলেন নিজে একজন অগ্রণী। বড়লাটের শাসন পরিষদের এই সম্প্রসারণে বোম্বাইয়ের নেতৃ-সম্মেলনের অভিমতকে কিছুমাত্র মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। বোম্বাইয়ের নেতৃ-সম্মেলনে বড়লাটের শাসন পরিষদ শুধু ভারতবাসীদিগকে লইয়া গঠন করিতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল এবং দেশরক্ষা বিভাগের ভার দিতে বলা হইয়াছিল একজন ভারতীয় সদস্যকে। সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে সে নীতি গ্রহণ করা হয় নাই, শ্বেতাঙ্গ সদস্যের হাতেই যে অর্থ বিভাগ এবং দেশরক্ষা বিভাগ থাকিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মহাশয় যদি এই টোপটি গলাধঃকরণ করেন, আমরা তাঁহাকে মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিতে পারিব না। শ্রীযুক্ত আণের সম্পর্কে কথা তো সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। আমরা এখনও মনে প্রাণে তাঁহাকে স্যার রাঘবেন্দ্র রাওয়ের সমশ্রেণীর রাজনীতিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবাসীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যমে তাঁহার আন্তরিকতাও রহিয়াছে। এই দিক দিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে আজকাল প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলেও তিনি যে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে কংগ্রেসের দাবী কোন দিক হইতে রক্ষিত হয় নাই। কংগ্রেস চাহিয়াছিল জাতীয় গভর্নমেণ্ট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইন সভার কাছে দায়িত্বসম্পন্ন ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত শাসন পরিষদ; প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে সে নীতিকে উপেক্ষা করা হইয়াছে, গোটাকত চাকুরীর সংখ্যা বাড়ান হইয়াছে মাত্র। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলিব, শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের জন্য কর্তাদের এই যে উদ্যম, ইহা ভাওতা দিয়া ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতে কায়েম রাখিবারই কৌশল মাত্র। সমগ্র জাতির জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া যিনি এই টোপ গিলিতে যাইবেন, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্যাদাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করিবেন। এমন ব্যক্তির এ পর্যন্ত রাজনীতিক মর্যাদা যদি কিছু থাকে, এই ফাঁদে পা দিবার পরে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং প্রবঞ্চিত দেশবাসীর ধিক্কার হইতে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন না।

জাতীয়তার উদ্বোধন—

বাঙলার বর্তমান হক মন্ত্রিমণ্ডল যে পাকেচক্রের মধ্যে পড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে বাঙালী হিসাবে বাঙালীর স্বার্থ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এই মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা রক্ষিত হইবে এমন আশা আমরা করিতে পারি না। বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিলই ইহার প্রমাণ। এই অনিষ্টকর উদ্যমের প্রতিক্রিয়া বাঙলার মুসলমান সমাজের মধ্যে জাতীয়তার প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতেছে, ইহা আশার কথা। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, বাঙালীর জাতীয় স্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করিবার এই উদ্যমকে ব্যর্থ করিতে হইলে শুধু দুই একটা সভা সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করিলেই চলিবে না; সভা সমিতির মূল্য না আছে এমন কথা আমরা কখনও বলি না; জনমতকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার পক্ষে সভাসমিতির খুবই মূল্য রহিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। সম্প্রতি কলিকাতায় বাঙলার হিন্দু মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি সভায় সেইরূপ ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইবার আন্দোলনের সূত্রপাত করা হইয়াছে। জাতীয়তার আন্দোলন বাঙলা দেশে নূতনভাবে আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের কাজ করিবার উপায় নির্ধারণের জন্য সভায় একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই সভায় কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন বিলটির সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করিবার ফলে বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙলার রাষ্ট্রনীতিক জীবনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন নীতির যে বিষ ঢুকিয়াছে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে তাহার অনিষ্টকারিতার অতি ক্ষুদ্র অংশ প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। বিষের উপচার বিভিন্ন ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সমাজ-জীবনের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং এ সম্বন্ধে সমগ্রভাবে সচেতন না হইলে বাঙালীর শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি সব ধ্বংস পাইবে; সুতরাং জাতিকে যদি বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে গোড়াকার বিষ উৎখাত করিয়া ফেলিতে হইবে। কোন তুকতাকের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নয়, এজন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচন নীতির বিলোপ সাধন করাই প্রয়োজন। আপাতঃ প্রতীয়মান তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রলোভনে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে যাহাতে বিকাইয়া না দেয়, এজন্য তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই

উদ্দেশ্য সাধনে তরুণদিগকেই আমরা প্রধান অবলম্বনস্বরূপ মনে করি। বাঙলার তরুণেরা ভারতের অন্য প্রদেশের চেয়ে জাতীয়তার আদর্শে বেশী সজাগ। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার নীতি ভাঙ্গাইয়া নিজেদের মতলব হাসিল করা অন্যত্র চলিতে পারে, কিন্তু বাঙলা দেশে তাহা চলিবে না, কর্তৃপক্ষকে ইহা বুঝাইয়া দিবার ভার প্রধানত রহিয়াছে বাঙলার তরুণদের উপর। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তরুণদের এই আদর্শে এক হওয়া উচিত। আজকাল জগতের তরুণ সমাজে সাম্প্রদায়িকতার স্থান কোথাও নাই। তুরস্ক, ইরাণ, মিশরের তরুণেরা সকল সঙ্কীর্ণতার সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার পথে বিজয় গৌরবে অভিযানে অগ্রসর, বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের তরুণেরাও পিছনে পড়িয়া থাকিবে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শিক্ষা বিলের বিশেষজ্ঞ কমিটি—

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের সম্বন্ধে আপত্তির কারণ না থাকিতে পারে, দেশের সকল সম্প্রদায়ের সুতীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং সরল প্রাণে তিনি যাহাতে আপত্তির কারণগুলি উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সরকার হইতে ঐ বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাঙলার শিক্ষা সচিবের এই সরল চিত্ততার সম্বন্ধে আমরা কোন সন্দেহ উত্থাপন করিতে চাহি না; কিন্তু, বিশেষজ্ঞ কমিটি, এই গালভরা নাম দিয়া যে কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেই কমিটি প্রধান মন্ত্রীর এ হেন আন্তরিক উদ্দেশ্য সাধনে কতটা সাহায্য করিতে পারিবে, এই বিষয়েই আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ বিলের আপত্তিগুলি কি কি, ইহা বুঝাই যদি প্রধান মন্ত্রীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগকে লইয়া ঐ কমিটি গঠন করা উচিত ছিল। অন্ততপক্ষে প্রধান মন্ত্রীর, নিজকে এবং তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষা বিভাগকে এই কমিটির সম্পর্ক হইতে দূরে রাখা কর্তব্য ছিল; কারণ যাঁহারা বিলের বিচার করিবেন, তাঁহারাই যদি প্রধান মন্ত্রীর প্রভাবাধীন হন, তাহা হইলে আপত্তির কারণ বুঝাইতে কমিটির উপযুক্ততার কোন মূল্য থাকে না; সেক্ষেত্রে যাঁহারা বিলকে অনাপত্তিকর মনে করেন, তাঁহারাই হন বিচারক শ্রেণীভুক্ত। বিশেষজ্ঞ কমিটিতে প্রধান মন্ত্রী নিজে রহিয়াছেন এবং তিনিই হইলেন কমিটির সভাপতি। তাঁহার নিকটই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন। শুধু মোড়ল হিসাবে তিনি যে এই কমিটিতে রহিয়াছেন ইহাই নয়, তাঁহার অধীনস্থ বিভাগের অনুগতদের মধ্যেও কয়েকজন সেখানে আছেন। বিলের যিনি জন্মদাতা সেই জেঙ্কিন্স সাহেবও কমিটিতে রহিয়াছেন। কিন্তু বিলের বিরুদ্ধতা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের দলের কাহাকেও কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় নাই। এতো গেল কমিটির গঠন; তার পর ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে ২৮শে জুলাই হইতে এবং এই অধিবেশনেই বিলটি যাহাতে পাশ করাইয়া লওয়া যায়, খুব সম্ভব সেইজন্যই ২৬শে জুলাইয়ের মধ্যে কমিটিকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিলের বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিগুলির সম্বন্ধে কমিটির সদস্যগণ বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া যাহাতে মত প্রকাশ করিতে পারেন, এরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে কমিটিকে আরও বেশী সময় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কমিটির গঠন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির গুরুত্ব সদস্যদের বিচার-বিবেচনাকে বিলম্বিত করিবে না, কমিটি নিয়োগকালে ইহা ধরিয়া লইয়াই বোধ হয় সময় সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। এই সব দিক হইতে বিবেচনা করিলে বিশেষজ্ঞ কমিটির এই নিয়োগ ব্যাপারটা মন্ত্রি-মণ্ডলের নিজেদের নীতির সাফাই গাহিবার জন্য একটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া দেশবাসীরা অন্য কিছু মনে করিতে পারিবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে ঢুকাইয়া বাঙলা দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার এই যে উদ্যম দেশের মঙ্গলকামী মাত্রেই তাহার বিরুদ্ধতা করিবেন। সরলচিত্ত বাঙলার শিক্ষাসচিবকে আমরা এই কথা কয়েকটি শুনাইয়া রাখিতে চাই।

সম্মুখে সুদীর্ঘ সংকট—

বাঙলার মন্ত্রীরা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন এবং তাঁহাদের তরফ হইতে স্যার বিজয়প্রসাদ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জানি, দেশের অবস্থা কিরূপ সংকটজনক হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু যাঁহারা অর্থসংকট ছাড়া দুর্ভিক্ষের কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে চাহেন না এবং চাউলের দর চড়াকে বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা অবলম্বনের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া চলিতে চাহেন, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলেন, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যেই আগ্রহ সহকারে আমরা ঐ বিবৃতিটি পাঠ করিয়াছি। স্যার বিজয়প্রসাদের বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে, বন্যার ফলে নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ব্যাপক অঞ্চলের ফসল—আউস এবং আমন দুই-ই একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। আগামী বৎসরের আউস ধান কিছু ঘরে না আসা পর্যন্ত এই সব অঞ্চলের নিদারুণ অন্নকষ্ট দূর হইবে না। ভোলার অবস্থা ত বর্ণনাতীত; ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, বিশেষভাবে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অবস্থাও শোচনীয়। সরকারী কৃষিঋণ এবং খয়রাতী দানের যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তা এই দুর্দশার প্রতীকার সাধনের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে। শুধু কৃষিঋণ দিলেই চলিবে না, যাহাদের জমিজমা নাই, তাহাদের গতি হইবে কি? তাহাদিগকে কাজ দিতে হইবে। কিন্তু কাজই বা কি দেওয়া যায়। রাস্তা তৈয়ারীর কাজ, পুকুর কাটার কাজ—এই দুইটি

এরূপ ক্ষেত্রে প্রধানত দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু জলে যেখানে সব ডুবিয়া গিয়াছে, সেখানে এ কাজ দিবার কোন উপায় নাই। ধান ভানার কাজের কথা বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে; কিন্তু ধান্যেরই যেখানে অভাব, সেখানে ধান ভানিবার কাজই বা জুটিবে কোথা হইতে? তারপর দিনরাত বাদলা-বৃষ্টি। সুতরাং সকল দিকে নিরুপায় অবস্থা। বাঙলার সর্বত্র অতি ঘোর দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে এবং দেশের লোকের অন্ন সংস্থানের এই সমস্যা বাঙলার কাছে আজ বড় সমস্যা। এই সমস্যার যথোচিত প্রতীকারের জন্য যদি শাসকেরা মনে প্রাণে অবহিত না হন তাহা হইলে বাঙলা দেশে নানা আকারে অশান্তি দেখা দিবে, আমরা এই আশঙ্কা করিতেছি। দেশবাসীর নিকটও আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁহারা আর্ত এবং বিপন্নের জীবন রক্ষা করিতে অগ্রসর হউন। দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুঃখে কষ্টে যদি আমাদের প্রাণে বেদনা না জাগে এবং নিজেদের স্বার্থ ভুলিয়া সেবার প্রেরণা আমাদের মধ্যে প্রবল না হয়, তবে জগতে মনুষ্যত্বের দাবী করিবার অধিকার আমাদের নাই।

পণ্ডিত নেহরুর মুক্তি প্রশ্ন—

রুশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর লড়াই বাধিবার পর গুজব কতই রটিতেছে। বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণের গুজব, স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে আমেরিকায় এবং শ্রীযুক্ত জয়াকরকে জাপানে ভারতীয় প্রতিনিধিস্বরূপে প্রেরণ শ্রীযুক্ত জয়াকরকে জাপানে ভারতীয় প্রতিনিধিস্বরূপে প্রেরণ, ভাবী বড়লাটের পদে লর্ড হ্যালিফাক্সের নিয়োগ,—এই সব মুখরোচক গুজবের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সত্বরই কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করা হইবে, এই গুজবও কয়েকদিন হইল রটিয়াছে। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে এই সব গুজবের কোনটি সত্য হইলেও আমাদের উল্লাসের যেমন কোন কারণ নাই, সেইরূপ মিথ্যা হইলেও নৈরাশ্যের কিছুমাত্র হেতু নাই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে জাতির নাই, স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহার প্রতিনিধিত্বের সং সাজিয়া যিনি সুখী হইতে চাহেন সুখী হউন, জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে কিছুই তিনি করিতে পারিবেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধেই আমাদের এ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের মুক্তির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পণ্ডিত জওহরলাল কারাদণ্ডকে ভয় করেন না। তিনি বহুবার কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছেন, এখন যদি কারাগার হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয়, তাঁহার প্রতি শাসকদের ব্যক্তিগত এই বিবেচনায় তিনি গলিয়া পড়িবেন না। দেশের স্বাধীনতাই তাঁহার পক্ষে বড় এবং কারামুক্তির পর প্রয়োজন হইলে তিনি শতবার কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইতে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। পণ্ডিত জওহরলালের মুক্তিতে তাঁহার সহযোগিতা লাভ করাই যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের আগে কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লওয়া কর্তব্য। ভারত-সচিব এ সম্বন্ধে শেষ কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা এই যে, নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য তাঁহারা ভারতের রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করাও যেমন প্রয়োজন বোধ করেন না, সেইরূপ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার প্রতীকার করিবার জন্যও নূতন কিছু তাঁহাদের বলিবার নাই। ভারতসচিবের মুখে এমন উদ্ধত উক্তি শুনিবার পর তাঁহাদের অনুগ্রহ সম্পর্কিত যত গুজব আমাদিগকে কিছুমাত্র আশ্বস্ত করে না, বরং আমাদের মনে বিরক্তিরই উদ্রেক করিয়া থাকে। আমরা অনুগ্রহ চাই না, চাই মানুষের মত নিজেদের মর্যাদা এবং অধিকার।

ফ্রান্সের জাতীয় দিবস—

গত ১৪ই জুলাই ফরাসী জাতির জাতীয় দিবস গিয়াছে। এই দিবসে ফরাসী দেশের অন্তর হইতে মানবতার এক মহান্ উচ্ছ্বাস উঠে এবং সেই উচ্ছ্বাস কারা-দুর্গের পাষাণ প্রাকার ভেদ করিয়া বিপুল গর্জনে বাহির হয়। তাহার তরঙ্গের তাড়নে স্বৈরাচারীর স্বর্ণ সিংহাসন ভাসিয়া যায়, নির্যাতিত এবং দলিত মানব মুক্ত বায়ুর স্পর্শে মহাশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিন উন্মুক্ত আকাশের তলে উচ্চ মস্তকে দাঁড়াইয়া ফরাসী জাতি সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার বাণী জগৎকে শুনায় এবং জগৎ তাহাতে নূতন বল, নবীন প্রেরণা লাভ করে। ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরার ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে; আজ সেই ফ্রান্স স্পর্ধিত পররাজ্যগ্রাসীর পদানত। স্বাধীনতা দিবসের উৎসব তিথি, এবার ফ্রান্সে শোকের দিবসরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে। উত্থান এবং পতন কালচক্রেরই এ গতি, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ফ্রান্সের কারাদুর্গ হইতে মানবের যে জয়গান একদিন উত্থিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্ঘট্ট রোলে তাহা কোনদিন স্তব্ধ হইবে না। অন্তঃস্থল বাহিনী ফল্গুধারার মত ফ্রান্সের মুক্তিমন্ত্র-উদ্গাতাদের প্রেরণা মানবকে নূতন শক্তি দান করিবে।

যুদ্ধে আদর্শের সংঘাত

চৌদ্দ মাস আগে, জার্মানরা ডেনমার্ক দখল করিবার একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একদল নৌসেনা আইসল্যাণ্ডে লইয়া নামান। আইসল্যাণ্ড স্বাধীন দ্বীপ; কিন্তু স্বাধীন হইলেও ডেনমার্কের রাজাকে আইসল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে রাজা বলিয়া মান্য করা হইত। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে এই আশ্বাস দান করেন যে, আইসল্যাণ্ড দখল করিতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের কোন ইচ্ছা নাই। জার্মানি পাছে ডেনমার্কের রাজা বলিয়া আইসল্যাণ্ড দখল করিয়া বসে, সেইজন্য তাঁহারা সাময়িকভাবে আইসল্যাণ্ডে সেনা নামাইয়াছেন। কারণ, জার্মানি যদি আইসল্যাণ্ড দখল করে, তাহা হইলে সেখানে উড়োজাহাজের ঘাঁটি বসাইয়া সে একদিকে ইংরাজের জাহাজের গতিবিধির পক্ষে উত্তর আটলাণ্টিকের সমুদ্রপথ বিপন্ন করিয়া তুলিবে, অন্যদিকে আইসল্যাণ্ড হইতে স্কটল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে উড়োজাহাজযোগে হানা দিতেও সে সুবিধা পাইবে। ইহার পরে অবশ্য কিছু ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। জার্মানি নরওয়ে দখল করিয়াছে এবং সেখানে উড়োজাহাজ এবং সাবমেরিনের ঘাঁটি বসাইয়াছে। এই সঙ্গে আইসল্যাণ্ড যদি সে দখল করিতে পারিত তাহা হইলে আটলাণ্টিক সমুদ্রে ইংরেজের জাহাজ ডুবাইবার এখনকার চেয়ে বেশী সুবিধা তাহার হইত। গত বৎসর আমেরিকা গ্রীনল্যাণ্ডে সেনা অবতরণ করায় এবং তাহাও ঐ জার্মানির আক্রমণের আশঙ্কা প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা হিসাবে। সম্প্রতি কয়েকদিন হইল আমেরিকা, আইসল্যাণ্ডে নিজেদের নৌসেনা নামাইয়াছে এবং আইসল্যাণ্ডে জার্মান উদ্যম প্রতিহত করিবার ভার নিজেদের হাতে লইয়াছে। ইহাতে ইংরেজের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে এই যে, ইংরেজদের যে সব নৌসেনা এবং জাহাজ আইসল্যাণ্ডে আটক ছিল, ইংরেজ তাহা অন্যত্র নিযুক্ত করিতে পারিবে। আইসল্যাণ্ডে মার্কিনদের এই সৈন্য নামান ব্যাপারটা মার্কিন জাতির পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। মার্কিন জাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া পররাষ্ট্র সম্পর্কে এই নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে যে, পশ্চিম গোলার্ধ লইয়াই তাহারা থাকিবে, পূর্ব গোলার্ধের কোন ব্যাপারে তাহারা হাত দিবে না। মার্কিন জাতির এই নীতিকে মনরো নীতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। গ্রীনল্যাণ্ড পশ্চিম গোলার্ধের ভিতর, কিন্তু আইসল্যাণ্ডের অবস্থান পূর্ব গোলার্ধের মধ্যে। মার্কিন রাষ্ট্রনীতিকদের এই নব অবলম্বিত নীতির ফলে জার্মানরা এই সুর তুলিয়াছে যে, এইবার আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ দিল। আমেরিকার এই নূতন নীতি অবলম্বনের অর্থ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সমান না হইলেও ইহা সত্য যে, আমেরিকা ইংরেজকে সাহায্য করিবার দিকে আরও এক ধাপ আগাইয়া গেল এবং প্রয়োজন হইলে সে এই নীতি আরও সম্প্রসারিত করিবে। ইতিমধ্যেই একটা কথা শোনা গিয়াছিল যে, আমেরিকা স্কটল্যাণ্ডে এবং আয়র্ল্যাণ্ডে নৌঘাঁটি নির্মাণ করিতেছে। এ কথার প্রতিবাদ হইয়াছে, তবে একথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে নৌঘাঁটি নির্মাণের কাজে মার্কিন মিস্ত্রী, ওস্তাদ—ইহাদিগকে লওয়া হইয়াছে। কিছুদিন আগে এমন কথা শুনা গিয়াছিল যে, মার্কিন

লেনিনগ্রাডের দৃশ্য : দূরে সেণ্ট আইসাকস ক্যাথিড্রেল দেখা যাইতেছে। বর্তমানে ইহা রুশিয়ার একটি বিখ্যাত মিউজিয়াম।

গভর্নমেণ্ট দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলের উপকূলভাগে নৌঘাঁটি নির্মাণ করিবেন এবং পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ গাম্বিয়াতেও ইংরেজের অনুমোদনক্রমে তাঁহারা উড়োজাহাজের ঘাঁটি তৈয়ার করিতে পারেন। মার্কিন রাষ্ট্রনীতি পূর্ব গোলার্ধে সম্প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যদি লড়াইতে নামিতেই হয় তাহা হইলেও মার্কিন গভর্নমেণ্ট সে ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত আছেন।

কথা হইতেছে এই যে, মার্কিন গভর্নমেণ্টকে সত্যই লড়াইতে নামিতে হইবে কি? কিছুদিন পূর্বে রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানি যুদ্ধে নামিবার পর আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভার এই মত প্রকাশ করেন যে, জার্মানিকে অতঃপর রুশিয়াকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে; সুতরাং ইহার পর আমেরিকার পক্ষে লড়াইতে নামার আর কোন প্রয়োজন হইবে না। স্থূল দৃষ্টিতে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। জার্মানি রুশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে নামিবার পর এ পর্যন্ত আটলাণ্টিকে প্রতিপক্ষের

জাহাজডুবিতে ঢিলা দেয় নাই। সেদিনও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইংরেজ এবং আমেরিকার কারখানা হইতে যত জাহাজ এক মাসে তৈয়ার হইতেছে, জার্মানরা আটলান্টিক সমুদ্রে তাহার চেয়ে বেশী জাহাজ ডুবাইতেছে; কিন্তু এ অবস্থা কয়েক মাস আগেও ছিল, নূতন কিছু নহে, পক্ষান্তরে সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে, রুশিয়ার সঙ্গে জার্মানির লড়াই বাধিবার পর জার্মানির দ্বারা ইংলন্ড আক্রমণের আতঙ্ক অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, ইংলন্ডের উপর জার্মান বিমানবহরের হানার তীব্রতা তেমন বেশী নাই। চার্চিলের বিবৃতিতেও ইহাই দেখা যাইতেছে; অবশ্য পরে কি হইবে বলা যায় না। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিনের পক্ষে সংগ্রামের সর্বাধিক ঝুঁকি লইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল কেন? নিজেদের আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইবার কারণ কোথায়?

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রুশ-জার্মান লড়াইয়ের চলতি অবস্থার জন্য চিন্তাটা তত বেশী নয়, চিন্তা হইল পরের পরিস্থিতির জন্য। পরবর্তী সে পরিস্থিতির স্বরূপের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে হইলে বর্তমান যুদ্ধের অন্তর্নিহিত আদর্শের সঙ্ঘাতের দিকটা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে লড়াই চলিতেছে তিনটি আদর্শের মধ্যে—নাৎসী-জার্মান ফ্যাসিস্ট আদর্শ, রুশিয়ার সাম্যবাদের আদর্শ এবং ধনতন্ত্রমূলক ইংরেজ-মার্কিন গণতান্ত্রিকতার আদর্শ।

রুশিয়া আক্রমণ করিয়া জার্মানি যত সহজে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, বলা বাহুল্য, তত সুবিধা সে করিয়া উঠিতে পারে নাই, বরং সীমান্তদেশ পার হইয়া রুশ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে জার্মানিকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। মস্কো, কিয়েভ এবং পেট্রোগ্রাদ এই তিন দিকে জার্মানরা সমানভাবে জোর দিয়াছিল; কিন্তু এক মিনস্কের পথে স্মোলেনস্কের দিকে কতকটা অগ্রসর হওয়া ছাড়া, এতদিন অন্য কোন দিকেই সে সুবিধা করিতে পারে নাই। স্মোলেনস্ক ১০ মাইল পশ্চিমে জার্মান সেনা এখনও রহিয়াছে এবং স্মোলেনস্ক হইতে মস্কোর দূরত্ব তিনশত মাইলেরও উপর। জার্মানরা নীপার নদী এখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঠিক এই অঞ্চলেই নেপোলিয়ান রুশ সেনাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়—রুশ সেনা সমগ্র অঞ্চল শ্মশানে পরিণত করিয়া দিয়া হটিয়া যায়। নেপোলিয়ানের আক্রমণকালের সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখন মিনস্ক হইতে মস্কো পর্যন্ত বড় রাস্তা হইয়াছে; কিন্তু এই রাস্তার সাহায্যও জার্মানি সেরকম গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সোভিয়েটদের যে রেল লাইন, সেই লাইনে জার্মানদের গাড়ী চালান যায় না; তারপর, এই অঞ্চলে পাহাড় পর্বত না থাকাতে জার্মানদের ট্যাঙ্ক চালাইবার সুবিধা হইলেও সুদীর্ঘ প্রান্তরের আশেপাশে সুবিস্তৃত জলাভূমি এবং জঙ্গল রহিয়াছে। রুশ সেনারা এই সব স্থানে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া অবস্থান করিতেছে। জার্মানদের অগ্রগামী বাহিনী তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া যে নির্বিঘ্ন হইয়া আগাইবে সে সুবিধা পাইতেছে না, ফলে তাহারা পশ্চাদ্ভাগ হইতে উপদ্রুত হইবে, এ আশঙ্কা থাকিয়া যাইতেছে। জার্মান সরকারী ইস্তাহারে এই সব অসুবিধার কথা স্বীকার করা হইয়াছে। সম্প্রতি পেট্রোগ্রাদ শহর জার্মানদের আক্রমণে বিপন্ন হইয়াছে এইরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে এবং শোনা যাইতেছে যে, জার্মানরা বর্ষার কুলপ্লাবী নিস্টার নদী পাড়ি দিয়া কিয়েভের একরূপ দ্বারদেশে পৌঁছিয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, জার্মানী রুশিয়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে এ সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু যতই ঢুকিয়া পড়িবে প্রতিকূলতার ক্ষেত্রও উন্মুক্ত হইবে ততই প্রচুর। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রুশিয়ার লড়াই সহজে মিটিবার নয়; অথচ জার্মানি যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার বসিয়া থাকিবার উপায়ও নাই; কারণ, যদি তাহাই থাকিত, তাহা হইলে সে এখনই রুশিয়া আক্রমণ করিতে যাইত না। জার্মানির দরকার শস্যের, দরকার তেলের। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সকল রকম ঝুঁকি সে লইবে। শুনা যাইতেছে, জার্মানি তুর্কী-বুলগেরিয়া সীমান্তে বহু সৈন্য সমবেত করিতেছে। জার্মান ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে ঐ অঞ্চলে দিন রাত দুর্গাদি নির্মাণকার্য চলিতেছে। বহু বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, জার্মানি তুরস্কের মধ্য দিয়া গিয়া বস্ফোরাস দখল করিবার জন্য তোড়জোড় করিতেছে। আমরা সে সম্ভাবনা অমূলক বলিয়া মনে করি না। উত্তর দিকে পশ্চিম রুশিয়ার পথে ককেসাস অঞ্চলের দিকে আগাইতে না পারিয়া জার্মানি বাধ্য হইয়া এসিয়া মাইনরের পথে পূর্ব দিকে গতিবেগ বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে ইংরেজ এবং রুশিয়া উভয়ের সঙ্গে তাহার সঙ্ঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। ইংরেজ তখন রুশিয়াকে সাহায্য করিয়াই যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিয়া নিজের ঘাঁটি পাকা করিবার ফুরসুৎ পাইবে না। ইহার ফলে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে; কারণ, ইতিমধ্যেই ইরাকের লড়াই চালাইবার সম্বন্ধে দায়িত্ব ভারত গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের জঙ্গীলাট হিসাবে জেনারেল ওয়াভেলের নিয়োগের গুরুত্ব আসন্ন এই পরিস্থিতি হইতেই কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যাইবে।

একটা জিনিষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই যে, রুশিয়ার সঙ্গে জার্মানির লড়াই বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর সঙ্ঘবদ্ধতা লাভ করিতেছে। রুশ-জার্মান লড়াইতে জয় যাহারই হউক না কেন, নিজেদের ধনতন্ত্রমূলক গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি প্রীতির ভাবই ইহার মূলে কাজ করিতেছে। এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, নাৎসী ফ্যাসিস্ট আদর্শবাদকে এই ধনতন্ত্রমূলক গণতান্ত্রিকেরা যেমন ভয় করে, রুশিয়ার সাম্যবাদমূলক আদর্শকেও সেইরূপ প্রীতির চোখে দেখে না। রুশ-জার্মান লড়াইয়ের পরিণতির ফলে নাৎসীবাদ বা সাম্যবাদ যাহাতে তাহাদের আদর্শকে বিপর্যস্ত করতে না পারে, সেজন্য ইহাদের উদ্বেগ রহিয়াছে। কিন্তু আপাতত নাৎসীদের প্রাধান্যের উদ্বেগটাই বেশী। জার্মানরা রুশিয়ার শস্য এবং খনিজ সম্পদে বলীয়ান হইয়া ইঙ্গ-মার্কিনদের আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে এমন সম্ভাবনা যে না রহিয়াছে, এমন নয়। জেনারেল ওয়াভেল কিছুদিন পূর্বে মার্কিন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছেন, রুশিয়ার সম্পদে নাৎসীরা অধিকতর শক্তি অর্জন করিবার আগেই, নাৎসীদিগকে যাহাতে পরাস্ত করা যায়, সেজন্য মার্কিনদের ইংরেজকে আরও বেশী সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিছুদিন আগে ভারতের ভূতপূর্ব জঙ্গীলাট জেনারেল অচিনলেকও এই ধরণের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে মার্কিনদের সেনাবলের সাহায্যলাভ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে এই বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ মনে করেন যে, জার্মানি যদি রুশিয়া হইতে সেনা সরাইয়া আনিবার মত সুবিধা পায় এবং সেই সঙ্গে রুশিয়ার তেল, খনিজসম্পদ এবং শস্য লাভ করে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে জার্মানিকে হারাইতে হইলে মার্কিন সেনার সহায়তা ইংরেজের পক্ষে দরকার হইয়া পড়িবে।

জার্মানি কিছুদিন আগে তুরস্কের সঙ্গে অনাক্রমণাত্মক সন্ধি করিয়াছে; কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে সন্ধির মূল্য খুবই সামান্য।

রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিকে সে যেমন মূল্য দেয় নাই, তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্তগুলোকে সে তেমনভাবেই অগ্রাহ্য করিতে পারে। আটলাণ্টিক সাগরে এবং ইউরোপের দিকে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী যেভাবে জাঁকিয়া উঠিতেছে, তাহার পাল্টা কিছু প্রশান্ত মহাসাগরে করা দরকার। সেদিকে ত্রিশক্তির লেজুড়স্বরূপে রহিয়াছে জাপান। শুনিতেছি, মার্কিনের আইসল্যাণ্ডে সেনা পাঠাইবার পর, জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা সাজ সাজ রব তুলিয়াছে। জাপানী সামরিকদের মধ্যে দুই দলের জোরই রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশী। একদল ইংরেজের বিরোধী, আর একদল রুশ-বিরোধী। জার্মানি আজ রুশিয়ার বিরুদ্ধে নামিয়া এই দুই দলকে নিজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিবার চাল চালিয়াছে। কিন্তু জাপানের অবস্থা সুবিধাজনক নয়, ইতালির মত জার্মানির জোরেই তাহার জোর। জার্মানি পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স দখল করিবার পর জার্মানদের জোর দেখিয়া জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে কিছু সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। এই সময় তাহারা ইন্দু-চীনের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু তার পরে, কার্যত কোনরূপ উচ্চবাচ্য করে নাই; এখন যদি পূর্বাভিমুখে জার্মানদের জোরের পরিচয় পায়, তাহা হইলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে আবার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতে পারে; সেক্ষেত্রে রুশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং চীন সাধারণতন্ত্র, ইহাদের সকলের সঙ্গে তাহাকে লড়িতে হইবে, ঝুঁকি সামান্য নয়।

বর্তমান লড়াইয়ে তিন আদর্শের সংঘাত চলিতেছে। নাৎসীবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরেজ এবং মার্কিন উভয়েই পরম উৎসাহশীল এবং সে উদ্দেশ্য সাধনে উভয়েই রুশিয়াকে সাহায্য করিতে সমানভাবে উৎসুক। সেদিন ইংরেজের সঙ্গে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েটের সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি আধুনিক ইতিহাসে এই প্রথম। সন্ধির দুইটি মাত্র সর্ত, তাহার মধ্যে প্রথম সর্তটি নিতান্ত মামুলী। রুশিয়া যখন জার্মানির শত্রুতা করিতে লাগিয়াছে, তখন জার্মান নিধন কার্যে ইংরেজ তাহাকে সহায়তা করিবে, এতো জানা কথা। গুরুত্ব যদি কিছু থাকে, আছে দ্বিতীয় সর্তটির। সে সর্তটি হইল এই যে, রুশিয়া কিংবা ইংরেজ কোন পক্ষই অপর পক্ষের সম্মতি না লইয়া শত্রু পক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিতে পারিবে না। ভবিষ্যতের জন্য রুশিয়ার দিক হইতে বাঁচোয়া আছে এই সর্তটির মধ্যে; কিন্তু এই সব বাঁচোয়ার ব্যবস্থার কোন মূল্য নাই; দরকার মনের মিলের। আধুনিক যুদ্ধের যে নীতি তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে রুশিয়ার সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি ইংরেজদের যে অপ্রীতিকর ভাব রহিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। নাৎসীদের চেয়ে কমিউনিষ্টরা সাংঘাতিক জীব, এই ধরণের মনোবৃত্তি লইয়া রুশিয়াকে সাহায্য করিয়া নাৎসীদিগকে দলন করা যাইবে না। মানবের স্বাধীনতা, মানুষের স্বাধীনতার বড় বড় কথা, কেবল ইংলণ্ডের বেলাভূমির মধ্যে কিংবা সুয়েজ খালের পশ্চিম দিকের অধিবাসীদের পক্ষেই কার্যকর অন্যত্র নয়, এমন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে গোঁজামিল চলিবে না; কিন্তু দেখা যাইতেছে, বৃটিশ রাজনীতিকগণ এখন গোঁজামিল দিয়াই চলিতে চাহিতেছেন। জার্মানি সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ করার পর ভারতের সাম্যবাদী ও অসাম্যবাদী সকল মহলেই জার্মানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতে দেখিয়া একদল বৃটিশ রাজনীতিক এই বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারত এইবার মনে প্রাণে ইংরেজের দিকে যোগ দিবে; ভারতের সাম্যবাদী নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ভারতের পক্ষে রুশিয়াকে সকল রকমে সাহায্য করা উচিত। সত্যাগ্রহী ছাড়া, ভারতে যে সব রাজনীতিক বন্দী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে কমিউনিষ্ট না হইলেও রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রমিক এবং কৃষক নেতার সংখ্যা কম নয়। রুশিয়ার দিকে সহানুভূতির সূত্রে নাৎসীদের বিরুদ্ধে ভারতের জনমত যাহাতে জাগ্রত হয়, সেজন্য মিঃ সোরেনসেন ভারতের রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত কিনা এই সম্বন্ধে ভারত সচিবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সচিব যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতির ভাবকে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে জাগাইয়া তুলিয়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে ভারতের জনশক্তিকে গঠন করিবার জন্য গরজ তাঁহাদের কিছুই নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বৃটিশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদমূলক মনোবৃত্তি এখনও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। বৃটেন এবং মার্কিণ পরস্পরের আদর্শে দৃঢ় হইয়া আজ নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি যেভাবে পাকিয়া উঠিতেছে তাহাতে প্রতিক্রিয়া অতি সুদূরপ্রসারী হইবে, ইহা উপলব্ধি করিয়া বৃটিশ রাজনীতিকদের মানবের স্বাধীনতা এবং মানবের অধিকারকে শুধু কথায় নহে, কাজে স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।

পাহাড়ের ডাক

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

পাহাড়ের ডাক শুনি, ডাক শুনি উঁচু পাহাড়ের।
হাতের চেটোর মত সমতল মাটির কুহরে
পাথরকঠিন ডাক, ডাক তার পাহাড়িয়া স্বরে,
শ্লথকণ মৃত্তিকার বাঁধ বুঝি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে,
তবু মাটি জড়াইয়া ধরে।

ডাক শুনি পাহাড়ের, কল্পনায় আঁকি তার ছবি।
ধূসর পিঙ্গল রুক্ষ? মসীকালো কঠিন পাষাণ?
পর্বতীয় ঘাসে ঢাকা? গায় তার শ্যাওলার ঘ্রাণ?
দীর্ণ-চীর গাছ তার বুকে করে রসের সন্ধান,
তবু তার কি প্রবল টান!

পাহাড়ের ডাকে টান, আকর্ষণ পাহাড়ের রূপে।
মাটির সোঁদালো রসে-ভেজা বুকে আকর্ষণ করে,
রুক্ষতার ডাক বুঝি তলতলে কাদার ভিতরে!
স্যাঁতসেঁতে রোমরন্ধ্র সিক্ততায় হাঁপাইয়া মরে!
বুকে তাই পাহাড়েরে গড়ে।

পাহাড়ের রূপ দেখি, ধ্যান করি উঁচু পাহাড়ের,
সমতল নিত্যতার বুক চিরে মাথা যার খাড়া,
বন্ধুর উপলঘাত প্রতি পায় মাথা দেয় চাড়া,
অনুদ্বেজ সোয়াস্তির ভেঙে যায় আরামী আগার
ধ্যান করি অদেখা পাহাড়।

অদেখা পাহাড় ডাকে, ডাক তার শুনি কান পেতে,
পাথুরে লতায় ঢাকা ভ্রমি তার শিখরে শিখরে,
রূপ তার বদলায়, অন্বেষণ প্রহরে প্রহরে,
বুনো ফুল ডাক দেয়, সাপটিয়া ধরে কাঁটালতা
ভুলে যাই মাটির মমতা।

প্রতিশোধ

গোপাল ভৌমিক

জীবনে কোথায় যেন
গুপ্ত ছিল ধ্বংসকারী কীটঃ
কোথায় ফাটল ছিল—
ছিল বুঝি চির-খাওয়া ইঁট।

মানুষের শোন চোখে
পড়ে নাই সে-প্রকান্ড ফাঁকিঃ
নগরে নগরে তাই
অন্ধকার, বিরাট চালাকি!

ভেবেছ সহজে বুঝি
শোধ হ'বে বঞ্চনার ঋণ?
আঁধার আকাশে বুঝি
দেখা দেবে তপ্ত সৌরদিন?

অতটা সহজ নয়
প্রকৃতির গুপ্ত প্রতিশোধ—
এত যে আঘাত পাও—
জাগে নাকি তবু আত্ম-বোধ?

এখনো সজাগ হও—
আছে আত্ম-শুদ্ধির সময়—
ঝেড়ে ফেল যত মোহ—
সহজ সন্তুষ্টি আর ভয়।

দুঃসাহসে বাঁধো বুক—
শান্ দেও নগ্ন তলোয়ার,
যখন সুদিন আসে
ছিঁড়ে ফেলো পুঞ্জিত আঁধার।

মনে তবু আশা রাখো
সূর্য-কর বেশী দূরে নয়—
একদা হবেই হবে—
পূর্বাকাশে উদার উদয়।

[৫]

সঞ্জিত পিয়ারীকে ভয় করে। পিয়ারীর সান্নিধ্য, কণ্ঠস্বর, চাহনি তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। রূপকে সে ভয় করে না, কিন্তু আক্রমণকে সে ভয় পায়। সঞ্জিতের মনে হয় পিয়ারী যেন মায়া জানে, তাই সে তাহাকে এড়াইয়া চলে। পিয়ারীর রূপ-যৌবন প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত এবং তাহার আক্রমণ ভয়ংকর।

অলকনন্দা পিয়ারীকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে নাই। সর্বহারা জাতিকে সে ভালবাসে, তাহাদের সে জাগাইয়া তুলিতে চায়, জীবন্ত করিয়া তুলিতে চায়। পিয়ারীর দুর্বলতা অলকনন্দার নিকট অজ্ঞেয় নয়, তাহার স্বাভাবিক উচ্ছৃংখল জীবনকে সে জানে, তবু তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে নাই।

অলকনন্দা যখন বাহিরে যায়, তখন তাহার পুত্র বিজন ও বাসন্তীকে পিয়ারীর নিকট রাখিয়া যায়। বিজনের বয়স দশ, বাসন্তীর ছয়। নিঃসন্তান পিয়ারী বিজন ও বাসন্তীকে নিজের সন্তানের ন্যায় ভালবাসে। বিজন ও বাসন্তীর খাওয়া-পরা, স্নান, ঘুম পাড়ান, বেড়ান সমস্তই পিয়ারী করে। পিয়ারীর কণ্ঠ সুমধুর, পিয়ারীর গান বিজন ও বাসন্তী ভালবাসে।

অলকনন্দা সভায় গিয়াছে, সঞ্জিতও বাড়ি ছিল না। বিজন ও বাসন্তী অন্যান্য দিনের ন্যায় পিয়ারীর নিকট ছিল। সঞ্জিত যখন সভা হইতে রাগ করিয়া বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি ন'টা বাজিয়া গিয়াছে।

বাসন্তী ও বিজন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পিয়ারী খাটিয়ার এক কোণে বসিয়া একটি বর্ণপরিচয় পড়িতেছে। পিয়ারী অলকনন্দার নিকট অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় লেখাপড়া শেখে।

সঞ্জিত ভিতরে প্রবেশ করিতেই পিয়ারী সোজা হইয়া বসিল এবং দরজার দিকে তাকাইয়া বলিল, অলকাদি আসে নি?

সঞ্জিত ছোট করিয়া বলিল, না।

সঞ্জিত ভাবিয়াছিল, পিয়ারী এবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, বরঞ্চ খাটিয়ায় চাপিয়া বসিল।

সঞ্জিত খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, চন্দ্রারাও ফেরে নি?

না। ওটা কি মানুষ, কোথায় মদে চুর্ হ'য়ে পড়ে আছে কে জানে। পুলিশের গলাধাক্কা খেয়ে শেষ রাত্রে হয়ত বাড়ি ফিরবে আমার হাড় জ্বালাতে। আপনিই বলুন, এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে?

ইহার পর পিয়ারী কথার মোড় কোন্ দিকে টানিয়া নিবে, তাহা সঞ্জিত জানে, তাই সে তাড়াতাড়ি বলিল, রাত হয়েছে অনেক এবার বাড়ি যাও, অনেকক্ষণ তোমায় আটকিয়ে কষ্ট দিয়েছি।

কষ্ট! পিয়ারী সুমধুর হাসি হাসিল, হাসিতে তাহার দেহের যৌবন-রেখায় একটা উদ্দাম তরংগ খেলিয়া গেল এবং চোখ দুইটি ঝলসিয়া উঠিল।

সঞ্জিত বলিল, রাত হয়েছে পিয়ারী।

বেশি আর কত, আপনি খেয়ে নিন, খেতে খেতে কথা বলা যাবে। পিয়ারী শরীরটা একবার দুলাইয়া, আড়চোখে সঞ্জিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, সত্যি এ অলকাদির অন্যায়, আপনার মত স্বামী যার, তাকে একলা ফেলে কি ক'রে যে বাইরে থাকতে পারে—আমি হ'লে—

পিয়ারী আর বেশি দূরে অগ্রসর হইতে পারিল না। ভয়ে মাঝ পথে কথা আটকাইয়া গেল।

সঞ্জিত বলিল, আমি অন্যত্র খেয়ে এসেছি, এখন ঘুমাবো—

পিয়ারী উঠিল না, বলিল, কিছুই খাবেন না?

না, তুমি এখন যাও, আমার ঘুম পেয়েছে।

পিয়ারী মনে মনে হাসিল, কিন্তু উঠিল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন সঞ্জিতের নিকট হইতে কোনই সাড়া পাইল না, তখন খাটিয়া হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল, আপনারা ত' এত লোকের উপকার করেন, আমি কি উপকার পাবার যোগ্য নই?

পিয়ারী পূর্ব কথার সুর ধরিয়া বলিল, আমি এ অত্যাচার আর সইতে পারি নে। আমার—পিয়ারী একটু থামিয়া, একটু হেলিয়া সুমধুর স্বরে বলিল আমার এত রূপ, যৌবন, জীবন কি এমনিভাবে ব্যর্থ হবে?

বিদ্রোহিনীর যে স্বাভাবিক উগ্রতা ও ধ্বংসমুখী তেজস্বিতা থাকে, তাহা পিয়ারীর কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল না, এ যেন নিছক শেখান কথা, আবৃত্তির মত বাহির হইয়া আসিয়াছে। পিয়ারী কি ভয় করে? শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের ব্যবধান কি সে আজও অতিক্রম করিতে পারে নাই?

সঞ্জিত পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং জামা খুলিতে খুলিতে বলিল, তোমার দুঃখে সমবেদনা জানান ভিন্ন আর কি করতে পারি—সকলই অদৃষ্ট।

আপনিও অদৃষ্ট বলেন!

আর কি বলতে পারি। তোমাদের দাম্পত্য জীবনে বাইরের কোন কথা চলে না। [illegible]

পড়ছ, নতুবা তুমি অত্যাচার দমন করতে পার। মনে রেখ, এখানে মীমাংসা চলে না, অত্যাচার দমন করলেই দাম্পত্য জীবন মধুর হয় না। উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। তবে যে অত্যাচারের কথা বলছ, তা তোমার দমন করা উচিত ছিল এবং এখনও করা উচিত।

আপনি শুধু আমার দোষই দেখছেন। আমার ওপর প্রতিদিন যে অত্যাচার, পীড়ন হয়, তা' কোন নারী নীরবে সয়ে তার স্বামীকে ভালবাসতে পারে? আমি যথেষ্ট সয়েছি, আমি ওকে ঘৃণা করি। আমার জীবন মাত্র আরম্ভ হয়েছে, আমি সব কিছুই চাই, সুখী হবার আমার অধিকার রয়েছে।

যারা তোমার প্রাণে আগুন জ্বালিয়েছে, তারা তোমার বন্ধু নয়। ব্যভিচারের কামনা পূর্ণ হওয়া উচিতও নয়, ভালও নয়। ওতে সুখ নেই—শান্তিও নেই।

আপনার মত কাপুরুষ নিয়ে এ সংসার চলছে না।

রাত অনেক হয়েছে, এবার ঘরে যাও।

আমি আর পারিনে। পিয়ারী হঠাৎ সঞ্জিতের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, আমি কি তোমার ভালবাসা পেতে পারি নে? একবার চেয়ে দেখ আমার দিকে। লোকে বলে—

সঞ্জিত হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, তোমাকে বহুবার সতর্ক ক'রে দিয়েছি, তবু তোমার শিক্ষা হয় না। কাপুরুষই হই, আর অপদার্থই হই, আমি তোমাকে ঘৃণা করি। পাথরের ওপর মাথা ঠুকে মর না পিয়ারী। নিজের মঙ্গল যদি সামান্যও কামনা কর ত' একটু সংযম শিক্ষা কর।

তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ। তোমার জন্যে আমি নিজেকে সকলের নিকট থেকে আলাদা ক'রে রেখেছি। আর ফেরবার উপায় নেই।

তুমি মেয়েমানুষ ব'লেই এত অত্যাচার স'য়ে যাচ্ছি, নয়ত চাবকে দিতুম। এক দিন নয়, দু'দিন নয়, ক্রমাগত এ অত্যাচার কাহাতক সহ্য করা যায়!

পিয়ারী হাত ধরিয়া বলিল, আমায় তুমি দয়া কর—বাঁচাও।

সঞ্জিত সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, চরিত্রহীনা নারীর সঙ্গে আমি কথা বলতে ঘৃণা বোধ করি। এর পর আমি গলাধাক্কা দিতে ছাড়ব না। চরিত্রহীন—ছোটলোক—

পরকে চরিত্রহীন, ছোটলোক বলে গাল দিয়ে গলাধাক্কা দেবার আগে নিজের স্ত্রীর—

খবর্দার। স্ত্রীলোক ব'লে যথেষ্ট সহ্য করেছি। বেরিয়ে যাও—!

পিয়ারী রাগে কাঁপিতে লাগিল। ঠোঁট কামড়াইয়া শুধু বলিল, আচ্ছা!

পিয়ারী আর ঘাঁটিতে সাহস পাইল না. ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পিয়ারীকে সঞ্জিত বিশ্বাস করিতে পারে না, ভয়ে সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। যে নারী একবার ক্ষেপিয়া যায়, তাহার লাজলজ্জা, সম্ভ্রম থাকে না, কোন ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না, এমন কি, শিক্ষা, দীক্ষা, আভিজাত্য জ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। এরা পুরুষের মত বলপ্রয়োগ করিতে পারে না, কিন্তু পৈশাচিক শক্তিতে পুরুষ মানুষকে ধ্বংস করিতে পারে।

সঞ্জিতের মন আজ স্বাভাবিক ছিল না, তার উপর পিয়ারীর অত্যাচারে মনটা ক্ষিপ্ত ও তিক্ত হইয়া উঠিল। বিছানায় শুইয়া শুধু সে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল, ঘুম পাইল না।

অলকনন্দা ও চন্দ্রনাথ যখন আসিয়া পেঁাছিল, তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সঞ্জিতের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, চন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চন্দ্রনাথের ডাক সে শুনিতে পাইল, কিন্তু বিছানা হইতে উঠিল না, ইচ্ছা করিয়াই শুইয়া রহিল।

অলকনন্দা ও চন্দ্রনাথ দুইজনই সঞ্জিতকে ডাকিল, সঞ্জিত ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল, কোন সাড়া দিল না।

পিয়ারী জাগিয়াছিল। তাহার মাথায় ও দেহে আগুন জ্বলিতেছিল।

অলকনন্দার সাড়া পাইয়া সে বাহির হইয়া আসিল। প্রতিহিংসা, বুভুক্ষা ও ক্রোধ, সব কিছু মিলিয়া তাহার মাথায় অগ্নিপ্রলয় সৃষ্টি করিল। যাহাকে সে ভক্তি করে, ভালবাসে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, এটা গৃহস্থ পাড়া।

অলকনন্দা চমকিয়া উঠিয়া পিয়ারীর দিকে তাকাইল, আশ্চর্য হইয়া, অথচ একটু ধমকের স্বরে ডাকিল, পিয়ারী!

পিয়ারী অলকনন্দার দৃঢ় কণ্ঠস্বরে একটু থমকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সঞ্জিতকে দরজা খুলিয়া বাহির হইতে দেখিয়া কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া বলিল, লোক চিনতে আর বাকি নেই। বন্ধুদের সঙ্গে দুপুর রাত অবধি স্ফূর্তি ক'রে হল্লা করতে সরম হয় না, চুপি চুপি শুয়ে পড়লেই ত' পার—পাড়ার লোককে ঢাক পিটিয়ে কেলেঙ্কারী দেখান কেন!

চন্দ্রনাথ রাগে যেন জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, এত ছোটলোকও মানুষ হয়—

ছোটলোক! পিয়ারী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, ভদ্রলোক আর লেখাপড়া জানার চরিত্র জানতে ত' আর বাকি নেই। ভদ্রলোক আর লেখাপড়া জানাওয়ালারাই এমন মাথা উঁচু ক'রে বেলেল্লাপণা করতে পারে। পিয়ারী সঞ্জিতের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া উল্লাসভরে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

চন্দ্রনাথ ব্যর্থ আক্রোশে শুধু জ্বলিয়াই পুড়িল, কোন প্রতিশোধ লইতে পারিল না। সে অহিংস নয়, নারীর মর্যাদা রক্ষা করিতে সে হিংসার পথ গ্রহণ করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। দজ্জাল নারীর নিকট পেঁাছিতে না পারিয়া সে শুধু অলকনন্দাকে বলিল, এ নোংরা স্থানে কি ক'রে বাস কর? আমার যে এ হাওয়ায় দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে! ছোটলোক, ইতর যত সব, আবার এদেরই সুখ্যাতি কর পঞ্চমুখে!

যারা উঁচুতে আছে, তাদের ত' আমাদের প্রয়োজন নেই ভাই। যারা নীচে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, নিজের পা নিজে

কামড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি নিজেরাই নষ্ট করে তাদেরই ত' আমাদের প্রয়োজন। ওই যে দরজা খুলেছে, আচ্ছা, Good night.

চন্দ্রনাথ শুভেচ্ছা জানাইয়া চলিয়া গেল।

সঞ্জিত অলকনন্দার জন্য প্রতীক্ষা করে নাই। অলকনন্দা যখন দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে ঢুকিল, তখন সঞ্জিত শুইয়া পড়িয়াছে। অলকনন্দা আলোক জ্বালাইয়া দেখিল, সঞ্জিত চোখ বন্ধ করিয়া অপরদিকে পাশ ফিরিল। বোধহয় আলোকের প্রতিবাদ জানাইল।

অলকনন্দা শাড়ি, ব্লাউস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে? বাবা কি ঘুম, আমাকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করতে হয়েছে।

রাত ক'টা বাজে?

কত আর হবে, সাড়ে দশটা, পোনে এগারটা।

এগারটা অনেকক্ষণ হয় বেজে গেছে। সঞ্জিত মাথা না তুলিয়াই বলিল, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

অলকনন্দার হাত হইতে চুলের কাঁটাগুলি পড়িয়া গেল, আয়নার দিক হইতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মানে!

এ সহজ কথার অর্থটা বুঝতে পারছ না, জিজ্ঞেস করছি এত রাত পর্যন্ত কোথায়, কার সঙ্গে—

চুপ কর!

না, না, আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না। তুমি ভেব না, তুমি যা করবে, তাই আমি স'য়ে যাব।

ফের বকছ। নোংরামি করতে একটু বাঁধছে না।

যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর নয়। দুপুর রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে, পরপুরুষের হাত ধরে ঘরে ফিরবে—আর পাড়াময় কুৎসায় ভরে যাবে, তবু আমাকে চুপ ক'রে থাকতে হবে।

তুমি আমায় সন্দেহ করছ?

না। এ শুধু লোকের কথার প্রতিধ্বনি—মিথ্যা যে নয়, খানিক আগে নিজের কানেই কিছু শুনেছ।

লোকের কথা আমি শুনতে চাইছি না।

আমার নিজের কোন কথা নেই। তবে একথা সত্য, তোমার স্বেচ্ছাচার আমি মানতে পারব না। তারপর—

তারপর কি?

তারপর মানুষের চরিত্র ও মন পাষাণ দিয়ে তৈরি নয়—ও ভাঙে এবং মচকায়ও।

তার চেয়ে স্পষ্ট ক'রে বল না, চন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমি মিশি, তা তুমি চাও না, বিশ্বাসও কর না। অলকনন্দা নীচের ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তোমাকে অনেক বড় মনে করতুম, এখন দেখছি, সাধারণ লোকের মত তোমার মনেও সন্দেহের কীট খেলে বেড়ায়। অপরকে বলবার পূর্বে তোমার একথা মনে করা উচিত ছিল যে, তোমাকেও যদি এমন প্রশ্ন করা যায়, তখন তুমি তার কি জবাব দেবে! না চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

সঞ্জিত তবু কোন জবাব দিল না।

আমি নারী, আর তুমি পুরুষমানুষ না! কেন—কেন তোমার মনে এমন হীন সন্দেহ জাগল, তুমি লোকের কথায় সন্দেহ করবার মত লোক নও। চন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ত' নূতন নয়—তবে কেন তুমি আমায় এত বড় অপমান করেছ—এত বড় আঘাত দিয়েছ?

আঘাত করলে আঘাত খেতে হয় অলকা।

আমি তোমায় আঘাত দিয়েছি?

হাঁ! আমি ভেবে দেখলুম অলকা, বাবার কথা সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও বেশ সত্য। বাবা বলতেন, সমাজকে রাখতে হ'লে, সংসারকে বাঁচাতে হ'লে স্ত্রীজাতিকে দাবিয়ে রাখতে হয়। যে পুরুষ চাবুক ধরতে জানে না এবং স্ত্রীর নিকট মাথা নত করে, তার সংসার টেঁকে না। যে পুরুষ বহুকষ্টে সংসার গড়ে তোলে, সে সংসার ভাঙতে পারে না, কিন্তু নারীরা পারে। যে সংসারে পুরুষ পৌরুষহীন, দুর্বল, আর নারীরা প্রভুত্ব করে, সে সংসার বড় হয় না—মাতাপুত্রে, পিতাপুত্র, ভাইয়ে-ভাইয়ে, জায়ে-জায়ে কখনও সদ্ভাব থাকে না— তাই—

তাই তোমার চাবুক ধরা উচিত। চাবুক ত' নেই, পিয়ারীর জন্যে চন্দ্রারাও একটা চাবুক রেখেছে—চেয়ে আনব কি!

ধন্যবাদ! এ সংসারে শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নেই, দেওর কিংবা জা'ও নেই, তারপর এ আমার বক্তব্যও নয়। পরের মেয়েকে ইঙ্গিত ক'রে স্বামীর নামে কলঙ্ক দেবার সময় নিজের কথাও ভাবতে হয়—এই আমার বলবার কথা, অন্য কিছু নয়। তোমার স্বাধীনতায় কোন দিন হস্তক্ষেপ করি নি, আজ মনে হচ্ছে ভুল করেছি।

পুরুষের রক্তগত বর্বরতা—

সঞ্জিত হাসিয়া বলিল, ওই বর্বরতা না থাকলে সংসার চলে না। তুমি হয়ত অন্যান্য আধুনিকা নারীদের মত গাল দেবে, কিন্তু প্রকৃতি চায় পুরুষের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা। তুমি তোমার মনকে চেন না, তাই অত্যাচার ব'লে মনে হচ্ছে। সে কথা যাক্, রাত অনেক হয়েছে এবার আমি ঘুমাবো।

সঞ্জিত পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইল। অলকনন্দা স্তম্ভীতের মত মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে, দুঃখে ও অপমানে তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, চিবুক বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অলকনন্দার মনে হইল, তাহার এত বড় অপমান সহ্য ক'রে যাওয়া উচিত নয়; এত বড় বর্বর পৌরুষিক অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া সংগত নয়—এর একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আক্রমণ করিবার সে কোন পথ পাইল না। সে শুধু অনুভব করিতেই পারিতেছে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

হয়ত ভুলের উপর ভিত্তি করিয়া এ সর্বনাশের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। হয়ত এ সত্যিকারের গরমিল নয়। সঞ্জিত ত' এমন ছিল না। অলকনন্দার মনে হইল, বিবাহের পর সে যখন প্রান্তর ছাড়িয়া প্রাচীরে আসিয়া আশ্রয় নেয়,

(শেষাংশ ৪৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ওয়াং লাং

পার্ল বাক্

(অনুবাদ : শ্রীতারাপদ রাহা)

চাষী ওয়াংএর ছেলের নাম ওয়াং লাং। নানকিং শহরের কাছাকাছি ওয়াং গাঁয়েই সে তার সারাজীবন কাটিয়ে দিল। কেউ যে তাকে একেবারে পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে তার উপায় নেইঃ শাকসব্জী বিক্রী করতে তাকে প্রায়ই শহরে যেতে হয়, তাই সভ্য জগতের অনেক খবরই সে রাখে; অন্তত এই তার বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—গ্রামের আর কেউ জানবার আগেই সে জেনে ফেলেছে যে—সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগ ব্যাপারটা অবশ্য ঘটে গেছে প্রায় বছরখানেক আগে, তবুও—। ওয়াং লাং এটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবাকে জানালে, বাবা আবার তার নিজের খুড়োকে জানালে। খুড়ো আবার নিজে লিখিয়ে, অবশ্য সাহিত্যিক নয়—চিঠি-লিখিয়ে। গ্রামের যত লোক তার কাছে চিঠি লিখতে আসে। চিঠি লিখতে এসেই তারা খুড়োর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে গেল। কথাটা এমনি করে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

তিনদিন ধরে তারা কথাটা কানে কানে বলাবলি করতে লাগলো। খানিকটা দুঃখও তাদের লেগেছিল—তা' ছাড়া ভয়ঃ প্রতি মুহূর্তে তারা একটা কিছু বিপদের আশঙ্কা করছিল। তাদের কেউই অবশ্য কোনদিন সম্রাটকে চোখে দেখে নি, তবু তারা সবাই মনে করতো—তাদের উপরে স্বর্গের দেবতার মত এমন একজন শক্তি-শালী লোক আছেন যিনি তার হোমরা চোমরা কর্মচারী নিয়ে দেশটাকে ঠিক শান্তির পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে চলেছেন। তাঁরই উপর নিজেদের ছোটখাটো পাপতাপ ভয় ভাবনার ভার দিয়ে অনায়াসে তারা নিজেদের ক্ষেতখামারের কাজ করে যায়। তাই যখন তারা শুনলো—সম্রাট আর নেই, তখন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে কেউ আর বাইরে যেতে চায় না। 'তাইপিংসের' সময় যা ঘটেছিল ঠাকুরদা ওয়াংএর তা' বেশ মনে আছে—তাই ঠাকুরদা আশঙ্কা করছিল এইবার লুটতরাজ আরম্ভ হবে। বাড়ির যা কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল সেগুলি একটা নিরাপদ জায়গায় রাখবার জন্য সে তৎপর হয়ে উঠলোঃ একখানা পুরানো দলিল, ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী একটা জামা (কয়েক পুরুষ অবশ্য সেটা ব্যবহার করা হয়েছে, তবে আরও কয়েক পুরুষ সেটা ব্যবহার করা চলবে এমন আশাও তারা রাখে), ছোট ছোট কয়েকটি রুপোর টুকরো নিয়ে ঠাকুরদা একটা মেটে ঘরের দেয়ালের মাঝে সেরে রাখলে—কে জানে! পুরো তিনটে দিন বুড়ো তার কয়েকগাছি হলদে-শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেয়ালের খোড়লের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিল, বিছানাটা বাইরে আনিয়ে তার নীচে শুয়ে ঘুমুতে লাগলো।

কিন্তু চারদিন কেটে গেলেও যখন কোন বিপদের নামগন্ধ দেখা গেল না, তখন এক রকম নিরাশ হয়েই ঠাকুরদা দেয়ালের মাঝ থেকেই তার ধনরত্ন সব সব টেনে বার করলে। লোকজন সব আবার তাদের নিজের নিজের কাজে বা'র হ'ল। প্রথম প্রথম অবশ্য সবাই একটু ভয়ে ভয়ে বেরুতে লাগলো, তারপর ক্রমে সে ভয়ও কেটে গেল। সম্রাট থাকবার যে এতদিন কোন দরকার ছিল—তাও তাদের মনে হ'ল না। ক্ষেতের ফসল তাদের ভালই দেখা যেতে লাগলো, তাদের মনে হ'তে লাগলো সম্রাট গেছে—না—ভালইঃ সম্রাটই যেন এতদিন তাদের ভালো ফসল হবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

একদিন শহরে গিয়ে ওয়াং লাং দেখলে—এক চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে তারই মত বয়সের একটি ছেলে বেশ জোর গলায় বলছে—

আমাদের এই যে সব সম্রাট ছিল, এরা সব কি? দেশের পয়সা দিয়ে এতদিন আমরা কতগুলি অকর্মণ্য অলস লোক পুষে এসেছি।

যুবকটির কথা শুনে ওয়াং লাং ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগলো—ওপর থেকে এক্ষুনি একটা টালি খ'সে প'ড়ে অথবা চায়ের পেয়ালার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে লোকটা এখনই মারা পড়বে, তাই অনেকক্ষণ ধরে সে উপরের টালির দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও যখন দুটোর একটাও কিছু ঘটলো না তখন সে অতি কষ্টে ভেবে চিন্তে ঠিক করলেঃ লোকটা হয়ত সত্যি কথাই বলেছে—নইলে দেবতারা তাকে শাস্তি দিতেন। এর পর থেকে লোকটাকে সে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে লাগলো।

ওয়াং লাং দেখলে—লোকটার গায়ে রয়েছে একটা গাঢ় নীল রঙের লম্বা পোষাক—বেশি মোটাও নয় পাতলাও নয়—বসন্তের এই সময়ে পরবার ঠিক উপযোগী। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করে ছাঁটা—আর তাতে তেল মাখিয়ে আঁচড়ে এমন মসৃণ করে তোলা হয়েছে যে, দেখে মনে হয় যেন মেয়েদের চুল।

ওয়াং লাংএর মনে হতে লাগলো—লোকটা নিশ্চয়ই দক্ষিণ দেশ থেকে এসেছে—কারণ এমন চেহারা ত এদেশে দেখা যায় না!

যুবকটি কেবলই কথা বলে যাচ্ছিল—আর চায়ের দোকানে যেসব লোক চা খেতে জড়ো হয়েছিল, তাদের উপর এক একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। যখন সে দেখলে—ওয়াং লাং তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, তখন সে তার শাদা হাত দু'খানি দিয়ে ভ্রূ দুটো একবার পাট করে নিয়ে নিজের বক্তৃতার গলাটা একটু উঁচু করলেঃ

জগতে আর আর যেসব দেশ আছে তাদের যে কোনটির চেয়ে আমাদের এই দেশের লোকসংখ্যা বেশি, সুতরাং তাদের সবারই চীন দেশকে ভয় করে চলা উচিত ছিল, তা' না করে তা'রা করে আমাদের ঘৃণা? এর কারণ কি জানো?—এর কারণ হচ্ছে আমাদের তেমন রেলগাড়ি নেই, আমাদের যুদ্ধজাহাজ নেই। অথচ এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আর এসব আমাদের ছিলওঃ আমাদের দেশের ঋষিরা সব আগুনের মেঘের উপর, আগুনখাকী রাক্ষসের উপর চড়ে চলাফেরা করতেন এসব তোমরা নিশ্চয়ই জানো। একবার যা হয়ে গেছে, তা আর একবারই বা না হবে কেন? এখন সম্রাট আর নেই—দেশ আমাদের সাধারণতন্ত্র। সবই সম্ভব এখন।

ওয়াং লাং একটু কাছে এগিয়ে যুবকটির লম্বা ঢিলে পোষাকটির এক প্রান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করে বেশ বিনয়ের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, আপনার জামাটা কত পড়েছে—আঁ!

জামাটার সুন্দর মোলায়েম কাপড় দুই আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সে আবার বললে, কি কাপড় এটা, দেখতে ত ঠিক মেঘের মতই মনে হচ্ছে। এ কি বিলিতি কাপড় না কি? এর কত দাম?

যুবকটি এইবার রেগে গিয়ে এক হেঁচকায় তার জামাটা টেনে নিয়ে বলে উঠলো, কি অসভ্য! তোমার আঙুল দিয়ে অমনি ক'রে জামাটাকে নোংরা করো না! খাঁটি বিলিতি পশমী কাপড় এ—এর এক এক ফুটের দাম নিয়েছে—দুই ডলার!

এক ফুটের দাম দুই ডলার! ওয়াং লাং একেবারে হা করে' তাকিয়ে রইলোঃ সারা মাস মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে দুই ডলার কামাই করতে পারে না। আর এই লোকটা তার পায়ের গোড়া থেকে গলা—আর শুধু গলাই বা বলি কেন—প্রায় কান পর্যন্ত লম্বা এই যে পোষাক করেছে এতে কত ফুটই না কাপড় লেগেছে! ...আর তার দাম পড়েছে কত! যুবকটি যখন প্রজাতন্ত্র নিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলো, ওয়াং লাং তখন একমনে ভাবতে লাগলো—ছ' বছর আগে যখন তার বিয়ে হয় তখন তার বিয়ের পোষাক তৈরী করতে ক' ফুট কাপড় লেগেছিলঃ সামনে লেগেছিল পাঁচ ফুট—পিছনে পাঁচ আর আস্তিন পাঁচ—প্রায় পনের ফুটের কাছাকাছি। দোকানে অতটা কাপড় কিনতে গেলে অবশ্য কিছুটা বেশি নেওয়া যায়—ফাউ, তবু চৌদ্দ ফুট তো বটে—তার দাম হ'ল গিয়ে আটা'শ

ডলার। বাপরে! একটা লোক সারা বছর ধরে যা আয় করে তাই দিয়ে এই লোকটা তার একটা জামা তৈরী করেছে! কি সাংঘাতিক!

যুবকটি যেন হঠাৎ খুশী হয়ে ওয়াং লাংএর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, খাঁটি বিলিতি ভেড়ার লোম দিয়ে এই কাপড় তৈরী। এই সব দেশের লোকের জন্য বিলেতের মেয়েরা নিজের হাতে এ সব তৈরী করেছে। ওয়াং লাং শুনে অবাক্ হয়ে যাচ্ছে দেখে যুবকের বক্তৃতার উৎসাহ যেন অনেক বেড়ে গেল; সে আরও উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলো—

কি বলছিলাম!...হাঁ, বলছিলাম—সম্রাট দিয়ে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। দেশের লোকের কল্যাণের জন্য দেশের লোকেরাই দেশের লোককে শাসন করতে পারবেঃ আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরাও ত এই কথাই বলে গিয়েছেন। আজ আমাদের দেশ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, তুমিও তোমার ভোট দিয়ে জানাতে পারবে—কে আমাদের প্রেসিডেণ্ট হবেন!

ওয়াং লাং কথাটা শুনে একেবারে ভড়্কে গিয়ে বলে উঠলোঃ আমি! আমি ত পারবো না, মশায়, আমার বাপ রয়েছে, বুড়ো ঠাকুরদা রয়েছে, বউ রয়েছে—সে আবার এমনি পয়া বউ যে একটাও ছেলে দিতে পারলো না আমায়—দিলো তিন তিনটে বাঁদী,—এরা সবাই খাবে বলে' হা-করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে...সময় কোথা আমার?...আমি পারব না; আমার হয়ে আপনিই এ কাজটা চালিয়ে নেবেন।

এই কথা শুনে যুবকটি একেবারে হো হো করে হেসে উঠলো। চায়ের টেবিলের উপর দুটো ঘুষি লাগিয়ে সে সবাইকে যেন তার হাসির কারণটা বেশ করে জানিয়ে দিতে চায়। কি যেন মস্ত বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছে মনে করে ওয়াং লাং লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

যুবকটি তাকে লক্ষ্য করে বললে, আরে বোকা, এমন বোকাও মানুষে হয়! কি কাজ করতে হবে তোমায়? এক টুক্রো কাগজে শুধু নামটা লিখে বাক্সে ফেলে দিতে হবে,—বাস্!

মুখটা ভার করে ওয়াং লাং বললে, আমি ত লিখতে পারি না।

পেয়ালা থেকে শেষ চা টুকু শেষ করে টেবিলের উপর দুই আনা পয়সা রেখে যুবকটি বলে উঠলো, নিজে না পারো অপর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে, বোকার মত যা তা বলো কেন?

নিজের অজ্ঞতার জন্য নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে বিশেষ দীনতার সঙ্গে ওয়াং লাং বললে, পাড়াগেঁয়ে মুখ্খু সুখ্খু লোক আমি, কি লিখতে হবে জানি নে, আপনি বলে দিন।

যুবকটি বললে, কেন?...যাকে তুমি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করবে বলে মনে মনে সাব্যস্ত করেছ তার নাম লিখে দেবে—আর কি!

যুবকটির হাবভাব দেখে মনে হ'ল সে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে, তাই ওয়াং লাং না বুঝলেও সাহস করে আর জিজ্ঞাসা করতে পারলো না—প্রেসিডেণ্ট মানে কি?

দোকানে আর আর যারা বসে ছিলো তারা সবাই এবার এদের কথাবার্তার দিকে মন দিয়েছে দেখে যুবক জোর গলায় বলতে আরম্ভ করলে—

আমি আমার দেশবাসী সবাইকে বলতে চাই—আমাদের সুদিন এগিয়ে এসেছে, এইবার যত সব বড়লোক হবে গরীব আর গরীব হবে বড়লোক।

ওয়াং এর কান খাড়া হয়ে উঠলোঃ সে কেমন করে হবে—গরীব বড়লোক হবে! যুবকটি পাছে রাগ করে তাই সে নিতান্ত ভয়ে ভয়ে—বিশেষ বিনয় করে অনুচ্চ স্বরে বললে, সে কেমন করে হবে, মশায়?

যুবক বললে,—হবে, হবে, আলবৎ হবে; যেখানে প্রজাতন্ত্র সেখানেই এমনি হচ্ছে। এই ধর, আমেরিকা, সেখানে কি হচ্ছে! সেখানে সবাই বড় বড় প্রাসাদে বাস করে, বড়লোকেরা সব বাধ্য হয়ে কাজ করে। এখানেও সম্রাট আর থাকবে না, বিপ্লব এল ব'লে—আর বিপ্লব এলেই এই সব ঘটবে। এই জন্যই ত আমার মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলেছিঃ এ হচ্ছে মুক্তির চিহ্ন,—আমি বিপ্লবী। আমার সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবী এসে এই জাতিকে রক্ষা করবে, যারা দুস্থ—যারা নির্যাতিত তাদের আমরা তুলে ধরবো।

—এই সব বক্তৃতা দিয়ে যুবকটি সেখান থেকে যাবার উদ্যোগ করতে সামনে পড়ে গেল ওয়াং লাং। যুবকের ক্রুদ্ধভাব দেখে তার চোখের সুমুখ থেকে সরে ওয়াং লাং দোরের সামনে এই জায়গাটায় তার বাঁকটা পেতে বসেছিল। যুবকটি পা দিয়ে তার বাঁকটি সরিয়ে দিয়ে বললে,—এই, হটো, হটো,...আাঁ,...একেবারে দরজা জুড়ে বসেছেন, কি রকম আক্কেল তোমার!

ওয়াং লাং তাড়াতাড়ি উঠে তার বোঝা সমেত বাঁক রাস্তার উপর সরিয়ে নিল। যুবকটি সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেল আর ওয়াং লাং সেখানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—কেমন করে ওর নীল রঙের সুন্দর পোষাকটি লীলায়িত ভঙ্গীতে দুলছে।

যুবকটি যত সব কথা বলেছে—তার প্রায় কিছুই সে বোঝেও নাই, মনেও তার কিছু নাই, শুধু একটি কথা তার মনের কোণে মধুর রাগিণীর মত বাজছেঃ গরীবরা বড়লোক হবে। সারাজীবন ধরে এই কথাটাই সে ভেবে এসেছে!...আগে এ নিয়ে খুবই মাথা ঘামাতো সে, তবে ইদানীং একরকম সে এসব চিন্তা ছেড়ে দিয়েছে। তার পূর্বপুরুষেরা সবাই তাদের সেই এই টুক্রো জমির উপর খেটে খেটে দেহপাত করেছে, কিন্তু জীবনে পয়সার মুখ কেউই দেখে নি।...কিন্তু যুবকটির কথা শুনে আজ যেন তার একটু আশা হচ্ছে। সম্রাট যখন নেই, তখন—সত্যিই ত—সবই হতে পারে!

ওয়াং লাং রাস্তার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো; নীল জামা-পরা যুবকটিকে তখনও দেখা যাচ্ছে। ওয়াং লাং ভাবতে লাগলো যদি কোনদিন সে বড়লোক হয়—তখন ঐ রকম একটা পোষাক সে করবেই, ঠিক ঐ রকম নীল, নরম, চক্চকে আর গরম। তার নিজের শরীর আর তালি দেওয়া হলদে পাজামাটির দিকে সে একবার তাকিয়ে দেখলে, পা দুটি তার একেবারে অনাবৃত। নিজের দেহের উপর ঐ সুন্দর নীল জামাটা সে একবার মনে মনে কল্পনা করে দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ কি কারণে মাথাটা নীচু করতেই তার মলিন, রুক্ষ, জটাবাঁধা চুলগুলি চোখের সামনে এসে পড়লো? কি আপদ—মাথায় এই রকম চুল নিয়ে আমি কি করে ঐ সুন্দর পোষাক পরবঃ—উত্তেজনায় কথাগুলো এক রকম তার মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল।

তার মনে হতে লাগলো—নীল পোষাকটা এর মাঝেই তার পরা হয়ে গেছে—আর তার গিল্টি-করা বোতামগুলি সোনার মত জ্বল্জ্বল্ করছে। সামান্য কিছু সব্জী বিক্রী করে সে যে দুই চারটে পয়সা পেয়েছিল তাই বারবার নাড়াচাড়া করতে করতে সে এক নাপিতের দোকানের সামনে এসে বললেঃ

ওহে, আমার মাথাটা একেবারে ন্যাড়া করে দাও ত, দশটি পয়সা দেবো তোমায়।

এমনি করে মাথা মুড়ে ওয়াং লাং বিপ্লবী হয়ে উঠলো।

ওয়াং লাং নিজে কিন্তু কিছুই বুঝলে না। সন্ধ্যাকালে তরিতরকারী বিক্রী করে যখন সে গাঁয়ে ফিরে এল, সবাই তাকে দেখে হাসতে লাগলোঃ এ কি রকম চেহারা হয়েছে গো—ঠিক যেন একটা পুরুত ঠাকুর! এক ওয়াংলিউএর ছেলে ছাড়া আর কেউই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলে না। সে শহরের স্কুলে পড়তে যেত তাই শহরের হালচাল সে কিছু কিছু জানতো,

ওয়াং লাংএর নেড়া মাথা দেখে সে চীৎকার করে বলে উঠলোঃ ও এবার বিপ্লবী হয়েছে, আমাদের মাস্টার মশায়ের কাছে শুনেছি —বিপ্লবীরাই শুধু মাথা নেড়া করে।

ছেলেটার মুখে শুনে ওয়াং লাং বেশ একটু ঘাবড়ে গেল। এসব ব্যাপারের সে কিছুই জানে না। নিজের অজানতেই সে তবে বিপ্লবী হয়ে গেছে। মেজাজটা তার হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠলো। কাঁধ থেকে সব্জী বওয়ার বাঁকটা বেশ একটু শব্দ করে নামিয়ে সে তার বউকে উদ্দেশ করে বলে উঠলোঃ

কই আমার ভাত-টাত কি আছে নিয়ে এসো দেখি! সারাদিন আমি আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওদের খাওয়াবার জন্যে পয়সা কামাই করে নিয়ে আসবো অথচ বাড়িতে এসে দেখি এক বাটী চা-ও আমার জন্যে তৈরী নেই!

বউয়ের উপর তম্বী করা ওয়াং লাংএর এই প্রথম নয়। পাড়াপড়শীরা যখন দেখলে ওয়াং লাং তার বউয়ের সংগে ঝগড়া শুরু করেছে অমনি যে যার মত সরে পড়লো। সেইদিন থেকে সবাই কিন্তু তাকে বিপ্লবী ওয়াং লাং বলতে শুরু করলে। ক্রমে এ নামের আর কোন অর্থ রইল না, কিন্তু এই নোতুন-দেওয়া নামটা তার ঠিকই রয়ে গেল।

ওয়াং লাং সেইদিন থেকে কেবলি ভাবতো কবে সে বড়লোক হবে—কবে সে সেই রকম নীলজামা পরতে পাবে! সে রোজই ভাবতো, আজই হয়ত তাজ্জব একটা কিছু ঘটে যাবে—যার ফলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আশায় আশায় সে তার নোতুন-ওঠা চুলগুলিতে বেশ করে তেল লাগিয়ে চকচকে করে তুললে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা এল, বর্ষার পর শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত একে একে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটা আর ঘটতে দেখা গেল না। সকাল থেকে রাত্রি অবধি এখনও তাকে মাঠে গিয়ে হাড়ভাংগা খাটুনি খাটতে হয়, তা ছাড়া আরও দুঃখঃ এ পর্যন্ত তার একটিও ছেলে হ'ল না। তার সমস্ত অন্তঃকরণটা রাগে গর্জে উঠতে লাগলো, রাগে সে রাত্রে ঘুমুতে পারতো না।

একটা দুঃখে কাতর হওয়ার লোক সে নয়। নানা রকম দুঃখে তাকে পাগল করে তুলেছে। তার কেবলি মনে হতে লাগলো, বুড়োকালে সে যে তার এই হাড়ভাংগা খাটুনি থেকে একটু রেহাই পাবে তাও তার ভাগ্যে নেইঃ একটি ছেলেও তার হ'ল না। রাগে দুঃখে সে অন্তত তিনবার করে তার বউকে গালি দিত—যে মাটিতে শুধু আগাছা জন্মায় সে মাটিতে লাভ কি!

পাড়ার অন্য কোন বউয়ের যখন ছেলে হ'ত, ওয়াং লাং রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠতো। তেল, কাপড় বা জ্বালানী কাঠের দাম চড়ে যাচ্ছে দেখে সে রেগে যেত, নিজের জমি থেকে সে ত আর মাপা ফসল ছাড়া একটুখানি বেশি ফসল পাবে না! শহরে গিয়ে সে প্রায় রোজই রেগে যেতঃ অন্য সবাই কেমন ভালো ভালো জামা কাপড় পরে কুড়েমি করে দিন কাটাচ্ছে, চায়ের দোকানের টেবিলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, জুয়া খেলছে, স্ফূর্তি করছে—আর সে তার বাড়ির লোকদের খাওয়াবে বলে বাঁক টেনে টেনে পিঠ ব্যথা করছে! ধিক্ তাকে!...শেষে এমন হ'ল যে সামান্য কোন একটি বিরক্তির কারণ হলেই সে একেবারে ক্ষেপে যেত। তার মুখের ঘামের উপর যদি একটি মাছি এসে বসে অমনি সে ক্ষেপে গিয়ে গর্জন করে ওঠে,—শুনে মনে হয় সে বুঝি বা একটা পাগলা কুকুরই তাড়াচ্ছে। সবাই তাকে দেখে বলে, এই একটা পাগল চলেছে—এ একটা মাছি দেখলেই ক্ষেপে যায়।...আসলে সে পাগল হয়েছে সেই নীল পোষাকের জন্যে—যে পোষাক সে কোনওদিনই কিনতে পাবে না।

শহরে মন্দিরের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে—তারই পাশ দিয়ে চলতে চলতে ওয়াং লাং একদিন দেখতে পেলে একটা ছেলে একটা কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় কি বলছে। ছেলেটির মুখখানা একেবারে শাদা, গায়ে কালো রঙের একটা লম্বা ঢিলে পোষাক, হাত দুখানি কচি ছেলের মত সরু আর নরম, তাই নেড়ে নেড়ে জোর গলায় ছেলেটি কি যেন বলে যাচ্ছে। চারিদিকে তার কথা শুনবার জন্যে ভিড় জমে গেছে। ক্লান্ত ওয়াং লাং কাঁধের বাঁকটা নামিয়ে সেইখানেই বসে পড়লো। পথ হেঁটে হেঁটে সে ঘামে নেয়ে উঠেছিল, কোমর থেকে তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে সে বার বার তার মুখখানা পুছতে লাগলোঃ ছেলেটা কি বলছে তা না শুনে সে আর এখান থেকে নড়ছে না।

ছেলেটা কি সম্বন্ধে বলছে প্রথমে সে তার কিছুই বুঝতে পারলে না। সে মনে করেছিল এখানে হয়ত সম্রাট আর প্রজাতন্ত্রের কথা হচ্ছে। কিন্তু তা' নয়। ক্রমে সে জানতে পারলে ছেলেটি বলছে বিদেশীদের কথা। ছেলেটির গলা একেবারে দরাজ নয়, একটু জোরে কথা বলতে গেলেই কেমন একটা বিকট আওয়াজ বেরোয়। সেই বিকট আওয়াজ করেই ছেলেটা বলে চলেছেঃ

ওরা, এই বিদেশীরা আমাদের সর্বনাশ করেছে, আমাদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। ওরা সাম্রাজ্যবাদী, দস্যু ওরা, ওরা সকল জাতির সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে।

ওয়াং লাং একবারে অবাক্ হয়ে শুনতে লাগলো। বিদেশীদের এমনি করে ত সে কোনদিন ভাবতে পারে নি। ওদের কাছ থেকে সে বরং আনন্দই পেয়েছে। ওদের অদ্ভুত চেহারা সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছে, আর গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সে তাদের কত গল্প করেছে। কেমন লোক তারা—একথা ত সে কোনদিন ভেবে দেখে নি। একথা এখনও সে ভাববার কোন প্রয়োজন বোধ করলে না। তার একবার তামাক খেতে ইচ্ছে হ'ল। অনেক হেঁটেছে সে, তামাকটা এখন বড় দরকার। বাঁশের নলটা বের করে সে একবার ভালো করে তামাক সেজে নিল। ছেলেটা তখন বেশ জোর গলায় বলে চলেছেঃ

এদের যত সব ধনসম্পদ দেখছ—এ সবই আমাদের। আমাদের ঘরবাড়ি জায়গা জমি, আমাদের সোনারূপা নিয়েই এরা বড়মানুষ হয়েছে। অথচ তারা বাস করছে রাজার মত, আর আমরা তাদের ক্রীতদাস। কলের গাড়ি, গানের কল, লাল, নীল, হলদে রঙের দামী পোষাক—কত কি ভোগ করছে তারা ঠিক যেন রাজার মত, —একবার ভেবে দেখো না!...আমি বলি, ধ্বংস যাক—এই সাম্রাজ্যবাদীরা অধঃপাতে যাক, জয় হ'ক বিপ্লবের, ধনীরা গরীব হ'ক, গরীব হ'ক ধনী।

ওয়াং লাং এইবার চমকে উঠে তার তামাকের নলটা এক পাশে রাখলে। গরীবরা বড়লোক হবে! আবার শুনেছে সে একথা! সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটার গায়ে একটু চাপ দিয়ে বললে, দেখুন!

ছেলেটি একবার তাকালে।

আপনি এই যে এসব বলছেন, এসব কবে হবে?

ছেলেটির চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো, উদ্দীপ্তভংগীতে সে বলে উঠলো, এখুনি, যখনই বিপ্লবীরা নগরে প্রবেশ করবে, তখনই। সব জিনিসই তোমার, তুমি যা খুশী নেবে।... বন্ধু, তুমি বিপ্লবী?

ওয়াং লাং সহজকণ্ঠে বললে, হাঁ, লোকে আমাকে বিপ্লবী ওয়াং বলে বটে!

ছেলেটি ওয়াং লাংএর কথায় কান না দিয়ে আবার চীৎকার করে বলে যেতে লাগলঃ

ধ্বংস হক এই ধনিকেরা, ধ্বংস হক বিদেশীরা, ধর্ম আর সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হ'ক। জয় বিপ্লবের জয়। বিপ্লবই ধনীকে করবে নির্ধন আর গরীবকে করবে বড়লোক!

এই কথাগুলি শোনামাত্র ওয়াং লাং যেন বিপ্লবের মানেটা বুঝে ফেললে। ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ধর্ম—এসব কথা ওয়াং লাংএর কাছে অর্থহীন, কিন্তু ধনী হবে নির্ধন আর গরীব হবে

বড়লোক—এ সবের অর্থই সে বেশ বোঝে। হাঁ, তা হলে বিপ্লবীই সে হতে চায়!

সে একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল—এমন সময় একটা পুলিশ এসে তার সঙীনটা ছেলেটির পিঠে লাগিয়ে বললে, চলো, এবার শ্রীঘরে চলো, দেখি, কেমন করে রাতারাতি তুমি বড়-মানুষ হও—তাই দেখা যাক। মুহূর্তে ছেলেটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে একটিও কথা না বলে বাক্‌সো থেকে নেমে চলতে শুরু করলে, আর পুলিশ সঙীনের আগাটা তার পিঠে ঠেকিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে চললো। সূর্যোদয়ে মেঘের মত জনতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ওয়াং লাং ভয়ে হতভম্ব হয়ে তার বাঁকটা কাঁধে নিয়ে দ্রুত বাজারের দিকে এগিয়ে চললো।

ওয়াং লাং রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। অন্যান্য দিন সন্ধ্যাকালে বাড়ি গিয়ে এক-বাটি চা খেলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন সে তার লাঙলে মোষ জুতে আলুর ক্ষেতে চাষ দিতে লেগে গেল। আকাশে চাঁদ উঠে 'উইলো' গাছের আড়ালে আবার ডুবে গেল, আঁধারে লাঙল চালাতে যখন আর দিশে পেলে না তখন ওয়াং লাং বাড়ি ফিরে গেল।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই ওয়াং লাং শহরে রওনা হ'ল। শহরে ঢুকবার দরজায় দেখলে কতকগুলি নোতুন কাগজ আঁটা রয়েছে তাতে কি সব লেখা! ওয়াং লাং অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু সে কোনদিন লেখাপড়ার চর্চা করে নি, তাই এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। হঠাৎ দেখা গেল সেই পথ দিয়ে একজন বৃদ্ধ চলেছেন, গতি তার মন্থর, চোখে তার মস্ত বড় চশমা-আঁটা। দেখে মনে হয়, ইনি নিশ্চয়ই লেখাপড়া জানেন। ওয়াং লাং তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, শুনুন!

বৃদ্ধ দাঁড়ালেন।

আচ্ছা দেখুন ত, এই যে কাগজ আঁটা রয়েছে, এতে কি লেখা আছে।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলেন।

রৌদ্র ক্রমে প্রখরতর হয়ে উঠলো, বৃদ্ধ পড়তেই লাগলেন। অবশেষে পড়া শেষ হলে তিনি ওয়াং লাংএর দিকে তাকিয়ে বললেন, এতে যা লেখা আছে তা তোমারও কিছু কাজে লাগবে না, আমারও না!

তবুও?

এতে লেখা আছে—নগরে কতকগুলি বিপ্লবীকে পাওয়া গেছে। কাল সকালে তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে।

ওয়াং লাং আঁৎকে উঠে বললে, মাথা কেটে ফেলা হবে?

বৃদ্ধ পণ্ডিত মুরুব্বিয়ানার সুরে বললেন, হাঁ তাই। আর শুধু তাই না, 'তিন বোনের সেতু'র কাছে গেলে তুমি দেখতে পাবে তাদের মাথাগুলি সারি সারি সাজানো রয়েছে। সরকার বাহাদুর চীনেতে বিপ্লবী রাখতে চান না।—

কথাগুলি বলেই বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে আবার চলতে শুরু করলেন।

আঁকা বাঁকা অক্ষরের দিকে চেয়ে ওয়াংলাং হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে উঠলো: তাকেও ত লোকে বিপ্লবী ওয়াংলাং বলে ডাকে! নীল পোষাক পরার লোভই তার সর্বনাশ করেছে। বড়লোক হবার সখ তার এক মুহূর্তে মিটে গেল, এক অজানা আকর্ষণে তার দুখানি পা যেন কেন 'তিন বোনের সেতু'র দিকে টেনে নিয়ে চল্‌ল। সেতুটা প্রায় এক মাইল দূরে। ওয়াংলাং তার এক আত্মীয়ের দোকানে তার বাঁকটা রেখে সেতুর দিকে রওনা হ'ল। দুপুরের খর রৌদ্রে হয়ত তার শাকসব্জী শুকিয়ে নালতে হয়ে যাবে—সে কথা তার মনেও রইল না।

সেতুর কাছে গিয়ে ওয়াংলাং দেখলে বুড়ো যা বলে দিয়েছে তা সবই সত্যি। সাতটা বাঁশের উপর সাতটা মানুষের মাথা। মাথাগুলি কাটা-গলার পাশে ঝুলে ঝুলে রয়েছে। একটা মুণ্ড হাঁ করে রয়েছে, জিভটা তার বেরিয়ে পড়েছে, আর বেরিয়ে পড়া দাঁতগুলি সেই জিভটাকে যেন কামড়ে ধরে রেখেছে। ওয়াংলাং আরও ভালো করে দেখবে বলে কাছে এগিয়ে গিয়ে একেবারে ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লো: কাল যে ছেলেটাকে উঁচু গলায় বক্তৃতা করতে শুনেছে এ যে তারই মুণ্ড। ওয়াংলাং আর একবার তাকিয়ে দেখলে যতগুলি মুণ্ড ঝুলছে সবই এই বয়সের ছেলের!

আশে পাশে মস্ত ভীড় জমে গেছে। এক বুড়ো তার ফোক্‌লা দাঁতের ভিতর থেকে থুথু ফেলে বলে উঠ্‌লো, বিপ্লবী-দের দশা দেখো।

কথাটা শুনে ওয়াংলাং ভয় পেয়ে গেল। তাকেও ত লোকে বিপ্লবী ওয়াংলাং বলে। যদি কেউ এখন চেনা লোক হঠাৎ বলে ওঠে, কিগো বিপ্লবী ওয়াংলাং, কেমন আছ?......খাওয়া হয়েছে ত!.........অন্য দিন এই নামে ডাক্‌লে অবশ্য এমন কিছু এসে যায় না,......কিন্তু আজ ভিন্ন কথা। ওয়াংলাং সেখান থেকে দ্রুত পদে ছুটে দিলে।

এরপর থেকে ওয়াংলাং দারুণ খাটতে শুরু করলো, আর লোকের সঙ্গে কথা বলা একরকম ছেড়েই দিল। বউকে যে এত গালিগালাজ করতো, তা'ও সে বন্ধ করে দিলে। বউটা ভয় পেয়ে শেষে গ্রামের গণৎকারের কাছে ছুটলো—তার স্বামীর কোন অসুখ করেছে কিনা জানতে। ওয়াংলাংএর কেবলি মনে হ'ত, 'তিন বোনের সেতু'র পাশে যেখানে বাঁশের দাঁড়ার উপর সাতটা মাথা ঝুলছে তারই পাশে আর একটা বাঁশের উপর তার নিজের মাথাটা রয়েছে। সন্ধ্যাকালে যখন হাতে কাজ থাকতো না তখন সে কল্পনা নেত্রে দেখতো যেন তার মাথাটাও অমনি বাঁশের আগায় ঝুলছে, চোখ তার অর্ধস্তিমিত, জিভটা বেরিয়ে পড়েছে, ঠোঁট দুটি শুকিয়ে গেছে। তার জ্ঞাতি ভাই যখন হাঁক ছেড়ে বলে, কিগো বিপ্লবী ভায়া, আজ শহর থেকে কি নোতুন খবর আনলে? ওয়াংলাং তখন ক্ষেপে ছুটে গিয়ে তাকে অজস্র গালিগালাজ শুরু করে দেয়। সে ত একেবারে অবাক্। সব চেয়ে মুস্কিল হচ্ছে সে তার ভয়ের কথা কাউকে বলতে পারে না: বললে হয়ত মাথাটা সত্যি সত্যি যাবে।

সেইদিন থেকে সে জগতের সব কিছুকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। যে জমীতে খেটে খেটে তার হাড় জর জর হয়ে গেল তাকে সে ঘৃণা করলে। যে প্রতিবেশীদের কাছে সে মনের কথা খুলে বলতে সাহস পায় না তাদের সে ঘৃণা করলে। গ্রামবাসীরা বলদের মত তাদের পূর্বপুরুষের চিরাচরিত রীতিতে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, জীবনে কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই—তাদের সে প্রাণ-ভয়ে ঘৃণা করলে। শহরের লোকরা কুঁড়েমী আর বিলাসিতা করে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে তাদেরও সে ঘৃণা করলে।

মনে ঘৃণার ভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়ের ভাব কেটে যেতে লাগলো। বিপ্লবের কথা আর তার কানে আসে না—বড়লোক হওয়ার আর কোন উপায় না পেয়ে মন তার গর্জে উঠতে লাগলো। বড়লোকদের কথা মনে হয় আর সে তাদের ঘৃণা করে। বড়লোকেরা দুনিয়াটা কেমন করে ভোগ করে সে কথা সে জানে। দেশের রেওয়াজ মত বৎসরে একবার করে সে গ্রামের জমিদার বাড়িতে তার নমস্কার জানাতে যায়। সে দেখেছে তাদের জানলায় ঝুলছে সাটিনের পরদা—নানা ভঙ্গীর চেয়ারে রয়েছে সাটিনের গদী। বাড়ির চাকরবাকরেরা পর্যন্ত রেশমী কাপড় পরে। আর ওয়াংলাং তার সারা জীবনে একবার রেশমী কাপড় পরতে পায় নি। কাপড়ের দোকানে একবার সকলের অলক্ষ্যে সে ছুঁয়ে দেখেছে রেশমী কাপড় কেমন মোলায়েম।

সেদিন যে ছেলেটা বক্তৃতা দিচ্ছিল তার মুখে সে শুনেছে যে বিদেশীরাই সবার চেয়ে ধনী। এখন চায়ের দোকানেও তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা হয়ঃ সোনার চেয়ারে বসে রূপার টেবিলে তারা খায়। গরীব লোকেরা যেমন ঘাসের উপর পা ফেলে যাতায়াত করতে ইতস্তত করে না তারা তেমনি মখমলের উপর চলে। তাদের বিছানা ঢাকা থাকে মণি-মুক্তা-খচিত দামী রেশমী কাপড়ে। টাকার গরম এমনি বটে! সে বিদেশীদের ঘৃণা করতে লাগলো সবার চেয়ে বেশি। তার মত গরীব চীনেরা যখন না খেতে পেয়ে শুকোচ্ছে—বিদেশ থেকে লোক এসে তাদেরই দেশে তখন আরামে দিন কাটাচ্ছে—এ একেবারে অসহ্য! প্রথম প্রথম তার মনে হত গরীবরা কেবল বড়লোক হ'ক, কিন্তু এতদিন তারা যে কষ্ট সহ্য করেছে সে কথা মনে করে এখন সে কামনা করে, বড়লোকরা গরীব হ'ক,—হয়ে কষ্টটা একবার বুঝুক!

অনবরত এই সব চিন্তা করতে করতে তার কাজে শৈথিল্য এল। এ সব হেঁয়ালি নিয়ে আগে সে কোনও দিনই মাথা ঘামায় নি। এখন নানা ভাবনা চিন্তা মাথায় এসে সে কাজ করতে পারে না। ভাবা আর নিড়ানো একসংগে দুটো সে কি করে করবে? আগেকার দিনের মত কাজ করতে না পেরে সে ক্রমে গরীব হ'য়ে পড়তে লাগলো। তার স্ত্রী তার রকম-সকম দেখে একদিন চীৎকার করে বলে উঠলোঃ

আসছে শীতে জামা কাপড় করবার তুলো কোত্থেকে আসবে শুনি? আমি ত দেখছি খাওয়া পরা দুই-ই আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে এবার! কথাটা শুনে ওয়াংলাং রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো।

একদিন মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওয়াংলাং এক চায়ের দোকানে গিয়ে চুপড়ী ফেলে বসে পড়লোঃ আজ সে কিছুতেই কাজ করবে না, বরাতে যা থাকে হ'ক; এতদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করেই বা কি হ'ল? টাকা পয়সার মুখ দেখলো সে! টেবিলের পাশে বসে সে এক বাটী চায়ের ফরমাইস করলে। টেবিলের অপর ধারে আর একটি লোক বসে ছিলো—অনেকটা ছেলে মানুষ, পরনে কালো সুতী পোষাক, মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, কপাল থেকে সেগুলি আবার সোজা উপর দিকে ব্রাস করা। মুখের ঘাম তোয়ালে দিয়ে পুছতে পুছতে ওয়াংলাংএর দিকে তাকিয়ে লোকটা বল্লে তোমাকে বড়ই খাটুনি করতে হয়, ভাই, —নয়?

অত্যধিক গরমে তালি দেওয়া কোটটা ওয়াংলাং আগেই খুলে ফেলেছিলো, সেটা কাঁধের উপর উঠিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললে, না করে উপায় কি বলুন? বাড়ি ভরতি কুড়ে মেয়ে-লোকগুলির অন্ন জোগাতে আমার হাড় জর জর হয়ে গেল।

বড়ই গরীব তুমি, সত্যি,—লোকটা ওয়াংলাংএর কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে, একটু সবুর, তোমার দুঃখ ঘুচবে, তুমি বড়লোক হ'বে।

ওয়াংলাং মাথা নাড়লেঃ না, এ সব বড় বড় কথা শুনে সে আর ভুলছে না। গরম চায়ের বাটীতে চুমুক দিয়ে একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়লে।

কিন্তু সেই লোকটা বলে চললো, এই দ্যাখো, তুমি প্রাণপণ খেটে খেতে পাচ্ছ না, অথচ অপরে হেসে খেলে সুখে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে।

ওয়াংলাং বললে, সে কথা ঠিক।

তুমি যা পাও—এর চেয়ে অনেক কিছু বেশি তোমার প্রাপ্য। ওয়াংলাং একটু হাসলে।

হাসির কথা নয়, সত্যি। তোমার মুখ দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি।.........আর একটু চা দিই তোমায়, কেমন?—বলেই লোকটা বিশেষ যত্নের সংগে ওয়াংলাংএর বাটীতে আর খানিকটা চা ঢেলে দিলে।

ওয়াংলাং আসন ছেড়ে উঠে তাকে ধন্যবাদ দিল। তার মনে হ'তে লাগলো, এই লোকটার কি বুদ্ধি, আমাকে সে দেখামাত্র বুঝে ফেলেছে। ওয়াংলাং বেশ বিনয় করে জিজ্ঞেস করলে, কোন বড়ঘরের ছেলে আপনি?

আমি?—আমিও গরীব ঘরের ছেলে। তোমাকে আর তোমার মত আর আর সব গরীবকে আমি শুধু বলে বেড়াচ্ছি, শীগ্‌গিরই তোমরা বড়লোক হবে। বিপ্লবীরা নগরে এলেই—

ওয়াংলাং তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বললে, বিপ্লবী আমি নই।

লোকটা তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বললে, না, না, ওসব কিছু নয়, তুমি এমনিই খুব ভালো লোক!

একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিলো, তাই ওয়াংলাং তার জামাটা বেশ এটে সেটে গায়ে দিলে।

লোকটা ওয়াংলাংকে উদ্দেশ করে বললে, বড্ডই গরীব তুমি, তোমার জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়।

ওয়াংলাংএর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। এর আগে তার জন্য দুঃখ বোধ ত কেউ করে নি! সবাই বরং তাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেছে। অনেকগুলি মেয়েলোকের খাওয়া-পরা তার জোগাতে হয়, মাঠে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়—সবই সত্যি, কিন্তু তবুও সে বাপের এক বেটা, বাপের মৃত্যুর পর—মাঠান আট দশ বিঘে জমী আর তিন খানা ঘরওয়ালা মেটে বাড়িটা ত তারই হ'বে! সবাই প্রায় এই রকমই ভাবতো। কিন্তু আজ এই লোকটা তার সত্যিকার দুর্দশা দেখে ব্যথিত হয়েছে দেখে তার মন গলে গেল, চোখে তার জল দেখা গেল। সে লোকটার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বল্লে, আপনি যা বলেছেন—তা' ঠিক।

লোকটা বল্লে, কিন্তু কত বড় অন্যায় এটা। তোমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি বেশ চালাক। যে অভাবে তুমি দিন কাটাচ্ছ—এর চেয়ে তোমার অবস্থা ভালো হওয়া উচিত ছিল। এ কথা আমি বার বার বলব। যে খাটুনি তুমি খাটো তোমার বড়লোক হওয়া উচিত। সময়ও এসে গেল। বিপ্লবীরা যেদিন নগরে প্রবেশ করবে সেদিন সব ওলোট পালট হয়ে যাবে —গরীব হবে বড়লোক আর বড়লোক হবে সব গরীব।

কথাটা বেশ চুপি চুপি হচ্ছিল। ওয়াংলাং শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লঃ সেটা কেমন করে হ'বে মশায়!

লোকটা চারিদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর চুপি চুপি বল্লে, বিদেশীরা এত ধনরত্ন আঁকড়ে নিয়ে বসে আছে যে তা তুমি কল্পনাও করতে পারো না। রুপো তারা গ্রাহ্যের আমলে আনে না, চায় তারা কেবল সোনা। তাদের ঘরের দেওয়ালগুলি পর্যন্ত সোনায় ভরতি,—আর এ সোনা তারা পেলো কোথায়?—আমাদের এই চীনাদের কাছ থেকেই পেয়েছে, —নইলে এদেশে থাকে কেন? তারা নিজের দেশে ফিরে যায় না কেন? আমাদের সোনা তারা কেড়ে নিয়েছে—তাই, আমাদের সোনা নেই। অথচ ভেবে দেখ এ সোনা ত আমাদেরই। তাই বলছি—বিপ্লবীরা যখন আসবে—ঠিক থেকো।—কথাগুলি বলেই লোকটা উঠে চায়ের দোকান ছেড়ে দ্রুতপদে কোথায় চলে গেল।

ওয়াংলাং সেই কাটা মুণ্ডগুলার কথা মনে করে এই লোকটার কথাগুলি আর মনে মনে আওড়াতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু বিদেশীরা কোত্থেকে উড়ে এসে দেশের সবটুকু সোনা যে কেড়ে

[illegible] এ কথা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। আর তার মনে হচ্ছিল, ওদের বাক্সো ভর্তি বোধ হয় নীল পোষাক রয়েছে। নীল জামার কথা মনে হ'তেই তার মোলায়েম গরম স্পর্শটুকু নিজের অঙ্গে স্পর্শ করবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

প্রায় এক মাস পরে সে একদিন শুনলে, বিপ্লবীরা নগরে এসেছে। লোকটা যা বলে গিয়েছিল—তা হ'লে সে কথা ঠিক! ওয়াংলাং একদিন বাজারে তার সব্জী নিয়ে দর করছে এমন সময় [illegible] এসে কানে কানে বলে গেল, আর দিন দশেকের মাঝে, [illegible] প্রস্তুত থেকো। ওয়াংলাং তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে [illegible], চায়ের দোকানের সেই লোকটা। ওয়াংলাংএর কথা বলার [illegible] না দিয়েই লোকটা শন্ শন্ করে চলে গেল। খদ্দের তখন [illegible] কাছে চীৎকার করছে তুই একেবারে ডাকু,—দুই [illegible]।

ওয়াংলাং অন্যান্য দিনের মত উত্তর করলে, না খেয়ে মরি [illegible] ভালো তবু, চার পয়সার কম দেবো না। কিন্তু মনে [illegible] সে যেন আওড়াচ্ছে—আর দশ দিন—তারপর দেখা যাবে!

তখন থেকে খানিকটা ভয় আর খানিকটা সন্দেহ নিয়ে সে দিন কাটাতে লাগলো। কিন্তু সন্দেহ তার শীগ্‌গিরই ঘুচে গেলঃ দুই দিন পরে সে দেখলে নদীতে যেমন বন্যার জল আসে তেমনি অসংখ্য সৈন্যের স্রোত নগরে এসে পড়ছে। ব্যাপারটি সে ঠিক বুঝতে না পেরে চায়ের দোকানের একটা লোককে জিজ্ঞাসা করলে, এরা সব বিপ্লবী নাকি?

চায়ের দোকানের লোকটা তাকে চোখ দিয়ে শাসন করে বললে, চুপ ....কি বোকা তুমি!.....তোমার জন্যে আমাদের সবারই মাথা দিতে হবে দেখতে পাচ্ছি।.....দেখছ না কেমন মোটা হাড় এদের! কথা বলার ভঙ্গী!—যেন ফোয়ারা ছুটছে।........ভাত ছেড়ে ফেলে এরা কেমন করে রুটি চিবোয়—দেখছ না? এরা [illegible] উত্তরদেশ থেকে এসেছে—বিপ্লবীদের বিপক্ষ এরা! সাবধানে থেকো,—তোমার মত অনেক হতভাগার মাথা সেতুর ধারে ঝুলছে। তারপর চায়ের বাটি নেবার ছলে ওয়াংলাংএর মাথার কাছে নুয়ে সে তার কানে কানে বললে, আর সাত দিন, তৈরী থেকো—বলে সে দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে গেল।

আবার সেই,—তৈরী থেকো!—ওয়াংলাং চমকে উঠলেঃ কিসের জন্য তৈরী! কিছুই সে ভালো করে বুঝতে পারে না, কারো সঙ্গেই কথা বলতে সাহস পায় না। বড় রাস্তা বেয়ে [illegible] রঙের কুর্তি গায়ে পল্টন চলেছে,—তাই সে রাস্তা ছেড়ে সে অন্য পথে নিজের কাজে চললো।

পরদিন সন্ধ্যায় আকাশে এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো, ঘন ঘন বজ্রনাদের মত, নীচের মাটীও যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ওয়াংলাং তার বাপ আর ঠাকুরদাকে নিয়ে এক টেবিলে রাত্রের খাবার খাচ্ছিল, তার বউ আর মেয়েগুলি পরিবেশন করছিল। ব্যাপারটি কি ভালো করে জানবার জন্যে ওয়াংলাং খাবার কাঠিগুলি রেখে দিল। দুইটি শব্দ সে লক্ষ্য করলে, একটা বাজের মত আওয়াজ খানিকটা পরে পরে হচ্ছে,—আর একটা অবিরাম 'পটাপট্'।—শেষের শব্দটা তার মোটেই পছন্দ হ'ল না, এ শব্দ সে জীবনে শোনে নি। বাইরে গিয়ে ভালো করে দেখবে বলে সে উঠে দাঁড়ালো কিন্তু ভয় পেয়ে পেছিয়ে এসে সে বউকে বললে, যাও না, দেখে এসো গিয়ে!

দেওয়ালের পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে এসে বউ যেই দরজা খুলেছে অমনি কি যেন তার পায়ের কাছের মাটিতে এসে আঘাত করলে, মস্ত বড় এক মাটির চাপড়া এসে তাদের টেবিলের উপর খাবারের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই ভয়ে আঁৎকে উঠলো। ওয়াংলাং তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা বন্ধ করে দিলে। ঘরে মেটে প্রদীপটা পর্যন্ত তারা জ্বালতে সাহস পেল নাঃ রাত্রের নীরবতা ভেদ করে এক অবিরাম ভয়ঙ্কর শব্দ তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

ওয়াংলাং ভয় পেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলো, এই তা' হ'লে বিপ্লব! আমরা সবাই সাবাড় হ'ব এবার দেখতে পাচ্ছি! একটা নীল পোষাকের জন্যই শেষে আমার প্রাণটা গেল!!

পরদিন সকালে দেখা গেল সেই ভীষণ আওয়াজটা দূরে সরে গেছে। ওয়াংলাং জানালা থেকে উঁকি মেরে বাইরে একবার তাকিয়ে দেখে চটে গেলঃ তার সব্জী ক্ষেতের মাঝে সব বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে, সব্জী সব মাটির নীচে পোঁতা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সে চীৎকার করে দেবতাদের অভিশাপ দিতে লাগলোঃ কাল রাতে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে গেছে, তার কথা সে ভুলেই গেল। যে দুই একটি বাঁধাকপি অবশিষ্ট ছিল, কুড়িয়ে তা' এক ঝুড়িও হ'ল না; তাই নিয়ে বাড়ি এসে সে একেবারে বসে পড়লো। বউকে ডেকে সে বললে, আমি এবার একেবারে গেছি। গাজরগুলি ত এক মাসের আগে বিক্রী করবার মত হবে না, এখন কি খাই আমরা?

কথাটা শুনে বউও বেঞ্চের উপর বসে পড়লো। চোখে তার জল দেখা গেল; যা কপাল আমার! হবে না! আমি ত মরা মানুষেরও অধম—সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো—একটু পরে সে একটু শান্ত হয়ে বললে, এখন আর কি করা যায়, বাঁধা কপি বিক্রী করে যে কয়দিন হয়—চালাও। তারপর গাজর পোক্ত হবার আগে পর্যন্ত উপোষ চলবে—তা' ছাড়া আর উপায় কি বলো?

ওয়াংলাং নিতান্ত মনমরা হয়ে বাঁধা কপি নিয়েই বাজারে চললে। আধ মাইলও যায় নি এমন সময় সে দেখলে পথে একজন লোক মরে পড়ে রয়েছে। ওয়াংলাং যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে নাঃ লোকটার রক্ত ধুলোতে পড়ে জমাট বেঁধে উঠেছে। মরার কাছে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভালো দেখায় না তাই সে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য চোখ তুললে। কিন্তু এ কি—সামনে যে দশ বারোটা বিকৃত দেহ শব রয়েছে—তার সামনে যে আরও! গত রাত্রে দেবতার রোষে নগরের সব লোকগুলি মারা পড়লো নাকি? নগরের সিংহদ্বার দিয়ে সে প্রাণপণ ছুটে চললো; সামনে দেখতে পেল এক উন্মত্ত ঘন-বিজয়োল্লাস-মুখর জনতা।

এ কি? ব্যাপার কি?—সামনে সে যাকে পেলে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু কে কার জবাব দেয়?—সবাই তারা উন্মত্ত, এ ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে, ঠেলাঠেলি করে কেবল সামনে এগিয়ে চলেছে। কেউ তার কথার জবাব দিলে না। ওয়াংলাং দেখলে কি করে সে-ও জনতার মাঝে গিয়ে পড়েছে। এ কি, কি এ?—ওয়াংলাং কেবলই চীৎকার করতে লাগলো। কিন্তু কে তার কথার উত্তর দেবে? সে এগুতেও পারে না, পিছুতেও পারে না, নিজের ইচ্ছায় কোনও দিকে চলবার শক্তি নেই তার! সে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে ভাবতে লাগলোঃ বউকে আজ বাজারে কপি বিক্রী করতে পাঠালেই ভালো হ'ত।

ঠিক এই সময় কে যেন চীৎকার করে বলে উঠলোঃ ওরে, বড়লোকের ঘরে যাবার এই যে পথ! এই যে বিদেশীদের ঘর!

এইবার ওয়াংলাং বুঝে ফেললে—ব্যাপারটা কি! এই ত বিপ্লব। বুক তার দ্রুত তালে নেচে উঠতে লাগলো। সেই গভীর জনতার মাঝে সে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে, শুধু হুঁসিয়ার রইলে কেউ তাকে পায়ে মাড়িয়ে পিষে না ফেলে। জনতার মাঝে অনেক সৈনিক রয়েছে, কিন্তু তারা কেউ আগেকার দিন রাস্তায় দেখা সৈনিকের মত নয়। এরা সব দেখতে

বেঁটে, শরীর পাতলা; জোর গলায় তালে তালে তারা শুধু চীৎকার করে চলেছে, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, বড়লোকের ঘরে চলো, টাকা পাবে।

ওয়াংলাংএর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। কি যে ব্যাপার ঘটছে সে যেন ভালো বুঝতে পারে না। তবুও আর সবার সঙ্গে সে এগিয়ে চললো। ক্রমে তারা মস্ত এক বাড়ির সম্মুখে এসে হাজির হ'ল; বাড়ির গেট ইট দিয়ে গাঁথা। শহরের যে কোন্ অংশ এ, ওয়াংলাং তা বুঝতেই পারলে না। অন্য সময় হ'লে এমন একটা বাড়িতে সে ঢুকতেই সাহস পেত না। কিন্তু আজকার কথা আলা'দা। আজ বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে পাগল করে তুলেছে, তার মনে হচ্ছে আজ তার সব কিছুতেই অধিকার আছে।

দুইজন সৈনিক এগিয়ে গিয়ে তাদের বন্দুকের হাতল দিয়ে গেটের গায়ে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলো। ওয়াংলাং তাদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো—চোখগুলি তাদের কাচের মত ঝক্‌ঝক্ করছে মুখগুলি তাদের রাঙা হয়ে উঠেছেঃ যেন মদ খেয়েছে। গেটের উপরে তারা আঘাতের উপর আঘাত করে চললো; শেষে গেটটা যখন একেবারে ভেঙে পড়লো তখন তারা জনতার দিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠলোঃ এইবার গরীবরা বড়লোক হ'বে, বড়লোক হ'বে গরীব, বলো, জয় বিপ্লবের জয়!

সমগ্র জনতা মুহূর্তের জন্য থেমে কি যেন ভেবে নিল একবার, তারপর যাদের সাহস বেশি সেই সব নরনারী যে-কোন ফাঁক দিয়ে খোলা গেটের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। সবার পিছনে পড়ে রইলো ওয়াংলাং। সবাই যখন ভিতরে চলে গেছে তখন ওয়াংলাংও আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো। ভিতরে ঢুকে তার প্রথমেই চোখে পড়ল একটা চৌকোণা ঘাসে ঢাকা জায়গা, চারিদিকে তার ফুলের গাছ। চারিদিক কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! বাড়ির একটি লোকও চোখে পড়ে না।

ইটের প্রাচীরের শেষ দিকটায় যেখানে একখানা দোতালা বাড়ি রয়েছে লোকগুলি সব সেই দিকে ঝুঁকে পড়লো। কি যে তারা করবে—তাদের কেউই যেন সে কথা বুঝে উঠছিল না। সেই সৈন্য দুটি এক লাফে সিঁড়িতে উঠে দরজায় আচ্ছা করে এক ধাক্কা দিলে। তখনই কে যেন ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে। ওয়াংলাং দেখলে—অদ্ভুত রকমের পোষাক-পরা লম্বা ফর্সা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মুখে তার শান্ত ধীর ভাব।

বিচ্ছিন্ন জনতা আবার ঘন হয়ে মিলে একসাথে চীৎকার করে উঠলো, তারপর তারা বাড়ির ভেতর ঢুকতে লাগলো—বাঁধ ভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসের মত। শিকার ধরবার সময় হিংস্র জানোয়ারেরা যেমনি করে আওয়াজ করে, তাদের আওয়াজ যেন অবিকল সেই মত। 'এই আওয়াজ শুনে ওয়াংলাংএর বুকের ভেতর কেমন ধারা একটা যেন ক্ষুধা জেগে উঠলো—আহারের ক্ষুধার চেয়ে এ যেন অনেক বেশি প্রবলতর। পথের কুকুর খাবার দেখলে যেমনি করে আর সবাইকে মুখ ভেংচিয়ে নিজে নেবার জন্যে লাফিয়ে পড়ে ওয়াংলাং ঠিক তেমনি করে সংকীর্ণ দরজার ভিতর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় সে যেন উড়ে চললো।

জিনিস লুঠ করবার জন্য আর সবার মত ওয়াংলাংও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, সবার সঙ্গে সে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল; কিন্তু কি যে নিতে হ'বে ওয়াংলাং তা স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারছিল না। তার সামনে থেকে অনেক জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলঃ কাপড়, কাঁচ, কাগজ, কাঠ। একবার ওয়াংলাং এক টুকরো রুপোর জিনিস পেয়ে গেল কিন্তু এমনি ভাগ্য—পেতে না পেতেই কে যেন তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওয়াংলাং নতুন একটা জিনিস দেখে ছুটতে গিয়ে হারানোর দুঃখটা এক রকম ভুলেই গেল। কিছুই সে যেন ধরতে পায় না, সবাই যে এর মাঝে ভালো ভালো জিনিসগুলি নিয়ে ফেললে!

ওয়াংলাং এর মন কিসের তালে যেন নেচে উঠছে, চোখ দুটি পুড়ে যাচ্ছে, সবার সাথে সে-ও অনবরত এক অদ্ভুত সুরে জোর গলায় চীৎকার করে চলেছে, অথচ নিজে সে জানে না যে সে চীৎকার করছে। এক লুঠ করবার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছুই সে আর অনুভব করতে পারছে না। যখনই কোন নতুন দেরাজ খোলা হচ্ছে অমনি একসাথে অনেকগুলি লোক তার উপর লাফিয়ে পড়ছে, ওয়াংলাংও হাতের জিনিস ফেলে সেই নতুন জিনিস পাবার জন্য তাদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

তারপর গ্রীষ্মের দমকা হাওয়ার মত লোকগুলি সব কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। ওয়াংলাং ঢুকবার সময় এসেছিল—সবার আগে—যাবার সময় তাই সে পড়ে রইল সবার পিছে। তার যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙলো, তাকিয়ে দেখলো সবাই চলে গেছে। ঘরের মাঝে সে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলো—রয়েছে সেখানে দু'খানা ভাঙা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, আর দেরাজগুলো সব টেনে বের করা,—জিনিসপত্রের নামগন্ধ তাতে নেই। এইবার যেন সে তার সম্বিৎ ফিরে পেলঃ সে এতক্ষণ করছিল কি! এক বিদেশীর ঘর এ। ওয়াংলাং এবার এখানকার চেয়ারগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেঃ সাধারণ কাঠ দিয়েই তৈরী এগুলি; টেবিলটাও দেখা যাচ্ছে সাধারণ সস্তা কাঠের। সোনার টেবিল চেয়ারের কথা যে সব সে শুনেছিল সে সব তা'লে মিছে! দেওয়ালগুলি শুধু চুণকাম করা—কোনও কিছু লাগানো নেই তাতে, মেজেটা কাঠ দিয়ে তৈরী, রং করা।

ওয়াংলাংএর হাতের উপর লুঠ করা জিনিসগুলি ছিল,—এই প্রথম তাদের দিকে সে একবার তাকালেঃ ছোট ছেলেদের পরবার মত একটি সাদা সুতীর জামা, মস্ত বড় একটা চামড়ার জুতো—আর শক্ত মলাটে বাঁধানো দু'খানা বই,—তাতে বিদেশী ভাষায় কি যে হিজিবিজি লেখা,—ওয়াংলাং তার বিন্দুবিসর্গও বোঝে না। এ ছাড়া একটা চামড়ার থলি—তাতে রয়েছে একটি রৌপ্যমুদ্রা আর কয়েকটি তামার। এই সামান্য পয়সা নিয়ে নীল পোষাক কেনার স্বপ্ন দেখা একেবারে মিছে।

তার বুক থেকে আপনা আপনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল, এতক্ষণের উত্তেজনার পর এইবার সে বড়ই ক্লান্ত বোধ করতে লাগলো। জানু পেতে বসে লুঠ করা জিনিসগুলি বেশ করে প্যাক করে সে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলো। কিন্তু এ কি—সে যে নামতে পারে না। সিঁড়িগুলি কি অদ্ভুত! জীবনে সে এই প্রথম সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করছে। পা-টা যেন তার টলছে। বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে রেলিং ধরে কোন মতে সে নীচে নেমে এল।

নীচে কয়েকটি মেয়েলোক তখনও অপরের ফেলে যাওয়া টুকিটাকি কুড়ুচ্ছে। ওয়াংলাংও থেমে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেঃ নতুন দামী কোনও কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কই—তেমন কিছুই ত, দেখা যায় না,—এদিকে ওদিকে ছড়ানো রয়েছে শুধু কয়েকখানা বই দু'একখানা চেয়ার টেবিল, ছেঁড়া পায়ে-দলা একখানা ছবি। ছাই-রংএর এক টুকরো কাপড় কুড়ুতে মাথা নীচু করে সে দেখতে পেলে ভিতরকার ঘরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। এমন লোক সে জীবনে দেখে নি। একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক দুইটি ছেলেমেয়ে নিয়ে গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে—কাপড়-চোপড় তাদের একেবারে ছেঁড়া আর মাটি কাদা মাখা,—বহির্বাস একরকম নেই বললেই হয়। স্ত্রীলোকটি একটুখানি কাপড় তার কাঁধের উপর টেনে

দিয়েছে। পুরুষটার কপালে মস্ত বড় একটা কাটার দাগ—আর তা থেকে তখনও তাজা ঘন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে; এমন লাল রক্ত ওয়াংলাং জীবনে দেখে নি।

ওয়াংলাং আড় চোখে তাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, তারাও ওয়াংলাংএর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কেউ একটি টু শব্দ করলে না। তাদের সেই দৃষ্টি ওয়াংলাং সইতে পারছিল না, সে একবার বাইরে একবার তাদের দিকে তাকাতে লাগলো। পুরুষটা বিদেশী ভাষায় কি যেন একটু বললে, স্ত্রীলোকটি তা শুনে কেমন করে হাসলে;—ওয়াংলাং তা'তে আহত বোধ করলে। তারপর তারা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

ওয়াংলাংএর মুখ থেকে জোরেই আপনা আপনি বেরিয়ে এল, এরা ত একটুও ভয় পায় নি! নিজের কণ্ঠস্বর শুনে ওয়াংলাং লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। দূরে শুধু উন্মত্ত জনতার কলরব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য সে কি যেন ভেবে নিলে, তারপর সে বড় রাস্তা বেয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। রাস্তায় সৈনিকদের মৃতদেহ বাসি হয়ে উঠেছে, মুখে চোখে তাদের মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা সব দ্রুত শহরের দিকে ছুটেছে। তাদের অনেকেই ওয়াংলাংকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হচ্ছে, ভাই, ওদিকে? ওয়াংলাং এমনি ক্লান্ত বোধ করছিল যে তাদের কথার জবাবই দিলে না।

বাড়ি এসে পুটলিটা টেবিলের উপর রেখে সে তার বউকে বললে, সেই যে বিপ্লবের কথা বলতাম না?—এই দ্যাখ কি সব এনেছি আমি!

—বলেই সে ভেতরকার ঘরে গিয়ে একেবারে বিছানার 'পর শুয়ে পড়লে। বিদেশী লোকগুলির সেই অদ্ভুত স্থিরদৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই সে মনে করতে পারছিল না। সে নিজে নিজেই বলতে লাগলো, আশ্চর্য, ওরা একটুও ভয় পায় নি!......কিন্তু যাই বলো,—আমার ত মনে হয় না—ওরা বড়লোক!

আর এক ঘরে ওয়াংলাংএর বউ তখন বকছেঃ এই বইগুলো দিয়ে জুতোর সুখতলা ছাড়া আর কি ছাই হবে—জানি না। এই টাকা আর পয়সা কয়টা তবু কিছু কাজে লাগবে—গাজর পোক্ত না হওয়া পর্যন্ত কয়েক দিন একরকম এতেই চলে যাবে।

নূতন পৃথিবী

(৪৮৫ পৃষ্ঠার পর)

তখন সঞ্জিতই তাহাকে আবার প্রান্তরে টানিয়া লইয়া যায়। আর আজ সে কি করিয়া এমন হীন ও কুৎসিত সন্দেহবশে তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে পারে! সঞ্জিতের কি করিয়া এত তাড়াতাড়ি এমন পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে?

অলকনন্দা ধীরে ধীরে জোর দিয়া বলিতে লাগিল, পুরুষ মানুষ এমনি হয়। (সঞ্জিত যে শুনিতে পাইতেছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না) বলতে পার, কখনও তোমায় অবহেলা করেছি, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি হয়েছে? এত ক'রেও কেন তোমার মন পাওয়া যাবে না? কেন তুমি এত গম্ভীর হ'য়ে থাক, আর কারণে অকারণে চটে ওঠ? বলতে পার, কি করলে তোমার মন পাওয়া যাবে? (তথাপি সঞ্জিত কোন উত্তর করিল না), আগে ত' তুমি এমন ছিলে না—মিথ্যে সন্দেহ করবার মত নীচু মন ত' তোমার ছিল না।

মানুষ চিরকাল এক থাকে না—যেমন তুমি নিজেও।

আমি তোমায় কখনও সন্দেহ করেছি?

সংশয় বা অবিশ্বাসই শেষ কথা নয়—এ নিয়েও আমাদের বিরোধ গড়ে উঠে নি—side issue মাত্র।

তবে? বাঃ, চুপ করে রইলে কেন। খোলাখুলি হ'য়ে যাওয়াই মঙ্গল।

না, আজ থাক, রাত অনেক হয়েছে। আমি ক্লান্ত, দয়া ক'রে আমায় একটু ঘুমাতে দাও।

সঞ্জিত চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

অলকনন্দা টেবিলের পাশে গিয়া ব্লাউসটা খুলিতে খুলিতে বলিল, তোমরা পুরুষ মানুষ বলে—স্বামী দেবতা বলে যা খুশি করবে, আর তাই আমাদের মেনে নিতে হবে—এমন কি, তোমাদের অন্যায় জুলুম—জবরদস্তিও!

উপায় কি অলকা, বিধাতার যে এমনি অভিরুচি ছিল।

বিধাতার অভিরুচি! শারীরিক দুর্বলতা ও অসুবিধার সুযোগ নিয়ে তোমরা চাও মেয়েদের পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে। তোমার এ হীন, নির্লজ্জ মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে আমি লজ্জায়, ঘৃণায়—

অলকনন্দা সহসা থামিয়া গেল। সঞ্জিতের ক্রুদ্ধ রূপ সে কখনও দেখে নাই। আজ অকস্মাৎ সঞ্জিতের ক্রুদ্ধ, ভয়ঙ্কর চাহনি দেখিয়া সে থমকিয়া গেল।

সঞ্জিত বিরোধটা এড়াইতেই চাহিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না। সে জানে এ বিরোধের মূল মঞ্জুশ্রীর প্রতি তাহার আসক্তির মিথ্যা সন্দেহ নয়, কিংবা চন্দ্রনাথ ও অলকনন্দার সুপ্ত প্রণয়ও নয়। এ বিরোধ আদর্শের সংঘাতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং রাজনীতি ক্ষেত্র ছাড়িয়া দাম্পত্য জীবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে ভ্রান্ত দুর্নীতি ও ভুলের জন্য অলকনন্দা তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাহা কৃত্রিম এবং স্থায়ী নয়। (ক্রমশ)

সোভিয়েট সাহিত্য

মাক্সিম গোর্কি

শ্রম-প্রক্রিয়ার যে বিবর্তনের ফলে একটা দ্বিপদ জন্তু মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সংস্কৃতির বনিয়াদ তৈরী হয়েছে, সে সম্বন্ধে যথোচিত গভীরভাবে অনুশীলন হয় নি। এটা কিন্তু স্বাভাবিক, কারণ এ রকম গবেষণা শ্রম-শোষকদের স্বার্থানুকূল নয়। শ্রম-শোষকেরা জনসাধারণের শক্তিকে টাকা বানাবার একরকম কাঁচা মাল মনে করে; সুতরাং তারা স্বভাবতই এই কাঁচা মালের দাম বাড়াতে চায় না। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন দাস ও দাসের মালিক-এ বিভক্ত ছিল তখন থেকেই তারা শ্রমরত জনসাধারণের প্রাণশক্তিকে ব্যবহার করেছে ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমরা এখন ব্যবহার করি নদীস্রোতের গতিবেগকে। সংস্কৃতির ইতিহাস-রচয়িতারা
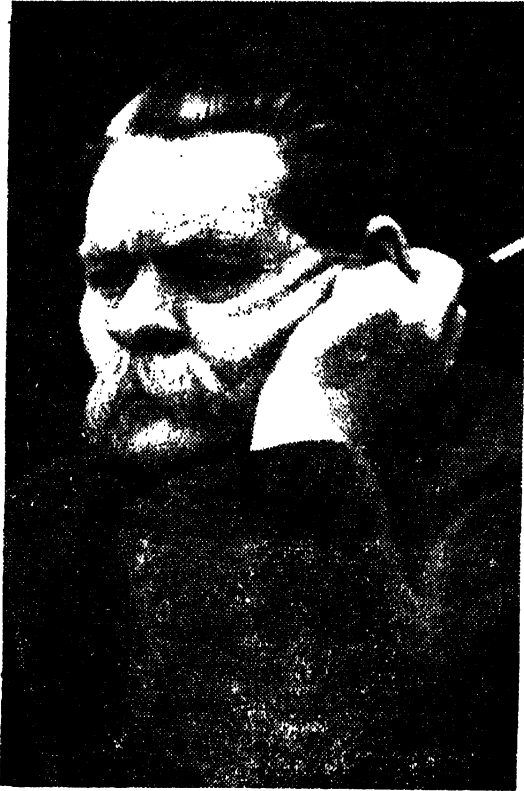
মাক্সিম গোর্কি

আদিম মানুষকে চিত্রিত করেছে দার্শনিক আদর্শবাদী ও মরমীরূপে, দেবদেবীর স্রষ্টা রূপে, "জীবনের অর্থ"-সন্ধানী রূপে। আদিম মানুষের মনোবৃত্তিকে দেখানো হয়েছে জেকব বোহমের মনোবৃত্তির মতো। জেকব বোহমে ছিল মুচি; তার জীবনকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। সে তার অবসর সময়ে দর্শন চর্চা করত। সে দর্শন বুর্জোয়া মরমীদের অতি প্রিয় দর্শনতত্ত্বেরই সমগোত্র। বোহমে প্রচার করত, "মানুষের উচিত আকাশ, নক্ষত্র ও মূলবস্তু নিয়ে এবং তাদের থেকে উৎপন্ন জীব নিয়ে ধ্যান করা; দেবদূত, শয়তান, স্বর্গ ও নরক নিয়েও তাদের ধ্যান করা উচিত।"

এ কথা সকলেই জানে যে, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য এবং প্রাচীন ধর্মাচরণ তত্ত্বই আদিম সংস্কৃতির ইতিহাসের বিষয়বস্তু জুগিয়েছে, আর এই সব জিনিষের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে খৃষ্টান দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে। এ প্রভাব নাস্তিক ঐতিহাসিকেরাও এড়াতে পারেন নি। এই প্রভাব স্পেন্সারের অতি-জৈব বিবর্তনের থিওরির মধ্যেও স্পষ্ট ধরা যায়। শুধু তাঁরই বইতে নয়, ফ্রেজার ও অন্যান্যদের লেখাতেও এটা ধরা যায়। কিন্তু আদিম ও প্রাচীন সংস্কৃতির কোনো ইতিহাস রচয়িতা লোকগাথা, জনসাধারণের অলিখিত রচনা ও পুরাণকে ব্যবহার করেন নি। অথচ এগুলোই একত্রে মিলে প্রাকৃতিক ব্যাপার, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম এবং সামাজিক জীবনের মোটামুটি একটা সুচারু প্রতিচ্ছবি।

যে দ্বিপদ জন্তুকে বেঁচে থাকবার জন্যে সংগ্রামে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হ'ত, সে শ্রম-প্রক্রিয়া এবং গোষ্ঠী ও উপজাতির কথা ছেড়ে বস্তুবিচ্ছিন্ন চিন্তা করতে পারে, এমন কল্পনা করা খুবই কঠিন। এমানুয়েল কাণ্ট খালি পায়ে পশুচর্ম পরে "তৎসৎ" (thing-in-itself)-এর ধ্যান করছেন, এমন কল্পনা করা বাস্তবিকই কঠিন। বস্তুবিচ্ছিন্ন চিন্তা মানুষ পরের যুগে করেছিল; এ চিন্তা করেছিল সেই একক মানুষ যার সম্বন্ধে আরিস্টটল্ তাঁর "রাজনীতি" বইতে বলেছেন, "সমাজের বাইরে মানুষ হয় দেবতা, নয় জানোয়ার।" জানোয়ার বলেই সে কখনো কখনো দেবতার সম্মান আদায় করত; কিন্তু জানোয়ার হিসেবে সে জানোয়ার সদৃশ মানুষের সম্বন্ধে বহু অলীক কাহিনী সৃষ্টির বিষয়-বস্তু জোগাত। ঠিক যেমন, প্রথম মানুষ ঘোড়ায় চড়া শিখলে তা থেকে সৃষ্টি হল "সেন্টর" (আধা মানুষ আধা ঘোড়া)-এর কাহিনী।

শ্রম-প্রক্রিয়া এবং প্রাচীন মানুষের সামাজিক জীবনে ঘটনাসমষ্টি থেকে অপরিহার্যভাবে যে বস্তুগত চিন্তার উদ্ভব হল, তার স্পষ্ট প্রমাণকে আদিম সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতারা একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন। এইসব প্রমাণ-চিহ্ন আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে গল্প ও কাহিনীর আকারে। এতে আমরা শুনতে পাই পশুকে পোষ মানাবার, ভেষজ আবিষ্কারের, শ্রমযন্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়াসের প্রতিধ্বনি। দূর অতীতে মানুষ আকাশে ওড়বার স্বপ্ন দেখত। পায়েথন, দিদালুস ও তার ছেলে ইকারুস-এর গল্প থেকে এবং "ম্যাজিক কার্পেট"-এর কাহিনী থেকে এ কথা বোঝা যায়। মানুষ পৃথিবীর উপর দিয়ে দ্রুতগতি চলাচলের স্বপ্ন দেখত; তাই শুনি "একুশ মাইল বুট জুতো"র গল্প। মানুষ শিখল ঘোড়ায় চড়তে। স্রোতের চেয়ে বেশী দ্রুত-বেগে নদীতে চলবার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভাবিত হল দাঁড় ও পাল। শত্রুকে ও জন্তুকে দূর থেকে মারবার চেষ্টা থেকে উদ্ভাবিত হল গুলতি ও তীরধনু। মানুষ এক রাতের মধ্যে সুতো কেটে প্রচুর কাপড় তৈরী করবার কল্পনা করল, রাতা-

রাতি ভালো বাসগৃহ তৈরী করবার, এমন কি "কেল্লা" অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে সুরক্ষিত বাসগৃহ তৈরী করবার কল্পনা করল। সে সৃষ্টি করল চরকা, যা একটা প্রাচীনতম শ্রমযন্ত্র। সে সৃষ্টি করল তাঁত, আর সেই সঙ্গে "বিজ্ঞ ভাসিলিসা"র গল্প। আরো অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায় যা থেকে বোঝা যায় এইসব পুরাণ রূপকথার মধ্যে একটা লক্ষ্য অন্তর্নিহিত ছিল—বোঝা যায়, আদিম মানুষের খেয়ালী ও কাল্পনিক চিন্তা কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। তখনই তার মনে যন্ত্র-বিষয়ী চিন্তা দেখা দিয়েছে। এ চিন্তা আমাদের সময়কার কল্পনা পর্যন্ত উঠতে পারে; যেমন, নিজের অক্ষদন্ডকে ঘিরে পৃথিবীর ঘোরার শক্তিকে কাজে লাগানোর কিংবা মেরু-তুষারকে ভেঙে ফেলার কল্পনা। প্রাচীনকালের সমস্ত কথা-কাহিনী যেন "টাণ্টালাস"-এর গল্পে চরম পরিণতি পেয়েছে। টাণ্টালাস দাঁড়িয়ে আছে গলা জলে, তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু তৃষ্ণা সে মেটাতে পারছে না—এই তো প্রাচীন মানুষ বহির্জগতের দৃশ্যমান ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে দাঁড়িয়ে, অথচ এ ঘটনাপুঞ্জকে সে এখনো বুঝতে শেখেনি।

প্রাচীন গল্প কাহিনী নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। কিন্তু সেগুলোর মূলগত অর্থ আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার। সেগুলোর অর্থ হচ্ছে প্রাচীন শ্রমরত মানুষের আকাঙ্ক্ষা নিজেদের শ্রম লাঘব করবার, উৎপাদন বাড়াবার, চতুষ্পদ ও দ্বিপদ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হবার এবং মানুষের বৈরী নৈসর্গিক ঘটনাবলীকে "মন্ত্র" ও "ঝাড়ফুঁক"-এর সাহায্যে বাগে আনবার আকাঙ্ক্ষা। শেষোক্ত বিষয়টা বিশেষভাবে উল্লেখ্য; কারণ এ থেকে বোঝা যায়, শব্দের শক্তিতে মানুষের কী গভীর বিশ্বাস ছিল। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রম-প্রক্রিয়া সংগঠনে বাক্য যে কতখানি কাজে লাগে তা তখন সকলেই স্পষ্ট অনুভব করত; এ থেকেই শব্দের প্রতি এ রকম বিশ্বাস জন্মেছিল। এমন কি, দেব-দেবীকে প্রভাবিত করবার জন্যে "মন্ত্র" ব্যবহার করা হত। এ খুব স্বাভাবিক, কারণ সমস্ত প্রাচীন দেব-দেবীই পৃথিবীতে বাস করত; তাদের আকৃতিও ছিল মানুষের এবং তারা আচরণও করত মানুষের মতো। তারা অনুগতের উপর ছিল সদয়, অবাধ্যের উপর খড়্গহস্ত। তারা ছিল মানুষের মতো হিংসুক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, দুরাকাঙ্ক্ষী। মানুষ যে তার নিজেরই প্রতিরূপে দেবতা সৃষ্টি করেছিল তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মচিন্তার উদ্ভব হয়েছিল প্রকৃতির অনুধ্যান থেকে নয়, সামাজিক বিরোধ-সংঘাত থেকে। আমাদের এ বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত যে, প্রাচীনকালের "যশস্বী লোকেরাই" দেবতা তৈরীর কাঁচা মাল জুগিয়েছিল। যেমন, "শ্রম বীর" "সর্বকর্মনিপুণ" হার্কিউলিস শেষ পর্যন্ত দেব-স্থান অলিম্পাসে উন্নীত হয়েছিলেন।

আদিম মানুষের কল্পনায় ঈশ্বরের একটা বস্তুবিচ্ছিন্ন রূপ ছিল না। তিনি ছিলেন এক বাস্তব ব্যক্তি; তাঁর প্রহরণ ছিল কোনো না কোনো শ্রমযন্ত্র, তিনি ছিলেন কোনো একটা ব্যবহারিক কাজে পারদর্শী, তিনি ছিলেন মানুষের শিক্ষক ও সহকর্মী। ঈশ্বর ছিলেন শ্রমকৃতিত্বের সাধারণ চারুশিল্প-রূপ। শ্রমরত জনসাধারণের "ধর্ম"-চিন্তাকে ধর্ম হিসেবে দেখা উচিত নয়; কারণ তা ছিল নিছক চারু সৃজনী শক্তির প্রকাশ। পুরাণ মানুষের শক্তির মহিমা কীর্তন করেছে এবং তার ভবিষ্যতের বিপুল বিকাশের পূর্বাভাষ এঁকেছে যেন। সুতরাং মূলগতভাবে বলতে গেলে পুরাণ খুব বাস্তব। প্রাচীন কল্পনার পক্ষ-বিস্তারে সব সময়ে লুকনো লক্ষ্যকে সহজে আবিষ্কার করা যায়; সে লক্ষ্য হচ্ছে শ্রম লাঘবের জন্যে মানুষের প্রয়াস। যাদের শারীরিক শ্রম করতে হত তাদের মধ্যেই যে এই প্রয়াস প্রথম জন্ম নেয় তাতে সন্দেহ নেই। আর এও নিঃসন্দেহ যে, ঈশ্বর আবির্ভূত হতেন না এবং এতদিন ধরে শ্রমজীবী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে টিঁকে থাকতেন না, যদি না তিনি পৃথিবীর প্রভু শ্রমশোষকদের এতটা কাজে লাগতেন। আমাদের দেশে ঈশ্বর যে এত দ্রুত ও সহজে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছেন, তার কারণ তাঁর অস্তিত্বের হেতু বিলুপ্ত হয়েছে—অর্থাৎ মানুষের উপর মানুষের ক্ষমতাকে কায়েম করবার প্রয়োজন বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ, মানুষ মানুষের মন ও ইচ্ছার প্রভু হবে না, শুধু সহকর্মী, বন্ধু, সাথী ও শিক্ষক হবে।

কিন্তু দাসের মালিকরা যতই বেশী শক্তিশালী ও প্রভুত্বপরায়ণ হতে থাকল, স্বর্গে দেবতারা ততই উঁচুতে উঠতে লাগলেন। আর জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল দেবতার সঙ্গে যুঝবার আকাঙ্ক্ষা—এ আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে প্রোমিথিয়ুস, কালেভি (এস্তোনিয়ান) ও অন্যান্য বীরের রূপ-কল্পনায়। এরা দেবতাকে বৈরী "প্রভুর প্রভু" হিসেবে দেখেছে।

প্রাক্-খৃষ্টান পেগান লোকগাথায় "মূল তত্ত্ব", "আদি কারণ" বা "তৎসৎ" সম্বন্ধে চিন্তার অস্তিত্বের পরিষ্কার কোন আভাস পাওয়া যায় না। মোট কথা, প্লেটো খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যে চিন্তাধারাকে একটা মতবাদে সংগঠিত করেছিলেন, সেই চিন্তাধারার চিহ্ন ওতে পাওয়া যায় না। শ্রম-প্রক্রিয়া এবং জীবনের অবস্থা ও বাস্তব ঘটনাপুঞ্জের প্রতি নির্বিকার ঔদাসীন্যের যে দর্শনতত্ত্ব, তার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন প্লেটো। একথা সুবিদিত যে, খৃষ্টান চার্চ প্লেটোকে খৃষ্টান ধর্মের অগ্রদূত বলে স্বীকার করেছে। এ কথা সুবিদিত যে, খৃষ্টান চার্চ তার জন্ম থেকেই "পেগানিজম্-এর অস্তিত্বের" বিরুদ্ধে যুঝেছে—এ অস্তিত্ব শ্রমিকদের বস্তু-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিচ্ছবি। একথা সুবিদিত যে, সামন্ত-প্রভুরা যখন বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি অনুভব করতে লাগল, তখন দেখা দিল বিশপ বার্কলির ভাববাদী দর্শন—ভাববাদের বিরুদ্ধে তাঁর তেজস্বী রচনায় লেনিন এই দর্শনের প্রগতিবিরোধী রূপকে মুখোস খুলে দেখান (Materialism and Empirio-Criticism—Lenin)। এ কথাও সুবিদিত যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি, ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততন্ত্র ও তার প্রেরণার কেন্দ্র ধর্মের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে বস্তুবাদী মত

কাজে লাগিয়েছিল, কিন্তু শ্রেণী-শত্রুকে পরাজিত করার পর বুর্জোয়ারা নতুন শত্রু শ্রমিক শ্রেণীর ভয়ে অবিলম্বে ভাববাদী মতকে আঁকড়ে ধরল এবং চার্চের শরণ নিল। শ্রমজীবী জনগণের উপর তার ক্ষমতা কত যে অন্যায় আর অনিশ্চিত, তা বুঝতে পেরে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রিটিসিজম্, পজিটিভিজম্, র‍্যাশনালিজম ও প্র্যাগম্যাটিজম্-এর দর্শন দ্বারা এবং শ্রম-প্রক্রিয়াসঞ্জাত বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাকে বিকৃত করবার অন্যান্য প্রয়াস দ্বারা নিজের অস্তিত্বের সাফাই দেবার চেষ্টা করে। এই সব চেষ্টা থেকে বুর্জোয়াদের জগৎকে ব্যাখ্যা করার অক্ষমতাই একের পর আর প্রকাশ পায়। তাই আমরা বিংশ শতাব্দীতে দেখি, দার্শনিক চিন্তার যশস্বী নেতা হচ্ছেন ভাববাদী বের্গসঁ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এঁর মতবাদ "ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষে অনুকূল।" এখানেই পশ্চাৎগতির প্রয়োজনের স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে যোগ করুন, টেক্‌নিকের (যার ফলে ধনিকরা অসাধারণ বিত্তশালী হয়েছে) অপ্রতিরোধ্য বৃদ্ধির সর্বনাশা সম্ভাবনা নিয়ে বুর্জোয়াদের কাঁদুনি। তাহলেই মোটামুটি পরিষ্কার একটা ধারণা করা যাবে, বুর্জোয়া শ্রেণী মননে কতখানি দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং এই ঐতিহাসিক অবশেষকে ধ্বংসের প্রয়োজন কতখানি। কারণ তার পচনের বিষ সমস্ত পৃথিবীকে সংক্রমিত করছে। প্রকৃত ঘটনার মূল অর্থকে বুঝতে অস্বীকার করা, জীবনের ভয়ে জীবন থেকে পলায়ন করা কিংবা নিরুদ্বিগ্নতার জন্যে একটা অহংসর্বস্ব কামনা, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঘৃণ্য জঘন্য অরাজকতা সৃষ্ট সামাজিক ঔদাসীন্য—এইগুলোতেই সব সময়ে পাওয়া যায় মানসিক দারিদ্র্যের মূল।

* * *

যখন মার্কসবাদীরা সংস্কৃতির ইতিহাস লিখবে, তখন দেখা যাবে, সাংস্কৃতিক সৃজন কাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকাকে এ যাবৎ খুবই বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে, বিশেষ করে সাহিত্যক্ষেত্রে এবং আরো বেশী চিত্রশিল্পে: কারণ চিত্রে বরাবর বুর্জোয়ারাই হচ্ছে নিয়োগকর্তা, অতএব নিয়ামক। সংস্কৃতি বলতে যদি জীবনের নিছক বাহ্যিক সুখ-সুবিধের ক্রমোন্নতি ও বিলাস বৃদ্ধি না বুঝে ব্যাপকতর অর্থ ধরা যায়, তাহলে মানতে হবে যে, সংস্কৃতির সৃষ্টির উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর কখনো কোনো টান ছিল না। জগতের উপর, মানুষের উপর, পৃথিবীর সম্পদের উপর এবং নৈসর্গিক শক্তির উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার জন্যে এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিস্তৃতির জন্যে নানা পদ্ধতির একটা নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থাই হচ্ছে ধনতন্ত্রের সংস্কৃতি। তা ছাড়া আর কিছু নয়। বুর্জোয়া শ্রেণী সংস্কৃতির উন্নতি বলতে কখনো সমস্ত মানুষের উন্নতির প্রয়োজনকে বোঝে নি। এটা একটা সর্ববিদিত সত্য যে, বুর্জোয়া অর্থনৈতিক নীতির ফলে রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত প্রত্যেক জাতি তার প্রতিবেশীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে, আর কম সুসংগঠিত জাতিগুলো বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলো বুর্জোয়াদের দাসরূপে পরিগণিত হয়েছে—বুর্জোয়াদের নিজেদের শ্বেতাঙ্গ দাসদের চেয়েও এরা অধিকারবঞ্চিত হয়েছে আরো বেশী।

কৃষক ও শ্রমিকেরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মনকে উন্নত করার অধিকার এবং জীবনকে উপলব্ধি করবার, জীবনযাত্রাকে পরিবর্তিত করবার, কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আরো সহনীয় করবার যে ইচ্ছা তাকে বিকশিত করার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। স্কুলগুলো শুধু ধনতন্ত্রের বিশ্বস্ত ভৃত্য তৈরী করেছে এবং এখনো করছে—এরা ধনতন্ত্রের অলঙ্ঘনীয়তা ও বৈধতায় বিশ্বাসী। অবশ্য "জনসাধারণকে শিক্ষিত করবার" প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে ও লেখা হয়েছে এবং শিক্ষা-বিস্তার নিয়ে গর্বও করা হয়েছে: কিন্তু কার্যত শ্রমজীবী জনগণকে খণ্ডিত করা হয়েছে এবং জাতি, বর্ণ ও ধর্মের বৈষম্যবোধে তাদের আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছে। যে অমানুষিক ঔপনিবেশিক নীতি মুনাফার উন্মত্ত লোভকে, দোকানদারের মূঢ় লালসাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সুযোগ দিয়ে থাকে, সেই নীতির সাফাই দেবার জন্যে এই মতবাদকে ব্যবহার করা হয়েছে। বুর্জোয়া বিজ্ঞান এই মতবাদকে সমর্থন করেছে। এই বিজ্ঞান এতদূর নীচে নেমেছে যে, সে একথা পর্যন্ত ঘোষণা করতে দ্বিধা করে নি যে, অন্যান্য জাতির প্রতি আর্যজাতির নৈতি-মনোভাব "সমগ্র জাতির পরা-প্রাকৃতিক কর্মতৎপরতা থেকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়েছে" অথচ এ সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান যে "সমগ্র জাতি" যদি কৃষ্ণাঙ্গ বা সেমিটিক জাতিদের প্রতি গর্হিত পাশবিক বৈরিতার সংক্রমণে দূষিত হয়ে থাকে, তাহলে সে সংক্রমণ বুর্জোয়া শ্রেণী বন্দুক তরোয়ালের জোরে শারীরিকভাবেই জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখানে যদি স্মরণ করি যে, খৃষ্টান চার্চ এই আচরণকে ঈশ্বরের প্রেমময় পুত্রের দুঃখ-ভোগের প্রতীকে পরিণত করেছে, তাহলে এই ব্যাপারটার পরিহাস কঠোরভাবে এবং নারকারজনকভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, "ঈশ্বরের পুত্র" যীশু খৃষ্ট খৃষ্টান ধর্মসাহিত্যের সৃষ্ট একমাত্র "পজিটিভ চরিত্র"। যিনি সমস্ত জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, বিরোধকে খাপ খাওয়াবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, তাঁর এই টাইপ এই সাহিত্যের দুর্বল সৃজনীশক্তিরই একটা বিশেষ রকম জ্বলন্ত প্রমাণ।

বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল আবিষ্কারের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায়, যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী টেক্‌নিক্যাল সংস্কৃতির বিকাশে পর্যন্ত বাধা দিয়েছে। এ সব ঘটনাগুলো খুবই পরিচিত। এই বাধাদানের কারণও সুপরিচিত—সেটা হচ্ছে শ্রমশক্তির সুলভতা। তর্ক উঠতে পারে,—তবুও তো টেক্‌নিক অনেক উন্নতিলাভ করেছে। এ কথা অবিসংবাদিত। কিন্তু এর কারণ, টেক্‌নিক আপনা থেকেই যেন আরো উন্নতির সম্ভাবনা ও প্রয়োজনকে নিয়ে আসে এবং সেই দিকে মানুষকে চালায়।

আমি একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করব না যে, বুর্জোয়া শ্রেণী তার সময়কালে—যেমন, সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে—একটা বৈপ্লবিক শক্তি ছিল এবং বৈষয়িক সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করেছে; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সে সর্বত্র শ্রমজীবী জনগণের মর্মগত স্বার্থ ও শক্তিকে বলি দিয়েছে। যাই হোক্, ফুলটনের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা তাদের জয়ের পরও বাণিজ্য বিস্তারে ও আত্মরক্ষায় বাষ্পীয় জলপোতের গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে নি। বুর্জোয়াদের রক্ষণশীলতা প্রমাণের ঘটনা এ ছাড়া আরো আছে। এই রক্ষণশীলতার মধ্যে লুকনো ছিল পৃথিবীর উপর তার শক্তি দৃঢ়তর ও সুরক্ষিত করবার জন্যে বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎকণ্ঠা। এই রক্ষণশীলতাই শ্রমজীবী জনগণের মানসিক বিকাশের পথে সব রকম প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছে। তবুও এ থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হল—প্রোলেটেরিয়াট (নিঃসম্বল শ্রমজীবী শ্রেণী) এবং এই প্রোলেটেরিয়াট ইতিমধ্যেই একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে, যেখানে জনগণের মানসিক বিকাশ বাধাহীন। শুধু একটা ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী টেক্‌নিক্যাল উদ্ভাবনকে সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেছে—সে হচ্ছে মানবসংহারের অস্ত্র-উৎপাদন। আমার মনে হয়, কেউ এ পর্যন্ত লক্ষ্য করে নি, ধাতু-শিল্পের উন্নতির ধারায় বুর্জোয়াদের আত্মরক্ষার অস্ত্র উৎপাদনের প্রভাব কতখানি।

হাত মাথাকে শেখায়, তারপর মাথা বিজ্ঞ হয়ে হাতকে শেখায়, আবার বিজ্ঞ হাত আরো ভালোভাবে মনকে বিকশিত করে : শুধু এই রকমই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি স্বাভাবিকভাবে এগুতে পারে। প্রাচীনকালে শ্রমজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যেসব কারণে ব্যাহত হয়েছে তা আপনারা জানেন। মাথা হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে ভাবতে লাগল মাটি থেকে। কর্মঠ জনগণের মধ্যে দেখা দিল কল্পনাশ্রয়ী স্বপ্নবিলাসীরা। মানুষের লক্ষ্য ও স্বার্থ অনুসারে যে শ্রম-প্রক্রিয়া পৃথিবীকে বদলে দেয় তা থেকে স্বতন্ত্র করে তারা জগৎকে ও চিন্তার বিকাশকে বস্তুনিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল। তাদের কাজ সম্ভবত প্রথমে ছিল শ্রমের অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করা; তারা ছিল ঠিক সেই রকম সব "যশস্বী লোক", সেই রকম শ্রম-বীর যাদের আমরা আমাদের কালে আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি। তারপর এই সব লোকের মধ্যে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গলের উৎস দেখা দিল—বহুর উপরে ক্ষমতা খাটাবার জন্যে একজনের প্রলোভন, অন্য লোকদের শ্রমে আয়েসী জীবন যাপনের কামনা এবং নিজের ব্যক্তিগত শক্তি সম্বন্ধে একটা দুষ্ট অতিরঞ্জিত ধারণা। এই ধারণা মূলত লালিত হয়েছিল ব্যক্তিগত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা স্বীকৃত হওয়ার ফলে, যদিও সেসব ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ছিল শ্রমজীবী সমষ্টি অর্থাৎ গোষ্ঠী বা উপজাতির শ্রমকীর্তির সংকেন্দ্রন (concentration) বা প্রতিফলন। সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতারা চিন্তা থেকে শ্রমের বিচ্ছেদ সমস্ত আদিম মানুষের মধ্যে আরোপ করেছেন, আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের উৎপত্তিও তাদের একটা সুস্পষ্ট কীর্তি বলে ধরেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ চমৎকার প্রাঞ্জল ও বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লোকগাথা অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের অলিখিত রচনাই সব চেয়ে গভীর, জীবন্ত ও আর্টের দিক থেকে নিখুঁত নায়ক চরিত্র সৃষ্টি করেছে। হার্কিউলিস; প্রোমিথিয়ুস; মিকুলা; সেলিয়ানিনোভিচ; স্ভয়াটোগো; ডাঃ ফাউস্টাস; বিজ্ঞ ভাসিলিসা; অদ্ভুত বিড়ম্বনায় ভাগ্যবান সরল আইভান; আর পেত্রুশকা, যে ডাক্তার, পুরোহিত, পুলিস, শয়তান, পরিশেষে মৃত্যুকেও হার মানাল—এইসব মূর্তি নিখুঁত, এদের সৃজনে যুক্তি ও স্বজ্ঞা (intuition), চিন্তা ও অনুভূতির অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে। এরকম সমন্বয় শুধু সম্ভব হতে পারে তখন যখন সৃষ্টিকর্তা প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব অবস্থা সৃষ্টির কাজে, জীবনকে নতুনভাবে বিকশিত করবার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

এ কথা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন যে, লোকগাথায় নৈরাশ্যবাদের স্পর্শ একেবারে নেই, যদিও লোকগাথার স্রষ্টারা কঠোর জীবনযাপন করত। তাদের কঠোর দাস-বৃত্তিকে শোষকেরা একেবারে অর্থহীন করে দিত, ব্যক্তিগত জীবনে কোনো রাষ্ট্রিক অধিকার তাদের ছিল না, আত্মরক্ষার উপায়ও তাদের ছিল না। এসব সত্ত্বেও সমষ্টি-মানুষের মনে তার নিজের অমরতা ও সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির উপর তার জয়লাভের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে একটা চেতনা ছিল। লোকগাথার নায়ক "বোকা",—যাকে তার বাবা ও ভাইরা পর্যন্ত হেনস্থা করেছে,—বরাবরই তাদের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে, বরাবরই জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে, ঠিক যেমন হয়েছে "বিজ্ঞ ভাসিলিসা।"

লোকগাথায় যদি কখনো কখনো হতাশার এবং পার্থিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের সুর শোনা যায়, তাহলে পরিষ্কারভাবে ধরা যায়, তার পেছনে রয়েছে খৃষ্টান চার্চের প্রভাব বা মধ্যবিত্তের অজ্ঞ সংশয়বাদ। খৃষ্টান চার্চ দুই হাজার বছর ধরে নৈরাশ্যবাদ প্রচার করেছে। আর পরজীবী মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব পড়ে থাকে ধনিকের হাতুড়ি ও শ্রমজীবীর নেহাইয়ের মধ্যে। আমরা যখন শ্রমকীর্তির উপর প্রতিষ্ঠিত লোকগাথার phantasyকে (উদ্ভাবনা) ধর্মসাহিত্যের ভোঁতা জাঁকালো phantasyর সঙ্গে এবং রোম্যান্সের অক্ষম phantasyর সঙ্গে তুলনা করি, তখন লোকগাথার তাৎপর্য উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

মহাকাব্য এবং রোম্যান্স সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি; তাদের নায়ক হচ্ছে বিজয়ী। সামন্ততান্ত্রিক

সাহিত্যের প্রভাব যে কখনো বড় বেশী কিছু হয় নি তা সকলেই জানে।

বুর্জোয়া সাহিত্য আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীনকালে, মিশরের "চোরের গল্প"-এ তার সূত্রপাত। গ্রীক ও রোমানরা তাকে টেনে নিয়ে চলে। আবার নাইটতন্ত্রের ক্ষয়ের যুগে তার আবির্ভাব হয় এবং রোম্যান্সের স্থান সে গ্রহণ করে। এটা খাঁটি বুর্জোয়া সাহিত্য এবং এর প্রধান নায়ক হচ্ছে দুর্বৃত্ত, চোর, পরে গোয়েন্দা, তারপর আবার চোর—এবার "ভদ্রলোক তস্কর"।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৃষ্ট টিল অয়লেনশ্‌-পীগেল-এর চরিত্র, সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট সিম্‌প্লিসিসিমাস-এর চরিত্র, লাজারিল্লো দা তোর্মে ও জিল ব্লা এবং স্মোলেট ও ফীল্ডিং-এর নায়করা থেকে আরম্ভ করে' মোপাসাঁর "প্রিয় বন্ধু", আর্সেন লুপ্যাঁ এবং আধুনিক ইওরোপের "ডিটেকটিভ" সাহিত্যের নায়করা পর্যন্ত আমরা হাজার হাজার বই পাই যেগুলোর নায়করা হচ্ছে বদমাশ, চোর, খুনে ও গোয়েন্দা পুলিসের চর। এই হচ্ছে খাঁটি বুর্জোয়া সাহিত্য, যার মধ্যে তার পাঠকদের আসল রুচি, স্বার্থ ও বাস্তব "চারিত্রিক নীতি" অতি জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সাহিত্যের জমি সব রকম ইতরতার—তার মধ্যে মধ্যবিত্তের "কান্ডজ্ঞান" (common sense) অন্যতম—সার দিয়ে উর্বর করা হয়েছে এবং এই জমির উপর অঙ্কুরিত হয়েছে "সাঙ্কো পাঞ্জা", ডি কোস্টার-এর "টিল অয়লেনশ্‌পীগেল" ও আরো অনেক সমপর্যায়ের বিশিষ্ট সর্বজনীন চরিত্র। অপরাধের চিত্রণে বুর্জোয়াদের গভীর শ্রেণীগত আগ্রহের একটা পরিচয় পাওয়া যায় পঁস' দু তেরাই-এর জীবনে। এই লেখক যখন বহু খণ্ড বই লিখে অবশেষে তাঁর নায়ক রোকাঁবোল-এর মৃত্যু ঘটিয়ে তার কাহিনী শেষ করলেন, তখন পাঠকরা এক মিছিল করে' লেখকের ঘরের সামনে এসে দাবী জানাল যে, তাঁর উপন্যাসকে আরো চালাতে হবে। ইওরোপের কোনো বড় লেখকের কপালে এ রকম সাফল্য জোটে নি। পাঠকরা "রোকাঁবোল" উপন্যাসের আরো কয়েক খণ্ড পেল। নায়ক রোকাঁবোলকে নৈতিক ও শারীরিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হল। এ দৃষ্টান্তটা স্থূল; কিন্তু সমস্ত বুর্জোয়া সাহিত্যে এর বহু প্রতিরূপ আছে—ঠগ ও ডাকাত কিভাবে ভালো বুর্জোয়ায় পরিণত হয় তারই আখ্যান। বুর্জোয়ারা চোরের দক্ষতা, খুনীর চাতুর্য আর ডিটেকটিভের বিচক্ষণতার কথা সমান পরিতৃপ্তির সঙ্গে পড়তে থাকল। আজও পর্যন্ত ইওরোপে সুখাদ্যপুষ্ট লোকদের মানসিক খাদ্য হচ্ছে ডিটেকটিভ উপন্যাস। উপরন্তু, অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে' এই ধরণের সাহিত্য শ্রেণী-চৈতন্য বিকাশে বাধা দিয়েছে ও দিচ্ছে। এই সাহিত্য সুদক্ষ চোরের প্রতি সহানুভূতি জাগায়, চুরি করবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে, বুর্জোয়া সম্পত্তির বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক বিচ্ছিন্ন মানুষের গরিলা যুদ্ধ চালাবার ইচ্ছা জোগায়, এবং শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের কি সামান্য মূল্য বুর্জোয়ারা দিয়ে থাকে তাই বিশেষ করে' ফুটিয়ে তুলে এই সাহিত্য হত্যা ও মানুষের বিরুদ্ধে অন্যান্য শারীরিক অপরাধকে বাড়িয়ে দেয়। অপরাধ বিষয়ক উপন্যাসের উপর ইওরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর অনুরাগ যে কত ঐকান্তিক তা সমর্থিত হয় এই ধরণের উপন্যাসের অফুরন্ত লেখকের সংখ্যা থেকে এবং তাদের বই-এর বহুল প্রচার থেকে। (ক্রমশ)

২৬

সহসা একজন সদ্যপরিচিত যুবকের নিকট একাকী হইয়া, এবং তাহার পরিচর্যার অনন্য ও অখণ্ড ভার পাইয়া বসুধা প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। সুবিমলকে সে অবনীশ—অর্থাৎ, বিনয়ের বন্ধু এবং সুলেখার স্বামী বলিয়া জানে, এ কথা সত্য; তথাপি একজন অনাত্মীয় যুবা পুরুষের সামীপ্য একজন তরুণী নারীর চিত্তে স্বভাবত যে বিমূঢ়তার সৃষ্টি করে, মুহূর্তের জন্য বসুধা সেই বিমূঢ়তার দ্বারা আক্রান্ত হইল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই কর্তব্যবুদ্ধির সাহায্যে নিজ দুর্বলতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সে সুবিমলকে ভিতরে লইয়া গিয়া বসিবার ঘরে বসাইল; এবং উপস্থিত সুবিমল শুধু মুখ-হাত ধুইয়া চা পান করিবে,—না, একেবারে স্নান পর্যন্ত সারিয়া লইবে, জিজ্ঞাসা করিল।

সুবিমল বলিল, "দোহাই মিস্ বোস, অতিরিক্ত সেবা ক'রে যদি দুর্নাম কিনতে না চান তা হ'লে এই দারুণ শীতে এখন আমাকে স্নান করিয়ে নির্যাতিত করবেন না!"

মৃদু হাসিয়া বসুধা বলিল, "বেশ ত, এখন তা হ'লে শুধু মুখ-হাত ধুয়ে চা খান। চলুন, আপনাকে কল-ঘর দেখিয়ে দিই।" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

হস্ত-সঙ্কেতে বসুধাকে নিরস্ত করিয়া সুবিমল বলিল, "ও-দুটি কার্যই আমি গাড়িতে সেরে এসেছি মিস্ বোস, সুতরাং ও বিষয়ে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি ত' জানেন বিনয় এখনি আমাকে ব'লে গেল, যখন যা দরকার হবে আপনার কাছে চেয়ে চিন্তে নিতে। তবে আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?"

বসুধার মুখে সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল; মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু আপনি কি তা সত্যি সত্যিই নেবেন?"

সুবিমল বলিল, "নিশ্চয় নোবো।" তাহার পর চাহিয়া দেখিল, দিনান্তের ক্ষীণ রক্তরাগের ন্যায় বসুধার অধর প্রান্তে। সুমধুর হাস্যের বিলীয়মান রশ্মিটুকু তখনো লাগিয়া আছে। সহসা সেই অপরূপ রশ্মির স্পর্শ লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব কামনার আলোকে সুবিমলের সমস্ত মন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল, অপূর্ব রূপ-রসে ভরা কামনা-ফলের বীজ বপন যদি করিতেই হয় ত' এই তাহার শুভক্ষণ; মুহূর্তের জন্য আলস্য অথবা অবহেলা করিলে চলিবে না। সুযোগ যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ;—ঘটনাক্রমে, বিনয়ের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র বসুধাকে সে একেবারে একান্তে পাইয়াছে। এই সুসময় যে প্রসন্ন ভাগ্যবিধাতার দান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার আয়ু অনিশ্চিত; যে-কোনো মুহূর্তে বিনয় এবং লতিকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহাকে খণ্ডিত করিতে পারে।

মনে পড়িল, সেই চিরাগত কবি-বাণী, 'ভালবাসায় এবং যুদ্ধে কিছুই অসঙ্গত নহে।' সুতরাং অভিনয়ও নিশ্চয় নহে। তখন বসুধাকে অধিকার করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সুবিমল নির্মমভাবে তাহার জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। সহাস্যমুখে বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন মিস্ বোস, আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। ভবিষ্যতে যখন প্রয়োজনের সময় আসবে তখন হয় ত' আপনার কাছে এমন প্রচণ্ডভাবে চাইতে আরম্ভ করব যে, দিতে দিতে আপনি হাঁপিয়ে উঠবেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বসুধা ভাবিয়া অবাক হইল, কী সে এমন অপূর্ব পদার্থ, যাহা সুবিমল তাহার নিকট হইতে প্রচণ্ডভাবে চাহিতে পারে, এবং যাহা দিতে দিতে তাহাকে হাঁপাইয়া উঠিতে হইবে! চা কি? কিন্তু কয় পেয়ালাই বা চা সুবিমল সমস্ত দিনে পান করিতে পারে? বড় জোর দশ পেয়ালাই ধরা যাক্। দশ পেয়ালা চা যোগাইতে তাহাকে হাঁপাইতে হইবে কেন? তবে কি খাবার? কিন্তু খাবার ত' ঠাসিয়া ঠাসিয়া বসুধা সুবিমলকে এত খাওয়াইতে পারে যে, অবশেষে সুবিমলকেই হাঁপাইতে না হয়! তাহা হইলে গান নহে ত? বসুধা মনে মনে ভাবিল গান অবশ্য এমন একটা জিনিস, যাহার অত্যধিক চাহিদায় হাঁপাইতে হইতে পারে। কিন্তু বসুধা যে গান গাহিতে পারে, তাহা সুবিমল ইহারই মধ্যে জানিল কেমন করিয়া?

কিছুই সুনিশ্চিতভাবে বুঝা যায় না, অথচ সুবিমলের কথার উত্তরে যা-হয় একটা-কিছু না বলিলেও ভাল দেখায় না। হঠাৎ মনে পড়িল, সুবিমলের নিকট হইতে বট্যানি বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা; উৎসাহিত হইয়া বসুধা বলিল, "ভবিষ্যতে আমিও ত' আপনার কাছে কিছু চাইতে পারি।"

আনন্দোৎফুল্ল মুখে সুবিমল বলিল, "সে সৌভাগ্য যদি কখনো হয় তা হ'লে আপনার কাছে কৃতজ্ঞই হব মিস্ বোস। কিন্তু আমার কাছে আপনার চাইবার মতো এমন কী থাকতে পারে তা' ত, জানিনে!"

বসুধার একবার ইচ্ছা হইল বলে, বট্যানি বিষয়ে গোটা পাঁচ ছয় পাঠ। কিন্তু সুবিমলের অদ্ভুত ভাষার এমন বিচিত্র ভঙ্গি যে, তাহার সম্পর্কে বট্যানির মত স্থূল জিনিসের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হইল না। অথচ, বিনয়ের বন্ধু এবং সুলেখার স্বামীর মতো একজন মুরুব্বি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির কথার মধ্যে বট্যানি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোন জিনিসের কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তখন এই দান-প্রতিদান-আদান-প্রদান-কণ্টকিত সমস্যামূলক প্রসঙ্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসুধা ডাকিল, 'ডক্টর মিত্র!'

অনভ্যস্ত নামের অতর্কিত সম্বোধনে চমকিত হইয়া সুবিমল বলিল, "ও! আচ্ছা! কি বলুন মিস্ বোস!"

বসুধা বলিল, "ভবিষ্যতের কথা ত' পরে হবে। কিন্তু

উপস্থিত এখন যদি আপনি আমার হাত থেকে কোনো সেবাই গ্রহণ না করেন, তা হ'লে বাড়ি ফিরে এসে দাদা মনে করবেন আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি।"

সুবিমল বলিল, "কিন্তু আমি ত' আপনার কাছ থেকে যথেষ্ট মূল্যবান জিনিস পাচ্ছি মিস্ বোস।"

ভয়ে ভয়ে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কি পাচ্ছেন?"

সুবিমল বলিল, "স্বর্গসুখ।"

সর্বনাশ! ইহার উপর আর কথা কওয়া চলে না! বিমূঢ় মুখে বসুধা চুপ করিয়া রহিল।

বসুধার মানসিক সঙ্কটের অবস্থা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া সুবিমল বলিল, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস,—এ কথা আপনি বহুবার শুনেছেন। আর আপনার সঙ্গ যে সৎসঙ্গ তা আপনি বিনয় ক'রেও অস্বীকার করতে পারেন না। সুতরাং আপনি আমাকে স্বর্গসুখ দিচ্ছেন। বলুন মিস্ বোস, এ কথার যুক্তিতে কোনো ভুল আছে কি?" বলিয়া সুবিমল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তবু ভাল! রহস্য। বসুধা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মনে মনে বলিল, যুক্তিতে ভুল আছে কি-না ত হয়ত' বলতে পারিনে, কিন্তু বিবেচনায় আছে। বন্ধুর অবিবাহিতা ভগ্নীর প্রতি বিবাহিত ব্যক্তির এই সরস কবিত্বময় ভাষার প্রয়োগ, নিশ্চয় বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক। ইহাকেই বলে মশা মারিতে কামান দাগা।

বসুধা বলিল, "অন্তত একটু চা খান ডক্টর মিত্র। চা ত' সব সময়েই খাওয়া চলে।"

সুবিমল বলিল, "তা' চলে। বিশেষত কেউ যখন তার দাদাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে আনন্দের চেয়ে স্থূলে আর ভারি একটা কোনো জিনিস খাড়া করতে চায়, তখন ত' নিশ্চয়ই চলে।"

সুবিমলের কথা শুনিয়া বসুধার অধর-প্রান্তে নিঃশব্দ হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

সুবিমল বলিল, "তা হ'লে না-হয় সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গহীন শুধু তরল চা। আর কিছু নয়।"

বসুধা বলিল, "আচ্ছা, তা-ই ব'লে দিচ্ছি।" বলিয়া উঠিয়া গিয়া চায়ের জন্য আদেশ দিয়া আসিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চা আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরিচারক চা প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যত হইলে বসুধা তাহাকে বিদায় দিয়া স্বয়ং চা করিতে আরম্ভ করিল।

সুবিমল বলিল, "ও কি মিস্ বোস? এক পেয়ালা চা করছেন কেন? আপনার চা কই?"

বসুধা বলিল, "আমি একটু আগে চা খেয়েছি।"

সুবিমল বলিল, "কিন্তু চা ত' সব সময়েই খাওয়া চলে মিস্ বোস!"

সুবিমলের কথায় বসুধা এবং সুবিমল উভয়েই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

অপর একটা পেয়ালায় বসুধা টি-পট হইতে চা ঢালিতে উদ্যত হইল। সুবিমল কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া পেয়ালাটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বসুধার হাত হইতে টি-পটটা লইয়া বলিল, "আপনার চা আমি ক'রে দিচ্ছি। দেখি, কার তৈরী চা ভাল হয়। আপনি যদি এ পেয়ালা শেষ ক'রে আর এক পেয়ালা চা-র জন্যে আমার সামনে আপনার পেয়ালা এগিয়ে দেন, তা হ'লে বুঝব আমার তৈরি চা-ই ভাল হয়েছে।"

মাথা নাড়িয়া সহাস্যমুখে বসুধা বলিল, "না, না, আপনার তৈরী চা ভাল হবে না; আমার তৈরি-ই ভাল হবে।" বলিয়া সুবিমলের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা স্থাপন করিল।

চা খাইতে খাইতে সুবিমল বলিল, "এলাহাবাদ ষ্টেশন থেকেই পাটনায় ফিরে যাচ্ছিলাম মিস্ বোস।"

সাগ্রহে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন ত?" পরক্ষণেই সুলেখার কথা স্মরণ করিয়া বলিল, "সুলেখা দিদি এলাহাবাদে নেই শুনে বুঝি?"

সুবিমল বলিল, "তা বলতে পারিনে;—তবে এখন দেখছি, ফিরে গেলে ভারি ভুল করতাম।"

সুবিমলের এই উক্তির মধ্যে একটা রহস্যের অস্তিত্ব আশঙ্কা করিয়া ঈষৎ ভয়ে ভয়ে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুবিমলের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "যে শহরে কোনো একজন লোক আমার আসবার প্রতীক্ষায় প্রত্যহ দিন গুনছে, সে শহর কি সহজে ছেড়ে যেতে আছে?"

সুবিমলের কথা শুনিয়া প্রথমটা বসুধার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু প্রসঙ্গটাকে সহজ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে পরক্ষণেই সে বলিল, "কিন্তু কি জন্যে দিন গুনছে, তা শুনলে আপনি হয়ত' পাটনায় ফিরেই যেতেন।"

সুবিমল বলিল, "ভুল মিস বোস, ভুল। পুলিশে ধরিয়ে দেবে ব'লে কেউ আমার আসবার দিন গুনছে শুনলেও বোধ হয় আমি ফিরে যেতাম না। আজকালকার এই ঔদাসীন্যের যুগে, কে কার জন্যে দিন গোনে বলুন ত? কিন্তু সে কথা যাক,—আপনি আমার জন্যে কি কারণে দিন গুনছিলেন জানবার জন্যে তখন থেকে মনের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ লেগে রয়েছে। বলতে যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তা হ'লে —" বাকি কথাটুকু শেষ না করিয়া সুবিমল উত্তরের আশায় বসুধার মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বসুধা বলিল, "না, না, আপত্তির কিছুই নেই। দাদার মুখে শুনলেন ত' এবার আমি আই-এস্-সি পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছি। বট্যানিতে আমি বেশ একটু কাঁচা। আপনি বট্যানির এত বড় একজন পণ্ডিত আসছেন শুনে মতলব ক'রে রেখেছি বট্যানির জায়গায় জায়গায় আপনার কাছ থেকে একটু বুঝেসুঝে নোবো।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল।

শুনিয়া সুবিমলের প্রফুল্ল মুখের উপর দুশ্চিন্তার ঘন ছায়া দেখা দিল। সর্বনাশ! সে ফিজিক্সের অধ্যাপক,—বট্যানির বর্ণমালাও সে অবগত নহে! যে ব্যাপারকে একটি

প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত মনে করিয়া সে এতক্ষণ অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তাহার মধ্যে এত বড় কাঁটা, সে কথা কে জানিত!

মুখের বিরস ভাব যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া সুবিমল বলিল, "আপনি বট্যানিতেই কাঁচা?"

বসুধা বলিল, "বট্যানিতেই।"

"আর ফিজিক্সে?"

"ফিজিক্স একরকম তৈরী আছে।"

সুবিমল বলিল, "ওটা ভুল। ফিজিক্স ভারি গোলমেলে সাবজেক্ট—মনে হয় তৈরী হয়েছি, অথচ তৈরী হইনি, মনে হয় বুঝেছি, অথচ বুঝিনি। বট্যানি ত' সহজ সরল সাদা-সিধে। গাধার মত বই মুখস্থ ক'রে গেলেই হ'ল। ফিজিক্স কঠিন, দুর্বোধ্য, প্যাঁচালো।"

বসুধা বলিল, "কিন্তু আপনি ত' ডক্টরেট পেয়েছেন বট্যানিতে?"

ফিজিক্সে ডক্টরেট অর্জন না করার জন্য মনে মনে অবনীশকে অভিসম্পাত দিয়া সুবিমল বলিল, "হ'লেই বা। বি এস্-সিতে আমার ফিজিক্সে অনার্স ছিল।"

"সে ত' অনেক দিনের কথা।"

সুবিমল বলিল, "কি আশ্চর্য! আপনি কি মনে করেন বট্যানির বনবাদাড়ে ঢুকে আমি ফিজিক্সের সমস্ত কথা ভুলে গেছি? ফিজিক্স হচ্ছে আমার অন্তরের সাবজেক্ট, আর বট্যানি বুদ্ধির।" মনে মনে বলিল, দুর্বুদ্ধির।

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে সুবিমলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বসুধা বলিল, "কিন্তু ডক্টর মিত্র, গোল আলু modified stem কেন, আর রাঙা আলু modified root কেন,—এ আমি একেবারেই বুঝতে পারি নে।"

সুবিমল বলিল, "কেন? ও কথা না বোঝবার কারণ আছে কি? ও ত' এক কথায় বোঝানো যায়।" পর মুহূর্তেই নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল, "ও ত' একবার পাতা উল্টে দেখলেই বোঝা যায়; কিন্তু একটা Magnetic field-এ Lines of Forces-এর গতিবিধি কি রকম, তা ঠিক বোঝেন কি?"

বসুধা বুঝিতে পারিল, 'বুঝিনে' বলিলেই সুবিমলকে সন্তুষ্ট করা হয়; তথাপি ভয়ে ভয়ে বলিল, "ওটা বরং কতকটা বুঝি।"

সুবিমল বলিল, "কতকটা বোঝেন? সম্পূর্ণ বোঝেন না?"

"না, সম্পূর্ণ বুঝি, কি ক'রে বলতে পারি।"

"সম্পূর্ণ বুঝতে হবে। আপনার কোন্ ইউনিভারসিটি?"

"ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি।"

জোরের সহিত সুবিমল বলিল, "তা হ'লে আপনাকে Magnetic field-এর চ্যাপ্টারটা খুব ভাল ক'রে প'ড়ে নিতে হবে। অনেক দিন ও থেকে প্রশ্ন পড়ে নি; এবার পড়বার খুব বেশী রকম সম্ভাবনা। ভাল ক'রে বোঝা থাকলে একেবারে নির্ঘাৎ দশ নম্বর।"

বসুধা বলিল, "আচ্ছা, তা না-হয় বুঝে নোবো; কিন্তু করোলার functionটা আপনি যদি একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন তা হ'লে আমার ভারি উপকার হয়।"

শুনিয়া সুবিমলের চক্ষু স্থির হইল! গোল আলু, রাঙা আলু, stem, root,—এ সকল কথা তবু একরকম বুঝা গিয়াছিল; কিন্তু Corolla যে কী বস্তু,—গাছ, না গুঁড়ি, পাতা, না ছাল,—তাহা একেবারে অবিদিত। ব্যগ্রোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "এখনি বুঝে নিতে চান না কি?—এই এক্ষণি?"

কুণ্ঠিত স্বরে বসুধা বলিল, "না, না, এক্ষণি নয়। সুবিধা মত কোনো সময়ে কোনো দিন।"

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া সুবিমল বলিল, "আচ্ছা, তা না-হয় বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে Epi-diascope-এর workingটা ভাল ক'রে বুঝে নেওয়া দরকার।"

ভয়ে ভয়ে বসুধা বলিল, "আর Nitrogen Assimilation?"

সুবিমলের ললাটে পুনরায় চিন্তার রেখা দেখা দিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিপদের পরিত্রাতারূপে সগর্জনে বাহিরে মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া প'ড়িয়া সুবিমল বলিল, "ঐ বিনয়রা ফিরে এল।"

বসুধা বলিল, "খুব শীঘ্র ফিরেছেন ত'!"

সুবিমল বলিল, "না,—বেশ দেরি হয়েছে।"

উভয়ে ত্বরিৎ পদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল।

(ক্রমশ)

নব্য-বিজ্ঞান

(৫০০ পৃষ্ঠার পর)

বাদ কিছুমাত্র কার্যকরী হইল না। আলোকরশ্মি ও তাপ-রশ্মি হইতে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রকৃতির আদৌ পূর্ণ পরিচয় নয়। তরঙ্গনীতির সাহায্যে ইহাদিগকে বুঝিবার চেষ্টা হইল। ঠিক এই সময়ই বার্লিনের বিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাকস প্লাঙ্ক তাপতরঙ্গ সম্পর্কে এক দুঃসাহসিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করিলেন। নূতন এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে পূর্বেকার যান্ত্রিক ব্যাখ্যার মূলে কুঠারাঘাত করিল। কেবল তাহাই নয়। এই মতবাদ সম্পূর্ণ নূতন এক চিন্তাধারা প্রবর্তন করিল। নব্য-বিজ্ঞান এই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বারান্তরে প্লাঙ্ক মতবাদ কি তাহার আলোচনা করিব।

কেশবচন্দ্র সেন ও স্ত্রী শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে সকল মহাপুরুষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এদেশের সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কার্য করিয়া গিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত সমুদয় বিষয় অতি সুনিপুণভাবে প্রীতিভাজন বন্ধুবর শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীতে ও বিবিধ মাসিকপত্র, বিশেষত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিয়া শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক আদেশ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উক্ত আদেশপত্রের ৫৭ ও ৮৩ অনুচ্ছেদে ডিরেক্টার সভা বালিকা বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিবার আদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। সে সময়ে গভর্নমেণ্ট মনে করিতেন যে, স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিলে দেশ মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক আদেশ প্রচারিত হইবার পর কিভাবে বাঙলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হইতে থাকে —সে ইতিহাস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিব না; সংক্ষেপে দুই একটি কথা মাত্র বলিব।

"বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্বে কলিকাতায় যে কয়েকটি বালিকা পাঠশালা ছিল, সে সমুদয়ই মিশনারিদিগের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইতে থাকে। সে সময়ে হিন্দুসমাজ স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী হইলেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা উহার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা দুই কারণে আপন আপন বালিকাদিগকে ঐ সকল পাঠ-শালায় পাঠাইতেন না। পাঠশালাগুলিতে অতি নিম্ন শ্রেণীর বালিকাদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল এবং সমস্ত পাঠশালাতেই খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে কিছু না কিছু উপদেশ দেওয়া হইত। এই কারণে স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থনকারীদিগের মধ্যে অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, কেবল ভদ্রপরিবারের বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত খৃষ্টান মিশনারিদের সংস্রববিবর্জিত কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন চেষ্টা সফল হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই মহাত্মা বেথুন গভর্নমেণ্টের কোন প্রকার সাহায্য না লইয়া কলিকাতায় একটি বালিকা পাঠশালা স্থাপনকার্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালে ৭ই মে তারিখে পরবর্তীকালে তাঁহার নামে আখ্যাত বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার এদেশে প্রবাসকাল পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিচালনের সমস্ত ব্যয় তিনি নিজেই বহন করিতে স্বীকার করেন। কার্যতও তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ১৮৫১ সালে ১১ই আগস্ট তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করিতে থাকেন। প্রথমত ১১ জন ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়; কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী দলের চক্রান্তে ছাত্রীদের মধ্যে কিছুদিন কেবল ৩।৪ জন মাত্র উপস্থিত হইতে থাকে। বহু চেষ্টায় ছাত্রীসংখ্যা আবার বৃদ্ধি হয় এবং লেডি ডালহৌসীর পরিদর্শনের দিবস ৩১ জনের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রী উপস্থিত থাকে।"

"বিদ্যালয় স্থাপনের কয়েক মাস পরে (১৮৪৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে) বেথুন সাহেব উহার অবস্থা এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি বিধান পক্ষে গভর্নমেণ্টের যে নীতি অবলম্বন করা তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তদ্বিষয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সময় পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা সমিতির সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিবার কারণ পত্রের প্রারম্ভেই উল্লিখিত হয়। দেশের অধিকাংশ লোক প্রথমত যেরূপ বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করে, তাহা বিবেচনায় নূতন প্রতিষ্ঠিত বালিকা পাঠশালার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ ছিল। এ অবস্থায় গভর্নমেণ্টের কোন প্রকার অপযশ না হয়, এই কারণেই শিক্ষা সমিতি এবং উহার সভাপতিস্বরূপ তিনি নিজেও গভর্ন-মেণ্টের সাহায্যে বা তত্ত্বাবধানে কলিকাতায়, উত্তরপাড়ায় কিম্বা অন্য কোন স্থানে বালিকা পাঠশালা স্থাপন সমীচীন বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু কলিকাতার এবং স্থানীয় লোকের চেষ্টায় ও অর্থে প্রতিষ্ঠিত বারাসত, সুখসাগর ও ছোট জাগুলিয়া—এই কয়েকটি স্থানে পাঠশালায় ক্রমোন্নতি দেখিয়া তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মে যে, মফঃস্বলে গভর্নমেণ্টের সাহায্যে ঐ প্রকার পাঠশালা স্থাপন করিবার পক্ষে আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই নিমিত্ত তিনি গভর্নর বাহাদুরকে অনুরোধ করেন যে, অতঃপর স্ত্রী-শিক্ষা বিধান জন্য উৎসাহ ও আবশ্যক হইলে সাহায্য দান এবং উহার তত্ত্বাবধান যাহাতে শিক্ষা সমিতির অন্যতম কর্তব্য বিষয় স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, তৎপক্ষে আদেশ প্রদান করা হয় এবং সকাউন্সিল গভর্নর জেনারেল যদি ইহা সমীচীন বিবেচনা করেন, তবে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে এই মর্মে আদেশ দেওয়া হউক যে, তাঁহারা বালিকা-শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় লোককে সকল প্রকারে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সর্বত্র ইহাও প্রচার করেন যে, লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে বালিকা পাঠশালা স্থাপন যদিও গভর্নমেণ্টের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট উক্ত শিক্ষা প্রচলনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। পত্রের উপসংহারে মহাত্মা বেথুন এই প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বিদ্যালয় যাহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে আখ্যাত হয়, মাননীয় ডিরেক্টর সভাকে গভর্নর জেনারেল বাহাদুর তজ্জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।"

বেথুন সাহেবের আশংকা ছিল, কলিকাতার অধিবাসীরা এই বিদ্যালয়ের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না। তাহা যে অমূলক নহে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝা যাইবে। কেননা পঁচিশ বৎসরের মধ্যেও উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বেথুন স্কুল সম্পর্কে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট, ১লা ভাদ্র, শুক্রবার, সন ১২৮৫ সালের মাসিক পত্রিকা "পরিচারিকা" পত্রে প্রকাশিত একখানি ইংরাজী পত্র হইতেই অনেক কথা জানা যাইবে।

The Bethune Girl's School

Our rulers seem willing to help female education. But we ourselves, that is our countrymen, do not seem to be so willing. There is the Bethune School, established more than quarter of a century, in the chief city of the Empire, in the midst of the very best of **Native Society**, and it has not flourished. **A sufficient number** of people will not send their girls there. At Dacca also there are girls' schools, but they also have not been as liberally encouraged by the people as might be wished. With a vew to give further encouragement, Government is trying to combine private female schools with their own. The **Banga Mahila Vidyalay,** a well conducted

school, under enlightened Native gentlemen, has been attracted and absorbed by the Bethune School Committee, and the two schools will now be one. This will be very good if the principles on which the two schools have been hitherto conducted are equally respected and find room of their exercise. The Banga Mahila and the Bethune are two very different institutions, and their objects, though in the main one, are carried out in very different ways. The former is a social as well as educational school. The habits, the manners, the tastes, the character of the pupils are meant to be formed and reformed by the Banga Mahila Vidyalaya, along with simple popular education. We think the practice of daily prayer is enjoined upon them. Whereas in the Bethune School there is no social and personal reform at all proposal in the basis of education. Nothing is done, nothing is meant so far as the habits and tastes of the girls go. The one is a school for young women the other is a school for mere children. The one is governed by an orthodox and conservative Hindu Committee. The other is governed by Brahmo and radical gentlemen. If the combination of the two schools, the differing elements that constitute them can be united and harmoniously worked, well and good. It would be a step in the direction of progress. But if otherwise, if outward union be the cause of internal disunion, and in the governing bodies there be no unanimity, the combination will lead to dissolution. Already there are signs of disagreement. In the appointment of a teacher the Committee pull one way the Brahmos pull another way, and education department in a third way. Mrs. Wheeler, the Inspectress of Schools, who is a Christian Bengali lady, has taken fancy for a Christian orphan girl, whom she takes out of the orphanage to fill up an important post in the newly amalgamated school. Of course the education authorities go with her. The quondam committee of the Banga Mahila Vidyalay don't like this arrangement at all. This is but the first difficulty, other and more serious ones will come by and by."

ইহা হইতে জানা যায় যে, সেকালে কলিকাতায় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের পল্লীতে অবস্থিত হইলেও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। সে সময়ে গোঁড়া হিন্দুসমাজের লোকেরা বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—ঐ বিদ্যালয়ও বেথুন বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছিল। এই উভয় বিদ্যালয়ের আদর্শের মধ্যে ছিল বিভিন্নতা, অর্থাৎ একটি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল—যুবতী মহিলাদের জন্য আর বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বালিকাদিগের শিক্ষা-বিধানের জন্য। একটি বিদ্যালয়ের পরিচালক ছিলেন ব্রাহ্মগণ ও উন্নতিকামী সম্প্রদায়, আর একটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণ ছিলেন গোঁড়া হিন্দুর দল। শিক্ষার বিধানও ছিল বিভিন্ন রূপ। ফলে দোটানার মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনাই ছিল বেশী। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনেও দুই দলের বিভিন্নরূপ আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক। একজন শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনে এইরূপ মতভেদ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। স্কুল ইনপেকট্রেস্ শ্রীযুক্তা হুইলার (Mrs Wheeler) একজন বাঙালী খৃষ্টান রমণী, তিনি একজন খৃষ্টান মহিলাকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের যে সদস্যগণ কমিটিতে আছেন তাঁহারা যে এইরূপ নিযুক্তির বিরুদ্ধবাদী হইবেন তাহা স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম সদস্যগণ এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন। এইরূপ নানা বাধাবিপত্তি যে স্বাভাবিক তাহা সহজেই বোধগম্য। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ সেকালের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত হইল।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে রাজধানী কলিকাতায় স্ত্রী-শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, ইহা হইতে তাহার অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়।

বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে সে সময়কার যে কয়জন স্ত্রীশিক্ষানুরাগী মহানুভব ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বাঙালী মাত্রেই জানেন বাঙলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার সম্পর্কে এই মহাপুরুষদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অর্থব্যয়, সামাজিক নিপীড়নও যে তাঁহাদিগকে সহিতে না হইয়াছিল তাহা নহে। এ সম্বন্ধে স্বর্গত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন:

"১৮৪৯ সালের ৭ই মে একদিন আর আজ এই একদিন। সেইদিনের কথা সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে শহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলের মুখে একই কথা। সর্বত্র এই আলোচনা। মদনমোহন তর্কালংকারের উপর লোকের বিশেষ আক্রোশ উপস্থিত হইল; কারণ তিনি স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন এবং এই বিদ্যালয়ে নিজের কন্যাকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, পণ্ডিতে পণ্ডিতে দেখা হইলেই—ওরে মদনা করলে কি? ওরে মদনা করলে কি? এই কথা ভিন্ন আর অন্য কথা হইত না।"

সেকালের স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাত্মা বেথুন যখন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল! রাজধানী কলিকাতার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই যখন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না, তখন মফঃস্বলের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই বোধগম্য। তবে মফঃস্বলের কোন কোন স্থানেও স্ত্রীশিক্ষানুরাগী তেজস্বী ব্যক্তিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেকথা সংক্ষেপে পরে আলোচনা করা যাইবে।

মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র সেন বাঙলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যে কিরূপ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন এবার সেকথা বলিব।

বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেকালের সংস্কারেচ্ছু যুবকেরা গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় যেমন মনোযোগী হন, তেমনি অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ সালে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া "ব্রাহ্ম বন্ধুসভা" স্থাপন করেন। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। সভা পাঠ্য-পুস্তক, নির্বাচন করিয়া দিতেন এবং মহিলাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই "বামাবোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বর্গত উমেশচন্দ্র দত্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া কয়েক বৎসর হইল মাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় মহিলাগণের উচ্চ-শিক্ষার্থ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহার সহিত স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। এ বিদ্যালয়ের কার্য কয়েক বৎসর অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার সম্পর্কে অন্যান্য সভ্যগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় কতিপয় উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া আমাদের পূর্বোক্ত "বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিদ্যালয়ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। উহা পরে বেথুন বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হয়। একথা আগেই বলিয়াছি।

কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে কিরূপ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার কিরূপ দূরদর্শিতা ছিল তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বা স্ত্রী-নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা হইতেই বুঝা যায়।

দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করিতে হইলে শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। এজন্য গভর্নমেণ্ট বেথুন স্কুলের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য ভালভাবে না চলায় উহা তুলিয়া দেওয়া হয়। এদিকে কেশবচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের কার্য যখন চলিতেছিল, সে সময়েই তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী, বুধবার 'ভারত সংস্কারক সভার' অধীনে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল, শুক্রবার ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 'নারীজাতির উন্নতি বিধায়িনী' সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এই সভায় নারীজাতির কর্তব্য, গৃহধর্ম ও সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্তব্য বিষয়ে প্রায়ই উপদেশ দিতেন। কেশবের সেই উপদেশ ও বাণী আজিও নারীজাতির শিক্ষার আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে।

আমরা ৪ঠা বৈশাখ, ১২৮০ সালের (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) 'সুলভ সমাচারে' ভারত সংস্কারক সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে স্ত্রী-নর্মাল স্কুলের বিবরণী জানিতে পারি।

'সুলভ সমাচার' পাঠে জানা যায় 'ভারত সংস্কারক সভার' সাম্বৎসরিক অধিবেশন টাউন হলে হইয়াছিল। উহাতে তিনটি বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১। ক্যালকাটা স্কুল ও শ্রমজীবীদিগের স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণ। "তাহাতে প্রায় অনেক ছোট বালক সভাতে উপস্থিত হয়। লর্ড বিশপ স্বহস্তে ছেলেদের পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন।"

"তারপর অন্যতম সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভার কার্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। পাঠ শেষ হইলে লর্ড বিশপ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ লেথব্রিজ, ডেলি নিউসের সম্পাদক মিঃ উইলসন, রেভারেণ্ড জারাডিন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে উক্ত সভার দ্বারা কি কি হিতকর কার্য হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।"

"সর্বশুদ্ধ প্রায় বার হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্ত্রী-নর্মাল স্কুলে ত্রিশজন ভদ্রবংশীয়া নারী নাম দিয়াছিলেন। তার মধ্যে গড়ে পনেরজন আন্দাজ উপস্থিত হইয়া শিক্ষা পাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর দুইটি ছাত্রী নীচের শ্রেণীতে শিক্ষা দিতেছেন। পরীক্ষকদিগের একজন ছাড়া সকলেই সন্তোষজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিভাগে 'বামাহিতৈষী' নামে একটি সভা আছে। মাসে দুইবার সেখানে জ্ঞাননীতি সামাজিক বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক রচনা পাঠ হইয়া থাকে। এই বিভাগ হইতে 'বামাবোধিনী' নাম্নী পত্রিকা প্রতি মাসে মাসে সাড়ে চারিশত সংখ্যা বাহির হয়। তাহাতে অনেক উচ্চতর বিষয় লিখিত থাকে।"

এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা ভারত সংস্কারক সভার অন্যান্য কতিপয় সাধু প্রচেষ্টার পরিচয় দিতেছি। উহা দ্বারা কেশবচন্দ্রের কর্মবৈচিত্র্যের পরিচয়ও জানা যাইবে। 'সুলভ সমাচার' বলেন—"সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধীনে ক্যালকাটা স্কুলে ৫৩৭ জন বালক ইংরেজী এণ্ট্রান্স পর্যন্ত শিক্ষা পায়। তাহাতে নীতি এবং কিছু গল্প শিক্ষাও হইয়া থাকে। বিনা মাহিনায় স্কুলে গরীব লোকেরা ৬০ জন আন্দাজ শিক্ষা পায়। শিল্প-বিভাগে কেবল ঘড়ি মেরামত বিদ্যা শেখান হইয়া থাকে। ছুতারের কাজ কেহ শিখিতে চায় না। কিন্তু তথাপি উক্ত বিভাগের সাহায্যের জন্য উহা রাখা হইয়াছে। অনেক ভাল ভাল টেবিল, আলমারী সেখানে প্রস্তুত হয়।"

"সুরাপান নিবারণী" সভা হইতে প্রতি মাসে সহস্র খণ্ড করিয়া "মদ না গরল" কাগজ বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং লেখাও খুব ভাল হইতেছে। ইংলণ্ডের সুরাপান নিবারণী সভার সঙ্গে পত্রাপত্র চলে, তাঁহারাও অনেক কাগজপত্র কেতাব পাঠাইয়া থাকেন। মদ বিক্রী বন্ধ করাইবার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট দরখাস্ত শীঘ্র যাইবে।"

"দাতব্য বিভাগ হইতে বিধবা, স্কুলের ছাত্র, অনাথ বালক, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি ঊনচল্লিশজন দুঃখীকে নিয়মিতভাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগে গতবর্ষে মোট ছয়শত টাকা ব্যয় হইয়াছে।"

"সুলভ সাহিত্য বিভাগ হইতে ২, ১৩, ৬১৯ খণ্ড সুলভ এক বৎসরে প্রচার হইয়াছে। তদ্ভিন্ন দুর্গাপূজার সময়ে "বিশেষ সুলভ" কিছু বেশী নয় হাজার বিক্রয় হইয়াছে। এই বিভাগের হিতৈষী কেহ যদি থাকেন, তবে সুলভের উন্নতির কোনও পরামর্শ দিবেন। ভারত সংস্কার সভার সভ্যগণ কিছু মনোযোগ করিলে ইহা অপেক্ষা অনেক কাজ হইতে পারিত। দুঃখের বিষয় যে, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে চাহে না। এ বৎসর সকলে উঠে পড়ে একবার ভাল করে লাগুন।"

এইবার পুনরায় স্ত্রী নর্মাল স্কুলের প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। কেশবচন্দ্রের ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় লিখিত যে সমুদয় জীবন চরিত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গভর্নমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার যে সকল পত্রবিনিময় হইয়াছিল, তাহার একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা বারান্তরে সে সমুদয় প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রাদি প্রকাশিত করিব।
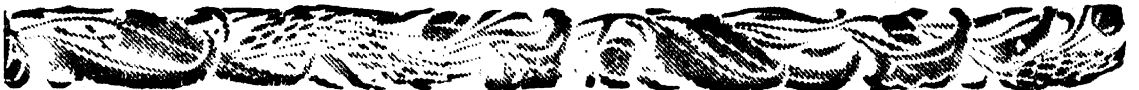
আজ-কাল

সোভিয়েট-বৃটিশ চুক্তি

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটি অতি সংক্ষিপ্তঃ দুই রাষ্ট্র পরস্পরকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবে এবং কেউ এই যুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে পৃথক্ সন্ধি করবে না। বলা বাহুল্য চুক্তিটা রাজনীতিক নয়, নিছক সামরিক। অবস্থাগতিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করে' বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনে যেন স্বস্তি নেই। প্রথমে এই চুক্তির সংবাদ দিয়ে "রয়টার" লিখ্‌লেন যে, আইনগত অর্থে এ চুক্তি দ্বারা মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মিঃ চার্চিলকে আবার এ ব্যাখ্যা খণ্ডন করতে হ'ল। তিনি কমন্স সভায় জানালেন যে, এই চুক্তির ফলে মৈত্রীই হয়েছে; রুশিয়া এখন বৃটেনের মিত্র। তবে সেই সঙ্গে তিনি ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সের জবানীতে তাড়াতাড়ি সতর্ক করে' বল্‌লেন, "কেউ বল্‌তে পারে না যে, আমরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিতালি করছি এবং কমিউনিজমের লড়াই লড়ছি। বরং যারা নিরপেক্ষ রয়েছে ও ভবিষ্যতে একপক্ষে ভিড়ে পড়বার জন্যে এখন বসে' আছে তারা নাৎসীজমের লড়াই লড়ছে বলে' অভিযোগ করা যায়।" মিঃ চার্চিল এবং অধিকাংশ ইংরেজের সোভিয়েট ইউনিয়ন'এর বদলে 'রুশিয়া' নাম ব্যবহারে অপ্রকৃত বোধ হয় এই অস্বস্তির বহিঃপ্রকাশ।

যুদ্ধের অবস্থা

যুদ্ধে এ সপ্তাহে সোভিয়েটের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। আকস্মিক আক্রমণে জার্মানি প্রথম কয়েক দিন কয়েক জায়গায় যে রকম দ্রুতগতি এগিয়ে গিয়েছিল এখন তা পারছে না। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, তিন দিন জার্মান অভিযান প্রায় বন্ধ ছিল। এই মহাযুদ্ধে জার্মান "ব্লিৎসক্রীগ" (বিদ্যুৎ-যুদ্ধ) একবার আরম্ভ হয়ে গেলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত কখনও ক্ষান্ত হয় নি। এই তার প্রথম ব্যতিক্রম। তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে জার্মানি সোভিয়েটের পশ্চিমদিকের কোনও বড় ঘাঁটি—যথা মুরমান্‌স্ক, লেনিনগ্রাড, কিয়েফ, ওডেসা—নিতে পারে নি। জার্মানরা কিয়েফের দ্বারদেশে পৌঁছেছে এবং লেনিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে' দাবী জানিয়েছে। তবে সোভিয়েট ইস্তাহারে মনে হয় জার্মানরা আশানুরূপ সুবিধে করে' উঠতে পারছে না। জার্মান-রুমানিয়ান সৈন্যেরা সমগ্র বেসারাবিয়া দখল করেছে বলে' দাবী করেছে। কিন্তু 'সমগ্র' না বলে 'উত্তর' বল্‌লে বোধ হয় সংগত হত; কারণ সমগ্র বেসারাবিয়া গেলে এতদিনে ওডেসাও যেতে বস্‌ত; কিন্তু ওডেসা সম্বন্ধে জার্মানদের কোনও দাবী নেই। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার। হিটলার যদিও প্রথম থেকে বল্‌ছেন যে, সোভিয়েট বিমান বাহিনীকে প্রায় খতম করে' দেওয়া হয়েছে, তবুও জার্মান বিমান এ পর্যন্ত মস্কোর উপর হানা দেয় নি, অথচ জার্মানরা নাকি মস্কো থেকে মাত্র আড়াই শ' মাইল দূরে আছে। প্রথম দু'দিনের অতর্কিত আক্রমণের পর লেনিনগ্রাডেও তারা হানা দেয় নি। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট বিমান রুমেনিয়া ও ফিনল্যাণ্ডে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সোভিয়েট বিমানবহর বাস্তবিক ঘায়েল হয় নি।

দুই পক্ষের দাবী

জার্মান অভিযানের প্ল্যান এখন স্পষ্ট হয়ে ওঠায় সোভিয়েট হাই কমাণ্ড সমগ্র রণাঙ্গনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন—উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম। এই তিন অংশের অধিনায়ক হয়েছেন যথাক্রমে মার্শাল ভরোশিলোফ, মার্শাল তিমোশেঙ্কো ও মার্শাল বুদেনি। তিন রণক্ষেত্রেই এখন তুমুল যুদ্ধ চল্‌ছে। জার্মান ইস্তাহার ও সোভিয়েট ইস্তাহার তুলনা করলে কতকগুলো পার্থক্য দেখা যায়। জার্মান ইস্তাহার উগ্র ও অস্থির এবং দৈনন্দিন বিস্তারিত বিবরণ তাতে কম থাকে; সোভিয়েট ইস্তাহারে একটা স্থৈর্যের ভাব থাকে এবং মোটামুটি সমগ্র রণক্ষেত্রের অবস্থার একটা চেহারা তাতে পাওয়া যায়। গত ১১ই জুলাই এক বিশেষ জার্মান ইস্তাহারে বিয়ালিস্টক ও মিন্‌স্ক্‌এর সমাপ্ত যুদ্ধের ফলাফল দেওয়া হয়। তাতে বলা হয় যে, মোট ৪ লক্ষের বেশী সোভিয়েট সৈন্য বন্দী হয়েছে, ৭৬১৫টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস বা দখল করা হয়েছে এবং ৬২৩৩টি সোভিয়েট বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। "পৃথিবীর ইতিহাসে সব চেয়ে বেশী সমরোপকরণ দখল করা হয়েছে।" বিয়ালিস্টক সম্পর্কে দাবী এর আগেও জার্মান হাই কমাণ্ড একবার জানিয়েছিলেন। তা ছাড়া এই বিবরণে জার্মান ক্ষতির কোনও বিবরণ নেই। গত ১৪ই জুলাই সোভিয়েট ইস্তাহারে তিন সপ্তাহ যুদ্ধের এক বিবরণ দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, এ পর্যন্ত জার্মানির ১০ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী করা হয়েছে, ৩০০০ ট্যাঙ্ক ও ২৩০০ বিমান ধ্বংস করা হয়েছে; আর সোভিয়েটের ২½ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়েছে, ২২০০ ট্যাঙ্ক ও ১৯০০ বিমান ধ্বংস হয়েছে।

সোভিয়েট এক খবরে জানায় যে, জার্মানী তুরস্কের ভিতর দিয়ে বস্ফোরাস দখলের তোড়জোড় করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে তুর্কী-বুলগেরিয়ান সীমান্তে বহু সৈন্য পাঠানো হয়েছে ও দুর্গাদি নির্মাণ করা হচ্ছে।

জার্মানীতে বিমান-হানা

পশ্চিমে বৃটিশ বিমানবহর জার্মান শহর ও ইওরোপের উপকূলে জার্মান ঘাঁটিগুলোর উপর ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। জার্মানীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বৃটিশ বিমানবহর হানা দিচ্ছে। মিঃ চার্চিল এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, এবার বৃটেনের পালা এসেছে। তিনি বৃটিশ বিমান আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করা হবে বলে' শ্রোতৃমণ্ডলীকে উৎসাহিত করেন। জার্মান বিমান ইংলণ্ডে হানা দিচ্ছে বটে, তবে আক্রমণ তেমন প্রবল নয়।

সিরিয়ায় সন্ধি

সিরিয়ার যুদ্ধ মিটে গেছে। জেনারেল দেনৎস শেষ পর্যন্ত সন্ধি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে যুদ্ধবিরতির পর তাঁর সঙ্গে বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল উইলসন এবং স্বাধীন ফরাসী সেনাপতি জেনারেল কাত্রুর আলোচনা হয়। এই আলোচনায় যে সন্ধিসর্ত নির্ধারিত হয়েছে, তদনুসারে বৃটিশ ও স্বাধীন ফরাসী সৈন্যেরা সমগ্র সিরিয়া ও লেবানন দখল করবে। আসল কথা এই। তবে ফ্রান্সের মর্যাদা রক্ষার জন্যে ও ফরাসী জাতি যাতে ক্ষুব্ধ না হয়, সেজন্যে ভিশি পক্ষের সৈন্য ও অফিসারদের সসম্মানে দেশে ফিরবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সিরিয়ায়

ভিশির আত্মসমর্পণের একাধিক কারণ আছে বলে' মনে হয়। সমরোপকরণ সরবরাহের উপায় না থাকায় যুদ্ধ চালানো যে জেনারেল দেন্‌ৎসের পক্ষে কঠিনতর হয়ে পড়ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ হয়তো আর একটা কারণ। ভিশি গভর্নমেণ্ট এতদিন নিশ্চিত ছিলেন যে, জার্মানী মহাযুদ্ধে জয়ী হবে; কিন্তু সোভিয়েটকে জার্মানী আক্রমণ করায় সে ফল তাঁদের কাছে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বৃটেনকে খানিকটা তুষ্ট করতে চাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়। আবার জার্মানীর দিকে চেয়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে ভিশি গভর্নমেণ্ট বৃটিশ যুদ্ধবিরতি সর্ত অগ্রাহ্য করে' জেনারেল দেন্‌ৎসএর উপর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করবার ভার দিয়ে দেন। সে যাই হোক, এই চুক্তির ফলে পেত্যাঁ গভর্নমেণ্টের মর্যাদা যেটুকু আছে, তাও যে ফরাসীদের চোখে আরো ক্ষুণ্ণ হবে এবং স্বাধীন ফরাসী দলের প্রভাব বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

মার্কিন ঘাঁটি-বিস্তার

সোভিয়েটের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ লাগার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। মার্কিন সৈন্য আইসল্যাণ্ডে গিয়ে ঘাঁটি তো করেছেই; উপরন্তু উত্তর আয়ারল্যাণ্ডেও মার্কিন শ্রমিকরা নাকি একটা নৌঘাঁটি নির্মান করছে। মিঃ উইল্কি প্রস্তাব করেছেন যে, আমেরিকা বৃটেনকে যে সাহায্য দিচ্ছে তা যথেষ্ট নয়, ঠিক সাহায্য দিতে হলে আমেরিকার উচিত উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে মার্কিন ঘাঁটি তৈরি করা। আইসল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠানোর পর প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্টও এক বিবৃতিতে বল্লেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষার সীমানা শুধু পশ্চিম গোলার্ধে আবদ্ধ নয়। পূর্ব গোলার্ধের কোনও কোনও জায়গা আমেরিকার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

ভারতবর্ষ

জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে পরিবর্তন হয়েছে, তা বিবেচনা করে' বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় রাজনীতিক বন্দীদের ছেড়ে দেবেন কি না এবং ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ এমেরী কমন্স-সভায় এক রকম জানিয়ে দেন যে, ভারত সম্পর্কে তাঁদের নীতি পরিবর্তনের কোনো কারণ নেই। অথচ এদিকে ভারতের কাগজে কাগজে বড়লাটের শাসন পরিষদের আসন্ন সম্প্রসারণ নিয়ে খুব জল্পনাকল্পনা চলেছে এবং গুজব রটেছে যে, পণ্ডিত জওহরলালকে ছেড়ে দেওয়া হবে। মিঃ এমেরীর কথার পর এ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের এত আগ্রহ দেখানোর কোনো মানে হয় কি?

শাসন-পরিষদ তাঁর নিজের সর্তে সম্প্রসারিত করতে বড়লাট সব সময়েই রাজী আছেন। তিনি শীঘ্রিই সম্প্রসারণ সম্বন্ধে একটা ঘোষণা করবেন। তার অর্থ ইতিমধ্যে কিছু বিশিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তি শাসন-পরিষদে ঢুকতে রাজী হয়েছেন। কে কে যাবেন, তাই নিয়ে সিমলার সাংবাদিকরা মহোৎসাহে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। নিশ্চিত সদস্য হচ্ছেন স্যার সুলতান আহমদ, স্যার হোমি মোদী ও ডাঃ আম্বেদকর; সম্ভাব্য সদস্যরা হচ্ছেন শ্রীমাধব শ্রীহরি আণে, ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও ও স্যার আকবর হায়দরী। শ্রীযুক্ত আণে এখন ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বড়লাট একটা কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা পরিষদও গঠন করছেন।

স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইরাক রক্ষার সামরিক ব্যবস্থাকে ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, নিকট প্রাচ্যে কোথাও যুদ্ধ গড়ালে ভারত প্রত্যক্ষভাবে সেই যুদ্ধে সংশিলষ্ট হবে। ইরাকের সীমান্ত সোভিয়েট ককেসাসের কাছাকাছি এবং তুরস্কের লাগোয়া।

ডাঃ সত্যপালের বিবৃতি

পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা ডাঃ সত্যপাল কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। তিনি ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভবনা দেখে বর্তমানে সরকারী সমর-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কতটা সমীচীন হয়েছে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে; কিন্তু তিনি তাঁর বিবৃতিতে বর্তমান কংগ্রেস-নেতৃত্ব সম্বন্ধে কতকগুলো ভাববার মতো স্পষ্ট কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, কংগ্রেস এখন গান্ধীজীর ডিক্টেটরী-প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে; হয় গান্ধীজীর মত ও পথ পুরোপুরি সমর্থন করতে হবে, নয় বেরিয়ে যেতে হবে। তিনি এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ও মানবেন্দ্রনাথের বহিষ্কারের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন—কংগ্রেস যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় চায় না; নইলে গান্ধীজী বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে এখন বিব্রত করতে ইচ্ছুক নন কেন? পরাধীনতা থেকে মুক্তি চাইলে গণ-আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু তার বদলে হচ্ছে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, যার কোনো অর্থ হয় না এবং এ আন্দোলন ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। ডাঃ সত্যপাল এই প্রসঙ্গে সত্যাগ্রহীদের অসহযোগ-বিরুদ্ধ কতকগুলো আচরণের উল্লেখ করেছেন।

বাঙালী মুসলমানদের ক্ষোভ

কলকাতার নাগরিক জীবনে অবাঙালী মুসলমানের আধিপত্য যে বাঙালী মুসলমানদের পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়েছে, একথা গত রবিবারে এক জনসভায় প্রকাশ পায়। সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমীর সভাপতিত্বে বাঙালী মুসলমান ও হিন্দুর এই সভা দাবী জানায় যে, কলকাতা কর্পোরেশনে আবার যুক্ত-নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হোক এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল (দ্বিতীয় সংশোধন) প্রত্যাহার করা হোক। একটা বাঙালী জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করবার জন্যে সভা হিন্দু ও মুসলমানের একটা কমিটি গঠন করে। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, পৃথক নির্বাচনের জন্যে আজকাল কর্পোরেশনে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে সদস্য হওয়া দুষ্কর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পীড়া

রবীন্দ্রনাথের পীড়া আরও কঠিন হয়েছে এবং চিকিৎসকদের উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ডাঃ বিধান রায় কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে গেছেন। চিকিৎসার জন্যে কবিকে কলকাতায় আনা হতে পারে।

* * * *

ঢাকা দাঙ্গার অবস্থা অনেকটা উন্নতির দিকে।

* * * *

কাণপুরে মজুরী বৃদ্ধি দাবী করে' কাপড়ের কলের ১৫০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেছে।

১৬-৭-৪১ —ওয়াকিবহাল

নাট্যনিকেতনে—'কালিন্দী'

ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহুপূর্বেই বাঙলা সাহিত্যের দরবারে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু নাটক লেখার চেষ্টা হয়ত তাঁহার এই প্রথম। তবে 'কালিন্দী' আসলে নাটক নয়, উপন্যাসের নাট্যরূপ। কালিন্দী উপন্যাস হইলেও ইহাতে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব নাই। একটা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়াই গল্পের দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এবং বারবার গল্পের মোড় ঘুরিয়া চলিবার সঙ্গেও উহার রেশ কাটে নাই। কিন্তু তবুও এমন সব ঘটনার ভিতর দিয়া গল্পকে টানিয়া নেওয়া হইয়াছে যাহা শুধু উপন্যাসের মধ্যেই প্রকাশ করা সম্ভব—নাটকের তথাকথিত 'টেকনিকে'র ছাঁচে ঢালা সত্যই একটু শক্ত। উপন্যাসের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদকে নাটকের পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্য করিবার লোভ ত্যাগ করা নাট্যকারের খুবই উচিত ছিল। এবং আমাদের মনে হয়, মায়া ত্যাগ করিয়া পরিচ্ছেদগুলিকে ভাঙিয়া নূতনভাবে ঘটনাগুলিকে যদি দৃশ্যের মধ্যে সাজাইয়া লইতে পারিতেন তবে কালিন্দী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক হইত। কালিন্দীর শুধু গল্পাংশই সুন্দর নয়, ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন্ত মানুষ হইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহাদের মধ্যে অনেককেই যেন আমরা বহুকাল হইতে চিনি। তারপর নাটকের যাহা প্রাণ-স্বরূপ বলা চলে, সেই সংলাপই হইয়াছে ইহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রত্যেকটি কথা হইয়াছে well balanced. দর্শক ও শ্রোতার মনকে যেন কথার জালে জড়াইয়া লইয়া চলে। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমতা রক্ষা হয় নাই। অনেকের প্রতিই লেখক অবিচার করিয়াছেন। প্রথম অহীনের চরিত্রটি উপযুক্ত তদ্বিরের অভাবে স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠে নাই। অহীন হঠাৎ এক সময় মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াও সকলের নিকট অচেনাই রহিয়া গেল, তারপর মাঝখানে অদেখার মধ্যে একভাবে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতেই হঠাৎ শেষ সময় একেবারে নূতন কাঠামোর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। সারীকে মাঝখানে বিদায় দিতে পারিলেই হয়ত ভাল হইত। অচিন্ত্যবাবুকে যেন অনেকখানি জোর করিয়াই এমন দুর্দশার ভিতর টানিয়া নেওয়া হইয়াছে। ফলে অচিন্ত্যবাবুর মত একটি পার্শ্বচরিত্রই নাটকটির মধ্যে প্রধান চরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা দর্শকের রুচিতে পীড়া দেয়। নাটকটির মধ্যে অনাবশ্যক দৃশ্য অনেকগুলি করা হইয়াছে বলিয়া ইহা অত্যধিক বড় হইয়া পড়িয়াছে।

চিত্র প্রভাকসন্সের আগামী চিত্র 'কাঞ্চনে' শ্রীমতী লীলা চিৎনীশ

পাঁচ অঙ্কের একটি সামাজিক নাটক দেখার মত ধৈর্য ও সখ থাকা একটা মস্ত বড় কথা বটে! আমাদের মনে হয়, প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য হইতে নাটক আরম্ভ করিলে একটু ছোটও হইত এবং প্রথম দৃশ্যেই নাটক জমিয়া উঠিত। অবশ্য

ইহা খুবই সামান্য কথা; নাট্যকার ও নাট্যনিকেতনের পরিচালকমণ্ডলী ইচ্ছা করিলে যে-কোনদিক হইতেই নাটকটিকে সাজাইয়া লইতে পারেন এবং আমাদের মনে হয়, একটু 'কাট-ছাঁট' করিতে পারিলে 'কালিন্দী'র অভিনয় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় বস্তু হইয়া উঠিবে।

অভিনয়ের দিক হইতে বলিতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই প্রশংসা পাইবার যোগ্য অভিনয় করিয়াছেন। শেষ দৃশ্যে শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এমন সুষ্ঠু অভিনয় তিনি অনেককাল করেন নাই। রবি রায়ের 'ইন্দ্ররায়' চমৎকার। ভূমেন রায়ের 'অহীন্দ্র'—নাটকের অহীন্দ্রের মর্যাদা বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নাই। নরেশবাবুর অচিন্ত্য তাঁহার পূর্বখ্যাতিকে আরও স্পষ্ট করিবে। ছায়া, ঊষা ও নীহারবালার অভিনয় ভালই হইয়াছে। সারীর ভূমিকায় রাধারাণী বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সারী সাঁওতালী মেয়ে, কিন্তু গানের সুর সাঁওতালী না হইয়া আসামী হইয়াছে এবং শেষ গানটা খাঁটি বাঙলা কীর্তন বলিয়া মনে হইল।

নিউ সিনেমায়—'পরদেশী'

শ্রীরঞ্জিৎ মুভিটোনের নূতন হিন্দী চিত্র 'পরদেশী' নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হইতেছে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন চতুর্ভুজ দোশী এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন মতিলাল, খুর্শিদ, স্নেহপ্রভা, বিলিমোরিয়া, দুর্গেশ, কেশরী প্রভৃতি।

ছবিটির মধ্যে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ভাল ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। ঘটনা বৈচিত্র্যে গল্প ঠাসা, অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মেলন লোভনীয়, গান আছে তেরোখানা, সুন্দরী যুবতীর রাস্তায় নৃত্য ও গান করিয়া ভিক্ষা চাওয়া, সস্তা হাস্যরসের ছড়াছড়ি, ইত্যাদি সবই কিন্তু আছে, নাই কেবল কাহিনীর বলিষ্ঠ কাঠামো। উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত এই কাহিনীর না আছে কোন সমস্যা, না আছে কোনো আদর্শ। প্রত্যেকটি চরিত্রই আগাগোড়া কৃত্রিমতায় ভরা, স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে কোনো চরিত্রই স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সর্বাধিক পরিতাপের বিষয় যে, নিউ থিয়েটার্সের একটি তৃতীয় শ্রেণীর ছবির অনুকরণে 'পরদেশী' খাড়া করা হইয়াছে। আমরা ইহাকে চুরি বলিতে চাই না, তবে great men অনেক সময় নাকি একরকমই চিন্তা করিয়া থাকেন, ইহাই প্রবাদ।

শহরে ভূমিকম্পের ফলে ধনীর একমাত্র পুত্র মতিলাল ভগ্ন স্তূপের মধ্যে চাপা পড়িল কিন্তু মরিল না। স্নেহের ভগ্নি স্নেহপ্রভার ধারণা বহু হতভাগ্যের মত দাদারও মৃত্যু হইয়াছে। মতিলাল কোনরকমে ভগ্নস্তূপ হইতে মাথায় আঘাত লইয়া বাহির হইল। Concussion of brain-এর ফলে পূর্ব স্মৃতি তাহার মনে নাই। যে মেয়েটিকে সে ভালবাসিত, যাহার সহিত বিবাহও তাহার স্থির হইয়া গিয়াছিল তাহাকেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। পাগল অবস্থায় সে আশ্রয় পাইল সুন্দরী ভিখারী খুর্শিদের কুটীরে এবং খুর্শিদকে সে ভালবাসে। পথে পথে গান গাহিয়া তাহারা রোজগার করে। এক শিল্পী ভিখারীর মডেল করিয়া মতিলালের ছবি আঁকিল এবং ভগ্নি স্নেহপ্রভা সেই ছবি দেখিয়া জানিতে পারিল যে, দাদা এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহার পর মতিলালকে সন্ধান করিয়া বাহির করিল এবং ডাক্তারের নিকট লইয়া অস্ত্রোপচার করা হইল। মতিলাল পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়া পাইল কিন্তু ভূমিকম্প হওয়ার পর হইতে তাহার আর কোন কথাই মনে পড়িল না, সুতরাং খুরশিদকেও ভুলিল। নিউ থিয়েটার্সের গল্পের সহিত তফাৎ এইখানেই যে, খুরশিদের স্মৃতি একেবারে বিস্মৃত হয় নাই বলিয়া পূর্ব প্রণয়িনীকে নিরাশ করিয়া খুরশিদের নিকট সে ফিরিয়া গেল।

দর্শকদের চিত্তবিনোদনের জন্য ছবিটিতে বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে এবং সে আয়োজন ব্যর্থ হয় নাই। তাছাড়া স্নেহপ্রভা ও খুরশিদ নাচে গানে ও চেহারায় আকর্ষণের বিষয়। নায়কের ভূমিকায় মতিলালের অভিনয়ে কোনো জড়তা নাই। ভিখারী বস্তির আমোদ আহ্লাদের দৃশ্যগুলি বাস্তবতার দিক দিয়া যাচাই করিয়া না দেখিলেই উপভোগ করা যায়।

ছায়ালোকের টুকিটাকি

নাইট শো'তে ছবি দেখছিলাম—কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। যখন ঘুম ভাঙ্গল—হল্ খালি—দরজা বন্ধ। কখন শো শেষ হয়েছে—কখন সবাই চলে গেছে—এখনই বা রাত ক'টা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। ঘণ্টাখানেক বৃথা চীৎকার করে—এবং তার চেয়েও বেশী মন খারাপ করে শেষ অবধি গিয়ে নিজের seat-এই বসলাম। দুনিয়ার নানান্ চিন্তা এসে মাথায় চেপে বস্‌ল। আবোলতাবোল্ কত কি ভাবছিলাম—হঠাৎ show সুরু হবার ঘণ্টা বেজে উঠল। চম্‌কে উঠ্‌লাম—স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি!

পর মুহূর্তেই দেখা গেল পর্দার সামনের কালো পর্দাখানা সরে গেল। তারপর রূপালী পর্দার উপর ভেসে উঠল এক গভীর বন। তার মধ্যে দুটি নারী পথ খুঁজে মরছে। চারিদিকে একটি জ্যোতি। ভাল করে তাকিয়ে দেখ্‌লাম লক্ষ্মী এবং সরস্বতী।

কি ছবি! কি এর উদ্দেশ্য! এরা পথ খুঁজে মরছে কেন? ধীরে ধীরে গাছপালাগুলো নড়ে চড়ে উঠ্‌ল—দেখা গেল সব গাছ লতা পাতায় সিনেমা জগতের এক এক জনের চেহারা। বিশাল বনানীর সব গাছ লতা পাতা গুলোই সিনেমার কর্মকর্তারা। তবে সিনেমার জঙ্গলে লক্ষ্মী সরস্বতী পথ হারিয়ে ঘুরে মরছেন? শেষ দৃশ্যে দেখ্‌লাম ধীরে ধীরে লক্ষ্মী সরস্বতীর জ্যোতি নিবে গেল। তারপর পথ হারিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল—তাদের আর দেখা গেল না।

দুরবীণ

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালিত বার্ষিক আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতীয় দল বিজয়ী হইয়াছে। ইউরোপীয় দল এই খেলায় ৩-১ গোলে পরাজিত হইয়াছে। ভারতীয় দলের এই সাফল্য আনন্দদায়ক হইলেও প্রশংসনীয় হয় নাই। ইউরোপীয় দল এই দিন প্রকৃতপক্ষে যেরূপ খেলিয়াছিল তাহাতে তাহাদের এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়া উচিত হয় নাই। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলেই ন্যায়সংগত হইত। ভারতীয় দল একরূপ সৌভাগ্য বলেই বিজয়ী হইয়াছে। ভারতীয় দল খেলার সূচনায় দুই মিনিটের মধ্যে প্রথম গোলটি করে। ইহার পর প্রথমার্ধের ২৪ মিনিটের সময় এই দল দ্বিতীয় গোল করিতে সমর্থ হয়। ফলে ভারতীয় দল প্রথমার্ধেই দুই গোলে অগ্রগামী হয়। কিন্তু ইহা স্বীকার করা অন্যায় হইবে না যে, ভারতীয় দল প্রথমার্ধে যে দুইটি গোল লাভ করে তাহা 'অফ সাইড' হইতে হইয়াছে। রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ভারতীয় দলকে দুইটি গোলের অধিকারী করে। ইহার পর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় দল একটি গোল লাভ করে। এই গোল লাভের পর ইউরোপীয় দল বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আর গোল করিতে পারে না। খেলা শেষ হইবার এক মিনিট পূর্বে ভারতীয় দল পুনরায় একটি গোল করে ও খেলায় ৩-১ গোলে বিজয়ী হয়।

ভারতীয় দলের খেলায় এই দিন কোন বিভাগেই উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। রক্ষণভাগে গোলরক্ষক ওসমানের খেলা সর্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য হয়। তিনিই এইদিন একটি ছাড়া ইউরোপীয় দলের গোলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছেন বলিলে অন্যায় হইবে না। হাফ ব্যাকে কাহারও খেলা ভাল হয় নাই। ব্যাকে একমাত্র পি চক্রবর্তীর খেলায় দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। আক্রমণ-ভাগে একজন মাত্র খেলোয়াড় দলের আক্রমণ সূচনায় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন তিনি হইতেছেন মোহনবাগান দলের তরুণ খেলোয়াড় অমিয় ভট্টাচার্য। কর্দমাক্ত মাঠে তিনিই এইদিন ভারতীয় দলের সম্মান রক্ষায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইউরোপীয় দলের পি ডি মেলো ও কক্‌ক্রক্টের আক্রমণ ভারতীয় দলকে অনেক সময়েই বিব্রত করিয়াছে। মাঠের অবস্থা খারাপ থাকায় আন্তঃর্জাতিক খেলা হিসাবে এই খেলাটি যেরূপ উচ্চাঙ্গের হওয়া উচিত ছিল সেইরূপ হয় নাই। ভারতীয় দলের পক্ষে গোল করেন অমিয় ভট্টাচার্য, সোমানা ও মোহিনী ব্যানার্জি এবং ইউরোপীয় দলের পক্ষে গোল করেন রোজারিও। নিম্নে উভয় দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

ভারতীয় দল—ওসমান (এরিয়ান্স); সিরাজুদ্দিন (মহমেডান স্পোর্টিং), পি চক্রবর্তী (কালীঘাট); নিলু মুখার্জি (মোহন-বাগান), মোহিনী ব্যানার্জি (কালীঘাট), মাসুম (মহমেডান স্পোর্টিং) অধিনায়ক; নির্মল চাটার্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), আপ্পারাও (ইস্ট বেঙ্গল), সোমানা (ইস্ট বেঙ্গল), অমিয় ভট্টাচার্য (মোহনবাগান) ও করিম (মহমেডান স্পোর্টিং)।

ইউরোপীয় দল:—কেনেট (পুলিশ); হজেস (কাণ্টমস্), আর্ল (রেঞ্জার্স); ফলস (পুলিশ, জে ল্যামসডেন (রেঞ্জার্স) অধিনায়ক, ইডান্স (নর্থ স্ট্যাফোর্ডস), টেম্পলটন (পুলিশ), ককক্রক্ট (ডালহৌসী), পি ডি মেলো (পুলিশ), বেয়ার্ড (ক্যাল-কাটা), রোজারিও (ই বি আর)।

রেফারী—ইউ চক্রবর্তী।

আন্তর্জাতিক খেলার ইতিহাস

১৯২০ সালে সর্বপ্রথম ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন কলিকাতা ফুটবল লীগের যোগদানকারী দলসমূহ হইতে বাছাই করিয়া এই আন্তর্জাতিক খেলার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বৎসরে ইউরোপীয় দল বিজয়ী হয়। তাহার পর হইতে গত একুশ বৎসর ধরিয়া এই প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কেবল ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য এই খেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। গত ২১ বৎসরের মধ্যে এই বৎসর লইয়া ভারতীয় দল ১১ বার এই খেলায় বিজয়ী হইয়াছে। মাত্র দুইবার অর্থাৎ ১৯৩৬ ও ১৯৩৯ সালে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। নিম্নে আন্তঃর্জাতিক খেলার পূর্বের ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

আন্তঃর্জাতিক খেলার পূর্বের ফলাফল

১৯২০ সালে:—ইউরোপীয় দল ৪—১ গোলে বিজয়ী।
১৯২১ সালে:—ভারতীয় দল ১—০ গোলে বিজয়ী।
১৯২২ সালে:—ইউরোপীয় দল ১—০ গোলে বিজয়ী।
১৯২৩ সালে:—ইউরোপীয় দল ২—১ গোলে বিজয়ী।
১৯২৪ সালে:—ভারতীয় দল ৩—১ গোলে বিজয়ী।
১৯২৫ সালে:—ভারতীয় দল ২—০ গোলে বিজয়ী।
১৯২৬ সালে:—ভারতীয় দল ২—০ গোলে বিজয়ী।
১৯২৭ সালে:—ভারতীয় দল ২—০ গোলে বিজয়ী।
১৯২৮ সালে:—ইউরোপীয় দল ২—০ গোলে বিজয়ী।
১৯২৯ সালে:—ভারতীয় দল ৩—০ গোলে বিজয়ী।
১৯৩০ সালে:—খেলা হয় নাই।
১৯৩১ সালে:—ইউরোপীয় দল ৩—০ গোলে বিজয়ী।
১৯৩২ সালে:—ভারতীয় দল ৫—০ গোলে বিজয়ী।
১৯৩৩ সালে:—ভারতীয় দল ২—১ গোলে বিজয়ী।
১৯৩৪ সালে:—ইউরোপীয় দল ৪—০ গোলে বিজয়ী।
১৯৩৫ সালে:—ইউরোপীয় দল ২—১ গোলে বিজয়ী।
১৯৩৬ সালে:—ইউরোপীয় (৩) ভারতীয় (৩) খেলা অমীমাংসিত।
১৯৩৭ সালে:—ভারতীয় দল ১—০ গোলে বিজয়ী।
১৯৩৮ সালে:—ইউরোপীয় দল ১—০ গোলে বিজয়ী।
১৯৩৯ সালে:—ইউরোপীয় দল (২) ভারতীয় দল (২) খেলা অমীমাংসিত।
১৯৪০ সালে:—ভারতীয় দল ৩—২ গোলে বিজয়ী।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। মোট ৬৩টি দল নাম প্রেরণ করিয়াছিল তাহার মধ্যে ৫৮টি দলকে যোগদান করিতে দেওয়া হইয়াছে। এই পর্যন্ত যতগুলি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার একটিতেও উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় নাই। বাহিরের নামজাদা দলসমূহের এখনও কোন খেলা হয় নাই। আগামী সপ্তাহে এই সকল দলের খেলা হইবার কথা সুতরাং সেই সময় দর্শনযোগ্য খেলা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। খেলার তালিকা যেরূপভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত দলসমূহ প্রতিযোগিতার শেষভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মহমেডান স্পোর্টিং, মহীশূর রোভার্স, পশ্চিম ভারত ফুটবল

এসোসিয়েশন দল (বোম্বাই), এরিয়ান্স, ইস্ট বেঙ্গল, মার্স ইউনিয়ান (বাঙ্গালোর), ওয়েলস রেজিমেণ্ট, মোহনবাগান ও তিলকমতী ইউনিয়ান (মাদ্রাজ)।

গত কয়েক বৎসর বাঙলার বিভিন্ন জেলার দল এই শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া খুবই নিম্নস্তরের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল কিন্তু এই বৎসর তাহা অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্যে প্রদর্শন করিয়াছে। অধিকাংশ দলেই খেলোয়াড়গণকে কলিকাতার খেলোয়াড়গণের ন্যায় বুট ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। ফুটবল খেলায় বাঙলার সুনাম ফিরাইয়া আনিবার জন্য খেলোয়াড়গণ যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গেল। ইহা প্রকৃতই আনন্দের বিষয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রাতিযোগিতার আরও কতকগুলি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দিল্লী দল ৫-১ গোলে রাজপুতানা দলকে ও ৩-২ গোলে পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করিয়া ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। বোম্বাই দলও মহীশূর দলকে ৪-১ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইনালে উঠিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার দলের খেলার বিজয়ী দলের সহিত আই এফ এ দল অর্থাৎ বাঙলার দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই খেলায় বাঙলা দল বিজয়ী হইলে সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দলের সহিত খেলিবে। বোম্বাই দল মহীশূরের শক্তিশালী দলকে যেরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছে তাহাতে বাঙলার দলকে

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় সম্মিলিত ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড় দল

শীল্ড প্রতিযোগিতায় প্রবীণ খেলোয়াড় দল

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দলের প্রবীণ খেলোয়াড়গণ একটি দল গঠন করিয়া যোগদান করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা কয়েকটি অনুশীলন খেলায়ও যোগদান করিয়াছেন। ঐ সকল খেলা দেখিয়া মনে হইতেছে, এই প্রবীণ খেলোয়াড়গণ ভালই খেলিবেন। এবং খেলাটি দর্শনযোগ্য হইবে। প্রবীণ খেলোয়াড়গণের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। এই দল নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে বাছাই করা হইবেঃ—পদ্ম ব্যানার্জি, গোষ্ঠবিহারী পাল, বিমল মুখার্জি, বলাইদাস চ্যাটার্জি, কৃষ্ণজীবন ব্যানার্জি, সুধাংশু বসু, রবী গাঙ্গুলী, উমাপতি কুমার, বামা সোম, মোনা দত্ত, সতু চৌধুরী, এ গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

এই দলের নিকট বিজয়ী হইতে যে বেশ বেগ পাইতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার দলের বিজয়ী দলের সহিত যে বাঙলার দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে তাহার খেলোয়াড়গণের নির্বাচন শেষ হইয়াছে। নিম্নে নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—গোল—ওসমান (এরিয়ান্স) ব্যাকদ্বয়—পি দাসগুপ্ত (ইস্ট বেঙ্গল) ও পি চক্রবর্তী (কালীঘাট), হাফ-ব্যাকত্রয়—এ নন্দী (ইস্ট বেঙ্গল), জে লামসডেন (রেঞ্জার্স) ও মাসুম (মহমেডান স্পোর্টিং)। ফরোয়ার্ডগণ—নূর মহম্মদ (মহমেডান স্পোর্টিং), অমিয় ভাট্টাচার্য (মোহনবাগান), ডি ব্যানার্জি (এরিয়ান্স) অধিনায়ক, সুনীল ঘোষ (ইস্ট বেঙ্গল) ও তাজ মহম্মদ (মহমেডান স্পোর্টিং) তাজ মহম্মদ খেলিতে না পারিলে এন মুখার্জিকে (কাস্টমস) লওয়া হইবে।

অতিরিক্ত—ডি সেন (মোহনবাগান), শরৎ দাস (মোহনবাগান), বাচ্চী খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং) ও সোমানা (ইস্ট বেঙ্গল)।

সমর বার্তা

৯ই জুলাই।—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—জার্মান ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় যে, জার্মান ও রুমানিয়ান সৈন্যেরা সমগ্র বেসারেবিয়া দখল করিয়াছে। রুশ ইস্তাহারে বলা হয় যে, লেপেল রণাঙ্গনে দুইটি জার্মান মোটরসজ্জিত রেজিমেণ্ট এবং চারিটি বড় গোলন্দাজ ব্যাটারী নিশ্চিহ্ন করিয়াছে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যগণ শত্রুর বৃহৎ ট্যাঙ্ক-বহরের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং পাল্টা আক্রমণ চালায়।

সিরিয়া—বৃটিশ বাহিনী দামুর দখল করে।

ইরাক—লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হয় যে, ইরাক রক্ষার ভার ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে; কাজেই এই দায়িত্ব জেনারেল ওয়াভেলের উপরই বর্তিবে।

১০ই জুলাই।—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—সোভিয়েট ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, রুশ বাহিনী জার্মানদের রসদ আনয়নের ব্যবস্থা এবং টেলিগ্রাফ লাইনের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে রুশ সৈন্যগণ সাফল্যভাবে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

একটি ফিনিস ইস্তাহারে বলা হয় যে, ফিনরা পূর্ব রণাঙ্গনে পাঁচ হইতে দশ কিলোমিটার অগ্রসর হইয়াছে। এক হাঙ্গারীয়ান ইস্তাহারে বলা হয় যে, হাঙ্গারীয়ান সৈন্যেরা জব্রুকজ নদী তীরে পৌঁছিয়াছে।

১১ই জুলাই।—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—মস্কো হইতে প্রাপ্ত লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, উত্তর মেরু হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সমগ্র ২০০০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে রুশিয়ার মধ্যে জার্মান অভিযান নিশ্চল হইয়া গিয়াছে—অন্তত সাময়িকভাবে। ইস্তাহারে ঘোষিত হয় যে, গতকল্য সারাদিন রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে নাই। সোভিয়েট দাবী করে যে, একটি সমগ্র জার্মান মেকানাইজড্ ডিভিসন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আর একটি ডিভিসনকে গুরুতরভাবে পরাজিত করা হইয়াছে; সোভিয়েট সৈন্যেরা দৃঢ়ভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। জার্মান হাইকমাণ্ডের এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হয় যে, বিয়ালিস্টক ও মিনস্কের দুই যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাধিক পরিমাণ সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে। প্রায় চারি লক্ষের বেশী রুশ সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে। মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হয় যে, মার্শাল ভরোশিলোভ, টিমোশেঙ্কো ও মার্শাল বুদেনি যথাক্রমে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

বৃটিশ বিমানবহর ইংলিশ প্রণালীর উপকূলবর্তী জার্মান অধিকৃত বন্দরসমূহের উপর সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টাকালব্যাপী অবিরাম আক্রমণ চালায়।

১২ই জুলাই।—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, পর পর দুইদিন ধরিয়া উত্তর মেরু হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত দুই সহস্র মাইল রণাঙ্গনের অবস্থা মূলত অপরিবর্তিত রহিয়াছে। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা নিস্তব্ধ থাকার পর অদ্য রাত্রিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় নাৎসী "ব্লিৎসক্রীগ" সুরু হইয়াছে।

সিরিয়া—মধ্যপ্রাচ্যের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, জেনারেল ডেনৎস বৃটিশের সন্ধি প্রস্তাবের সর্তে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাইতে স্বীকৃত হওয়ায় গতকল্য মধ্যরাত্রি হইতে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৩ই জুলাই।—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—দুইদিন বিরামের পর নাৎসীরা রুশিয়ার বিরুদ্ধে আবার আক্রমণ সুরু করিয়াছে। মস্কো ইস্তাহারে বলা হয় যে, তুমুল সংগ্রাম সত্ত্বেও পনের শত মাইলব্যাপী রণাঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। জার্মান হাইকম্যাণ্ডের ইস্তাহারে মস্ত মস্ত দাবী করা হইয়াছে। প্রথমত বলা হইয়াছে যে, জার্মান যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী সোভিয়েট এস্তোনিয়ার সীমান্তবর্তী পিপাস্ হ্রদের পূর্বদিকে লেনিনগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দ্বিতীয়ত, প্রিপেট জলাভূমির উত্তরে সোভিয়েট দুর্গসমূহ ভেদ করা হইয়াছে; তৃতীয়ত, নীস্টারের উত্তর-পূর্বে জার্মান বাহিনী রুশদিগকে নীস্টারের ওদিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নীস্টার নদী হইল ইউক্রেনিয়া ও বেসারেবিয়ার সীমারেখা। রুশ ইস্তাহারে বলা হয় যে, দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের একটি যন্ত্রসজ্জিত রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে।

বৃটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে গতকল্য মস্কোতে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় গভর্নমেণ্ট নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের জন্য পরস্পরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য ও সমর্থন করিবেন এবং পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া তাঁহারা এই যুদ্ধে কোনরূপ যুদ্ধবিরতির চুক্তি কিংবা সন্ধি সম্পাদন করিবেন না বা সে সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনাও চালাইবেন না। মস্কোস্থ ইংরেজ রাজদূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় কমিশনার মঃ মলোটোভ এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

সিরিয়া—ভিসি কমিশন যুদ্ধবিরতির দলিলে সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ স্বাক্ষর করিয়াছেন।

১৪ই জুলাই।—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। সোভিয়েট সৈন্যেরা জেস্নাবিন ও রাগাচেভ শহর পুনর্দখল করে। এই দুইটি শহর মিনস্কের ১৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। জার্মান ইস্তাহারে বলা হয় যে, পূর্ব রণাঙ্গনে ব্যূহভেদের অভিযান পরিকল্পনামত পরিচালিত হইতেছে। মার্শাল ম্যানারহাইমের পরিচালনাধীনে ল্যাডোগা হ্রদের উভয় তীরে ফিনিশ সৈন্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে এবং তাহারা আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, লেনিনগ্রাডের দিকে নাৎসীদের অগ্রগতি বিশেষ আশঙ্কাজনক বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সোভিয়েট ইনফর্মেশন ব্যুরো বলিতেছে যে, এ পর্যন্ত অন্তত দশ লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত বা বন্দী হইয়াছে; অপরপক্ষে সোভিয়েট পক্ষে হতাহত ও বন্দী হইয়াছে আড়াই লক্ষ।

লণ্ডনে এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের উপর জার্মানির আরও প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহও অতি শীঘ্রই জার্মানির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইবে।

সিরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সরকারীভাবে স্বাক্ষরিত হয়।

বৃটিশ বিমানবহর উত্তর ফ্রান্সের ব্যাপক অঞ্চলে হানা দেয়।

১৫ই জুলাই।—

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের ১০০ ট্যাঙ্ক ও বহু গাড়ি ধ্বংস করা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে তিন হাজার জার্ম্মাণ সৈন্যের এক বাহিনীকে পরাজিত করা হয় এবং বহু কামান হস্তগত করা হয়।

বল্টিকে সোভিয়েট আক্রমণে ২টি জার্মান ডেস্ট্রয়ার, ১৩টি সৈন্যবাহী জাহাজ ও ট্যাঙ্ক বোঝাই একটি বজরা জলমগ্ন হয়।

"নিউইয়র্ক টাইমসে" প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, হিটলার ও গোয়েরিং-এর মধ্যে বিরোধ হওয়ায় গোয়েরিংকে তাঁহার নিজ গৃহে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।

কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, রাশিয়া এবং বৃটেন যথারীতি মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৯ই জ্বলাই—

আজ ঢাকা শহরের দাঙ্গা সম্পর্কে সাংঘাতিক কোন ঘটনা ঘটে নাই। দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্যন্ত মোট ৭৮৮জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গত ১৩ই এপ্রিল বিডন স্কোয়ারে একটি আপত্তিজনক বক্তৃতা করায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নীহারেন্দ্র দত্তমজ্বমদারকে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর ওয়ালী-উল-ইসলামের আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।।

দাঙ্গাহাঙ্গামা, চুরি এবং কর্তব্যরত পুলিস কর্মচারীকে মারপিট করিবার অভিযোগে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণচক গ্রামের কৃষক আন্দোলনের নেতা সুধাংশু দত্ত এবং শ্রীমতী তরুবালা মণ্ডলকে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই মামলায় আরও ১৫জন আসামী বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মিঃ চার্চিল অদ্য কমন্স সভায় বলেন যে, লণ্ডনে একটি মসজিদ ও ইসলাম সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটা জমি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দান করিবেন।

১০ই জ্বলাই—

ঢাকা দাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৩৫জন হত এবং ৮০জন আহত হইয়াছে। গত রাত্রিতে নিরুদ্দিষ্ট গোয়ালার মৃতদেহ নদীতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আপত্তিকর ইস্তাহার রাখার অভিযোগে শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীকে ভারতরক্ষা বিধানবলে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০, টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল নামঞ্জুর হইয়াছে।

গত কয়েকদিন যাবৎ উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানসমূহে অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। ফলে বৈতরণী রোড স্টেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কমন্স সভায় ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

১১ই জ্বলাই—

গত এপ্রিল মাসের বিভিন্ন তারিখে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশ সম্পর্কে কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের অভিযোগক্রমে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপর ১৪ই জুলাই কোর্টে হাজির হইবার জন্য সমন জারী করা হয়।

১২ই জ্বলাই—

বসিরহাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভারতরক্ষা বিধি অমান্যের অভিযোগে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরীর বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য ও পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সত্যপাল যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া শীঘ্রই পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের চারি আনার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

অহিংসানীতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সহিত মতভেদ হওয়ায় জব্বলপুর টাউন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নরসিং দাস আগরওয়াল কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথম সত্যাগ্রহী আচার্য বিনোবাভাবে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৪ই জ্বলাই—

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটর এজলাসে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার আরম্ভ হয়। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য উভয়কে দুইশত টাকা করিয়া ব্যক্তিগত জামীন মুচলেকায় মুক্তি দেওয়া হয় এবং মামলার পরবর্তী শুনানীর দিন ২২শে জুলাই ধার্য করা হয়। "বসুমতী" এবং "ভারত" পত্রিকার সম্পর্কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়।

কলিকাতা শহরের হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৮৬জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান সংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক হইয়াছে; গতবারের লোক গণনায় ঐ সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষাধিক। মুসলমান জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৫ লক্ষ হইয়াছে; গতবারে ছিল প্রায় তিন লক্ষ।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক নির্বাচিত প্রথম সত্যাগ্রহী আচার্য বিনোবাভাবে তৃতীয়বার সত্যাগ্রহ করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গত ১০ই জুলাই হইতে ঢাকা শহরের দাঙ্গা সম্পর্কে কোন গুরুতর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অদ্য অনেকগুলি দোকান খুলিয়াছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ আছে।

১৫ই জ্বলাই।—

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পুনরায় অসুস্থ হইবার পর তিনি কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের চিকিৎসাধীনে আছেন। এই চিকিৎসা কতটা ফলদায়ক হইয়াছে। তবে কবি অতিশয় দুর্বল এবং তিনি নিজ কক্ষের বাহির হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকর ও বড়লাটের মধ্যে "কতকগুলি বিশেষ বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে" পত্রালাপ চলিতেছে।

আলীপুরের দায়রা জজ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কতকগুলি শেয়ার জাল করিয়া সেই জাল শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ভবানীপুরে ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনকে প্রতারণা করিয়া প্রায় দশ লক্ষ টাকা ওভার ড্রাফ্ট লইবার অভিযোগে ধৃত রাজকুমার চ্যাটার্জি প্রমুখ সাতজন আসামীর জামীন নাকচ করিয়া তাহাদিগকে আদালতে আত্মসমর্পণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

অদ্য ঢাকা তদন্ত কমিটির অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হয়।

বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে যে, একদিকে জাপান এবং অন্যদিকে জার্মানি উভয় দিক হইতেই যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বৃটেনের পক্ষে অবিলম্বে ভারতীয় সমস্যার সমাধানে ব্রতী হওয়া আবশ্যক।

ভারত রক্ষা আইনের প্রয়োগ—আপত্তিকর বক্তৃতা করার অভিযোগে আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০, টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সাপ্তাহিক "ফরোয়ার্ড ব্লক" পত্রিকার প্রাক্তন ম্যানেজার মাদারীপুরের ভূতপূর্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মজুমদার আপত্তিকর পত্র লিখিবার অপরাধে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫, টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।
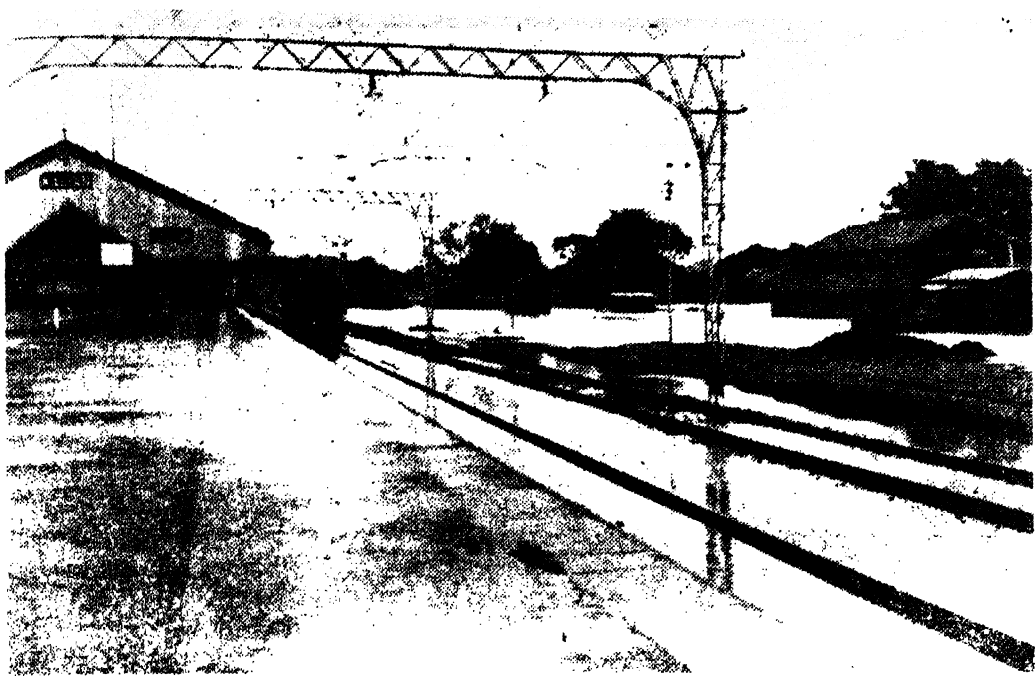
বোম্বাই অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টায় ১৫ ইঞ্চি বারিপতনের ফলে জলমগ্ন কল্যাণ স্টেশনের দৃশ্য।

তুষারাচ্ছাদিত বনভূমিতে কাষ্ঠ নির্মিত রাইফেল ও মেশিনগান লইয়া ক্রীড়ারত রাশিয়ার বালকদল।

পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণার জল চঞ্চল গতিতে নীচে নেমে আসছে। অবিরাম জল পড়ার শব্দে একটা ছন্দ আছে। চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সেই জল পড়ার ঝর ঝর শব্দ মানুষকে দূর থেকে আকৃষ্ট করে। বহু অতিথির সমাগম হয় ঝর্ণার আশে পাশে, তাদের মধ্যে অনেকে সেই শব্দে বিভ্রান্ত হ'য়ে, সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে ঝর্ণার জলে সমাধি নিয়েছে। ঝর্ণার জলে মানুষের আকস্মিক দুর্ঘটনা বিরল নয়। জলের ধারে ধারে গভীরতা হয়ত কোথাও কোথাও ফাঁদ পেতে রেখেছে; পাথরের গায়ে গায়ে সবুজ শেওলার সারি জমে পিছল হয়ে আছে; পাথরের ফলাকা হয়ত কোথাও সঙ্গীন চড়িয়ে জলের তলায় আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। এ সব বিপদকে অনেকেই সহজভাবে উপেক্ষা ক'রে জলে নামে। বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, জলের ঝর ঝর ছন্দধ্বনি তখন কানে লেগে আছে, চোখে প্রকৃতির মায়াবীরূপ তখন যাদু এনে দিয়েছে। আনন্দের হিল্লোলে, ঝর্ণার চটুল গতিবেগের সমতা রেখেই যেন অতিথিরা ঝর্ণার জলে নেমেছে। আনন্দের আবেগের মধ্যে কেউ বিপদের ফাঁদে পা ফেলে জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। বাঁচবার জন্যে সাহায্য জানাল। সাহায্য হয়ত কোথাও কোথাও মিলল। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তা পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনা এমন আকস্মিকভাবে উড়ে আসে যে, সহযাত্রীরা সাহায্য দিতে পারে না। বাঁচবার জন্য কাতর আবেদন, মরণের সঙ্গে হাতাহাতি—এ সমস্ত দেখে ভয়ে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সঙ্গীর জলের মধ্যে নেমে যাওয়া দেখে, তাজা মানুষের প্রাণবায়ু জলে বুদ্বুদ আকার নিতে নিতে চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়। চোখের জল ফেলে সহযাত্রীরা ফিরে যায়। আশপাশের জংলী ছেলেরা খবর পেয়ে ছুটে আসে। জলের উপর নজর রেখে একদিন লাস তুলে মাটির নীচে সমাধি দেয়, এক কণা সোণার লোভে তারা জলে ডুব দিয়ে লাসের তল্লাস করে, জোয়ানরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৌশলে অনেককে উদ্ধার ক'রে ডাঙ্গায় তুলে বকশিস পায়। আবার জলের এক এক টানে বেকাদায় পড়ে জলদেবীর সহচরীদের হাতে ওরাও প্রাণ দেয়। ওরা বলে, ঝর্ণার জলে নাকি আছে বনদেবী, তার রাজপুরীতে সতর্ক পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে সহস্র সহচরী। তারা যাদু করেছে ঝর্ণার জল। জলের ঝর ঝর শব্দ মানুষকে ডাকে—সে ডাকে যারা মোহিত হয়ে এগিয়ে যায় তাদের নাকিই মরণ। সে মরণ থেকে ওরাও নাকি সহজে মানুষকে উদ্ধার করতে যায় না, ভয় থাকে, এর প্রতিশোধ ওদেরও একদিন পেতে হবে বলে।

এটা ওদের সরল মনের বিশ্বাস। তবে ঝর্ণার জলের কলধ্বনির মধ্যে যে একটা ছন্দ মাধুর্য আছে সেটা মানুষের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে—হয়ত অনেকেই মনের সেই অসতর্ক অবস্থায় জলের মধ্যে বিপদে পড়ে প্রাণ হারায়।

*   *   *   *   *

শব্দ একটা সুরক্ষিত ছন্দে আবদ্ধ হ'লে মানুষ তার উপর আকৃষ্ট হয়। কেবল মানুষ নয়, জীব জগতের বহু প্রাণীও। বসন্তের কোকিল তার সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি বর্ষণ ক'রে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। তার কাছে বায়সের কর্কশ কণ্ঠস্বর পীড়াদায়ক। শব্দ কেবল মৃদু হলেই শ্রুতিমধুর হবে এমন নয়। সুরক্ষিত ছন্দের মধ্যে শব্দের বিকাশ প্রয়োজন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিউগলের উচ্চ কণ্ঠ আর্তনাদ নয়, জয়ঢাকের জয়ধ্বনি মৃদু না হলেও মানুষের মনকে পীড়া দেয় না। আধুনিক সঙ্গীতে বহু বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়। শব্দের উচ্চতার ছন্দপতন নেই বলে মানুষের কাছে তাও সমাদর পেয়েছে।

কিন্তু গর্দভরাগিণী বাতাসে তরঙ্গ তুলে মানুষের কাণে পৌঁছলে তা উপভোগ করা আর সহজ হয়ে উঠে না। অথচ এই শব্দের তুলনায় বহু উচ্চ শব্দ একটা ছন্দের মধ্যে থাকায়, তা গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে বেশ সহজ হয়। বহুক্ষণ ধরে উপভোগ করাও যায়।

*   *   *   *   *

বাতাসে যে শব্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তার আকার এবং গতিবেগ এক নয়। শব্দও দৃশ্যমান নয়। Low-Hilger Audiometer যন্ত্রে শব্দের স্পন্দনের আকার ভেদ ধরা যায়। তবে শব্দ (Sound) বাতাসে যে স্পন্দন সৃষ্টি করে, তা কয়েক উপায়ে দেখা যেতে পারে। পরীক্ষার ফল উপভোগ্য। একটি স্পন্দনাত্মক পাত্র যেমন ট্রেসিং পেপার কিম্বা কাচ সংগ্রহ ক'রতে হবে। সমতল কাচ হলেই ভাল হয়। কাচটিকে একটি কাঠের অথবা অন্য কোন ধাতুর স্ট্যাণ্ডে রেখে তার উপর লাইকোপোডিয়াম পাউডার ছড়িয়ে দিতে হবে। অন্যথায় পাতলা বালি কিম্বা অন্য পাউডার দিয়েও পরীক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু লাইকোপোডিয়াম পাউডারই পরীক্ষার পক্ষে বিশেষ নির্ভরযোগ্য। এই জাতীয় পাউডার কোন কোন ফুলের রেণু থেকে তৈরী বলেই খুব সূক্ষ্ম। কাচের সমতল ক্ষেত্রে পাউডার ভাল করে ছড়িয়ে দেবার পর এস্রাজের ছড়ি দিয়ে কাচের চার ধার ধীরে ধীরে বাজাতে আরম্ভ করলেই কাচের মধ্যে দিয়ে যে মৃদু শব্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হবে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে কাচের উপরিস্থিত পাউডারের উপর। শব্দের কম্পনে পাউডারগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে কিরূপ বিচিত্র নক্সায় পরিণত হয়েছে, তা সংলগ্ন চিত্রে দেখান হল। কাচের চার পাশে এস্রাজের ছড়ি দিয়ে শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত করে আরও বিচিত্র নক্সা তৈরী করা যায়। নক্সাগুলি বিভিন্ন আকারের এবং এত নিখুঁত হয় যে, তা মানুষের শিল্পকুশল হাতের চিত্রাঙ্কন বলেই মনে হয়। বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রে শব্দের স্পন্দন যেভাবে ধরা দেয়, তাতে মসীরেখার উত্থান-পতন ছাড়া অন্য কিছু দর্শনযোগ্য থাকে না। কিন্তু স্পন্দনের সে কাহিনী বৈজ্ঞানিকের চোখে বিচিত্র বৈকি!

* * * *

গরম দেশ ছেড়ে চলে এস তুষার দেশে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, গাছের গায়ে মাথায়, বাড়ির ছাদে অবিরাম তুষার বৃষ্টি হচ্ছে। গোরস্থানের সমাধির উপর বরফের সাদা চাদর বিছিয়ে রয়েছে। শতাব্দীর মত যোদ্ধাদের রক্ত মাটির তলায় হিম হয়ে জমাট বেঁধে গেছে—বন্দুকের সঙ্গীনে মরচে ধরে মাটিতে মিশে গেছে। ঘরছাড়া পথিক, নীড়হারা পাখীর দল বরফের মধ্যে ডুবে গিয়ে বরফের চাঁইয়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। বরফের বুকে মৃত মানুষের সমাধি আর তার পাশে পাশে 'স্নো ক্রিসটাল' ছড়িয়ে আছে। খালি চোখে স্নো ক্রিসটালগুলি বরফের কুচি, কিন্তু তাদের বিচিত্র সৌন্দর্য ধরা যায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে। ভিন্ন ভিন্ন আকারের 'স্নো ক্রিসটাল' মানুষের হাতের ছাঁচে তৈরী নয়—কিন্তু তাদের গঠন সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

সাহিত্য সংবাদ

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

"সাহিত্য চক্র" কর্তৃক একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন, কোনরূপ প্রবেশ মূল্য লাগিবে না। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রত্যেক প্রতিযোগীকে পালন করিতে হইবে।

(১) ফুলস্কেপ সাইজ কাগজের ছয় পৃষ্ঠার অধিক গল্প হইবে না এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। (২) অনুবাদিত বা ছায়া অবলম্বনে গল্প চলিবে না। (৩) আমাদের নির্বাচিত বিচারকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পের সমস্ত অধিকার 'সাহিত্য চক্রের' থাকিবে। (৪) বিচারকের বিচারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। (৫) গল্প ফেরৎ লইবার এবং কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকিলে উপযুক্ত ডাকটিকেট পাঠাইতে হইবে। (৬) গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৭ই আগস্ট। ফলাফল আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

পাঠাইবার ঠিকানাঃ—শ্রীমতী পুষ্প বসু, ১৪৯।২, রাসবিহারী এভেনিউ, বালিগঞ্জ অথবা শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য এম এ, বি এল, সম্পাদক, "সাহিত্য চক্র", বিজলী ভবন, ১০৭।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তক পরিচয়

আকাশ গঙ্গা—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতী ভবন, ১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা ও দু'টাকা।

বর্তমান বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে মোটামুটি দুটি প্রধান কাব্য-প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়—আধুনিক বাঙলা কবিতার পাঠকমাত্রই এ দুটি প্রবাহের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। এর একটি প্রধানত রোমাণ্টিক-ধর্মী এবং দ্বিতীয়টি বাস্তব-ধর্মী। রোমাণ্টিক কবিতা বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবহমানকাল থেকে চ'লে আস্ছে—তবু এর পরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি আমরা দেখি রবীন্দ্র-কাব্যে। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ক'রে তাঁর পরে অনেক বাঙালী কবি রোমাণ্টিক কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি যে, ভাষায় কিংবা ভাবে তাঁর প্রভাব এড়িয়ে কবিতা লেখা সত্যই অসম্ভব। তবু আধুনিক বাঙলা কবিতায় রোমাণ্টিসিজ্‌মের বিপরীত-ধর্মী বাস্তববাদ ব'লে যে জিনিসটার আমদানী করা হ'য়েছে, তার সাহায্যে রবীন্দ্র-প্রভাবকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এই প্রচেষ্টা অতি আধুনিক বাঙালী কবিরা কতটা সার্থকতা লাভ করেছেন, সে আলোচনার স্থান এটা অবশ্য নয়। কবিতায় বাস্তববাদ বিদেশ থেকে আমদানী করা হ'লেও, বাঙলার মাটিতে তার ফসল ভালই ফল্‌বে ব'লে আশা করা যায়। এই বিপরীত-ধর্মী মতবাদ থাকা সত্ত্বেও বাঙলায় রোমাণ্টিক কবিতা প্রচুর পরিমাণে লেখা হ'চ্ছে এবং হবেও। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মতবাদের চেয়ে কবিতাই বড়—কবি মতবাদ অবলম্বন ক'রে কবিতা লেখেন না, কবির কবিতাই মতবাদের সৃষ্টি করে।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আকাশ-গঙ্গা' কবিতার বইখানি প'ড়ে মনে হ'ল যে, তিনি রোমাণ্টিকধর্মী কবি; আঙ্গিক, ভাষ্য এবং ভাব সব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর উপরে যথেষ্ট। এর দ্বারা কেউ যেন মনে না করেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকাটা নিন্দার বিষয়। রবীন্দ্র-প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নির্মল-বাবুর বৈশিষ্ট্য আছে যথেষ্ট। 'আকাশ-গঙ্গা' তাঁর প্রথম কবিতার বই; এর পূর্বে তাঁর বহু কবিতা সাময়িক পত্রিকাদিতে প'ড়েছি এবং প'ড়ে আনন্দলাভ ক'রেছি। নির্মলবাবুর মন কল্পনাপ্রবণ, ব্যষ্টি-চেতনাশীল; সমষ্টি-চেতনাজনিত কোনরূপ দুর্বোধ্যতা এবং অস্পষ্টতা তাঁর কবিতায় নেই। 'আকাশ-গঙ্গা'র বেশীরভাগ কবিতাই ভাব-সমৃদ্ধ, শব্দ-চয়ন এবং ছন্দ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে উপভোগ্য হ'য়েছে—তবে দু'একটি কবিতায় কাঁচা হাতের ছাপ ধরা পড়ে। নানা জাতীয় প্রায় ছাব্বিশটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে; তার মধ্যে প্রশস্তিমূলক কয়েকটি কবিতা এবং অনুবাদ কবিতা কয়টি বাদ দিলে, বাকীগুলো প্রায়ই প্রেমের কবিতা। কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল লেগেছে শেষ আরতি, প্রত্যূষ, ভাষাহারা, রাগসন্ধ্যা, আগুনে পুড়ে লাল, চৈত্র-শ্রী এবং ভাড়াটিয়া গাড়ি। নির্মলবাবু যে সত্যিকারের কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর এই প্রথম বইয়ে তিনি যে সম্ভাবনা দেখিয়েছেন, ভবিষ্যতে বাঙলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু আশা করে। ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর নিখুঁৎ জ্ঞান আছে—'আকাশ গঙ্গা'র ছন্দবৈচিত্র্য প্রশংসনীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির বর্ণনায় নির্মলবাবু সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বিদেশী কবিতার তর্জমা কয়টি উচ্চাঙ্গের হ'য়েছে। পুস্তকের প্রথমে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নির্মলবাবুর কবি-প্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণ। তবে নির্মলবাবুর কবিতায় একটু যেন বলিষ্ঠতার অভাব আছে; বোধ হয় অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতাই তার কারণ। ভবিষ্যতে বাস্তব বিষয়ে কবি যদি আরেকটু সজাগ হন, তবেই এ দুর্বলতা থাক্‌বে না ব'লে মনে হয়। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এবং শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় পরিকল্পিত পুস্তকের অঙ্গসজ্জা আভিজাত্যের পরিচায়ক। কাব্য-রসিক পাঠকমহলে বইটি সমাদৃত হবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

আফ্রিকা ইন পিকচার্স—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য আট আনা। ১৫৬, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট এবং গ্লোব ট্যাম্প এন্ড কয়েন কোং, ১৬৭।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস বাঙালী সমাজে সর্বত্র সুপরিচিত। তিনি বিখ্যাত ভূপর্যটক। আলোচ্য পুস্তিকাখানাতে গ্রন্থকারের আফ্রিকা ভ্রমণকালে গৃহীত চুয়াল্লিশখানার উপর ফটো চিত্র আছে। আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগের নরনারী এবং জীবজন্তুর বৈচিত্রে ছবিগুলি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আর্ট পেপারে ছাপান বলিয়া ছবিগুলি সুন্দর এবং সুস্পষ্ট উঠিয়াছে। উপসংহারভাগে আফ্রিকা ভ্রমণের উপর গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতালব্ধ মন্তব্য রহিয়াছে। রামনাথবাবুর লেখার বিশিষ্টতা হইল এই যে, মানবতার মর্যাদাপূর্ণ একটা ব্যঞ্জনা তাহাতে সব সময় থাকে ও নির্যাতিত নিপীড়িতের বেদনা এবং মানব [illegible] দের বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্তের বিক্ষোভ এবং জ্বালা পাওয়া যায় তাঁহার লেখার ভিতর। তাঁহার লেখার এই বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া স্বদেশের পরাধীনতার জন্য বেদনাকে তিনি তীব্র করিয়া তোলেন। আলোচ্য গ্রন্থখানাতে দক্ষিণ আফ্রিকায়, অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যে এবং রোডেসিয়ায় বর্ণবৈষম্যের জন্য ভারতবাসীদিগকে কিরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হয়, বিশ্বাস মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। সর্বত্র এমন পুস্তিকার আদর হওয়া উচিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। পঞ্চম খণ্ড। প্রকাশক—গীতা প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১ মনোহরপুকুর রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য সাধারণপক্ষে ১৷৵০ আনা, গ্রাহকপক্ষে ৸০ আনা।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয়ের অনূদিত গীতার বর্তমান সংস্করণের পরিচয় বাঙলা দেশের চিন্তাশীল এবং মনীষী পাঠকবর্গের নিকট প্রদান করা অনাবশ্যক। গীতার এই সংস্করণ ইতিমধ্যে যথেষ্টই সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্তমান খণ্ডে গীতার চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা সুবিস্তৃত, প্রাঞ্জল এবং সুত্রানুগ। মানব জীবনের সমগ্রতার দিক হইতে গীতার সঞ্জীবনী বাণীকে সুপরিস্ফুট করিয়া ধরিবার যে প্রগাঢ় অনুভূতির আলোক অনিলবরণের অনুবাদে পাওয়া যায়, মায়াবাদের পারিভাষিক পাণ্ডিত্যে জটিল অন্যান্য অধিকাংশ সংস্করণে তাহা দুর্লভ। এই দিক হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যিনি গীতার এই সংস্করণটি পাঠ না করিবেন, ব্যাখ্যা এবং ভাষামুখে গীতার রস আস্বাদন তাঁহার পক্ষে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে; অবশ্য ভগবৎ কৃপালব্ধ সাধনাবলে গীতার রসকে যিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

দেহালি—কবিতার বই। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এই ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্য গ্রন্থখানির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'দেহালিতে দেহবাদ আছে, এ কথা সত্য। মানুষের নানা অনুভূতির যে বিচিত্র বর্ণলীলা অহরহ চলছে, তার অধিকাংশই দেহ ও মনকে আশ্রয় করেই বাঁচে। যৌবনের পুষ্পধনু রামধনু রংয়ে দেখা দেয় দেহের আনন্দকেই অবলম্বন করে। কাব্যে অশ্লীলতা অবশ্যই দোষের মনে করি, কিন্তু দেহবাদকে কল্পনার রাজ্যে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নি।' আমরা নিজেরাও দেহবাদকে সব সময় দোষের বলিয়া মনে করি না; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, দেহ শুধু রক্ত মাংসের সমষ্টি নয় কবির দৃষ্টিতে—তাঁহার দৃষ্টি ভাবের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে দেহ কামোপভোগের উপাদানমাত্রে উপলব্ধি হয় না, দেহের ভিতর দিয়া কবি পান সেবার ছন্দকে, আত্ম-নিবেদনের আকর্ষণকে এবং তখন উপাধিকে অতিক্রম করিয়া চৈতন্যময় আনন্দসত্তারই অভিব্যক্তি ঘটে দেহের ভিতর দিয়া। আলোচ্য গ্রন্থের কবি দেহবাদের ভিতর দিয়া ততটা উঁচুস্তরে উঠিতে সমর্থন হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইল না, অনুমান এবং প্রত্যয়ের স্তর অর্থাৎ কতকগুলি, বাহিরের আরোপিত সংস্কারই তাঁহার ভিতর এখনও কাজ করিতেছে, প্রত্যক্ষতা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি আমরা একথা স্বীকার করিব যে, তাঁহার লেখায় রস আছে, সে রস দানা বাঁধিয়া এখনও না উঠিলেও, সে সম্ভাবনা কবির এই প্রথম প্রচেষ্টার মধ্যে প্রচুর রহিয়াছে।

চাঁদ ও রাহু—কবিতার বই। প্রজেশকুমার রায়। দাম ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড সন্স, কলিকাতা।

আধুনিক কবিতার বই। কবিতাগুলি গদ্যছন্দে লেখা। অধিকাংশ কবিতাই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। খাঁটি কবিতার চেয়ে কবিতাগুলিতে সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বনির্দেশের ইঙ্গিতই বেশী। তাহা হইলেও ছোট ছোট কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

গুরুত্ব নাই; সুতরাং দেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার-প্রয়াসীদের নিকট এই ঘোষণা উপেক্ষিতই হইবে।

বাঙলার দৈন্য-দুর্দশা—

বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে অন্নহীন জনগণের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ আমরা প্রতিদিন পাইতেছি। ঝঞ্ঝা ও প্লাবন দেশের বিপুল অঞ্চল শ্মশানবৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মরে, বোধ হয়, সভ্য-শাসিত শুধু এই ভারতবর্ষেই। বাঙলার মফঃস্বল হইতে প্রতি সপ্তাহেই শোচনীয় সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অন্নকষ্টের সঙ্গে ঢাকার দাঙ্গাপীড়িত এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমার গুণ্ডাবিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারীর দুঃখ-কষ্টও রহিয়াছে। দাঙ্গায় সর্বস্ব হারাইয়া সহস্র সহস্র নরনারী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজা তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করেন, পাঠকবর্গ ইহা অবগত আছেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, ঢাকা অঞ্চলের যে সব সর্বস্বহারা এখনও ত্রিপুরা রাজ্যে আছে, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য মহারাজা চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকায় আশ্রিতেরা যাহাতে কুটীরশিল্পের সাহায্যে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করিতে পারে, তেমন ব্যবস্থা করা হইবে। মহারাজার এই বদান্যতার জন্য আমরা দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সঙ্গে আমাদিগকে নিরতিশয় দুঃখের সঙ্গে এই কথাও বলিতে হইতেছে যে, বরিশাল এবং নোয়াখালির বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারীর জন্য তেমন অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না এবং অর্থের অভাবে সাহায্য সমিতিগুলির কাজ উপযুক্তভাবে চালান সম্ভব হইতেছে না। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন নরনারীর দুর্দশার গুরুত্ব দেশবাসীরা উপলব্ধি করুন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন। বাঙলা দেশ বিপন্নের সাহায্যে কোনদিন কার্পণ্য প্রদর্শন করে নাই. আজ বাঙলা দেশে মানবতার মহান্ আদর্শ যেন উজ্জ্বল থাকে। বিবেকানন্দের বাঙলা, বিদ্যাসাগরের বাঙলা ক্ষুৎপীড়িত ভ্রাতাভগিনীর অশ্রু মুছাইতে যদি আগাইয়া না আসে, তবে জাতির পক্ষে দারুণ কলঙ্কের বিষয় হইবে।

গুরুতর অপরাধ—

ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটি লেবর ফেডারেশন ব্রিটিশ শ্রমিক দলের একটি শাখা। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রিটিশ শ্রমিক দল হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপরাধ অতি গুরুতর। তরুণদের এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষ ও উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন করিত। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতাদের নাম করিতে যাঁহাদের মুখে প্রশংসাবাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাঁহারা ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইবেন এবং হয়ত বিস্মিত হইবেন; কিন্তু আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে, আমরা উহাতে একটুও বিস্মিত হই নাই। ম্যাকডোনাল্ডী কর্তৃত্বের আমল হইতে ভারতের প্রতি ব্রিটিশ শ্রমিকদলের এই প্রীতির পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। আমরা জানি, ঘরোয়া ব্যাপারে ইংরেজের মধ্যে নীতির বিরোধ যাহাই থাকুক না কেন, নিজেদের সাম্রাজ্য স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে তাহারা সকলেই একজোট। সাম্য, স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মুখ হইতে এই সব বড় বড় কথা বড় স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়া থাকে এবং সেইদিক হইতেই ঐগুলির বিচার করা বুদ্ধিমানের কার্য। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমিক স্বার্থবাদী ছাত্রেরা যদি তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া সত্য সত্যই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থচক্র হইতে ভারত এবং উপনিবেশসমূহের মুক্তি কামনা করিয়া থাকে তবে তাহারা যে ইংরেজ সমাজে অপাংক্তেয় হইবে, ইহা জানা কথা।

সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া—

সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গাইয়া মোড়লী কিভাবে বজায় রাখিতে হয়, বাঙলার অর্থসচিব সুরাবর্দি সাহেবের এ বিষয়ে ওস্তাদী আছে। বাঙলা দেশের গত কুড়ি বৎসরের ইতিহাস যাঁহার জানা আছে, তিনি এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারিবেন না। সুতরাং পূর্ববঙ্গের বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া হিন্দুসভার সেবাকার্যে তিনি সাম্প্রদায়িকতার যে অভিযোগ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা একটুও আশ্চর্য হই নাই। বন্যার ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের বেশ বড় একটা অংশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী সাহায্য প্রধানত পাইতেছে যাহারা কৃষক এবং পূর্ববঙ্গের কৃষক সম্প্রদায় প্রধানত মুসলমান। এমন অবস্থায় হিন্দুসভা যদি বিপন্ন হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্রভাবে সাহায্য করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহাতেই বা সাম্প্রদায়িকতা জোর করিয়া টানিয়া আনিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বিপন্নের সেবায় বাঙলার হিন্দুগণ সর্বদা অগ্রণী হইয়াছেন এবং সেই সেবাকার্যে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যের কোন প্রশ্নই এ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। এখনও বাঙলা দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বত্রই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বিপন্নমাত্রের সেবাব্রতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুরাবর্দী সাহেবের মুখে ইঁহাদের কাজের প্রশংসাসূচক কোন কথা আমরা শুনি নাই; কারণ বোধ হয় এই যে, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতা ভাঙ্গাইয়া নিজেদের মোড়লী বজায় রাখিবার নীতির দিক হইতে অবিবেচনার কাজ হয়। তাঁহার বর্তমান অভিযোগের মূলেও রহিয়াছে মুখ্যভাবে মোড়লীর মহিমা পাকা করিবারই মতলব। আজ যদি বাঙলা দেশে বিপন্নদের সাহায্যের ক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হইয়া থাকে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতিই তাহার কারণ। এ বস্তু সুরাবর্দী সাহেব এবং তাঁহার অনুরাগদেরই আমদানী। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নিজেদের মনের কোণে এই সত্যকে বড় বলিয়া বুঝিয়াও দেশের লোককে ইঁহারা ভাঁওতা দিতে চাহেন এবং প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িকতাই ফুটাইয়া তুলিবার ফিকীর

খাটান। চালবাজীটা সূক্ষ্ম হইতে পারে; কিন্তু দেশের লোকের চোখে ইহা ধরা পড়িবে।

বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া—

আমরা জমিদারী প্রথার অনুরাগী নহি। ইহার প্রধান কারণ এই যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ আমরা ভাল মনে করি। এদেশের জনসাধারণের অধিকাংশ হইল কৃষক, সুতরাং কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। মধ্যবর্তী একটা সম্প্রদায়, কৃষকদের মা-বাপস্বরূপে দাঁড়াইয়া রাষ্ট্রের উপর কৃষকদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে ব্যবধান ঘটাইবে, আমরা ইহা চাহি না। মধ্যবর্তী জমিদার সম্প্রদায়ের অসংগত আয়ের ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক দিক হইতে আপত্তির কারণ তো রহিয়াছেই। জমিদারী প্রথার মধ্যে ভাল কিছু নাই—একথা আমরা বলি না; কিন্তু গতানুগতিকতার মোহই তেমন ধারণার মধ্যে অনেকখানি থাকে। একটা ব্যবস্থা বহুদিন চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে, ইহা কোন যুক্তির কথা নয়। ফ্লাউড কমিশন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাব করাতে এই সব বিবেচনা করিয়া আমরা আর্তনাদ উত্থাপনের কোন হেতু দেখি নাই; কিংবা এমন যুক্তিও তুলি নাই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী শ্রেণী যখন এদেশে রহিয়াছে, তখন জমিদার সম্প্রদায়কেও টিকাইয়া রাখিতে হইবে। আমাদের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল, জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ এবং সেই হিসাবে কৃষকদের স্বার্থ। ফ্লাউড কমিশন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার কোন সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশ করেন নাই। ঐ কমিশনের সুপারিশ পরীক্ষা করিবার জন্য বাঙলা সরকার কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান গার্নার সাহেবকে নিযুক্ত করেন। গার্নার সাহেব এক বৎসর আগে তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। বাঙলা সরকার এতদিন উহা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গার্নার সাহেবের রিপোর্টের মর্ম এই যে, জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ করিতে হইলে সরকারকে এই সব স্বত্ব ক্রয়ের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, তাহা ছাঁটকাট করিয়া সরকারের আর্থিক লাভ হইবার কোন আশা তো নাই-ই, বরং লোকসানের সম্ভাবনাই রহিয়াছে। গার্নার সাহেব সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ সম্পত্তির মূল্যের পনেরো গুণ টাকা দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কৃষকদের কল্যাণের জন্য সরকারকে যদি কোন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হয়, সেজন্য নূতন কর বসাইতে হইবে; তাহাতে ফল হইবে বিপরীত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফ্লাউড কমিশনের সুদীর্ঘ রিপোর্ট এবং তাহার উপর সুপণ্ডিত গার্নার সাহেবের সারগর্ভ মন্তব্য, এসব সত্ত্বেও বাঙলার কৃষকদের আর্থিক দুর্দশার প্রতীকারের প্রকৃত কোন পন্থা নির্ধারিত হইল না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, মূল্যবান মস্তিষ্কের এইরূপ অপব্যবহারের কি প্রয়োজন ছিল? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, বাঙলার কৃষকদের দরদের দরদী মন্ত্রীদের সস্তা চালবাজীতে সুবিধা করিবার পক্ষে ইহা প্রয়োজন ছিল এবং গার্নার সাহেব তাঁহার রিপোর্টে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের যে সব আর্থিক অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছেন তাহাও মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। মন্ত্রীরা ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টখানা চাপা দিতেই চাহিয়াছিলেন, গার্নার সাহেবের রিপোর্টে উহা কার্যত ধামা চাপা পড়িল।

ব্রহ্ম হইতে ভারতীয় বিতাড়ন—

ভারত সরকারের সঙ্গে ব্রহ্ম সরকারের এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে; এই চুক্তি অনুসারে ১লা অক্টোবর হইতে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে আর ব্রহ্মদেশে যাইতে দেওয়া হইবে না। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির সর্বত্র লাথি গুঁতা খাইয়া আসিতেছে। খাস ইংলণ্ডেই ভারতবাসীদিগকে এমন কি, ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চপদস্থ এবং ইংরেজনবীশ, তাঁহাদিগকে কেমন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে, স্যার হরিসিং গৌড়ের প্রতি লণ্ডনের এক হোটেলওয়ালার আচরণেই তাহা বুঝা গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগকে তো 'কুলী' ছাড়া কথা বলা হয় না। ব্রহ্মদেশ সেদিনও ভারতের সঙ্গে একই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সংযুক্ত ছিল এবং ব্রহ্মী ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্পর্ক ঠিক সাদা কালার সম্পর্ক নয়; কিন্তু এতদিন পরে ব্রহ্মদেশও ভারতবাসীর পক্ষে দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত হইল। ব্রহ্মদেশ আজ ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র। নিজেদের দেশের স্বার্থ রক্ষা করিবার ক্ষমতা ব্রহ্মীদের থাকিবে না আমরা ইহা বলি না; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভারতীয় বিতাড়নের এই যে কঠোর বিধি প্রবর্তিত হইল, সত্যই ইহার কি প্রয়োজন ছিল? ব্রহ্মদেশে বিদেশী জাতির লোক আরও রহিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা অবশ্য মনিবের জাত, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা অপরাধ হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া চীনা রহিয়াছে যথেষ্ট, মালয়ী রহিয়াছে, বিতাড়নের ব্যবস্থা তাহাদের কাহারও উপর প্রযুক্ত হইল না, হইল ভারতীয়দেরই উপর! বহুদিন হইতেই সেখানে ভারতীয় বিদ্বেষ বাড়াইবার জন্য চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল, এই চুক্তির দ্বারা উভয় দেশের সরকার, সেই চেষ্টাকেই প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিলেন। এই চুক্তির ফলে ব্রহ্মী বা ভারতবাসী কাহারও কল্যাণ হইবে না। কর্তারা এই চুক্তিকে জনস্বার্থমূলক চুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে কি ভারত, কি ব্রহ্মদেশ—কোন দেশের জনসাধারণের সঙ্গেই এমন চুক্তির সম্পর্ক নাই। এ চুক্তি ব্রহ্মের কতকগুলি উপদলীয় স্বার্থগত সুবিধাবাদী রাজনীতিকের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি। জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে এই চুক্তি ব্রহ্ম এবং ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই নিন্দিত হইবে।

রুশিয়ার যুদ্ধ ও ভারত

ভারতের উপর বড় রকমের বহিরাক্রমণ সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব—ভারতের নূতন জঙ্গীলাট জেনারেল ওয়াভেল এদেশের সমরবিভাগের ভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। 'স্টেটস্‌ম্যান্‌' পত্রের সম্পাদক মিঃ আর্থার মূর অক্সফোর্ডে ভারতীয় নিদাঘ বিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় এই আতঙ্ক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, জার্মানেরা মস্কোর দিকে আক্রমণ চালাইতেছে এবং ককেসাস্‌ অঞ্চলে প্রবেশ করিবার জন্য সজ্জিত হইতেছে। উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ উপস্থিত হইবে। ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, জার্মানি যদি রুশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দিয়া ককেসাসের দিকে জোরের সঙ্গে আগাইয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলে ভারতের আকাশে সমরের প্রলয় ঘনঘটা গর্জিয়া উঠিবে এবং সেই মেঘাড়ম্বর শুধু পশ্চিম দিক হইতেই নয়, পূর্ব দিক হইতেও আসিয়া ভারতের আকাশকে আচ্ছন্ন করিবে।

রুশিয়ার সীমান্ত ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই

রুশিয়ার লাল ফৌজ বাহিনীর বিমান চালকদল কুচকাওয়াজ করিতেছে

শুধু বাকুর তেলের খনিগুলির উপরই যে তাহাদের দৃষ্টি আছে এমন নয়, ইরাক এবং ইরাণের তেলের খনিগুলিও দখল করিবার জন্য তাহাদের মতলব রহিয়াছে। এদিকে জাপান ইন্দোচীনের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম ও সিঙ্গাপুর আক্রমণের উদ্যোগে রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জার্মানির সঙ্গে রুশিয়ার লড়াই বাধিবার ফলে জার্মানদের তড়িৎ-আক্রমণের আতঙ্ক ইংলণ্ডের পক্ষে কিছু কমিলেও ভারতের পক্ষে আতঙ্ক হ্রাস পায় নাই। ব্রিটিশ বাহিনী স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর সহযোগিতায় সিরিয়া অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সিরিয়া, ইরাক ও ইরাণের সমস্যার তাহাতে চূড়ান্ত সমাধান হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে একজন সামরিক বিশেষজ্ঞের মুখে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, রুশিয়ার সঙ্গে লড়াই বাধিবার পর জার্মানি কর্তৃক ভারত আক্রমণের আতঙ্ক অনেকটা হ্রাস পাইল, কিন্তু বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিলে এই জার্মান সৈন্যেরা সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণে কিছু বিব্রত হইয়া পড়ে। তাহারা এতটা বাধা যে পাইবে, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্সে তড়িৎ-বিজয়ের বিচারে তাহা আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই। জার্মান সেনাদল এই বাধা পাইবার পর কিছুদিন একটু থমকিয়া ছিল; কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তাহাদের এই মন্থরতা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না, বড় গোছের পরিকল্পনা লইয়াই তাহারা লড়াইতে নামিয়াছে এবং অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাহাদিগকে রুশিয়া আক্রমণ করিতে হইয়াছে। কিছুদিন সমরোদামে ঢিলা দিবার পর জার্মান সৈন্যেরা পুনরায় সমগ্র রুশ রণাঙ্গনে জোর দিয়াছে। এত সত্বরই যে তাহাদের পুনরাক্রমণ আরম্ভ হইবে, তাহা মনে করা গিয়াছিল না। এই পুনরাক্রমণের পর্যায়ে তাহারা স্মোলেনিস্কের কাছে গিয়াছে। মিনস্ক দখলের পর মস্কোর অভিমুখে স্মোলেনিস্ক বিজয়

তাহাদের পক্ষে সামান্য বিজয় নয়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মিনস্ক অতিক্রম করিবার পর জার্মান বাহিনীর মস্কোর দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে বেরেজিনা এবং নীপার নদী এই দুইটি বড় বাধা ছিল। এই বাধার জন্য অগ্রগামী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে কিছু বিপদেই পড়িতে হয়। সে বাধা অতিক্রম করিলে তাহারা স্মোলেনস্ক দখল করিবে। সোভিয়েট সেনাদল ভীষণ বিক্রমে বাধা দিয়াছে এবং প্রতি খণ্ড ভূমি দখল করিবার জন্য জার্মানিকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে; এই ক্ষতি স্বীকারে তাহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই। শহর হিসাবে স্মোলেনস্কের গুরুত্ব আছে, মস্কোর পশ্চিম দিকে স্মোলেনস্ক রুশিয়ার বড় একটা রেলওয়ে জংশন, তাহা ছাড়া বড় একটা কারবারী জায়গা। মিনস্ক হইতে মস্কোর আধাআধি রাস্তা ছাড়াইবার পরে স্মোলেনস্ক শহর পড়ে। জার্মানরা অবশ্য স্মোলেনস্ক দখল করার পর রেলপথে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহের সুবিধা এই শহর হইতে বিশেষ কিছু পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সোভিয়েট সেনাদল মিনস্ক শহরকে যেমন সম্পূর্ণ ভগ্নস্তূপে পরিণত করিয়া হটিয়া গিয়াছিল, স্মোলেনস্ককেও সেই অবস্থায় তাহারা রাখিয়া যাইবে। স্মোলেনস্ক রুশিয়ার অধুনা প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত স্ট্যালিন লাইনের ভিতরে অবস্থিত বলা চলে। স্ট্যালিন লাইনের রক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ঠিক বলা যায় না; কারণ সোভিয়েট সমর-চাতুর্যের এ সব কথাই গোপন, তবে এই মাত্র বলা চলে যে, এই স্ট্যালিন লাইন, সিগফ্রীড লাইন, ম্যাজিনো লাইন বা ম্যানারহাইম লাইনের মত নয়। এই লাইন ভেদ করা দুই-দশ মাইলের ব্যাপার নয়, কোথায় কোথায় পঞ্চাশ ষাট মাইল ইহার গভীরতা, কোন অঞ্চলের গভীরতাই পঁচিশ মাইলের কম নয়। গভীরতা বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ অঞ্চল জুড়িয়া নানারকম রক্ষা-ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং অধিকাংশ রক্ষা-ব্যবস্থাই প্রচ্ছন্ন আকারে; সহজে ধরা পড়িবার উপায় নাই। স্মোলেনস্ক হইতে মস্কো পর্যন্ত সমস্তটা অঞ্চল বলিতে গেলে এইরূপ রক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত। সে সব অতিক্রম করিয়া এবং দুর্ধর্ষ রুশ সেনাদের বাধাকে প্রতিহত করিয়া মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়া সহজ হইবে না। উত্তরে লেনিনগ্রাদ এবং দক্ষিণে কিয়েভের দিকে জার্মানেরা আক্রমণে আগাইয়া গিয়াছে। জার্মানেরা মস্কো দখল করিতে পারিবে না, এমন কথা বলা যায় না—মস্কো দখল করিবার আগেই তাহারা কিয়েভ দখল করিতে পারে, তার পর পেট্রোগ্রাদ দখলের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। রুশ সেনার বলবিক্রম আমরা অস্বীকার করি না, জার্মানেরা নিজেরাও তাহা অস্বীকার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহা সত্ত্বেও রুশিয়ার কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থান জার্মানি দখল করিয়া বসিবে, এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু সে সম্ভাবনা কার্যে পরিণত হইলেই যে রুশিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবে, ইহা মনে করা ভুল; প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের তখন অভিনব পর্যায় সুরু হইবে। সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইংলণ্ড কিংবা ফ্রান্সের মত নয়। প্যারিসের পতন হইলে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এলাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, লণ্ডনের পতনে ইংলণ্ডে ঠিক তেমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে না বটে, তথাপি সেখানকার শাসন-ব্যবস্থাও অনেকটা কেন্দ্রানুগ; কিন্তু রুশিয়ার শাসন-ব্যবস্থা অন্যরূপ। কয়েকটি প্রধান প্রধান শহর জয় করিলেই রুশিয়া জয় করা হইবে না—প্রত্যেকটি সোভিয়েটের সঙ্গে লড়াই চালাইতে হইবে। সোভিয়েট সেনা পরিচালনার ভার যে তিনজন সেনাধ্যক্ষের উপর দেওয়া হইয়াছে, সামরিক দক্ষতার সঙ্গে সোভিয়েট শাসন-শৃঙ্খলা এবং সেই শাসন-শৃঙ্খলার

লেনিনগ্রাড উইন্টার প্যালেসের দৃশ্য

পরিচালনে জনপ্রতিনিধিগণের সহিত রাজনীতিক দিক হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরের যোগ রহিয়াছে। ভোরোসিলফ, বুদেনি এবং তিমোসিঙ্কোর নাম সমগ্র রুশিয়ার ঘরে ঘরে প্রচলিত, এবং তাঁহাদের সুখ্যাতি রুশিয়ায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক রুশ সেনা ভেরোশিলভের মত সাহসী, বুদেনীর মত অশ্বারোহণে সুদক্ষ এবং তিমোসিঙ্কোর মত রণচাতুর্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। সোভিয়েট বিমানবহরের অধ্যক্ষ লোকটিও-নোভ একজন খ্যাতনামা স্বদেশপ্রেমিক। জেনারেল র্যাঙ্গেলের ষড়যন্ত্র হইতে তিনি দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সোভিয়েট সেনাদের বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহারা সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে, অন্য সব দেশের মত জড় যন্ত্রবৎ নেতৃত্বের অপেক্ষায় ইহারা থাকে না। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণায় তাহারা প্রত্যেকে অনুপ্রাণিত। সুতরাং রুশিয়ায় প্রকৃত যুদ্ধ চলিবে এখন এই আভ্যন্তরীণ জনশক্তির সঙ্গে। তবে জার্মানি এই আশা করিতেছে যে, অগ্রগতির উন্মাদনায় সে নিজের কাজ হাসিল করিতে পারিবে। সে পরিস্থিতিকে নিজেদের সুবিধা-জনক দিকে ঘুরাইয়া লইতে সক্ষম হইবে। এ যুক্তির মূল্য কিছু যে না আছে, এমন নয়।

পশ্চিম দিক হইতে জার্মানির এই অগ্রগতির প্রতিক্রিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরে তরঙ্গ উঠিবে এবং তাহার ধাক্কা ভারতের উপর আসিয়া পড়িবে, ইহাও বেশ বুঝা যায়। সম্প্রতি জাপানের যে সব সাজ সাজ রব শুনিতেছি, আমরা তাহাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে চাহি না। জাপান যদি জার্মানির বিশেষ জোর না বুঝে, তাহা হইলে কিছুতেই যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না। সেখানে যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা প্রতীক্ষাবাদী। জার্মানি অবশ্য চায় যে, জাপান এখনই লড়াইতে নামিয়া পড়ে, জাপানের একদল সামরিক নেতাও আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে ব্যগ্র, মাৎসুওকা এবং আরাকীর দল এই মতের অগ্রণী; কিন্তু নূতন মন্ত্রিসভায় দেখা যাইতেছে, সে দলের চেয়ে অপর দলকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ব্যারণ হিরানুমার নাম এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জার্মানির অগ্রগতি অপ্রতিহত, ইহা না বুঝা পর্যন্ত জাপান রুশিয়ার বিরুদ্ধে নামিবার ঝুঁকি লইবে না; তবে সেই ঝুঁকি না লইয়া নিজেদের কাজ যতটা গোছাইয়া লইতে পারে, সে চেষ্টা করিতেও কসুর করিবে না, ইহা বুঝা যায়। জাপান স্পষ্টই বুঝিতেছে যে, এখন জার্মানির পক্ষ লইয়া তাহার লড়াইতে নামার অর্থ এ, বি, সি, ডি, অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটিশ, চীন এবং ওলন্দাজ, এই সঙ্ঘশক্তির সম্মুখীন হওয়া। সেই সঙ্গে রুশিয়ার থাকিবে যোগ।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে, লড়াইয়ের গতি এবার এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হইতেছে। জার্মান সমর বিশেষজ্ঞগণ বহু পূর্বে আনাটোলিয়া এবং ইরাণের পাশে ঢুকিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার ছক অনেকে কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, জার্মানি সেই চাল কার্যে পরিণত করিবার মতলবে আছে; অমন অবস্থায় সামরিক পরিস্থিতির গুরুত্ব হইতে ভারতকে মুক্ত বলা যাইতে পারে না।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানি লড়াইতে নামিবার পর ভারত-বাসীদের মনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে, সম্প্রতি বাঙলা দেশের কতিপয় বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং সাহিত্যিক এই সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

সোভিয়েটেরা পাষণ্ডী, তাহারা নাস্তিক, ধনতন্ত্রমূলক-গণ-তান্ত্রিকতাবাদীদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি, সোভিয়েটকে সাহায্য করিবার শত কথা বলা সত্ত্বেও তাঁহারা মন হইতে সোভিয়েটের প্রতি এই ঘৃণার ভাবটা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও জেনারেল স্মাটসের নজীর উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন যে, রুশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহার সর্তগুলি প্রকাশিত হইবার পর এমন কথা কেহ আর বলিতে পারিবেন না যে, ইংরেজ রুশিয়ার দলে ভিড়িয়াছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বড়কর্তাদের মধ্যে ইহা লইয়া বেশ একটু বচসা হইয়া গিয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার নবনিযুক্ত ইংরেজ হাই কমিশনার মিঃ রেনল্ড ক্রশ সিডনী শহরে পদার্পণ করিয়াই বলেন,—ইংলণ্ডের সর্বত্র রুশিয়ার শাসনপদ্ধতি ঘৃণিত হইয়া থাকে, সামান্য দুই-একজন লোক মাত্র মনে করে যে, ঐ শাসনপদ্ধতি নাৎসী প্রভুত্ববাদের চেয়ে একটু ভাল। অস্ট্রেলিয়ার নৌসচিব মিঃ হিউয়েস মিঃ রেণল্ড ক্রশের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "রুশিয়াকে বন্ধু স্বরূপে পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। রুশিয়া আমাদের বন্ধু। যাহারা রুশিয়াকে কথায় এবং কাজে ঘৃণা করে, বর্তমান সময়ে তাহারা নিশ্চয়ই ইংরেজের বন্ধু নয়। দুই মাতব্বরের এই বচসার মাঝে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস পড়িয়া যান কিছু মুস্কিলে। পাষণ্ডী মতের বিরুদ্ধতা করাই নিরাপদ মনে করিয়া তিনি বলেন, মিঃ হিউয়েস অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে নিশ্চয়ই কোন কথা বলেন নাই। মিঃ ক্রশ ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজের একজন গুণী ব্যক্তি। গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার অধিকার তাঁহার থাকা উচিত।"

রুশিয়া পাষণ্ডী, রুশিয়া নাস্তিক, ভগবানকে মানে না। জগতের পতিত জাতিগুলিকে মানুষ করিবার পবিত্র দায়িত্ব যাহাদের উপর ভগবান দিয়াছেন, সেই সব শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ববাদীদের পক্ষে রুশিয়ার বিরুদ্ধে ঘৃণা থাকিবে, ইহা আমরা বেশই বুঝি। কারণ, 'সর্ব দ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ জম্বু দ্বীপ, তাহাতে ভারত-বর্ষ ধর্মের প্রদীপ' এবং আমাদের সেই ধর্মনিষ্ঠার জন্য এখনও পাশ্চাত্যের মাতব্বর পণ্ডিত প্রভুদের পিঠ চাপড়ানী পর্যন্ত আমরা পাইয়া থাকি। তবু একথা স্বীকার করিব যে, এই সংগ্রামে রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি আমাদের আছে এবং সেই সহানুভূতি ধনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রবাদীদের মত অতখানি ব্যাহতও নয়। রবীন্দ্র-নাথকে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতীকস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতের অধ্যাত্মিকতার তিনি বাণী মূর্তি। রুশিয়ার প্রতি ভারতের সহানুভূতির কারণ কোথায়, তিনি তাঁহার রুশিয়ার চিঠিতে বহুদিন পূর্বেই ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন এবং এই সেদিনও তাঁহার 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক বক্তৃতায় আমরা তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। যাঁহারা ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁহারাও রুশিয়ার আদর্শ সাধনার মধ্যে একটা জিনিস দেখিতে পান, তথাকথিত ঈশ্বরনিষ্ঠ অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ শক্তির মধ্যে যাহা দুর্লভ। সোভিয়েট ভগবানকে না মানিতে পারে; কিন্তু তাহারা মানুষকে মানে। অবশ্য খাঁটি মার্কস্‌পন্থীদের আদর্শের কথাই বলিতেছি। স্ট্যালিনের প্রতিষ্ঠার পরে, নিরীশ্বরবাদ সোভিয়েটে বাধ্যতামূলক নয়। ধর্ম সম্বন্ধে সেখানে এখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সকলকেই দেওয়া হইয়া থাকে। মসজিদ, গীর্জা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও বলা যায় যে, মানুষকে মানা, মানুষের সেবা, সোভিয়েট শাসনপদ্ধতিতে যাহা সর্বোচ্চ আদর্শস্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে, ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় ইহার মূল্য সবচেয়ে বেশী। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের সেবায় এই সর্বজনীন উদার আদর্শ অধ্যাত্মবাদী ভারতবাসীদের অন্তর স্পর্শ করে; পক্ষান্তরে ভগবানের দোহাই দিয়া যাহারা মানুষকে

শোষণ করাই বড় বলিয়া বুঝিয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে দাবাইয়া রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে, ভারতীয় সাধনায় তাহাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ স্থান কখনও স্বীকৃত হয় নাই; কোথায়ও যদি স্বীকৃত হয়, হইয়াছে স্বার্থের চাপে পড়িয়া, সত্যের খাতিরে নয়। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে সমদর্শনই হইল সকলের চেয়ে বড় কথা, অবশ্য, আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ সর্বতোব্যাপ্ত অখণ্ড আত্মার উপলব্ধি ভিন্ন এই দর্শন যে সত্য হইতে পারে, ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা কিছুতেই তাহা স্বীকার করে না, তথাপি যাহারা এই সমদর্শনকে আদর্শ করিয়া মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করিতেছে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতির ভাব ভারতবাসীদের মনে স্বভাবতই উদ্রিক্ত হইবে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অধ্যাত্মবাদী এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় ভগবানে বিশ্বাসী ভারতীয় মনীষী সোভিয়েটের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন এই হিসাবেই। ভগবানের দোহাই দিয়া গণতান্ত্রিকতার বুলি মুখে আওড়াইয়া যাহারা মানুষের দুঃখ দৈন্যকে উপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের চেয়ে, মানুষের যুগান্ত সঞ্চিত নিরক্ষরতা যাহারা কুড়ি বৎসরের মধ্যে দূর করিয়াছে, বর্ণবৈষম্য এবং ধনগর্বকে যাহারা বিচূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি মানবপ্রেমিকের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শে যাঁহারা সত্যই অনুপ্রাণিত, তাঁহারা মানুষের উপর বিদ্বেষবুদ্ধিতে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থমূলক যে সব সমাজব্যবস্থা, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না এবং মানবের সমাধিকার ও সাম্যমূলক সামাজিক বিপ্লবকে তাঁহারা অভিনন্দনই করিয়া থাকেন। মানব-মহত্ত্ব স্বীকৃতির তেমন বিপ্লব প্রচেষ্টাকে ভারতবর্ষ, বিশেষভাবে এই বাঙলা দেশ বরাবরই অভিনন্দিত করিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব যুগে বাঙলা দেশে মানবপ্রেমের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আজও তাহার গতিবেগ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয় নাই। বিভিন্ন সংস্কারের ভিতর দিয়া বাঙলার সংস্কৃতির সে বলিষ্ঠ শক্তি সমগ্র ভারতে কাজ করিতেছে।

ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির এই মনস্তত্ত্বকে নিজেদের সুবিধার জন্য প্রয়োগ করিতে পারেন। ভারতের ভাবাদর্শের উৎসস্বরূপ হইল এই বাঙলা দেশ; এই সুযোগে মানুষের অধিকার স্বীকৃতির উদার আদর্শ যদি তাহারা অনুসরণ করেন, তাহা হইলে বাঙলার তরুণ চিত্তে সেই আদর্শের অনুকূলে সহানুভূতি জাগিবে এবং বাঙলার তরুণ চিত্তের সে উদ্দীপনা সমগ্র ভারতে উৎসারিত হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষের মতিগতির তেমন পরিবর্তনের কোন লক্ষণই এ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধ ভারতের দিকে আসিয়া পড়িল, শুধু এমন কথাই শুনা যাইতেছে, কিন্তু আসন্ন এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণেও ভারতের জনমতের আন্তরিক সহযোগিতা কর্তারা একান্তভাবে যে কামনা করেন, ইহার পরিচয় কোন দিকেই নাই। মিঃ আর্থার মুর প্রশ্ন করিয়াছেন,—"যদি চীন ধ্বংস হয়, ভারতবর্ষ কি বাঁচিতে পারে? জার্মানি যদি এশিয়া মাইনর এবং মধ্য এশিয়া ডিঙ্গাইয়া পার হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব কি বজায় থাকিবে? সমগ্র এশিয়াতে এমন উৎসাহ উদ্দীপনার অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে হিটলার এবং জাপানী সামরিকদের সব চক্রান্তের জাল ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইংরেজ এবং ভারতবাসীর উপরই সেই উৎসাহ উদ্দীপনা জাগাইবার ভার রহিয়াছে।" সেজন্য ভারতের আত্মা সাড়া দিতে প্রস্তুত আছে। জার্মানি যদি রুশিয়াকে হটাইতে না পারে, সে যদি রুশিয়ার হাতে শক্ত ঘা খায়, তাহা হইলে এশিয়া মাইনরে এবং মধ্য এশিয়ায় অভিযানের সব পরিকল্পনা তাহার ব্যর্থ হইবে এবং তাহার দোস্ত জাপানও মাথা নাড়া দিতে পারিবে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদসুলভ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ মানবের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিবেন কি? তাহা হইলেই ভারতের পক্ষ হইতে রুশিয়ার সংগ্রামে সত্যকার সহযোগিতা তাঁহারা পাইবেন এবং সমগ্র ভারতের জাগ্রত জনমত তাঁহাদের অনুবর্তন করিবে। জার্মান-রুশ সংগ্রামের আসন্ন পরিস্থিতিতে ভারতের সেই বিশিষ্ট দানের সুবিধা গ্রহণ করা ইংরেজের পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। মার্কিন ধনতান্ত্রিকদের মুখাপেক্ষা ছাড়িয়া ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ যত সত্বর এই সত্যকে উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।
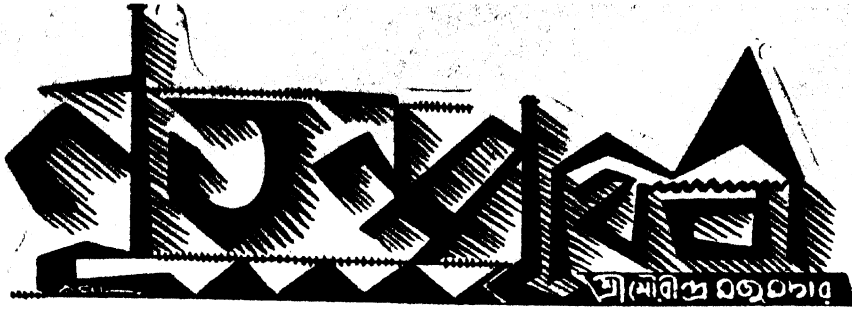
[৬]

অলকনন্দার আক্রমণে সঞ্জিত আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিল, কঠিনস্বরে বলিল, থামলে কেন, আরও বাকি র'য়ে গেল যে, বল, বল—অত্যাচার, অপমান, পীড়ন, নারীত্ব মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা- বল আরও সুন্দর সুন্দর শব্দগুলি। লজ্জাও করে না দুপুর রাত্রে নাটুকিপণা বক্তৃতা করতে। স্বামী সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ঘরে এসে দেখবে স্ত্রী সাজগোজ ক'রে বেরিয়ে গেছেন, আর ছেলেমেয়েগুলি অনাথ বালকের মত এর বাড়ি ওর বাড়িতে হ্যাংলাপণা ক'রে ঘুরছে। স্বামী পুত্রকন্যাকে আগলিয়ে বসে থাকবে, ঠান্ডা কড়কড়ে ভাত খেয়ে কিংবা না খেয়ে কড়িকাঠ গুণবে আর স্ত্রী করতালির সঙ্গে বক্তৃতা করবে। ছেলেমেয়েদের দুঃখকষ্ট দেখে, পাড়াপড়শীদের কুৎসায় যদি স্বামী কিছু বলে, তবে স্বামী অত্যাচারী, পাষণ্ড হ'য়ে যায়, নারীত্ব, স্বাধীনতা পদদলিত করা হয়।

এও কি অভিনয়ের ভাষা নয়! শুনতে ভাল লাগতে পারে, পুরুষ কেন, যে কোন নারীই তোমার পক্ষ সমর্থন ক'রে আমায় গাল দেবে, কিন্তু এ ত' সত্যি কথা নয়। বিষয়গুলি যে একেবারে মিথ্যে, তা আমি বলছিনে, কিন্তু আংশিক সত্য কথাগুলি এমনভাবে বলেছ যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথাও এত বড় মারাত্মক হ'ত না। তারপর সভাসমিতিতে আমি যাই—যাওয়াটাই ত' স্বাভাবিক, একজন খাঁটি শ্রমিক কর্মী সভাসমিতিতে কিংবা জেলে যে যাবে, তা ত' তোমার ভাল ক'রেই জানা আছে। তবে কেন অমন মিথ্যে—

মিথ্যে?

নিশ্চয় মিথ্যে—সম্পূর্ণ নির্লজ্জ মিথ্যে—!

সঞ্জিত সহসা অলকনন্দার হাত ধরিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, মিথ্যে!

তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ, শরীরে হাত তুলেছ, ছাড়—

এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে পিয়ারী বাঈর চীৎকার শুনা গেল। গভীর রাত্রে পিয়ারীর চীৎকার অপ্রত্যাশিত নয়, মাঝে মাঝে পিয়ারী মাতাল স্বামীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করে।

আজ পিয়ারীর চীৎকার নূতন রূপ লইয়া সঞ্জিত ও অলকনন্দাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সঞ্জিতের দৃঢ় মুষ্টি আপনি খসিয়া পড়িল, মস্তক নত হইয়া গেল।

পিয়ারীকে সাহায্যের জন্য এখনই ছুটিয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু সঞ্জিত লজ্জায়, অনুশোচনায় এত মুশড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সে কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিল না, এমন কি সহসা বাহিরও হইয়া যাইতে পারিল না।

প্রথম অলকনন্দাই কথা কহিল, বলিল, মাতালটা পিয়ারীকে মেরে ফেল্‌ল।

তাইত! সঞ্জিত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, যেন সে ইতিপূর্বে ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারে নাই।

নোংরা একটি ঘর। এক পাশে একটি খাটিয়া, চারিদিকে অগুছান জিনিসপত্র। বহুদিন যেন এ ঘরে কেহ বাস করে না এমনি এর অবস্থা। একটা পুরাতন দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ হাওয়া সারা ঘরটিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ঘরের জানালা বিশেষ নাই, যে কয়টি আছে তাহাও খোলা হয় না।

দরজাটি খোলাই ছিল। সঞ্জিত বিনা বাধায় ভিতরে প্রবেশ করিল। চন্দ্ররাওএর অপরদিকে লক্ষ্য করিবার মত জ্ঞান ছিল না। পিয়ারীকে এক হাতে ধরিয়া অপর হাতে চাবুক লইয়া শাসাইতেছে। পিয়ারী ঘুমাইয়াছিল, প্রস্তুত হইবার অবকাশ পায় নাই। শাড়ি তাহার খসিয়া পড়িয়াছে, পায়ে জড়াইয়া রহিয়াছে—পরিষ্কার কোমল দেহে কয়েকটি চাবুকের প্রহার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সঞ্জিত ভিতরে ঢুকিয়া থমকিয়া গেল। চন্দ্ররাও যাহা বলিয়া চলিয়াছে তাহা যে কোন লোক বলিতে পারে তাহা তাহার ধারণা ছিল না। এত অশ্লীল গালি সে শুনিবে বলিয়া প্রস্তুত ছিল না।

পিয়ারীও কম যায় নাই। চন্দ্ররাও সত্য মিথ্যা যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিয়া চলিয়াছে। পিয়ারী সতীত্বের এত বড় অপবাদে প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা প্রারম্ভে স্বীকার করিয়া লইয়া শেষ জবাব দিল যে, সে আর মাতাল, বদমাইস স্বামীর ঘর করিবে না, পৃথক হইয়া যাইয়া টাকা রোজগার করিবে এবং সুখে থাকিবে।

এত বড় দম্ভ চন্দ্ররাও সহ্য করিতে পারিল না, সপাং করিয়া মুখের উপর চাবুক মারিয়া বলিল, আগুন দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেব, বেশ্যা মাগী।

সঞ্জিত আর দেরি করিল না, চন্দ্ররাওকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। বাধা পাওয়ায় চন্দ্ররাও-এর বীরত্ব যেন বাড়িয়া গেল।

চন্দ্ররাও আস্ফালন করিয়া বলিল, কে তুমি দুপুর রাত্রে আমার বাড়িতে ঢুকেছ? যত সব বদমাইস, নচ্ছার- মিলে আমার ইস্ত্রিকে নষ্ট করে দিলে—আজই আমি হারামজাদীর সুন্দর মুখ পুড়িয়ে দেব।

সঞ্জিত বলিল, ফের যদি কখনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলো তবে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। বেরিয়ে যাও—

বেরিয়ে যাব, আমি বেরিয়ে গেলে—

চাবুকে-মুখ ছিঁড়ে ফেলব।

কী! আচ্ছা আমি পুলিশ ডাকছি, এ বাবা মগের মুল্লুক পেয়েছ—রাজা নেই দেশে?

চল্ তোকে থানায় নিয়ে যাই।

চন্দ্ররাও তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে গিয়া বলিল, পুলিশে দেবে—কেন আমি কি চোর, আমি পকেট কাটি? আমার বিয়ে করা বউকে একশবার শাসন করব—তোমরা কেরে ব্যাটা।

সঞ্জিত চাবুক তুলিতেই চন্দ্ররাও ভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল।

অলকনন্দাও পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়াছিল তাহা সঞ্জিত লক্ষ্য করে নাই, ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল অলকা তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সঞ্জিত অলকার হাত ধরিয়া বলিল, তুমি কেন এ নোংরা স্থানে এলে, চল।

এখানেই ত আমার সবচেয়ে বড় কাজ।

এই বিষাক্ত ও কলুষিত হাওয়ায় তোমার দম আটকে আসবে না?

না, তুমি যে আমার পাশে রয়েছ।

অলকা! সঞ্জিত অলকনন্দার হাত ধরিতে গিয়া পিয়ারীকে দেখিয়া সংযত হইয়া গেল, বলিল, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

সঞ্জিত বাহির হইয়া গেল।

পিয়ারী—বোন!

অলকনন্দার কণ্ঠস্বরে পিয়ারী যেন জাগিয়া উঠিল, আঘাত পাওয়া সাপিনীর মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, এ অত্যাচার ও মারধরের জন্য তুমিই দায়ী। তোমার জন্যেই আমার এ দুরবস্থা।

আমি! তুমি বলছ কি পিয়ারী।

সত্য কথাই বলছি। তোমার জন্যেই আমি পালাতে পারিনি। তোমার গায়ে পড়া উপদেশ, যদি না শুনতুম তবে আজ আর আমায় মাতাল ও পশু স্বামীর প্রহার সইতে হত না, এত দুঃখ কষ্ট সইতে হত না।

এর জন্যে কি তোমার ত্রুটি নেই, তুমি দায়ী নও?

না। তুমি বাধা না দিলে আমার এ দুর্দশা হত না, হয়ত আমি সুখী হতুম।

তুমি স্বামী ত্যাগ করে পালাতে চাও?

তাতে দোষ কি! প্রত্যেকেরই সুখী হবার দাবী আছে। আমি টাকা চাই, ভোগ চাই, বিলাস চাই। তুমি বেশ ভাল করেই জান, ওগুলি আমি সহজেই পেতুম এবং আর এত দুঃখ কষ্ট নির্যাতনও আমায় সইতে হত না।

পিয়ারী, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এত বড় ভুল কর না, শেষে অনুতাপ করে কূল পাবে না। নারী জীবনের এত বড় সর্বনাশ স্বেচ্ছায় নিও না।

থাক্ থাক্ ধর্ম-হিতকথা আর বলতে হবে না। আমার টাকা হোক, আমি সুখী হই এ তোমরা চাও না। একটা পাষণ্ড মাতালের লাথি ঝাঁটা খেয়ে আমি তিলে তিলে মরি—এই ত' তোমরা চাও। আমি যদি তোমার পরামর্শ না শুনতুম তবে কি না করতে পারতুম, দু'চারটে ঝি চাকর, কি দালান কোঠা, গাড়ি কি এতদিনে আমার হত না?

পিয়ারী আমায় বিশ্বাস কর। সত্যই আমি তোমাদের একজন। আমি তোমাদের ভালবাসি, তোমাদের উন্নতি তোমাদের কল্যাণ আমি সর্বদা কামনা করি। আমি তোমাদের দারিদ্রে, তোমাদের কলঙ্কে, তোমাদের হীনতায়, দীনতায় মরে যাই। বিশ্বাস কর পিয়ারী, তোমাদের আর্থিক উন্নতি, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, তোমাদের নারীত্ব প্রস্ফুটিত করবার জন্যে আমি আমার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করেছি। অশিক্ষা, কুসংস্কার, দৈন্য, সামাজিক অত্যাচার, রাষ্ট্রীয় পীড়ন, পায়ের নীচে অমানুষ করে রাখবার ধনতন্ত্রবাদের পাশবিক বল ও কণ্ঠাকীর্ণ শৃঙ্খল ভেঙ্গে জেগে ওঠ। পিয়ারী, নিজের দাবি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নিজের হাতে অত্যাচার দমন করতে হবে। এসো আমরা নারীত্ব, মনুষ্যত্ব ও মানবতার দীপ্তিতে জ্বলে উঠি, দেখি কে আমাদের গতি রোধ করতে পারে।

পিয়ারী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, ও ফাঁকিতে আর ভুলছিনি। তুমি যে ভাল বক্তৃতা করতে পার, তোমার জীবনটা যে বক্তৃতা ভিন্ন আর কিছুই নয় তা সকলেই জানে।

এ শুধু বক্তৃতা হল? নারীর জন্য কত জাতি, কত দেশ কত মহাযুদ্ধে ধ্বংশ হয়েছে, নারীকে উপঢৌকন দিয়ে কত জাতি, কত দেশ রক্ষা পেয়েছে—এ যে নারী জাতির পক্ষে কত বড় অপমান, কত বড় কলঙ্কের কথা তা কি তোমরা বুঝবে না? আজ তুমি চাচ্ছ রূপের বেসাতি খুলতে—পুরুষকে খুশি করে, প্রতারিত করে অর্থ উপার্জন করতে—এরচেয়ে বড় নীচতা, এরচেয়ে বড় কলঙ্ক আর কি হতে পারে?

তুমি আমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছ, দয়া করে আর ক্ষতি ক'র না। জহরা বেগম আজ বড় বাড়ি করেছে, গাড়ি চড়ে, তার কত দাসদাসী। ছবি তুলে পাঁচ শ' টাকা মাইনে পায়, বাবু তাকে হাজার হাজার টাকা দেয়। আমি তার চেয়ে বেশি সুন্দরী—উঃ আমার কত সর্বনাশ তুমি করেছ! পিয়ারী সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, তোমার আর সতীপণার বড়াই মানায় না—বোকা স্বামী পেয়ে—

সহসা সঞ্জিত ক্রুদ্ধভাবে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অলকনন্দার হাত ধরিয়া বলিল, শিক্ষা হল ত? না, আর এক মুহূর্ত নয় পশুর সঙ্গে কথা বলা চলে না।

সঞ্জিত অলকনন্দার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরেরদিন পিয়ারী বাঈ কোথায় যে চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

এক সঙ্গে বাস করিতে গেলে, মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাটি হইয়াই থাকে এবং মত থাকিলে মতানৈক্য হওয়াই স্বাভাবিক। এই মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাটি ও মতানৈক্য জীবনের মস্ত বড় কথা নয়। যাহাদের জীবন বৃহত্তর, কর্ম্মময় এবং যাহারা সত্য সত্যই বড় তাহাদের জীবন এ সকল সামান্য বিষয়ে উল্টা

দিকে ঘুরিয়া যাইতে পারে না। যাহারা বড় নয়, সত্যিকারের কর্মী নয় তাহাদের জীবনে মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাটিই প্রধান হইয়া পড়ে।

সঞ্জিত ও অলকনন্দার প্রেম সুগভীর ছিল, তাই এত বড় ঘাতপ্রতিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল না। আন্তরিক মনুষ্যত্ব ও প্রেম শান্ত হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া চলে, উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ মনের অসংলগ্ন কথা মানিয়া আত্মহত্যা করিতে পারে না। ভুল যাহারা বুঝে এবং ভুল যাহারা করে তাহাদের প্রেম আন্তরিক হইলেও পশুত্বের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে এমন ঝড় উঠে। ট্র্যাজিডির এই গুপ্ত কথা।

সঞ্জিত ও অলকনন্দার কর্মপন্থা এক নয়, মতানৈক্যও সামান্য নয়, কিন্তু তাহারা উল্টা দিকে মুখ করিয়া যাত্রা সুরু করিল না। উত্তেজনার মুখে কথার পৃষ্ঠে কথা ও রুক্ষ্ম বর্বরতা জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয় এবং শেষ কথা নয়। তাই তাহাদের জীবনে ট্র্যাজিডি আরম্ভ হইল না। ক্ষণস্থায়ী ঝড় তাহাদের জীবনে নূতন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিল।

রাত্রি জাগরণের ফলে সঞ্জিতের শরীর বিশেষ ভাল বোধ হইতেছিল না। বহুক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, দুই চোখ বাহিয়া নামিয়াছে ঘুম। সঞ্জিত ঘুমের নেশা কাটাইবার জন্য কয়েকবার নাকে মুখে জল দিয়া আসিয়াছে কিন্তু শ্রান্তিজড়িত ঘুমের নেশা ক্রমশ তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল।

ঘুমে সঞ্জিতের মাথাটা একটু ঝুঁকিয়া গিয়াছিল, হঠাৎ মঞ্জুশ্রীর সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুশ্রী তাহার দিকে তাকাইয়া নাই। সঞ্জিত একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহাকে ঘুমে ঝুঁকিয়া পড়ার অবস্থায় যদি মঞ্জুশ্রী দেখিতে পাইত তবে লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকিত না। সঞ্জিত তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া চোখ মুখ রগড়াইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষুণি আবার মঞ্জুশ্রী তাহার নিকট আসিবে এবং মিলের ও বস্তির সকল সংবাদ জানিবার জন্য নানাপ্রকার খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিবে।

মিল ও বস্তি সম্বন্ধে সঞ্জিতের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করা লইয়া শ্রমিক মহলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজেন্দ্র সন্দিগ্ধমনা। এমনি সে সঞ্জিতকে ভাল চোখে দেখিতে পারে না, তারপর মঞ্জুশ্রী তাহার উপর অনুগ্রহ করায় রাজেন্দ্র সঞ্জিতকে শত্রু বলিয়াই মনে করে। তাহার বিশ্বাস সঞ্জিত মঞ্জুশ্রীকে মিলের সকল গোপন সংবাদ জানায় এবং তাহার প্রতি মঞ্জুশ্রীর মন ক্রমশ বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে।

রাজেন্দ্র চুপ করিয়া গেল না। শ্রমিকদের উপর সঞ্জিতের যে প্রতিপত্তি রহিয়াছে তাহা নষ্ট করিবার জন্য রাজেন্দ্র কৌশলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল যে, সঞ্জিত কর্তৃপক্ষের চর। গোপনে সে সকল সংবাদ মঞ্জুশ্রীকে জানায় এবং প্রতিদানে তাহাকে ভাল চাকরি দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিক সংঘকে ভাঙিয়া দিবার জন্য সঞ্জিত চেষ্টা করিতেছে এবং এর জন্য সে বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছে। রাজেন্দ্র শুধু সঞ্জিতকে শ্রমিক সংঘ হইতে বিতাড়িত ও লোক চোখে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টাই করিতে লাগিল না, মঞ্জুশ্রী ও সঞ্জিতের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

সঞ্জিত আশা করিয়াছিল মঞ্জুশ্রী প্রতিদিনের ন্যায় তাহার নিকটেই প্রথম আসিবে, কিন্তু মঞ্জুশ্রী আসিল না, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মঞ্জুশ্রী অস্বাভাবিকভাবে চলিয়া যাওয়ায় সঞ্জিতের গতকল্য সভার কথা মনে পড়িয়া গেল এবং তাহার বুক অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কেমন যেন একটা দুর্বলতা, একটা শৈথিল্য তাহার সকল শক্তি গ্রাস করিয়া চলিল। কাল মঞ্জুশ্রীকে ইঙ্গিত করিয়া যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা শুধু মিথ্যা নয়, গর্হিত। সঞ্জিতের অন্তর আপনা আপনিই ছি ছি করিয়া উঠিল এবং লজ্জায় তাহার মাথা আপনি নত হইয়া গেল।

মিনিট পনেরো পরেই মঞ্জুশ্রী ফিরিয়া আসিল। সঞ্জিত ভাবিয়াছিল মঞ্জুশ্রী আপিসে ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাকে আর লক্ষ্যই করিবে না।

মঞ্জুশ্রী তাহাকে উপেক্ষা করিল না, নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিল, এদের আজ এত চঞ্চল—বেশ একটু উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে? কিছু হয়েছে বলে আপনি জানেন?

সঞ্জিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মনে হইল মঞ্জুশ্রী সভার বিষয় কিছুই জানে না, জানিলে তাহাকে এমনভাবে প্রশ্ন করিতে পারিত না। অন্তত মঞ্জুশ্রীর মত সম্ভ্রান্ত মহিলা এত বড় লজ্জাজনক সন্দেহের পর তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না। যদিও ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু জনসাধারণ আলোচনা করিতে পারে মনে করিয়া সে সতর্ক হইত।

সঞ্জিত উত্তরে বলিল, উত্তেজিত হবার মত কিছু ঘটেছে বলে তা আমি কিছু জানিনে।

আমায় দেখে আগে এরা যেমন খুশী হয়ে উঠত তেমন তা আজ মনে হল না। পূর্বেকার সম্পর্কেরই যেন অভাব পেলুম।

এ আপনার ভুল ধারণাও হতে পারে। আপনি এদের অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন—

মঞ্জুশ্রী হাসিয়া বলিল, অনেক কিছুই করতে চেয়েছি, কিন্তু পারছিনে। আপনি হয়ত ভাবছেন, আমার বাবার মিল, আমি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারি। বিশ্বাস করুন, আমি পারিনে। এক স্থানে আমাদের এত বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে যে, আমরা কার্যত শক্তিহীন। আমার মা স্বর্গে যাবার কালে আমার ওপর আশীর্বাদ রেখে যান—সে আশীর্বাদ আমায় পঙ্গু করে রেখেছে। মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তিনি তা ফিরিয়ে নিতেন এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

মায়ের কথা মনে পড়ায় মঞ্জুশ্রীর চোখ সজল হইয়া উঠিল। মঞ্জুশ্রী চোখের জল গোপন করিবার জন্য চট করিয়া মুখখানি ঘুরাইয়া লইল, যেন সে কোন জিনিস দেখিবার জন্য মুখ ঘুরাইয়াছে। মঞ্জুশ্রীকে আত্মগোপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে আর হইল না। নিকটেই কোন এক তাঁতে একটি মাকু সুতায় জড়াইয়া গিয়াছে। মঞ্জুশ্রী তাঁতের দিকে

অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, বেচারী মাকুটা নিয়ে বড্ড অসুবিধায় পড়েছে। সঞ্জিতবাবু, কি স্পিনিং মাস্টার হলেন, একটু ধমকে দিয়ে আসুন। সর্দারী করবার কোন সুযোগ নষ্ট করতে নেই।

মঞ্জুশ্রী সঞ্জিতের দিকে একটু মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসি হাসিল।

সঞ্জিত বলিল, যাদের সঙ্গে দুদিন পূর্বেও একত্রে কাজ করেছি তাদের ওপর অকারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার কিংবা পদমর্যাদার রূঢ় ব্যবহার করবার মত নির্লজ্জতা আমার নেই মঞ্জুশ্রী দেবী।

যে তাঁতে মাকু জড়াইয়া গিয়াছিল সেখানে সঞ্জিত গেল এবং মাকুটি ঠিক করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

সঞ্জিত ফিরিয়া আসিলে মঞ্জুশ্রী বলিল, কৈ আপনার বাড়িতে আমায় নিয়ে গেলেন না!

সত্য সত্যই কি আপনি যেতে চান?

সত্য নয়ত কি মিথ্যে বলছি।

আমরা যে বস্তিতে থাকি, সেখানে আপনি গেলে দুর্নাম হবে।

কমরেডের উপযুক্ত কথা হল না, দেখা হলে দেব আপনার বউকে বলে, বুঝবেন তখন মজা।

মঞ্জুশ্রী হাসিল, সঞ্জিতও না হাসিয়া পারিল না।

মঞ্জুশ্রী বলিল, আপনাদের বাড়িতে বিখ্যাত লোকরা যেতে পারেন আর আমি ত' অতি নগণ্য। সত্যি আপনার স্ত্রীকে দেখবার আমার ইচ্ছে। লোকমুখে প্রশংসা শুনি, কাগজে ছবি দেখি, শুনেছি তিনি নাকি চরম কম্যুনিস্ট—ভারি চমৎকার বক্তৃতা দেন।

স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠায় সঞ্জিত কোন জবাব দিতে পারিল না, নিঃসন্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

তা' হলে কবে নিচ্ছেন?

যেদিন আপনার সুবিধে হয়।

সংসারে আপনার কে কে আছেন?

এখানে শুধু আমরাই আছি, দেশে বাবা, মা ও এক ভাই আছেন। আমিই বড় এবং বাবার ত্যাজ্য পুত্র।

আপনি ত্যাজ্য পুত্র—বলেন কি?

তেজারতী ব্যবসায় করে বাবা বেশ টাকা জমিয়েছেন, জমিজমাও মন্দ করেন নি। আমার নীতি ও কাজ বাবার স্বার্থহানিকর। অনেকবার তিনি আমায় বুঝিয়েছেন, ক্ষমাও করেছেন। আমি পৈতৃক সম্পত্তির লোভে দেশসেবার কাজ বর্জন করিনি, কয়েকবার জেলও খেটেছি। অলকনন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্যকাল থেকেই ছিল, কলেজ জীবনে এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমাদের পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়। অলকনন্দা তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের। বাবা মা আমাদের বিয়ের প্রস্তাবে যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন। সমাজের অত্যাচারে ও মিথ্যা কলঙ্ক রটায় আমরা বিয়ে করতে বাধ্য হই।

নইলে বিয়ে করতেন না?

জীবন ধারণের একটা ব্যবস্থা না করে বিয়ে করতুম না। তবে এ কথা বলতে পারি, আমরা সুখী—আমাদের বিবাহিত জীবন সার্থক হয়েছে।

আপনি আবার ফিরে যান। আপনার পিতা আপনাকে ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নিষ্পাপ নাতি নাতনীদের ত্যাগ করতে পারবেন না।

যেখানে পুত্র ও পুত্রবধূর স্থান হয় না, এমন কি যে বিবাহকে স্বীকার করা হয় না—

তবু ওরা পিতামাতা।

জানি, কিন্তু পারব না মঞ্জুশ্রী দেবী। যে বিবাহকে গৌরবের আসন না দিয়ে কলঙ্কের কালিমা দেওয়া হয়েছে, সেস্থলে আমাদের সন্তান কোন মুখে যাবে কৃপা ভিক্ষা করতে। যেখানে মানুষের দাবী পদদলিত সেখানে দারিদ্র্যের কলঙ্ক নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব কোন লজ্জায়। তা আর হয় না।

সত্যই অদ্ভুত আপনারা স্বামী-স্ত্রী। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে নিয়ে যাবেন ত'।

দুর্নাম হবে কিন্তু।

কোন দুর্নাম? বস্তিতে যাওয়া নিয়ে—সুখ্যাতি হবে। লোকে বলবে এমন পুণ্যবতী, এমন দয়াবতী নারী আর হয় না। লোকের কথায় নির্ভর না করে তিনি ছুটে যেতেন গরিব দুঃখীদের সেবা করতে। মঞ্জুশ্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, তারপর মরলে পরে কাগজে কাগজে যা প্রশস্তি বেরুবে সত্যিকারের পুণ্যবতী ও দয়াবতীরাও হিংসা না করে পারবে না।

প্রশস্তিটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে হবে না।

তবে ভয় কেন? বড়লোকদের আজ যা দুর্নাম কাল তা গৌরবের। তবে, মঞ্জুশ্রী একটু থামিয়া বলিল, কালকের সভার বিষয় নিয়ে ভয় পাচ্ছেন কি?

সঞ্জিত অপরাধীর মত বলিল, আপনি সকল কথা শুনেছেন?

হ্যাঁ।

ওরা, বিশেষ করে আমার স্ত্রী আপনার উপর অবিচার করেছেন। আমি সেজন্য সত্যই লজ্জিত।

মানুষ ঠেকে এবং ঠকে ঠকেই সতর্ক হয়। আমি যে সাহায্যটুকু করতে যাচ্ছি তাকে যদি এরা সন্দেহের চোখে দেখেন তবে তাদেরকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অলকনন্দা দেবী বলেন, আমার এ দুর্বলতাটাই শোষণের পক্ষে বিশেষ কার্যকর হচ্ছে। উদাহরণটা তিনি খুব ভাল দিয়েছেন। কুকুরকে জুতাপেটা করে আয় বলে ডাকলে কুকুর ধন্য হয়ে প্রভুর পা' চাটে। বিজেতা জাতি যখন বিজিত জাতিকে ক্লীব করে নিয়ে রক্ত শোষণ করে তখন একদল সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করলে বাকি সকলে শুধু প্রভুদের কৃপালাভের জন্য সত্য সত্য আন্তরিক বিশ্বাসে বাধা দেয়, বলে, সর্বনাশ ডেকে আনিসনে, বটগাছের ছায়ায় বসে আছিস, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা (প্রভু জাতি কিন্তু ডেমোক্রাট, মহৎ) ওঁৎ পেতে আছে, মাংস চিবিয়ে খাবে। পরাধীন জাতির এই বিশেষত্ব যে, ডেমোক্রেটরা ইক্ষুর কল চালায় বলে পরাধীন

জাতি ভাবে, রসটাই শুধু নিয়েছে, ছোবড়াতে ত' আগুন ধরিয়ে দেয়নি।

মঞ্জুশ্রী একটু থামিয়া বলিল, অলকনন্দা দেবী চরম 'সিমিলি' দিয়েছেন, কিন্তু যাদের সম্মুখে বলেছেন ওরা বুঝতে পারবে না। উনি যা বলেছেন তা মিথ্যে নয়। ধনতন্ত্রবাদীদের দান ও সহানুভূতি একটা মারাত্মক নীতি, সহজ কথায় 'প্যাচ'। নামটা চিরস্মরণীয় করবার জন্যে এবং জনসাধারণকে মোহমুগ্ধ ও সংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখবার জন্যেই ধনতন্ত্রবাদীরা বহু অর্থ ব্যয় করে কীর্তি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নস্তরের লোকগুলি যাতে জেগে না উঠতে পারে এবং দুরদৃষ্টের জন্য অদৃষ্টকে দোষারোপ করে ধর্মেকর্মে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতে পারে, সেজন্যেই ধনতন্ত্রবাদীরা এদের মনকে অনুকূল পথে চালিত করবার জন্যে মন্দিরাদি নির্মাণ করে দেয়, দান করে। This tactic is the prime and fundamental principle of pact capitalism. যুগ যুগ ধরে এর জন্যে প্রবলভাবে প্রচার হয়েছে, সাহিত্য ও ধর্ম গ্রন্থ রচনা হয়েছে।

আপনি এ সকল অভিযোগ মানেন ?

সত্য যা তা আমি মানলেও সত্য হবে না মানলেও মিথ্যে হবে না, এমন কি দল বেঁধে অস্বীকার করলেও নয়।

আলোচনা বেশি দূর যাইতে পারিল না। মিলের মধ্যে গোলযোগ ইত্যবসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিক-ধ্বনি শুনিয়া মঞ্জুশ্রী চমকিয়া উঠিল। সঞ্জিত অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাজেন্দ্রের চক্রান্ত সফল হইয়াছে। সে কৌশলে মঞ্জুশ্রীর নামে শ্রমিকদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার করিয়া তাহাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। রাজেন্দ্রের চরদের প্রচারকার্যে শ্রমিকদের মন মঞ্জুশ্রীর প্রতি বিষাইয়া উঠিল। ক্রমাগত অত্যাচারে শ্রমিকদের অন্তরে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ সুযোগ পাইয়া হিংসার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল।

রাজেন্দ্র অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং মিল পরিচালনার সকল কর্তৃত্ব লাভের আশায় একদল শ্রমিককে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য করিয়া দেয়। তাহারা মিলে ধর্মঘট এবং গোলযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। অর্থে বশীভূত একজন শ্রমিকের সামান্য ত্রুটির সুযোগ লইয়া রাজেন্দ্র তাহাকে অপমান করে। শ্রমিকটি উহার প্রতিবাদ করে এবং ক্রমে তাহা বাদানুবাদে পরিণত হয়। রাজেন্দ্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কোন এক অপমানজনক কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রমিকটিকে জুতা দিয়া প্রহার করে, ফলে মিলে ধর্মঘট আরম্ভ হয়। দেখিতে দেখিতে সারা মিলে গোলযোগ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

জুতা দিয়া প্রহার করার ফলে শ্রমিকরা এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে যে, যে কোন মুহূর্তে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিতে পারে। রামজী নামক জনৈক বিশ্বস্ত শ্রমিক অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া মঞ্জুশ্রীকে গিয়া সংবাদ দিল।

মঞ্জুশ্রী বলিল, হঠাৎ ধর্মঘট হবার কারণ ?

রামজী বলিল, কয়েকটি লোক গোলমাল বাধাবার জন্যে চেষ্টা করছিল। আপনার আদেশে এবার বোনাস দেওয়া হয়নি, আপনার আদেশেই মজুরী কমান হচ্ছে, আপনিই লোক তাড়াচ্ছেন বলে ওরা দুর্নাম রটিয়ে মজদুর লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছিল।

মঞ্জুশ্রী অবাক হইয়া বলিল, এ সকল মিথ্যা দুর্নামের কথা আমায় জানান হয় নি কেন রামজী ?

ওরা গোপনে রটাচ্ছিল, আমার মনে হয় এর পেছনে কোন ফন্দী আছে। মাইজী, আমি ত' ছিলুম না, ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিলুম।

তারপর ?

আজ ছোটবাবু এক আদমীকে জুতো দিয়ে প্রহার করেছেন, যা নয় তা বলে গালি দিয়েছেন। আপনি চলে যান মাইজী, দাঙ্গা হতে পারে।

মঞ্জুশ্রী একটু ভাবিয়া বলিল, দাঙ্গা হতে পারে, এত ভীষণ কথা, এখনই এর প্রতিবিধান করা উচিত। চল রামজী !

রামজী বাধা দিয়া বলিল, আপনি যাবেন না মাইজী।

সঞ্জিত পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, এ অবস্থায় আপনার যাওয়া উচিত নয়, ক্ষিপ্ত জনতার মনুষ্যত্ব থাকে না।

মঞ্জুশ্রী হাসিয়া বলিল, শ্রমিকদের রক্ত চক্ষুকে আমি ভয় করি নে সঞ্জিতবাবু। বাবা শুধু আমায় লেখাপড়াই শেখান নি, সাহসী হতেও শিক্ষা দিয়েছেন। বাবা বলেন, দাঙ্গাকারীদের ভয়ে পালিয়ে গেল দাঙ্গাকারীরা সাধু হয় না, আর পালিয়ে গিয়ে ওদের প্রশ্রয় দেওয়া শুধু নিকৃষ্ট স্তরের কাপুরুষতা নয় অপরাধও।

সঞ্জিত বলিল, সাহস দেখানোরও একটা স্থান কাল পাত্র আছে।

মঞ্জুশ্রী বলিল, বর্তমানে নেই। এই করে করে আমরা এত কাপুরুষ হয়ে গেছি যাতে এখন ভারতবর্ষের কোথায়ও শান্তিতে বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছে। সামান্য কয়েকটা সাম্প্রদায়িক গুণ্ডার ভয়ে সহস্র সহস্র লোক ইঁদুর, বিড়ালের মত পালিয়ে যায়, আর দাঙ্গাকারী নির্বিবাদে ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে ঘরদোরে অগ্নিকাণ্ড করে। সে কথা যাক, আলোচনার সময় এখন নেই। আমার বিপদ হলেও আমায় যেতে হবে কারণ, আমি চাইনে এখানে দাঙ্গা হোক, আর পুলিস এসে আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে মোড়লী করুক। মঞ্জুশ্রী চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, একথা আমাদের সকল সময় মনে রাখতে হবে যে, এদের ভাল মন্দের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

মঞ্জুশ্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামজী ও সঞ্জিত গেল।

(ক্রমশ)

ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, ভূপর্যটক

[৩]

ক্রমাগত কয়েকদিন বক্তৃতা দিয়ে লোকসমাজে একটু পরিচিত হবার পর দুদিন বিশ্রাম ক'রে ক্যালিফোর্নিয়া ব্রীজ দেখ্‌তে বে'র হলাম। এই ব্রীজটি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা এবং দেখতেও সুন্দর। ট্রেজার আয়লেন্ড-এ যদি এর যোগ না হতো তবে এটা হয়ে যেত পৃথিবীর একটা আশ্চর্য জিনিস। ব্রীজটার উপর দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম লোকের কর্মকৌশল। মানুষ পৃথিবীতে কত সৎকর্ম করতে পারে তার হিসেব নেই, কিন্তু পারে না—পুঁজিবাদী সকল সৎকর্মেই বাধা দিয়ে থাকে। এই ব্রীজটি প্রস্তুত করার সময়ও ওয়াল্‌স্‌ স্টীট বাদ সেধেছিল, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার লোক সে আপত্তি শোনে নি ব'লেই আজ পৃথিবীর মাঝে সব চেয়ে বড় ব্রীজ ব'লে খ্যাতি লাভ করেছে।

ব্রীজটার উপর নীল আকাশ, নীচে নীল জল। এক পারে আকাশ ভেদী Y. M. C. A.এর দালান অপর পার অনেক সময় অদৃশ্য। এর যে কোন তীরে দাঁড়িয়ে ব্রীজটির কথা ভাব্‌লে অবাক হতে হয়। আমিও অবাকই হয়েছিলাম বটে, কিন্তু মুহূর্তে কবিত্ব দূর হয়ে গিয়েছিল। Y. M. C. A.তে যারা গিয়ে বাস করে, আনন্দ করে, ধর্মের কথা বলে তারাই ক্যালিফোর্নিয়ায় পাপের সৃষ্টি করে। পাপ মানে সমাজের অনিষ্ট। এত বড় একটা রাস্তা যার নাম আমেরিকার সকল লোক জানে, সেই মার্কেট স্ট্রীটের পাশের পথটায় অর্থাৎ 6th Street আজ হারলামকে টেক্কা দিয়ে পাপ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তার একমাত্র কারণ অর্থের অভাব। এদিকে আশী পৃষ্ঠার সংবাদপত্রে আমেরিকার অর্থের Almighty Dollarএর গুণ গরিমা প্রচার করা হচ্ছে, কিন্তু এরূপ অন্যায় তাণ্ডব নৃত্য হয় বলেই বোধ হয় মজুর ইউনিয়ন এ শহরে অতি সহজে গজিয়ে উঠেছে।

ব্রীজের ওপারে গিয়ে গাড়ি হতে নেমে পড়লাম। পথে যারা পায়ে হেঁটে চলছে তাদের মুখের দিকে চাইতে লাগলাম। কেউ যুদ্ধের কথা বল্‌ছে না, বল্‌ছে কেন জিনিসের দাম চড়ে গেল। বিদেশে রপ্তানির কথা বল্‌ছে না, বল্‌ছে জিনিসের দাম বাড়ানো অন্যায়। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সাধারণ লোক অনেক সময় ভাবে, হয়ত জাপান একদিন ক্যালিফোর্নিয়া আক্রমণ করবে, তখন তাদের দেশের কি অবস্থা হবে? এমন সুন্দর সেতু মাত্র কয়টি বোমার আঘাতে ধ্বংস হবে। সাধারণ লোকের মনে এ ধরণের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। তারা চায় শান্তিতে থাকতে। কিন্তু যেরূপ ক'রে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে তাতে শান্তি কোথায়? এরই মাঝে ছয় সেণ্ট পাউণ্ডের চাল বার সেণ্টে গিয়ে উঠেছে, আমার মত ভেতো বাঙলী ত একদম কাৎ; অথচ ক্যালিফোর্নিয়ার চাল ইউরোপের কোথাও যায় না।

ব্রীজ দেখা সমাপ্ত ক'রে ফের একদিন ট্রেজার আয়লেন্ড দেখ্‌তে গেলাম, সঙ্গে কয়েকজন আমেরিকানও ছিলেন। তাঁরাই আমাকে একটা বইএর দোকানে নিয়ে গেলেন। এরূপ বইএর দোকান কলকাতায় একখানা কি দুখানা আছে বলে মনে হয়। দোকান অতি ছোট, বই তাতে প্রচুর এবং ক্রেতা অতি বিনীতভাবে বই কিনে চলে যাচ্ছে। বই কিন্‌তে পেরেছে বলে যেন তারা ধন্য। ভীড়ের এক পাশ দিয়ে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করার পর আমার পরিচয় পেয়ে দোকানী একখানা চেয়ার এনে দিলেন এবং অন্য একজন ভদ্রলোককে বই বিক্রির কাজে লাগিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে লাগলেন। সেই লোকটিও বই কিন্‌তে এসেছিল, এখন তাকে বই বিক্রেতা দেখে মনে হলো এরূপ বইএর ক্রেতা এবং দোকানী পৃথিবীতে অর্থাৎ রুশিয়া ছাড়া ইউরোপ এবং আমেরিকার অল্প স্থানেই দেখেছি।

আমি বই একখানাও কিন্‌তে পারি নি, কারণ এরূপ বই নিয়ে আমার পথ চলা অন্যায় হবে বলে দোকানী বললেন। তাই আমার বই কেনা হলো না, শুধু কথা বলেই বিদায় নিয়ে আমরা ফেরী স্টেশনে চলে গেলাম। ফেরী স্টেশন আমাদের দেশের মত নয়। তাতে রেস্তোরাঁ, বইএর দোকান, সংবাদপত্র, নাপিতের দোকান, বসবার ঈজি চেয়ার সবই আছে। গদি দেওয়া লম্বা আরাম-কেদারা লাইন করে রাখা হয়েছে। যাত্রীরা বোটে উঠেই বিশ্রামের জন্য চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। তাদের মুখে তৃপ্তির ছাপ সুপরিস্ফুট। স্টেশন ঘরটার নীচে কতকগুলি বিশ্রামাগার রয়েছে। প্রত্যেকটি বিশ্রামাগারের সামনে এক এক জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। যদি কোন কারণে বিশ্রামাগার অপরিষ্কার হয়, অথবা দুর্গন্ধ বের হয়, তৎক্ষণাৎ তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি লোকের ডিউটি আট ঘণ্টা মাত্র। এদের যদি মেথর বলি তবে এদের ত অপমান করা হবেই উপরন্তু নিজেকেও দোষী হ'তে হবে। একটি জাপানী জাহাজে দেখেছি, যে লোকটি বিকালে বিশ্রামাগারগুলি পরিষ্কার করত, সেই লোকটিই সকালে ডাক পিওনের কাজ করত। যদি কেউ বিশ্রামাগারে যায় তবে সে বলে থুথু ফেলতে যাচ্ছি। অথচ বিশ্রামাগারে থুথু ফেলার নিয়ম নেই। যদি কেউ থুথু ফেলতে চায়, তবে থুথু ফেলার কাগজে থুথু ফেলে ড্রেনে ফেলে দিতে হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একেই বলে। যাদের মেরুদণ্ড দুর্বল তারাই শৃঙ্খলা রাখতে পারে না।

ফেরী বোট আসামাত্র লোকগুলি আপনা হতে লাইন বেঁধে ধীরে ধীরে ফেরীতে গিয়ে উঠতে লাগ্‌ল। কোনরূপ গণ্ডগোল নেই, অসুবিধে নেই, নাক সিঁটকানো নেই, ছোট বড় নেই, কারণ তাতে তৃতীয় শ্রেণী আর প্রথম শ্রেণী বলে কিছু নেই; যা আছে তাতে সবারই সমান অধিকার। এখানে নাক সিঁট্‌কানো চলে না। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ক্যানেডার কথাই ধরা যাক, সেখানে নাক সিঁট্‌কানো আছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী আছে, "মিস্টার" আছে এবং আছে "এস্কোয়ার"। মিস্টারে এবং এস্কোয়ারে কত প্রভেদ তা বুঝবার আমার অনেক সুযোগ হয়েছিল।

ফেরী পার হতে আমাদের লাগবে মাত্র আধ ঘণ্টা। কিন্তু ফেরী বোটে বসবার, বেড়াবার, আনন্দ করবারও স্থান আছে। আমেরিকানরা যখনই কিছু তৈরী করে, তারা বোধ হয় আমোদ

প্রমোদের দিকটাই ভাল করে বোঝে। কিন্তু আমেরিকানদের কতকগুলি জাহাজ আছে যা সাধারণত এশিয়ার বন্দরগুলিতেই এসে থাকে, সেখানে আমোদ প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত নেই, উপরন্তু সেই জাহাজগুলিতে যে সকল লোক যাত্রী হয়, তারা যেন কয়েদী জীবন কাটিয়ে গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। এশিয়া দেশটা যে একটা জঘন্য স্থান এটা আমেরিকানরাও মেনে নিয়েছে বলেই মনে হয়, কিন্তু আমেরিকাতেও এক শ্রেণীর নূতন লোক হয়েছে যারা এশিয়াবাসীদের তাদেরই মত মানুষ বলেই চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে। আমি আকাশের দিকে চেয়ে এসব চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে আমার হুঁস হলো, ওপারে এসেছি। যাত্রীর দল হাসিমুখে নামতে লাগল। আমি ও সঙ্গীদের সঙ্গে নামলাম।

একটু যাবার পরই আমাদের সামনে পড়ল একটা তোরণদ্বার। মেক্সিকানদের প্রথা মতে এই তোরণদ্বার তৈরী হয়েছে। তোরণদ্বারটি প্রাচীন স্থাপত্য বিদ্যার একটি নিদর্শন। যখন লোকে অন্ধকার দেখলে ভীত হতো, লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করত, এই তোরণদ্বার সেই যুগের। সেই যুগের বয়স যারা নির্ণয় করেছেন, যদিও তাঁদের সঙ্গে আমার মতান্তর আছে তবুও পুরাতন পুরাতনই।

গেটটা পার হয়ে গিয়েই দেখলাম সারি দিয়ে নানা দেশের পতাকা উঠিয়ে নানা ধরণের গৃহ রয়েছে। ভারতবর্ষ, জার্মানী এবং থাইল্যাণ্ডের কোনও গৃহ তাতে নেই। রুশিয়ার এক্‌জিবিসন গৃহ নিউইয়র্ক-এ আছে, কিন্তু এখানে তা নেই। দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশ কিন্তু তাতে প্রদর্শনী খুলেছে। সকল দেশের এক্‌জিবিসন ছেড়ে দিয়ে আমরা দক্ষিণ আমেরিকার প্রদর্শনী দেখায় মন দিলাম।

প্রত্যেকটি দেশের প্রদর্শনী একবার নয় দুবার করে দেখতে লাগলাম। দুবার করে দেখার উদ্দেশ্য আমার আর কিছুই নয়, ভারতের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না অবগত হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের সঙ্গে কোথাও কোনো সম্বন্ধ না পেয়ে বড়ই দুঃখিত হলাম।

প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতে একটি ক'রে বড় বই আছে, তাতে পরিদর্শকেরা নাম দস্তখত করে থাকেন। আমিও নাম দস্তখত করতে লাগলাম ইংরেজীতে নয়, মাতৃভাষা বাঙলাতে। নাম ধাম বাঙলাতে লিখে দিয়ে যেই বের হয়েছি অমনি সেই প্রদর্শনীর লোক এসে আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ভারতের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না? ওরা ভারতের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ বের করতে চায় এবং ভারতবাসী ব'লে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করতে চায়। আমি তাদের বলেছিলাম—"It is no good finding out blood relation with us, but it could be a very good thing to drive out the pride of blood relationship with any superior old nation.

ভারতবাসীকে তারা দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ান বা তাদের পূর্বপুরুষ ব'লে গর্ব অনুভব করতে চায়, অথচ আমেরিকায় ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ। সুখের বিষয় আমাদের দেশেরও কয়েকখানা খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকা মেক্সিকানদের ভারতবাসী ব'লে স্বীকার করতে চান, কিন্তু জানেন না, যে সকল চিত্র এবং পত্র তাঁরা আনন্দের সহিত বের করেন তার সঙ্গে ভারতের কোন সম্বন্ধ নেই।

দক্ষিণ আমেরিকায় এবং মেক্সিকোতে স্প্যানিশ রক্তের সংমিশ্রণে যে জাতের সৃষ্টি হয়েছে তাতে আছে আরব এবং ইউরোপীয় রক্ত। অনেকগুলি দেবদেবীও দেখতে পেয়েছিলাম সেখানে, তার সঙ্গে আমাদের জগন্নাথ ঠাকুরের বেশ সম্বন্ধ আছে। জগন্নাথ ঠাকুর আমাদের দেশের একটি বড় দেবতা এবং সে সম্বন্ধে অনেক বড় বড় বইও লেখা হয়েছে। বিদেশে ভ্রমণ করলে মানুষের রকম বদলে যায়। তাই বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, জগন্নাথ ঠাকুরের মূর্তি দেখলে যে কোন লোক বলবে, যখন স্থাপত্য বিদ্যার পরিস্ফুটন হয় নি, তখনকার দিনেরই ঐ মূর্তি। যদি হিন্দু সভ্যতার স্থাপত্য বিদ্যা জগন্নাথ দেবের ঐ মূর্তির উপর নির্ভর করে তবে আমাদের দেশের সঙ্গে মেক্সিকো সভ্যতার নিকট সম্বন্ধ আছেই বলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও বলতে হবে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শুধু মেক্সিকোতে দেখতে পাওয়া যায় না, উত্তর আমেরিকার ক্যানেডায় এবং বেলজিয়ম কঙ্গোতেও আছেন।

সারাটা দিন দক্ষিণ আমেরিকার প্রদর্শনীগুলিতে ভ্রমণ ক'রে জাপানী প্রদর্শনীতে এসে বসলাম এবং বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলাম দক্ষিণ আমেরিকার লোক স্প্যানিশ ভাষা বলে, ইউরোপীয় পোষাক পরে, খাবারের প্রণালী অনেকটা ইউরোপীয় ধরণে, তবুও কেন শ্বেতকায়দের ঘৃণা করে এবং প্রতিশোধের প্রত্যাশায় বসে আছে? উত্তরে একজন বললেন, "সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার এখনও এদের মনে আছে, এখনও এরা ন্যাশনালিজমের আওতায় আছে, যখন এদের মাঝে প্রকৃত জ্ঞান আসবে তখন তারা শ্বেতকায়দেরে ঘৃণা করবে না; ঘৃণা করবে পর্দার আড়ালের পুঁজিবাদী পরিচালিত প্লুটোক্রেটিক সাম্রাজ্যবাদীদের, সেদিন আগতপ্রায়।"

ভারতবর্ষ হতে কোন পর্যটক গিয়ে যখন দেখবেন মেক্সিকান এবং অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা চাপাটি এবং পাঁপড় খাচ্ছে, তখন হয়ত বলবেন, ওরা নিশ্চয়ই ভারতবাসী। কিন্তু এই ধারণা হবে অতি অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন; কারণ স্পেন থেকে অনেক আরবও দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিল। আরবরা চাপাটি খেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যখন আরবরা স্পেন জয় করেছিল, মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে চাপাটিও নিয়ে গিয়েছিল, সেজন্যই স্পেনে পাঁপড়ের মত করে চাপাটি বাজারে বিক্রয় হয় এবং ঘরে এনে একটু সেকলেই চাপাটি ফুলে ওঠে ও সুখাদ্যে পরিণত হয়। উত্তর আমেরিকায় যেমন রুটির দোকান আছে তেমনি দক্ষিণ আমেরিকায় চাপাটির দোকান আছে। তাই দেখে যেন কারো প্রবাসী রোগে না পেয়ে বসে। এ রোগটি বড়ই খারাপ। প্রবাসী রোগে (Home sick) অনেক দিন আমি কষ্ট পেয়েছি, অন্ধ হয়ে রামাকে শ্যামা

(শেষাংশ ৫৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৈবল্য প্রাপ্ত

(রস রচনা)

শ্রীবিজন ভট্টাচার্য

কলিকাতার শহরটি আজব কারখানাই বটে। এখানে শুধু সাবানই প্রস্তুত হয় না, মানুষও তৈয়ারী হইয়া থাকে। মানুষ যদি হইতে চাও ত চলো শহরে। তবে কাঁচা মালের মত আসিবে। যন্ত্রস্থ হইয়া 'চিজ' হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। এই যেমন ধর পাট......।

সন্ধ্যা ঘোর ঘোর হয় ; এমন সময় শহরের এক প্রান্তে হনুমানের মত একখানা মফঃস্বল ফিরতি বাস বাক্স-ডেক্স্, বিছানা-পত্তর, বোঁচকা-বুঁচকি—যেন এক গন্ধমাদন পর্বত মাথায় করিয়া আসিয়া ভিঁড়িল। অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা, যুবক ও যুবতীর মধ্যে এক ঝুড়ি মুরগী, তিন চারটে পাকা কাঁঠাল, দুই তিন টুকরী আম ও পাঁচ জোড়া করকচি ডাব—ইত্যাদি কাঁচা মালের সঙ্গে এলেন কুটুম্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চানন, বাসনা—মানুষ হব।

যে হেতু অনেকেই কলিকাতা আসিয়া মানুষ হইয়া গিয়াছেন সেই হেতুই শহরে আসিলেন পঞ্চানন ; আমাদের পঞ্চু—যাহাকে দেখিলেই মনে হয়, ঠাস করিয়া গালের উপর একটি চড় বসাইয়া দিই। দেখিতে একটা বিরাট অপগণ্ডের মত। চোয়াড়ে দুই গালে ইতস্তত খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তাম্বুলে অসম্ভব আসক্তি, ফলে বিম্বাধর। চক্ষুদ্বয় ভাসা ভাসা তন্দ্রালু—ভাবটা, আমাকে করুণা কর। না হাসিতেই মনে হয় মারি এক ঘুঁসি আর হাসিলে ত কথাই নাই. খুন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। অথচ দেখিতে তেমন একটা কিছু বিভৎস নয়। ওর চেয়ে কত কুৎসিত মুখশ্রী আছে ; যাহাদের একবার দেখিলে আর দ্বিতীয়বার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু এ মুখশ্রীর এক অদ্ভূত আকর্ষণী শক্তি আছে। খুব দেখিতে ইচ্ছা করে অথচ দেখিলেই মনে হয়, মারি এক চড় ; চড়ের উপর চড়। বলিলাম কি, সে একেবারে অসহ্য। এমন কি অহিংসার অবতার যিনি, তাঁহাকেও, একবার চড় মারুন আর নাই মারুন, দাঁত খিঁচাইতে ইচ্ছা করিবেই।

বলিতে কি পঞ্চানন সম্পর্কে আমার কেউ হয়। তবে কি জানেন, পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে না। আসলে, আত্মীয় কুটুম্ব! ও, আমার ঢের দেখা আছে। বলিতে কি, আজ এই তিন বৎসর বিবাহিত জীবনের মধ্যেই মন সংসারে একেবারে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে। পরিজনবর্গের দৌলতে আজ আমার সংস্কৃতি ও শিক্ষা সব কিছুই বিপন্ন। নিঃসঙ্গ অবিবাহিত জীবন স্বার্থপরতারই নামান্তর জানিয়া বিবাহ করি। ভাগ্য ও নিয়তির স্থানে একমাত্র পুরুষাকারকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আজ উদ্বন্ধনের কথাও চিন্তা করিতে হয়।

একে কলিকাতার শহর, তাহার উপর আবার কাল অপরাহ্ণ। রাজপথে একটা মাথার ঢেউ পার হইয়া যাইতে না যাইতেই আর একটা প্রচণ্ড ঢেউ। আর পথচারীরাই বা কি সুন্দর। সকলেই যেন গন্ধবহ। চতুর্দিকে আনন্দ, আর আনন্দ। কিন্তু আশ্চর্য! কেহই ত দিশাহারা হইয়া পড়ে নাই। প্রেমানন্দে সে ঢলাঢলি কই। অথচ সবাই ত দেখিতেছি পুলকিত। হুঁ, বুঝিয়াছি। শিক্ষাস্থল কি না? তাই এত আনন্দের মধ্যেও কেহই পাগল হইয়া যায় নাই। অপূর্ব শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

সহোদরের শুভাগমন প্রত্যাশা করিয়া গৃহিণী দেখি সদরেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুটকেশটা মাধবের হাতে তুলিয়া দিয়া 'উনি'কে বলিলাম "যাও ওপরে নিয়ে যাও;" আর পঞ্চুকে বললাম, "নাও পঞ্চু জামা কাপড় ছেড়ে একটু জিরিয়ে নাও গে।"

উনি বলিলেন—"তোমার ত আবার যাবার সময় হয়ে এলো।" ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ শীগ্‌গিরই ফিরব আর কি! এই বড় জোর দশটা।"

উনি একটু অসন্তুস্ট হইয়া টানিয়া টানিয়া বলিলেন—"দ—শ—টা।" আমি অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "কাজ হ'লে আগেও ফির্‌তে পারি।" মনে মনে বলিলাম "তোমাকে ধ'রে ব'সে থাকলে ত আর পেট ভ'রবে না।"

পঞ্চানন ইদানীং এখানেই থাকে। কিন্তু আমাকে ত একরকম সারাদিনই বহির্জগতে বিচরণ করিতে হয়; পঞ্চুর খোঁজ খবর নেওয়া আমার পক্ষে সব সময় সম্ভব হইয়া ওঠে না, আর লইতেও চাহি না। এইমাত্র জানি যে, আমারই স্কন্ধে চাপিয়া একটি অপদার্থ কুটুম্বশ্রেষ্ঠ অযথা অন্নধ্বংস করিতেছে। এখন বিদায় হইলে বাঁচিতাম। আত্মীয় কুটুম্ব! কিছু বলাও ত যায় না। আজ আবার রামপুর হইতে এক চিঠি পাইয়া মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। এবার পূজার সময় রামপুর হইতে শ্বশুরকুল নাকি কলিকাতা আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। অর্থদণ্ডের কথা বড় একটা ভাবিতেছি না। ভাবিতেছি মাতৃকুল আর শ্বশুর কুলের সহিত সামঞ্জস্য করিব কি করিয়া। যাহা হউক বাঁচিতে ত হইবেই যে কোন প্রকারে। তবে শ্বশুরকুলের কলিকাতা অভিযান সম্ভব হইলে নির্ঘাত প্রাণে মারা যাইব। একুল ওকুল দুই কুলই ভাঙ্গিবে। আর শ্বশুর শাশুড়ী সমেত তিন শ্যালিকা ও তিন দুনো ছয় শ্যালকের স্থান সঙ্কুলানই বা কি উপায়ে হইবে। থাকি কলিকাতায়। বাড়িটিও পৈতৃক নয়। মাত্র তিনখানি ঘর। মাস যাইতে না যাইতে বাড়িওয়ালী কান মলিয়া নগদ পঁয়ত্রিশ টাকা আদায় করিয়া নেয়। খাও আর না খাও দশ তারিখের মধ্যে ভাড়া তাহার চাই-ই। বিবাহ করিয়াছি, তাও বেশীদিন নয়, মাত্র তিন বৎসর। বধূর মুখ দেখাইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমার মরণের সুরাহা করিয়া দিবার জন্য বিবাহ করি নাই। বিবাহ করিয়াছি নিজ প্রয়োজন ও কর্তব্য বোধে। কবিত্ব হয় ত ছিল, কিন্তু বিত্ত এত ছিল না যে, সেই কবিত্ব আত্মবোধের
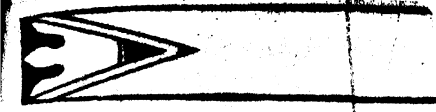
উপর কর্তৃত্ব করিবে। অর্থাৎ বিবাহ
প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছি, একথা আমি
লইতে প্রস্তুত নহি। আর
সংসারের নিকট দাসখত লিখিয়
'মায়ের' ইচ্ছানুযায়ী 'চোখ বাঁধা ব
পাক খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে
হউক না কেন।

না আছে পেটে বিদ্যে ন
বলিলেই ত আর চাকুরী পা
'উনি'র একান্ত অনুরোধে অ
বিভাগে বহু ধরাধরি করিয়া
টাকা বেতনের একটা চাকুরী
পঞ্চাননকে বলিলাম, "টিকিয়া
বুঝলে পঞ্চু! জোর বরাত
কিন্তু পঞ্চাননের যেন ইহাতে
করে করুক, না করে না করুক।
খামখা মাথা ঘামাইবার। ঘোড়ার
তার আবার ইয়ে!

এদিকে পূজা আগতপ্রায়।
দুইখানি 'রিমাইণ্ডার' পাইয়াছি
উপায়ই এ পর্যন্ত স্থির ক
সাংসারিক দিক দিয়া ব্যাপার
কাহারও পরামর্শ নেওয়াও যু
সহানুভূতি না দেখাইলে বরং
মজাই দেখিবে। 'উনি'র কাছে
বুঝাইয়া বলিতে গেলে উনি
উঠিবেন, মাতৃকুল বিদ্রোহ
নিদারুণ হইতেছে যে, শ্বশুরে
ধীর স্থির মস্তিষ্কে নিজে
উদ্ভাবন করিতে হইবে।
অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চূড়
পলায়ন বিনা গত্যন্তর নাই
চলিবে না। সমস্ত ব্যাপার
সম্ভাবনা। আমি যে পলা
আমি একলা। 'উনি'র ক
আর সকলে জানিবে
দেশান্তরে বদলি হইবে
বলিয়া যে কোন উপায়ে
করিয়া লইতেই হইবে

আনন্দিত চিত্তে
ফিরিলাম। মাথার
নামিয়া গিয়াছে।
করিয়া আনিলাম, গ
গেল। মাধবমুখে শ্র
বান্ধবীকে নাকি '
আনিয়াছে। মি

পারিত। সংবাদপত্রে মন্তব্য করিয়াছে যে, সন্নিকটে সরোবর থাকা সত্ত্বেও প্রেমিক প্রেমিকা যখন আত্মনিমজ্জন করে নাই তখন বুঝিতে হইবে যে, এই প্রচণ্ড শীতে তাহারা ডুবিয়া মরিতে সাহস করে নাই। পরন্তু প্রেমাতঙ্ক রোগটা একরূপ জলাতঙ্কের মত এবং এই কারণেই যুবক যুবতী বিষপানে উদ্যত হইয়াছে। পত্রিকা মন্দ লেখে নাই। পশ্চিম-যাত্রা মাথায় উঠিয়া গেল। 'উনি'র নিকট কিছু না ভাঙ্গিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে হাসপাতালের দিকে ছুটিলাম। পরিচয় দিলাম না; কি জানি যদি আমাকে ধরিয়া আবার টানাটানি করে। খোঁজপত্র করিয়া জানিতে পারিলাম যে, পঞ্চাননের বিষ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, তবে যুবতীর বিষ কিছুতেই নামিতেছে না। উভয়কেই কড়া জোলাপ দেওয়া হইয়াছে। এ পর্যন্ত কাহারো সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই। তবে আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিয়া দেখি 'উনি' ভূলুণ্ঠিতা হইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। বলিলাম, "আগেই অমঙ্গল ডেকে আনছো কেন শুনি! পঞ্চানন ত ভালই আছে দেখে এলাম।" অশ্রুবিগলিত চক্ষে স্ফুরিত অধরে উনি বললেন, "হ্যাঁ! ভাল হয়ে যাবে?" বুকটার মধ্যে যেন আমার কন্‌কনিয়ে উঠল। উনিকে তুলিয়া বসাইয়া আমি বারবার বলিলাম, "নিশ্চয়ই, ডাক্তারদের মুখ থেকে শুনে এলাম। ছিঃ। এইরকম ক'রে কি কাঁদতে আছে। পঞ্চানন ঠিক ভাল হয়ে যাবে। তুমি দেখে নিও।"

সারাদিন উনিকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইল। হিস্টিরিয়ার বেগটা আজ আবার অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আছেন আছেন হঠাৎ ওঁ......ও......শব্দ করিয়া ধরাশায়ী হইয়া এমন জোরে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন 'উনি' যে আমার একার সাধ্য কি সামলাই। অনেক বুঝাইয়া 'উনি'কে একটু ধাতস্থ করিলাম। এদিকে আবার হাসপাতালে যাইবার সময় হইয়া আসিল। কি যে করি, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মাথাটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। কপালের বাম পাশটায় কে যেন হাতুড়ী পিটিতেছে। কানের মধ্যে সেই যে পোঁ......ও......ও ধরিয়া বাঁশী বাজিতেছে তাহার আর বিরাম নাই। কে দেখে! মোট কথা তুমি শালা মর! এই ত! এদিকে ব্যবস্থাও ত পাকা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এত শীগ্‌গির যে ফাঁসিয়া যাইবে তাহা কে জানিত। হা ঈশ্বর, বলিয়া হাঁপ ছাড়িবার প্রবৃত্তির বেগ আসিলেও সুকৌশলে চাপিয়া গেলাম। ও-নাম উচ্চারণ করিয়া কচু হয়। নাম মাহাত্ম্যে আর প্রয়োজন নাই। যথেষ্ট হইয়াছে। ঠকিয়াছিইত! কতবার যে ঠকিয়াছি তাহার কি আর ইয়ত্বা আছে নাকি। এই ত সেদিনও ভোরবেলা বলিতেছিলাম, "এই ত সামান্য আয়, নিজেই কুলাইয়া উঠিতে পারি না। অন্তর্যামী তুমি সবই তো বুঝিতেছ। এ যাত্রা মাপ করিয়া দাও! কেমন মাপ করিল! যতসব বুজরুকি। বরঞ্চ গোড়াগুড়ি হইতে নিজে একটু সাবধান হইয়া চলিলে আত্মরক্ষার একটা উপায় হইত।" শাস্ত্রেই বলা আছে 'স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।' ঠিক তাহাই ঘটিল আর কি!

এদিকে আবার চারিটা বাজিয়া যায়। ছুটিলাম হাসপাতাল। যাইয়া আবার কি শুনিব, মনে মনে শুদ্ধ এই আশঙ্কাই করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বলিল, "অবস্থা মোটের উপর পূর্বের মতই, তবে নাড়ির গতিটা এ বেলা অনেকটা ভাল।" যাহা হউক, একটু আশ্বস্ত হইলাম। তবু নিশ্চিত করিয়া এখনও কিছু বলা যায় না। বোস ডাক্তারের সুপারিশের জোরে এবং কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড দিয়া পঞ্চাননকে সাধারণ 'ওয়ার্ড' হইতে 'কেবিনে' স্থানান্তরিত করার বন্দোবস্ত করিলাম। আসিবার সময় নার্সের হাতে আবার পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিলাম, "একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন দয়া করিয়া।" উত্তরে নার্সটি যাহা বলিল তাহার বঙ্গানুবাদ হইতেছে—"চিন্তা করিও না, আগামী প্রাতঃকালের মধ্যেই রুগী অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিবে।" ভাবিলাম 'ফ্লোরেন্স নাইটিন্‌গেলের' দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিয়া মহিলাটিকে তাহার উচ্চ আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাই। আবার ভাবিলাম নাঃ হাঙ্গামায় কাজ নাই। ভালয় ভালয় সরিয়া পড়া যাক। যাহা হউক মোটের উপর অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। আসিয়াছিলাম পঞ্চাননকে কি অবস্থায় দেখিব ভাবিতে ভাবিতে, এখন আবার ফিরিতেছি 'উনি'কে কি অবস্থায় দেখিব ভাবিতে ভাবিতে।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দূরে চলন্ত ট্রেনের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে বিদ্রূপের মত বাজিয়া উঠে। একবার শুধু ভাবিলাম, কি হইতাম আর কি হইলাম। সম্মুখেই চিরপরিচিত কৃষ্ণগোবিন্দ লেন। যত রাজ্যের ধোঁয়া আসিয়া অপ্রসস্ত গলিটার মধ্যে রোজই এক নারকীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। ধূম্রজালের অন্তরাল হইতে ঘোড়ার ক্ষুর ঠোকার শব্দ কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আগাইয়া দেখি আমারই বাড়ির সদর আগলাইয়া দুই ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। প্রাণটার মধ্যে ছেঁক করিয়া উঠিল। গাড়োয়ান হাঁকিতেছে "কই মা, ভাড়াটা মিটিয়ে দেবেন।" সম্মুখে মাধবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি রে ব্যাপারটা কি! কারা! কোন ফ্ল্যাট!" প্রত্যুত্তরের আশা আর করিলাম না। উপর হইতে অশ্রুতপূর্ব কোকিলকণ্ঠে কোন নারী কূজন করিয়া উঠিলেন "জামাইবাবুর কি হ'লো! সাতটা বেজে গেল, এখনও ফিরছেন না কেন!" সম্ভবত মেজো শালী। যাক্! নিঃশব্দে বৈঠকখানা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটু বিশ্রাম। উপরে হুড়হুড় —দুড়দুড়, সাত ভূতের নৃত্য চলিতেছে। একা অন্ধকার ঘরটিতে আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মনে হইল আমি যেন সম্পূর্ণ একক। বহির্জগতের সহিত আমার এতটুকু সম্বন্ধ নাই। জগদ্দল পাথরের মত সমগ্র বিশ্ব সংসারের পাদপীঠতলে পড়িয়া দ্বিখণ্ডিত টিকটিকির লাঙ্গুলের ডগার মত আমার অন্তরাত্মা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সোভিয়েট রণনীতি ও রণকৌশল

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে রুশিয়ার মারণাস্ত্রসমূহের উৎকর্ষ এবং লাল ফৌজের রণনৈপুণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। গত কয়দিন রুশ-জার্মান যুদ্ধের যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে ইহার পরিচয় অনেকটা পাওয়া গিয়াছে। কয়েকদিনের যুদ্ধেই সোভিয়েট সেনা দুর্দান্ত জার্মানবাহিনীকে অন্তত কিছুকালের জন্য স্তব্ধ করিয়াছে। প্রচণ্ড পাল্টা ঘা খাইয়া নাৎসী সেনা দম না লইয়া পারে নাই। সমগ্র রণাঙ্গনে লাল ফৌজ যেভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের রণ-নীতির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রণনীতিতে লাল ফৌজের অধিনায়কদের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে ইহার পর বোধ হয় আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বলা বাহুল্য, জারের আমলের সেই প্রাচীন রুশ রণনীতি আর এখন নাই। সোভিয়েট আমলে রুশিয়ার স্ট্র্যাটেজী সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। সোভিয়েটের আধুনিক স্ট্র্যাটেজী সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। সোভিয়েটের আধুনিক স্ট্র্যাটেজীর উন্নতি বিধানে দুইটি বিষয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে ঃ গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক রণবিদ্যা শিক্ষার অনুকূল আব-হাওয়া রুশিয়ার গৃহযুদ্ধে লালফৌজের নায়কগণ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের বিশেষ সুযোগ পান। ইহার ফলে তাঁহাদের পক্ষে বাহিরের কতকগুলি মরিচাধরা রণপ্রথার প্রভাব-মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণে সৈন্যদল গঠন করা সম্ভব হয়। কোন বাঁধাধরা পথে নয়, সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পন্থায় প্রয়োজনের তাগিদে লাল ফৌজ গড়িয়া ওঠে। প্রথম অবস্থায় লাল ফৌজের রণ-কৌশল যে খুব উচ্চাঙ্গের ছিল তাহা নয়,—কিন্তু স্ট্র্যাটেজী জ্ঞান তাহাদের আগাগোড়াই ভাল ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। তার-পর ১৯২৯ সাল হইতে যন্ত্রসজ্জার দিকে মন দিয়া সোভিয়েট সেনাপতিগণ লাল ফৌজকে আধুনিক রণবিদ্যায় এমনভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন যাহার ফলে তাঁহাদের স্ট্র্যাটেজীতেও বিপ্লব ঘটে। অনেকের অনুমান, লাল ফৌজকে দেখিয়াই জার্মানরা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার প্রেরণা পায়। কেবল অনুমান নয়, একথা সত্য যে, লাল ফৌজের শক্তিশালী বিমানবাহিনী, মোটর ও যন্ত্রসজ্জা এবং আধুনিক যুদ্ধের বহু উপকরণ দেখিয়া কয়েক বৎসর পরে বিভিন্ন দেশ তাহাদের সেনাদলে সেইগুলির প্রবর্তন করে।

নিজের দেশের জলবায়ু, ভৌগলিক অবস্থান, জনবল, অস্ত্র-বল, পথঘাট, যানবাহন প্রভৃতি অবলম্বনে সোভিয়েটের যে নিজস্ব স্ট্র্যাটেজী গড়িয়া ওঠে তাহা একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয় ১৯৩৭ সালে। রাজনৈতিক লক্ষ্য আত্মরক্ষাত্মক হইলেও সোভিয়েট রণ-নীতি আক্রমণাত্মক হইলেই যে পররাজ্য আক্রমণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এইখানেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সোভিয়েট রুশিয়ার পার্থক্য। জার্মানির রণনীতিও আক্রমণাত্মক; কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার নীতি আত্মরক্ষাত্মক নয়। কাজেই তাহার আক্রমণাত্মক রণনীতিকে সে রাজনৈতিক অভীষ্টলাভের জন্য পররাজ্য গ্রাসের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে, তাহার সমর প্রস্তুতিই সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। পক্ষান্তরে দেখা যায়, প্রথম হইতেই সোভিয়েট রুশিয়াকে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য বাহির হইতে নানারূপ চক্রান্ত চলিয়া আসিয়াছে এবং পূর্বে জাপান ও পশ্চিমে জার্মানি অহরহ তাহাকে আক্রমণের ভয় দেখাইয়াছে। কাজেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্যই তাহাকে সামরিক ব্যাপারে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ না করিলে কি শোচনীয় ফল দাঁড়ায়, ফ্রান্সের পরাজয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব লাল ফৌজ সোজাসুজি যুদ্ধে

সোভিয়েট লাল ফৌজ শৃংখলার সহিত সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া তীরে উঠিতেছে

প্রচণ্ড পাল্টা ঘা দিয়া শত্রুনিধনের স্ট্র্যাটেজী অবলম্বন করে। তাহার সামরিক বিধানেই বলা হইয়াছেঃ

"The military operations of the Red Army will be conducted with a view to destroying the enemy. The fundamental aim of the Soviet Union in any war which is forced upon it will be to secure a decisive victory and utterly overthrow its enemy. . . . .

"The enemy must be caught throughout the whole depth of his positions and there encircled and destroyed."

ইহা হইতেই বুঝা যায়, সোভিয়েটের রণনীতি যুদ্ধে আত্ম-রক্ষার জন্য হাত পা গুটাইয়া কূর্মাবতার সাজিবার পক্ষপাতী নয়। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে তাহাকে প্রচণ্ড বেগে গিয়া পাল্টা ঘা দিতে হইবে। এই জন্যই সোভিয়েট রুশিয়া তাহার সমস্ত বাহিনীকে দ্রুত গতিশীল করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। লাল ফৌজের নায়কেরা আত্মরক্ষার অস্ত্র ও আক্রমণের অস্ত্রের সেই প্রাচীন সংজ্ঞা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং রণকৌশলেও আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার পুরাতন পার্থক্যটাকে বিদায় করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, সাফল্যের সহিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়াই আত্ম-রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আধুনিক মারণাস্ত্রগুলি প্রধানতই আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত অতএব আত্মরক্ষার জন্য সেই আক্রমণের অস্ত্রগুলিরই সাহায্য লইতে হইবে। তবে কোন অস্ত্রের উপরই বেশী জোর দিলে চলিবে না। সমবেতভাবে সকল অস্ত্র একসঙ্গে প্রয়োগ করিয়া প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ড ঘা দিতে হইবে। তাহাদের নীতিই হইল এইঃ

"Each arm must be used in battle with care-ful regard to its peculiarities and its strong points. Each arm must operate in the closest possible co-operation with all other arms, and each arm

must be used under the conditions most favourable for developing its possibilities to the full.''

অতএব দেখা যায়, লাল ফৌজের অধিনায়কেরা আধুনিক যুদ্ধের একটা বাস্তব রূপ বহু পূর্বেই সম্যক ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। বর্তমান যুদ্ধে কেহ কেহ যাহা ঠেকিয়া শিখিয়াছে, সোভিয়েট নায়কগণ পূর্বাহ্ণেই তাহা বুঝিতে পারায় লাল ফৌজকে ঠিক তেমনিভাবে তাঁহারা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন।

লাল ফৌজে বিভিন্ন বাহিনীর কার্যভার এইভাবে বণ্টিত হইয়াছে ঃ

স্বতন্ত্র ট্যাঙ্কবাহিনীতে থাকে বিস্তৃত অঞ্চলে আক্রমণ চালাইবার জন্য বহু ট্যাঙ্ক ইউনিট এবং মোটর সাঁজোয়া ইউনিট। এই সমস্তের পশ্চাতে যায় মোটরবাহী পদাতিক ও মোটরবাহী

রুশিয়ার বালক দল ট্যাঙ্ক লইয়া রণকৌশল শিক্ষালাভ করিতেছে

গোলন্দাজবাহিনী। প্রথমোক্ত ট্যাঙ্কবহরের কাজ হইল প্রতিপক্ষের প্রধান যোগাযোগপথে হানা দেওয়া, বিপক্ষের রিজার্ভবাহিনী ও সেনানায়কদের উপর বিধ্বংসী আঘাত করা, প্রধান গোলন্দাজবাহিনীকে বিনাশ করা এবং মূলবাহিনীর পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করা। মোটর-সাঁজোয়া ইউনিটগুলির কাজ হইল বিপক্ষের পশ্চাদপসরণকারী সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করা এবং পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের ঘাঁটি হইত বিচ্ছিন্ন করা।

বিমানবাহিনী অগ্রবর্তী ট্যাঙ্কগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবে। আগাইয়া গিয়া বিপক্ষের ব্যূহাভ্যন্তরেও এইগুলি আক্রমণ চালাইতে পারে। বোমা ফেলিয়া বিপক্ষের যোগসূত্র ছেদ, পশ্চাৎদিকস্থ ঘাঁটি হইতে শত্রুকে বিচ্ছিন্নকরণ এবং তাহার যোগান বন্ধের চেষ্টা করাও বিমানবাহিনীর কাজ।

গোলন্দাজবাহিনী কামান দাগিয়া যে কেবল বিপক্ষের অগ্রগতিই রোধ করে এমন নয়, লালফৌজের গোলন্দাজবাহিনীতে দূরপাল্লার এমন সব কামান আছে যেগুলির সাহায্যে বিপক্ষের ব্যূহের অভ্যন্তরস্থিত রিজার্ভবাহিনী, সেনানায়কদের হেড কোয়ার্টার, পশ্চাৎদিকস্থ যানবাহন এমন কি কামানশ্রেণীর উপর পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করা চলে। আর কামানগুলিকে একস্থানে বসাইয়াও গোলা দাগিতে হয় না, মোটরযানে স্থাপিত কামানগুলিকে যত্রতত্র লইয়া যাওয়া চলে। কাজেই অগ্রগামী সৈন্যদের এইগুলি প্রধান সহায়।

এইভাবে সকল বাহিনী লইয়া শত্রুর উপর চূড়ান্ত আক্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়া লালফৌজের একখানি মুখপত্রে বলা হইয়াছে ঃ—

''The enemy is defeated and seeks to withdraw from the battlefield, to preserve his forces intact and save his equipment and stores. However, his line of retreat is cut off by long-distance tank units, and by mechanised and air-landing corps, which have penetrated deep into the territory behind his front line. Everywhere the demoralised enemy is met with the fire of attacking units which have broken through his flanks and taken him in the rear. The encirclement closes in more and more tightly until finally the enemy is compelled to lay down arms.''

অতএব দেখা যায়, পশ্চাতের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া অকস্মাৎ পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করত শত্রুকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করার যে কৌশল হিটলারের বাহিনী বর্তমান মহাযুদ্ধে দেখাইয়াছে, সোভিয়েটের লালফৌজও সেই কৌশলে অভ্যস্ত।

সোভিয়েট স্ট্র্যাটেজীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জার্মানদের মত অকস্মাৎ আক্রমণ এবং তড়িৎগতিতে যুদ্ধে ফললাভের স্বপ্ন লালফৌজ কখনও দেখে না। অর্থাৎ যুদ্ধে চটক দেখাইবার প্রবৃত্তি

(শেষাংশ ৫৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যবধান

শ্রীসমীর ঘোষ

(১)

ছোট্ট সংসার সতীশের। কিছুদিন হলো বিয়ে করেছে পূর্ব বাঙলার কোন এক জেলাতে। শ্বশুর বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, অর্থের অভাব তাদের না থাকলেও সংসারে একটি বিরাট অভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে একটি ছেলের জন্য। মা ষষ্ঠী এই পরিবারে একটি কন্যারত্ন কৃপা ক'রে চিরকালের মতো তাঁর কৃপা হতে এদের বঞ্চিত করেছেন। পরিবারে এই হতাশার মধ্যে সতীশের শ্বশুর তাঁর একমাত্র কন্যা সুচরিতার অঙ্গচ্ছায়ে জীবনের একটা পর্ব কাটিয়েছিলেন। তাঁর এই একমাত্র কন্যা; বাড়ির প্রতি কাজে সে ছিল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতি কাজে সুচরিতার অদৃশ্য হস্ত কাজ করে যেত। বৃদ্ধ বাবা স্নেহাঞ্চলে তাকে ঘিরে রাখতেন। তাঁর কাছে সুচরিতা যে নির্দেশ দিত তাই খাটত সর্বাগ্রে। পরিণত বয়সে যখন সুচরিতা তার বাবার স্নেহাঞ্চল ছেড়ে বিবাহ জীবনের দ্বারপ্রান্তে নতুন জীবনে ব্রতী হল, তখন তার বাবা জীবনে একটা বিরাট অসম্পূর্ণতা অনুভব ক'রে এক মনে নিবিষ্ট চিত্তে ওপারের আহ্বানের প্রতিক্ষায় বাকী সময়টা পূজার্চনায় ভগবানের আরাধনায় মগ্ন হবেন, তা স্বাভাবিক।

সতীশ কলকাতায় কোন এক মার্চেণ্ট অফিসের মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনের কেরাণী। কোনরকমে উত্তর কলকাতার অসূর্যম্পশ্যা একটি গলিতে একটি একতলা বাড়ি ভাড়া ক'রে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে ঢিমে তেতালায় সংসারটিকে চালিয়ে চলেছে।

পঁচাত্তর টাকা তার সংসার প্রতিপালনে বাধা না জন্মালেও তাতে স্ত্রী পুত্রের বা নিজের সখ-সামগ্রীর যোগান হয় না। সংসারের এই দিকটা যাতে অসম্পূর্ণ না থাকে তার জন্য তাকে একটি টিউশনির দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তাতে প্রায় টাকা কুড়ি মেলে।

স্ত্রী সুচরিতা যখন মাসের শেষে ধন্না দিয়ে তার কাছে বসে থাকে একটি ভাল সাড়ীর আশায় তখন এই কুড়ি টাকার মধ্যে তার ব্যবস্থা সতীশের করতে হয়। ছেলের জামা দরকার, তার ব্যবস্থাও এই কুড়ি টাকার থলি থেকে। সতীশ নিজের ব্যক্তিগত খরচ সম্বন্ধে তেমন সচেতন না থাকলেও পরিবারের যখন যা দরকার তার সংস্থানে সতীশ কখনও পেছ পাও হয় না। তার প্রকৃতির এই দিকটা স্বভাবতই কৌতূহলোদ্দীপক।

ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যে শুভ লক্ষণের ছায়া সতীশের সংসারে দেখা দিয়েছিল তা' হঠাৎ অবলুপ্ত হবার সূচনা হলো। তাদের এই ক্ষুদ্র সংসারের কোথায় একটা ফাটল দেখা দিল—পরিবারটির আনন্দের মাঝখানে একটি নিরানন্দের কৃষ্ণছায়া অবলোকিত হলো।

তার স্ত্রীকে ঘিরেই যে এর প্রকাশ তা সতীশের স্ত্রী 'সুচরিতার' বুঝতে বাকী রইল না। একমাত্র ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই আজ চার বৎসর পর্যন্ত সুচরিতার কাছে সতীশ নিতান্ত হেঁয়ালী মনে হতে লাগল। সতীশের কাছেও সুচরিতাকে আজ মনে হল একটা বিরাট ব্যবধান। সুচরিতা অবুঝের মতন তার দাবী জানাচ্ছে তার কাছে। বিমর্ষ, বিষণ্ণ সুচরিতাকে দেখে সে ভাবে, হয়ত সে নিতান্ত অজান্তে তার কাছে কিছু একটা পাওয়ার আশা করে সম্পূর্ণভাবে। সুচরিতা ভাবে, বোধ হয় সতীশের কাছে আজ সে অলীক স্বপ্ন—তার প্রতি সতীশের একটা অসংলগ্ন ঔদাসীন্য সে লক্ষ্য করেছে এ কয়দিন, যার সূচনা দেখা দিয়েছে এই একটিমাত্র ছেলে হবার পর থেকেই। যে কৃষ্ণচ্ছায়া দুজনের মনের কোনে টেনেছিল কাল একটি রেখা তা আরও গভীরভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ল দুজনের মাঝে। সুচরিতা ভাবে তাদের একটি মাত্র ছেলের গ্রন্থিতে যখন এই ক্ষুদ্র জীবনের পবিত্র বন্ধন শিথিল তখন এখানে রাহু হা করেছে সবকিছু গিলে খাবার জন্য। বিষিয়ে মারবে দুজনাকে। নিয়মের বিরুদ্ধে আজ চলেছে তারা,—দেনা-পাওনার সম্বন্ধ নিয়ে পরিহাস। এত বড় ট্র্যাজেডী সতীশ সহ্য করতে পারলেও সুচরিতা পারে না। তার সম্বন্ধে সতীশের এই ভুল সে শোধরাবে। একদিন সে সার্থক হবে। সুচরিতার ভরাযৌবন ঘেরা দেহকান্তি এই অনর্থের সূচনায় আজ ম্লান। সতীশ সুচরিতার এ চেহারা দেখেছে কিন্তু সে নির্বাক।

স্বামী যে দেবতা—সে সুচরিতা জানে, মনে মনে স্বীকার করে। সতীশকে সে ষোড়শোপচারে দিয়ে পূজো করে—তার সব সে বিলিয়ে দেয় তার কাছে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সতীশের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'তুমি কি রকম রোগা হয়ে যাচ্ছ, শরীরের প্রতি দৃষ্টি দিও বুঝলে?' সতীশও জানে সুচরিতাকে—সে যেন একান্তভাবে তার জন্যই জন্মেছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু আজ ব্যবধান নিভৃতে দেখা দিয়েছে সতীশের মনের কোনে, আজ সুচরিতা তার কাছে স্বপ্ন।

কাল বৈশাখীর তান্ডব লীলা যেন আজ সুচরিতার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে আলোড়ন এনেছে। মাঝে মাঝে তার হৃদয়তন্ত্রীতে ভীষণ ঘা দিয়ে সুচরিতাকে করে তোলে অবসন্ন। সতীশকে সে আজ হারিয়েছে চিরকালের মতন। সতীশ আজ তার কাছে অন্য কেউ।

সতীশের মধ্যে আজ সে দেখে রুদ্র বৈশাখের প্রচন্ডতা। কী শক্তি তার। সুচরিতা সতীশের সম্বন্ধে নানারকম ভাবে আর নিজেকে হারিয়ে ফেলে নানা চিন্তায় যখন সে এর সুরাহা করবার চেষ্টা করে। অন্যকে সুচরিতা বুঝতে দেয় না। ভয়ানক চাপা সে। সাংসারিক কাজে এই চিন্তা সে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না—তার হৃদয়ের এই দুষ্ট ক্ষত বার বার তাকে আঘাত করে।

(২)

সতীশ প্রতিদিন সকালে নয়টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে অফিস্ যাওয়ার জন্য তৈরী হয়।

অফিসে যাওয়ার সাজ পোষাক পরে রোজই ছেলেটিকে বাড়ির দুয়োর পর্যন্ত নিয়ে এসে শেষে একটা ট্রাম ধরে তার গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হয়।

এমনি এক সকালে সতীশ তার অফিসে চলে গেল। সুচরিতার সঙ্গে সতীশের এই সময়টা প্রায় দেখা হয় না—কারণ সুচরিতা গৃহস্থালীর কাজে এই সময়টা বিশেষ ব্যস্ত

থাকে। সতীশ যখন পান্‌টি খেয়ে তার ঘরে আহারান্তে বিশ্রামের পর্বটা কাটায়, সুচরিতা এ সময় তার কাছে আসে—কিন্তু সাংসারিক দু'একটা কথা ছাড়া অন্য কোনরূপ আলোচনা হয় না।

সতীশ অফিসে। সুচরিতা দ্বিপ্রহরের আহারান্তে একবার শয়নঘরে এসে সতীশের সদ্য তোলা একটি ছবি দেয়াল থেকে নাবিয়ে রাখ্‌লে শয়নঘরের টিপয়টির উপর। সে উন্মুখ হয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে আর এক একবার অধীর হয়ে বলে ওঠে, 'তুমি আমায় ভুল বুঝো না।' সে ছবিটিকে টিপয়ে রেখে বাড়ির সংলগ্ন বাগান থেকে কতকগুলি 'ক্রিসান্‌থিমাম্‌' ফুল তুলে এনে ছবির কাছে সারিবদ্ধ করে সাজালে। সতীশের ছবি যেন প্রাণ পেলে। সুচরিতা এগিয়ে গিয়ে সতীশের ছবির কাছে ধূপদানি জেনলে দিল। ধূপের ধূয়া ও ফুলের শ্রেণীবদ্ধ পরিবেশে মনে হলো সুচরিতার এ প্রথম পূজা-বিরাটের পূজা। এগিয়ে এসে সুচরিতা বলে উঠ্‌ল, "পারে না! তোমার সঙ্গে যখন আমার জীবনের গ্রন্থি বাধা চিরকালের জন্য তখন আমার প্রতি তোমার এ অসংযত ঔদাসীন্য হতে পারে না। আমার দোষ যদি কিছু থাকে—তবে ক্ষমা করো।" এক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল সুচরিতার বাম চোখ দিয়ে, মুখে দেখা দিল অপূর্ব রক্তিমা।

সুচরিতার এই প্রার্থনা কেউ শুনেছিল কিনা জানি না। কিন্তু বাতাসে বাতাসে তরঙ্গ তুলে এ মিলিয়ে গেল দূরে। হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় শয়ন ঘরের পূর্বদিকের জান্‌লার একটা কবাট গেল খুলে। একটা শালিখ পাখী ভীতিবিহ্বল হয়ে সেই জান্‌লা দিয়ে কিচির মিচির করে এসে ঢুক্‌ল ঘরে। আশে পাশে সবই শান্ত। নিদাঘ-তপ্ত দ্বিপ্রহরের খাঁ খাঁ ভাব চারদিকে। সবই একটানা চলেছে নিয়মে। কিন্তু...... ধূপদানি জ্বলতে লাগ্‌ল। ছবি রইল টিপয়ের উপর একইভাবে। সুচরিতা মাটিতে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে। অবরুদ্ধ একটা বেদনা যেন তার ভেতর থেকে ঠেলে বেরোতে চায়। কি কষ্ট সুচরিতার।

ঝি কেষ্টার-মা ডেকে গেল "মা"! ডাক মিলিয়ে গেল দূরে—বহু দূরে।

সোভিয়েটের রণনীতি ও রণকৌশল

(৫৩৯ পৃষ্ঠার পর)

তাহাদের কম। তাহাদের মতে আকস্মিক আক্রমণ ও "স্ট্র্যাটেজিক" আক্রমণের মধ্যে পার্থক্য আছে। যুদ্ধকে তাহারা একটা তাড়াতাড়ির ব্যাপার বলিয়া মনে করে না। অনেকগুলি অবস্থার উপর স্ট্র্যাটেজী নির্ভর করে। তাড়াহুড়া করিয়া অপ্রত্যাশিত ফললাভের আকাঙ্ক্ষা তাহারা মনে মনে পোষণ করে না। বরঞ্চ তাহারা ইহাই ধরিয়া লয় যে, যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিবে এবং শত্রু যথাশক্তিতে লড়িবে। একজন সোভিয়েট সমরবিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন ঃ—

"Modern warfare is not like a boxing match in which the better man knocks out his opponent suddenly with one blow. In war an uninterrupted flow of strength and energy is necessary in order to beat the enemy to his knees."

পক্ষান্তরে দেখা যায়, জার্মান স্ট্র্যাটেজীর মূলেই রহিয়াছে শত্রুকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া অত্যল্পকালের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করা। এই নীতিকে ভিত্তি করিয়াই জার্মান 'ব্লিটজক্রীগের' উদ্ভব। সোভিয়েটের স্ট্র্যাটেজী ঠিক ইহার বিপরীতধর্মী। যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে পারে ইহা মনে করিয়াই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং সেই ভাবেই তাহার সমরপ্রস্তুতি। তাহার সমরার্থক অর্থনীতি এবং শিল্প ব্যবস্থাও সেই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এই যুদ্ধের জয়পরাজয় সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন, তবে উভয় দেশের সমরপ্রস্তুতি, রণনীতি ও রণকৌশল দৃষ্টে এপর্যন্ত বলা যায় যে, যুদ্ধকে বিলম্বিত করিতে পারিলে সোভিয়েটের প্রতি বিজয়লক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ

(৫৩৩ পৃষ্ঠার পর)

বলেছি। পর্যটকের সেরূপ কুবুদ্ধি থাকা উচিত নয়। আরবদের অনুগ্রহে আজ নিগ্রোও চাপাটি খায়। আবার সেই আরব এবং তুরস্কদের আক্রমণের ফলে হাঙ্গেরীতেও কাঁচা লঙ্কার চাষ হয়ে থাকে। পর্যটক হতে হলে সকল দিক সামলিয়ে কথা বলা দরকার হয়, ছবি এঁকে, ছবি ছাপিয়ে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে দেওয়া অদূরদর্শীতার পরিণাম মাত্র।

জাপানী প্যাভিলিয়নের একজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো, তিনি আমার ঠিকানা নিয়ে গেলেন এবং পরের দিন দুটার সময় আস্‌বেন বলে গেলেন। পরের দিন ঠিক ঠিক সময় মতো এসেও ছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে সেদিন কথা খুব কম হয়, পরে দেখা হয় হলিউডে। তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়ে আমাকে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাতে আমার দুঃখ হয়েছিল। সেকথা হলিউডের তথ্য সম্বন্ধে যখন লিখব তখন বলা হবে।

মুক্তা ফলের লোভে

ভবানী পাঠক

পৃথিবীর স্থলের পরিচয় আমরা জানি। স্থলের উপরে যত রকম ঘটনা ও দৃশ্য আছে, তার সংগে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। স্থলের অন্তস্থলের পরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত নয়। সহস্র ফুট গভীর খাদের ভিতর থেকে বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ মানুষ তার ইঞ্জিনিয়ারিং নিপুণতার বলে নানা ধাতুরত্ন আহরণ করে আনছে। পৃথিবীর গর্ভে পরিখা খনন করে মানুষ বসবাস করবারও চেষ্টা করছে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই সুড়ংগের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। আধুনিক উন্নততর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার জোরে সুড়ংগ বা টানেল নির্মাণের রেওয়াজ আরও বেড়ে গেছে। ভূগর্ভে রেলওয়ের ব্যবস্থা আধুনিককালে নূতন কিছু নয়, বরং সর্বত্র এই রকম অন্তর্ভৌম যানবাহনের ব্যবস্থা আজকাল প্রসার লাভ করছে।

মানুষের গতিবিধি স্থলে ও জলে আর নিবদ্ধ নয়। আকাশেও যন্ত্রবিজ্ঞানে গরীয়ান মানুষের চলাচল আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য আকাশে এখনও মানুষ স্থির আশ্রয় পায় নি। জলের ওপর মানুষ আশ্রয় পেয়েছে। নিম্ন চীনের নদীবহুল প্রদেশে অজস্র লোক নদীর ওপর স্থাবর নৌকা বেঁধে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। কাশ্মীরের হ্রদে 'ভাসান জমি' তৈরী করা হয়, বাঁশ বা পাটাতনের ওপর মাটি ছড়িয়ে। তার ওপর লোকের বসতি খুবই বিরল, তবে শব্জী চাষ বেশী রকম হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জলপৃষ্ঠ ও স্থলপৃষ্ঠ—বর্তমানে এ দুইটি মানুষের অধিষ্ঠানের অবলম্বন হতে পেরেছে। বাকী রয়েছে আকাশ ও জলগর্ভ। আকাশে মানুষ বিমান-পোতে শুধু পাড়ি দিয়ে আসতে পারে; বিমানাবাস তৈরী এখনও সম্ভব হয় নি। জলগর্ভ বা সমুদ্রের অভ্যন্তর সম্বন্ধে সেই কথা বলা চলে। 'মুকুতা ফলের লোভে ডোবে রে অতল জলে যতনে ধীবর।' জলগর্ভে মানুষ নিজের স্বার্থের উদ্দেশ্যে হেঁটে হাতড়ে এসেছে। বহুদিন থেকেই এক শ্রেণীর ডুবুরীদের জাতব্যবসা ছিল শুক্তি উত্তোলন করা।

মহাশূন্যে বিলম্ব অগণ্যকোটী জ্যোতিষ্কের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী। কিন্তু ভূগোলের ভূবৃত্তান্তটুকুই শুধু আমরা কিছুটা চর্চা করেছি। কিন্তু পৃথিবীর বৃত্তান্ত জানা আমাদের অনেকখানি বাকী আছে।

জলগর্ভের কথা। এই রহস্যময় জগতের কতটুকু পরিচয় আমরা জানি? এ জগত চির অন্ধকারে আবৃত। বিচিত্র নয়নাভিরাম প্রাণী পরিপূর্ণ অতি শীতল একটি তরল জগৎ। বহিঃনিসর্গের মত এখানেও অজস্র বিভিন্ন দৃশ্যের বৈচিত্র্য রয়েছে। জলগর্ভে এমনও দেখা যায় যে, এক এক জায়গায় সুদীর্ঘ বৃক্ষখচিত উদ্যান। নানা রঙে রঙীন উদ্ভিদ, চকচকে ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্য সরীসৃপের গাত্র বিচ্ছুরিত জ্যোতি। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগৎ যেন যাদুমন্ত্রে শব্দহীন হয়ে আছে।

অন্ধ কাঁকড়া, উজ্জ্বল তারা মাছ, বিদ্যুৎপুচ্ছ বিশিষ্ট সরীসৃপের জীবন চাঞ্চল্যে ফসফোরাসের বর্ণবিভঙ্গ জল-রাজ্যের নিসর্গশোভা সৃষ্টি করে।

আজ পর্যন্ত সমুদ্রগর্ভে আড়াই হাজার হাতের বেশী কেউ নামতে সমর্থ হয় নি। ১৯১৬ সালে লিয়াভিট নামে মিশিগানের জনৈক ডুবুরী ৩৬১ ফুট নীচে নেমে ৪৫ মিনিট কাল থাকে। ১৯২০ সালে ফিলাডেলফিয়ার জন টার্নার ৩৬০ ফুট নীচে নামতে সমর্থ হয়। এই রেকর্ড এখনও কেউ

জাপানের নারী ডুবুরী

অতিক্রম করতে পারে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের সরকারী রেকর্ড হলো ৩০৬ ফুট।

তিনশত ফুট নীচে—অর্থাৎ জলরাজ্যের উপরতলা। এখানে শামুক পানা প্রভৃতি জন্মাবার মত আলোকের অভাব নেই। কিন্তু সত্যিকারের গভীর জলরাজ্য আরম্ভ হয় তিনশত ফুটের পর থেকে। সমুদ্রের তলদেশ গড়ে ৩১৭২২ ফুট ধরে নিতে পারা যায়। কিন্তু স্থলের পাহাড় পর্বতের মত সমুদ্রতলেও মাঝে মাঝে সুগভীর 'রসাতল' আছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতার চেয়েও এই রসাতলগুলির গভীরতা বেশী। ১২০০ ফুট নীচে বিচিত্র-দেহ জীবের আশ্রয়, এদের শরীরে সারি সারি দীপের মত আলোক উৎসারক অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ সমাবিষ্ট। এ থেকেই অনুমান করা যায়, সমুদ্রের একেবারে তলদেশে পেঁাছিলে সেখানে নিশ্চয় আর একটা জীবরাজ্য পাওয়া যাবে, যারা সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে স্থলবাসী জীবের চেয়ে কম নয়। বায়ুমণ্ডলে আবৃত স্থলচর জীব-জগতের কথা আমরা জানি, কেননা, আমরা সেই জগতেরই লোক। কিন্তু জলমণ্ডলে আবৃত 'রসাতল' রাজ্যের খবর আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আধুনিক উন্নত যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে ডুবুরী বহু গভীরে নেমে গিয়ে শুক্তি তোলে, ১০০ বছর আগে জলমগ্ন জাহাজের মালমসলা তুলে আনে। তবুও এই রসাতল রাজ্যে পেঁাছিতে হলে আধুনিক

জলের তলায় দুইজন ডুবুরী যাহাতে পরস্পর কথা বলিতে পারে তজ্জন্য টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে

যন্ত্রপাতির সাহায্যে চলবে না। আবিষ্কারের উন্নতির জন্য আরও এক হাজার বছর বোধ হয় অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

ডুবুরীর মতন এত দুঃসাহসী ও রোমান্টিক পেশা বোধ হয় আর কারও নেই। শুক্তির লোভে ডুবুরী কালো হিম সলিলের গহনে ডুব দেয়। হাতড়ে হাতড়ে স্পঞ্জ আর শুক্তি তোলে। অক্টোপাস, হাঙ্গর, হিংস্র কুকুর-মাছ তাড়া করে আসে।

আধুনিককালে বর্মাচ্ছাদিত ডুবুরীর জীবন অনেকটা নিরাপদ। বেশীক্ষণ জলের নীচে থাকাও তার পক্ষে সহজ. কেননা, সুদীর্ঘ টিউবের সাহায্যে ওপর থেকে নিঃশ্বাসের জন্য বায়ু সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

এ ব্যবস্থায় অক্টোপাসের আলিঙ্গন থেকে অবশ্য রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু একরকম অঙ্গ অসাড় করা রোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। Diver's Palsy নামে এ রোগ পরিচিত। নদীগর্ভে কয়েক শত ফুট নীচে ডুবুরী তার দানবীয় লৌহ পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে কাদা ঘাঁটে অথবা বালুময় সমুদ্রতলের ওপর সবুজ ম্লান জ্যোৎস্নার আভায় শুক্তি শিকার করে। আধুনিক ডুবুরীদের পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করেন অগাস্টাস সীব, ১৮২৮ সালে। রবার ও ক্যানভাসে তৈরী পোষাক, বুকের কাছে তামার একটা বর্ম। জলের চাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই তামার প্লেট ব্যবহার করা হয়। বুকের ওপর এই তামার বর্মের সঙ্গে গাঁথা থাকে একটি তামার হেলমেট। হেলমেটটি মুখোসের ঢঙে গড়া। হেলমেটের পিছন দিকে বায়ুবাহী টিউবের মুখ সংযুক্ত থাকে।

দুইশত ফুট নীচে নামবার পর ডুবুরীর শ্বাসক্রিয়াও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সাধারণত এক মিনিটে যতখানি শ্বাসবায়ু দরকার, তার শতগুণ বেশী বায়ু ডুবুরী এই অবস্থায় প্রতি মিনিটে গ্রহণ করে। জলের ভয়ঙ্কর চাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সক্রিয় রাখবার জন্য এই দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রয়োজন। ডুবুরীদের পায়ের বুট জুতোর ওজন প্রত্যেকটি ৮ সের হয়ে থাকে। আগে ডুবুরীরা পায়ে ভারী পাথর বেঁধে জলে ডুব দিত। এত ধাতু পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে ওজন বাড়িয়ে নেবার পরও ডুবুরী ২০০ ফুট নীচে গিয়ে বেলুনের মত ভাসতে থাকে। এই স্তরে জলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৯০ পাউণ্ডের মত।

গভীর ডুবের জন্য যে পরিচ্ছদ ধারণ করতে হয় তা নিয়ে নামবার আগে ডেকের ওপর ডুবুরী প্রায় নড়তে পারে না। নৌকা থেকে লাইফ লাইন ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবুরী। ওপর থেকে টিউবের ভিতর দিয়ে বায়ুস্রোত হেলমেটের ভিতর আসতে থাকে। ডুবুরীর কানে দূরে পাম্পের টিক্ টিক্ শব্দ বাজতে থাকে। ডুবুরীর সমস্ত অন্তরপুরুষ এই শব্দের দিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখে। সামান্য ত্রুটী হলেই তার বুকে চমক লাগে, মৃত্যুর ভ্রূকুটী ভেসে ওঠে। যত নীচে নামা যায় পাম্পের টিক্ টিক্ তত দ্রুততর হয়ে উঠতে থাকে, দ্রুততর বায়ুপ্রবাহ টিউবের ভিতর দিয়ে মুখোসে আসতে থাকে। এই শব্দ থেকেই ডুবুরী বুঝতে পারে কত গভীরে সে নেমে যাচ্ছে। জলের চাপে গায়ের পরিচ্ছদ চামড়ার সঙ্গে এক হয়ে বসে যেতে থাকে। শুধু মুখোস আর বুকের তামার প্লেটের ওপর জলের চাপে ডুবুরীর শরীরে কোন প্রকোপ হয় না। মাটীতে পা দেবার পর ডুবুরী 'লাইফ লাইন' ঝাঁকানি দিয়ে সংকেত করতে থাকে। ওপরের নাবিকেরা সে ভাষা বোঝে।

টেলিফোন আবিষ্কার হবার পর থেকে ডুবুরীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। লাইফ লাইনের সঙ্গে টেলিফোন রিসিভার লাগান থাকে। এমন কি দুজন ডুবুরী সমুদ্রতলে নেমে পরস্পর আলাপ করতে পারে, এমন ব্যবস্থাও টেলিফোনে করা হয়েছে। এর ফলে ডুবুরীরা জলের তলে কাজ করার সময় আর নিঃসঙ্গতা ভোগ করে না। গল্পগুজব করে তারা পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করে যায়।

গভীর জলস্তরে ডুবুরীদের বিপদ আছে। এত ভারি পরিচ্ছদ ধারণ করেও তারা অতি গভীর জলস্তরে এসে

শোলার মত ভাসতে থাকে, কেননা এখানে জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলনায় তার শরীর থেকে অনেক গুণে বেশী। ডুবুরীর চাঁদের মানুষের মত অবস্থা হয়। এই বানচাল অবস্থায় ডুবুরী যদি একটু মোচড় দিয়ে লাফ্ দিতে পারে, তবে এক দফা বহু উঁচু স্তরে সে উঠতে পারে। কিন্তু এমনি দুর্দৈব হয় যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও অপোগণ্ড শিশুর মত তার শরীরের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। দুইশত ফুট নীচে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডুবুরী যদি একটুক্‌রা কাঠের ওপর টাঙ্গির আঘাত করে, তবুও কাঠের টুক্‌রোটি

অসাড়তা প্রাপ্ত হওয়ায় একটি ডুবুরীকে উপরে তোলা হইয়াছে

ভাঙবে না। জলের চাপে কুঠারের আঘাত শত গুণ হাল্কা হয়ে যায়।

তার মাথার ঠিক খাড়া উপরে ভাসমান কোন জাহাজ থেকে যদি কামান গর্জন হয়, তবে তার কোন শব্দ ২০০ ফুট নীচের ডুবুরীর কানে আসবে না। অথচ জলের অভ্যন্তরে বিচরণশীল সাবমেরিনের শব্দ তার কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। জলের ভিতরে তিন মাইল দূরে কোন বিস্ফোরণের শব্দ ডুবুরীর শ্রুতিগোচর হয়।

সমুদ্রগর্ভের কোন বেলাভূমির ওপর এসে দাঁড়ালে ডুবুরীর দেখতে পায় সবুজ সূর্যের সন্ধ্যারাগের মত একটা আভা। দশ গজ দূরে অবস্থিত বস্তু তার দৃষ্টিগোচর হয়। ওপর দিকে তাকিয়ে সে দেখে বহিঃপৃথিবীর সূর্যরশ্মি অগাধ জলমণ্ডলের ভেতর দিয়ে কোটি কোটি রূপালী বুদ্বুদের মত ছাঁকা হয়ে ঝরে পড়ছে। কাঁকড়া, মাছ, সাপ, শামুক প্রভৃতি প্রত্যেকটি জলচর জীব সত্যিকারের আকারের চেয়ে—অনেক গুণ বড় হয়ে প্রতিফলিত হয়। আজব দেশের সমস্তই আজব। সমুদ্রগর্ভবাসীর চোখে দৃশ্যমান জগতের এত বড় ছলনা এত বড় প্রপঞ্চ আর কিছুই নেই। এখানে 'জগন্মিথ্যা' সত্য হয়ে উঠেছে। Things are not what they seem.—ঐ তথাদৃষ্ট বিরাট কাঁকড়াটিকে আসলে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলা যায়।

সিংহল, অস্ট্রেলিয়া এবং ত্রিপলির ডুবুরীরা খুবই দুঃসাহসী। হাঙ্গর আর কুকুর-মাছের আক্রমণের আশঙ্কায় এদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। গল্প শোনা যায় যে, সিংহলী ডুবুরীরা জলের নীচে ১৫ মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। কিন্তু এসব গল্প অমূলক। তবে শুক্তি আহরণে সিংহলী ডুবুরীদের দক্ষতা সর্ববাদিসম্মত। মালয় এবং জাপানি ডুবুরীরাও শুক্তি আহরণে পটু। অস্ট্রেলীয় ডুবুরীরা ৯০ ফুটের বেশী নীচে যেতে পারে না।

ভূমধ্যসাগরে ব্যাপকভাবে স্পঞ্জ আহরণ হয়। এখানের ডুবুরীদের ভয়ানকভাবে 'অসাড়' রোগে ভুগতে হয়।

আগে ধারণা ছিল, অত্যধিক জলের চাপের দরুণ এই 'অসাড়তার' আক্রমণ হয়। কিন্তু এ অনুমান সত্য নয়। প্রশ্বাস বায়ুর নাইট্রোজেন বার বার অধিক পরিমাণে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার জন্যই এই 'অসাড়তা' হয়ে থাকে।

এক এক সময় দেখা যায় ডুবুরী ওপরে উঠে আসার ১৫।২০ মিনিট পরে অসাড় হয়ে পড়ে যায়, অথবা মারা যায়। এই কারণে অসুস্থ ডুবুরীকে ধীরে ধীরে ওপরে টেনে তুলতে হয়। মাঝে মাঝে বিশ্রামও দিতে হয়।

[২৭]

বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকাল। সুবিমল এলাহাবাদ পৌঁছানোর পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে।

'অবনীশকে' শান্ত করিবার এবং শান্ত রাখিবার জন্য লাবণ্য কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হরিপদকে প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়াও বিনয়ের গৃহে আসিতে হইয়াছে। আজ সকালেও সে আসিয়াছে সেই সদভিসন্ধিরই অনুবর্তী হইয়া।

স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কহিলেও যেখান হইতে অপরের শ্রুতিগোচর হইবার আশংকা নাই, বারান্দার সেইরূপ একটা নিরাপদ কোণে বসিয়া হরিপদ, বিনয় এবং সুবিমল কথোপকথন করিতেছিল।

হরিপদর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া সুবিমল বলিল, "কি বিপদে যে পড়েছি দাদা, তা আর কি বলব! বসুধা শাসিয়ে রেখেছে, আজ বেলা ন'টার সময়ে তাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, গাঁদা আর সূর্যমুখী, ফুল নয় কেন। আচ্ছা বলুন দেখি, যে কথা তার মুখে আজ আমি প্রথম শুনলাম, সে কথা বিশদভাবে তাকে কেমন করে বোঝাই?"

বিস্মিত কণ্ঠে হরিপদ বলিল, "বল কি হে সুবিমল! গাঁদা আর সূর্যমুখী, ফুল নয় না-কি?"

কাতরভাবে সুবিমল বলিল, "চিরদিনই ত' ফুল বলে জেনে এসেছি; আজ এখন যদি অন্য রকম শুনি ত' কি বলব বলুন!"

বিনয় বলিল, "বলতে পার, চিংড়ি যদি মাছ না হ'তে পারে ত হলে গাঁদা আর সূর্যমুখীর ফুল না হবার পক্ষে বিস্ময়েরই বা এমন কি আছে, আর বিশদ করে সে কথা বোঝাবারই 'বা এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে। এতে আর কিছু না হোক, একটা পাল্টা উক্তি ত' দেওয়া হবে।"

আসন্ন বিপদকালে কাজে লাগাইবার পক্ষে কথাটার মধ্যে একটা সুযোগ উপলব্ধি করিয়া উৎফুল্ল মুখে সুবিমল বলিল, "তাই নাকি বিনু দাদা, চিংড়ি মাছ মাছ নয় না-কি ?"

বিনয় বলিল, "একেবারে নিঃসন্দেহ নই ভাই, তবে ঐরকম একটা জনশ্রুতি বহুকাল থেকে শোনা আছে। এর না-কি প্রধান প্রমাণ, চিংড়ি কাটলে রক্ত পড়ে না, কিন্তু কাৎলা কাটলে পড়ে।"

প্রমাণের কথা শুনিয়া সুবিমল আরও উৎফুল্ল হইল। অকস্মাৎ যেন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির দ্বার খুলিয়া গেল। আজ বেলা নয়টার সময়ে বসুধা বটানির কথা তুলিলে অন্যদিনের মত তাহা ফিজিক্সের কথা দিয়া চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না; আজ সে চিংড়ি, কাৎলা, গাঁদা এবং সূর্যমুখীর কথা তুলিয়া এমন একটা জটিল গবেষণার অবতারণা করিবে যাহার সুগভীর তলদেশে নিমজ্জিত হইয়া দুর্বৃত্ত বটানির আই-এস্‌সি ক্লাসের পাঠ দম আটকাইয়া মরিবে।

হরিপদ বলিল, "এই রকম বটানির ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে তোমাকে বিপন্ন হতে হয় না-কি সুবিমল?"

সুবিমল বলিল, "মাঝে মাঝে কি বলছেন দাদা? প্রতিদিনই হতে হয়। এমন কি এই বাড়িতে পদার্পণ করার আধ ঘন্টার মধ্যেও হতে হয়েছিল।"

সকৌতূহলে হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে সামলাও তুমি?"

সুবিমল বলিল, "ফিজিক্স চাপা দিয়ে। যখনি বসুধা বটানির কথা পাড়বার উপক্রম করে ফিজিক্সের একটা কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে এমন প্রবলভাবে আমি আলোচনা চালাই যে, তার মধ্যে সে বটানি সম্বন্ধে আর টুঁ শব্দ করবার ফাঁক পায় না।"

"কিন্তু ফিজিক্সের আলোচনার ত' শেষ আছে সুবিমল!"

সুবিমল বলিল, "আছে, যদি তা অকপট হয়। তা ছাড়া, বিপদের আশংকা উত্তীর্ণ হয় নি বুঝতে পারলে, ফিজিক্সের একটা প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা প্রসঙ্গ ত' আরম্ভ করা যায় দাদা।"

হরিপদ বলিল, "সর্বনাশ! এ তিন দিন তুমি এই-রকম করে কাটিয়েছ না-কি?"

কাতর কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "কাটিয়েছি!"

মুহূর্তকাল সুবিমলের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে হাসিয়া ফেলিয়া হরিপদ বলিল, "যন্ত্রণা ত' কম নয় দেখছি!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুবিমল বলিল, "দারুণ! একেবারেই কম নয়!"

সুবিমলের কাতরোক্তি শুনিয়া কষ্টে হাসি চাপিয়া বিনয় বলিল, "কিন্তু কষ্ট না করলে ত' কেষ্ট পাওয়া যায় না সুবিমল।"

হরিপদ বলিল, "এ ক্ষেত্রে কিন্তু রাধিকা।"

কৃষ্ণ ও রাধিকা বিষয়ে কোনো উত্তর না দিয়া সুবিমল বলিল, "এই নিদারুণ যন্ত্রণার কথা ভেবে মাঝে মাঝে মনে করি, দুত্তোর ছাই, আর অভিনয়ে কাজ নেই; জোড়হাত ক'রে বসুধাকে বলি, দোহাই তোমার, আর বটানির কথা বলে

আমাকে ভয় দেখিয়ো না, আমি বট্যানির বিন্দু বিসর্গ জানিনে; আমি অবনীশ নই, আমি সুবিমল।"

সুবিমলের কথা শুনিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বিনয় বলিল, "খবরদার সুবিমল, খবরদার! ওরকম ক'রে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের প্রহসনের শেষ অঙ্কটি যেন একেবারে মাটি করে দিয়ো না। আর ত' মধ্যে মাত্র চারটে দিন। ৩১শে ডিসেম্বরের সকাল সাড়ে দশটার সময়ে এ প্রহসনের যবনিকা পতন, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমারও যন্ত্রণার অবসান।"

হরিপদ বলিল, "আর, তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পুরস্কারেরও প্রাপ্তি।"

সুবিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে ভরসা বিশেষ কিছু নেই দাদা। বট্যানির বিদ্যের বিষয়ে যে রকম পরিচয় দিচ্ছি, তাতে নিঃসন্দেহ পরীক্ষায় ফেল করব।"

হরিপদ বলিল, "ভয় কি সুবিমল, আমরা তোমাকে গ্রেস্ দিইয়ে পাশ করিয়ে নোবো।"

সুবিমলের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "গ্রেস দিইয়ে পাশ করানো হয়ত' যায়, কিন্তু পুরস্কার দেয়ানো যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়েও না, বিশ্বসংসারেও না।"

হরিপদ বলিল, "কিন্তু এ সত্য যখন প্রকাশ পাবে যে, তুমি অবনীশ নও, সুতরাং তোমাকে বট্যানির বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত হয়নি,—তখন ফিজিক্সেরই জোরে তুমি পাশও করবে, পুরস্কারও পাবে।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সুবিমল চুপ করিয়া রহিল।

বিনয় বলিল, "তুমি যে কিছু যন্ত্রণা ভোগ করছ তা আমি অস্বীকার করিনে সুবিমল। কিন্তু যন্ত্রণা ভোগ থেকে আমিও একেবারে বাদ পড়িনি। লতিকা ত' আজ সকাল থেকে আমার সঙ্গে প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ করেছে; আর, যেটুকু বন্ধ করেনি, সেটুকুও বন্ধ করলে মোটের উপর আমি বোধ হয় কম দুঃখিতই হতাম।"

সকৌতূহলে সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বিনুদা?"

বিনয় বলিল, "লতিকার ধারণা, তোমাকে এ বাড়িতে স্থান দিয়ে আমি জটিল অবস্থাকে জটিলতর করেছি,—আর সেই জটিলতর অবস্থাকে আমার ভগ্নী, অর্থাৎ বসুধা, জটিলতম ক'রে তুলতে পারে সন্দেহ ক'রে সে তার ওপরও যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুবিমল বলিল, "আমার ওপরও যে তিনি খুব সন্তুষ্ট নন, তার সামান্য পরিচয় পেয়েছি আজ চা খাবার সময়ে তাঁর কথাবার্তা কওয়ার অল্পতার মধ্যে। কিন্তু কোথায়, কি লক্ষণ দেখে যে, তিনি এরকম শঙ্কিত হলেন, তা' ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

বিনয় বলিল, "ছোট-খাট অস্পষ্ট আবছায়া লক্ষণ তিনি পরশু থেকেই দেখছেন,—কিন্তু আসল লক্ষণ তিনি দেখেছেন কাল বিকেলে বাগানে তোমার আর বসুধার পাশাপাশি বেড়িয়ে বেড়ানোর মধ্যে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া সুবিমলের মুখে দুঃখের আভা হাসি ফুটিয়া উঠিল; আর্তকণ্ঠে বলিল, "হায় রে! তিনি যদি জানতেন যে, সে বেড়ানোর সমস্তটাই কণ্টকিত হ'য়ে ছিল বট্যানি আর ফিজিক্সের প্রশ্ন আর প্রতি-প্রশ্ন দিয়ে, তা হ'লে এরকম কথা কখনই মনে করতেন না!"

বিনয় বলিল, "তা তিনি জানেন। বসুধাকে জেরা ক'রে তিনি বট্যানি আর ফিজিক্সের কথা জানতে পেরেছেন। সুবিমল, তুমি কখনো গয়ায় গিয়েছ?

সুবিমল বলিল, "আজ্ঞে, না।"

"গয়ায় ফল্গু নদী আছে, শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"ফল্গু নদীর বিশেষত্ব কি, তা জান?"

"জানি।"

"তোমার বৌদিদি বলেন, তোমাদের বট্যানি আর ফিজিক্স ফল্গু নদীর বালি; আর সেই বালির নীচে যে অন্তঃসলিলা ধারা আছে, তাই জটিলতর অবস্থাকে জটিলতম ক'রে তুলবে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুবিমল বলিল, "এর ওপর ত' আর কথা কওয়া চলে না! এ ত' যুক্তির কথা নয় বিনুদা,—এ অনুভূতির কথা।"

হরিপদ বলিল, "কিন্তু সত্যি কথা। তবে লতিকা প্রকৃত কথা জানেন না ব'লে এ কথাটাকে অসংগত কথা মনে ক'রে ভুল করছেন।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া হরিপদ পুনরায় বলিল। "তোমাদের দুজনের দুঃখের কথা যখন বললে তখন আমার দুঃখের কথাটাও বলি শোন। যে জটিলতর অবস্থা এ বাড়িতে জটিলতম হবার অপেক্ষায় রয়েছে, লাবণ্যর বিশ্বাস আমিই প্রথমে তার জটিলতার সৃষ্টি করি গৌরহরিকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে। চোরের মার কাঁদবার উপায় নেই। আমি নিঃশব্দে তার হাজার রকমের অভিযোগ-অনুযোগ শুনি, আর চুপ ক'রে ব'সে থাকি। বল দেখি, ৩১শে ডিসেম্বরের আগে কি ক'রে তাকে বলি যে, গৌরহরিকে পাঠিয়ে আমি কিছুই অন্যায় করিনি। তার ওপর আমার প্রাণান্ত হয়েছে প্রশান্তর মুহুরী মথুরানাথকে সামলাতে সামলাতে। সে লোকটা যেমন চতুর তেমন তৎপর। সুলেখা আর অবনীশের সন্ধানে সে এক শ' মাইল বেড়ে এলাহাবাদের চতুর্দিক একেবারে চ'ষে ফেলবার জোগাড় করেছে। থেকে থেকে বলে, 'আমার সন্দেহ হয় তাঁরা কানপুরে গেছেন',—আর আমি কৌশলে তাকে অন্য পথে চালনা করবার ব্যবস্থা করি।"

হরিপদর কথা শুনিয়া বিনয় ও সুবিমল হাসিতে লাগিল।

বিনয় বলিল, "দেখবেন বড়দা, আমাদের প্রহসন শেষ হবার আগে মথুরা যেন কানপুর যেতে না পারে। ওর গতিবিধির ওপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।"

হরিপদ বলিল, "ক্ষেপেছ বিনয়। আমাদের প্রহসন শেষ করবার আগে আমি নিজেই মথুরাকে কানপুরে পাঠিয়ে

অবনীশ আর সুলেখাকে ধরিয়ে দেওয়াব। প্রহসন সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে প্রশান্ত নিজের পয়সা খরচ করে মথুরাকে কানপুরে পাঠিয়ে অবনীশ আর সুলেখাকে এলাহাবাদে আনাবে।"

সকৌতূহলে বিনয় বলিল, "অথচ আমাদের যা প্ল্যান তা নষ্ট হবে না ?"

হরিপদ বলিল, "নষ্ট ত' হবেই না,—আরও ভাল হবে।"

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "এ পারবেন বড়দা ?"

হরিপদ বলিল, "এ যদি না পারি তা হ'লে বৃথাই কলকাতার বালাম চাল আর মুগের ডাল খেয়ে এতটা বড় হয়েছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিনয় বলিল, "কি আপনার প্ল্যান আমাদের বলতে আপত্তি আছে কি বড়দা ?"

হরিপদ বলিল, "বিলক্ষণ! তোমাদের বলতে আবার আপত্তি কি আছে তা' ত' জানিনে। আমাদের দলের সকলের মত না নিয়ে আমাদের প্ল্যানে কোনো পরিবর্তনই ত' হ'তে পারে না। দাঁড়াও বলছি।" বলিয়া দেশলাই জ্বালিয়া হরিপদ একটা চুরোট ধরাইবার উপক্রম করিল। (ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

মনে ছিল আশা—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

'মনে ছিল আশা' উপন্যাসখানি যখন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল তখন পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করে। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক দরিদ্র যুবকের জীবনকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার কয়েকটি নরনারীর সুখ দুঃখের নিখুঁত চিত্র লেখক আশ্চর্য দরদের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহারা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপন অথচ শহুরে সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোকে যাহারা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যায়। দারিদ্র্যের পীড়নে মানুষ অমানুষ না হইয়াও সংগ্রামের মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এমন একটি আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ আদর্শ উপন্যাসখানিকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করিয়াছে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

হালখাতা (ছোটদের বার্ষিকী)—সম্পাদক—শ্রীঅসীম দত্ত ও শ্রীকমলাপ্রসাদ মিত্র, মূল্য এক টাকা।

বাঙলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিকট হইতে শিশুদের উপযোগী গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লইয়া ১৩৪৮ সালের বৈশাখে হালখাতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী এই পুস্তকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রত্যেকটি গল্প ও প্রবন্ধ সুলিখিত, পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়। বইখানি দামী কাগজে ছাপা, প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা মনোরম। ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার পক্ষে ইহা একখানি উপযুক্ত পুস্তক।

রূপকুমারের রূপকথা—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস, ২৯।১।১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

আলোচ্য পুস্তকের আখ্যানবস্তু মৌলিক ও পরিকল্পনাটি লেখকের নিজস্ব। পাকা লেখকের লেখনীতে গল্পটি জমিয়াছে এবং ভাষার প্রাঞ্জলতায় অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই।

শ্যামলী (মাসিক পত্রিকা):—সম্পাদক—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান—২৭।১, স্কুল রো, ভবানীপুর। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

আষাঢ় সংখ্যা 'শ্যামলী' পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। প্রত্যেকটি রচনাই সুলিখিত এবং বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সাময়িক পত্র সমালোচনা বিভাগটি এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, ইহা ছাড়া ছোট ছেলেদের জন্যও একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। একটি উপন্যাস ও দুইটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা নির্বাচনে সম্পাদকের রুচি-বোধ ও ঐকান্তিক চেষ্টার ছাপ সুস্পষ্ট। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আত্মবাণী—ডাক্তার কে চক্রবর্তী, এম বি প্রণীত। মূল্য আট আনা। সৎসঙ্গ, পাবনা। প্রাপ্তিস্থান—১৫।১নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

কতকগুলি ধর্মকথার সংগ্রহ। সৎকথার আলোচনা যাঁহারা করিতে চাহেন, তাঁহারা পাঠে পরিতৃপ্তি পাইবেন। সংগ্রহ সুন্দর।

বনযূথী—শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবি সরোজরঞ্জন বাঙলা মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় পাঠকদের নিকট অপরিচিত নহেন; তাঁহার কবিতা অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'বনযূথী' পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কাব্যরস বলিতে যে বস্তু বুঝায়, তাঁহার কবিতার মধ্যে সে বস্তুর প্রাচুর্য আছে এবং সেজন্য তাঁহার প্রতি কবিতায় প্রগাঢ় মাধুর্য সম্পাদিত হইয়া উঠিয়াছে; গীতি পাইয়াছে রূপ। 'বনযূথী', 'নব বরষায়', 'বসন্ত', 'স্বপ্ন-সঞ্চারিণী', 'শরৎ', 'মৌন পূজারিণী' কবিতাগুলি একাধারে ভাবের বৈচিত্র্যে এবং ছন্দের লালিত্যে অপূর্ব। রসিক সমাজে সরোজরঞ্জনের লেখার সমাদর হইবে।

সাহিত্য সংবাদ

তরুণ সঙ্ঘ গল্প, কবিতা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

তরুণ সঙ্ঘ (ঝোড়হাট) আন্দুলমৌড়ী পোস্ট, হাওড়া পরিচালিত হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা "তরুণ"এর উদ্যোগে গল্প, কবিতা ও চিত্র প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে আগস্ট, রবিবার ১৯৪১ সাল। গল্প ফুলস্কেপের চার পৃষ্ঠার বেশী হইলে অথবা অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে হইলে চলিবে না; কবিতা ৩০ লাইনের বেশী হইলে চলিবে না; ছবি আর্ট পেপারে আঁকিতে হইবে ও পেন্সিল স্কেচ্ চলিবে। যোগদানের কোন প্রবেশমূল্য নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। মনোনীত গল্প, কবিতা ও ছবি "তরুণ"এ প্রকাশিত হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে হইলে অথবা কোন কিছু জানিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের নির্ধারিত বিচারকের বিচারই মানিতে হইবে। পাঠাইবার ঠিকানা:—শ্রীবীরেশনাথ ভট্টাচার্য পরিচালক "তরুণ", ৬৪নং হ্যারিসন রোড (সঙ্ঘের কলিকাতা অফিস) অথবা "সম্পাদক" তরুণ সঙ্ঘ, ৬।২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা।

সোভিয়েট সাহিত্য

ম্যাক্সিম গোর্কি

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ছিঁচকে ধড়িবাজী স্টক এক্সচেঞ্জে, পার্লামেন্টে আর খবরের কাগজে বৃহৎ ও মহৎ আকার নিল, তখন উপন্যাসের নায়ক হিসেবে বদমাশের জায়গায় এল ডিটেকটিভ। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রমজীবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অপরাধে যে জগৎ পূর্ণ সেখানে এই ডিটেকটিভ দেখালেন অসাধারণ কৌশল কাল্পনিক অপরাধের রহস্য আবিষ্কারে। বিখ্যাত শার্লক হোমস্ যে ইংলণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিল, এটা মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নয়; আর তার চেয়েও কম আকস্মিক ব্যাপার, এই ডিটেকটিভ প্রতিভার পাশাপাশি "ভদ্রলোক তস্কর"এর আবির্ভাব। কল্পনা যা সৃষ্টি করে তার প্রেরণা আসে বাস্তব জীবন থেকে, আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত বাস্তব সব কারণ, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ভিত্তিহীন fantasy নয়। এই সব বাস্তব কারণ হচ্ছে সেই ধরণের কারণ যা ফ্রান্সে "বামপন্থী" ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রবৃত্ত করে "ভদ্রলোক তস্কর" স্টাভিস্কির শবদেহের সঙ্গে ফুটবল খেলতে; অবশ্য খেলতে তারা চায়, তবে খেলাটা "ড্র" রেখে শেষ করতে চেষ্টা করে।

ভাষায় যত রকম শিল্প সৃষ্টি আছে তার মধ্যে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে নাটক। নায়ক নায়িকার চিন্তা ও আবেগকে নাটক জীবন্তভাবে রঙ্গমঞ্চে মূর্ত করে। আমরা যদি শেক্সপীয়ারের সময় থেকে ইওরোপীয় নাটকের বিবর্তন লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই সে নাটক কোট্সেবু্য, নেস্টর কুকোলনিক, সার্দুর স্তরে এবং তারও নীচে নেমে গেছে; আর মোলিয়ের-এর কমিডি নেমেছে স্ক্রাইব-এর স্তরে। আমাদের দেশে গ্রিবোইয়েডভ ও গোগোল-এর পরে নাটক প্রায় একেবারে অদৃশ্য হয়েছে। আর্ট যেহেতু মানুষকে আঁকে, সেহেতু নাট্যশিল্পের অবনতি থেকে বোধ করি এই কথা মনে হতে পারে যে, স্পষ্ট সুপরিস্ফুট চরিত্রের ক্ষয় হয়েছে, "মহৎ মানুষ" সামনে থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

অথচ এই সব টাইপই আজ পর্যন্ত বাইরে বেশ আসর জাঁকিয়ে রেখেছে—যেমন, বুর্জোয়া সাংবাদিকক্ষেত্রে কুৎসাপ্রচারক থের্সাইটস্, সাহিত্যে মনুষ্যদ্রোহী টিমন অফ এথেন্স, রাজনীতিতে মহাজন শাইলক; শ্রমজীবী শ্রেণীর বিশ্বাস-হন্তা জুডাস তো আছেই। এ ছাড়া আরো অনেক মূর্তি আছে, অতীতে যাদের চমৎকার চরিত্র-চিত্রণ হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এই ধরণের চরিত্র সংখ্যায় আরো বেড়েছে এবং প্রকৃতিতে আরো বেশী ঘৃণ্য হয়েছে। উস্ত্রিক, স্টাভিস্কি, আইভার ক্রয়গার এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য মহা-জুয়াচোরদের অ্যাডভেঞ্চারের তুলনায় অ্যাডভেঞ্চারার জন ল' শিশু ছিল। সিসিল রোডস্ এবং উপনিবেশ লুণ্ঠনের অন্যান্য এজেন্ট কর্টেজ ও পিৎসারের যোগ্য সহধর্মী। বড় বড় তেল-মালিক, ইস্পাত-মালিক প্রভৃতি ব্যক্তিরা চতুর্দশ লুই বা আইভান দি টেরিব্ল্-এর চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর ও অনেক বেশী অপরাধী। দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদে রাষ্ট্রগুলোতে এমন সব মহামতি আছে যারা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালির "কন্দোত্তিয়েরি"র চেয়ে কম করাল নয়। ফোর্ড রবার্ট ওয়েনের একমাত্র ব্যঙ্গরূপ নয়। পিয়েরপণ্ট মর্গানের ভয়াবহ মূর্তির কোনো সমকক্ষ অতীতে নেই, অবশ্য আমরা যদি সেই প্রাচীন সম্রাটকে বাদ দিই যাঁর গলায় গলানো সোনা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।

উপরে যে সব নামের উল্লেখ করা হলো তা ছাড়াও অবশ্য আরো অনেক "মহৎ" মানুষকে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী সৃষ্টি করেছে। এই সব লোকের যে চরিত্র বল আছে, নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়াবার জন্যে টাকা গোনবার, পৃথিবী লুট করবার, আন্তর্জাতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাবার প্রতিভা আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তাদের আশ্চর্য নির্লজ্জতা বা গর্হিত কাজের অমানুষিকতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইওরোপের বাস্তবপন্থী সমালোচনা এবং সুকুমার সাহিত্য এই সব লোককে বাদ দিয়ে চলে গেছে, তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রায় লক্ষ্য করে নি।

"ফালতু মানুষের" চরিত্র চিত্রণে সাহিত্য যে আর্টের শক্তি দেখিয়েছে সে শক্তি নিয়ে নাটক বা উপন্যাসে কোনো ব্যাঙ্কার, কারখানা-মালিক বা রাজনীতিকের চরিত্র চিত্রণ করা হয় নি। বুর্জোয়া সংস্কৃতির যারা স্রষ্টা ও কর্ণধার সেই বৈজ্ঞানিক, আর্টিস্ট ও টেকনিক-প্রবর্তকদের নিত্যদৃষ্ট শোচনীয় ভাগ্যের দিকেও সাহিত্য কোনো নজর দেয় নি। যে সব বীর বিদেশীর কবল থেকে জাতিকে মুক্ত করবার জন্যে লড়েছে তাদের এবং টমাস মোর, কাম্পানেলা, ফুরিয়ে, স্যাঁ সিমঁ প্রমুখ যে সব লোক সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখেছে তাদের স্থান সাহিত্যে হয় নি। আমি ভর্ৎসনা করছি না। অতীত ভর্ৎসনার অতীত নয়; কিন্তু ভর্ৎসনা করার কোনো মানে নেই। অতীতকে অধ্যয়ন করা দরকার।

বিংশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় সাহিত্যে সৃজনী শক্তির এই অবসাদ এল কি করে? আর্টের স্বাধীনতাকে, সৃজনী চিন্তার স্বাধীনতাকে বার বার প্রবল আবেগে সমর্থন করা হয়েছে; শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে সাহিত্য যে কি রকম বেঁচে থাকতে ও পুষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ সাহিত্য যে সামাজিক রাজনীতির উপর নির্ভরশীল নয়, একথা প্রমাণের জন্যে সব রকম যুক্তি দেখানো হয়েছে। এ নীতি কিন্তু খুব খারাপ হয়েছিল। কারণ এর ফলে বহু সাহিত্যিক বাস্তব জীবন সম্বন্ধে নিজেদের পর্যবেক্ষণকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করবার, জীবনের ব্যাপক ও বহুমুখী অধ্যয়ন থেকে বিরত হবার, "নিজেদের হৃদয়ের নির্জনতায়" নিজেদের বদ্ধ করবার, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন খেয়ালী চিন্তা ও

আত্মখীনতার মারফৎ একটা নিষ্ফল "আত্মপরিচয়ে" সীমাবদ্ধ থাকবার পথে অলক্ষ্যে পরিচালিত হ'লো। কিন্তু দেখা গেছে যে, বাস্তব জীবন ওতপ্রোতভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত; সেই বাস্তব জীবন থেকে আলাদা করে' মানুষকে বোঝা যায় না। দেখা গেছে যে, মানুষ নিজের সম্বন্ধে যতই আজব ধারণা তৈরী করুক না কেন, সে সামাজিক জীবই থাকে, গ্রহনক্ষত্রের মতো তার অস্তিত্ব শূন্যমার্গী নয়। তা ছাড়া এও দেখা গেছে যে, যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিণতি আত্মরতি, তা থেকেই হয় "ফালতু মানুষের" উৎপত্তি। প্রায়ই দেখা গেছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে নিপুণভাবে সৃষ্ট নায়ক ছিল এই "ফালতু মানুষের"ই টাইপ। এই ধরণের মানুষকে আঁকতে গিয়ে সাহিত্যের অগ্রগতিকে থামতে হল। সাহিত্য এঁকেছিল শ্রমবীরকে অর্থাৎ যে মানুষ টেকনিকের দিক দিয়ে নিরস্ত্র হয়েও তার দিগ্বিজয়ী শক্তিকে ঘিয়ের ভিতরে অনুভব করেছে; এঁকেছিল সামন্ত বিজেতাকে অর্থাৎ যে মানুষ বুঝেছে, জিনিষ গড়ার চেয়ে কেড়ে নেওয়া সোজা; এঁকেছিল বুর্জোয়াদের আদরের জুয়াচোরকে, পারে। গত ১৭ "জীবন-শিল্পের শিক্ষক"কে অর্থাৎ যে-মানুষ বুঝেছিল ইমানদারির কাজ করার চেয়ে সোজা হচ্ছে চুরি করা, প্রতারণা করা। তারপরই সাহিত্য তার বিকাশের পথে থমকে গেল। ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা যারা, মানুষের নিপীড়ক যারা, যারা সামন্ত-অভিজাত, ধর্মযাজক, রাজা ও জারের চেয়েও অনেক বেশী অমানুষিক তাদের দিকে সাহিত্য দৃষ্টি দিল না।

ইওরোপের বুর্জোয়া সাহিত্যে দুই দল লেখকের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। একটা দল নিজের শ্রেণীরই মহিমা কীর্তন আর মনোরঞ্জন করে; যথা—ট্রলোপ, উইল্কি কলিন্স, ব্র্যাডন, ম্যারিয়াট, জেরোম, পল দ্য কক, পল ফেভাল, ওক্তাভ কেইয়ে, জর্জ ওনে, জর্জ সামারোভ, জুলিয়াস স্টিন্ডে এবং এই ধরণের শত শত লেখক। এরা হচ্ছে "ভালো বুর্জোয়া" লেখকের খাঁটি নমুনা। এদের প্রতিভা বেশী কিছু নেই, কিন্তু এরা কৌশলী আর লঘু, ঠিক এদের পাঠকদের মতো। অন্য দলে লেখক-সংখ্যা কয়েক ডজনের বেশী নয়; তারা হচ্ছে সেই সব গরীয়ান লেখক যারা বিচারপন্থী রিয়্যালিজম্ ও বৈপ্লবিক রোম্যান্টিসিজম সৃষ্টি করে। তারা হচ্ছে স্বধর্মদ্রোহী, তাদের শ্রেণীর "বেহিসেবী সন্তান"—তারা হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা বিনষ্ট অভিজাত কিংবা সেই সব মধ্যবিত্ত-বংশধর যারা তাদের শ্রেণীর চারিপাশের শ্বাসরোধী আবহাওয়া থেকে নিজেদের ছিনিয়ে বাইরে নিয়ে এসেছে। এই দলের ইওরোপীয় লেখকদের বইয়ের দুটো মূল্য আমাদের কাছে আছে এবং সে-মূল্য অবিসংবাদিত ঃ প্রথমত, আঙ্গিকের দিক দিয়ে আদর্শ সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে; দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ও ক্ষয়ের ইতিবৃত্ত হিসেবে। যদিও এই ইতিবৃত্ত রচনা করেছে ঐ শ্রেণীর দলত্যাগীরা, তবু তা থেকে তার জীবন, ঐতিহ্য ও কার্য-কলাপের একটা বিচারশীল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় সাহিত্যে বিচারপন্থী রিয়্যালিজ্মের ভূমিকার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। তার সারমর্ম হচ্ছে ধনিকদের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত সামন্ত-রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। উদারনীতি ও লোকহিতৈষণার মতবাদের ভিত্তির উপর গণতন্ত্রকে অর্থাৎ মধ্যবিত্তকে সংগঠিত করে' এই সংগ্রাম চালানো হয়েছে। বহু লেখক এবং অধিকাংশ পাঠক এই গণতন্ত্র সংগঠনকে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক শ্রেণীর উত্তরোত্তর শক্তিশালী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলে' মনে করেছে।

* * *

আপনারা জানেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুশ সাহিত্যের অসাধারণ ও অভূতপূর্ব শক্তিশালী বিকাশে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমস্ত মেজাজ ও ঝোঁকের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যকে পরে তা প্রভাবিতও করেছে। রুশ বুর্জোয়া সাহিত্যের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে "ফালতু মানুষের" টাইপের প্রাচুর্য। তার মধ্যে অনেক মৌলিক টাইপও আছে, যা ইওরোপীয় পাঠকদের কাছে অপরিচিত-যেমন, লোকগাথায় ভাসিলি বুসলাইয়েভ, ফেডর টলস্টয়, মাইকেল বাকুনিন এবং ইতিহাসের অন্যান্য চরিত্র। এরা সাহিত্যে "অনুতপ্ত অভিজাতের" এবং জীবনে "মাথা খারাপ" লোকের টাইপ।

পাশ্চাত্যের মতো আমাদের সাহিত্যও দুই দিকে বেড়ে ওঠে। একটা হচ্ছে বিচারপন্থী রিয়্যালিজ্মের পথ। এর প্রতিনিধি হচ্ছে ভনভিজিন, গ্রিবোইয়েডভ, গোগোল প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে' শেকভ ও বুনিন পর্যন্ত। আর একটা হচ্ছে নিছক মধ্যবিত্ত সাহিত্যের পথ। তার প্রতিনিধি হচ্ছে বুলগারিন, মাসাল্‌স্কি, জতোফ, গোলিট্সিন্স্কি, ভনলিয়ার-লিয়াস্কি, ভসেভলোড ক্রেস্টভ্স্কি, ভসেভলোড সলোভিয়েভ থেকে আরম্ভ করে' লেইকিন, অভেরশেঙ্কো পর্যন্ত।

পাপাজিত অর্থে ধনী ভাগ্যবান জুয়াচোর যখন স্থান নিল সামন্ত-বিজেতার পাশে, তখন আমাদের লোকগাথা "সরল আইভান"-এর রূপে তার এক সঙ্গী জুটিয়ে দিল। এই লোকটা একটা ব্যঙ্গ-টাইপ; সে টাকা রোজগার করে, এমন কি রাজত্বও পায় একটা কুঁজো ঘোড়ার সাহায্যে। রোম্যান্সের সদয়া পরীর জায়গা নিল এই ঘোড়া।

চার্চ চেষ্টা করছিল যাতে দাস তার ভাগ্য মেনে নেয় এবং তার মনের উপর যাতে চার্চের আধিপত্য কায়েম হয়; সুতরাং নম্রতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতীক হিসেবে নায়ক সৃষ্টি করে' এবং "খৃষ্টের জন্যে" শহিদ তৈরী করে' চার্চ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। চার্চ সৃষ্টি করল "সন্ন্যাসী"; অর্থাৎ যাদের দিয়ে তার কোনো দরকার ছিল না, তাদের সে পাঠাল পাহাড়ে জঙ্গলে ও মঠে।

শাসক শ্রেণী যত বিভক্ত হতে লাগল, তার নায়করা তত

ছোট হ'তে থাকল। এমন একটা সময় এল যখন লোকগাথার "বোকারা" সাঙ্কো পাঞ্জা, সিমপ্লিসিসিমাস ও অয়লেন্‌শ্‌পীগেল-এ রূপান্তরিত হ'য়ে সামন্ত-প্রভুদের চেয়ে চালাক হ'য়ে উঠল, তাদের প্রভুদের বিদ্রূপ করবার সাহস পেল এবং সেই মনোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করল যে মনোভাব রূপ পেল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে "টাবোরাইট"-দের গল্পে এবং নাইটদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামের কাহিনীতে।

শ্রমজীবী জনসাধারণের অলিখিত রচনার পরিচয় না পেলে তাদের প্রকৃত ইতিহাস বোঝা যায় না। বহু মহাগ্রন্থের সৃষ্টিতে এদের স্পষ্ট প্রভাব ছিল; যেমন, "ফাউস্ট", "ব্যারন মুনশহাউসেনের অ্যাডভেঞ্চার", "পাণ্টাগ্রুয়েল ও গার্গানতুয়া", ডি কোস্টারের "টিল অয়লেন্‌শ্‌পীগেল", শেলির "প্রমিথিয়ুস আনবাউণ্ড" ও আরো অনেক বই। প্রাচীনকাল থেকে লোকগাথা অবিরত ইতিহাসকে অদ্ভুত চোখে দেখেছে। একাদশ লুই ও আইভান দি টেরিবল্-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে লোকগাথার একটা নিজস্ব ধারণা আছে; এ ধারণা ইতিহাসের রায় থেকে একেবারে অন্যরকম। ইতিহাস লিখেছেন বিশেষজ্ঞরা; নৃপতি ও সামন্ত-প্রভুদের মধ্যে সংঘর্ষের অর্থ যে শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনের পক্ষে কি, সে প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামান নি। আলুর চাষ করবার জন্যে স্থলে জবরদস্তির মনোভাব নিয়ে যে "প্রচারকার্য" চলেছিল, তা থেকে কতকগুলো গল্প ও জনপ্রবাদের উৎপত্তি হয়; এক বেশ্যার সঙ্গে শয়তানের সহবাসের ফলে আলুর জন্ম হয় বলে' এই সব গল্প-প্রবাদে প্রচার করা হয়েছে। প্রাচীন বর্বরতার দিকে এর গতি; "খৃষ্ট ও তাঁর শিষ্যেরা আলু খেতেন না", এই চার্চ-মত দিয়ে একে শুদ্ধ করে' নেওয়া হয়। কিন্তু এই একই লোকগাথা আমাদের কালে ভ্লাডিমির লেনিনকে পুরাকালের এক পুরাণ-কথিত বীরের পর্যায়ে—প্রমিথিয়ুসের সমান পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

পুরাণ হচ্ছে উদ্ভাবন। উদ্ভাবন করার মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বাস্তব ব্যাপার থেকে তার সার কথাটা বের করে' নিয়ে তাকে রূপকে মূর্ত করা। এইভাবেই আমরা পাই রিয়্যালিজ্‌ম্। নির্দিষ্ট বাস্তব ব্যাপার থেকে নিষ্কাষিত আইডিয়ার সঙ্গে আমরা যদি অনুমিতির (hypothesis) সাহায্যে আইডিয়াটাকে পূরণ করে' যা বাঞ্ছনীয় ও সম্ভবপর তা যোগ করে' দিই, তাহলেই পাই সুস্থ রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্। এ রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ হচ্ছে পুরাণ কাহিনীর মূলে এবং এ রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ অতি শুভ। কারণ সে বাস্তবের প্রতি একটা বৈপ্লবিক মনোভাব জাগিয়ে তোলে; এই মনোভাব জগৎকে বেশ ব্যবহারিকভাবে বদ্‌লে দেয়।

আমরা দেখ্‌তে পাই, বুর্জোয়া সমাজ আর্টের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন-ক্ষমতাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। অনুমিতির লজিক টিঁকে আছে; কিন্তু সে শুধু পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রেরণা দিয়ে থাকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্—যার ঝোঁক আজ্ গ[illegible]ার দুর্জ্ঞেয় আইডিয়ার দিকে—কল্পনাকে অনুপ্র[illegible] চিন্তাকে উৎসাহিত করে না। বাস্তব থেকে [illegible]ভক্ত এই রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ দৃঢ়মূল রূপকের উ[illegible] গড়া প্রায় সম্পূর্ণভাবে "শব্দের ম্যাজিক" [illegible]মন আমরা দেখি মার্সেল প্রুস্ত ও তাঁর [illegible]াভালিস থেকে আরম্ভ করে' যত বুর্জোয়া [illegible] সব পিটার শ্লেমিহলের টাইপ, যে "তার ছায়াকে হারিয়ে ফেলেছিল।" এই শ্লেমিহলকে সৃষ্টিও করেছিলেন একজন ফরাসী দেশত্যাগী। তাঁর নাম শামিসো; তিনি জার্মানীতে জার্মান ভাষায় লিখেছিলেন। সমসাময়িক পাশ্চাত্যের লেখকও তার ছায়া হারিয়ে ফেলেছে; সে বাস্তব থেকে চলে গেছে হতাশার শূন্যবাদে। লুই সেলিন-এর বই A Journey to the End of the Night থেকে এটা বোঝা যায়। এই বই-এর নায়ক বার্দোমু তার দেশ হারিয়েছে; সে মানুষকে ঘৃণা করে, মাকে বলে "কুকুরী" আর তার রক্ষিতাদের বলে "পচা মাংস"; সে সব রকম অপরাধ সম্পর্কে নির্বিকার এবং বিপ্লবী প্রোলেটেরিয়াটে "যোগ দেবার" কোনো কারণ তার নেই বলে' সে ফাশিজ্‌ম্ বরণ করবার জন্যে একেবারে তৈরী।

ক্রমশ

আজ-কাল

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা কবে হবে, এখনো সামরিক পরিস্থিতি দেখে বলা যাচ্ছে না। আক্রান্ত দেশের পক্ষে এটা কৃতিত্বের কথা। তবে এটা ঠিক যে, আগের চেয়ে মন্থরভাবে হলেও জার্মানী আরো এগিয়েছে। জার্মানদের সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি হয়েছে মধ্য রণাঙ্গনে মস্কোর দিকে। গত ১৭ই জুলাই তারা মস্কো থেকে ২২০ মাইল দূরে স্মলেনস্ক দখলের কথা প্রচার করে। তার একদিন আগে থেকে সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, স্মলেন্স্ক্-এর দিকে লড়াই চলছে। মস্কো এখনো পর্যন্ত স্মলেন্স্ক্-এর পতন স্পষ্ট স্বীকার করেনি; তবে বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, স্মলেনস্ক-এ জার্মানরা ঢুকেছে; তবে যুদ্ধটা এখন শহরটাকে ঘিরেই চলছে। সোভিয়েট সৈন্যেরা এর খানিকটা দক্ষিণ পশ্চিমে বব্রুস্ক দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে; এ আক্রমণ সফল হলে স্মলেন্স্ক-এ জার্মনরা পেছন দিক থেকে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে দেখা যায়, গত ১৭ই তারিখ থেকে যুদ্ধ একই জায়গায় চলছে। জার্মানীর ইস্তাহারে অবশ্য বিভিন্ন দিকে অগ্রগতি ঘোষণা করা হচ্ছে; কিন্তু নির্দিষ্ট নামের অভাবে সে ঘোষণার সত্যাসত্য বিচার করবার উপায় নেই। তবে দু'একটা ইস্তাহারে জার্মানী বড় কাঁচা হাতের পরিচয় দিয়েছে। যেমন, গত ৯ই জুলাই জার্মান ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে, জার্মানরা সমগ্র বেসারেবিয়া দখল করেছে; অথচ গত ১৭ই ও ১৮ই জুলাই-এর জার্মান ইস্তাহারে বলা হয় যে, জার্মানরা বেসারেবিয়ার রাজধানীতে পৌঁছেছে এবং আরো কয়েকটা প্রধান জায়গা দখল করেছে। একটা সমগ্র প্রদেশ দখল করে' নেওয়ার পর আটদিন পরে তার রাজধানীতে ও অন্যান্য জায়গায় পৌঁছানর আবার কি দরকার থাকে বোঝা যায় না। গত ১৭ই জুলাই জার্মান ইস্তাহারে বলা হয় যে, সোভিয়েট তার শেষ রিজার্ভ সৈন্য ব্যবহার করছে; ২১শে তারিখে জার্মান খবরে বলা হয় যে, সোভিয়েট শেষ রিজার্ভ সৈন্য রণক্ষেত্রে পাঠাল। দু'দুবার শেষ সৈন্য পাঠালে শেষ হবে কবে? জার্মানীর অধুনাতম দাবী হচ্ছে এই যে, লাল-ফৌজকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করে' দেওয়া হয়েছে। এই রকম আরো দৃষ্টান্ত আছে। তবে আসল কথা, জার্মানবাহিনী অগ্রসর হতে পারছে বলেই এই ধরণের অসঙ্গতিপূর্ণ ইস্তাহার প্রচারে ক্ষতিবোধ করছে না।

মস্কোতে সোমবার রাত্রে প্রথম জার্মান বিমান আক্রমণ হয়েছে। দুই শতাধিক জার্মান বিমান একসঙ্গে সোভিয়েট রাজধানীর উপর যাবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু বিমান নাকি ছাড়া ছাড়াভাবে পৌঁছতে পারে। আক্রমণের ফলে কয়েকজন লোক হতাহত হয় এবং কয়েক জায়গায় আগুন লাগে। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, দু'রাত লেনিনগ্রাডে হানা দেবার জন্যে জার্মান বিমান চেষ্টা করে; কিন্তু তারা পথেই প্রতিহত হয়।

সোভিয়েট গভর্নমেন্টের এক বিধানে লাল ফৌজে সামরিক কমিসার ও রাজনীতিক নেতা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব ও কাজের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সংযোগ দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর করাই এর উদ্দেশ্য মনে হয়। স্টালিন বর্তমান সংকট অবস্থায় নিজে আরো দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন; এখন দেশরক্ষাসচিবের পদও নিলেন।

জাপ মন্ত্রিসভা বদল

জাপানের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করার পর এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এ পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়েই থাকলেন; তবে অন্যান্য সব দপ্তরে নতুন লোক এলেন। এ মন্ত্রিসভায় সমরনায়কদেরই প্রাধান্য হয়েছে। পররাষ্ট্রসচিব হলেন এডমিরাল তয়োদা। মিঃ মাৎসুওকা—যিনি সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন—বিদায় নিলেন। নতুন পররাষ্ট্রসচিব প্রথমেই এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, জাপানের পররাষ্ট্রনীতি অপরিবর্তনীয়; তবে দিনকে দিন আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হবে। আবার জার্মানী ও ইতালীকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, ত্রিশক্তি চুক্তিই জাপ পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি থাকবে।

জাপানের উদ্দেশ্য?

জাপ-মন্ত্রিসভার পরিবর্তন যে নিকট ভবিষ্যতে নতুন একটা জাপ সামরিক অভিযানের পূর্বাভাষ, এ কথা সকলেই অনুমান করছে। কিন্তু সে অভিযান কোন্ দিকে—সোভিয়েট এশিয়ার দিকে, না ইন্দোচীন ইস্ট ইন্ডিজের দিকে? এ নিয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা চলছে। শোনা গেল, জাপান শান্সি থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে মাঞ্চুকুওতে বা কালগানে (পিপিং-এর পশ্চিমে) পাঠাবার জন্যে সমবেত করছে। এই সঙ্গে আবার সামরিক কাজের জন্যে অর্থাৎ সৈন্য ও সমরোপকরণ বহনের জন্যে পিপিং-ফুসান (কোরিয়া) রেলপথে অনেক যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ করে' দিয়েছে। এ যদি সত্যি হয়, তাহলে এর লক্ষ্য সোভিয়েট। আবার শোনা যাচ্ছে, জাপান ইন্দোচীনে আরো প্রবেশ করে' ঘাঁটি করবার জন্যে দাবী করছে। ইন্দোচীনের গভর্নর এডমিরাল দেকু তো দৌড়েছেন হানয়ে জাপ সামরিক মিশনের কাছে। জাপ মিশনের কর্তাও টোকিওতে যাতায়াত করছেন। এ গতিবিধি যেন ইস্ট ইন্ডিজকে লক্ষ্য করে'। বৃটেন ও আমেরিকার যে রকম মনোভাব তাতে তারা ইন্দোচীনে জাপানকে ঢুকতে দিতে রাজী নয়। অবশ্য এমন অনুমান করা যেতে পারে যে, জাপান ভাবছে সে সোভিয়েটকে আক্রমণ করলে বৃটেন ও আমেরিকা এ দিক থেকে তাকে চেপে ধরতে পারে; সে জন্যে সতর্কতা হিসেবে এদিকের ঘাঁটি যতটা সম্ভব শক্ত করবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু সোভিয়েটকে সে কি অবস্থায় আক্রমণ করবে? জার্মানী মস্কো পর্যন্ত দখল না করে' নিলে জাপান সোভিয়েটকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে বলে' মনে হয় না।

বিমানহানা

বৃটিশ বিমান ক্রমাগত জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে বলে' খবর পাওয়া যাচ্ছে। রটারডাম, হানোভার, মুনস্টার, ডুসেলডর্ফ, কলোন প্রভৃতি জায়গায় তারা

প্রচুর বোমাবর্ষণ করেছে। বহু জার্মান জাহাজ নাকি উপকূলে ঘায়েল হয়েছে। বৃটেনে জার্মান বিমানহানা অল্পস্বল্প চলছে।

বলিভিয়ায় এক নাৎসী অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত থাকার জন্যে জার্মান দূতকে সেখানকার গভর্নমেণ্ট বহিষ্কৃত করেছেন। অনেক নাৎসী ও নাৎসী সমর্থককে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর্জেণ্টিনা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নাৎসীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো এক বক্তৃতায় এক্সিসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির প্রতি তাঁর বিরাগ ব্যক্ত করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নকে গালিগালাজ করে' তিনি বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে যোগ দিতে চায়নি: সে চেয়েছিল, শেষকালে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। হিটলার রুশিয়া আক্রমণের আগে বলেছিলেন, রুশিয়া বৃটেনের সংগে ষড়যন্ত্র করছিল। কিন্তু তাঁর সেবক ফ্রাঙ্কো তাঁর কথাকে খণ্ডন করছেন!

ভারতবর্ষ

বড়লাটের ঘোষণা

বড়লাট তাঁর শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণ ও 'জাতীয়' দেশরক্ষা পরিষদ গঠন ঘোষণা করেছেন। শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণের কারণ "যুদ্ধ সম্পর্কে কাজের চাপ বৃদ্ধি," আর দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের কারণ "বে-সরকারী জনমতকে সমর পরিচালনার সংগে যথাসম্ভব বেশী যুক্ত করা।" এর মধ্যে ভারতের জাতীয় দাবী বা অধিকারের কোনো উল্লেখই নেই। মিঃ এমেরী কমন্স-সভায় বলে' দিয়েছেন যে, এই নতুন ব্যবস্থায় কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত নেই। এখন শাসন পরিষদে কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছাড়া চারজন সরকারী ও তিনজন বে-সরকারী সদস্যের বদলে আটজন বে-সরকারী ও তিনজন সরকারী সদস্য হ'ল। নয়া ভাগ্যবানরা হচ্ছেন স্যার হোমি মোদি (সরবরাহ), স্যার আকবর হায়দরী (প্রচার), ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও (অসামরিক দেশরক্ষা), স্যার ফিরোজ খাঁ নুন (শ্রম), শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে (সমুদ্রপারের ভারতীয়), স্যার সুলতান আহমদ (আইন) ও শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি)। দেশরক্ষা পরিষদে প্রায় ৩০ জন সদস্য হবে; তার মধ্যে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে; এ'দের মধ্যে আছেন—ডাঃ আম্বেদকর, স্যার মহম্মদ সাদুল্লা, মিঃ ফজলুল হক, স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ, রাও বাহাদুর এম সি রাজা, খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স, শ্রীযমুনাদাস মেহতা।

কংগ্রেস, লীগ ও মহাসভা

এই হ'ল পর্বতের মুষিক প্রসব। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সংগে মিটমাট না ক'রেই এই নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গান্ধীজী স্পষ্ট বলেছেন যে, বড়লাটের এই ঘোষণায় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কোনো তারতম্য ঘটল না, কারণ কংগ্রেসের কোনো দাবী ওতে পূরণ হয় নি। কিন্তু ক্ষেপে গেছেন মিঃ জিন্না; কারণ কংগ্রেসের কাউকে বড়লাট তাঁর শাসন বা দেশরক্ষা পরিষদে টানতে পারেন নি, অথচ মুসলিম লীগের কয়েকজন মাতব্বরকে ভিড়িয়ে নিয়েছেন। তিনি পরোক্ষে বড়লাটকে এবং প্রত্যক্ষভাবে ফজলুল হক, সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ প্রভৃতিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের শাসানি দিয়েছেন। মিঃ সাভারকর বলেছেন, বড়লাট ঠিক পথই নিয়েছেন; কারণ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে তিনি 'অযথা' গুরুত্ব দেন নি। তবে শ্রীসাভারকর ভারতের জাতীয় দাবী সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টকে অবহিত হ'তে বলেছেন।

সোভিয়েট দিবস

গত ২১শে জুলাই বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নানা জায়গায় 'সোভিয়েট দিবস' প্রতিপালিত হয়েছে। কলকাতায় টাউন হলে এক বৃহৎ সভা হয়। সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ভারতীয় জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটা সোভিয়েট-সুহৃদ প্রতিষ্ঠান গঠনেরও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী অতুল গুপ্ত, ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ বাঙলার বিশিষ্ট মনীষীরা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেছেন। তাঁরা এই বিবৃতিতে বিস্তারিতভাবে সোভিয়েটের মানব কল্যাণকর বহুমুখী কাজের ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ব সাফল্যের উল্লেখ করেছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী সমিতিও দিল্লী অধিবেশনে এক প্রস্তাবে সোভিয়েট জনগণের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন।

২২-৭-৪১ —ওয়াকিবহাল

রঙমহলে 'রক্তের ডাক'

গত ১৯শে জুলাই, শনিবার রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত 'রক্তের ডাক' নাটকখানি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। তরুণ নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য এই নূতন নাটকটি রচনা করিয়াছেন। নাট্যকার হিসাবে তরুণ মহলে বিধায়কবাবুর নাম এবং যশ দুই-ই আছে। আমরা বিধায়কবাবুর একাধিক নাটক অভিনীত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে কখনও সংস্কৃতিলব্ধ বলিষ্ঠ চিন্তাধারা অথবা মহত্তর জীবনের কোন আদর্শ ও সত্যোপলব্ধির পরিচয় পাই নাই। তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি, জীবনের ঘটনাস্রোত, সংলাপ ও মনস্তত্ত্বে কখনও সূক্ষ্ম শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই, সুস্থ আবহাওয়ারও নহে।

শিক্ষাদীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ও সুরুচির অভাবে অধিকাংশ নাটকই নাট্যকারের মনোবিকারেরই পরিচয় দিয়াছে। সেই এক-ঘেয়ে প্রেম, নারীজাতির ব্যর্থ জীবনের প্রতি বিজাতীয় অশ্রদ্ধা, দুর্বল ও ক্লীব পুরুষের কুৎসিত প্রণয় নাট্যকারের চিন্তাধারা ও কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; সংগতিহীন ঘটনাস্রোতে যৌন আবেদন ইতস্ততঃভাবে উঁকি ঝুঁকি দিয়া এবং লেখকের দুর্বলতাকে বার বার দর্শক সমক্ষে প্রকাশ করিয়া মনকে ক্লিষ্ট করিয়া তোলে। বাঙলা দেশ অদ্ভুত। এ দেশের দর্শকগণ সাহিত্য চায় না, আর্ট চায় না, উচ্চস্তরের কাহিনীও মঞ্চে চায় না। তাই, কালরাত্রি, 'পি ডব্লিউ ডি', 'রক্তের ডাক' প্রভৃতির মত নাটক বাঙলা দেশে চলে। হয়ত এমন একদিন আসিবে, যখন দর্শক সাধারণ রসজ্ঞ হইবে, চিন্তাশীল হইবে এবং তখন এই সকল নিম্ন শ্রেণীর cheap stunt-এর নাটক ছুঁড়িয়া ফেলিতে একটুও দ্বিধাবোধ করিবে না এবং অতীতের রুচিজ্ঞানহীনতা অরসিকতা ও শিক্ষাদীক্ষার দৈন্যতার জন্য লজ্জিত হইবে। হয়ত যেন নারীজাতি গড্ডলিকাসম থিয়েটার সিনেমায় যে কোন বই দেখিবার জন্য ভিড় করিবে না এবং রসোত্তীর্ণ, সাহিত্য পর্যায়-ভুক্ত নাটক এবং সুঅভিনয়ের দাবী করিবে। নারীজাতিকে বিদ্রূপ করিয়া এবং আকার-ইঙ্গিতে গণিকা বলিয়া যাহারা বাহবা নেয়, তাহাদের ক্ষমা করিবে না।

এবার 'রক্তের ডাক' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। পল্লী-গ্রামের গৃহস্থ বাড়ি। আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় তাহারা যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর। নায়িকার শাশুড়ীর চোখের দৃষ্টিতে কাক পুড়িয়া যায় এবং ছাই হইয়া আকাশে ওড়ে, বাড়ির ত্রিসীমানায় পড়ে না, কারণ শাশুড়ী ভীষণ সতী। এ কাহিনী পুত্র এবং কন্যা বিশ্বাস করে। কন্যা জননীকে প্রণাম করিলে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, কারণ 'কত বড় সতীর সতী কন্যা'। কাজেই নাটকের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ। তার পর নায়ক শুভেশ ব্রিচেস পরিয়া শিকার করিতে আসিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা তাহাকে সাহেব না ভাবিয়া পারেই না। শুভেশ নায়িকা বুলুর বাল্য প্রণয়ী। পুকুরঘাটে দেখা (অন্তরালে)। পরিণামে শাশুড়ী, স্বামী ও ননদ কর্তৃক প্রহার ও গালিবর্ষণ। এইখানেই নাটকের আরম্ভ। ইহার পরই নায়িকার পুকুরঘাটে গমন আত্মহত্যার সংকল্পে। শুভেশ ঘাটে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, নায়িকাকে ধরিয়া ফেলিয়া একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিল, ফলে নায়িকা নবজীবন লাভ করিল; নাম হইল তার শতাব্দী। নায়ক আড়াই ইঞ্চি ঘাড় কাৎ করিয়া একটা হাত লৌহদণ্ডের মত সোজা করিয়া ধরিল এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে নায়িকার হস্তধারণ, তারপর ধীরে ধীরে elopement (পলায়ন) —একেবারে কলিকাতায় নাচের আসরে। যাত্রার পূর্বে অবশ্য নায়ক তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়া গেল। পরবর্তী দৃশ্য মিসেস মজুমদারের বাড়ি। মিসেস মজুমদার একটি গান গাহিলে পর নাচের মহলা আরম্ভ হইল। নাটক অভিনয়ের মহলা চলিতেছে, অথচ নাচগুলি নাকি চলচ্চিত্রের। হইবে হয়ত, কারণ স্বল্প খরচের সুবুদ্ধির আমরা প্রশংসা করি। অদ্ভুত নাচগুলি নাটক ও সিনেমার উভয়েরই। অভিনয় মঞ্চের এবং সিনেমা উভয়ের কিনা জানি না, তবে নায়িকা নায়কের ব্যভিচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিরাপদ স্থান সিনেমায় যোগদান করিল। বাল্য প্রণয়ী, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যাহাকে নির্ভর করিয়া নায়িকা কুলত্যাগ করিয়া আধুনিক সমাজের টারগেট হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে পরমুখে সন্দেহজনক কথা শুনিয়াই নায়িকার পলায়ন হাস্যকর হইলেও মঞ্চ-মনস্তত্ত্বে নিখুঁত। মিসেস মজুমদারের বাড়িতে কুমারী নমিতার সহিত শুভেশের প্রথম পরিচয়। মিসেস মজুমদারের সহিত চোখ টিপিয়া অনুমতি গ্রহণ ও ধন্যবাদ প্রদান, তারপরই শুভেশের গাড়িতে নমিতা। ফলে কয়েক মাস পরে নমিতা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া শুভেশকে কুলমান রক্ষার জন্য পত্র দিল। মিসেস মজুমদার টাকা পান কি না, তাহা অবশ্য প্রকাশ করা হয় নাই। অথচ শুভেশ তাহারই বাড়িতে ও অভিভাবকত্বে তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু শতাব্দীকে রাখিয়াছে।

যে শুভেশের বুলুকে (শতাব্দী) পাওয়ার পর চরিত্রের সংযম হইল না এবং ভদ্র মেয়েদের টাকার জোরে আনিয়া অঙ্ক-শায়িনী করিতেছিল, তাহার জীবনে হঠাৎ নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা আরম্ভ হইল বুলুর পলায়নে। মনস্তত্ত্বের এলোপাথারি গতির প্রশংসা করিতে হয় বটে। অবশ্য তাহাতে বুলুর সহিত শুভেশের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয় নাই। কয়েক মাস পর হইতেই পুনরায় সুরু হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে শুভেশের ব্যভিচারে মন্দা না পড়িয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ইহার পর হইতে climax-এর সৃষ্টি। কুমারী-জননী নমিতা জাত রক্ষার জন্য আসিল শুভেশের নিকট। শুভেশ টাকা দিতে রাজি হইল, কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না। Stunt চাই, তাই শুভেশ জল খাইতে চাহিয়া প্রস্থান করিল। নমিতা জলের গ্লাসে বিষ মিশাইয়া দিল এবং বুলু উপর হইতে তাহা দেখিল। তারপর নমিতা থর থর কম্পমান অবস্থায় মধুর বচন বলিতে বলিতে শুভেশকে জল খাওয়াইতে চাহিল এবং বুলু ছুটিয়া আসিয়া জলের গ্লাস উপুড় করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ পড়িয়া গেল। দর্শকগণ বলিবেন, আমরা এ পর্যন্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট নই, নরহত্যা, রিভলবার, আত্মহত্যা চাই এবং বিশেষ করিয়া একটি পাগল চাই; কারণ গোটা দুই-তিন মৃত্যু ও পাগল না থাকিলে বিধায়ক-বাবুর নাটক হইল কি! সবই আছে এবং তাহা শেষ দৃশ্যে। একেবারে মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শেষ দৃশ্যে শুভেশ উন্মাদ। কখনও আয়নার দিকে চাহিয়া প্রলাপ বকিতেছে, কখনও দর্শকদের করতালি লাভের জন্য নমিতার ভয়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। টেবিলের পাশে পড়িয়া রহিয়াছে গোটা পঞ্চাশেক মদের বোতল, একেবারে খালি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সম্ভব শুভেশের লিভারটা পরীক্ষা

করিয়া দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইবেন। একে একে সকলের আগমন ও প্রস্থান। শুভেশ নমিতার ভয়ে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে কি না, তাই দরজাগুলি খোলাই রহিয়াছে, কারণ সকলকেই ত' আনিতে হইবে।

এদিকে নায়িকার বাড়িতে আসিয়াছে তাহার শাশুড়ী, স্বামী ও ননদ। কি তাদের মরণকান্না ও দরদ। ধন্য মনস্তত্ত্ব। নায়িকা কিন্তু পলাইয়া গেল। নায়কের ঘরে গেল বিদায় লইতে। করুণ মর্মন্তুদ সংলাপ। নায়কের প্রেমনিবেদন ব্যর্থ হইল, কারণ তাহাদের বংশধরদের সমাজে স্থান হবে না। তবে নায়িকা আশ্বাস দিল, পরজন্মে নাকি তাহাদের মিলন হইবে। খানিক কান্না ও খানিক pose, তাহার পর নায়িকা বলিল, তুমি বলেছিলে, সকল মেয়েকে তুমি অঙ্কশায়িনী করেছ, এ পর্যন্ত একটি মেয়ে তোমায় বাধা দেয় নি। (সংলাপটি সম্ভবত নাটকে আরও রিয়ালিষ্টিক ছিল) আমি সেজন্য ধরা দেব না (অর্থাৎ তুমি ও-কথা না বলিলে বুলুর কোন আপত্তি থাকিত না)। বুলু অবশ্য একথা বলিল যে, শুভেশকে তাহার বিশ্বাস নাই, দুইদিন পরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য নারীতে আসক্ত হইবে। একেই বলে মনস্তত্ত্ব ও অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি। বুলুর প্রস্থান ও নমিতার প্রবেশ। নমিতা শুভেশকে মারিতে গিয়া নিজেই শুভেশের হাতে প্রাণ হারাইল এবং শুভেশ রিভলবারের গুলীতে প্রাণ ত্যাগ করিল। চরিত্রগুলি কোন্ দেশের এবং কি হইলে এমন চরিত্র ও ঘটনাবলীর আবিষ্কার হয় জানি না। তবে বাঙলা দেশে এ কাহিনী চলে, তার প্রমাণ রঙমহল। শুভেশ এক স্থানে বলিয়াছে যে, মানুষই তাহাকে নারী উপঢৌকন দিয়া সংসার চালায়, কাজেই তাহার কোন দোষ নাই। কথাটা আংশিক সত্য, কিন্তু বাঙলা দেশের মেয়েদের টাকা হইলে পাওয়া যায় এবং শুভেশ কখনও কোন ভদ্র নারীর নিকট হইতে বাধা পায় নাই— এই মন্তব্যের আমরা প্রতিবাদ করি। অনেকে হয়ত বলিবেন, শুভেশের কথার কোন মূল্য নাই। কিন্তু শুভেশ কে এবং চরিত্র কি? সে নাটকটির নায়ক, সে শুধু বেফাঁস কথা বলে নাই, চরিত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে। রমার চরিত্রে নূতনত্ব রহিয়াছে। কারণ সে বিবাহিত হইয়া কুমারী সাজিয়া থাকে এবং শুভেশকে সঙ্গসুখ দিয়া অর্থ গ্রহণ করে। অবশ্য সে নাকি ভদ্র ও সতী। অবনীর চরিত্রটি বুঝিলাম না। সে শুভেশের হিতের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অথচ নাট্যকার তাহাকে villain করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাটকে বহু চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু নায়ক ও নায়িকা ব্যতীত কেহই কোন সুযোগ পায় নাই। প্রধান চরিত্রগুলি শিথিল এবং কাহিনীর দুর্বলতা ও অসঙ্গতির পরিচায়ক।

নাট্যকারের ভাষা ভাল, টেকনিক সুষ্ঠু। অভিনয়ের দিক হইতে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয় নিখুঁত হইয়াছে। সরযুর অভিনয় উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। পুতুল, পদ্মাবতী, আশুবাবু, নীতীশবাবু, শান্তিবাবু প্রভৃতির অভিনয় ভালই হইয়াছে। রেণুকার জড়তা কাটে নাই। অবনীর চরিত্রটি সংশোধন করিলে হয়ত জহর গাঙ্গুলীর অভিনয়ের উৎকর্ষতা হইতে পারে। দুর্গাদাসের হাসি ও Stunt পূর্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দুর্গাবাবুর মত শক্তিশালী নটের নিকট আরও উচ্চ স্তরের নট-কুশলতা আমরা আশা করি। নাটক পরিচালনা ভাল। সংগীত পরিচালনা নিম্নস্তরের। নৃত্য পরিচালনা নিকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক। দৃশ্যপট জমকালো ও প্রশংসনীয়।

খেলা-ধূলা

(৫৫৬ পৃষ্ঠার পর)

আহিরকে বাদ দেওয়া হইল কেন ইহারও কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই তরুণ খেলোয়াড়টিকে এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ গোলদাতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অথচ ইহার দলে স্থান হইল না। নির্বাচনমণ্ডলী বাঙলার সম্মানের কথা ভুলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণা। নিম্নে সন্তরণের বিভিন্ন বিভাগে যাহাদের নির্বাচিত করা হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলঃ—শচীন নাগ (হাটখোলা), দিলীপ মিত্র (ন্যাশানাল)।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলঃ—শচীন নাগ (হাটখোলা), মদন সিং (খিদিরপুর)।

১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলঃ—মদন সিং (খিদিরপুর), মণীন্দ্র চ্যাটার্জি (ভবানীপুর)।

১০০ মিটরা পিঠ সাঁতারঃ—রাজারাম সাহু (খিদিরপুর), প্রতীপ মিত্র (ন্যাশানাল)।

২০০ মিটার পিঠ সাঁতারঃ—রাজারাম সাহু (খিদিরপুর), মদন সিং (খিদিরপুর)।

১০০ মিটার বুক সাঁতারঃ—প্রফুল্ল মল্লিক (বৌবাজার), হরিহর ব্যানার্জি (বৌবাজার)।

২০০ মিটার বুক সাঁতারঃ—প্রফুল্ল মল্লিক (বৌবাজার), হরিহর ব্যানার্জি (বৌবাজার)।

৩০০ মিটার মেডলী রিলেঃ—রাজারাম সাহু (খিদিরপুর) প্রফুল্ল মল্লিক (বৌবাজার), শচীন নাগ (হাটখোলা)।

অতিরিক্তঃ—হরিহর ব্যানার্জি (বৌবাজার), মদন সিং (খিদিরপুর)।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেঃ—শচীন নাগ (হাটখোলা), রাজারাম সাহু (খিদিরপুর), মানু চ্যাটার্জি (তালতলা), দিলীপ মিত্র (ন্যাশনাল)।

অতিরিক্তঃ—শচীন মুখার্জি (খিদিরপুর), বি সাধুখ (খিদিরপুর)।

ডাইভিংঃ—আশু দত্ত (বৌবাজার), গোপীনাথ [illegible] (ন্যাশনাল)।

ওয়াটার পোলোঃ—শিশির সাহা (বৌবাজার), বীরেন বসা[illegible] (ন্যাশনাল), গণেশ দাস (কলেজ স্কোয়ার), শ্যামু চ্যাটা[illegible] (তালতলা), কে কেশরবাণী (খিদিরপুর), যামিনী দাস (হা[illegible] খোলা), শচীন নাগ (হাটখোলা), এস ক্ষেত্রী (সেণ্ট্রাল সুইমি[illegible]) অজয় চ্যাটার্জি (ন্যাশনাল), প্রফুল্ল মল্লিক (বৌবাজার)।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলঃ—সুখলতা প[illegible] (বৌবাজার), রমা পাল (বৌবাজার)।

সমর বার্ত্তা

১৬ই জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—পসকোভ, ভিটেভস্ক ও নোভোগ্রাড অঞ্চলে প্রবল লড়াই চলে। পসকোভ অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যেরা একটি জার্মান মোটরাইজড ও মেকানাইজড সৈন্যদলকে ধ্বংস করে বলিয়া দাবী করে। রুমানিয়ার তৈলখনির উপর সোভিয়েট বিমানবহর বোমা বর্ষণ করে। ভিটেভস্ক রণাঙ্গনে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয়।

জাপ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন।

১৭ই জুলাই—

• রুশ-জার্মান যুদ্ধ—বার্লিনের সংবাদে বলা হয় যে, জার্মানরা স্মোলেনস্ক, তালিন ও নভগোরোড দখল করিয়াছে। জার্মানরা এই দাবীও করে যে, স্মোলেনস্ক রণাঙ্গনে বন্দীদের মধ্যে একটি সোভিয়েট ডিভিসনের সেনাপতিমণ্ডলীর চীফ সহ বহু সৈন্য বন্দী হইয়াছে। জার্মান হাইকম্যাণ্ডের ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের শেষ রিজার্ভ বাহিনীকে এই যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছেন। এই সংগ্রামে ৯০ লক্ষ লোক লিপ্ত হইয়াছে।

১৮ই জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, লেনিনগ্রাড, স্মোলেনস্ক, কিয়েভ এবং বেসারেবিয়া—এই চারিটি প্রধান রণাঙ্গনে জার্মানরা অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সর্বত্রই তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে প্রতিপক্ষের আরও আটটি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

জাপানের নব-গঠিত মন্ত্রিসভায় প্রিন্স কনোয় প্রধানমন্ত্রী ও বিচার বিভাগের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আর এডমিরাল তোয়েদা পররাষ্ট্রসচিব এবং জেনারেল তোজো সমরসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রসচিব মঃ মাৎসুওকাকে নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নাই।

একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, জাপ সৈন্যগণ মঙ্গোলিয়ার নিকট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য আমদানী করিতেছে।

আনকারার খবরে প্রকাশ, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইতালীয়রা তুরস্কের দক্ষিণ, ঈজিয়ান উপকূলের কয়েক মাইল দূরবর্তী সামোস দ্বীপে (গ্রীক) প্রায় ১০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করিয়াছে। এক্সিসের এই কার্য এবং সেই সঙ্গে বুলগেরিয়ার সামরিক তৎপরতা হইতে এই আভাষই পাওয়া যায় যে, রুশিয়ার পর তুরস্কই এক্সিসের লক্ষ্য হইবে।

১৯শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—জার্মান সরকারী নিউজ এজেন্সীর এক ইস্তাহারে কিয়েভের ১৩০ মাইল পশ্চিম দিকবর্ত্তী নোভোগ্রাদ-ভলিনস্ক দখলের দাবী করা হয়। একটি জার্মান ইস্তাহারে বলা হয় যে, জার্মান ও রুমানিয়ান বাহিনী বেসারেবিয়ার কয়েক স্থানে নীষ্টার এলাকা ভেদ করে। ল্যাডোগা হ্রদের উত্তর তীরে ফিনিশবাহিনী প্রতিপক্ষের প্রবল প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

মস্কো বেতারে প্রকাশ, হের হিটলার মৃগীরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

জুরিখের সংবাদে প্রকাশ, জার্মানীকে খুসী করার জন্য ভিসি মন্ত্রিসভার সর্বশেষ যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে পিয়ারিপুসে' স্বরাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

২০শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—আজ মস্কো হইতে প্রকাশিত এক সোভিয়েট ইস্তাহারে উল্লিখিত হয় যে, পলোটস্ক, স্মোলেনস্ক এবং নভোগ্রাদ-ভলিনস্কের দিকে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। অন্য রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নাই।

বার্লিনের খবরে প্রকাশ, এক জার্মান ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জার্মান ও রুমানিয়ানবাহিনী বেসারেবিয়া হইতে আরও অগ্রসর হইতেছে। প্রতিপক্ষের বাধাদানের শক্তি চূর্ণ করিয়া নীষ্টার নদীর পূর্ব তীরে উহারা প্রতিপক্ষের সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। উক্ত ইস্তাহারে উল্লিখিত হয় যে, স্মোলেনস্ক অঞ্চলে যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে। ফিনিশ রণাঙ্গনেও তাহারা আরও জয়লাভ করিয়াছে। ইতালীয়ান সরকারী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হয় যে, নীষ্টার নদীর পূর্ব তীরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে এবং জার্মান ও রুমানিয়ান বাহিনী ষ্ট্যালিন লাইন অতিক্রম করিয়াছে।

২১শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, সোভিয়েট গরিলা সৈন্যেরা জার্মান বাহিনীর পশ্চাৎভাগে সফলভাবে লড়াই চালাইতেছে এবং শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি করিতেছে।

লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, রাশিয়ার অভিযানে সাহায্যের জন্য হের হিটলার ইতালী ও রুমানিয়ার নিকট আরও সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, জেনারেল আণ্টনেস্কু হের হিটলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন।

মস্কোর বেতারে বলা হয় যে, সম্প্রতি ইতালীয় সৈন্যদের পরিদর্শনকালে সিনর মুসোলিনীর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়।

২২শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—মস্কো বেতারে বলা হয় যে, গতকল্য রাত্রে সোভিয়েট রাজধানীর উপর প্রথম বিমান আক্রমণ হয়। সমস্ত রাত্রিব্যাপী এই বিমান আক্রমণ হয়। শহরের কয়েকটি স্থানে আগুন লাগে। কয়েকজন লোক হতাহত হয়। জার্মান হাই-কম্যাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, জার্মান বাহিনী তাহাদের মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের সাহায্যে সোভিয়েট প্রতিরোধ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রচণ্ড ও দুঃসাহসিক পাল্টা আক্রমণ সত্ত্বেও বর্তমানে সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ অসম্ভব হইয়াছে। আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের মস্কোর সংবাদদাতা দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্মোলেনস্ক এখনও সোভিয়েটের দখলেই আছে। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, নাৎসীরা যে কিয়েভ দখল করিয়াছে, সেরূপ ধারণা করার কোনও কারণ নাই। মস্কো বেতারে বলা হয় যে, ২০শে ও ২১শে জুলাই জার্মানরা লেনিনগ্রাডে বিমানহানা দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জাপানের নূতন পররাষ্ট্র সচিব এডমিরাল তোয়েদা ঘোষণা করেন যে, মিঃ মাৎসুওকার অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি ও তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য হইবে না। প্রকাশ, জাপানে যুদ্ধার্থে সেনাদলকে ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে।

মার্কিন সাংবাদিক মিঃ স্যামুয়েল গ্রাফটোন "নিউইয়র্ক পোষ্ট" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৬ই জুলাই।—

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এম এল এ ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর অদ্য আলিপুরের সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি লাভ করিবেন কথা ছিল; কিন্তু জানা গিয়াছে যে, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জেলের ভিতরই ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে তাঁহাকে আটক রাখার এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারিগণের খদ্দরের পোষাকের টেণ্ডার দেওয়ার বিষয় লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় কয়েকজন সদস্যের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডা হয়। শেষ অবধি ডেপুটি মেয়র মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী কর্তৃক পদত্যাগ পত্র দাখিলের দ্বারা এই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৭ই জুলাই।—

বিহার প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী ১৮ মাস কাল কারাদণ্ড ভোগের পর হাজারীবাগ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব কমিশনের প্রধান প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিবার জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ সি ডব্লিউ গার্নারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮ই জুলাই।—

বোম্বাইয়ে অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে ৫০ জনের জীবনান্ত ঘটিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশক্রমে পাঞ্জাবের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ৩৫০ জন সত্যাগ্রহী ২০শে জুলাই হইতে ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে সত্যাগ্রহ করিবেন।

১৯শে জুলাই।—

শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জি এম এল এ'র উপর ভারতরক্ষা বিধানে এক আদেশ জারী করিয়া তাঁহাকে এক বৎসরকাল কলিকাতা বা শহরতলীর জনসভায় বক্তৃতা বা সভাসমিতিতে যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ সভাপতি ডাঃ চারুচন্দ্র ব্যানার্জির উপরও অনুরূপ আদেশ জারী করা হইয়াছে।

বরিশালের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভোলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মামলার ২০ জন আসামীর প্রতি এক মাস হইতে এক বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

২০শে জুলাই।—

দিল্লীতে সর্দার শার্দুল সিং কবিশেরের সভানেতৃত্বে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম দিনের অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার, জেনারেল সেক্রেটারী লালা শঙ্করলাল, ডাঃ পট্টবর্ধন, মিঃ ভি ভি সুবেদার, পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অখিল বঙ্গ কায়স্থ মহা সম্মেলনের অধিবেশন বিপুল উৎসাহের মধ্যে পাইকপাড়া রাজবাটীতে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়।

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পক্ষে এজেণ্ট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

২১শে জুলাই।—

ভারত গভর্নমেণ্টের এক ইস্তাহারে বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের এবং ৩০ জন সদস্য লইয়া জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে নিম্নলিখিত পাঁচজন নূতন সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছেঃ—(১) সরবরাহ সচিব—স্যার এইচ পি মোদী, (২) প্রচার সচিব—স্যার আকবর হায়দরী, (৩) বেসামরিক দেশরক্ষাসচিব—মিঃ রাঘবেন্দ্র রাও, (৪) শ্রমসচিব—স্যার ফিরোজ খাঁ নুন, (৫) বিদেশ প্রবাসী ভারতীয় বিভাগ—মিঃ এম এস আণে। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ এবং স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী নূতন পদ গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের স্থলে স্যার সুলতান আমেদ আইন সচিব এবং মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি সংক্রান্ত বিভাগের সদস্য হইবেন। জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদে বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রিগণকে লওয়া হইয়াছে।

গত ১৩ই এপ্রিল বিডন স্কোয়ারে এক জনসভায় বক্তৃতা করা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এম এল একে অভিযুক্ত করা হয়। কলিকাতার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদারের প্রতি ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে আদালতের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকিবার এবং ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথা ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি বলবৎ হইবে এবং পাঁচ বৎসর যাবৎ উহা কার্যকরী থাকিবে। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, আইনানুগভাবে পাশপোর্ট না লইয়া কোন ভারতীয় ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ২১শে জুলাই হইতে সাধারণ শ্রমিকদের ব্রহ্মে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।

২২শে জুলাই—

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ব্যাখ্যাত অহিংসার আদর্শ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী প্রস্তাব গ্রহণের পর গতকল্য দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী সমিতির দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা সম্পর্কিত ব্যাখ্যার তীব্র নিন্দা করিয়া এবং দেশের সর্বত্র জাতীয় দেশরক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে যেভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে, কার্যকরী সমিতি তাহাতে গভীর অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। একটি প্রস্তাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পরিবর্তে গণ-আন্দোলনে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে। অপর একটি প্রস্তাবে ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী সমিতি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সোভিয়েট জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে "আনন্দবাজার পত্রিকার" বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করা হইয়াছে, অদ্য ঐ মামলার শুনানী উঠিলে মামুলী ধরণের কয়েকটি সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার ও মুদ্রাকর এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে চার্জ গঠন করা হয়।

বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণ ও জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠন সম্পর্কিত ঘোষণা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, এই ঘোষণায় কংগ্রেসের অবলম্বিত মনোভাব পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটে নাই এবং ইহাতে কংগ্রেসের দাবীও পূরণ হয় নাই।

কমন্স সভায় ভারতসচিব মিঃ আমেরি 'ভারত ও যুদ্ধ' সম্পর্কে একখানি 'হোয়াইট পেপার' পেশ করিতে গিয়া ঘোষণা করেন যে, ভারতের সমর প্রচেষ্টা বর্ধিত ও সুবিন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, অতঃপর কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে অধিকসংখ্যক ভারত-বাসীকে নিযুক্ত করা হইবে এবং ভারতীয় সদস্যদিগকে অধিক-সংখ্যক দপ্তরের ভার দেওয়া হইবে। হোয়াইট পেপারে যে সকল পরিবর্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ক্রমোন্নতি সাধনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

বিচিত্র বার্তা

পল্লীগ্রামে বর্ষা নেমেছে। সেই ঘন ঘোর বরিষণের পরিবেশের মধ্যে ডুব দিতে বেশ একটা আমেজ লাগে। দূরের লম্বা লম্বা তালগাছের সারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বর্ষার জল মাথায় পেতে নিচ্ছে, গাংশালিকের দল জলে ভিজে জলার পাড়ে পাড়ে ফড়িংয়ের পিছনে পিছনে ত্রস্ত গতিতে উড়ে চলেছে। শুকনো গাছের ডালে হরেক জাতির পাখীরা আরামে বসে গেছে বর্ষার জলে শরীর ভিজিয়ে নিতে। ওদের মত জলে ভিজতে নেমেছে উলঙ্গ চাষাদের ছোট ছেলে মেয়েরাও। কেবল খড়ো চালের জল বাঁচিয়ে দাড়িয়াল ছাগলের সারি চোখ বুজে জাবর কাটছে, জলে ভিজতে ওরা নারাজ, জোলো হাওয়াতে এরই মধ্যে সারা দেহ জুড়ে ওদের কাঁপুনি লেগে গেছে। সারা মাঠের উপর আলো ঝল্‌সিয়ে তালগাছের মাথার উপর দিয়ে বাজ পড়ল। তালিমারা ছাতায় আর মাথা বাঁচান গেল না। ছাতার মাথার উপর আকাশ দেখা গেল। বাধ্য হয়েই আশ্রয়ের আশায় গাছের তলায় দাঁড়ালাম। শুধু আমি একা নই, ইতিপূর্বে বহু অতিথি গাছের তলায় আস্তানা নিয়েছে। মুষলধারে বারিপাত হচ্ছে, গাছের গা বেয়ে ঘন পাতার আচ্ছাদন ভেদ করে। নিরাপদ স্থানগুলি ইতিপূর্বেই অনেকে অধিকার ক'রেছে। আমার ডানদিকের নিরাপদ বিস্তীর্ণ স্থানটি জুড়ে মাটির স্তূপ—লাল পিঁপড়ার সুরক্ষিত দুর্গ। লালফৌজ সতর্ক দৃষ্টিতে দুর্গ রক্ষা করছে। প্রহরীরা টহল দিচ্ছে দুর্গের চারিধার। আমার গতিবিধির উপর সন্দেহবশতঃই মাঝে মাঝে সামনের পা তুলে, মাথা কাত ক'রে আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানছে। মাঝে মাঝে ওদের কেউ না কেউ গর্তের মধ্যে ছুটে যাচ্ছে, বোধ হয় শত্রুপক্ষের গোপন সংবাদ পৌঁছে দিতে। শক্তিতে দুর্বল হলেও সংখ্যায় ওরা অসংখ্য, আক্রমণের আশঙ্কায় সর্বদাই প্রস্তুত ছিলাম। মাঝে মাঝে ওরা সমবেত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, একটা অদ্ভুত শব্দ যেন ওদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। বৃষ্টির অবিরাম বারিপাতের মধ্যেও সে শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। দূরের মেঘ চিরে আলোর লাল ফালি বের হয়ে এল, এদিকে আকাশের বুকে ধনুকের রেখা সাত রংয়ে রাঙিয়ে গাঢ় হয়ে উঠল। আমি অন্যমনা হয়ে সেই অবিরাম বারিপাতের দিকে চেয়েছিলুম। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে ব্যাণ্ড বাদ্যধ্বনি মুখর হয়ে উঠল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম পুকুরের পাড়ে পাড়ে

ডাকটিকিটে বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তি
উপরের—প্রথম সারি—ম্যাকডাওয়েল, এণ্ডার্সন, স্টুয়ার্ট (বাঁদিক থেকে ডানদিক)
২য় সারি—ম্যাক্সিম গোর্কি, রুবেন্‌স্‌, সাপেনহাওয়ার
৩য় সারি—উইলিয়ম পেন, গ্যালিলিও, স্টিভেনসন

সৈন্যদের ছাউনি পড়ে গেছে। সাদা, পাশুটে রংয়ের ছাউনি। কয়েক ঘণ্টা আগেকার জনবিরল স্থানগুলি কলরবে সরগরম হয়ে উঠেছে। প্যারাসুট সাহায্যে সৈন্য অবতরণের কথাই ভাবছিলুম। একদল নৌসৈন্য চোখের উপরই মাটির বুকের উপর মার্চ করে জল থেকে উঠে এল। সামনে সামনে এগিয়ে সবুজ ইউনিফর্ম গায়ে লম্বা সেনাপতি যেন একটা সরলরেখা চলেছে। শিবির থেকে বিউগিল বাজিয়ে সৈন্যদের অভিবাদন জানাল। বোধ হল এরাই যুদ্ধ প্রত্যাগত বিজয়ী সৈন্যদল। অন্ধকার হয়ে আসবে। এখুনি শিবিরে শিবিরে আলো জ্বলবে। বিজয়ের গর্বে ওরা আজ আনন্দে উল্লাসে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। কোষের মধ্যে থেকেও ক্লান্ত তরবারির জিহ্বা ওদের আনন্দে হিংস্র হয়ে উঠবে। লুণ্ঠিত ধনভাণ্ডারের উপর চোখ নিবদ্ধ রেখে সৈন্যরা মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে,

ওদের উপর একটা আসন্ন সংঘর্ষের ছায়া রেখা পাত করছে। সেই সঙ্গে মনে আসে অধিকৃত দেশের নাগরিকদের উপর বিজয়ী সৈন্যদের লুণ্ঠনজাত, তীক্ষ্ম সঙ্গিনবিদ্ধ নারীর মরণ চীৎকার ওদের উল্লাসের তোড়ে কোথায় ডুবে যাচ্ছে। রণভেরী বাজিয়ে 'মাটির' বুকের উপর ভারী বুটে মার্চ করে কত দেশ ঘুরে আজ ওরা ফিরেছে স্বদেশের শিবিরে। মদের উগ্রতায় রক্ত ঝাঁঝাল হয়ে উঠবে কিন্তু একটা আরামের নিশ্বাস ওদের সুঠাম মাংসল বুকের ছাতি বেয়ে নেমে আসবে। হাপরের সে অবিরাম শব্দ যেন থেমে আসছে। আর থেমে আসছে শ্রাবণ বর্ষার এই অবিরাম ক্রন্দন।

* * * * *

সেই নিস্তব্ধ সুযোগের মধ্যে এগিয়ে গেলাম শিবিরের দিকে। জলে ভেজা ভারি বুট লেফট রাইট করে চলেছে ঝিঁঝিঁর ঐক্যতানে পা ফেলে। শত্রুর আগমন সঙ্কেত পেয়ে সেনাবাহিনী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাবমেরিণের তল্লাসে। আমার বুটের ঘায়ে ঘায়ে মার খেয়ে তখন শতাধিক শিবির মাটিতে ধ্বসে পড়েছে।

আমার চিন্তাজালও শতধাছিন্ন। মাটিতে ঝুঁকে পড়ে দেখি ব্যাঙের ছাতা—সারি সারি বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে মাটির বুকে শিবিরের ছাউনি ফেলেছে। আর পলাতক সৈন্যরা আর কেউ নয় জোলো ব্যাঙ। জলের উপর ভেসে উঠে মহাউল্লাসে তারা গান আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ওদের ফুলো গলার ভিতর থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হয়ে জলার চতুর্দ্দিক তখন ঐক্যতানে মুখরিত ক'রে তুলছে।

* * * *

এগিয়ে চল জলার ধারে ধারে। ওদের ঘর-সংসার চোখে পড়বে। ছোট ছোট ফোকরের ভিতর জড়াজড়ি ক'রে চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছে নানা জাতির ব্যাঙ। স্থূলাকার শরীর নিয়ে থপ্ থপ্ ক'রে কেউ জলের মধ্যে আত্মগোপন করল, যারা শীর্ণকায় তারা চকিতের মধ্যে জলে লাফিয়ে পড়ে বিশ গজ দূরের জলে মাথা তুলে শিকারীকে ভেংচি কাটল। শিকারীর লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে জলের উপর ভেসে উঠল; তীরের ফলা ওদের দেহ স্পর্শ করতে পারেনি। কোপনী চড়িয়ে সাঁওতাল ছেলেরা সন্তর্পণে গর্তের মধ্যে বর্শার ফলা ঢুকিয়ে দিয়ে শিকারের সন্ধান নিয়ে ঘুরছে, এরই মধ্যে ঝোলা ভরিয়ে ফেলেছে। বহু শিকার ঘায়েলও হয়েছে।

সোনা ব্যাঙ—এক একটার ওজন আধসের। মসৃণ চামড়ার উপর গাঢ় সবুজ ডোরা কাটা, পেটের দিক হলদে, সর্ব্ব দেহ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভোজনের আনন্দে ব্যাঙের মতনই লাফাতে লাফাতে ওরা ছুটেছে গাঙের পাড়ে পাড়ে।

* * * *

জলের ঢল ঢুকে শুকনো ডোবাগুলো ভরিয়ে দিয়েছে। জোলো গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে জলের উপর। সেই সব ঝাঁঝির গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা ফিতা। কোপনী-পরা সাঁওতাল, বাউরী ছেলেরা জলে নেমে গলায় জড়াচ্ছে ফিতার বাণ্ডিল, ফিতা শেষ হতে চায় না, নাড়ির মত এগাছ ওগাছ জড়িয়ে আছে, শেষ হয়েছে বিশ গজ দূরের গাছের মাথায়। স্বচ্ছ মোটা, মালা—ভিতরটা ফাঁপা। ভিতরে গোল গোল অসংখ্য কাল দানা সুরক্ষিত। দানাগুলি একজাতীয় ব্যাঙের ডিম। সব জাতের ব্যাঙের ডিম কিন্তু এক নয়। আর একজাতীয় ব্যাঙ দেহের পিঠের উপর সুরক্ষিত স্থানে ডিম রেখে ঘরকন্না করে। আবার কোন জাতীয় ব্যাঙ পিছনের পায়ের উপর ডিম রাখে। পাইমা ব্যাঙ পিঠের চামড়ার গর্তে বাচ্চাদের লালনপালন করে। রাইনোডারমা ব্যাঙ বাক্‌তন্ত্রীর মধ্যে সন্তান পালন করে।

* * * *

ব্যাঙের জন্ম ইতিহাস বিচিত্র। ডিম, ব্যাঙাচি এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থা-এই তিন অবস্থার ভিতর দিয়েই ব্যাঙের জন্ম। ব্যাঙাচি অবস্থায় এদের শরীরের গঠন অদ্ভুত। সামনে দুটো পা, লম্বা শরীর, দেহের পিছনে লম্বা লেজ। তারপর অবস্থার পরিবর্তনে লেজ খসে পড়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়।

পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ। তার পুষ্ট দৈহিক গঠন। মানুষের জিহ্বাতেও লালসা এনে দেয়। শিকারীরা ঘুরে বেড়ায় ভোজ্য ব্যাঙের সন্ধানে। নামমাত্র পারিশ্রমিক পেয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয় মণ মণ ওজনের ব্যাঙ। তারপর সুদৃশ্য কৌটায় সুস্বাদু মশলার মধ্যে জারান থাকে। পরে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়। কাঁচের ডিসে এদের মাংস সযত্নে রাখা হয় ভোজনের টেবিলে। কোন কোন সভ্য দেশের মানুষ তারিয়ে তারিয়ে এদের উপাদেয় মাংস খায়।

* * * *

বৈদ্যুতিক আলোর এবং পাখার নীচে বসে ব্যাঙের এই ছিন্ন কাহিনী লিখছিলাম। আর ভাবছিলাম মানব কল্যাণে এই নিরীহ প্রাণীর কোন কিছু দান আছে কি না? মনে পড়ে গেল ইটালির শরীর-বিদ্যার অধ্যাপক গ্যালভানির কথা। তিনি একদিন পরীক্ষা করছিলেন নুনের জলে জারানো ব্যাঙের মরা দেহকে। পরীক্ষা চলছিল বাতাসের দোলনে মরা ব্যাঙ কার যাদু স্পর্শে এসে মাঝে মাঝে সংকুচিত হচ্ছে। এই তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েই গ্যালভানি লক্ষ্য করলেন লোহার বারান্ডার স্পর্শে এসে এমনিভাবে মরা ব্যাঙটি সংকুচিত হচ্ছে। গ্যালভানি প্রথম লক্ষ্য করলেন, কিন্তু সঠিক কারণ আবিষ্কার করলেন পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ভল্টা। ফলে তড়িত প্রবাহ আবিষ্কৃত হ'ল। যুগে যুগে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার মধ্যে দিয়ে সেই ক্ষুদ্র প্রাণ তড়িত প্রবাহ প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে আজ মহাশক্তি ধারণ করেছে। নগণ্য ব্যাঙের দেহ মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যে তড়িত প্রবাহ মানুষ সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিল তা প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়ে আজ মানুষের মহাকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। তার ধারাবাহিক ইতিহাস বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত ক'রে গ্যালভানি, ভল্টা, ডেভি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ অমর হয়ে রয়েছেন। কিন্তু যে হতভাগ্য ব্যাঙের জীবন শেষ ক'রে এই মহাশক্তির প্রথম পরিচয় মানুষ পেয়েছিল তার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা নেই।

৮ম বর্ষ] ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল Saturday, 2nd August, 1941. [৩৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ—

গত ৯ই শ্রাবণ, শুক্রবার রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতা আনয়ন করা হইয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বর্তমানে সন্তোষজনক বলিয়া চিকিৎসকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র দেশ এই সংবাদ পাইয়া আশ্বস্ত হইবে। কবি অচিরে সম্পূর্ণ নিরাময় লাভ করুন, আমরা ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

মডারেট বৈঠক—

অভাবের মধ্যে ভাব, উপেক্ষার মধ্যে কর্তৃপক্ষের অন্তরঙ্গতা অতি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করিবার একটা বিশেষ দৃষ্টি এদেশের মডারেটদের আছে। আমাদের তাহা নাই। সুতরাং পুনার মডারেট সম্মেলনের অগ্রণীগণ বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের মতের মিল হওয়া সম্ভব নহে। সম্মেলনের সভাপতি স্বরূপে স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রু তাঁহার অভিভাষণে বড়লাটের ঘোষণার তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার চেয়ে তীব্রতর ভাষা কোন জাতীয়তাবাদীও প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। অথচ আশ্চর্য বিষয় এই যে, যে ব্যবস্থা এমন আপত্তিকর, তাহার মধ্যেই তিনি আবার অপরিহার্য রকমে গ্রহণযোগ্য উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। স্যার তেজবাহাদুরের ন্যায় মডারেট ধুরন্ধরকেও একান্ত দুঃখের সহিত এই সত্যকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদের হাতে প্রকৃত অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা সমর বিভাগ এবং আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে বেশী অধিকার দিয়া এখনও বিশ্বাস পান না। অথচ ভারতবাসীদের প্রতি এমন যাঁহাদের অবিশ্বাস, তাঁহাদের দরবারেই মডারেটগণ আবার আরজি লইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাঁহারা সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদের পূর্ব দাবীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতের কোন মূল্য দেন নাই, তাঁহাদের কাছেই ইঁহারা পুনরায় আবেদন-নিবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। দীর্ঘ পরাধীনতার সকলের চেয়ে বড় গ্লানি হইল এই যে, ইহাতে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধিকে দুর্বল করিয়া ফেলে। যাঁহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁহারাও পরাধীনতার প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া পরানুগ্রহ-প্রত্যাশার পাকচক্র কাটাইয়া নিজেদের বিচার বুদ্ধিকে অনপেক্ষ আত্মমর্যাদার স্তরে তুলিতে পারেন না। পুনার উদারনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশনের প্রস্তাব হইতে আমাদের সুদীর্ঘ অতীতের এই অভিজ্ঞতাই দৃঢ়তর হইয়াছে। ভিক্ষার দ্বারা রাজনীতিক ক্ষেত্রে কোন অধিকার লাভ করা যায় না। আমরা জানি, ভারতও কোন দিন তাহা লাভ করিবে না। এই ভিক্ষা-বৃত্তিকেই যাঁহারা প্রকারান্তরে রাজনীতির ক্ষেত্রে সার নীতি বলিয়া বুঝিয়াছেন, জাগ্রত ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণের মিল কোন দিন হইতে পারে না।

অধিকারের মূল্য—

বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ করিয়া ভারত-বাসীদিগকে কর্তারা কি কি দেবদুর্লভ ধন অকাতরে দান করিয়াছেন, ভারতসচিবের মুখে আমরা তাহা শুনিয়াছি। হোয়াইট পেপারের মারফতে আমরা কৃষ্ণকায়ের দল সে করুণাপ্রাচুর্যের স্পর্শে পরম কৃতার্থ হইয়াছি। পুণার বৈঠকে শ্রীযুত এম আর জয়াকর কর্তাদের অবদানের গূঢ় তত্ত্ব কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"ডাক্তার রাঘবেন্দ্র রাওয়ের মত ব্যক্তিকে 'সিভিল ডিফেন্স' দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে। সিভিল ডিফেন্স কথাটির অর্থ অতি অস্পষ্ট। ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এ আর পি-র ভীরুতা-পূর্ণ চেহারা বিশিষ্ট লোকদের তত্ত্বাবধান করা। তিনজনের-স্থলে এখন শাসন পরিষদে ছয়জন ভারতীয় নিযুক্ত

হইয়াছেন। ইংরেজের হাত হইতে কোন নূতন দপ্তর ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হয় নাই। যে সকল বিভাগের কর্তৃত্বভার ভারতীয়দের উপরে ন্যাস্ত ছিল, সেই বিভাগে একজন ভারতীয়ের স্থলে তিনজন কাজ করিবেন।" শ্রীযুত জয়াকর দেখাইয়াছেন, এই ব্যবস্থার ফলে নূতন সদস্যদের বেতনের জন্য নূতন বাজেটে প্রায় দুই কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" আমরা দেখিতেছি, ভারতবাসীদের দিক হইতে ইহাই উল্লেখযোগ্য লাভ। কর বৃদ্ধির যত নূতন নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে, আমরা ততই ধাপে ধাপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইব। ভারতে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানী শাসনের ইহাই পরমতত্ত্ব। ব্রিটিশ উপদেষ্টাদের নিকট হইতে দেড়শত বৎসরের অধিককাল তালিম লইয়াও যদি আমরা এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারি, তবে আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দয়া নয় অধিকার—

স্যার গণেশ দত্ত সিং আগে বিহারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিক মতের সঙ্গে আমাদের মিল নাই। কিন্তু লোকটি ভাল। তিনি সম্প্রতি আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণ এবং জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠনের পরও যদি পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদিগকে গভর্নমেণ্ট ব্যাপকভাবে মুক্তি দান না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বড় ভুল করিবেন। স্যার গণেশ দত্ত সিং বড়লাটের ঘোষণাকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, আমরা তাহা দেখি নাই। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণের দিক হইতে এই ঘোষণায় কর্তাদের মতিগতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। ভারতের শাসন ব্যাপারে বৃটিশ কর্তৃত্বকে অটুট রাখিবার জিদ ধরিয়াই তাঁহারা চলিয়াছেন। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি, তাঁহারা তাঁহাদের এই জিদ বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে যেমন কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, সেই-রূপ, পরে আবার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই কিঞ্চিৎ করুণাকণা সিঞ্চন করিয়া তাঁহাদের মহিমায় আমাদের চিত্তকে দ্রব করিয়া থাকেন এবং এই পরোক্ষ উপায়ে নিজেদের জিদকেই কায়েম রাখেন। তাঁহাদের ধরা এবং ছাড়া, একই নীতিরই এপিঠ আর ওপিঠ। স্বাধীনতার অধিকারে জাগ্রত ভারত কর্তাদের এই দ্বন্দ্ব-নীতির মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছে। আজ আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি দিলেই ভারতের বর্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান হইবে না। সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কংগ্রেসের দাবীকে সর্বাগ্রে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ভারতবাসীরা আজ চায় কর্তাদের অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ, এই দুই অবস্থার দাসত্ব কাটাইয়া রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অব্যাহত অধিকার।

জিন্নার ফতোয়া—

মোসলেম লীগের সর্বময় প্রভু জিন্না সাহেব জিগীর ছাড়িয়াছেন। এবার তাঁহার জিগীর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয় হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধেও নয়, নেহাৎ নরম, নিতান্ত নিরীহ সপ্রু-সম্মেলনের নেতাদের বিরুদ্ধে। তিনি বলিয়াছেন, 'পাকিস্থানী উদ্যমকে পণ্ড করিবার জন্যই এই সব কারসাজি।' তিনি শুনাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্থান-প্রস্তাবানুযায়ী ভারতকে বিভক্ত করা ছাড়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় উপায় নাই। এই সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকেও তিনি কিঞ্চিৎ শাসাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মোসলেম ভারতের নিকট যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা যেন বিস্মৃত না হন। তাঁহারা যদি ঘুণাক্ষরে তাহার ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে মোসলেম ভারত তাঁহাদিগকে ছাড়িবে না, সমস্ত শক্তি লইয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবে। জিন্না সাহেবের এই জিগীর যে কত ফাঁকা, কর্তারা না বুঝিয়া লইয়াছেন এমন নয়। বড়লাটের এক চালেই বাঙলা, আসাম এবং পাঞ্জাব তিন প্রদেশের তিন প্রধান মন্ত্রী জিন্না সাহেবকে কুর্ণীশ না করিয়াই দেশরক্ষা পরিষদে যোগ দিয়াছেন। মিঃ জিন্না যে মোসলেম ভারতের দোহাই দিতেছেন, সেই মোসলেম ভারতের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সম্পর্ক কি ক্রমেই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এজলাসেই মিঃ জিন্নার এই আবদার। মিঃ জিন্নার দৌড় কতটা তাঁহারা এ ভাল করিয়াই জানেন। তবে যে মিঃ জিন্নার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠাকে প্রকারান্তরে তাঁহারা সমর্থন করিয়া থাকেন, সে কেবল তাঁহাদের নিজেদের প্রয়োজনে। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বৃটিশ রাজ-নীতিকরা যতদিন প্রয়োজন বোধ করিবেন, জিন্না সাহেবের মান বাড়াইবেন এবং যে মুহূর্তে অপ্রয়োজন বোধ করিবেন, তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের গর্বেই জিন্না সাহেবের গর্ব, তাঁহাদের জাঁকেই জিন্না সাহেবের যত জমক। পরনির্ভরতার এই দৈন্যময় জীবনের মর্যাদা কোথায়ও নাই। আঘাত এবং অবমাননা এমন জীবনে অনিবার্য। একদিকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে অবমাননা অপরদিকে নিজের দলের চাঁইদের নিকট হইতে অবমাননা, অপরদিকে নিজের দলের চাঁইদের নিকট জিন্না অন্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। দেশের সেবা এবং জনসাধারণের সেবার বৃহত্তর আদর্শের ভিত্তির উপর যাঁহার কর্মসাধনার প্রতিষ্ঠা নাই, পরিণামে তাঁহার এমন দুর্দশাই ঘটিয়া থাকে।

বাঙলার আত্মরক্ষা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের আলোচনা লইয়া আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা নাই, কারণ আমরা জানি, সে বাগাড়ম্বর বাষ্পাবস্থা কাটাইয়া বাস্তব কোন রূপ পাইবে না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিল—এই দুইটি বিলের

গুরুত্বই পরিষদের বর্তমান অধিবেশনের প্রতি বাঙলার সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। বাঙলার কি হিন্দু, কি মুসলমান কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রতিবাদ সকল সমাজ হইতেই হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিলও সমভাবে নিন্দিত হইয়াছে। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর ঘটে যদি কিছুমাত্র সুবুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে পূর্বেই তাঁহারা এই দুই উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর মতিগতি অন্য দিকে। সাম্প্রদায়িকতাই তাঁহাদের বর্তমানের বল এবং ভবিষ্যতের ভরসা। গত সোমবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আহূত মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদ সভার সভাপতি সৈয়দ হবিবর রহমান সাহেব বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির স্বরূপ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব বাঙালী মুসলমানকে ডুবাইয়া দিয়া অবাঙালী মুসলমানের নৌকায় পাল তুলিয়া ছুটিয়াছেন।' বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি হিন্দুর স্বার্থেরই যে শুধু ক্ষতি করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা নহে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থেরই প্রতিকূলে ঐ নীতি প্রযুক্ত হইতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইহার মধ্যেই বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অনিষ্টের সেই দিকটা স্পষ্টই হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিলের অন্তর্নিহিত নীতির অনিষ্টকারিতার দিকটা আরও বেশী সাঙ্ঘাতিক। বাঙালী জাতির শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বাঙলার কি হিন্দু, কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের সম্পদ স্বরূপ। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির এই ক্ষেত্র এতকাল পর্যন্ত সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত ছিল। জাতি সার্বভৌম উদার আদর্শের প্রেরণা এবং প্রাণরস লাভ করিত সেই ক্ষেত্র হইতে। বহু বিপদের ভিতর এবং বাহির হইতে আগত প্রতিকূল প্ররোচনার মধ্যে বাঙালী জাতি সেই রস পাইয়া বাঁচিয়া ছিল। আজ বাঙালী জাতির সংস্কৃতির সেই ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফল সকল দিক হইতে সর্বনাশকর হইবে। সস্তা সাম্প্রদায়িকতার মোহে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক দল এই উদ্যমের অনিষ্টকারিতা আপাতত হয়ত ধরিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পরে তাঁহারা দেখিবেন যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষজ্বালাবাহী এই বিল হিন্দুর চেয়ে বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশী অনিষ্ট করিবে; কারণ বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই এখনও নিরক্ষরতা বেশী এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন তাঁহাদের এখনও অধিক রহিয়াছে। আমরা জানি, সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত একটা জোটবাঁধা দল বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর পিছনে রহিয়াছে। তাঁহারা সেই জোটবাঁধা দলের জোরে বিল দুইটি আইনে পাকা করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে, সেই পাকা ব্যবস্থা বাঙলাদেশ কাঁচা করিয়া ছাড়িবে। বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের শুভ বুদ্ধি আজ জাগ্রত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর মূঢ়তাকে বিচূর্ণ করিতে প্রস্তুত হোক।

বন্যাপীড়িতের সাহায্য—

নোয়াখালি জেলার শোচনীয় অবস্থা বিবৃত করিয়া কংগ্রেস সাহায্য সমিতির সম্পাদক একটি মর্মস্পর্শী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। চাউলের দর ক্রমেই চড়িতেছে, খাদ্যাভাবে লোকে গাছের পাতা, সাপলার মূল প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। অখাদ্য এবং কুখাদ্য ভোজনের ফলে কোথাও কোথাও কলেরা দেখা দিয়াছে। বস্ত্রাভাবে মেয়েরা ঘরের বাহির হইতে পারে না। এই যে অবর্ণনীয় দুর্দশা ইহার প্রতীকারের জন্য আমরা কি করিতেছি, ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আমরা দেখিলাম, নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গতানুগতিক সরকারী নীতি ছাড়িয়া সাহায্য-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে সাহায্যকার্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গ্রামের লোকদিগকে লইয়া প্রতি গ্রামে কমিটি গঠন করা হইবে। কমিটি যদি সুগঠিত হয়, তাহা হইলে সাহায্য-কার্যের ভার তাঁহাদের হাতেও দেওয়া যাইবে। কোন গ্রামের কেহ যাহাতে অনাহারে না থাকে, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য চৌকিদারদের প্রতি বিশেষ আদেশ দেওয়া হইতেছে। বিপন্ন অঞ্চলে ৪৫০টি নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং শুশ্রূষাকেন্দ্রসমূহ হইতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণেরও বন্দোবস্ত করা হইতেছে। প্রস্তাবগুলি সবই ভাল, তবে প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করা অর্থ-সামর্থ্যে সম্ভব হইবে কি না, ইহাই হইতেছে সমস্যা। এবং সমস্যা কেবল নোয়াখালীর নয়, ভোলার অবস্থা নোয়াখালীর অপেক্ষাও শোচনীয় এবং অন্নকষ্ট বাঙলার সমস্ত অঞ্চলেই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। এই নিত্য দারিদ্র্যের স্থায়ী প্রতীকার সাময়িক জোড়াতালি দেওয়া কোন ব্যবস্থায় সম্ভব হইবে না, ইহা আমরা জানি। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার যেদিন দেশবাসীরা হাতে পাইবে সেদিন ইহার প্রকৃত প্রতীকার হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত প্রাণবান্ যিনি তিনি বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি নিজের দুই মুষ্টি অন্ন হইতে এক মুষ্টি দিয়া ক্ষুৎপীড়িতের প্রাণ রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবেন এবং এই প্রাণবেগই প্রচণ্ডতা লাভ করিয়া একদিন বৈদেশিক শোষণ-নীতি হইতে দেশকে মুক্ত করিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—

গত ১০ই শ্রাবণ, শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় আগামী বৎসরের জন্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বাঙলার জাতীয় জীবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদানের তুলনা নাই; সেজন্য বাঙালী জাতির খুবই গর্ব করিবার আছে। কিন্তু সেই গর্ব লইয়া থাকিলেই চলিবে না, পরিষদের কর্মক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত করিতে হইবে। কাজ অনেক হইয়াছে সন্দেহ

নাই, কিন্তু এখনও অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। স্যর যদুনাথ শানিবারের সভায় পরিষদের প্রতি কর্তব্যের কথা জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন দিকে পরিষদের উন্নতিমূলক কর্মধারা সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিষদকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে মৌলিক গবেষণা চলিতে পারে, পরিষদের পুস্তকাগারকে এমনভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক এবং সেই উদ্দেশ্যে কলাভবনেরও উন্নতি সাধন করা দরকার। লণ্ডনের পুস্তকাগারের মত পরিষদের পুস্তকাগারটিকে রীতিমত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা পরিষদের কর্মকর্তৃগণের উদ্দেশ্য। এই পুস্তকাগারে বসিয়া বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ বিদ্যার্থীদিগকে সাহায্য করিবেন। কোন কোন বিষয়ে কোন্ গ্রন্থ প্রয়োজন, তাহা বলিয়া দিবেন। এইভাবে নানা-প্রকার তত্ত্বানুশীলনের দ্বারা বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি ঘটিবে, চিন্তাসম্পদে বাঙালীর সংস্কৃতি সমৃদ্ধতর হইবে। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই মহান্ আদর্শ যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, সেজন্য সমগ্র দেশবাসী অবহিত হইবেন।

বিহারে বাঙালী বিদ্বেষ—

বাঙালী কোনদিন প্রাদেশিকতাকে স্বীকার করে নাই। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে জাতীয়তার সাড়া জাগাইয়াছে বাঙালী। কিন্তু আজ সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার আঘাত আসিয়া পড়িতেছে বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালীদের উপর। সমগ্র ভারত-বর্ষের মধ্যে বিহারের একদল লোকের মনে বাঙালী বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে বেশী রকম। জাতীয়তার উদার আদর্শে যাঁহারা অনুপ্রাণিত তাঁহারা এই প্রাদেশিকতার প্রবৃত্তিকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখিবেন ইহা স্বাভাবিক। কিছুদিন পূর্বে সিংহভূম জেলার বিহারীরা জামসেদপুরে এক সভা করিয়া এই দাবী করেন যে, বর্তমান লেবর কমিশনার মিঃ এস এন মজুমদার যখন বাঙালী, তখন তাঁহাকে ঐ পদে রাখা চলিবে না। ঐ পদ হইতে বাঙালীকে সরাইয়া বিহারীকে নিযুক্ত করিতে হইবে। বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত যমুনা কারজী বিহারীদের এমন মনোবৃত্তিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং এইরূপ প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার প্রতিবাদস্বরূপ তিনি কেন্দ্রীয় বিহারী সমিতির সিংহভূম শাখার সভাপতির পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন। বিহারের কোন কোন স্থানে বাঙালী বিদ্বেষ এমন প্রবল আকার ধারণ করিতেছে যে, বিহারীদের মধ্যে যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহারাও তাহা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না, শ্রীযুত কারজীর সিদ্ধান্ত হইতে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া পড়িল। আমরা আশা করি, তাঁহার এই সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা বিহারী সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং বিহার হইতে বাঙালীদিগকে বিতাড়িত করিবার বাতিকে যাহারা নাচিয়া উঠিয়াছে তাহাদের চিত্তে সুবুদ্ধির উদয় হইবে।

আচার্য প্রফুল্ল জয়ন্তী—

২রা আগস্ট, শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বাঙলার বিশ্বজ্জন-সমাজ এবং বিভিন্ন বিদ্যাস্থানের প্রতিনিধিগণ জ্ঞানবৃদ্ধ বঙ্গগুরুকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন বঙ্গজননীর সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন। বাঙালীর উন্নতি কামনা এবং সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র কর্মসাধনাকে প্রযুক্ত করিয়া যাঁহারা বাঙালী জাতির মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। বঙ্গের এই বরেণ্য সন্তানের শ্রীচরণে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মিঃ এম এন রায়ের আপশোষ—

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধ সম্পর্কে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রচণ্ড বিপ্লবী মিঃ এম এন রায়ের প্রবল আগ্রহ; এই ব্যাপারে ভারতবাসীদিগের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পাওয়া না পাওয়ার কোন প্রশ্ন তুলিলেই তিনি নারাজ। এ হেন ব্যক্তি বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের ব্যাপারে নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে ইহাতে বিস্মিত হইবেন। আমরা কিন্তু একটুও বিস্মিত হই নাই। পোড়া দেশ, এমন একজন বিপ্লবীর কদর তো করিলই না; মিঃ রায় আশা করিতে-ছিলেন যে, অন্তত সরকার তাঁহার মূল্য উপলব্ধি করিবেন। প্রকৃত গুণীর কদর করিবার লোক যে ভারত সরকারের উপ-দেষ্টাদের মধ্যে না আছে এমন তো নয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের শাসন পরিষদে নিয়োগ হইতেই তাহা বুঝা গিয়াছে। নলিনীবাবুর কদর হইল অথচ মিঃ রায়কে কেহ কথাটা পর্যন্ত বলিল না ইহা কি কম দুঃখের কথা! আশা-ভঙ্গজনিত এই উত্তাপই মিঃ রায়ের অন্তর হইতে নৈরাশ্যের আকারে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। অবশ্য বিপ্লবী মিঃ রায় চাকুরীর খোঁজে ফিরিবেন, ইহা কেহ মনেও স্থান দিতে সাহস পাইবে না; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় সেদিন বোম্বাইয়ের সভায় বলিয়াছেন যে, তিনি কোন দিন চাকুরীর পিছনে ঘোরেন নাই, কিন্তু চাকুরীই তাঁহার পিছনে ঘোরে। সেইরূপ এক্ষেত্রে মিঃ রায়ের পিছনে চাকুরী ঘুরিবে, ইহা আশা করা উচিত ছিল না কি?

[৭]

এদিকে রাজেন্দ্র পুলিসের সাহায্য চাহিয়া কর্তৃপক্ষকে ফোন করিয়াছে। ছগনলাল দাঙ্গার ভয়ে রাজেন্দ্রের ঘরে চলিয়া আসিয়াছেন এবং অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছেন।

রাজেন্দ্র আশ্বাস দিয়া বলিল, আপনি আপনার কোঠায় গিয়ে বসুন, আপনার ঘরে ঢুকতে সাহস পাবে না।

কিছু বিশ্বাস আছে না রাজেনবাবু। কানপুরে ওরা এক এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারকে খুন করেছিল।

মিলের মধ্যে কিছু করতে পারবে না, পুলিস এক্ষুনি এসে যাবে। আপনি ভয় পাবেন না।

আপনি ত বলিছেন ভয় পাবে না, ওদিকে কেমন free fight হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন। এদের হাতে মার খেতে খেতে না-ও যদি মরি, বড়বাবু নকরি খতম করে দিবেন।

অজহর ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং রাজেন্দ্রকে কোন গোপন সংবাদ দিতে গিয়া ছগনলালবাবুকে সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া গেল।

রাজেন্দ্র চোখ টিপিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, গোলমাল থামাতে পারলে ?

না হুজুর। ইটপাটকেল ছুড়ছে। এই দেখুন হুজুর আমায় কেমন মেরেছে।

ছগনলাল হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, এ অন্যায় আছে। ধর্মঘট করতে হয় অহিংস থাক, মারধর কেন হোবে। রাজেনবাবু গোলমাল যে ইদিকে আসছে, শীগ্‌গির পুলিসকে আসতে বলুন।

ভজুয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, মঞ্জুশ্রী দাঙ্গা থামাইতে গিয়াছে।

ছগনলাল চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, বলিস কি। তোরা যেতে দিলি কেন ?

ভজুয়া বলিল, মানা শুনলে না।

ছগনলাল বলিলেন, রাজেনবাবু বসে থাকবেন না, শীগ্‌গির চলুন, সর্বনাশ হোয়ে যাবে।

ছগনলাল উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মঞ্জুশ্রীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

অজহর বলিল, ম্যানেজারবাবু গেলেন, তিনি যদি চিনে ফেলেন ?

ভজুয়া বলিল, ভিড়ে চিনতে পাবে না, আমাদের লোক পেছনেই থাকবে।

রাজেন্দ্র প্রশ্ন করিল, মঞ্জুশ্রী একা গেছে ?

ভজুয়া বলিল, না। সঞ্জিতবাবু ও রামজী সঙ্গে গেছে।

রাজেন্দ্র বলিল, ঠিক আছে। ম্যানেজারবাবুকে শ্রমিকদের উপর চটিয়ে দিয়েছি, এখন বড়বাবুকে হাত করতে পারলেই হয়। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। ব্যাটা কি কম পাজি, এত অপমান করলুম তবু দলের নির্দেশ ছাড়া ধর্মঘট করতে চায় নি, শেষটায় জুতো মারতে হল। অজহর সব ঠিক আছে।

অজহর বলিল, জী হুজুর।

রাজেন্দ্র বলিল, আজ মঞ্জুশ্রীকে অপমান করা চাই-ই। তা'হলে অপমানের সুযোগ নিয়ে আমি সকল ক্ষমতা নিতে পারব। অজহর তুমি যাও, পুলুয়াকে বলে এস, মঞ্জুশ্রীকে যদি কৌশলে ঢিল ছুড়ে অপমান করতে পারে তবে ভাল বকশিস মিলবে।

অজহর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

অজহর চলিয়া যাইবার খানিকক্ষণের মধ্যে লোকনাথবাবু মিলে আসিয়া পৌঁছিলেন। মেন গেট দিয়া গাড়ি প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া বেয়ারা দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া রাজেন্দ্রকে সংবাদ দিল।

লোকনাথবাবুর আগমন সংবাদ পাইয়া রাজেন্দ্র একটু ভয় পাইয়া গেল, ভজুয়াকে বলিল, বুড়োটা এসে যে বিপদ ঘটালে।

ভজুয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, ভাল মানুষ সেজে বড়বাবুকে ধোঁকা দিন। আপনি এখানে আর বসে থাকবেন না।

রাজেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক বলেছিস। বড়বাবু যদি এখানে আসেন, তবে বলবি আমি দাঙ্গা থামাতে গেছি। হুসিয়ার, কোন বেফাঁস কথা বলিস নি।

রাজেন্দ্র দ্রুত অন্যত্র গিয়া আত্মগোপন করিল।

লোকনাথবাবু ব্যস্ত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজেন কোথায়, ম্যানেজারবাবু ?

ভজুয়া মাটি পর্যন্ত মাথা নত করিয়া বলিল, ছোটবাবু দাঙ্গা থামাতে গেছেন।

মঞ্জু মিলে এসেছিল, সে কোথায় ?

তিনিও সেখানে গেছেন।

মঞ্জু গেছে দাঙ্গাহাঙ্গামায়, বলিস কি! গোলমালে তোরা কেন যেতে দিলি, তোদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। চল।

লোকনাথবাবু প্রস্থানোদ্যত হইলে রাজেন্দ্র সহাস্য ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া রিভলবার বাহির করিতে করিতে বলিল, ছোটলোকদের স্পর্ধা কম নয়।

লোকনাথবাবু বলিলেন, ব্যাপার কি রাজেন, মঞ্জু কোথায়?

আর বিলম্ব করবার সময় নেই। আমি এদের আজ এমন শিক্ষা দেব যাতে জীবনে আর গুণ্ডামি করতে সাহস পাবে না।

আরে, এত চটেছ কেন, কি হয়েছে। লোকনাথবাবু রিভলবারটা নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, ক্রুদ্ধ মানুষের হাতে রিভলবার থাকতে নেই। হাজার অন্যায় করলেও নর-হত্যা করতে তুমি পার না।

আমি এর শাস্তি দেবই।

উত্তেজনার সময় শাস্তি দেওয়া যায় না। তুমি যা চটেছ তাতে খুনোখুনি হতে পারে।

এর পর কি খুন করা উচিত নয়। আমায় শুধু যদি অপমান করে ক্ষান্ত থাকত তবে নয় ক্ষমা করতুম কিন্তু মঞ্জুশ্রীকেও অপমান করেছে। এত বড় পাষণ্ড ও দুর্বৃত্ত যে, নারী নির্যাতন করতে সাহস পেয়েছে।

নারী নির্যাতন! লোকনাথবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন। নারী নির্যাতনের ক্ষমা আমি করিনে, কাকে কারা নির্যাতন করলে?

মঞ্জুশ্রীকে।

মঞ্জুশ্রীকে? মঞ্জুশ্রীকে নির্যাতন করতে পারলে।

রাজেন্দ্র রিভলবারটা লইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ সহকারে হাত বাড়াইয়া বলিল, ওটা আমাকে দিন, আমি এ কিছুতেই সহ্য করব না।

লোকনাথবাবু রিভলবারটা দৃঢ় হস্তে ধরিয়া বলিলেন, গুণ্ডামীর একটা সীমা আছে। মনে করেছে আমি বৃদ্ধ, অকর্মণ্য, আমি কাউকে কঠোর কথা বলতে পারিনে। এবার আমি বুঝিয়ে দেব আমি দুর্বল নই, নির্মম হস্তে অন্যায়ের শাস্তি দিতেও পারি।

লোকনাথবাবুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাজেন্দ্র একটু ভয় পাইয়া গেল। বাধা দিয়া বলিল, আপনি এর মধ্যে যাচ্ছেন?

ভয় পাচ্ছ? ভয় নেই, এদের কি করে দমন করতে হয় তা তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। এদের বশীভূত করতে রিভলবারের প্রয়োজন হয় না। লোকনাথবাবু দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

রাজেন্দ্র ভজুয়াকে চোখ টিপিয়া দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

লোকনাথবাবুর যাওয়ার পূর্বেই গোলযোগ থামিয়া গিয়াছে। মঞ্জুশ্রী ও সঞ্জিতের চেষ্টায় দাঙ্গা সূচনাতেই বন্ধ হইয়া যায় গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

ধর্মঘট সম্পর্কে কোন মীমাংসা হয় নাই। একদল শ্রমিক মিল ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং অপর একদল কাজে যোগদানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

মিলের অবস্থা শান্ত হইবার পর লোকনাথবাবু অপিস কক্ষে আসিয়া বসিলেন। লোকনাথবাবুর সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্র, মঞ্জুশ্রী ও ছগনলালবাবু অপিস কক্ষে আসিলেন।

রাজেন্দ্র যথাসম্ভব উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মঞ্জু, তোমার শরীরের উপর কোন ইট পাটকেল পড়েনি ত'? যত সব Rogues & rascals—এদের দ্বারা কিছু অসম্ভব নেই।

মঞ্জুশ্রী সুরটা একটু জড়াইয়া উত্তর দিল, দোর আটকিয়ে ভেতরে না বসে থেকে, ঢিলগুলো কোথায় পড়ে তা দেখবার জন্য নয় একবার বাইরেই যেতেন।

অপমানে রাজেন্দ্রের মুখখানি কালো হইয়া গেল। চট করিয়া কোন জবাব খুঁজিয়া না পাওয়ায় চুপ করিয়া গেল।

লোকনাথবাবু বলিলেন, ছিঃ মা মঞ্জু, তোমার এ কথা বলা উচিত হয়নি। রাজেন ঘরে বসে ছিল না। আমি এসে দেখি রাজেন ছুটে এল এবং ড্রয়ার থেকে রিভলবার বের ক'রে নীচে যাচ্ছে। আমি যদি রিভলবারটি কেড়ে না রাখতুম ত' আজ একটা খুনোখুনি হয়ে যেত।

কৃত্রিম লজ্জায় মাথা নত করিয়া রাজেন্দ্র বলিল, আমি এখনও বলছি, আপনার বাধা দেওয়া উচিত হয়নি। আমার কর্তব্যের ত্রুটি হয়েছে।

লোকনাথবাবু বলিলেন, খুনোখুনি করা উচিত ছিল না!

রাজেন্দ্র বলিল, আপনি একবার ভেবে দেখুন, যারা মঞ্জুর মত ভাল ও দয়াবতী মহিলাকে অপমান করতে পারে তারা কতবড় কৃতঘ্ন; শুধু অপমান নয়, তার গায়ে পর্যন্ত ঢিল ছুঁড়েছে, অথচ মঞ্জুশ্রী এদের কল্যাণের জন্য কি না করেছে। তবে একথা সত্যি, আপনি এসে না পড়লে আমি এত বড় অপমান নীরবে সইতুম না।

মঞ্জুশ্রী লজ্জিত হইয়া রাজেন্দ্রকে বলিল, আমি না জেনে আপনাকে বিদ্রূপ করেছি, আমায় ক্ষমা করবেন।

রাজেন্দ্র বলিল, না-না এতে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। তোমার অপমানে আমার চুপ করে থাকতে হ'ল বলে আমি লজ্জায় তোমার সামনে মাথা তুলতে পারছি না।

লোকনাথবাবু মঞ্জুশ্রীকে বলিলেন, তুমি এখন বাড়ি যাবে?

মঞ্জুশ্রী বলিল, হাঁ, তুমি যাবে না—চল এক সঙ্গেই যাই।

লোকনাথবাবু বলিলেন, তুমি যাও, আমি একটু পরে যাব।

মঞ্জুশ্রী বলিল, তুমিও চল না।

লোকনাথবাবু বলিলেন, আমার একটু কাজ আছে মা। ভয় নেই, আমি কোন কিছু করব না, একটু খবর জানবার এবং একটু পরামর্শ করবার আছে।

মঞ্জুশ্রী বলিল, বাবা, তুমি ত' জান, এরা গরিব, বড় নিঃসহায় এবং নিপীড়িত—এরা সতাই অজ্ঞ, নিজের ভাল-মন্দ জানে না। দুষ্ট লোকদের কথায় একটা ভুল করেছে ব'লে ক্ষমার অযোগ্য হতে পারে না। আমি এদের ক্ষমা করেছি।

লোকনাথবাবু বলিলেন, তোর ভয় নেই মা, তুই যাদের

ক্ষমা করেছিস আমিও তাদের ক্ষমা না করে পারব না। আমার রুদ্ররূপ কখনও দেখিসনি বলে অত ভয় করছিস। তোকে না জানিয়ে কিছুই করব না মা, কথা দিচ্ছি।

মঞ্জুশ্রী নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল।

রাজেন্দ্র বলিল, মঞ্জু দুঃখ পাবে বলে আমি এতক্ষণ চুপ করেছিলুম। মেয়েরা একটু সেন্টিমেন্ট্যাল হয়, কিন্তু এত বেশি সেন্টিমেণ্ট নিয়ে ব্যবসায় চালানো যায় না। যারা প্রতিদ্বন্দ্বী মিলের চর হিসাবে এখানে লুকিয়ে থেকে আমাদের সর্বনাশ করছে তাদের সকল সময় ক্ষমা করা চলে না এবং উচিতও নয়।

লোকনাথবাবু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী মিলের চর কে?

রাজেন্দ্র বলিল, অনেক আছে, আপনাকে আমি পরে সব জানাব। ওরা রীতিমত মাইনে পায়। ওরাই মিলে গোলমাল সৃষ্টি করছে। কাগজে কাগজে দুর্নাম এবং সভাসমিতিতে বিরুদ্ধ প্রচারকার্য এদের মারফতই হচ্ছে। আমার হাতে প্রমাণ রয়েছে।

লোকনাথবাবু বলিলেন, আমি ত কারো প্রতি কোন অবিচার হয় তা চাইনে এবং এ বিষয়ে আমার স্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে। তবে কেন আমার বিরুদ্ধে দুর্নাম হয় এবং মিলের ক্ষতি করবার জন্যে এরা চেষ্টা করছে?

রাজেন্দ্র বলিল, দেশকর্মীরা দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে সুবিধে করতে পারছে না এবং কংগ্রেসের তীব্র দলাদলিতে প্রাধান্য লাভ না করতে পারায় এক দল লোক সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী হয়েছে। ওরা নানাস্থানে শ্রম ও কিষাণ আন্দোলন করছে। ওদের দাবীর শেষ নেই। বর্তমানে দেশে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে কোন মিল ফ্যাক্টরী সুনামের সঙ্গে এবং নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবে না।

লোকনাথবাবু বলিলেন, এটা খুব বড় যুক্তি হল না, আত্মপক্ষ সমর্থনের মত কথা হল। আমাকে দেখছি এ সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে হচ্ছে।

রাজেন্দ্র বলিল, এমন অচল ও নিন্দনীয় অবস্থা দাঁড়াত না। মঞ্জুশ্রীর অতিরিক্ত কারুণ্যের জন্য এমন হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম, যারা আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হয়েও আমাদের সর্বনাশ করতে চাচ্ছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মিলের চর সেজে আমাদের ধ্বংস করতে চাচ্ছে তাদের তাড়িয়ে দিতে। ক্ষতি আমাদের নয়, কয়েকজন বদমাইশ লোকের জন্য যদি মিলটি উঠে যায় তবে হাজার হাজার পরিবার নিরন্ন হবে।

লোকনাথবাবু বলিলেন, তাই ত। এত বড় ভীষণ কথা। আমি তোমাকে বলছি, তুমি আর ম্যানেজারবাবু পরামর্শ করে এর প্রতিকার কর। কয়েকটি লোকের জন্য হাজার হাজার পরিবারের অন্ন সংস্থানের পথ বন্ধ করা যায় না। আমি মঞ্জুকে বলে দেব, সে আর তোমাদের বাধা দেবে না। তারপর শিগ্গিরই বোধ হয় আমি ও মঞ্জু য়ুরোপে যাব এবং প্রাগে এবার যে Science Congress হবে তাতে এবার আমি যোগদান করব। তখন তোমাদেরই বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে মিল পরিচালনা করতে হবে।

রাজেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইল কিন্তু মনের উচ্ছ্বাস গোপন করিয়া বলিল, প্রথম অবস্থায় যদি আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন ত আমি সকল গোলযোগ মিটিয়ে দিতে পারি। একবার মিলের আবহাওয়া স্বাভাবিক ও ভাল করে নিতে পারলে তারপর কুলিমজুরদের যত ইচ্ছে স্বাধীনতা দেওয়া যায় এবং দয়া দাক্ষিণ্য করা যায়। চরম দারিদ্র্যের চাপে মানুষ সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী হয়ে পড়ছে। বর্তমানে শ্রমিক সঙ্ঘ যথেষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এবং তাহাদের মধ্যে আত্মচেতনা হচ্ছে কাজেই—

লোকনাথবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, এ ত অত্যন্ত শুভ লক্ষণ রাজেন। আমাদের দেশবাসী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, আত্মচেতনা লাভ করে এবং শক্তিশালী হয় তবে অবিলম্বে আমরা স্বাধীন হতে পারবো।

রাজেন্দ্র তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, এই spiritএর জন্য আমি কংগ্রেস ও শ্রম ও কিষাণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কয়েকটি লোকের স্বার্থসিদ্ধি ও নীচতার জন্য কোন বিরাট প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করবার চেষ্টাকে আমি অবহেলা করতে পারিনে। এতে শিল্পজগতের ক্ষতি, দেশের ও দশেরও ক্ষতি।

ছগনলাল বলিলেন, সে কথা ঠিক আছে। অন্যায় ও জবরদস্তির কাছে আমাদের মাথা নত করা ঠিক আছে না। সকলের ভালই আমরা করিব।

লোকনাথবাবু বলিলেন, এখন এ বিষয়ে আলোচনা থাক। কাল রাজেন তুমি, আমি আর ছগনলালবাবু এ বিষয়ে পরামর্শ করব। রাজেনের বোধ হয় এখনো নাওয়া খাওয়া হয়নি। রাজেন আর দেরি নয়, তুমি এক্ষুণি বাড়ি যাও, বড্ড অবেলা হয়ে গেছে।

রাজেন্দ্র তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে খানিক বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। রাজেন্দ্র বাড়ি যাইবার পূর্বে অজহর, ভজুয়া ও পলুয়াকে সতর্ক করিয়া দিয়া যাইতে ভুলিল না।

(ক্রমশ)

কেরাণী রবীন্দ্রনাথ *

অমল হোম

[সম্পাদক, "ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট"]

আপনারা আমার আজকের অভিভাষণের আখ্যা শুনে চমকে বা হেসে উঠবেন না। "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" মানে এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কেরাণীরূপে কোনদিন কোলকাতার কোন সওদাগরী হৌসে চাকরী করেছেন। তা যে তিনি করেন নি সে ত আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু এটাও জেনে রাখা ভাল যে, ধরুন যদি তিনি এই কর্পোরেশনেই কাজ করতেন, তবে সে-কাজ তিনি ভাল করে, নিখুঁত ক'রেই করতেন; আমাদের রামিয়া-সাহেবের মত কুড়ি টাকায় চাকরীতে ঢুকে, হাজার টাকা মাইনের সেক্রেটারীগিরি তিনি অনায়াসেই ক'রে যেতে পারতেন;—চাই কি, হয়ত, আমাদের 'বড় সাহেব'এর চেয়ারেও বসতেন। অনেক বছর আগে, চিত্তরঞ্জন দাশ-মশাই একদিন আমাকে বলেছিলেন,—"ভাগ্যিস্, তোমাদের গুরুদেব বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হ'য়ে আসেননি, তা হ'লে আর আমাদের ব্যবসা জমাতে হোত না।" কথাটা দাশ-সাহেব,—তখন তিনি ব্যারিস্টারি করেন,—পরিহাসচ্ছলেই বলেছিলেন বটে কিন্তু কথাটা সত্যি;—কেননা বিধাতা ললাটে রাজটীকা দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; যেখানে যে-ক্ষেত্রেই তিনি যেতেন, সেখানেই বসতেন তক্ততাউযে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু যাক সে-কথা। আমার অভিভাষণের আখ্যা "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" কি অর্থে দিয়েছি সেই কথাটা বলি। "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" মানে আমি এই করেছি যে, রবীন্দ্রনাথ কেরাণীকে কি চোখে দেখেছেন, কি রূপে এ'কেছেন,—তাঁর সৃষ্টিতে কেরাণীর ছবি ফুটেছে কি রকম। আমরা এখানে প্রায় সবাই কেরাণী, অর্থাৎ কিনা কলম পিশে খাই; মাস গেলে মাইনে গুণে,—অবশ্য "কাট্" বাদ দিয়ে,—বুক-পকেটে পিন এ'টে নোট-ক'খানি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে যাই; সমর্পণ করি সর্বংসহা গৃহিণীর করকমলে; — সকাল হতে না হতেই আসে বিল হাতে বাড়িওলার দরোয়ান, খেরোবাঁধা খাতা হাতে মুদী, ফর্দ নিয়ে গোয়ালা; —তারপর মাসের বাকী দিনগুলো কাটাই মাস-কাবারের মুখ চেয়ে। আমিও আপনাদেরই একজন, নামে শুধু 'এডিটর';—কাজেই আমার মুখে শোনাবে ভাল, কেরাণীর কথা রবীন্দ্রনাথ কেমন বলেছেন; আপনাদেরও ভালো লাগবে সে-কথা শুনতে নিশ্চয়।

প্রথমেই একটা কথা বলি। কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে 'প্রগতি'-বাদীদের মুখে—'রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের কবি, তিনি শুধু এ'কেছেন তাঁর কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে বড়লোকদের ছবি; দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনাটন কি তা তিনি জানেন না, গরীব লোকের খবর তিনি রাখেন না!' বারবার একটা কথা বললে কথাটা অবশ্যই সত্যি হয় না কিন্তু হ'য়ে দাঁড়ায় সেটা "ধুয়োই বুলি",—যাকে বলে ইংরেজীতে catchword! হয়েছেও তাই। সেই যে কবে বিপিন পাল-মশাই "বঙ্গদর্শন"এ" লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য বস্তুতন্ত্রহীন',—সেই থেকে সুর ধরলেন এক দল,—বাঙলার গীতি-কবিতার সত্য রূপটি ফোটেনি তাঁর কাব্যে, দেশের নাড়ীর সঙ্গে নেই নাকি তার যোগ—ইত্যাকার। টি'কলো না কিন্তু এই সব টিপ্পনী, দেশ নেয় নি ও-সব সমালোচনা। কিন্তু বালির চেয়ে সূর্যের তাপ বরাবরই বেশী; তাই বড় বড় মহারথীদের নারায়ণী-সেনা যখন গেল ভেসে, বৈষ্ণবরসতত্ত্ব আর উজ্জ্বলনীলমণি, রাইকিশোরী আর বাঙলার রূপ গেল মুছে, তখন এই সব সমালোচকেরা মার্ক্সিস্ট্ বুলি আউড়িয়ে, কড্ওয়েল কপ্‌চিয়ে, Illusion আর Reality গুলিয়ে ফেলে চেঁচামেচি সুরু করেছেন,—রবীন্দ্রনাথ "আন্তর্জাতিক কল্পনাবিলাসী, সৌখীন সাহিত্যের স্রষ্টা"; তাঁর "রঙ-বেরঙের ঝুঁটিওয়ালা কচি কচি মিষ্টি বুলবুলি ভাষা"; রবীন্দ্রনাথ না কি "সমস্ত রকমের আধুনিকতার বিরোধী", শুধু "সমাজ ও বাস্তব-জীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে তিনি অনাবিল সৌন্দর্য ও ব্রহ্ম-স্বাদরূপ 'রসের' মধ্যে নিমজ্জিত"! এ সব তাঁদেরই কথা আমি উদ্ধার ক'রছি মাত্র! এই সব মার্ক্সিস্ট্ মৌলানারা ফতোয়া জারী করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'বুর্জোয়া' অতএব তিনি 'ব্যাক নাম্বার'! নূতন সাহিত্য ও সমালোচনার নামে এই সব বিনয়ীরা বুঝোতে চাচ্ছেন আমাদের,—আমি আবার তাঁদেরই ভাষা উদ্ধার করছি,—যে—রবীন্দ্রনাথের কাছে "মানুষ বা মরজগতের জয় হয় নি"; "তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' আহ্বান দিগ্‌ভ্রান্ত সরল শিশু-হৃদয়ের কাতরাণি"; তিনি "বাদশাহ রাজা-উজীরের আওতায় মধ্যযুগের নির্জন নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসে" আছেন; তিনি "সামন্ততন্ত্রের সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে........ মুক্তির আশ্রয় খুঁজছেন;" তিনি "সংখ্যালঘিষ্ঠ মহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠীর......পৃষ্ঠপোষকতা করছেন এবং তাঁর বিমূর্ত কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট 'মানবপ্রেম পরোক্ষে স্বশ্রেণীপ্রীতির মহিমা কীর্তন করছে"।(১) এই 'সাম্যবাদী' সমালোচকেরা জানাতে চান যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ চোখে ডায়েলেক্‌টিসের ঠুলি এ'টে সাহিত্যের ঘানি টানেন না, সেই হেতু তাঁর সাহিত্য সেই তেল যোগাতে পারছে না, যার অভাবে আজকের দিনে মানুষের ঘরে নাকি আলো আর জ্বলবে না।

বলা হচ্ছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিচার নাকি 'সাম্প্রতিক' সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমালোচনা-সম্মত! আমি

---

* কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী-সংঘকর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

(১) "নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা"—বিনয় ঘোষ।

বলা, এই সমালোচনা 'সাম্যবাদী' হতে পারে, সত্যবাদী নয়! কিন্তু যাঁরা এই বিধান দিয়েছেন, সেই নূতন গোঁসাইয়ের দল, আর কিছু না জানুন, দলভারী করবার বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছেন যথেষ্ট! দুঃখ এই যে, আমাদের খবরের কাগজের প্রভুরা আছেন সব সময়েই তৈরী ঢাকের কাঠি নিয়ে—এঁদের ঢাক পেটাবার জন্য। নির্বিচারে নির্বিকারে এঁরা ছাপিয়ে দিচ্ছেন এঁদের এই সব মূঢ় আলোচনা, আর ভাবছেন কী গূঢ়ই না হোলো, মার্ক্সিস্ট্ দর্শনের অপব্যাখ্যার প্রলাপ,—সাহিত্যের এই নবতত্ত্ব! একদিন ছিলাম আমরা ইংরেজ গুরুর পাঠশালার ছাত্র,—গুরুমশাইয়ের সব কথাই ছিল আমাদের কাছে বেদবাক্য; আজ সেই আসনে বসিয়েছি মার্ক্সিস্ট্ মাস্টারমশাইদের; মাস্টার বদলেছে বটে, কিন্তু মন বদলায় নি,—সে দাসত্ব করছে চিরদিন!

আরো দুঃখ এই যে, খবরের কাগজ শুধু নয়, ত্রৈমাসিক আছেন, অভিজাত মাসিক আছেন—যাঁদের কেউ কেউ নৈবেদ্যের চূড়ার উপর সন্দেশের মত রবীন্দ্রনাথেরই লেখা ছাপিয়ে, সেই কথামালার শৃগাল ও শিকারীদের গল্পের মত, ইঙ্গিতে দেন দেখিয়ে, ভঙ্গীতে দেন জানিয়ে যে, রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে পড়েছেন এবং তিনি নাকি হাঁপিয়ে উঠেছেন নব্যদের তালে পা ফেলতে গিয়ে;—আহা বুড়ো মানুষ, খেটেছেন সারাজীবন যথেষ্ট, পারবেন কেন? এই সব পত্রিকার পংক্তিতে মিশিয়ে থাকে কেমন যেন একটা অনুকম্পার সুর, একটু দরদের রেশ। এঁরা একটা নতুন কথা তৈরী করেছেন—একটা নতুন সাহিত্য আবিষ্কার করেছেন; তার নাম "রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য"। আপনারা ভুল বুঝবেন না। 'রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য' মানে রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্য নয়,—রবীন্দ্র-অতিক্রান্ত-সাহিত্য, অর্থাৎ কি না যে-সাহিত্য রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অতিক্রম করে গেছে। এঁরা দল বেঁধে, মহোৎসাহে পরস্পরের পৃষ্ঠকণ্ডুয়ন ক'রে, নিজেদের কাগজে নিজেদের বন্ধুদের দিয়ে নিজেদেরই গল্প কবিতার সুদীর্ঘ আলোচনা ছাপিয়ে জাহির করছেন যে, "আধুনিক বাঙলা কবিতার অগ্রগতি সত্যিই বিস্ময়কর" এবং "বাঙলা কবিতার এ উন্নতির জন্য অনেকখানি দায়ী" নাকি এঁদেরই পরিচালিত একখানি ত্রৈমাসিকী। (২) আর একখানি কাগজে,—যা ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে 'নবকলেবর' লাভ করেছে,—খ্যাতনামা এক অধ্যাপক-সাহিত্যিক, আমারই বিশেষ বন্ধু, কিছুকাল পূর্বে প্রচার করলেন যে, আধুনিক কবিতা ব'লতে যা বোঝায়, তা কেবল একমাত্র তাঁরই বন্ধু কবি-সম্পাদকের রচনাতেই রূপ ধরেছে,—আর বাকী যা, সব মেকি! শুনে আশ্চর্য হবেন কি যে, এ-লেখাটি সে-কাগজে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনই লাভ করেছিল? (৩) এঁরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত এবং নিজেদের কাছে ও নিজেদের কাগজে নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করেছেন যে, "রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত" নূতন বাঙলা সাহিত্য,—গল্প কাব্য সব কিছু, এঁরা সৃষ্টি করেছেন; অতএব রবীন্দ্রযুগ অবসান —Q. E. D.!

কিন্তু যাক এ-সব "অশ্রাব্যম্ অপ্রিয়ম্"। শাস্ত্রের "মা ব্রূয়াৎ" আদেশ শিরোধার্য ক'রে আমার আসল বক্তব্যে এসে পড়া যাক। বক্তব্যটা আমার এই—রবীন্দ্র-সাহিত্যে, তাঁর গল্পে উপন্যাসে, তিনি রাজারাজড়া নিয়ে কারবার করেন নি; আপনার আমার মত সাধারণ লোক, যারা খেটে খায়, আপিসে চাকরী করে, তাদের কথাই বলেছেন; তার চাইতে একটুও কম বলেন নি, দুঃখে পীড়িত, অভাবে ক্লিষ্ট পরমসহিষ্ণু বাঙলার পল্লীবাসীদের কথা;—তাদেরই তিনি রূপে ও রসে মূর্তি দিয়েছেন অপরূপ;—সে-মূর্তি মানুষের চিরন্তনী মূর্তি, দেশ ও কালের পাত্র ছাপিয়ে আসন নিয়েছে তা সকল কালের, সকল মানবের মর্মস্থলে।

আর একটি কথা এখানে বলবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। সে-কথাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যপ্রকাশিত "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা" (৪) গ্রন্থখানিতে খুব ভাল ক'রে বলা হয়েছে। সেটি এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের উপাদান খুঁজেছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাইরে। রবীন্দ্রনাথই বাঙলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম বাঙলার ও বাঙালীর বাস্তব জীবনের ছবি আঁকলেন তাঁর ছোট গল্পে। রোমান্স নয়, রাজরাজড়ার লড়াই নয়, বাঙলার পল্লীজীবনের সুখদুঃখের ছবি,—ঘনিষ্ঠ নিবিড় যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ দেখা।

"পোস্ট্‌মাস্টার" নিশ্চয়ই পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আদ্যযুগের সৃষ্টি,—পঞ্চাশ বছর আগে লেখেন "হিতবাদী" কাগজে। গল্পটা কাকে নিয়ে? গণ্ডগ্রামের গরীব ডাকবাবু—অখ্যাত অজ্ঞাত—কেরাণীরই সামিল; গৃহ-ছাড়া, সঙ্গীহীন—সে শুধু রতনের মনিব। রতন কে? সামান্য গ্রাম্য বালিকা; পোস্টমাস্টারের দুটি ভাত সিদ্ধ করে, দুখানি রুটি গড়ে দেয়, আর তার বিচ্ছেদকাতর দিন-গুলিকে পূর্ণ ক'রে তোলে। শেষে একদিন এল বিদায়ের পালা, অশ্রুসজল রতনকে রেখে মাস্টারমশাই—"নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল........"

এই "পোস্টমাস্টার" গল্পটিতে যে-সুরের আভাস, তার পূর্ণ পরিণতি দেখি "সমাপ্তি"-তে। কেরাণীর একমাত্র কন্যা; পোষ-না-মানা বন্য হরিণীর মত চঞ্চলা মৃন্ময়ী। বাপ চাকরী করে বিদেশে; স্টীমার ঘাটের মাল ওজন মাশুল আদায় হোলো তার কাজ; মেয়ের বিয়েতে আসবার ছুটী হোলো না তার মঞ্জুর। সেই গরীবের ঘরে হোলো একদিন সহসা মেয়ে জামাইয়ের আবির্ভাব—অপূর্ব আর মৃন্ময়ী। কী বেদনার রসে আনন্দ-উচ্ছল সেই মিলনের দৃশ্য!......

দারিদ্র্যের অভাব-অনাটনের এই ছবিটির উপর কবি তাঁর যাদুকাঠি বুলিয়ে, অনির্বচনীয় রসের সঞ্চারে, আমাদের হৃদয় মন অভিষিক্ত করে দিলেন,—কেরাণী জীবনের কালি

(২) "বৈশাখী বার্ষিকী" ১৩৪৮—আধুনিক বাঙলা সাহিত্য—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

(৩) "পরিচয়" বৈশাখ ১৩৪৭—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(৪) রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়।

নিমেষেই সোনা হয়ে গেল। দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে; অভাব-অনটন ত নিত্য সহচর, কিন্তু সে সমস্ত ছাপিয়ে গেল গরীব কেরাণী বাপের সেই তিনদিনের আনন্দ। মানব-হৃদয়ের এই অপূর্ব পরিচয়ে নিবিড়, স্নেহ-সুকোমল, প্রশান্তি-গভীর এই অন্তর্দৃষ্টি কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মত রবীন্দ্রনাথের সহজাত। কোন বিশিষ্ট অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কোন জীবনসম্পর্কহীন যান্ত্রিক মতবাদ থেকে এর জন্ম নয়। অশেষ বিধিনিষেধ বাধাবন্ধনের মধ্যে যেখানে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির নানা বিচিত্র প্রকাশ আহত ও সঙ্কুচিত, সেখানে কবি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একান্ত আত্মীয়তাবোধের সাহায্যে গল্পের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন এবং সুদুর্লভ মনোবিশ্লেষণ-ক্ষমতায় হৃদয়লীলার যথার্থ রূপটি আমাদের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন। তাঁর কল্পনার ছোঁয়া লেগে সকল বস্তু এক অখণ্ড রসপরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করে; তা ব্যক্তি-বিশেষের দুঃখকে কোন বিশেষ ঘটনার বেদনাকে সকলের বেদনার ভিতরে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়। অথচ তিনি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুকে নিয়েই তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টির সূত্রপাত কিন্তু তাঁর অপূর্ব কল্পনা বাস্তবকে ছাড়িয়ে, রসের ঊর্ধ্বলোকে উঠে, সেই সৃষ্টিকে অপরূপ ঐশ্বর্য্য মহিমায় মণ্ডিত ক'রে দেয়।

এই রসসৃষ্টির জন্য 'ফিউডল্', কি 'মিডিভল', 'বুর্জোয়া' বা 'প্রলেটারিয়েট' কোন সমাজতন্ত্রের বিশেষ পরিবেশ বা পরিমণ্ডলের প্রয়োজন হয় নি রবীন্দ্রনাথের;—সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে তাঁর রস-অনুভূতি সমান। "একরাত্রি" গল্পের 'বিপুল বিরতি', অপূর্ব কারু-সংযম গরীব স্কুলমাস্টারকে আশ্রয় ক'রেই ফুটে উঠেছে। "মহাপ্রলয়ের তীরে" সুরবালার পাশে দাঁড়িয়ে "অনন্ত আনন্দের আস্বাদন" হোলো সেই "ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।" "মধ্যবর্তিনী" গল্পের অপরিসীম আবেগ তিনটি মানুষের জীবনকে আলোড়িত ও বিধ্বস্ত ক'রে গহন গোপন-চারী মানব-মনের যে বিচিত্র-সূক্ষ্ম পরিচয় দিল, তা "ম্যাকমোরান কোম্পানীর আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র"কে নিয়ে। পরাধীন দেশের সমস্ত গ্লানি, বেদনা, নিষ্ফলতা, অন্যায় অত্যাচার অপমান পুঞ্জীভূত হ'য়ে রইলো "মেঘ ও রৌদ্র" আখ্যানে—'ক্ষীণদৃষ্টি' মক্কেলহীন গ্রাম্য উকীল শশিভূষণের ব্যর্থ জীবনে; শুধু বুলিয়ে দিলে তার হৃদয়ক্ষতে স্নেহপ্রলেপ তার শৈশব-ছাত্রী 'নিরাভরণা, শুভ্রবসনা, বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা'।

"গল্পগুচ্ছ" পড়ুন,—দেখবেন, কবির সৃষ্টিতে কেউ বাদ যায় নি। "অতিথি" গল্পে সেই জন্ম-vagabond তারাপদ ছোকরাকে মনে পড়ে? সেই "আসক্তিবিহীন উদাসীন ব্রাহ্মণ বালক", যার 'পথ চলাতেই আনন্দ', যাকে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিবাবু, তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা বা তাঁদের মেয়ে চারু কেউ ধরে রাখতে পারলে না—যে একদিন বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল।.........

'সমাজ-সচেতন' মনের কথা আজকাল খুব শোনা যাচ্ছে। এই social consciousness রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে দেখবেন ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। পণ্যা নারী নিয়ে তিনি কোনদিনই মাতামাতি করেন নি—তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে; কিন্তু যে সামাজিক আবেষ্টনে ও অবিচারে পতিতার সৃষ্টি, যে একদেশদর্শিতায় তার চরম গ্লানি ও নির্যাতন, তা তাঁর মনকে কিভাবে নাড়া দিয়েছে, তা পাবেন তাঁর "বিচারক" গল্পে। মনে রাখবেন, এ-গল্প Tolstoy-এর "Resurrection" উপন্যাসের আগে লেখা এবং বাঙলা কথাসাহিত্যে পাইকারী হিসাবে পতিতা আমদানী হবার বহু পূর্বে রচিত। আমি ত মনে করি এই একটি গল্পে এ-সমস্যা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা আধুনিক বা অতি-আধুনিক কোন গল্পেই খুঁজে পাওয়া শক্ত।

নারী-জাগরণ, নারী-বিদ্রোহের বাণী থেকে থেকে খবরের কাগজে, বক্তৃতামঞ্চে আত্মঘোষণা করছে কিছুকাল থেকে এদেশে। সে স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ মহীয়সী বাণী পাবেন "স্ত্রীর পত্রে", "পলাতকা"র 'মুক্তি' কবিতায়—বিনুর বাইশ বছরের জীবনের ব্যর্থতায়। জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস-কে নিয়ে যে "চতুরঙ্গ", তাতে পাবেন নরনারীর আদিম সম্বন্ধের উপর রস-সমুদ্রের যে ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়লো, হৃদয়ের হাপরে যে আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো, সেই সম্বন্ধ বিষয়ে এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এমন সূক্ষ্ম বিচার, যা পড়বার পর মনে হবে, যৌনসমস্যা নিয়ে এ-দেশে লেখা রাশি রাশি কাহিনী পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেণরাশি মাত্র।

'ছোটলোক' যাদের বলা হয় তাদের গল্প চান? ছিদাম চন্দরার কথা পড়ুন "শাস্তি"তে,—সেই ছিদাম আর তার ভাই দুঃখী। দুজনে জমিদারের কাছারীতে সারাদিন না খেয়ে বেগার খেটে এসেছে। বৌয়ের কাছে ভাত চেয়ে না পেয়ে দুঃখী খুন ক'রে বসলো তাকে। তার পর ভাইকে বাঁচাবার জন্য ছিদাম খুনের দায় চাপালে তার বৌ চন্দরার কাঁধে। ...... চন্দরা—"হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল"—"একখানি নূতন তৈরী নৌকার মত সুডোল" দেহ যার। মনে পড়ে, ফাঁসীর আগে "দয়ালু সিভিল সার্জন" যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে তার স্বামীকে দেখতে চায় কি না তখন সে কি বলেছিল? এমন বস্তুনিষ্ঠ অথচ এমন রস-সার্থক গল্প খুঁজে পাওয়া শক্ত।

কিন্তু আমি বোধ হয় "কেরাণী রবীন্দ্রনাথ" থেকে একটু দূরে এসে পড়েছি। সুতরাং ফিরে যাওয়া যাক আবার কেরাণী জীবনের কথায়। কেরাণী জীবনে রোমান্স খোঁজেন যদি ত পাবেন তা "ক্ষুধিত পাষাণ"-এ। গল্পের যিনি নায়ক, বরীচের বাজারে তুলার মাশুল-আদায়কারী শুস্তার শুষ্ক বালুতীরবর্তী শা-মামুদের পরিত্যক্ত প্রাসাদবাসী সেই বাঙালী ভদ্রলোকটি,—কেরাণীই। সারাদিন কলম চালিয়ে এসে যখন সে সূর্যাস্তের পর, নিস্ফল কামনার অভিশাপে অভিশপ্ত সেই প্রাসাদে প্রবেশ করে, তখন সে হয়ে ওঠে

শত শত বৎসরের পূর্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি ব্যক্তি; জড়িয়ে পড়ে একটা নেশার জালের মধ্যে; তাকে ঘিরে সেই বিজন প্রাসাদের বিস্তীর্ণ কক্ষগুলিতে বিস্তৃত হয় এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল। তার পর সকাল হ'তেই সে-জাল যায় খুলে; বাইরে রাস্তায়, পাগলা মেহের আলি চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে —"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। সব ঝুট্ হ্যায়।" কেরাণী জীবনের ঝুটা রোমান্স এম্নি করেই ভাঙ্গে বটে—রূঢ় আলোকে।

"চোখের বালি"তে দেখি বিহারী যখন বিনোদিনীর কাছ থেকে পালিয়ে এসে "নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতেছে", তখন "কলিকাতার দরিদ্র কেরাণীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে।" কবি লিখছেন—"গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলিনিবাসী অল্পাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরাণীর বঞ্চিত জীবন সেইরূপ।—সেই বিবর্ণ কৃশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।"

শুধু কেরাণীজীবনের দুঃখকষ্টই যে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছে তা নয়; তার অন্য দিকটা,—যেখানে শত দুঃখের মধ্যেও হাসি উঁকি মারছে, সে দিকটারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন। মনে পড়ে কি "গোরা"তে মহিমের আপিষের ডালকুত্তার মতো নতুন বড় সাহেবের কথা,—খবরের কাগজে যার নামে চিঠি বেরিয়েছে ব'লে মহিমকেই তার লেখক ব'লে সন্দেহ ক'রেছে এবং সন্দেহটা ঠিকই করেছে!.........

আর নয়; এবার শেষ করা যাক; তা না হলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা আছে। রবীন্দ্রনাথের চোখে কেরাণীর পরিচয় আপনাদের একটু দিতে পেরেছি আশা করি। কিন্তু ভুল করবেন না; এ-পরিচয় তাঁর কথাসাহিত্যের অত্যন্ত আংশিক পরিচয়মাত্র; আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যই আমি তাঁর গল্প উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ* সংগ্রহ করে দিয়েছি মাত্র।

আর একবার আমার এই অসম্পূর্ণ অভিভাষণের গোড়ার কথায়, আপনাদের অনুমতি পেলে, ফিরে যাই। আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ধর্তাই-বুলির জালে বাঁধা পড়বেন না, তথাকথিত "বামমার্গী" সাহিত্যিকদের সমালোচনায় বিভ্রান্ত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের—সম্পূর্ণ মানুষের—কবি, মতবাদের কবি নন; মানুষের যা কিছু ভাল বা মন্দ, দ্বন্দ্ব সন্দেহ, আশা আকাঙ্খা, সার্থকতা ব্যর্থতা সব রূপ নিয়েছে তাঁর রচনায়—তাঁর কবিতায়, গল্পে গানে।

> "আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার
> যত উঠে ধ্বনি
> আমার বাঁশির সুরে, সাড়া তার
> জাগিবে তখনি।

মন তাঁর চির চঞ্চল, "সুদূরের পিয়াসী"; সে চিরদিনই বলেছে "হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"। স্থিতিতে তাঁর বাসা নয়, স্থানুতে তাঁর আস্থা নেই। তাই আজ একাশী বৎসর বয়সে, জরা যখন এসে আক্রমণ করেছে দেহ,—তখনও অনন্ত প্রাণবেগবান কবি নূতন ধরিত্রীর আগমন-প্রত্যাশায় অধীর। শুনুন তিনি কি ব'লছেনঃ—

> "এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
> বীভৎস তাণ্ডবে
> এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,—
> মানব তপস্বী-বেশে
> চিতা-ভস্ম-শয্যাতলে এসে
> নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
> স্থান লবে নিরাসক্ত মনে;
> আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
> ঘোষিছে কামান।"

সেই সৃষ্টির আহ্বানে আসবে কারা? যারা শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলায় তারা নয়। কারা? কে?

> "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি—"

কবি তার, তাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কাদের জন্য? না, যারা—

> "চিরকাল—
> টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
> ওরা মাঠে মাঠে
> বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
> ওরা কাজ করে
> নগরে প্রান্তরে.........
> ওরা কাজ করে
> দেশে দেশান্তরে,
> অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
> পাঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে
> গুরু গুরু গর্জন গুণ গুণ স্বর
> দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি' দিন যাত্রা করিছে মুখর
> দুঃখসুখ দিবস রজনী
> মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
> শত শত সাম্রাজ্যের
> ভগ্ন শেষ 'পরে
> ওরা কাজ করে!"

এর পরেও কি মার্কসবাদী বলবেন—"দেখলুম না তো তাঁর রচনায় সে মানুষের স্বীকৃতি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ-জগৎ সৃষ্টি করবে"? (৫)

---

*রচনার কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই উদাহরণগুলি এখানে বর্জিত হোলো—লেখক।

(৫) "পরিচয়"—রবীন্দ্রসংখ্যা—'মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' —বসুধা চক্রবর্তী

গার্ড সনাতন হাজরা

শ্রীকরুণাময় বসু

কার্তিকের শেষ, অল্প শীত পড়িয়াছে। র‍্যাপারে আপাদমস্তক মুড়িয়া বেঞ্চেতে দিব্য সটান শুইয়া আছি। ট্রেন শ্যামবাজার ছাড়িয়া পাতিপুকুরের মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল,—ধীরে ধীরে পাতিপুকুর স্টেশন পার হইয়া গেল। অনুভব করিতে লাগিলাম দুই ধারের বিল ও মাঠের প্রান্ত-ভাগ হইতে শীতল বাতাস শিরশির করিয়া ট্রেনের কামরায় প্রবেশ করিয়া শরীরকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম শীতের পান্ডুর চাঁদ দিগন্তের কিনারায় প্রায় ডুবু ডুবু হইয়াছে; ম্লান জ্যোৎস্নার ছায়া বিলের জলে, পথের ধারে গাছপালার মধ্যে জড়াইয়া একটি রহস্য-স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, মনে হইতেছে যেন কোন বিরহিণী বিবর্ণ বেশে রাত্রির কুন্তল ছায়ায় মুখ ঢাকিয়া কাহার প্রতীক্ষায় সুদূরের পানে চাহিয়া আছে। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে; শীতের নিস্তব্ধ রাত্রি, পতঙ্গের ডাকও নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে; শুধু সময়ে সময়ে বনান্তরাল হইতে দুই একটি পেচক পাখা ঝটপট করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গাড়ি চলিয়াছে ধীরে ধীরে, হাসানাবাদ কখন পৌঁছিবে কে জানে! রাত্রি একটা হইতে পারে, পথের মধ্যে গাড়ির মেজাজ বিগড়াইলে কাল নাগাদ একটা হইতে পারে।

ঠিক যে ঘুম আসিতেছিল তাহা নয়; সমস্ত অবচেতনার মধ্যে কেমন যেন একটা অসাড় নির্জীবতা ধীরে ধীরে বিষের ক্রিয়া করিতেছিল; চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিয়াছে, চোখ মেলিয়া চাহিতে কষ্ট হয়, গাড়ির ঝাঁকানিতে সময় সময় তন্দ্রা ভাঙিতেছিল, আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া চোখ বন্ধ করিতেছিলাম, একটি অপরিসীম ক্লান্তি যেন সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ মনে হইল কে যেন ঠেলিতেছে।

উঠিয়া বসিলাম। চাহিয়া দেখি সম্মুখে গার্ড সনাতন হাজরা।

"মটকা মেরে থাকলে আমরা বুঝি; পঁচিশ বছর এই লাইনে কাটালাম, আমি আর চিনিনে ঘুম কাকে ব'লে? গার্ড সনাতন হাজরার চোখে ধুলো দেবে, এ লাইনে এমন কেউ আছে নাকি? হা, হা বুঝলেন না।"

নিতান্ত করুণ মুখে হাজরা মশাইয়ের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম ঘুমকে আপাতত বিদায় দিতে হইবে।

"শুনলেন না তারপর কী হ'ল? সেদিন ত' সব শেষ করা হয় নি। উপসংহারই যে এখনো বাকী, উপসংহারেই আমাকে সংহার করে গেছে ঘোষাল মশাই। বুকটায় হাত দিয়ে দেখুন দিকি?"

"থাক থাক আর দেখতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি বুকে আপনি নিদারুণ ব্যথা পেয়েছেন।"

ঝাড়িয়া মুছিয়া বেঞ্চের একধারে সনাতন হাজরা বসিল।

"এই নিন একটা সিগারেট, আমি কিনব সিগারেট, আপনি ক্ষেপেছেন মশাই! পুরোনো মান্থলী টিকিট দেখালে হাসনাবাদের এক আড়তদার হাতে হাতে ধরা পড়ে আক্কেল সেলামী দিলে মশাই। নগদ সাড়ে সাতাশ টাকার গার্ড আমি সনাতন হাজরা, আমি কিনব সিগারেট। হাঃ হাঃ, আপনি খান না বুঝি, বেশ বেশ!"

সনাতন হাজরার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। এ লাইনে সে পঁচিশ বৎসর টহল দিতেছে। সুতরাং আমাদের মতো উইকলী প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা থাকা খুব আশ্চর্য নয়।

কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে মন প্রসন্ন ছিল না, তবু হাসি মুখে বলিলাম, "তারপর বলুন মাই ডিয়ার গার্ড, আপনার হৃদয়বিদারক কাহিনী। ঘুম যখন ভেঙে গেল, শীগ্গির আসবে না বুঝতে পারছি। গল্পে গল্পে বেশ যাওয়া যাবে বাকী পথটা।"

"বললে বিশ্বাস করবেন না ঘোষাল মশাই, মালতী আমার জন্য পাগল হয়েছিল। আমার বয়স তখন কতোই বা এই পঁচিশ আর কি? চাকরীতে তখন প্রথম ঢুকেছি। আমারও জেদ ওই মেয়েকেই বিয়ে করব।"

বিগত যৌবন এই আধাবয়সী মানুষটির প্রথম যৌবনে একটি রোমান্টিক কাহিনী সত্যই ঘটিয়াছিল ইহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। যে কাহিনীর স্মৃতি মনের কিনারায় দাগ কাটিয়াছিল একদিন, সে দাগ হয়তো এতকালে মুছিয়া গিয়াছে। তবুও স্মৃতির জোয়ার মনের উপকূলে সময় সময় আঘাত করে,—এই রাত্রির রহস্য অন্ধকারে কেন জানি না গল্পের কাহিনীকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল না।

"ওদিকে হাঁ ক'রে চেয়ে কী দেখছেন? হ্যাঁ, তারপর শুনুন। কোন্ বাড়ি জানেন ত, বেড়াচাঁপা স্টেশনের গায়ে যে দোতলা বাড়ি পুব মুখো ওই বাড়ির দোতলায় তারা থাকত। সে আজ কতো কালের কথা, তবু মনে হয় কদিনই বা। এই গাড়িতে ত' কতো মেয়ে যাচ্ছে, কই বার করুন ত' তার মতো একটা সুন্দরী, চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ, এই চোখ এই মুখ......" দুই চক্ষু বড়ো বড়ো করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া সনাতন হাজরা বুড়ো আঙুল ঘুরাইয়া দেখাইল। পঁচিশ বৎসর আগে যে রূপসী তরুণী এই যৌবন অতিক্রান্ত লোকটিকে মোহ অভিভূত করিয়া-ছিল, সে রূপ সে সৌন্দর্য এতদিনে নিশ্চয় বিলুপ্ত হইয়া যাইত তবুও ইহার মনে পঁচিশ বৎসর আগেকার সৌন্দর্য-ময়ী মেয়েটি আজিও বাঁচিয়া আছে, কখন যে মেয়েটির বয়স বাড়িয়া গিয়াছে তাহাও সে জানে না।

"মালতী গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার টাকাও গেল ঘোষাল মশাই। কে নিয়েছে? নিয়েছে ওই বুড়ো ভুবন পালধি, মালতীর বাবা। কই বার করুক দেখি সেই আটশ টাকা। করকরে কাঁচা টাকা গুনে দিয়েছি হাতে, ফিরিয়ে দিক সে টাকা। আদায় করতে পারি কিনা বলুন ঘোষাল মশাই।"

হঠাৎ সনাতন হাজরা উঠিয়া দাঁড়াইল। "কে পড়ে গেল ঐ গাড়ি থেকে, পড়বার শব্দ শুনতে পেলাম।"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া আধো আলো-অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল, "না, কিছু না, হয়তো আমার মনের ভুল।"

"মালতীকে বিয়ে করে ফিরছি দেশে, দেভাটার ওদিকে কলমীডাঙা আমাদের গাড়ি। হা, হা, হা বুঝলেন না এই মার্টিনের গাড়িতে একেবারে ফাস্টো কেলাসে চড়িয়ে, কোম্পানীর পাশ পেয়েছিলাম কিনা। গাড়িতে আর কেউ ছিল না, সময় সময় ঘোমটার ভিতর দিয়ে মালতী আমার দিকে তাকাচ্ছিল, সে চাউনি আমার বুকে বিঁধে আছে ঘোষাল মশাই। চোখ বন্ধ করলে আজো যেন স্পষ্ট দেখতে পাই সেদিনের সেই ছবি। মালতী আমাকে ভালো-বাসেনি, শুভুরে একথা বলে।

গাড়িতে আর ত' কেউ ছিল না, আমি পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম, তোমার হার গড়িয়ে দেব লক্ষ্মী, দু'হাতে চারগাছা চুড়িতে কি মানায়, আরো চারগাছা দেব গড়িয়ে ডায়মণ্ডকাটা চুড়ি। কতো রকমের শাড়ি উঠেছে কলকাতায়, ফি মাসে একখানা করে এনে দেব। আরে কি বললাম জানেন ঘোষাল মশায়, তোমার জন্য আমি সব করতে পারি মালতী, একবার মুখ ফুটে বলো, আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ব।" দেখলাম একপ্রকার অদ্ভুত দুর্বোধ্য হাসিতে গার্ড সনাতন হাজরার মুখখানি ভরিয়া গিয়াছে।

তারপর, তাহার কণ্ঠস্বর সহসা ভারী হইয়া উঠিল, "ট্রেনের ঝাঁকুনিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছিল, বুঝলেন। একটু তন্দ্রার ভাবও আসছিল, হঠাৎ চেয়ে দেখি মালতী উঠে যাচ্ছে দরজার দিকে। দরজা তখন আধ হাত মাত্র বাকী। গাড়ি তখন বেশ জোরে যাচ্ছিল, বাধা দিতে যাবো ভাবছি, ততক্ষণে মালতী দরজা খুলে ফেলেছে। এক মুহূর্তের জন্য আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, সমস্ত শরীর যেন পলকের মধ্যে বিদ্যুতের ঝাঁকুনিতে অবশ হয়ে এসেছে, আমি চেঁচিয়ে বললাম, মালতী তুমি কি পাগল, তোমার প্রাণের ভয় নেই, দরজা খুলো না। ছুটে গেলাম ধরতে, গাড়িতে পা জড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে তার আগেই মালতী গড়িয়ে পড়ল নীচে।"

উত্তেজনায় সনাতন হাজরা দুই হাতে গলা চাপিয়া ধরিয়াছে, তারপর এক প্রকার অদ্ভুত আশ্চর্য হাসি। 'হা-হা-হা আমার মরণ নেই ঘোষাল মশাই, চোখের সামনে দেখলাম রক্তের ঢেউয়ের মধ্যে মালতী মরে যাচ্ছে; কানে এল, একটু জল; জল দিতে গেলাম, মালতীর ঠোঁট দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চারদিকে একবার তাকাল, মনে হ'ল কাকে যেন চাইছে। পাগলের মত মুখের কাছে মুখ এনে বললাম, কিছু বলবে আমাকে মালতী। মালতী একটা কথাও বললে না, দেখলাম দু'চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমিই মালতীকে মেরে ফেলেছি ঘোষাল মশাই। আমি যদি তাকে বিয়ে না করতাম, হয়তো সে মরত না। টাকা দিয়ে সব জিনিস কেনা যায়, মানুষের হৃদয় কেনা যায় না। আমি মূর্খ, ভালোবাসা চেয়েছিলাম লোভ দেখিয়ে, কিন্তু টাকা ত পথ আটকাতে পারল না। কেমন আমি বলেছিলাম না ঘোষাল মশাই মালতী তুমি একবার মুখ ফুটে বলো আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ব, আমি তাকে পথ দেখিয়েছিলাম সে চলে গেল। আমি তো গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়িনি, আমার সে সাহস কই? অন্ধকার পথের দিকে চাইলে আমার ভয় হয়, মনে হয় কে যেন তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চোখের পলক নেই, সে দৃষ্টি কী ভয়ঙ্কর, আমাকে ডাকে ইসারা করে।" হঠাৎ পাগলের মত সনাতন হাজরা চেঁচাইয়া উঠিল,—"ওই দেখুন ঘোষাল মশাই, কে যেন একটা মেয়ে গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে, রক্তমাখা দেহ, চুল বাতাসে উড়ছে, রাঙা চেলির আঁচল আকাশের মেঘে গিয়ে ঠেকছে। দেখুন, দেখুন।"

দেখিলাম সনাতন হাজরার শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চোখ পাকাইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছে।

আমি জোর করিয়া তাহাকে বেঞ্চের উপর বসাইলাম। "কী বাজে পাগলের মতো বকছেন, ঠাণ্ডা হ'ন। আপনি কি ক্ষেপেছেন?" ততক্ষণে ট্রেন বসিরহাট স্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। পথের ধারে লাইট পোস্টের আলো দেখা দিয়াছে। সারি সারি দোকানের বিচ্ছুরিত আলো, লোকজনের কোলাহল এক মুহূর্তে যেন এক রহস্য-পুরীর যবনিকা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিল। চোখের উপর যে স্বপ্ন-শরীরী এতক্ষণ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, পলকের মধ্যে সেই স্বপ্ন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, দিগন্তের কোন প্রান্তেও তাহার ক্ষীণতম আভাস পাওয়া গেল না। চাহিয়া দেখিলাম সনাতন হাজরা সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে, চোখের দৃষ্টি আর অস্বচ্ছ নয়, কেবল মুখ কিছু বিবর্ণ, মলিন। বলিলাম, "বসিরহাট এসে পড়ল যে। অন্য গাড়িতে চেক করবেন না? নিশ্চয়, নিশ্চয় চেক করব বৈকি? কোম্পানীর কাজ, বুঝলে না, টিকিট দেখি আপনার?" আমার টিকিট দেখিয়া ভদ্রতার লেশমাত্র না রাখিয়া বিনা সম্ভাষণে সনাতন হাজরা গাড়ি হইতে নামিয়া গেল। পরের শনিবারে বাড়ি যাইতেছি। মাথায় পুঁটলি দিয়া একটু গড়াইবার উদ্যোগ করিলাম। হঠাৎ শুনিলাম, "ও ঘোষাল মশাই শুনলেন না, তারপর কী হ'ল?" চাহিয়া দেখিলাম গার্ড সনাতন হাজরা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সার্ভান্তেস সাভেদ্রা

শ্রীকণাদ গুপ্ত

সমাজ এবং সাহিত্যের প্রকৃতি কতকটা ধনী বাপমায়ের আদুরে দুলালের মত! যখন ভাল পথে চলে, তখন বেশ; কিন্তু কুবুদ্ধিবশত একবার বিপথে যাবার বায়না ধরলে সে একেবারে অসহনীয়। তখন তার তালে তাল দিলে চলবে না; তাকে আদর দিলে ঠকতে হবে। এখন তার একমাত্র দাওয়াই শঙ্খমাছের চাবুক। পিঠে পড়লে নির্বাক আনুগত্য দিয়ে সে শাসন মেনে নেবে।

বিশ্বের সকল দেশেই এমন এক একটা যুগ আসে, যখন সমাজ এবং সাহিত্যের ঘাড়ে এই লক্ষ্মীছাড়া পাগলামী চাপে। কিন্তু সকল দেশে চাবুক জোটে না; শাসনকর্তার অভাব হয়। ইংরেজী সাহিত্যে যখনই প্রয়োজন হয়েছে, এই চাবুক মারার লোক জুটেছে। সুইফ্‌ট, বাট্‌লার, বার্নার্ড শ'র সেখানে অভাব হয়নি। আমাদের দেশেও ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু আজ বাঙলার বাজার ঘুরে আবেগপ্রধান সাহিত্যের অকারণ বাহুল্য দেখে মনে হয়, আজও চাবুকের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু মারে কে? তাই স্মরণ নিতে হচ্ছে তাঁকে, যিনি তাঁর কষার একটি মাত্র অব্যর্থ আঘাতে স্পেন-সাহিত্যকে বাস্তববর্জিত, কপট, ন্যাকামিগর্ভ সিভাল্‌রি কাহিনীর একাধিপত্য থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন—সেই সার্ভান্তেস্‌ সাভেদ্রাকে।

সার্ভান্তেস্‌ সাভেদ্রা—পুরো নাম বলতে গেলে, মিগুয়েল দা সার্ভান্তেস সাভেদ্রা—আজকের লোক নন্‌। তিনি জন্মান ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের নিকটবর্তী আলকালা নামক এক নগরে। তাঁর বাবা রদ্রিগো সার্ভান্তেস্‌ সুবংশজাত ছিলেন কিন্তু তাঁর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অর্থলাভের আশায় তাঁকে প্রায়ই শহর থেকে শহরান্তরে ঘুরে বেড়াতে হোত। এ অবস্থায় তিনি পুত্র-কন্যাদের সুশিক্ষা দিতে পারলেন না। অবশ্য পড়ুয়া হিসাবে সার্ভান্তেস্‌ও নিতান্ত ভাল ছেলে ছিলেন না। পাঠ্যপুস্তক পড়ার চেয়ে কবিতা রচনার দিকেই তাঁর মনোযোগ ছিল বেশী। মাদ্রিদের সিটি স্কুলে যখন তিনি ছাত্র, তখন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের তৃতীয় পত্নী ইসাবেলের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কয়েকটি শোকাত্মক কবিতা রচনা করেন এবং তা মুদ্রিতও হয়। অবশ্য কবিতা হিসাবে এগুলির কাণাকড়িও দাম নেই।

এর পর পড়াশুনো ত্যাগ করে এক ইতালীয়ান সম্ভ্রান্তের অনুচরের কাজ নিয়ে সার্ভান্তেস্‌ ইতালী গমন করেন। পরিশেষে বছর চব্বিশ বয়সে তিনি দেশীয় সৈন্যদলে যোগ দেন। এই সময় থেকে তিনি জীবনে যে সব অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেন, পশ্চাতে সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে সামান্য মিনমিনে কবি থেকে একজন শক্তিশালী বাগ্মবীর করে তুলতে সহায়তা করে।

খৃষ্ট-ধর্মী দেশগুলোর উপর টার্কির অটোমান্‌ সুলতান যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, পোপের অনুরোধে দ্বিতীয় ফিলিপ তার প্রতিরোধকল্পে এক সৈন্য বাহিনী পাঠান। সার্ভান্তেস্‌ এবং তাঁর অনুজ রদ্রিগো দু'জনেই এই বাহিনীতে থেকে নানান্‌ জায়গায় যুদ্ধ করেন। যতদূর জানা যায়, এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন কিছুই রচনা করেন নি। বছর কয়েক গোরার জীবন যাপন করে গৃহে ফেরবার পথে কতকগুলি মুর দস্যু তাঁদের জাহাজ আক্রমণ করে, তাদের পরাজিত করে, বন্দী করে এবং ক্রীতদাস করে। তাঁর এই সময়কার অভিজ্ঞতার খবর আমরা পাই 'আলজিয়ার্সের কয়েদী'তে এবং 'ডন কুইক্সোটে'র 'বন্দীর কাহিনী' নামক একটি অধ্যায়ে। পাঁচ বৎসর পরে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে তবে দুই ভাই মুক্তিলাভ করেন।

বাড়ি ফিরে সার্ভান্তেস্‌ দেখলেন ধনাগার শূন্য। মুক্তির মূল্য দিতে গিয়ে তাঁর বাবা ফতুর। তাই অর্থার্জনের জন্য এই প্রথম তিনি পেশা হিসাবে কলমসেবার দিকে নজর দিলেন। মাদ্রিদ তখন—শুধু মাদ্রিদ নয়—ইউরোপের সকল দেশের রাজধানীই—কলম-সেবীদের আড্ডা। তখন রেনেশাঁসের যুগ। জ্ঞান, সংস্কৃতি, ললিত কলার উৎকর্ষের যুগ। ইংলন্ড এই যুগেই সেক্ষপীয়রের জন্ম দেয়। এই সময় ইউরোপের ধনী দরিদ্র, জমিদার কৃষক সকলেরই লোভ হোত কবি হবার। সার্ভান্তেস্‌ও দিন কতক কবিতা চালাবার চেষ্টা করেন। কোন কাজের হয় না। অতঃপর তিনি প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করলেন—লা গালাতিয়া।
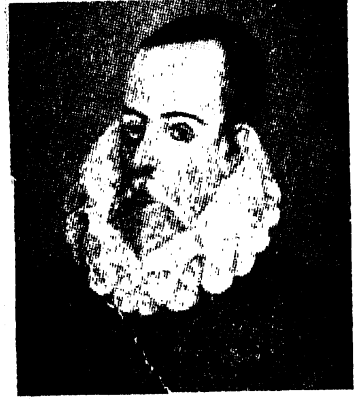
১৬০০ সালে অঙ্কিত সার্ভান্তেস সাভেদ্রার ৫৩ বৎসর বয়সের প্রতিকৃতি। ১৯১১ সালে এই ছবিটি সংগ্রহ করিয়া রয়াল স্প্যানিশ একাডেমীতে রাখা হইয়াছে

অসির অভিজ্ঞতা নিয়ে মসী ধরলেও 'লা গালাতিয়া'য় অসির ঝনৎকার বিশেষ শোনা গেল না। এটি একখানি প্যাস্টোরাল উপন্যাস। লেখকদের মধ্যে এ দোষ প্রায়ই দেখা যায় যে, নিজেদের প্রতিভার গতি সম্বন্ধে তাঁদের কোন সম্যক ধারণা নেই। সার্ভান্তেসেরও এই ধারণা ছিল না। ব্যঙ্গবর্ষী লেখায় তাঁর লেখনীর অসাধারণ পটুতা থাকলেও তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবন সুরু করলেন প্যাস্টোরাল উপন্যাসের লেখক হয়ে। অবশ্য তাৎকালীন ইউরোপে প্যাস্টোরাল উপন্যাসের প্রচলনও ছিল বেশী। একটি বন থাকবে, সেখানে বাস্তব জীবনের হুড়াহুড়ি থাকবে না, কতকগুলি রাখাল রাখালী থাকবে, তারা প্রেম করবে, নিজেদের সুখদুঃখের কথা কইবে, দর্শনের বুলি আওড়াবে, কবিতা পড়বে—তখনকার রেওয়াজই ছিল এই ধরণের উপন্যাস লেখা। যেমন সিড্‌নির 'আরকেডিয়া', স্পেন্‌সারের 'সেফার্ডস্‌ ক্যালেণ্ডার', দার্ফের 'আস্ত্রি' প্রভৃতি।

উপরি-উক্ত বইগুলোর মতই কতকগুলি রাখাল-রাখালীর বিযুক্ত প্রেমকাহিনীকে একসঙ্গে সেলাই করেই 'লা গালাতিয়া'র সৃষ্টি। প্রথমেই আমরা খবর পাই এলসিও তাগাসা নদীর তীরে গালাতিয়ার প্রেমে পড়েছে। তার পর জুটল তার প্রতিদ্বন্দ্বী এরাস্ত্রো। এরা দু'জনে হাত থাকতেও মুখোমুখী বিবাদ করছে, এমন সময় লিসানদ্রো তাদের সামনে একজনকে হত্যা করল। কি কারণ? সুরু হোল লিসান্‌দ্রোর কাহিনী। কতু[illegible] মিও জুলিয়েতে'র

কাহিনীর মত। তারপর এলেন ভাগ্যহীনা তিওলিন্দা। চলল তাঁর হতাশ প্রেমের কাহিনী। আমাদের ভাগ্য ভাল শেষ হবার পূর্বেই দিন শেষ হোল।

এইভাবে চলেছে প্রেমকাহিনীর পর প্রেমকাহিনী। একঘেঁয়ে, বিশেষত্বহীন। এই ধরণের কৃত্রিম উপন্যাস লেখার দুর্মতি কেন যে সার্ভান্তেসের হয়েছিল, ভেবে পাওয়া কঠিন। তবে তাঁর অতুলনীয় বর্ণনাশক্তির কিছু কিছু পরিচয় এইখানেই পাওয়া যায়।

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে সার্ভান্তেস্ বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম কাতালিনা দ্য পালাসিও সালাৎসার ভসমেডায়ানো। নামের বহর দেখে অনেকে মনে করতে পারেন, ইনি কোন লাট-বেলাটের কন্যা। তা নয়। সামান্য গ্রাম-দুহিতা। তবে ইনিই নাকি 'লা গালাতিয়া'র গালাতিয়া।

'লা গালাতিয়া'র অসাফল্যে সার্ভান্তেস্ প্যাস্টোরাল উপন্যাসের উপর চটে গেলেন। কিন্তু ছাড়া ছাড়া কয়েকটা ব্যঙ্গ কবিতা ছাড়া বৃহৎভাবে ব্যঙ্গমূলক কিছু লেখার কথা এবারও তাঁর মনে হোল না। অর্থার্জনের জন্য তিনি নাটক লেখার চেষ্টা করলেন। মাদ্রিদে তখন নাটক ও নাট্যকারের যেমনি চাহিদা, তেমনি ছড়াছড়ি। এঁদের আচার্য ছিলেন লোপে দ্য ভেগা। তাঁকে অনুসরণ করে সার্ভান্তেস্ কতকগুলি নাটক লেখেন। তাঁর সৌভাগ্য সেগুলি অভিনীতও হয়। কিন্তু এদের মধ্যে যে দুইখানি অবশিষ্ট আছে, সেই দুখানি পাঠেই উপলব্ধি হয়, নাটক হিসাবে সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীরও নীচে।

যে দুখানি আজও পাওয়া যায়, তাদের নাম 'পিকচার্স অফ্ এলজিয়ার্স' এবং 'নুমান্সিয়া'। নাটক হিসাবে প্রথমটি একেবারেই অবস্তু আলোচনা নিষ্ফল। দ্বিতীয়টি সার্ভান্তেসের ভক্তেরা দাবী করেন, পৃথিবীর একখানি সেরা নাট্যগ্রন্থ। এতে জাতীয়তামূলক কয়েকটা দৃশ্য এবং উক্তি আছে, যা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। রোমক হাতে নুমান্সিয়া অবরুদ্ধ হলে পুরবাসীরা কি অদ্ভুত সাহস, তেজ, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল —তাই এই নাটকের বিষয়। খুব সম্ভব কোন প্রচলিত জাতীয় গাথা থেকে সার্ভান্তেস্ এর আখ্যানভাগ নিয়েছিলেন। কিন্তু মূল আখ্যানভাগের সুবিস্তীর্ণ পটভূমি যে নাটকের প্রয়োজনে অনেকখানি ছোট করে নিতে হয়, এ বুদ্ধি তাঁর হয় নি। ফলে সমস্ত নগরবাসীরাই হয়ে উঠেছে নাটকের নায়ক এবং ব্যক্তি-চরিত্রের চেয়ে সমষ্টির ভাবই নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে বেশী।

নাট্যকলায় নিজের শক্তিহীনতার পরিচয় পেয়ে সার্ভান্তেস্ ও প্রচেষ্টা তখনকার মত ত্যাগ করেন। বৃদ্ধ বয়সে এ সখ তাঁর আর একবার হয়েছিল। তখনও কতকগুলি নাটক তিনি লেখেন। কিন্তু সেগুলিও সমান অবস্তু।

এর পর সার্ভান্তেস্ দিনকতক গভর্নমেন্টের কমিশারীর কাজ করেন। এবং এই সূত্রে টাকার গোলমালে পড়ে একবার জেলও ঘুরে আসেন। শুনা যায়, এই জেলেই নাকি 'ডন্ কুইক্সোটে'র পরিকল্পনা হয়।

'ডন্ কুইক্সোটে'র পূর্বে উপন্যাস সাহিত্য সম্বন্ধে স্পেনের জনসাধারণের রুচি বেশ একটু বিকৃতই ছিল বলতে হবে। কাল্পনিক নাইটদের আজগুবি বীরত্ব কাহিনী—এই ছিল সকলের পছন্দ। কেতাবের এই সব ভবঘুরে নাইটেরা এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন পথে পথে। হরবখত এঁরা দেখা পেতেন খাপসুরত রমণীর। তাঁরা পড়তেন বিপদে, এঁরা পড়তেন তাঁদের প্রেমে, তাঁদের জন্য লড়তেন ডুয়েল এবং এমন সব ভারী ওজনের স্বার্থত্যাগ করতেন, যা শুধু মোক্ষ লাভের জন্য সিদ্ধার্থই পেরেছিলেন বলে শোনা যায়। বাস্তবজীবনের সঙ্গে এই সব রোমান্সের সম্পর্ক থাকত না এতটুকু। সত্যকার সমাজকে বিম্বিত করার চেষ্টা থাকত না এতটুকু। শুধু যা অলীক এবং আজগুবি, তাই নিয়েই ছিল এদের কারবার। তবু স্পেনের আপামর জনসাধারণ এই সব সিভালরি কাহিনীগুলিকে গিলত—নববঙ্গের ছেলেমেয়েরা যেমন রোমাঞ্চ সিরিজের ডিটেকটিভ্ উপন্যাসগুলিকে গেলে।

অবশ্য যাঁরা মনস্বী, তাঁদের অনেকে এই ধরণের উপন্যাসের উপর চটা ছিলেন। এঁদের জন্য মনস্তত্ত্বমূলক, জোরালো, বাস্তববাদী সাহিত্য—ইতিমধ্যে যার আবির্ভাব এবং অভ্যর্থনা ইউরোপের অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই হোয়ে গিয়েছিল—স্পেনে মোটেই ঠাঁই পাচ্ছিল না। সার্ভান্তেস্ তাই সাধারণের এই বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে মনস্থ করলেন।

সিভালরি কাহিনীর বিষ ক্ষয় করবার জন্য সার্ভান্তেস্ও সিভালরি কাহিনী লেখাই প্রশস্ত মনে করলেন—তবে সত্যকার নয়, ব্যঙ্গের। এর নায়ক খাড়া করলেন এক উনপঞ্চাশী প্রৌঢ়কে। সিভালরি কাহিনী পড়ে পড়ে এই প্রৌঢ়কে উনপঞ্চাশে ধরল। এর মগজে কেবল ঘুরতে লাগল উপন্যাসের নাইটদের কথা, তরোয়াল নিয়ে ডুয়েল লড়ার কথা, পথিমধ্যে বিপন্না রমণীকে উদ্ধার করার কথা, একক শত শত্রু বিনাশ করার কথা। অবশেষে তাঁর ধারণা হোলো কেতাবের ঐ সব আজগুবি ঘটনা কাল্পনিক নয়, সত্য—ইতিহাসের চেয়েও বেশী সত্য। তখন তার খেয়াল হোল সে নিজেও নাইট হবে, দেহে বর্ম চাপিয়ে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে কেতাবী নাইটের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াবে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সন্ধানে—নারীকে রক্ষা ক'রে, দুষ্টকে দমন ক'রে, অন্যায়কে শাসন করে। কি মহৎ আদর্শ! প্রৌঢ় তার নিজের নাম 'এলনসো কুইক্সানো' বদলে 'লা মান্সার ডন্ কুইক্সোট' নাম অবলম্বন করলে এবং জুলাইয়ের এক রৌদ্র প্রখর দ্বিপ্রহরে এই পাগল নাইট পুঙ্গব পথে বেরিয়ে পড়লো এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে।

ডন্ কুইক্সোটের প্রথম এ্যাডভেঞ্চার জুটলো পথিপার্শ্বস্থ এক পান্থবাসে। পান্থবাস দেখেই তার মনে হোল এ সেই সিভালরি উপন্যাসের দুর্গ। মালিককে মনে হোল দুর্গরক্ষক এবং স্ত্রীলোকদের মনে হোল রাজকন্যা। সিভালরি দেখানোর এই ত সুযোগ। কিন্তু মনে পড়ে গেল, নাইটধর্মে শাস্ত্রমত দীক্ষা নেওয়া হয়নি। পাকড়াল পান্থবাসের মালিককে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। ধূর্ত মালিক রাজী হোল। বিপুল আয়োজনের মধ্যে ডন্ কুইক্সোট শাস্ত্রমত নাইট হবার অধিকার পেল।

এর পর প্রথম অভিযানে আর দুটি এ্যাডভেঞ্চার—এক কৃষকের সঙ্গে এবং আর এক, জনকতক ওলন্দেজ দেশীয় বণিকের সঙ্গে। লামান্সার রাজ্ঞী ডালসিনিয়া যে রূপে অপ্সরী, এ কথা তারা কিছুতেই স্বীকার করবে না। পরন্তু তারা রাজ্ঞীকে নিয়ে ঠাট্টা করল। বীর নাইট ডন্ কুইক্সোটের আর সহ্য হোল না। তরবারি নিয়ে তাদের শাস্তি দিতে গেল। এমন সময় বিশ্বস্ত অশ্ব রোসিনান্তে হোঁচট খাওয়ায় বীরের অবস্থা হোল পপাত ধরণীতলে। বণিকেরা তার বর্শাটি ভেঙে দুঘা উত্তম মধ্যম দিয়ে প্রস্থান করল। তখন ডন্ কুইক্সোট তার পড়া কোনও সিভালরি কাহিনীর নায়কের কথা মনে করল—যার অবস্থার সঙ্গে তার বর্তমান অবস্থার বেশ একটু মিল আছে। এই মিল পেয়ে তার মন খানিকটা সান্ত্বনা পেল। তারপর সেই কেতাবী নায়কের মত মাটীতে গড়িয়ে গড়িয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলোঃ

> প্রাণের প্রেয়সী মোর, আমার এ দুখপাতে
> দুখ কি লাগে নাক তোর?
> আমার এ দুখকথা নাহিক জানা তার
> জানিলে অসতী সে ঘোর। —ইত্যাদি।

এমনিভাবে চীৎকার করছে। এমন সময় সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার গ্রামের এক কৃষক তাকে দেখতে পেয়ে তার গাধায় তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলে।

এই প্রথম যাত্রায় আমরা শুধু কয়েকটা হাস্যকর ঘটনা পাই—যেসব ঘটনা ডন কুইক্সোটের ক্ষেপামীর স্বাভাবিক ফল। কিন্তু হাসির জন্য কৃত্রিম ঘটনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী নয়। বিশ্বের সঙ্গে এতদিনের পরিচয়ে সার্ভান্তেস্ জেনেছেন, এই পৃথিবীর বুদ্ধিহীন বা অতিবুদ্ধি মানুষের সকল কাজই হাস্যকর—মূলে তার যত গাম্ভীর্যই থাকুক না কেন। এই হাসি বিলোবার জন্য তিনি ডন কুইক্সোটের পাগলামীকে করলেন মুখর। তার সঙ্গী হিসাবে জুটিয়ে দিলেন এক সরল নিরীহ কৃষক—সাঙ্কো পাঞ্জাকে। নাইট ডন্ কুইক্সোট একজন স্কোয়ারের অভাব বোধ করল। সে সাঙ্কোকে বলল, এ্যাডভেঞ্চার করতে করতে একদিন কোন্ না একটা দ্বীপ জয় করা যাবে। তখন সেই দ্বীপের লাটসাহেব ত ঐ সাঙ্কোই হবে। অনভিজ্ঞ, ঐহিকবুদ্ধিসম্পন্ন সাঙ্কো লোভে

ডন কুইক্সোট ও সাঙ্কো পাঞ্জা : মাদ্রিদ নগরীর একটি প্রধান রাস্তায় এই মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে

নিরীহ সহজ বুদ্ধির লোক; তার আশা একদিন লাট হবে। যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা ডন্ কুইক্সোট করছে তার আদর্শ পাগল মন দিয়ে—শুনলে হাসি পায়। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্কো তার চাষার বুদ্ধি নিয়ে প্রভুর ব্যাখ্যার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছে—অবশ্য কাজে আসছে না কিছুই। না আসুক—ফলে যে রঙের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে—যে কনট্রাস্ট্—তাতে পরস্পর পরস্পরকে উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করছে। বাস্তবিক পাঠকের মনে ডন্ কুইক্সোটকে অমর করে রেখেছে সাঙ্কো। সাঙ্কোকে অমর করে রেখেছে ডন্ কুইক্সোট।

অবশ্য ডন্ কুইক্সোটের চারিত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে গিয়ে সাঙ্কোর মাথায়ও খানিকটা ছিট রাখতে হয়েছে বৈকি। তার সহজবুদ্ধির আতিশয্যই তার ছিট। তা নইলে ডন কুইক্সোটের মত পাগলা নাইটের কথায় সে অত বেশী গুরুত্ব আরোপ করত না।

একটা উদাহরণ ধরা যাক্। পথ চলতে চলতে এক পাল লোভে রাজী হয়ে স্ত্রীপুত্র ফেলে ডন্ কুইক্সোটের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল—তার গাধা ড্যাপ্‌লের পিঠে চড়ে। সাঙ্কো-চরিত্র সত্যই প্রতিভার সৃষ্টি। মানুষ হিসাবে সাঙ্কো ডন্ কুইক্সোটের একেবারে বিপরীত। ডন্ কুইক্সোট পরোপকারী পাগল; তার খেয়াল ত্যাগী বীরের জীবনযাপন করবে। আর সাঙ্কো ভেড়াভেড়ী দেখে ডন্ কুইক্সোটের ধারণা হোল ওগুলো তার বইয়ে পড়া নাইট আর দৈত্য। কে কোথাকার নাইট বা দৈত্য বই অনুযায়ী সে সব পরিচয় সে সাঙ্কোকে দিতে লাগল। সাঙ্কো বললে, নাইট বা দৈত্য ছেড়ে দিয়ে কোন মানুষও ত দেখতে পাচ্ছি না, সেনর। হয়ত আপনার চোখের ভুল বা মায়া। ডন্ কুইক্সোট বললে, কি বলছ সাঙ্কো। তুমি অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, ভেরীর নিনাদ, ঢক্কার গর্জন—কিছুই শুনতে পাচ্ছ না? ভেড়া-ভেড়ীর বিপুল ব্যা ব্যা শব্দ ছাড়া আর ত কিছুই শুনতে পাচ্ছি না—জবাব দিল সাঙ্কো। সাঙ্কো, তুমি ভয় পেয়েছ—ডন্ কুইক্সোট তখন বললে—তাই দেখতে শুনতে ভুল করছ। কারণ, আতঙ্কের একটা ফল হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে জড় করে বস্তুকে উল্টোপাল্টা করে দেখানো। সরে দাঁড়াও—যুদ্ধ করলে আমার পক্ষকে আমি একাই জিতিয়ে দিতে পারি। এইসব বলে ডন্ কুইক্সোট ঘোড়া ছুটিয়ে ভেড়ার পালে গিয়ে পড়ল, আর সাঙ্কো চীৎকার করতে লাগল, ফিরে আসুন, ফিরে আসুন! আপনি ভেড়া-ভেড়ীর পাল আক্রমণ করছেন। বাব্বাঃ, এ কি পাগলামির পাল্লায় পড়া গেল!

আর একবার গাধার পিঠে চড়ে এক নাপিতকে রৌদ্র আটকাবার জন্য মাথায় গামলা চাপিয়ে আসতে দেখে ডন্ কুইক্সোট ভাবলে, ওর মাথায় মামব্রিনোর মুকুট। বয়ার্দোর উপন্যাস 'অরল্যান্ডো'য় পাওয়া এক মুর রাজার নাম মামব্রিনো। ডন্ কুইক্সোট বললে, ওই মুকুটটি পাওয়ার সাধ আমার অনেকদিনের। সাঙ্কো বললে, আমি সরে দাঁড়াই। নাপিত কিন্তু 'যঃ পলায়তি স জীবতি' পন্থা নিল। গামলা দেখে সাঙ্কো বললে, দামী পাত্র। ডন্ কুইক্সোট যখন বললে, মুকুট, সাঙ্কো হাসি চাপতে পারল না। ডন্ কুইক্সোট জিজ্ঞাসা করলে, হাসছ কেন? সাঙ্কো তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, এই ভেবে যে, যাঁর মাথায় এই মুকুট ছিল, তাঁর মাথাটি না জানি কত বড়! কারণ, মুকুটটি দেখতে ঠিক নাপিতের পাত্রের মত।

এইসব উদাহরণ আর নানাস্থানের সংলাপ থেকে বোঝা যায়, নাইট আর স্কোয়ার আসলে কত বিপরীতমুখী। বস্তুত, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ডন্ কুইক্সোট আর সাঙ্কোকে যোগ করলে বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীকে ঢেকে দেওয়া যায়। টুর্গেনিভ্ ডন্ কুইক্সোটকে মানুষ চরিত্রের একটা টাইপ আখ্যা দিয়েছেন। ঠিক। কিন্তু সাঙ্কোও ঠিক তেমনি একটা টাইপ। যুগে যুগে কতকগুলি লোক যেমন বরাবর জন্মাবে, যাদের আঙুল দেখিয়ে বলা যাবে, এরা ঠিক পাগলা নাইটের মত, আর কতকগুলি লোক সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি নিঃসঙ্কোচে বলা যাবে, এরা স্কোয়ার সাঙ্কোর মত।

প্রথম খণ্ড লেখার দশ বৎসর পরে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সার্ভান্তেস ডন কুইক্সোটের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ডে একঘেয়েমি ভাঙবার জন্য অনেকগুলি অবান্তর গল্প ছিল। শুধু ডন্ কুইক্সোট আর সাঙ্কো—ঘটনার ভাগ অনেক কম, বিদ্রুপবর্ষী সংলাপের ভাগ বেশী। তবু যে সব ছোট ছোট চরিত্র সেখানে আনা হয়েছে, সেগুলি চরিত্র হিসাবে সম্পূর্ণ। এইজন্য বুদ্ধি প্রধান ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয় খণ্ডের আবেদন বোধ করি প্রথম খণ্ডের চেয়েও বেশী।

ডন কুইক্সোট সিভালরির সাহিত্যের মৃত্যুবাণ। কিন্তু সেইটাই ওর সবচেয়ে বড় কথা নয়। ডন্ কুইক্সোট স্পেন সাহিত্যে বাস্তব-বাদের ভিত্তি স্থাপন করল। কিন্তু সেও ওর প্রধান কথা নয়। ওর মুখ্য গর্ব, ও একজন বড় আর্টিস্টের বড় সৃষ্টি। কল্পনার বিস্তৃতিতে, ঘটনা সন্নিবেশের চাতুর্যে, দৃষ্টির গভীরতায়, চরিত্র সৃষ্টির সার্বজনীনতায়, সংলাপের প্রাচুর্যে ডন কুইক্সোট স্পেন সাহিত্যে ত অতুলনীয়ই, বিশ্ব সাহিত্যেও কদাচিৎ তুলনীয়। মহাকাব্য লিখে অনেকে অমর হয়েছেন। ডন কুইক্সোট মহাকাব্য নয়। কিন্তু মহাব্যঙ্গ কাব্য বলে সাহিত্যে যদি কোনও একটি বিশেষ শ্রেণী থাকত, ডন কুইক্সোট তার শীর্ষস্থান অধিকার করত নিঃসন্দেহে।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পূর্বে সার্ভান্তেস সাভেদ্রা আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন—শ্রেষ্ঠত্বে যা ডন্ কুইক্সোটের পাশাপাশি

দাঁড়াতে পারে। "এক্সেমপ্লারি নভেলস্"। কল্পনার প্রসারে ডন্ কুইক্সোট যেখানে, লিপিচাতুর্যে 'এক্সেম্প্লারি নভেলস' সেখানে। এর বারোটি গল্পের কতকগুলি নেওয়া কল্পনা থেকে, কতকগুলি বাস্তবজীবন থেকে। বোকেসিওর "ডিক্যামেরনে"র কাহিনীগুলির সঙ্গে এই গল্প কয়টির বেশ একটু সাদৃশ্য আছে। তবে সার্ভান্তেসের গল্পগুলিতে বোকেসিওর উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। সার্ভান্তেস সংযম ভালবাসতেন। এই পুস্তকের ভূমিকাতেই তিনি লিখেছেন, একটা কথা আমি সাহস করে বলি যে, আমার এই নভেল-গুলি পড়ে কোনও পাঠকের মনে যদি কু-ইচ্ছা বা কু-চিন্তা জাগে, তাহলে যে হাত দিয়ে এগুলিকে লিখেছি, সেই হাত কেটে ফেলব, তবু সাধারণ্যে এ বস্তু প্রকাশ করব না।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও সার্ভান্তেস কয়েকটা গল্পে বোকেসিওকে ছাড়িয়ে গেছেন। যেমন, 'লাইসেন্সিয়েট্ অফ দি গ্লাস' এবং 'কলোকী অফ দি ডগ্স্'। প্রথমটিতে, সালামাঙ্কার এক মেধাবী ছাত্র টমাস রোডাজা বিষের প্রকোপে পাগল হয়ে যায়। ডন কুইক্সোটের মত এও গারদে পাঠাবার মত পাগল নয়—খেয়ালী। এর খেয়ালী উক্তির দরুণ এর চারপাশে সমাজের নানা স্তরের জীব জড় হয়। সার্ভান্তেস তাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখাবার সুবিধা পান। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর ওষুধে পাগল ভাল হয়ে যায়। তখন আর তার শ্রোতা জোটে না। সে ফ্লান্ডার্সে সৈন্য হয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করে। এই গল্পের অভিনব পদ্ধতি একেবারে আধুনিক বললেও চলে।

'কলোকী অফ্ দি ডগস্' দুই কুকুর বার্গানজা এবং সিপিয়'র সংলাপ। পূর্বজীবনে কোন্ কোন্ মনিব এবং কি প্রকৃতির মানুষের সংস্পর্শে সে এসেছিল, বার্গানজা তারই বিবরণ দিল। তদনীন্তন স্পেন সমাজের পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র এতে পাওয়া যায়। তলায় তলায় তরল হিউমারের ফল্গু। এক্সেম্প্লারি নভেলস্ পাকা হাতের লেখা। কিন্তু ডনং কুইক্সোটের মত এর আবেদন সর্বজনীন নয়। এর প্রতিটি গল্পে স্পেনের মাটীর গন্ধ। সংক্ষেপতঃ, একে তদানীন্তন স্পেন সমাজের ঔপন্যাসিক ইতিহাসও বলা চলে।

সার্ভান্তেস্ শেষ নিঃশ্বাস ঐ যে আকাশ ওখানে যাইয়া ফেলেনা।

পূর্বে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ... পারনাসাস্'। ডন্ কুইক্সোটের মত এখানিও স্পেনের ...কৃত কাব রুচিকে ব্যঙ্গ করে লেখা। কিন্তু গদ্যের সে সাবলীল গতি ছন্দে মধ্যে নাই। আটখানি নাটকও লেখেন। কিন্তু এগুলিও পূর্বে দোষ থেকে মুক্ত নয়। একখানি রোমান্স লেখেন। সেখানি তেমন সুখপাঠ্য নয়।

ডন্ কুইক্সোটের বিরাট কীর্তির পাশে এইসব ছোটখ অসাফল্য বেদনাদায়ক না হলেও বিস্ময়কর। এই অসাফল্যের কার সার্ভান্তেসের সাহিত্যিক প্রতিভা বহুমুখী ছিল না। তি আসলে ছিলেন ব্যঙ্গবীর। কিন্তু তবু বিশ্বসাহিত্যের অন্যা ব্যঙ্গবীরের সঙ্গে তাঁর প্রভেদও আছে অনেকখানি। ব্যঙ্গে মূলে থাকে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা—সেই হেতু, ভাঙ তৃষা। যে লেখনী ভাঙে, সে লেখনী সহজে গড়ে না। কি সার্ভান্তেস গড়তেও পারতেন। না হলে, চিত্রগুপ্তের খাতায় ত সৃষ্টির পাশে বড় বড় হরফে 'অমর' নাম লেখা থাকত না। ত লেখনী ছিল ধ্বংশকারী; শুধু ভাঙাতেই তার পটুতা। কিন্তু ত আত্মা ছিল সৃষ্টিকারী, শুধু গড়াতেই তার সার্থকতা। তাই তি নৈরাশ্য নিশ্চিত জেনেও কবিতা লিখেছিলেন, নাটক রচনা ক ছিলেন, আবেগপ্রধান ঔপন্যাসিক হবার জন্য চেষ্টা করেছিলে অসফল হয়েছিলেন, কিন্তু তবু মরুপথে যে সব নদী ধারা হার তাদের মত তাঁর প্রচেষ্টাগুলিও ব্যর্থ হয়নি। 'ডন্ কুইক্সোট' 'এক্সেম্প্লারি নভেলস'এ ধ্বংশকারী লেখনী গঠনকারী আত্মার মিলন সাধিত হোল। ফু উঠলো কাঁটাভরা গোলাপ। এ গোলাপকে যাঁরা আল করে দেখেছেন, তাঁরা এর দাম দেন অনেক, বলেন অমূ কিন্তু যাঁরা সার্ভান্তেসকে একেবারে ছেঁটে দেন অবান্তর বো এঁদেরকে বলার কিছু নেই। শুধু এই স্মরণ বাণীটুকু বিনে সঙ্গে জানাতে হয় যে, 'ডন কুইক্সোট'কে বিশ্বসাহিত্যে অমর কর মূলে শুধু মাথাপাগলা নাইট ডন্ কুইক্সোটই নেই, আছেন স্ব সার্ভান্তেস্ সাভেদ্রাও।

এই প্রথম যাত্রায়

অমাবস্যার ভাষা

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

গৌরমোহন একদিন গ্রামের সকলকে বিস্মিত করিয়া পাশের বাড়ির বিভাবতীকে বিবাহ করিল। তার পিতার এই বিবাহে সম্মতি ছিল না বলিয়া তাদের অবস্থার অনুরূপ কোন ধুমধামই হইল না; না আসিল জেলার শহর হইতে যাত্রার দল, না পুড়িল আতসবাজী। যারা আশা করিয়াছিল জমিদার পুত্রের বিবাহে ভুরীভোজন হইবে, টাকাটা সিকেটা কাপড় জামা বখ্‌শিস্ পাইবে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাশ হইতে হইল।

বিভাবতীর বাবা একজন দরিদ্র গ্রাম্য পুরোহিত, অবস্থানুযায়ী উৎসবের সামান্য ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাছে জমিদার হরিপ্রসাদ বিরক্ত হন এই ভয়ে গ্রামের কেহ বড় একটা যোগদান করিল না। শীতের ম্লান জ্যোৎস্নায় একটি মাত্র সানাই করুণ সুর তুলিয়া রাত্রির কুয়াসাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

গৌরমোহনের মাতার আপত্তি ছিল আরও তীব্র। বিবাহের পরের দিন বর-কনের আসিবার সময় তাঁর মাথা ধরিল; তাই বধূবরণের ভার পড়িল এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার পর।

নব-বধূকে জল মিশানো দুধের পাত্রে দাঁড় করাইয়া সেই মহিলা বিভাবতীর চিবুক তুলিয়া বলিলেন, একবার মুখ তুলে চাও লক্ষ্মীটি।

লক্ষ্মীটি মুখ তুলিয়া চাহিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইস্—

ছোট এই শব্দটুকু শুনিয়া বিভা শিহরিয়া উঠিল। তার মনে হইল ঐ 'ইস' এর পিছনে যেন যত রাজ্যের অমংগল লুকাইয়া আছে।

একদিন এই বিভাবতী ছিল অপূর্ব সুন্দরী, তার ছিল ঢলঢলে আয়ত দুটি চোখ, তপ্ত কাঞ্চনের মতন বর্ণ, শান্ত উজ্জ্বল মুখশ্রী, সুগঠিত নিটোল গড়ন। লোকে বলিত, গরীবের ঘরে যেন রাজকন্যার জন্ম।

সে আজ এক যুগ আগের কথা, পাশের বাড়ির দুটি কিশোর কিশোরী গৌর ও বিভা, গৌরদের নাটমন্দিরে খেলা করিতেছিল। নিজের হাতে বাঁশের ধনুক বানাইয়া হোগলা চাঁছিয়া তীর তৈয়ারী করিয়া গৌর বিভাকে বলিল, দেখি কে ভাল তীরন্দাজ, তুমি না আমি।

একে অপরকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছোঁড়ে, বিভাবতীর তীরগুলি প্রায়ই মাঝ পথে পড়িয়া যায় আর গৌরের কোনটা যাইয়া লাগে বিভার হাতে, কোনটা বা বুকে। সুন্দরী বিভা খিল খিল করিয়া হাসে।

হঠাৎ সে বাঁ চোখটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবা রে।

গৌর রাগিয়া গেল, বলিল, এক চড় মারবো, শুধু শুধু চ্যাঁচাচ্ছিস্।

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল বিভার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের রেখা। তীরটা যাইয়া চোখের মণির পাশে বিঁধিয়াছিল।

গৌর ভয়ে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। পিতা তার পিঠে কয়েক ঘা চাবুক বসাইয়া দিলেন। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিল, ছেলেটার দুষ্টুমি হাড়ে হাড়ে, কেহ বা বলিল, বড়লোকের ছেলে, ওরা কি আর মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে?

কিন্তু অনুযোগ করিল না শুধু একজন।

বিভাবতী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিল, কয়েকদিন তাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। কিন্তু কেহ যদি বলিত, ছেলেটা কি দুষ্টু—মেয়েটির চোখ প্রায় নষ্ট করেছিল আর কি, তখনই বিভাবতী বলিত, ও ইচ্ছে করে করে নি, খেলতে খেলতে লেগে গেছে।

ঠিক এই সময় গৌরমোহন গ্রামের মন্দিরে মন্দিরে দেবতার জাগ্রত থোলায় যাইয়া মানত করিল, বিভার চোখ সারিয়ে দাও ঠাকুর।

কোন জায়গায় দুধ কলা মানিল, কোন জায়গায় পয়সা, কোথাও বা পাঁঠা। কিন্তু দেবতা প্রার্থনা শুনিলেন না, বিভা চোখ হারাইল, মুখখানা দেখিতে বিকৃত হইয়া গেল। পুরানো হইবার সংগে সংগে ব্যাপারটার আলোচনাও ক্রমে চাপা পড়িল।

(২)

গৌরমোহন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় আই এ পড়িতে গেল, আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করিল। চারিদিক হইতে প্রস্তাব আসিতে লাগিল বিবাহ সম্বন্ধের, সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী, অভিজাত বংশ, লোভনীয় বরপণ। তার পিতা দেশ দেশান্তরে মেয়ে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, মার নিকট আসিল পাত্রীদের ফটো।

এই সময় গৌরমোহন একদিন মাতার নিকট বলিয়া বসিল, সে বিভাকে বিবাহ করিতে চায়।

ঘরের মধ্যে একটা তাজা বোমা পড়িলেও মা হয়ত অতটা চমকিয়া উঠিতেন না।

তিনি কহিলেন, এ্যাঁ, তুই পাগল হয়েছিস্ গৌর?

তার চোখ খারাপ করেছে কে মা?

তুমি ত' ইচ্ছে করে করনি। দৈব চক্করে হয়ে গেছে।

গৌরমোহনের পিতা হরিপ্রসাদ স্ত্রীর নিকট সব শুনিয়া বলিলেন, বে'তে আবার ছেলের মতামত কি? ওসব চলে আপস্টার্ট ফ্যামিলিতে। গৌরকে বলে দিও রায় পরিবারে কোন বাঁদরামো চলবে না।

ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় শেষটায় বলিলেন, বেটাকে ত্যাজ্য পুত্তুর করব।

জননী পুত্রকে অনেককিছু বুঝাইলেন, চোখের জল ফেলিলেন।

বিভাবতীর পিতার সম্মতি লইতেও গৌরমোহনকে বেগ পাইতে হইল অনেকখানি।

তিনি বলিলেন, একী বলছ বাবা, একি কখনও সম্ভব?

গৌরমোহন বলিল, আপনি বিভার চোখের কথা বলছেন? সে ত আমি জানি, আর তার জন্যই এসেছি এই প্রস্তাব নিয়ে।

বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও, তোমার মন খুব উঁচু, কিন্তু—

এই কিন্তুর মধ্যে ছিল যত রাজ্যের সমস্যা।

হরিপ্রসাদ ধনী, দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। তাঁর নিকট এই প্রস্তাব লইয়া গেলে তিনি যে শুধু ক্ষমা করিবেন না তাহাই নয় হয়ত গ্রামে বাস করাই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব হইবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গৌরমোহনেরই জয় হইল, তার পিতা বলিলেন, আমার ছেলে, ও বেটা'ত একগুঁয়ে হবেই, যাক যা ইচ্ছে করুক।

কিন্তু জয়ের যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে গৌরমোহন তাহা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিল না।

শুভ দৃষ্টির মুহূর্তে বিভাবতীর আনত চোখের যতটুকু সে দেখিয়াছিল তাহাতেই নিজের অজ্ঞাতে তার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। বিভাবতী যে দেখিতে এতটা খারাপ হইয়াছে তাহা সে এতদিন লক্ষ্য করে নাই। বাঙালীর ঘরের মেয়ে বিভাবতী, তার কাছে স্বামীর মনের কথাটা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়িল।

আরম্ভ হইল এক অপূর্ব দাম্পত্য জীবন।

বিভাবতীর ফুলশয্যার রাত্রি—

কুয়াসায় ঢাকা চাঁদের মতন বিভাবতী বালিশে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া আছে। তার পিতার প্রেরিত সামান্য তত্ত্বের দু'একখানা পাত্র ও বিছানায় ছড়ানো ইতস্তত দু'চারটা ফুল ভিন্ন উৎসবের আর কোন চিহ্নই নাই।

পাশেই স্বামী শুইয়া, কিন্তু বিভাবতীর তার দিকে চাহিতে সাহসে কুলায় না! তার চোখ দেখিলে হয়ত সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইবে।

বিভাবতী ভাবে বিনা অধিকারে যে এই বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। এ সুখের লোভ তার সম্বরণ করা উচিত ছিল, উচিত ছিল আমরণ কুমারী অবস্থায় কাটাইয়া দেওয়া।

কেন সে আর একজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পথের কাঁটা হইল?

তার এই অবিমৃষ্যকারিতা, এই যে লোভ ইহার ফল চিরদিন তাকে ভুগিতে হইবেই, আর এই বিশাল পুরীর নিস্তব্ধতা যেন তারই পূর্বাভাস।

তার বাঁ চোখের উপরের সাদা দাগ আর মনির পাশের ডিম্বাকৃতি পদার্থটা যে সত্যই বড় কুৎসিৎ। আয়নায় দেখিলে যে তার নিজেরই ভয় করে। লোকেত তাকে শুনাইয়া বলাবলি করে, এমন রাজার ছেলে তার কিনা হল একটা কানা বউ—

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়।

বাহিরে শোনা যায় ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঝির ঝির করিয়া বাতাস আসে। বাহিরের দিকে চাহিলে মনে হয় কুয়াসায় ঢাকা ঐ যে আকাশ ওখানে যাইয়া জমাট বাঁধিয়াছে তার বুকের শত বেদনা।

ক্রমে ক্রমে ভাবিয়া ভাবিয়া মন আচ্ছন্ন হইয়া আসে। ছেলেবেলা এই বাড়িতে সে কত খেলাধূলো করিয়াছে, কিন্তু আজ মনে হয় এ এক অচিন পুরী, আর তার পাশে শায়িত স্বপ্নের এক রাজকুমার।

পাছে তার স্পর্শে গৌরমোহনের ঘুম ভাঙিয়া যায় এই আশঙ্কায় বিস্তৃত শয্যার এক পাশে নিজকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিল, জোরে নিশ্বাস নিতেও তার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। ফুলশয্যার রাত্রে নববধূর পক্ষে এ এক অপূর্ব অনুভূতি। তার আর পাঁচজন সখী সহচরীর নিকট সে এই রাত্রির যে বিবরণ শুনিয়াছে তার সঙ্গে নিজের এই অনুভূতির মিল নাই কোথায়ও। কিন্তু সে জানে তার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শেষ রাত্রের দিকে গৌরমোহনের ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে কহিল, তুমি যে এখনও ঘুমোওনি বিভা।

ঘুম আসছে না।

গৌরমোহন বিভাবতীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল, চেষ্টা করলেই আসবে।

স্বামীর স্পর্শে বিভাবতীর মনে একটা পুলকের সাড়া জাগিল কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। গৌরমোহন আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

কর্তব্য পালনের আত্মপ্রসাদেই গৌরমোহন কয়েকদিন মশগুল হইয়া রহিল। সে মহৎ, সে বড়, বড় না হইলে কানাকে কেহ কখনও বিবাহ করে?

বিভা ও তার সঙ্গে ঠিক সেইভাবেই ব্যবহার করিত। তার চাল-চলন, কথাবার্তা প্রত্যেক ভাবভঙ্গীতেই প্রকাশ পাইত যে সে অতি দীন, অত্যন্ত অনুপযুক্ত তার স্বামীর দাসী হইবার।

গ্রামের পাঁচজনে, বিশেষ করিয়া বন্ধুবান্ধবরাও বাহবা দিত, বলিত, এমন যুবক এ যুগে দুর্লভ।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপ্রসাদের নেশাও কাটিতে লাগিল।

আর বিভাবতী?

স্বামীর সামনে সে বড় একটা আসে না। চোরের মতন লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করে। কিন্তু তার যে নারীর মন, সে যে সত্য সত্যই স্বামীকে ভালবাসিয়াছে- এ ভালবাসাত আজকের নয়।

সে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দুর্ঘটনার দিন হইতে, যেদিন গৌরমোহনের নিক্ষিপ্ত হোগলার তীর যাইয়া তার চোখে বিঁধিয়াছিল। আজ সে পতিরূপেই তাকে পাইয়াছে কিন্তু এ পাওয়ার পিছনে আছে শুধু একটা বিরাট ফাঁকি। দোষ তার নয়, গৌরমোহনের নয়, অপরাধ ঘটনাচক্রের।

ভাবিতে ভাবিতে নিজের অজ্ঞাতসারে তার দুই গণ্ড

বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে, কখনও বা চোখের পাতা ফুলিয়া যায়।

(৩)

মাস দুয়েক পরের কথা।

একদিন বিভাবতীর ঘরের বারান্দা হইতে শাশুড়ী ডাকিলেন, বৌমা। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল একটা অপরিচিত কোমলতা।

বিভাবতীর উত্তর করার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধা ঘরে আসিয়া তার নিকটে বসিলেন। তারপর তার চুলের গোছা ধরিয়া বলিলেন, একী, চুলটাও বাঁধনি যে! নিজের উপর এতটা অযত্ন কেন, কিসের জন্য? দুঃখ তোমার কিসের? এই বাড়িঘর দাসদাসী সবইত তোমার।—

ঝিকে দিয়া জল আনাইয়া বধূর চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বৃদ্ধা অনেক প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিলেন, বলিলেন, তোমার বাবার শরীর কেমন? তিনি অনেক দিন এ বাড়িতে আসেন নি।

শুনেছি ভাল আছেন।

খাসা লোক, অমন ভদ্দর লোক গাঁয়ে আর একটিও নেই, অবশ্য রায়দের বাদ দিয়ে, রায়েরা হল দেশের রাজা।

বৃদ্ধা আসলে যে কথাটা বলিতে চান তাহা উত্থাপন করিতে কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সমস্ত বাধা এড়াইয়া বলিলেন, গৌর জীবনে সুখী হতে পারল না, কি বল?

এর উত্তর বিভাবতী কি করিবে?

শাশুড়ী বলিলেন, আমি মা কিনা তাই বুঝি, তোমারও বোঝা উচিত।

বিভাবতী কোন উত্তর করিল না।

তুমি আমার মেয়ের মতন, ছেলেবেলা থেকে তোমায় দেখেছি, তোমার অমন সুন্দর স্বভাব, একদিন অত রূপ ছিল, অমন কুন্দকান্তি কিন্তু আমার বরাতে—বলিয়া বৃদ্ধা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তারপর একটু পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাকে পেয়েও সুখী হতে পারেনি।

বিভাবতী বলিল, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

তুমি ওকে খুব ভালবাসো তা জানি, তাই বলছিলাম—আমিত অনেক বলে কয়েও রাজী করাতে পারছি না তুমি যদি একবার—

বিভাবতী বলিল, ওঁর বিয়ের কথা বলছেন, বেশ, আমি বলে দেখব।

শাশুড়ী পরম উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, তাইত সবার সঙ্গে তর্ক করি, খাসা বউ আমার, ভদ্দর লোকের মেয়ে হইলে অমন হয়।

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, ওর মেজাজ বুঝে বলো। আর আমার নাম কর না, কবে বলবে বল দেখি।

কাঠের উপর কাঠ দিয়া আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শুষ্ক কণ্ঠে বিভাবতী বলিল, আজই বলব।

তারপর দুজনেই খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন। বলিবার আর কিছু নাই, কাছে বসিয়া থাকিতেও সঙ্কোচ বোধ হয় অথচ কথাটা সারিয়াই উঠিয়া আসা চলে না। তাই বৃদ্ধা অগত্যা ডিবা খুলিয়া দাঁতে মিশি দিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই রাত্রেই বিভাবতী গৌরমোহনকে বলিল, তুমি আর একটা বিয়ে কর—

গৌরমোহন উত্তর করিল, মা বলেছেন, বুঝি?

আমার অনুরোধ।

তুমিও পাগল হয়েছ দেখছি।

স্ত্রীকে গৌরমোহন ভালবাসিতে পারে নাই, কিন্তু স্ত্রী বর্তমানে আবার বিবাহকে সে মনে করিত চরম নিষ্ঠুরতা। যে সমাজে পতি বর্তমান থাকিতে স্ত্রী কিছুতেই আবার বিবাহ করিতে পারে না সেখানে স্ত্রী বর্তমানে পুরুষের আবার বিবাহ করার মতন অপরাধ আর কিছু নাই।

সে একটু পরে বলিল, তুমি আর কখনও আমায় এ অনুরোধ করবে না।

গৌরমোহনের বিবাহের প্রসঙ্গটা চাপা পড়িল বটে, কিন্তু শাশুড়ী বিভার উপর চটিয়া গেলেন, পাঁচজনের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কানিটা ছেলেকে আমার মন্তর করেছে।

একদিকে অনাদর ও উপেক্ষা, অন্যদিকে নিজের প্রতি অযত্ন এর মধ্যেই দিনগুলি কোন রকমে কাটিতেছিল। কিন্তু এবার আরম্ভ হইল শাশুড়ীর অত্যাচার, কথায় কথায় টিটকারী। বিভাবতীর উঠিতে দেরী না হইলেও বলেন, কী গো বড় মানুষের ঝি, এতক্ষণে ঘুম ভাঙল। কখনও জিজ্ঞাসা করেন, পাথরের চোখ বসাবার জন্য তোমরা কলকাতায় যাবে শুনেছিলাম কিন্তু তারও বোধ হয় আর দরকার নেই, কি বল?

বিভাবতী নীরবে সব সহ্য করে।

নিজের প্রতি কোন মমতাই যেন আর তার নাই। এ অধ্যায়ের যত শীঘ্র পরিসমাপ্তি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু তার দুঃখ হয় স্বামীর জন্য। নিজকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিলেন তার জন্য, বিবাহ করিলেন না তারই মুখ চাহিয়া।

এত হতভাগিনী সে যে একদিনের জন্যও তাঁকে সুখী করিতে পারিল না।

সে সেদিন স্বামীকে বলিল, মা বলছিলেন পাথরের চোখের কথা, ওতে নাকি দেখতে বেশ দেখায়।

গৌরমোহন বলিল, আচ্ছা দেখি, আমার ওতে খুব মত নেই।

কেন?

কলকাতায় একজনকে দেখেছি যখন সে নকল চোখটা খোলে তখন চোখের ফাঁকা গর্তটা দেখতে আরও ভয় হয়।

আমার চোখের চেয়েও খারাপ?

হ্যাঁ।

আমি যদি তোমার সামনে কখনো না খুলি?

কিন্তু প্রস্তাবটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

কিছুদিন হইতেই বিভাবতীর ভাল চোখ দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, যন্ত্রণাও ছিল অল্পবিস্তর। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে স্বামীকে বলে নাই। তাকে বিব্রত করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে রোগটা বাড়িয়া চলিল। শেষটায় একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

সে একদিন শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় উঃ আঃ করিতেছে এমন সময় গৌরমোহন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, কি হয়েছে?

বিভাবতী বলিল, ভাল চোখটা ব্যথা কচ্ছে।

এ্যাঁ, ডান চোখটা?

বিভাবতী দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল। গৌরমোহন তার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, এ্যাঁ, একী—

দুটো চোখেই রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে, বিভাবতী রোধ করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কতদিন হয়েছে?

বিভাবতী চুপ করিয়া রহিল।

দু'একদিনে ত' এমন হতে পারে না, তুমি এতদিন বলনি কেন—বলিয়া সে রুমাল দিয়া স্ত্রীর দুটি গর্ত মুছাইয়া দিতে লাগিল।

স্বামীর এইটুকু আদরেই বিভাবতীর সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ জাগিল, হতভাগিনী দুঃখ ভুলিল, যন্ত্রণা ভুলিল।

গৌরমোহন বিভাবতীকে কলিকাতায় আনিল। নামজাদা প্রায় সকল ডাক্তারই দেখিলেন, রক্ত পরীক্ষা ও ইনজেকসন্ হইল নানারকম, ধুমধামের কোন ত্রুটীই হইল না।

একজন বিশেষজ্ঞ বলিলেন, টু লেট্ (too late), ভাল চোখও থাকবে না।

আর একজন কহিলেন, দেখা যাক্ কি হয়।

তারপর অস্ত্রোপচার, কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সুচিকিৎসক দুটা চোখই অপারেশন করিলেন। বাঁ চোখের মণির নিকট হইতে হোগলার সেই কুচিটা বাহির হইল। জিনিসটা জমিয়া পাথরের কুচির মতন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেটাকে চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া ডাক্তার বলিলেন, root of all evils this nasty thing.

চিকিৎসা সর্বশেষ হইল। রোগিনী আশা ও নিরাশার মধ্যে অনেকদিন কাটাইয়াছে। ফুলা, যন্ত্রণা, রক্তাক্ত এমন কি বাঁ চোখের সাদা সেই গ্যাঁজটাও আর নাই। বেশ দুটা স্বাভাবিক চোখ।

কিন্তু বিভাবতীর সামনে জগৎ তখন একেবারে অন্ধকার।

কোথায় আলো কোথায় আকাশ—তার এ জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ঐ অন্ধকারে পূর্ণতা লাভ করিবে বলিয়াই কি সে এতদিন বাঁচিয়াছিল?

একটু একটু করিয়া সে যখন ভাল চোখের দৃষ্টি শক্তি হারাইতেছিল তখনও ডাক্তার তাকে আশ্বাস দিতেন।

আজ ব্যাণ্ডেজ খোলার পর সব অন্ধকার দেখিয়া বিভাবতী ডাকিল, ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার অপরাধীর মত নীরব রহিলেন।

গৌরমোহন বলিল, কিছুই দেখতে পারছো না। এই আমাকে—বলিয়া সে স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

বিভাবতী শূন্যে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল।

গৌরমোহন কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, ও ভগবান্!

ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন।

গৌরমোহন বিভাবতীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ডাকিল—বিভু—

বিভাবতী স্বামীর চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—ছিঃ ওকি কচ্ছ—

গৌরমোহনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, সে এবার বিভাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, তুমি আমায় ক্ষমা কর—বিভা—আমায় ক্ষমা কর।

অপ্রত্যাশিত এই যত্নের আনন্দে স্বামীর বুকে মাথা লুকাইয়া অন্ধ বিভাবতী ভাবিতেছিল, চোখ থাকতে যদি একদিনও এ সুখের অধিকারিণী হ'তে পারতাম।

সোভিয়েট সাহিত্য

মাক্সিম গোর্কি

(পূর্বানুবৃত্তি)
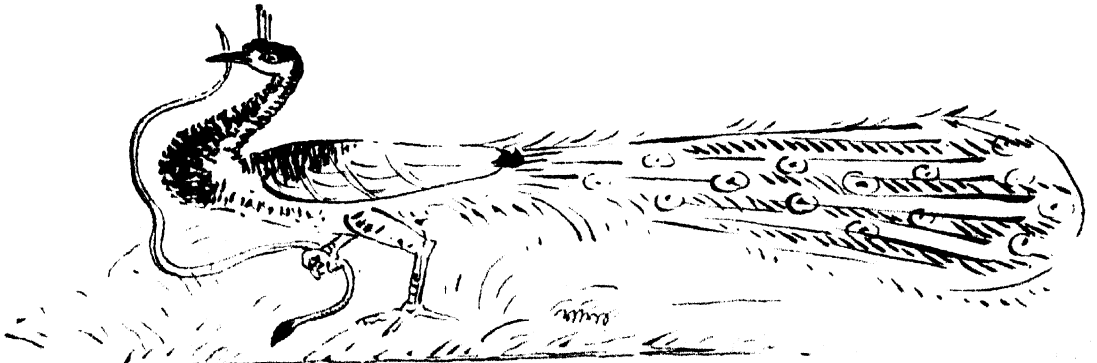
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লেখকদের উপর টুর্গেনেভ-এর প্রভাব সুস্পষ্ট; কাউণ্ট পাহ্‌লেন, রেনে বাজ্যাঁ, এস্তোনিয়ে, টমাস হার্ডি (তাঁর Tess of the D'Urbervilles বইতে) এবং ইওরোপের অন্যান্য অনেক লেখকের উপর লিও টলস্টয়ের প্রভাব সর্বস্বীকৃত, আর ডস্টয়েভস্কির প্রভাব বরাবরই খুব বেশী ছিল এবং এখনো আছে। যে নীট্‌শের চিন্তাধারা ফাশিজমের প্রমত্ত মতবাদ ও প্রয়োগের ভিত্তি, সেই নীট্‌শে এই প্রভাবকে স্বীকার করেন। Memoirs from the Underground বইয়ের নায়ক চরিত্রে আত্মকেন্দ্রিক লোকের টাইপ, সামাজিক ভ্রষ্টতার টাইপ আঁকার কৃতিত্ব ডস্টয়েভস্কির। ডস্টয়েভস্কির এই নায়ক একটা উৎকট জয়গৌরবে তার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য ও দুঃখকষ্টের জন্যে, তার যৌবনোচিত উন্মাদনার জন্যে তৃপ্তিহীন প্রতিশোধ নিচ্ছে; উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুবকদের মধ্যে যে সব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁদের ক্ষিপ্ত হতাশার আমূল চিত্র পাই এই টাইপে। ফ্রিড্রীখ নীট্‌শে, হুইসম্যানের Against the Grain-এর নায়ক, পল বুর্জের Le Disciple-এর নায়ক, বোরিস সাভিনকভ্ (যিনি নিজেকেই নিজের রচনার নায়ক করেন), অস্কার ওয়াইল্ড, আর্টসিবাশেভের 'সানিন' এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অমানুষিক অবস্থার স্বৈরাচারী প্রভাবসৃষ্ট আরো অনেক সমাজভ্রষ্টের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় হয়েছে এই টাইপে।

ভেরা ফিগনারের মারফৎ সাভিনকভ্ ঠিক অধোগামীদের মতোই যুক্তি বিস্তার করেন—"কোনো নীতিধর্ম নেই, আছে শুধু সৌন্দর্য। আর সৌন্দর্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অব্যাহত বিকাশ, আত্মার মধ্যে যা কিছু আছে, তার অবাধ পরিস্ফুরণ।"

বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বের আত্মা যে কি গলিত ভারাক্রান্ত, তা আমরা ভালই জানি।

যে রাষ্ট্র অধিকাংশ লোকের অপমানকর অযৌক্তিক দুঃকষ্টের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কথায় ও কাজে দায়িত্ব-হীন স্বেচ্ছাই তো প্রধান নীতি হবে। "মানুষ প্রকৃতিতে স্বৈরাচারী," সে "অত্যাচারী হ'তে চায়," সে "দুঃখকষ্টকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসে," সে "স্বেচ্ছা ও আচরণের অবাধ স্বাধীনতায় জীবনের অর্থ ও সুখ কল্পনা করে, এই স্বেচ্ছা থেকেই সে সব চেয়ে বেশী উপকার" পাবে, "সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয় হোক, আমি তো চা খেয়ে নিই"—এই রকম সব মতকেই ধনতন্ত্র সঞ্চারিত করে দিয়েছে এবং সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও সমর্থন করেছে।

ডস্টয়েভস্কিকে সত্যসন্ধানী বলে' অভিহিত করা হয়েছে। সত্যের সন্ধান যদি তিনি করে' থাকেন তো তাকে পেয়েছেন মানুষের পশুপ্রবৃত্তির মধ্যে এবং পেয়ে তার প্রতিবাদ করেন নি, তার সাফাই দিয়েছেন। বাস্তবিক, যতদিন মানুষের মধ্যে পশুকে জাগানোর এত অসংখ্য কারণ ধন-তান্ত্রিক সমাজে থাকবে, ততদিন মানবজাতির পশুপ্রবৃত্তিকে নির্মূল করা যাবে না। পোষা বেড়াল ইঁদুর ধরে' খেলা করে; কারণ পশুর পেশীর—ক্ষিপ্রগতি ছোট শিকারের শিকারীর তাগিদই ঐ। এ খেলা শরীরের ট্রেনিং। যে ফাশিস্ট মজুরের থুতনিতে লাথি মেরে শিরদাঁড়া থেকে তার মাথাটা টলিয়ে দেয়, সে পশু নয়, তার চেয়েও অনেক অনেক অধম—সে পাগলা জানোয়ার, তাকে মেরে ফেলা দরকার; সে হচ্ছে সেই 'হোয়াইট' অফিসারের মতো জন্তু, যে লাল পল্টনের চামড়া কেটে নিশানের চিহ্ন বানায়।

ডস্টয়েভস্কি যে কি খুঁজেছিলেন বোঝা দুষ্কর। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, রুশদের মধ্যে সব চেয়ে প্রতিভাবান ও সং লোক তাঁর সেই ভিসারিয়ন বেলিনস্কিই রুশ জীবনে সব চেয়ে ঝগড়াটে, জেদী ও জঘন্য জীব; আবিষ্কার করেছিলেন যে, তুর্কীদের কাছ থেকে কনস্টাণ্টিনোপলস্ কেড়ে নিতে হবে, আর দাসত্বই "জমিদার ও চাষীর মধ্যে আদর্শ নৈতিক সম্পর্কের" সহায়ক। পরিশেষে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর রুশ জীবনের নির্মমতম চরিত্র কনস্টান্টাইন পোবেডনোট্‌সেভকে তাঁর গুরু বলে' স্বীকার করেছিলেন। ডস্টয়েভস্কির প্রতিভা অবিসংবাদিত। চরিত্র চিত্রণে তাঁর শক্তি বোধ হয় একমাত্র সেক্সপীয়ারের সমান। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে, "মানুষ ও জগতের বোদ্ধা" হিসেবে তাঁকে মধ্যযুগীয় 'ইনকুইজিটরের'* ভূমিকায় সহজে কল্পনা করা যায়।

আমি যে ডস্টয়েভস্কি সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার কারণ ১৯০৫-০৬ সালের পর রুশ সাহিত্য ও অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী আমূল পরিবর্তন ও গণতন্ত্রের পথ থেকে বুর্জোয়া "আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষার দিকে যে উল্টো মোড় নিল, ডস্টয়েভস্কির মতের প্রভাব ছাড়া তাকে বোঝা প্রায় অসম্ভব।

ডস্টয়েভস্কির মত জনপ্রিয় হ'ল পুশকিন সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতার পর, "নারোডনায়া ভলিয়া" (যারা স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিল) দলের ভাঙনের পর। লেনিনের সরল ও মহৎ সত্যকে উপলব্ধি করে' প্রোলেটেরিয়াট ১৯০৫ সালে বিশ্ব জগৎকে তার কঠোর মূর্তি দেখাবার আগে পিটার স্ট্রুভে বুদ্ধিমানের মতো বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে প্রচারে হাত দিলেন। যে কুমারী তার নির্মলতা হারিয়েছে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যেন সেই রকম এক কুমারী; স্ট্রুভে তাকে বোঝাতে লাগলেন—বুড়ো ধনিককে এবার বৈধভাবে পতিত্বে বরণ কর। স্ট্রুভের পেশা ছিল ঘটকগিরি; বইয়ের পোকা হ'লেও তাঁর মগজে মৌলিক চিন্তা একেবারে ছিল না। ১৯০১ সালে তিনি হাঁক দিলেন—"ফিক্‌টের মতবাদে ফিরে চল"—এ মতবাদ হচ্ছে দোকানদার ও জমিদাররূপী জাতির ইচ্ছার কাছে দাসত্ব। ১৯০৭ সালে আবার তাঁর সম্পাদনায় ও সহ-

---

* যারা খৃষ্টান ধর্মের নামে বিচারের ছলে বিধর্মীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করত।—অনুবাদক

লিখনে প্রকাশিত হ'ল "ল্যান্ডমার্ক'স" নামে এক প্রবন্ধ-সঙ্কলন। সে বইতে এক জায়গায় হুবহু এই কথাগুলো আছে, "জনসাধারণের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে বেয়নেট দিয়ে আমাদের রক্ষা করার জন্যে গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

জমিদারদের পাইক মন্ত্রী স্টোলিয়াপিন যখন প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় শ্রমিক ও কৃষকদের ফাঁসী দিচ্ছিল, সেই সময় গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা এই জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছিল। ১৮৭০-৮০ সালের মধ্যে চরম রক্ষণশীল কনস্টান্টাইন লেওনটিয়েভ যে উৎকট মত ব্যক্ত করেছিলেন, "ল্যান্ড-মার্ক'স"-এ মূলত তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়। লেওনটিয়েভ বলেছিলেন, "রুশিয়াকে হিম করে' দিতে হবে," অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লবের সমস্ত স্ফুলিঙ্গ রুশিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কনস্টিটুশনাল ডেমোক্র্যাট'দের স্বধর্ম ত্যাগের নিদর্শন এই "ল্যান্ডমার্ক'স" প্রবীণ স্বধর্মত্যাগী লিও টিখোমিরোভের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিল; তিনি একে "রুশ আত্মার প্রকৃতিস্থতা ও বিবেকের পুনরুজ্জীবন" বলে' বর্ণনা করেন।

* * * *

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্বহীন মতবাদ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে; এই সময়টাতে রুশ লেখকরা পূর্ণ "সৃষ্টির স্বাধীনতা" ভোগ করে। পাশ্চাত্য বুর্জোয়ার যত রক্ষণশীল মতবাদ প্রচারে এই স্বাধীনতা প্রকাশ পায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লবের পর এই সব মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল এবং ১৮৪৮ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর মাঝে মাঝে নিয়মিত ব্যবধানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ঘোষণা করা হয় যে,—"বেয়র্গস' দর্শন মানুষের চিন্তার ইতিহাসে একটা মস্ত বড় ধাপ", বেয়র্গস' "বার্কলির থিওরিকে অনুপূরণ করেন ও নিবিড় করেন," "কান্ট লাইব্‌নিটস্‌, দেকার্ত ও হেগেলের মতবাদ মৃত, প্লেটোর রচনাই সূর্যের মতো শাশ্বত সৌন্দর্যে তাদের সকলের উপর স্বয়ংপ্রভ রয়েছে।" অথচ প্লেটো সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তার মধ্যে সব চেয়ে ক্ষতিকর মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা—শ্রম ও সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে কঠিন বাস্তব তার সমস্ত রূপ নিয়ে অনবরত উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তা থেকে এই মতবাদ একেবারে বিচ্ছিন্ন।

ডমিট্রি মেরেজকোভস্কি—যিনি তাঁর সময়ে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন—উচ্চকণ্ঠে বললেন,—

> যাই আসুক না কেন, কিছু আসে যায় না।
> ওরা খেলায় অনেক দিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,
> ওই তিন ভাগ্যদেবী—
> ধুলোয় ধুলো মিশুক, ছাইতে ছাই।

শোপেনহাউয়ারকে অনুসরণ করে' এবং স্পষ্টত বোদলেয়রের উপর নির্ভর করে' সলোগুব "ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বের ব্রহ্মাণ্ড মায়ার" এক বিশদ বিবরণ দেন। যদিও তিনি এ সম্বন্ধে কবিতায় কাঁদুনি গাইলেন, তবু বেশ আরামের বুর্জোয়া জীবন যাপন করে' চললেন এবং ১৯১৪ সালে ভয় দেখালেন জার্মানদের যে, "উপত্যকা থেকে তুষার অদৃশ্য হ'লেই" বার্লিন ধ্বংস করে' দেওয়া হবে। "রাজনীতিতে আদিরসের" এবং "মরমী স্বৈরাচারের" মতবাদ প্রচারিত হ'ল। ধূর্ত ভাসিলি রোজানোভ আদিরস প্রচার করেন, লেওনিড আন্দ্রিয়েভ উদ্ভট গল্প ও নাটক লেখেন, আর্টসিবাশেভ তাঁর নভেলের নায়ক হিসেবে মানুষের পোষাক-পরা এক দ্বিপদ কামার্ত ছাগলকে বেছে নেন। মোট কথা, ১৯০৭-১৭ যুগটাকে রুশ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ইতিহাসে সব চেয়ে লজ্জাকর, আর সব চেয়ে নির্লজ্জ যুগ বলে' অভিহিত করা যায়।

আমাদের দেশের গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহাসিক শিক্ষা পশ্চিমের সমগোত্র বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে কম হয়েছিল; সেই জন্যে তাদের "নৈতিক" ভাঙন, তাদের বুদ্ধির দারিদ্র্য আমাদের দেশে অনেক দ্রুত দেখা দেয়। কিন্তু এই ভাঙন আর এই দারিদ্র্য সমস্ত দেশেরই মধ্যবিত্তের মধ্যে আসে; প্রোলেটেরিয়াটের ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মেশাবার শক্তি ও সংকল্প যে বুদ্ধিজীবীর নেই তার পক্ষে এ অপরিহার্য। কারণ প্রোলেটেরিয়াটের ঐতিহাসিক ব্রত হচ্ছে সমস্ত সংশ্রমী লোকের মঙ্গলের জন্যে জগতের পরিবর্তন করা।

এ কথা বলা দরকার যে, পশ্চিমের সাহিত্যের মতোই রুশ সাহিত্য প্রাক্-বিপ্লব যুগে জমিদার, শ্রমশিল্পের সংগঠয়িতা ও মহাজনদের উপেক্ষা করেছে, যদিও পশ্চিমের চেয়ে রুশিয়ায় এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেক বেশী মৌলিক ও বিচিত্র টাইপ ছিল। বিখ্যাত মাদাম সাল্টিচিখার মতো উৎকট জমিদারের টাইপ, জেনারাল ইজমাইলোভ এবং আরো শত শত অনুরূপ চরিত্রকে রুশ সাহিত্য উপেক্ষা করে যায়। গোগোলের Dead Souls বইতে ব্যঙ্গ-চরিত্র ও নক্সাগুলো রুশিয়ার জমিদার ও সামন্ত চরিত্রের ঠিক প্রতিরূপ নয়। কারোবোচকা, মানিলোভ, পেতুখ, সোবাকিয়েভিচ ও নোজদ্রেভ নিছক তাদের অস্তিত্ব দ্বারা জার-স্বৈরতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছিল; কৃষকদের রক্তশোষা হিসেবে তারা ঠিক ঠিক দৃষ্টান্ত নয়। রক্তশোষণের আর্টের অন্য সব কৃতী আর্টিস্ট ছিল। কিন্তু তাদের কুকীর্তি লেখনীর আর্টিস্টরা, এমন কি তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে ক্ষমতাশালী যিনি তিনিও লিপিবদ্ধ করেন নি; এমন কি যাঁরা 'মুজিখ'-এর * (রুশ কৃষক) প্রতি প্রীতিতে ভরপুর ছিলেন তাঁরাও লেখেন নি। অথচ এমন প্রচুর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দিয়ে আমাদের ধনিক শ্রেণী ও পশ্চিমের ধনিক শ্রেণীর পরিষ্কার পার্থক্য বোঝা যায়। ইতিহাসের হিসেবে আমাদের তরুণ বুর্জোয়া—যার উদ্ভব প্রধানত কৃষক থেকে—পশ্চিমের প্রবীণ বুর্জোয়ার চেয়ে দ্রুত ও সহজে ধনী হয়ে যায়। আমাদের শিল্প মালিক পশ্চিমের প্রবল প্রতিযোগিতার শিক্ষা পায়নি বলে' প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত "পাগ্‌লাটে" ও "খোশ খেয়ালী" লোকের ধাঁচটা বজায় রাখে; যে অদ্ভুত সহজ রকমে সে লাখ লাখ টাকা জমাচ্ছিল তাতে নিজেই সে বিস্ময় বোধ করেছিল; বোধ হয় এই

বিস্ময়ই ওই "পাগ্‌লাটে" ও "খোশ খেয়ালীর" ভাব সঞ্চারিত করেছিল। এই রকম একজনের চরিত্র বর্ণনা করেছেন তিব্বতের বিখ্যাত ডাক্তার পি এ বাদমাইয়েভ তাঁর ১৯১৭ সালে প্রকাশিত Wisdom of the Russion People বইতে। এ বইতে তিনি তরুণদের বলেছেন "সাম্য স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের ফাঁকা বুলি দিয়ে শয়তানের যেসব লেখা তাদের প্রলুব্ধ করে" তা বর্জন করতে। এই সুখপাঠ্য বইটিতে পিটার আয়োনোভিচ গুবোলিন সম্বন্ধে নিম্নোধৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গুবোলিন রাজমিস্ত্রীর ছেলে, নিজেও রাজমিস্ত্রী ছিল, পরে রেলওয়ে কণ্ট্র্যাক্টর হয়।—

"রুশিয়ার মুক্তির যুগের যে সব প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় রাজকর্মচারীরা এখনও গুবোলিনের আমল ভোলেন নি, তাঁরা এই বর্ণনা দেন—গুবোলিন পালিসকরা বুট জুতো আর হাতকাটা জামা পরে', এক থলি টাকা নিয়ে সরকারী দপ্তরে ঢুক্‌লেন, হলে দারোয়ান ও বেয়ারাদের কুশলপ্রশ্ন জিগ্‌গেস করলেন, তারপর থলি থেকে টাকা বের করে' প্রত্যেককে অভিবাদন জানিয়ে দিল খুলে টাকা দিলেন—যাতে তারা তাঁকে ভুলে না যায়। তারপর তিনি গেলেন প্রত্যেকটি বিভাগ ও উপবিভাগে; সেখানে তিনি প্রত্যেক কর্মচারীর জন্যে পদমর্যাদা অনুসারে এক একটি সীলকরা খাম রাখলেন, তাদের তিনি সকলকে বন্ধুর মতো নাম ধরে' ডাক্‌লেন এবং অভিবাদন জানালেন। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তিনি অভিনন্দন জানিয়ে চুমু খেলেন এবং বল্‌লেন তাঁরা রুশ জাতির হিতসাধক। এর পরই তাঁকে অবিলম্বে মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পিটার আয়নোভিচ দপ্তর থেকে চলে' যাওয়ার পর প্রত্যেকে আনন্দ করতে লাগ্‌ল। সেদিনটা যেন বাস্তবিকই ছুটির দিন; শুধু খৃষ্টমাস বা ঈস্টারের সঙ্গে তার তুলনা চলে। প্রত্যেকেই যা পেয়েছিল গুণে হাস্‌ল; প্রত্যেকেই প্রফুল্ল, প্রত্যেকেই ভাব্‌তে লাগ্‌ল পরদিন সকাল পর্যন্ত দিনরাত্রির বাকী অংশটা কিভাবে কাটাবে। হলে দারোয়ানরা পিটার আয়নোভিচের জন্যে গর্ববোধ করছিল, কারণ তাদের মধ্যেই তাঁর উৎপত্তি। তারা তাঁকে চতুর বল্‌ল, ভালো বল্‌ল, আর পরস্পরকে জিগ্‌গেস করল কত করে' পেয়েছে; কিন্তু পাছে উপকারকের কোন বদ্‌নাম হয় সেজন্যে টাকার পরিমাণ প্রত্যেকেই গোপন রাখ্‌ল। নীচের কর্মচারীরা গভীর আবেগে ফিস্‌ফিস করে' নিজেদের মধ্যে বলাবলি কর্‌ল যে, পিটার আয়নোভিচ তাদেরও ভোলেন নি—এত ভালো, এত সাধু তিনি। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মন্ত্রী সমেত—উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, পিটার আয়নোভিচের রাজনীতিক দূরদৃষ্টি কি প্রখর, জাতি ও রাষ্ট্রের কি মহৎ উপকার তিনি করছেন। তাঁরা বল্‌লেন, তাকে রেলওয়ে সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার বৈঠকে আমন্ত্রণ করা উচিত; কারণ একমাত্র তিনি এসব বিষয়ে ভাবেন। বাস্তবিকই সবচেয়ে দরকারী বৈঠকগুলোতে তাঁকে ডাকা হত। সেখানে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও ইঞ্জিনীয়াররা উপস্থিত থাকতেন। আর এইসব বৈঠকে গুবোলিনের মতই চূড়ান্ত হত।"

এই বিবরণ শ্লেষাত্মক শোনায়। কিন্তু তা নয়। যে সমাজ ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের গৌরবময় বাণী "সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব" ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়, সেই সমাজ ব্যবস্থার আন্তরিক গুণগানেই এই বিবরণ লেখা হয়েছে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃজনী শক্তির যে অক্ষমতা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি যা কিছু বললাম তা খুব নৈরাশ্যজনক মনে হতে পারে। আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উঠতে পারে যে, আমি ইচ্ছে করে' বাড়িয়ে বলেছি। কিন্তু সত্য সত্যই; তাকে আমি যথাযথ দেখি।

শত্রুর শক্তিকে কমিয়ে দেখানো মূঢ়তা, এমনকি ঘোর অন্যায়। তার শ্রমশিল্প টেক্‌নিকের, বিশেষত সমর-শিল্পের টেক্‌নিকের শক্তি আমরা খুব ভালো রকম জানি। এই টেক্‌নিক আজ হোক, কাল হোক, আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে; কিন্তু তার ফলে অপরিহার্যভাবে বিশ্বব্যাপী সমাজ-বিপ্লব জেগে উঠবে এবং ধনতন্ত্র ধ্বংস হবে। পশ্চিমের সমরবিদ্‌রা চীৎকার করে' বলে' থাকেন যে, যুদ্ধে এবার পশ্চাৎভাগও জড়িয়ে পড়বে, অর্থাৎ যুধ্যমান দেশের সমস্ত জনসাধারণ জড়িত হবে। একথা অনুমান করে' নেওয়া যেতে পারে যে, ইওরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক, যারা ১৯১৪-১৮ সালের হত্যাকাণ্ড এখনও একেবারে ভোলে নি এবং যারা এক নতুন ও আরো ভয়াবহ ধ্বংসলীলাকে অপরিহার্য জেনে সন্ত্রস্ত, তারা শেষ পর্যন্ত বুঝবে, আগামী সামাজিক ধ্বংস-তাণ্ডবে লাভ হবে কাদের, সেই পাষণ্ড কে [illegible] মাঝে মাঝে নিজের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোটি কোটি লোককে নিশ্চিহ্ন করে—তারা এই কথা বুঝে নিয়ে ধনতন্ত্র ধ্বংসের কাজে প্রোলেটেরিয়াটকে সাহায্য করবে। আমরা এটা অনুমান করতে পারি; কিন্তু এ রকম ঘটবে বলে' নির্ভর করে' থাকতে পারি না। কারণ শঠ ও কাপুরুষ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা* এখনো বেঁচে রয়েছে। প্রোলেটেরিয়াটের বৈপ্লবিক বিচার-বুদ্ধির উপর আমাদের দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে হবে; কিন্তু তার চেয়েও ভালো নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হওয়া এবং সে শক্তিকে অবিরাম বাড়িয়ে যাওয়া। সাহিত্যের একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য হচ্ছে, প্রোলেটেরিয়াটের বৈপ্লবিক আত্মচেতনাকে বিকশিত করা, যে গৃহ সে নিজের জন্যে তৈরী করেছে, সেই গৃহের প্রতি তার মমতাকে লালন করা এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে এই গৃহকে রক্ষা করা। (ক্রমশ)

* যারা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু কাজে ধনিক শ্রেণীকে সাহায্য করে।—অনুবাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৮
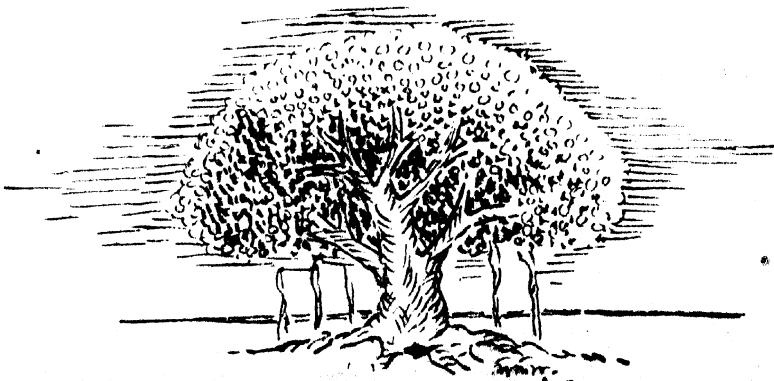
বিনয়, হরিপদ ও সুবিমল যখন বারান্দায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অন্দরমহলের একটা কক্ষে বসিয়া লতিকা এবং বসুধার মধ্যে সুবিমলকে অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত প্রকার কথাবার্তা চলিতেছিল।

লতিকা বলিল, "শোন্ বসুধা, আমাদের শাস্ত্রে যে পুরুষ আর স্ত্রীলোককে আগুন আর ঘি-এর সঙ্গে তুলনা করেছে, সেটা ভুল নয়। আগুনের বেশি কাছে গেলে ঘি গলবেই।"

বসুধা বলিল, "এখানে তুমি আগুন বলছ কাকে?"

লতিকা বলিল. "অবনীশবাবুকে।"

লতিকার কথা শুনিয়া বসুধার মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তাই কখনো হয় বউদিদি? যে মানুষ একবার বিয়ে করেছে, সে কখনো আগুন হ'তে পারে?"

লতিকা বলিল, "যে কাঠ একবার পুড়েছে, তার কয়লায় আঁচ ওঠে না?"

বসুধা বলিল, "ওঠে। কিন্তু কয়লা ত' আপনা-আপনি জ্বলে না,—তার জন্যে আগুন চাই। সে আগুন কোথায় বউদিদি?"

লতিকা বলিল, "সে আগুন তুই।"

বিস্মিতকণ্ঠে বসুধা বলিল, "আমি? আমি ত' ঘি।"

"ঘি তোর মন; আর আগুন তোর রূপ। তোর রূপের আগুনে লেগে কাঠ-কয়লা জ্বলে উঠবে,—আর সেই জ্বলন্ত কয়লার আঁচে তোর মন ঘিয়ের মত গলে যাবে।"

লতিকার কথা শুনিয়া পুনরায় বসুধার মুখে সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "আমি আগুন না কি বউদিদি?" তাহার পর লতিকার নিকট সরিয়া আসিয়া দুই বাহুপাশে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি যদি আগুন হতাম, তাহ'লে ত তুমি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠতে।"

বসুধার বাহুবন্ধনের মধ্যে ক্ষণকাল অপ্রতিবাদে অবস্থান করিয়া লতিকা বলিল, "আমি যদি লতিকাবালা না হ'য়ে ললিতকুমার হতাম, তাহ'লে এতক্ষণে মোমের পুতুলের মত নিশ্চয় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতাম; কিন্তু তোর আগুনের পক্ষে আমি যে মাটির পুতুল বসুধা।" তাহার পর বসুধার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সহসা কণ্ঠস্বর হইতে কৌতুকের সমস্ত লঘুতা অপসৃত করিয়া বলিল, "না, না, বসুধা, ঠাট্টা নয়। সময় থাকতে তোকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি, কিছুতে সে মাটির ওপর পা দিসনে, যে মাটিতে সত্যিসত্যিই ভয়ের কথা আছে।"

সহাস্যমুখে বসুধা বলিল, "ভয় ত' দেখছি, তোমার মনের মধ্যেই আছে বউদিদি। তা ছাড়া আর কোথাও আছে ব'লে ত মনে হয় না।"

লতিকা বলিল, "প্রথমে অনেকেরই মনে হয় না। চোরা বালিতে সর্বপ্রথম যখন একটু একটু ক'রে পা বসতে থাকে, তখন ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, অনেকে বেশ একটু মজাই বোধ করে। তারপর হঠাৎ যখন এক সময়ে বিপদ বুঝতে পেরে উদ্ধার পাবার জন্যে ধড়ফড় করতে আরম্ভ করে, তখন সেই ধড়ফড়ানির চোটেই আরও শীগগির শীগ্‌গির তলিয়ে যেতে থাকে।

বসুধা বলিল, "কিন্তু তুমি বট্যানির পড়াকে চোরাবালি বলছ না-কি বউদি?"

লতিকা বলিল, "বট্যানির পড়াকেই ঠিক বলছিনে। বট্যানির পড়া হচ্ছে চোরাবালির পথ; আর, চোরাবালি হচ্ছে, বট্যানির পড়াকে অবলম্বন ক'রে আর যা-কিছু, সব।"

পাংশুমুখে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "আর যা-কিছু কি বউদিদি?"

লতিকা বলিল, "হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, গান-বাজনা, দুজনে বাগানে বহুক্ষণ ধ'রে বেড়িয়ে বেড়ানো, সকলের আগে দুজনে ঘুম থেকে ওঠা, সকলের শেষে দুজনে ঘুমোতে যাওয়া। আরও কিছু বলতে হবে কি?"

বসুধা বলিল, "না, আর বলতে হবে না। কিন্তু বউদিদি, এ-সবের জন্যে আমি ঠিক ততটা দায়ী নই, যতটা দায়ী অবনীশবাবু নিজে। প্রায় সব সময়েই আমাকে তাঁর অনুরোধ পালন করতে হয়।"

লতিকা বলিল, "সেই জন্যেই ত' এ ব্যাপারটা আমার অতিশয় বিশ্রী লাগে। সুলেখার কথা শুনে যে মানুষ স্টেশন থেকেই পাটনা ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল, যে মানুষ নিজের ভায়রাভায়ের বাড়ি না গিয়ে বন্ধুর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, বন্ধুর অবিবাহিতা বোনকে নিয়ে তার এতটা মাতামাতি আমার একটুও ভাল লাগছে না; স্ত্রী অতিশয় গুরুতর অন্যায় করেছে মনে ক'রেও যে মানুষের মনে রাগ নেই, দুঃখ নেই, বিষাদ নেই, অথচ বেশ স্ফূর্তি আছে, আনন্দ আছে, তাকে আমি খুব সাধুপুরুষ ব'লে মনে করিনে বসুধা।"

বসুধা এ কথার কোনো উত্তর দিল না, নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া লতিকা বলিতে লাগিল, "এর মধ্যে সুলেখার মঙ্গল-অমঙ্গল জড়িত রয়েছে। সুলেখা আমাদের পরিচিত, লাবণ্যদিদির সে নিজের বোন, তার এই বিপদের জন্যে লাবণ্যদিদি একেবারে ভেঙে পড়েছেন, লাবণ্যদিদিকে আমরা আত্মীয়ের মত মনে করি। এই সব কথা মনে রেখে আমাদের কখনই এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে সুলেখা আর অবনীশবাবুর মধ্যে বিরোধটা বেড়ে ওঠে। বরং অবনীশবাবু আমাদের বাড়িতে বাস করছেন, এইটে একটা বিশেষ সুযোগ মনে ক'রে সেই বিরোধটা যাতে মিটে

যায়, সেইদিকেই আমাদের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত।"

এবারও বসুধা লতিকার কথার কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু লতিকা কর্তৃক সুলেখার ইন্টার্নিন্টের উল্লেখে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন একটা অননুভূতপূর্ব অপরাধ-বোধের বেদনায় আর্ত হইয়া উঠিল। এ কথা সে মনে মনে নিজের কাছে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিল না যে, বিগত তিন দিবস যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সহিত সে সুবিমলের সঙ্গ কামনা এবং উপভোগ করিয়াছে, তাহা একমাত্র বট্যানি পাঠের প্রয়োজনীয়তার দ্বারাই উৎপন্ন নহে, এবং সেই কামনা এবং উপভোগের মধ্যেই যে একটা অস্পষ্ট অনির্ণীত কুণ্ঠা সূক্ষ্ম কণ্টকের ন্যায় তাহার বিবেককে নিরন্তর বিদ্ধ করিয়াছে, সে কথাও সে অস্বীকার করিতে পারিল না। যে কথা এই কয়েকদিন তাহার অবচেতন মনে আবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, লতিকা আজ তাহা তাহার চেতন মনের সুস্পষ্টতার মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রকট করিয়া দিল। অথচ আশ্চর্য! একজন পরিচিত রমণীর বিবাহিত স্বামীর সঙ্গ-লিপ্সার অবৈধতা বিচার-বিবেচনার দ্বারা, পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও মনের মধ্যে সে লিপ্সার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিতেছে না! এখনও বেলা নয়টায় নির্দিষ্ট আসন্ন মিলন-বৈঠকের প্রতি আকর্ষণের কিছু পরিচয় মনের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া আছে।

বসুধা সভয়ে মনে করিল, ইহাই লতিকা কর্তৃক কথিত চোরাবালি ত' নহে!

"ঠাকুরঝি!"

লতিকা মাঝে মাঝে আদর করিয়া বসুধার প্রতি অধুনা-লুপ্তপ্রায় ঠাকুরঝি সম্বোধন প্রয়োগ করে।

সহসা এই সোহাগ সম্বোধনে চকিত হইয়া বসুধা লতিকার প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে দৃষ্টিপাত করিল।

"চুপ ক'রে অত কি ভাবচিস?"

অল্প একটু হাসিয়া বসুধা বলিল, "ভাবচি, বট্যানির পড়া বন্ধ ক'রে দেবো কি-না।"

"তাতে কি লাভ হবে?"

"আর কিছু না হোক, একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।"

"কে নিশ্চিন্ত হবে?—আমি, না তুই?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া স্মিতমুখে বসুধা বলিল, "বোধ হয় দুজনেই।"

লতিকা বলিল, "না,—তাতে আমি নিশ্চিন্ত হব না। আমি নিশ্চিত হব, বট্যানির পড়া উপলক্ষ্য ক'রে আর যে-সব ব্যাপার জন্মেছে, সেগুলো বন্ধ হ'লে। বরং বট্যানির পড়াটা এমন জোরের সঙ্গে চালাস যাতে অবনীশবাবু অন্য ব্যাপারের জন্যে দম ফেলবার ফুরসৎ না পায়। কথায় বলে, শক্তর সব দিক মুক্ত। তুই যদি শক্ত হোস, তা হ'লে—"

কথাটা শেষ হইবার সময় পাইল না, কক্ষে প্রবেশ করিল বিনয়। বসুধাকে লতিকার নিকট দেখিয়া বলিল, "কি রে বসু, তুই এখানে ব'সে ব'সে গল্প করছিস্ আর অবনীশ তোর পড়ার ঘরে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। নটার সময়ে তোদের বট্যানির ক্লাস নয়?"

বিনয়কে কোনও উত্তর না দিয়া বসুধা লতিকার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

লতিকা বলিল, "যা; কিন্তু যে-কথা বললাম, মনে যেন থাকে।"

বসুধা কক্ষ পরিত্যাগ করিলে বিনয় সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বললে লতিকা?"

লতিকা বলিল, "তোমার ঐ ভণ্ড বন্ধুটির কাছে শক্ত হ'য়ে বট্যানির পাঠ নিতে বললাম। তোমার বন্ধুটি ত' শুধু বট্যানিই জানেন না,—শয়তানীও যথেষ্ট জানেন!"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনয় বলিল, "ছি, ছি, লতিকা! একে বন্ধু, তায় অতিথি; অতিথি-নারায়ণের প্রতি এ রকম ভাষার ব্যবহার একেবারেই অতিথি-সৎকারের পরিচায়ক নয়!"

লতিকা বলিল, "অতিথি-নারায়ণ যদি হ'ত তা হ'লে মাথায় ক'রে রাখতাম; কিন্তু এ যে অতিথি দানব!"

বিস্ময়ক্লিষ্ট কণ্ঠে বিনয় বলিল, "দানব বলছ!"

সজোরে লতিকা বলিল, "একশ' বার বলছি! যে লোক দু দণ্ডে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে ভুলে গিয়ে আশ্রয়-দাতার বোনের মাথা চিবিয়ে খেতে পারে, সে দানব নয় ত' আবার কি"

বিনয় বলিল, "প্রথমত, মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে কিনা তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না; আর যদিই বা দেখা যায় খাচ্ছে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে কার্যটা প্রতিশোধের হিসেবেই করছে। মহাত্মা বেকন্ বলেছেন, Revenge is a sort of wild justice,—প্রতিশোধ এক রকমের বুনো বিচার!"

লতিকা বলিল, "বাঃ চমৎকার বিচার! একটা বিয়ে করা বদলোককে তা হ'লে তুমি তোমার বোনের সঙ্গে প্রেম করতে দেবে?"

বিনয় বলিল, "কিছুই আমি দোবো, অথবা দোবো না লতিকা, এ সব বিষয়ে আমি ঘোরতর অদৃষ্টবাদী। যা হবার তা হবেই, কেউ রোধ করতে পারবে না, এই আমার বিশ্বাস। সুতরাং আমাদের যত কিছু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভবিষ্যতের হাতে অর্পণ ক'রে ঘটনার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা, আর পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি আমরা করতে পারি বল?"

দৃঢ়কণ্ঠে লতিকা বলিল, "আর যা করতে পারি তা এক্ষুনি আমি তোমাকে বলছি; কিন্তু তার আগে তুমি বল, এই রকম অবিশ্বাসী একটা লোককে এতটা প্রশ্রয় দিতে তোমার মনে একটুও সঙ্কোচ হয় না?"

অতিশয় কোমল আবেদনপূর্ণ কণ্ঠে বিনয় বলিল, "কিন্তু ওর অপরাধ কোথায় বল লতিকা। আচ্ছা, ওর কোনও দোষ আছে কি?"

এই কথার ঠিক দশ মিনিট পরে বসুধার পাঠ-কক্ষে সুবিমলও আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বসুধাকে বলিতেছিল, "কিন্তু আমার অপরাধ কোথায় বলুন মিস্ বোস। আচ্ছা, আমার কোনও দোষ আছে কি?" (ক্রমশ)

গুজবের মনস্তত্ত্ব

শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাস এম, এ

১

গুজব বর্তমান সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। যুদ্ধরত দেশের ত কথাই নাই, আমাদের দেশেও আজকাল গুজবের আশ্চর্য প্রসার। সেদিন রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুজব, দুই পক্ষের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। গুজব রটনার ফলে মাঝে মাঝে নানারূপ গোলযোগের উপক্রম হয় এবং কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। জার্মানির অতিরঞ্জিত বিজয়বার্তাই নাকি ফ্রান্স পতনের (প্রধান) কারণ, মস্কো রেডিওতে সেদিন এই সতর্ক-বাণী ঘোষিত হইয়াছে। গুজবে সকলেই অল্প-বিস্তর অনুরাগী, সুতরাং দেখা যাক্ গুজব উঠে কেন?

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, সব কিছু অবলম্বনে গুজব রটে না এবং সময় বিশেষেই গুজব রটে, সর্বদা নয়। ধরুন ক্লাবরুমের বৈঠকে বন্ধু বলিলেন, "শুনেছ হে, বালী পুলের থামগুলি নাকি একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে......" শুনিবামাত্র তাস রাখিয়া সকলে একাগ্র হইয়া বন্ধুর দিকে ঝুঁকিবেন, ইহা সম্ভব নয়। "একটা ব্রীজ যদি যায় আর একটা হবে; আপাতত ব্রীজ খেলায় মন দেওয়া যাক্!" শ্রোতাদের নিকট ইহার অধিক প্রতিক্রিয়া আশা করা বৃথা। বালীপুলের স্তম্ভসমূহের অধোগতি, তা সে যতই বিস্ময়কর হউক, কাহারও মানসিক উত্তেজনার কারণ হইতে পারে না। পুলের উপর দিয়া কাহারও যদি দিনে দুইবার যাতায়াত করিতে হয়, এই খবরে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার কথা বটে, কিন্তু তাহার মনে গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে এমন উপাদান তন্মধ্যে নাই। যে বস্তু লোকের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া তাহাদের চিন্তা-সূত্রের অভ্যস্ত ধারায় ব্যতিক্রম ঘটাইতে অক্ষম, তাহা গুজবের বিষয়ীভূত হয় না। বালীপুলের থাম তলাইয়া যাওয়া এমনি এক অনুত্তেজক বস্তু, সুতরাং ইহা অবলম্বনে কোন গল্প-আলোড়নের কারণ না ঘটিলে গুজব রটিতে পারে না। কোন গুজব উল্লেখ করিতে হইলে সচরাচর বলা হয়, 'বাজারে গুজব এমন হচ্ছে বা হবে'; বাজারে গুজব কথাটার তাৎপর্য এই, বহু লোকের মধ্যে গুজব প্রচারিত। বহু লোক কোন কারণে উত্তেজিত হইলেই গুজবের অনুকূল মানসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইল বলা যাইতে পারে।

আজকাল লড়াই-দাঙ্গার গুজব অবিরতই উঠিতেছে, কারণ এই দুইটি বস্তুর মধ্যে বহুজনের যুগপৎ উত্তেজনার উপাদান প্রচুর। এই উত্তেজনার মূলে অনুসন্ধান করিলেই এই শ্রেণীর গুজবের কারণ পাওয়া যাইবে। একটা কাক মারিয়া ফেলিলে বহু কাক আতঙ্কিত কলরব শুরু করিয়া দেয় ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এই প্রতিক্রিয়ার কারণ আদিম যূথবুদ্ধি। এক জাতীয় পশুর একত্র বিচরণ ও আহার্য সন্ধান, একের বিপদে অপরের সক্রিয়তা ও আতঙ্ক, এ সমস্তই প্রধানত যূথবুদ্ধিজনিত। পশুর ন্যায় মানুষও সহজ বৃত্তির প্রভাবাধীন; সমাজে যুদ্ধ বা দাঙ্গাকালীন যে চাঞ্চল্য তাহা বিশ্লেষণ করিলেও পাওয়া যাইবে সেই সহজাত যূথবুদ্ধি। 'আমরা বিপন্ন, আমাদের এই মুহূর্তে ইহা করা দরকার' এই মনোভাব এই যূথবুদ্ধির অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বৃত্তির ইহা অপেক্ষা মৃদুতর অভিব্যক্তিও সম্ভব। খালি গাড়িতে কথা বলিবার লোকের অভাবে যে অধীরতা জন্মে তাহার কারণও যূথবৃত্তি; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতি অর্থাৎ ব্যক্তির চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। "আমরা বিপন্ন" এই তীব্র অনুভূতি একান্ত ব্যক্তি-মনের ক্রিয়া নয়, বহু-মনের সমাবেশ ব্যতিরেকে ইহার উদ্ভব হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দিলে পরিষ্কার হইবে।

মনে করুন, এক হিন্দু ভদ্রলোক সুদূর স্বাস্থ্যনিবাসে একা আছেন। সেখানে খবরের কাগজ মারফৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধনপ্রাণ হানির সংবাদে তাহার ক্রোধ ও বেদনার উদ্রেক নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু তাহা এত লঘু ও ক্ষণিক যে তদ্দ্বারা ভদ্রলোকের দৈনন্দিন জীবনে কোনরূপ ব্যতিক্রম উপস্থিত হইবে না। কিন্তু লোকালয়ে থাকিয়া দৌরাত্ম্যের বিবরণ শুনিলে তাহার যে মানসিক অবস্থান্তর ঘটিত, তাহার সহিত নির্জন স্বাস্থ্যাবাসে পত্রিকা পাঠজনিত মৃদু বিক্ষোভের তুলনা হয় না।

বহু লোকের মধ্যে থাকিয়া দাঙ্গা পীড়িতের দুর্দশার কথা শোনা এবং একা বসিয়া পত্রিকায় সে কাহিনী পাঠ—এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। বিশেষ সময়ে বহু লোকের মধ্যে অবস্থানমাত্র যূথবুদ্ধি তীব্রভাবে জাগরিত হয়ঃ 'আমি একক নহি, ইহাদের অঙ্গীভূত' এই অস্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রত্যেকের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। তখন যাহা কিছু জনতার সম্মুখে বর্ণিত ও ব্যক্ত হয়, তাহা সাধারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আকারে না আসিয়া সেই উত্থলিত যূথানুভূতির পটভূমিকায় প্রতি ব্যক্তির মনে প্রবিষ্ট হয়। আলাপ-আলোচনা যতই অগ্রসর হইতে থাকে এক মনের সহিত অন্য মনের এক আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটিয়া যায়, যাহাকে মানসিক ঐক্যতান বলা যাইতে পারে; ফলে ব্যক্তি-মন ছাপাইয়া উঠিয়া একটি প্রবল যৌথমনের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন প্রত্যেকের চিন্তা, কল্পনা, কার্য একই পথ ধরিয়া চলে—কাহারও স্বতন্ত্র মানসিক সত্তা থাকে না। "আমরা বিপন্ন, আমাদের অবিলম্বে ইহা করাই চাই ইত্যাদি" এই আকারে সদ্যস্ফূর্ত যৌথমন প্রত্যেকের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। (আমরা রাজনৈতিক সভা সমিতিতে মাঝে মাঝে সভাগণের যে উত্তেজিত আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া ত্যক্ত হই তাহা এই ব্যক্তিনির্বিশেষ যৌথমনের ক্রিয়া। যে ব্যক্তি মিটিং-এ মতানৈক্যের জন্য প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তাহারই সঙ্গে ঘরে বসিয়া নিরাপদে রাজনীতি আলোচনা করা চলে। কারণ তখন তাহার ব্যক্তিগত রুচি ও বিচারশক্তি যৌথমনের প্রভাবমুক্ত।)

ব্যক্তিসমূহ যখন যৌথমনের প্রভাবাধীন তখনই গুজবের উৎপত্তি হয়। গুজব যৌথমনের অন্যতম প্রতিক্রিয়া। পুলিশ মনে করে গুজব ব্যক্তিবিশেষের কার্য এবং শাসনের ভয় দেখাইয়া গুজব নিবারণ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা কোন সংবাদ আমদানী হওয়া সম্ভব বটে; কিন্তু যেখানে সংবাদের মর্ম-বস্তু স্থানীয় জনসাধারণের মনে ইতিপূর্বে কোন উত্তেজনার সঞ্চার করে নাই, সেখানে কেবল ব্যক্তির চেষ্টায় সে সংবাদ রাষ্ট্র করা যায় না।

ঢাকার দাঙ্গার প্রথমভাগে সেই জেলারই কোন গ্রামে এক দিবস পূর্বাহ্নের বাজারে হিন্দু-মুসলমান অনেক উপস্থিত। এমন সময় এক মুসলমান যুবক আসিয়া খবর দিল, দুইটি নিরীহ মুসলমান এই গ্রামবাসী এক হিন্দুর হস্তে আহত হইয়াছে। কল্পিত আততায়ীর নামোল্লেখ পর্যন্ত করিল। খবর নিতান্তই উত্তেজনাজনক, কিন্তু উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল না; কেহই এই খবর বিশ্বাস করিল না। কিয়ৎকাল মধ্যে জানাও গেল ইহা মিথ্যা খবর। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে তখন পর্যন্ত উগ্র যূথবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া ব্যক্তিগত বিচার শক্তি লুপ্ত হয় নাই, তাই সেদিন খবরটি একেবারে মাঠে মারা গেল। প্রত্যেক ব্যক্তি যতক্ষণ স্বীয় বিবেচনা দ্বারা সংবাদ যাচাই করিতে সক্ষম, ততক্ষণ মিথ্যা খবরে উত্তেজনা জন্মিতে পারে না। কিন্তু যখন ব্যক্তিমন স্তিমিত এবং যৌথ-উত্তেজনা প্রবল, তখন যাহা সেই উত্তেজনার পরিপোষক তাহাই লোকে বিশ্বাস করে, কল্পনা করে এবং গুজবে গুজবে আবহাওয়া আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

মিথ্যা খবর কিভাবে কল্পনায় পরিণত হয় তাহার এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। পূর্বোক্ত ঘটনার সমকালেই এক রাত্রিতে খবর পাওয়া গেল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া ২০।২৫ জন গুণ্ডা গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে পেট্রোলের টিন; ইহারা সটান মুসলমান পল্লীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, একাধিক ব্যক্তির স্বচক্ষে দেখা ব্যাপার সুতরাং অবিশ্বাসের কি কারণ থাকিতে পারে! তা ছাড়া, কেহ কেহ তখন বলিলেন, বাহিরের লোক কিছুদিন যাবৎই নাকি আনাগোনা করিতেছে। হিন্দুপল্লী আত্মরক্ষার জন্য ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু দুই চারিজন ধীর-স্থির ব্যক্তি ব্যাপারটা সেই রাত্রিতেই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে যে তথ্য সংগ্রহ হইল তাহা এই যে, নিকটবর্তী এক বাড়িতে বিবাহ হইতেছে সেখানে ভিন্নগ্রাম হইতে কতিপয় ব্যক্তি এই পথ দিয়া গিয়াছে।

রায়পুরা অঞ্চলের গুণ্ডার অত্যাচারের কাহিনী সকলের মনে জাগরূক, সে অত্যাচার এ অঞ্চলেও হইতে পারে এই আশঙ্কায় প্রত্যেকে সন্ত্রস্ত; এমতাবস্থায় যখন রাত্রির অন্ধকারে কয়েকজন অপরিচিত লোক সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা গেল, তখন ইহারা গুণ্ডাই বটে, এই কল্পনা আতঙ্কিত মনে উদয় হইতে বাধ্য। এই কল্পনাকে উচ্চকিত যৌথ-মনের প্রথম বিপদ সঙ্কেত বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় চাক্ষুষ দ্রষ্টাদের প্রত্যেকেই হয়ত অপরিচিতদের নাম-ধাম, গন্তব্যস্থান জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তৎপর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন; কিন্তু আজ উত্তেজনার বশে অপরিচিত দর্শন মাত্রই সিদ্ধান্ত, ইহারা গুণ্ডা, জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন! তৎপর পেট্রোলের কল্পনা। লোকগুলির সঙ্গে বাক্স-পেটরা নিশ্চয়ই কিছু ছিল, যেহেতু বিশ্বাস হইয়াছে ইহারা গুণ্ডা, ইহাদের সঙ্গের জিনিস নিশ্চয়ই পেট্রোল! আরও মজা এই যে যাহা প্রত্যক্ষ ও যাহা অনুমান উভয়ই একাকার হইয়া গেল, কোন পার্থক্য রহিল না। তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন অপরিচিত মানুষ, অনুমান করিয়াছেন গুণ্ডা; দেখিয়াছেন বাক্স কিংবা এমন কোন জিনিস কিন্তু ভাবিয়াছেন পেট্রোলের টিন। অথচ যে বিবরণ তাঁহারা গ্রামবাসীদের নিকট দিলেন তাহাতে অনুমানের নামগন্ধও নাই। "২০।২৫ জন গুণ্ডাকৃতি লোক, সঙ্গে পেট্রোলের টিন, স্পষ্ট দেখলুম," যাহাদের নিকট এই সংবাদ ব্যক্ত হইল তাহাদের মনও একই কারণে আলোড়িত, সুতরাং তাহারা অবলীলাক্রমে এই সংবাদ গলাধঃকরণ করিল। কাহারও মনে এই জিজ্ঞাসা উদয় হইল না যে, অন্ধকারে পেট্রোলের টিন ও গুণ্ডাকৃতি চেহারা কোনটাই ঠাহর হওয়া সহজ নয়।

বাক্স বা পেটরাকে পেট্রোলের টিন বলিয়া প্রত্যয় এক প্রকার hallucination. গুজবের মূল hallucination বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে Russian rumour নামে এক ধরণের গুজব প্রচার হয়; রুষ ফৌজ ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই ছিল ঐ গুজবের মর্ম, রুষ ফৌজের চিহ্নও নাই অথচ রাত্রিতে ফৌজ দেখিয়াছে এরূপ চাক্ষুষ সাক্ষীর অভাব হইল না। বাড়ির দাসীরা ফৌজ দর্শনে আতঙ্কিত হইয়া গৃহস্বামীকে নানারূপ প্রশ্ন দ্বারা অস্থির করিয়া তুলিল। ইহাকে hallucination ছাড়া আর কি বলা যায়? যাহা মনকে অভিভূত করিয়া রাখে তাহাই বিভ্রম জন্মায়। পত্রমর্মর বিরহিনী চিত্তে বল্লভের পদশব্দের ভ্রান্তি উৎপাদন করে, বৈষ্ণব কবির এই কল্পনা বিজ্ঞানসম্মত।

আজকাল complex কথাটা খুবই চলিত। কোন ব্যক্তি বা ব্যাপার দ্বারা যখন মন আলোড়িত হয়, তখন উহা কেন্দ্র করিয়া মনে তীব্র ভাবাবেগের এক জট বাঁধিয়া যায়। ইহারই নাম complex. complex দ্বারা ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা-কল্পনা প্রভাবিত হয়, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে একই চিন্তা ও কার্যের মধ্যে দিনের পর দিন চলিয়া যায়, অন্য কর্ম-চিন্তার অবকাশ থাকে না। 'দত্তা'র নরেন্দ্রের ভূতে পাওয়ার কথা মনে করুন, যে ভূত বেচারীকে সমস্ত কাজকর্ম ভুলাইয়া বিজয়ার বাড়ির সম্মুখের পথ দিয়া কয়দিন ঘোড়দৌড় করাইয়া ছাড়িল! অপরিচিত লোক দর্শনে গুণ্ডাজ্ঞান, পেটরাতে পেট্রোলের টিনভ্রম, অথবা শূন্য স্থানে ফৌজ দর্শন, সকলই complexএর ক্রিয়া—বনের বাঘের স্থলে মনের বাঘের ভীতি!

সামাজিক আপদ উপস্থিত হইলে মানুষের মনে যে

অস্থিরতা ক্রমে তাহাই ঘনীভূত হইয়া complexএর আকার ধারণ করে। এবং এই complexএর প্রভাবেই নানারূপ বিভ্রান্তি, অবাস্তব ভয় ভাবনা। কিন্তু কেন এইরূপ হয়? বহির্জগতে কোন প্রকার অবস্থান্তর ঘটিলে মন তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার নিমিত্ত ক্রিয়াশীল হয়—ইহা মনের স্বভাব। অবাস্তব চিন্তা-কল্পনা ও তজ্জনিত গল্প-গুজব সচকিত মনের আত্মরক্ষামূলক অক্ষম প্রতিক্রিয়া মাত্র।

২

আতঙ্কের গুজব anxiety rumour ছাড়া অন্য এক প্রকার গুজব আছে যাহাকে মনগড়া গুজব বা wishfulfilment rumour বলা যাইতে পারে।

বিলাতের এক স্কুলের তেরো বছরের ছাত্রী মেরী স্কুলের জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপবাদ সৃষ্টির দোষে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত হয়। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং এই বালিকা অপরাধিনীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিমত দিতে আহূত হইয়া অনুসন্ধানক্রমে জানিলেন—মেরী একদা স্বপ্ন দেখে, স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সন্তরণ ক্রীড়া। মেয়েদের ঘাটে জায়গার অভাবে মেরীকে ছেলেদের ওখানে যাইতে হইল। সেখানে এক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। মেরী তাহার সহিত বহুক্ষণ সাঁতার কাটিল। একটি ষ্টীমার যাইতে দেখিয়া শিক্ষকটি মেরীকে লইয়া উহাতে চাড়লেন। অনেকক্ষণ মনের আনন্দে ভ্রমণের পর তাহারা এক স্থানে অবতরণ করিলেন; সেখানে তাহাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হয়।

এই স্বপ্ন মেরী তিনটি বন্ধুকে বলিল। বন্ধুরা বলিলেন অন্য মেয়েদের কাছে। এইভাবে যাহা ছড়াইল তাহা এই যে, শিক্ষক মেয়েটিকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায় এবং অনুচিত আচরণ করে; ইহা যে স্বপ্ন এই বড় কথাটি শেষ পর্যন্ত খসিয়া পড়িল। বন্ধুরা নিজেদের অজান্তে মনের রংএ মূল বিবরণটি রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করলেন এবং ইহা যে স্বপ্নে দেখা ব্যাপার এই কথাটি হয় অস্পষ্ট রাখিয়া দিলেন কিংবা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরবর্তী প্রত্যেক শ্রোতা তাহাই করিল, ফলে স্বপ্নের সত্যেতে আশ্চর্য রূপান্তর! কিন্তু এরূপ হওয়ার কারণ কি?

বালিকাদের মনে শিক্ষক সম্বন্ধে একটা গূঢ় কামনা বিদ্যমান ছিল। বয়ঃসন্ধিকাল, যে কোন উপলক্ষ্য ধরিয়া অস্পষ্ট আবেগ কিশোর চিত্তে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। বিশেষত মেরীর যে একটা complex ছিলই তাহার স্বপ্নই তার স্পষ্ট প্রমাণ। মেরীর গোপন কামনা তৃপ্ত হইতে চাহিল স্বপ্নরচনার মধ্যে, অন্যেরা তৃপ্তি পাইল স্বপ্ন কাহিনীর অতিরঞ্জন ও রূপান্তর করিয়া। মেয়েরা প্রত্যেকেই অজ্ঞাতে মেরীর স্থানে নিজকে আরোপ করিয়া যে উপাদান সুখকর তাহাই মূল বর্ণনাতে সন্নিবেশ করিয়া দিল এবং যেহেতু স্বপ্ন হইলে সুখ হয় না, স্বপ্নের স্থানই রহিল না। অতএব নির্দোষ শিক্ষকের নামে যে অপবাদ রটিল তাহার মূলে আছে কিশোর চিত্তের অজ্ঞাত কামনার আবেগ।

যখনই কোন কুৎসা রটনা হয় তখন অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে কুৎসাকারীদের মনের গভীরে এক ইচ্ছার তাড়না বর্তমান। কুৎসা সেই গোপন ইচ্ছা মিটাইবার উপায় মাত্র। শেষ প্রশ্নের কমলের বিরুদ্ধে অক্ষয়ের যে বিষোদ্গার ইহ বাহ্য, তাহার অন্তরে ছিল অনিবৃত্তকাম যাহাকে মনোবিজ্ঞান frustration বলা হয়; আর ছিল সুন্দরী, সংস্কারমুক্তা কমলের প্রতি নিগূঢ় লিপ্সা যাহা তাহার সজ্ঞান মনের অপরিচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে কামনা থাকিলে কমলকে আক্রমণ করিবে কেন? ইহার দুইটি উত্তর সম্ভবঃ—(১) কামনার বস্তুকে আঘাত করিয়া কাম চরিতার্থ হয়, এই মনোভাবের নাম Sadism। (২) যেখানে কামনা অপ্রকাশ সেখানে তার অভিব্যক্তি বিপরীত। Stekelএর একটি সুন্দর কথা আছে (Disgust is desire negatively expressed.)

যখন দেখা যায় কেহ কোন স্ত্রী-চরিত্রে দোষারোপের চেষ্টা করিতেছে তখন মনে করিতে হইবে ইহাকে আঘাত করিয়া কুৎসাকারীর সুখবোধ হয়, অথবা কুৎসাকারীর অজ্ঞাত কামনা বিদ্বেষের মুখস পড়িয়া তাহাকে এবং অপরকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে আরও একটি মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে। অপবাদ সম্পর্কিত এক বা অধিক পুরুষের মধ্যে অপবাদকারী নিজকে অজ্ঞাতে আরোপ করিয়া লয় এবং অপবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় সুখাবেগ অনুভব করে। এখানে অপবাদকারী বলিতে অপবাদ শ্রবণকারীকেও বুঝিতে হইবে। 'বলেন কি মশায়, এ যে বিশ্বাস হতে চায় না। কী অসম্ভব! হে তারপর, তারপর!' এইরূপ উক্তি ভুল বুঝিবার কোনই কারণ নাই। এখানে একটা কথা হইতে পারে যে যাহার বিরুদ্ধে অপবাদ তাহার সহিত শ্রোতার পরোক্ষ অপরোক্ষ কোন পরিচয়ই না থাকিতে পারে অথচ অপবাদ শোনায় আগ্রহ থাকা সম্ভব। সম্ভব বটে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মনে করিতে হইবে শ্রোতার কাম-জীবনে কোথাও অতৃপ্তির গ্লানি জমা আছে; নিন্দা কুৎসা উপভোগের মধ্যে সেই অতৃপ্তি অপনোদনের চেষ্টা হয়। যে ব্যক্তির মন সুস্থ, কামজীবন দ্বন্দ্ববিরহিত কুৎসা অপবাদে তাহার রুচি নাই। সেজন্য বলিতেছি না কুৎসা উল্লেখ মাত্র তিনি কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন। কিন্তু হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, কিংবা কোন উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবানন্দ অবহেলা করিয়া নিন্দাচর্চা করা কখনই তাহার অভ্যাসের অন্তর্গত নয়।

অপবাদমূলক গুজব সম্বন্ধে একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। ইহার প্রসার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আপিসের নূতন সাহেবের চরিত্রের আলোচনা আপিসের কর্মচারীরা ব্যতীত অপরে করে না; হাসপাতালের নার্সবিশেষের অখ্যাতি হাসপাতালেই সীমাবদ্ধ। কুৎসা নিন্দা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গন্ডীর প্রতিক্রিয়া, সমগ্র সমাজের নয়। তাই দাঙ্গা হাঙ্গামার গুজবের তুলনায় ইহার শক্তি সামান্যই।

যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কিরূপ মনগড়া গুজব উঠে সকলেই দেখিতেছেন, দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। এই প্রবন্ধের গোড়ায় রুশ-জার্মান সন্ধির গুজবের উল্লেখ করিয়াছি। রুশ-

(শেষাংশ ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আজ-কাল

সুদূর প্রাচ্যে জাপানী মেঘ

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ কিছুকাল সকলের অখণ্ড মনোযোগ আকৃষ্ট করে' রাখার পর হঠাৎ সুদূর প্রাচ্য তাতে ভাগ বসিয়েছে। প্রথমে খবর আসে যে, জাপান ফরাসী ইন্দোচীনের পূর্ণ দখল চেয়ে এক চরমপত্র দিয়েছে; তারপর খবর পাওয়া যায় যে, পেত্যাঁ-গভর্নমেণ্ট জাপানকে ইন্দোচীনে নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটি দিয়ে জাপ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে এক চুক্তি করে' ফেলেছেন। সোমবারে দুই পক্ষের যে সরকারী বিবৃতি বের হয়েছে তাতে জানা গেল যে, গত ২৩শে জুলাই হানয়ে জাপ সামরিক মিশন ও এডমিরাল দেকুর মধ্যে "যুক্তভাবে ইন্দোচীন" রক্ষার জন্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী জাপান ইন্দোচীনে ৮টা বিমানঘাঁটি ও কয়েকটা নৌঘাঁটি পেয়েছে এবং ইন্দোচীনে সৈন্য রাখবার অধিকার পেয়েছে। এই সৈন্যের সংখ্যা ৪০ হাজার। শনিবার থেকেই জাপ সৈন্য ও বিমান ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলো দখলে নিতে আরম্ভ করেছে।

ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবস্থা

প্রথমে মনে হয়েছিল, এই নিয়ে জাপানী ও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মধ্যে যুদ্ধ বুঝি বেধে গেল। বৃটেনের সুর গরম হয়ে গেল, আমেরিকা জাপানকে ইন্দোচীনে আক্রমণকারী বলে' অভিহিত করল। তারপর তারা ব্যবস্থা অবলম্বন করল—কিন্তু সেটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; তাও অবরোধ নয়, অর্থনৈতিক চাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্য জাপানের সম্পত্তি আপাতত আটক করেছে। প্রথমে রটানো হয়েছিল যে, জাপানী জাহাজগুলোও এই ব্যবস্থার মধ্যে পড়বে; কিন্তু এখন প্রকাশ করা হয়েছে যে, জাপানী জাহাজের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। ভারতবর্ষ থেকেও জাপ জাহাজকে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রাক্কালে লোহা নিয়ে চলে' যেতে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন ব্যবস্থায় নানা-রকম রেহাইও দেওয়া হয়েছে। ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ জাপ আমদানী রপ্তানির উপর শুধু সরকারী কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করেছে। এ সবের জবাবে জাপানও বৃটিশ, মার্কিন ও ডাচ সম্পত্তি আটক করেছে।

ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবস্থার যে রকম দেখা যাচ্ছে তাতে অর্থনৈতিক চাপ শেষ পর্যন্ত না নৈতিক চাপে পর্যবসিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এতদিন জাপানকে আস্কারা দিয়ে এসেছে, একথা প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্টের এক বিবৃতিতে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান যাতে সংঘর্ষ বাধাবার ছুতো না পায় সেজন্যে আমেরিকা তাকে তেল সরবরাহ করে' এসেছে। আমেরিকা জাপানকে অন্য সমর-পণ্যও দিয়েছে। একেই তোষণ-নীতি বলে। এই তেল আর সমরোপকরণ দিয়ে জাপান চীনের বিরুদ্ধে এতদিন যুদ্ধ চালিয়েছে; অথচ চীনের প্রতি মৈত্রী জানিয়ে বক্তৃতা দেবার কোনো সুযোগ মার্কিন নেতারা ছাড়েন নি। বৃটেনও জাপানকে বরাবর মাল সরবরাহ করেছে। ইন্দোচীন দখল করে নেওয়ার পরে বৃটেন ও আমেরিকা যতখানি বাধা দেবে বলে' আশা করা গিয়েছিল, কার্যত সে আশা পূর্ণ হ'ল না। কিন্তু কতদিন এভাবে চলতে পারে? পরাজিত, অধঃপতিত ও ইংরেজের প্রতি বিতৃষ্ণ ফরাসী কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে ইন্দো-চীনকে আয়ত্তে আনা জাপানের পক্ষে যে রকম সহজ, দুর্বল থাই-ল্যাণ্ডকে ভয় দেখিয়ে আয়ত্তে আনা তার চেয়ে কঠিন নয়। এর মধ্যেই শোনা গেছে যে, সে থাইল্যাণ্ডের কাছে বিমানঘাঁটি ও নৌ-ঘাঁটি দাবী করেছে। এ সংবাদ এখনো সমর্থিত না হলেও এরকম সম্ভাবনা খুবই রয়েছে। বর্মা ও মালয়ের সীমান্ত-সংলগ্ন থাইল্যাণ্ড দখল করলে বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং প্রচুর সম্পদসমৃদ্ধ ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন হবে। তখন কি বৃটেন-আমেরিকার পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে? বোধ হয় এই বিপদ বিবেচনা করে' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সুদূর প্রাচ্যে তার অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনীকে অপ্রকাশিত গন্তব্যস্থলে পাঠিয়েছে; আর বৃটেন অস্ট্রেলিয়ায় ও মালয়ে তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করছে। এদের একমাত্র বাঁচোয়া জাপান যদি এখনও উত্তরে সোভিয়েট এলাকার দিকে ঘুরে যায়। কিন্তু সে ভরসা তারা কি বাস্তবিকই করে? সোভিয়েট যেভাবে জার্মানীর সঙ্গে লড়াই করছে, তা দেখে জাপান সহজে তাকে ঘাঁটাবে বলে' তো মনে হয় না।

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের বর্তমান গতি সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে আগের চেয়ে আরো ভালো। স্মলেন্স্ক জার্মানরা দখল করেছে বলে' সোভিয়েট আজ পর্যন্ত স্বীকার করে নি। গত ১৬ই জুলাই থেকে সোভিয়েট ইস্তাহারে এই কথাই বলে' আসছে যে, স্মলেন্স্ক-এর দিকে লড়াই চলছে। তবে রয়টারের প্রতিনিধি ও মার্কিন সংবাদদাতারা বলছেন যে, স্মলেন্স্ক এখনো সোভিয়েটের হাতে আছে এবং বরাবরই ছিল; জার্মান সৈন্যদল একবার স্মলেন্স্ক-এর উপকণ্ঠে এসেছিল; কিন্তু তারা বিতাড়িত হয়। সোভিয়েট প্রচার-সচিব মঃ লজোভ্স্কি বলেন যে, স্মলেন্স্ক-এর বিরাট যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এখন দেওয়া হবে না, জার্মানরা সেখানে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে দেওয়া হবে। কিন্তু জার্মান ইস্তাহারে বলা হচ্ছে যে, স্মলেন্স্ক যুদ্ধের সফল অবসান এগিয়ে আসছে। যাই হোক, দুই পক্ষের বিবরণ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, স্মলেন্স্ক-এর দিকেই জার্মানী সবচেয়ে বেশী শক্তি প্রয়োগ করেও এখনো এগিয়ে যেতে পারছে না। এক জায়গায় জার্মানী কখনো এর আগে এতদিন ঠেকে থাকে নি। লেনিনগ্রাডের দিকেও জার্মানরা আর অগ্রসর হতে পারে নি। দক্ষিণে সোভিয়েট সৈন্যেরা নভোগ্রাড-ভলিন্স্ক থেকে সরে' কিয়েভের শ'খানেক মাইল পশ্চিমে জিতোমির-এ লড়াই করছে। ১৩ই জুলাই জার্মান ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে, জার্মান বাহিনী কিয়েভের দ্বারদেশে পৌঁছে গেছে; কিন্তু তারপর আর কিয়েভের উল্লেখ করা হয় নি। উত্তরে লাডোগা ও ওনেগা হ্রদের মধ্যে মুরমান্স্ক-লেনিনগ্রাড রেলপথে অবস্থিত পেট্রো-জাভোড্স্ক-এর দিকে লড়াইয়ের কথা একদিন সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয়েছিল; কিন্তু আর কোনো বড় যুদ্ধ ওদিকে হয় নি। বল্টিকে কয়েকটি নৌসংঘর্ষ হয়েছে; সোভিয়েট ইস্তাহারে একাধিক দিন জার্মানদের অনেকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন রণক্ষেত্রে কতকগুলো জার্মান ডিভিসন, রেজিমেণ্ট ও ব্যাটালিয়ন (মেকানাইজড্, সাঁজোয়া ও পদাতিক) ধ্বংস করে' দেওয়া হয়েছে বলে সোভিয়েট দাবী করেছে। জার্মান লাইনের পেছনে সোভিয়েট গরিলা যোদ্ধাদের কৃতিত্ব ও অসমসাহসের নানা তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে।

গত সোমবার থেকে মস্কোর উপর জার্মান নৈশ বিমানহানা

চলছে, মাঝে একবার দুদিন ও একবার একদিন বাদ গেছে। সোভিয়েট বলছে, প্রত্যেকবার জার্মানদের যুদ্ধবন্ধ হানা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। জার্মানী বলছে, ব্যাপক আক্রমণে মস্কোর প্রভূত ক্ষতি করা হয়েছে।

এ সপ্তাহে যুদ্ধের মোট কথা এই যে, রুশিয়ায় জার্মানদের প্রথম অভিযানের চেয়ে দ্বিতীয় অভিযানের বেগও কম, সাফল্যও কম। তাদের প্রচুর ক্ষতিও যে হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। আক্রমণকারীর পক্ষে এ অবস্থা সুবিধের নয়। সোভিয়েটের হাতে যদি যথেষ্ট রিজার্ভ সৈন্য থেকে থাকে (বাইরের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আছে) তাহলে ভবিষ্যতে সে সুযোগ বুঝে ব্যাপক পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করবে এবং তখন জার্মানীর পক্ষে সামাল দেওয়া খুব কঠিন হতে পারে।

গ্যাস ব্যবহারের অভিপ্রায়?

যুদ্ধের পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে দুই পক্ষের মোট ৩০ লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে' জানা যায়। এক সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্মান হাইকমান্ড বিভিন্ন সৈন্যদলের কাছে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের নির্দেশপত্র পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে; কারণ এই রকম একটা নির্দেশপত্র পরাজিত জার্মান সৈন্যদলের কাছ থেকে সোভিয়েট সৈন্যেরা হস্তগত করেছে। জার্মানী স্বীকার করেছে যে, এই রকম নির্দেশপত্র পাঠানো হয়েছে; তবে সেটা একটা রুটিনগত ব্যাপার মাত্র। অনেকেরই আশংকা, এই যুদ্ধে বিষবাষ্প ব্যবহৃত হবে; জার্মানী যদি দেখে যে, তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠছে, তাহলে সে বিষ ব্যবহার করতে পিছপাও হবে না। সেক্ষেত্রে সোভিয়েটও বিষ ব্যবহার করবে। তখন ধ্বংসের পূর্ণ তাণ্ডব শুরু হয়ে যাবে। সোভিয়েট সৈন্যেরা জিতোমির-এ আর একটা গুপ্ত দলিল পেয়েছে; তাতে তুরস্কের উপর জার্মানীর আক্রমণের প্ল্যান ছিল। জার্মানী কিন্তু এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বিমান হানা

এ সপ্তাহে বৃটিশ বিমানবহর জার্মানীর অন্যান্য ঘাঁটি আক্রমণ ছাড়াও বার্লিনের উপর হানা দেয়। জার্মান বিমানও ৩২ রাত চুপচাপ থাকার পর গত রবিবারে লন্ডনে নৈশ আক্রমণ করে। কিছু ক্ষতি হয় ও কিছু লোক হতাহত হয়। অন্য কয়েক জায়গাতেও জার্মানেরা বোমা ফেলে।

দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী ষড়যন্ত্র?

দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসীরা নাকি ব্যাপক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেছে। মার্কিন সরকারী মহল বলেন যে, ব্রেজিল, বলিভিয়া ও কলম্বিয়া এই তিনটে দেশ তাদের অভ্যুত্থানের কেন্দ্র। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অন্য কয়েকটা দেশেও নাৎসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। বলিভিয়া জার্মান দূতকে বহিষ্কৃত করেছে, আর্জেণ্টিনায় নাৎসী দূতাবাসে হানা দিয়ে পুলিস থানাতল্লাস করে এবং পেরুতে জার্মান কন্সালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পেরু-ইকুয়াডর সংঘর্ষ আবার সালিশে মিটমাট করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভারতবর্ষ

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট

বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট যে কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন, সেই কমিশন ১৯৪০-এর মার্চ মাসে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। কমিশন প্রধানত সুপারিশ করেন যে, গভর্নমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দিন এবং সমস্ত খাজনাভোগীর ভূস্বত্ব কিনে নিয়ে চাষীকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীনে আনুন। যে প্রজা ও কোর্ফা প্রজা নগদ খাজনায় জমি বিলি করে তাদের স্বত্বও কমিশন গভর্নমেণ্টকে কিনে নিতে বলেন। কমিশনের অধিকাংশ সদস্য জমিদার ও পত্তনিদার প্রভৃতির নিট আয়ের দশ গুণ হারে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভূস্বত্ব গভর্নমেণ্টকে নিয়ে নিতে সুপারিশ করেছেন। এজন্যে গভর্নমেণ্টের মোট ৯৮ কোটি টাকা লাগবে। এ ছাড়া বাকী খাজনার অর্ধেক জমিদারেরা পাবে, কমিশন এই রায় দিয়েছেন। কমিশন কৃষি আয়কর বসাতে ও প্রজাস্বত্ব সংশোধন করতেও বলেন। খাজনার বর্তমান হারও তাঁরা বজায় রাখতে বলেন।

জমিদারকে বিপুল ক্ষতিপূরণ দিয়ে ও বকেয়া খাজনা কৃষকের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে এবং খাজনার হার এখনকার মতোই রেখে কৃষক ও গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করলে কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হতে পারে না। খাসমহল প্রজাদের দুরবস্থা তার প্রমাণ।

কিন্তু বাঙলা গভর্নমেণ্ট কমিশনের এই রিপোর্টেও স্বস্তি না পেয়ে রিপোর্ট পরীক্ষা করবার জন্য নিযুক্ত করলেন মিঃ গার্নারকে। তিনি আবার জমিদারদের ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দিতে বললেন এবং কমিশনের সুপারিশের আরো সব খুঁত দেখিয়ে দিলেন।

তবুও গভর্নমেণ্ট খুশী হলেন না। গত সোমবারে মিঃ গার্নারের সুপারিশ সহ ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করে' গভর্নমেণ্ট বললেন যে, এ সম্বন্ধে এখন শুধু আলোচনা হোক; তাঁরা এখন কিছু মত প্রকাশ করবেন না, এখন তাঁরা সদস্যদের মত জানতে চান। হয়তো তাঁরা শেষ পর্যন্ত বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার করবার আগে মাদাগাস্কার, আলাস্কা, গুয়াতেমালা, কামচাট্‌কায় সকলের সুচিন্তিত অভিমত নেবার চেষ্টা করবেন। ততদিন চাষীরা যেন ধৈর্য ধরে' থাকে।

বাঙলার জন-প্রতিষ্ঠানগুলির দাবী এই যে, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে, বাকী খাজনা রেহাই দিতে হবে এবং কৃষককে জমির মালিক করতে হবে এবং খাজনা কমিয়ে দিতে হবে। তা নইলে বাঙলার কৃষকদের অবস্থার কোনো প্রতিকার হতে পারে না। বাঙলার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিও সেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে বলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এখানকার ভূসংস্কারে প্রবর্তন করা উচিত। তবে তিনি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন।

পুণা সম্মেলন

পুণায় দলনিরপেক্ষ নেতাদের সম্মেলন হয়ে গেছে। স্যার তেজবাহাদুর ছিলেন সভাপতি। শ্রীজয়াকর, সচ্চিদানন্দ সিংহ, রাধাকৃষ্ণণ, মির্জা ইস্মাইল প্রভৃতি যে সব বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কোনো অনুচর নেই তাঁরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণে খানিকটা খুশী হয়ে সম্মেলন মত প্রকাশ করেছে যে, শাসন-পরিষদের সমস্ত দপ্তরই ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেবার দাবী জানানো হয়।

* * *

রবীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় আনা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভালো।

২৯-৭-৪১

—ওয়াকিবহাল

সিনেমার গল্প

বাঙলা দেশের জনৈক প্রখ্যাতনামা চিত্র পরিচালকের পরিচালিত সাম্প্রতিক একখানি ছবির গল্প সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হওয়ায় তিনি সদম্ভে বলিয়াছিলেন 'গল্প একটা কিছু হলেই হোলো, পরিচালনাই তো ছবির সব কিছু।'

গল্প 'একটা কিছু হলেই' যে হয় না তার প্রমাণ উক্ত পরিচালকের পরিচালিত ছবিখানি শ্রেষ্ঠ নটনটী সম্মেলন ও শ্রেষ্ঠ (?) পরিচালনা সত্বেও ছবিটি'র আয়ুষ্কাল কমিয়া আসিয়াছে, ১৪ সপ্তাহেই প্রেক্ষাগৃহ প্রায় শূন্য।

ভাল গল্পের অভাবেই আমাদের বাঙলাদেশের সিনেমায় যে এই দুর্দশা, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া বহুবার বহুপ্রকার ঠকিয়াও আমাদের ষ্টুডিও মালিক আর পরিচালকদের দৃষ্টি খুলিল না। অথচ গল্পই সিনেমার মেরুদণ্ড, গল্পের উপর ভর করিয়াই ছবিকে দাঁড়াইতে হয়। কারণ গল্প ছাড়া সিনেমা আর কিছু বলে না। দৃশ্যে, অভিনয়ে, সুরে ও সংগীতে শেষ পর্যন্ত সিনেমা যাহা দেখাইবে এবং শুনাইবে তাহা একটি গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রেক্ষাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসার পরও দর্শকের মনে যে ছাপ থাকিয়া যায় তাহা গল্পেরই, সুতরাং গল্পটি যাহাতে মনোহরণ করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া চাই।

বাঙলা দেশ গল্পের রাজা অথচ সিনেমায় ভালো গল্প দুর্লভ। পরিচালকদের নির্দেশানুসারে অক্ষম হস্তে ফরমাসী গল্প লিখাইয়া লইলে তাহা কখনই জাতে উঠিতে পারে না, কারণ গল্পেরও জাত আছে। আমাদের দেশের সিনেমাতে যে সব গল্প আজকাল রূপান্তরিত হইতেছে তাহাদের জাত-বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও জাতেই তাহারা পড়ে না, এমন কি তাহাদের বি-জাতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ গল্পেই চৌর্যপ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হয় বিদেশী গল্প নতুবা বাঙলা দেশের শরৎচন্দ্র প্রমুখ জাত-লিখিয়েদের গল্প অনুসরণে সিনেমার গল্প খাড়া হইতেছে এবং মারাও পড়িতেছে। এ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে আমাদের চোখের সামনেই ছবির কতগুলি ঘটনা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' হইতে চু[রি] করা হইয়াছে, কোন একটি সদ্য প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা[য়] তাহা পড়িলাম। অপর একখানি চলতি ছবির কাহিনীর গোঁজামিল রহিয়াছে; খানিকটা লওয়া হইয়াছে শৈলজানন্দ[র] 'ডাক্তার' হইতে খানিকটা 'রিক্তার', আবার কোন একটা প্রধা[ন]

নিউ থিয়েটার্সের 'মীনাক্ষী' চিত্রে সাধনা বোস।

চরিত্র নাকি শরৎচন্দ্র হইতে চুরি। সুতরাং এ কাহিনীও য[দি] মার খায় তবে বিস্মিত হইব না।

সিনেমা ফাঁকির জিনিস নয়, শিল্প বলিয়াই ইহা[কে] সম্মান দিয়া থাকি। ইহার জন্য চাই সৃজনী শক্তিসম্পন্ন হৃদয়। আমাদের দেশের সিনেমা-শিল্পীদের মধ্যে এ[ই] সৃজনী শক্তির অভাব অত্যন্ত বেশী এবং সেই কারণেই প্রতি পদে তাঁহারা ব্যর্থ হইতেছেন। সিনেমা-শিল্পের যাঁহা[রা]

সমর বার্তা

২৩শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—জার্মান বিমান দ্বিতীয়বার মস্কোতে হানা দেয়। মস্কোর ইস্তাহারে বলা হয় যে, পেট্রোজাভোডস্ক (ল্যাডোগা হ্রদের তীরে), পরহোভ, স্মলেনস্ক ও জিতোমির-এর দিকে ২২শে জুলাই প্রবল যুদ্ধ চলে। সোভিয়েট বিমানবহর ৮৭টি জার্মান বিমান ধ্বংস করে। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, স্মোলেনস্ক এখনও রাশিয়ানদের অধিকারে আছে।

ইন্দোচীন—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, জাপবাহিনী কর্তৃক ইন্দোচীন দখলের দাবী করিয়া গতকল্য জাপান ২৪ ঘণ্টার মেয়াদে এক চরমপত্র দিয়াছে।

২৪শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, ২৩শে জুলাই পলোট্স্ক-নেভেল, স্মলেনস্ক ও জিতোমিরের দিকে এবং বেসারেবিয়ান রণাঙ্গনে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই চালান হয়। বেসারেবিয়ার এক স্থানে রুশ সৈন্যেরা শত্রুর একটি মোটরাইজড্ রেজিমেন্টকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া বহু সমরোপকরণ হস্তগত করে। সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী বলে যে, সোভিয়েট বোমারু বিমান ও ডেস্ট্রয়ারগুলিকে জার্মান কনভয়ের ১০টি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। মস্কোর বেতারে বলা হয় যে, জার্মান কম্যান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল ব্রাউশিচ এবং সেনাপতি-মণ্ডলীর কর্তা ফিল্ড মার্শাল কাইটেলকে জার্মান বাহিনীর অসন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য অভিযান পরিচালনার কার্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভিসির সংবাদে বলা হয়, ইন্দোচীন সম্পর্কে জাপ ও ভিসি গভর্নমেণ্টের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। জাপান কর্তৃক ফ্রান্সের নিকট ইন্দোচীন অধিকার সম্পর্কে চরমপত্র দানের কথা ভিসির সরকারী মহল অস্বীকার করেন।

২৫শে জুলাই—

ইন্দোচীন—ইন্দোচীন সম্পর্কে ভিসি গভর্নমেণ্টের সহিত জাপ গভর্নমেণ্টের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হানয়ের বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ আগামী ২৯শে জুলাই হইতে জাপানীরা দক্ষিণ ইন্দোচীনের বিমান ও নৌ-ঘাঁটিগুলি দখল করিবে এবং তথায় সৈন্য মোতায়েন করিবে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—রুশিয়ার এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, স্মোলেনস্ক অঞ্চলে নবাগত পঞ্চম পদাতিক ডিভিসনটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। জার্মান বিমান মস্কোর উপর হানা দেয়। জার্মান হাই-কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হয় যে, সমগ্র রণাঙ্গনে পরিকল্পনানুযায়ী সংগ্রাম চলিতেছে।

২৬শে জুলাই—

জাপান কর্তৃক দক্ষিণ ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলি অধিকারের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আমেরিকা, বৃটেন, কানাডা ও ভারত গভর্নমেণ্ট জাপানের সমস্ত সম্পত্তি আটক করেন। জাপ সরকার আমেরিকা ও বৃটেনের সমস্ত সম্পত্তি আটক করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

২৭শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—মস্কোর এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, স্মোলেনস্ক এবং জিতোমিরের (ইউক্রেন) দিকে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। অন্যান্য রণক্ষেত্রে কোন বড় যুদ্ধ হয় নাই। স্মোলেনস্কের দিকে সংঘর্ষকালে সোভিয়েট সৈন্যরা শত্রুপক্ষের একটি যান্ত্রিক ও দুইটি পদাতিক ডিভিসন ধ্বংস করিয়াছে। জার্মানরা মস্কোকে ব্যাপক নৈশ বিমান আক্রমণের চেষ্টা করে। মাত্র কয়েকটি বিমান নগরীর উপর পৌঁছায়। মস্কোর সামরিক লক্ষ্যস্থানে হানা দিতে অক্ষম হইয়া জার্মান বোমারু বিমানগুলি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিশু হাসপাতালের বোমাবর্ষণ করে। কেহই হতাহত হয় নাই।

ইন্দোচীন—গতকল্য কতকগুলি জাপানী বোমারু বিমান এবং সাঁজোয়া গাড়ী সর্বপ্রথম সাইগনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তদুপরি সাইগনে চারখানি জাপ ডেস্ট্রয়ার এবং কামরাণ উপসাগরে একখানি জাপ ক্রুজার ও তিনখানি জাপ যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন রাখা হইয়াছে। আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য কম্বোডিয়ার কোন এক বন্দরে জাপ সৈন্য অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। জাপ মিশনের অধ্যক্ষ জেনারেল সুমিতা কতিপয় নৌ-বিভাগীয় কর্মচারীদের সহিত সাইগনে পৌঁছিয়াছেন।

২৮শে জুলাই—

থাইল্যাণ্ড—চুংকিংয়ের এক খবরে প্রকাশ, জাপান থাই গভর্নমেণ্টের নিকট থাইল্যাণ্ডে নৌ ও বিমান ঘাঁটি পাইবার জন্য দাবী উপস্থিত করিয়াছে। লণ্ডনে এ সংবাদ সমর্থিত হয় নাই।

ইন্দোচীন—টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, জাপ প্রিভি কাউন্সিলের এক অতিরিক্ত বৈঠকে জাপ-ইন্দোচীন "যুক্ত দেশরক্ষা চুক্তি" অনুমোদিত হইয়াছে। হানয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানী সৈন্যদল দক্ষিণ ইন্দোচীনে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী জাপানীদিগকে সাইগন ও সিয়েমরীপ বিমান ঘাঁটি সহ আটটি বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—একটি সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, মস্কোর পথে সোভিয়েট ব্যূহ বিধ্বস্ত করিবার জন্য হিটলারের দ্বিতীয় চেষ্টা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কোন কোন স্থানে রুশেরা তীব্র পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। বল্টিকে সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণে প্রতিপক্ষের পাঁচটি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ২৬শে জুলাই সোভিয়েট বিমানবহর ১০৪টি জার্মান বিমান ধ্বংস করে। জার্মান ইস্তাহারে বলা হয় যে, স্মোলেনস্কের যুদ্ধ সাফল্যের সহিত শেষ হইতে চলিয়াছে এবং আবেষ্টনীর মধ্যে নিপতিত সোভিয়েট সৈন্যদিগকে উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ইউক্রেনে এবং উত্তরে ফিন রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী আরও অগ্রসর হইয়াছে।

২৯শে জুলাই—

রুশ-জার্মান যুদ্ধ—মস্কোর সংবদে প্রকাশ, সোমবার রাত্রে ১৪০ হইতে ১৫০টি জার্মান বিমান আক্রমণের উপর সংঘবদ্ধ বিমান-আক্রমণের চেষ্টা করে। বিমানধ্বংসী গোলার বেড়াজাল এবং নৈশ জঙ্গী বিমান জার্মান বিমানদলগুলিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং তাহাদিগকে মস্কোর উপর আসিতে দেয় নাই। মাত্র ৪টি কি ৫টি শত্রু বিমান শহরে পৌঁছিয়াছিল। এক সোভিয়েট ইস্তাহার হইতে মনে হয় যে, মস্কোর পথে সোভিয়েট ব্যূহ বিধ্বস্ত করিবার জন্য হিটলারের দ্বিতীয় চেষ্টা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জার্মানদের ইস্তাহারে এস্তোনিয়া ও বেসারেবিয়ায় জার্মানদের সাফল্যের দাবী করা হয়।

কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সতর্কবাণী করেন যে, বৃটেন আক্রমণের সময় পুনরায় আসন্ন। ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে সমবেতভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইন্দোচীন—হানয়-এর এক সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, দক্ষিণ ইন্দোচীনে ৪০ হাজার জাপানী সৈন্য অবস্থান করিবে। লণ্ডনে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপ বাহিনী কামরাণ উপসাগর দখল করিয়াছে। ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীনের কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ ইন্দোচীনে জাপানকে ৮টি বিমানঘাঁটি এবং থাইল্যাণ্ডের নূতন সীমান্তে একটি বিমানঘাঁটি প্রদান করিতেছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৩শে জুলাই—

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (গণেন মহারাজ) তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৫ সপ্তাহ যাবৎ তিনি রক্তের চাপে ও হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তরুণ বয়সে রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশ করেন এবং দীর্ঘকাল উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

মুড়াপাড়ার জমিদার রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এল সি'র বাস্তু ভিটার অন্তর্ভুক্ত যে ভগ্ন অট্টালিকা এক শ্রেণীর মুসলমান মসজিদ বলিয়া দাবী করে, তৎসম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারা অনুযায়ী যে মামলা রুজু হইয়াছিল, অদ্য ঢাকার এক্সট্রা এডিশন্যাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর এস টি জনের এজলাসে উহার শুনানী আরম্ভ হয়।

২৪শে জুলাই—

ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির শুনানী আরম্ভ হইলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষীয় প্রথম সাক্ষী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

২৫শে জুলাই—

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ, কবিকে কবিরাজী মতে যে চিকিৎসা করান হইতেছিল কলিকাতায় আসার পর তাহা বন্ধ করিয়া এলোপ্যাথী মতে তাঁহার চিকিৎসা চালান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

দেশরক্ষা সামরিক প্রয়োজন এবং বিশেষ জরুরী অবস্থায় অসামরিক প্রয়োজন ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন লৌহ ও ইস্পাত যাহাতে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেন্ট লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে নূতন আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে আমলে আসিবে। উক্ত আদেশ অনুসারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, টাটা কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার এবং বর্তমানে ইস্পাত সরবরাহ সম্পর্কে গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা মিঃ জে সি মহীন্দ্র লৌহ ও ইস্পাত কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

যশোহরের সাব-জজ মিঃ টি সি ব্যানার্জি যশোহর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ওয়ালিয়র রহমান এম এল এ'র আপীলের স্বপক্ষে এক রায় প্রদান করিয়াছেন। জজ উহাতে মিঃ রহমানকে মামলার খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রকাশ, কর্তব্যের প্রতি অবহেলার অভিযোগ করিয়া জিলা বোর্ডের কয়েকজন সদস্য এক সভায় মিঃ রহমানের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী বাঙলা গভর্নমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের এক আদেশক্রমে মিঃ রহমান চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসারিত হন। জজ রায় দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, জিলা বোর্ডের প্রস্তাব এবং গভর্নমেণ্টের আদেশ বিধিবহির্ভূত হইয়াছে।

২৬শে জুলাই—

পুণায় স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে দল নিরপেক্ষ ম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্যার সাপ্রু এক ঘণ্টাকাল বেং বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের দাবী সম্পর্কে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ও রতসচিবের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। বড়লাটের সন পরিষদের নূতন ভারতীয় সদস্যদের হস্তে দেশরক্ষা, অর্থ স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার অর্পিত না হওয়ায় বক্তা ক্ষোভ প্রকাশ রেন।

ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর এস টি জন ড়াপাড়া দাঙ্গার মামলায় রহম আলী, সুলতান ও মুজাফরের রুদ্ধে চার্জ গঠন করিয়াছেন।

ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ কর্তৃক "খাদি জগতের" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে মহাত্মা গান্ধী একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার এক স্থানে গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "এই রক্তাক্ত যুদ্ধে এই কথাই সূচিত হইতেছে যে, যন্ত্রবাদের দ্বারাই ভবিষ্যতে পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে এ কথাও সূচিত হইতেছে যে, হস্তশিল্পই মৃতকল্প বিশ্বে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিবে। চরকা দুই লক্ষাধিক হিন্দু ও মুসলমানের জীবিকা সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছে। উহা সমস্ত খদ্দরধারী ভারতবাসীর প্রতীক এবং তাহাদের মারফৎ সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতীক।"

২৭শে জুলাই—

পুনায় স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে দল নিরপেক্ষ সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে মিঃ এম আর জয়াকর কর্তৃক উত্থাপিত মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে যুদ্ধের পর বৃটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করিবার দাবী করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতের সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ প্রধান ভিত্তির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করা উচিত, তাহা নির্ণয়ের জন্য আশু ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করা হয় এবং সম্মেলন উহার সভাপতি স্যার সাপ্রুর উপর আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার অর্পণ করেন।

২৮শে জুলাই—

বাঙলা সরকার সংবাদপত্রে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৩৯ সালের ১৯ই নবেম্বর বাঙলা সরকার এই মর্মে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে ৪০ জন বৈপ্লবিক বন্দীকে সর্তাধীনে মুক্তিদানের সুপারিশ করা হইয়াছে, তাঁহারা সরকারের বর্ণিত সর্তাবলী মানিয়া লইলেই যে-কোন সময়ে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইবে। তদনুসারে দশজন বিপ্লবী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের প্রতিবাদ-কল্পে নিখিল বঙ্গ বাঙালী মুসলমান সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হয়। নিখিল বঙ্গ বাঙালী মুসলমান সমিতির প্রেসিডেণ্ট সৈয়দ হবিবর রহমান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং প্রথম দিনই পরিষদে ভূমি-রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের আলোচনা চলে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে চারিটি সরকারী বিল পেশ করা হয়।

২৯শে জুলাই—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনাকালে বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কংগ্রেসী দলের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, জমিদারী ও জমির অপরাপর সর্বপ্রকার খাজনাভোগী স্বত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক ক্রয় করার জন্য কমিশন যে প্রধান সুপারিশ করিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার দলভুক্ত সুপারিশের সহিত একমত। বিতর্কের শেষের দিকে রাজস্ব সচিব স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে কয়েকটি ব্যক্তিগত আক্রমণ করায় পরিষদে উত্তেজনা ও বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

বড় হওয়ার জ্বালা অনেক। যাঁরা রাজা হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি তাঁরা নিজেদের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়ে সিংহাসনে উপবেশনের আনন্দ কল্পনা করেন। রাজা হওয়ার সুখ থাকতে পারে, কিন্তু যন্ত্রণা কম নয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রাজাদের দুর্ভাগ্যের যে ইতিহাস আছে তা পড়ে করুণা জাগে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রাজা যে শান্তিতে রাজত্ব চালিয়ে অমর হ'য়ে গেছেন এমন বোধ হয় বেশী পাওয়া যাবে না। যে সব রাজার রাজত্ব বড়, তাঁদের বিপদও বড়, ঘরে বাইরে শত্রুও অনেক। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রাণ থাকতে কেউ অপরের বশ্যতা স্বীকার করবেন না, শত্রুর বিক্রমে রাজত্ব অধিকারচ্যুত হয়েছে, রাজ পরিবার পাহাড়ের গুহায়, অরণ্যের গভীরতার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ফিরছেন। রাজবেশ রাজার দেহ থেকে নেমে এসেছে, সামান্য মাত্র বস্ত্র দিয়ে পুরনারীরা লজ্জা নিবারণ করছেন। বিজয়ীরা রাজকোষ লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে ভোজনের আনন্দে মেতে উঠেছে। এ দিকে রাজার অন্ন নেই, ছেলেমেয়েরা রোদের তাপে মাখনের মত গলে পড়ছে, ঘাসের বীজ থেকে তৈরী রুটি, ছোট ছেলের হাত থেকে তুলে নিয়ে বন্য শ্বাপদ ছুটে চলেছে। এই দৃশ্যের মধ্যে রাজা পাথরের মত বসে আছেন; প্রতিজ্ঞা তাঁর দৃঢ়, বিজাতীর কাছে মাথা নীচু করবেন না। রাজত্ব, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, নিজের জীবন সম্মানের কাছে তুচ্ছ। বাপ প্রপিতামহদের আভিজাত্য তার সামনে তখন বহুমূল্য, হীরা জহরতের চাকচিক্য চোখের উপর অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে। চোখের উপর দাঁড়িয়ে আছে দেশবাসী। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্ত দিয়ে তারা রণক্ষেত্র রাঙা করে তুলেছে! সৈন্য নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কামানের মুখে তরবারির ধার মরে গিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তবু তারা পরের হাতে স্বাধীনতা তুলে দিবে না। সন্ধিপত্র বার বার রাজাকে লোভ দেখিয়েছে, প্রচণ্ড আক্রমণ তাদের ছত্রভঙ্গ করেছে, রাজা দেশবাসীর স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নি। বাধ্য হয়ে রাজপ্রাসাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ ক'রে দীন বেশে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে যুদ্ধের বহ্নি অগ্রসর হয়ে চলেছে; সম্মান এবং শান্তি হারিয়ে কত মহারথীরা গৃহছাড়া হয়েছে। অদৃষ্টের এ নিষ্ঠুর পরিহাস মানুষের ভাগ্যে বড়ই মর্মন্তুদ। জনসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে সম্মানিত ব্যক্তিদের জীবনে যে ঝটিকা প্রবাহিত হয় তা সহ্য করা সাধারণের সম্ভব হয়ে উঠে না। আমরা বিস্মিত নেত্রে তাঁদের জীবনী পাঠ করে মুগ্ধ হই।

* * *

জনসেবক। তাঁর কার্য্যকলাপে কোথাও ত্রুটি থাকবে না। নিজের রুচীর বিরুদ্ধে ও পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকে নির্দিষ্ট সাজসজ্জায় ভূষিত করতে হবে। ভারী চামড়ার বুট, মোটা কাপড়ের বেশভূষা, কাঁধের উপর বন্দুকের ভার, মাথায় ইস্পাতের চাদরের হেলমেট। সৌখীন সাজসজ্জা সৈনিকের দেহাবরণের কাজে লাগবে না। সৈনিক,— এই নামের সঙ্গে খাপ রেখেই তার সাজসজ্জার ছাঁট তৈরী হয়েছে। কোথাও মরুভূমির তপ্ত বুকের উপর দিয়ে কোথাও বা প্রবল তুষার ঝটিকা উপেক্ষা করে তার মধ্যে পথ তৈরী ক'রে এগিয়ে যাবে জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। বিপক্ষ সৈন্যদের প্রবল প্রতিরোধ খণ্ডন করে রাজ্যলুণ্ঠনের আনন্দে সৈন্যদের সে উদ্দাম ওদের সুদৃশ্য অদ্ভুত ইউনিফর্ম ভেদ করে প্রকাশ পাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সৈন্যদের নানারকম পোষাকের ছাঁট, রং আলাদা; কুচকাওয়াজের ধাপে ধাপে তারা বিচিত্র ভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলেছে। সৈন্যদের পোষাকেই কেবল এ স্বাতন্ত্র্য নেই। দেশ, কাল এবং পাত্র ভেদে জনসেবকদের পোষাকে যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে তেমনি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সামাজিক আচার ব্যবহারে এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের শাসনকার্যের প্রাচীন প্রথায়।

* * * *

হাইওয়েকোম্বা শহরে একটা অদ্ভুত প্রথা আজও অপ্রতিহত রয়েছে। ঐ শহরে নবাগত প্রত্যেক নগরাধ্যক্ষকে দাঁড়িপাল্লার সামনে হাজির হয়ে শরীরের ওজন দিতে হয়। এই অদ্ভুত প্রথার উৎপত্তি কোথায় তার সঠিক তথ্য লোকের অজ্ঞাত। হাইওয়েকোম্বা একটি প্রাচীন শহর, প্রায় রোমানদের সমসাময়িক। রোমের বহু অতীত ইতিহাস এখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

সরকারী কাজ করতে এসে শরীরের ওজন রেকর্ড রাখা—কেন এমনি এমন সব অদ্ভুত প্রথা পৃথিবীর নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে যা শুনলে বিভিন্ন দেশের রুচির পরিচয় পেয়ে পরস্পরকে হাসতে হয়। কিন্তু বড় হওয়ার জ্বালা অনেক। সরকারী কাজ করতে এসে এ সমস্ত প্রথাকে নীরবে মেনে নিতে হয়। পরিবর্ত্তন অনেক ক্ষেত্রে করাও হয়। কিন্তু প্রাচীন প্রথার উপর মানুষের আদিমকালের মোহ লোপ পেতে দেরী লাগে। প্রাচীন সংস্কার দেহের প্রতি রক্তবিন্দুকে দূষিত করে রেখেছে, হয়ত কোথায় সাময়িকভাবে সে সংস্কার চাপা থাকে, তারপরে একদিন ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্তে সে প্রাচীন সংস্কার উদ্দাম হয়ে উঠে।

মানুষের মনের সংস্কারের কথা বলছিলাম।

তা যেমন অদ্ভুত তেমনি বিচিত্র। বেশীর ভাগ সংস্কারের উৎপত্তির কারণ পাওয়া যায় না। অথচ সংস্কারবশে লোকে তা রক্ষা করে আসছে।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঘোড়ার খুরের নাল। হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে পেরেকের দাগে জর্জরিত। ঘোড়ার পা থেকে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া সেই লোহার নালও মানুষের ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়। আমাদেরই দেশেও দরজার মাথার উপর, দোকানের চৌকাঠে ঘোড়ার খুরের নাল সিঁদুরগায়ে সেঁটে আছে। লোকের বিশ্বাস ঐ নালই একদিন সৌভাগ্য এনে দিবে, অতীতের দুঃখ, বর্তমানের অনুশোচনা মুছে গিয়ে সুদিন আনবে, এই আশায় অনেকে অপেক্ষা করছে। এদেশ ছেড়ে পশ্চিমের দিকে ফিরে তাকাও। লণ্ডনের 'ওয়েস্ট এণ্ডে'র বেশীর ভাগ ঘরের প্রবেশদ্বারে একসময়ে ঘোড়ার খুরের নাল ঝুলিয়ে রাখবার প্রথা ছিল। লোকের একটা বিশ্বাস ছিল ঐ নালের প্রভাবে ডাইন অথবা দুষ্টগ্রহের কোপানল থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। ১৮১৩ সালে মনমাউথ স্ট্রীট তল্লাস করে ১৭টা ঘোড়ার খুরের নাল পাওয়া যায়। ভাগ্য ফেরাবার জন্যে এবং আত্মরক্ষার জন্য ঘোড়ার খুরের নাল, মাদুলি প্রভৃতি তুকতাকের প্রচলন আমাদের দেশে এখনও রয়েছে। এ সংস্কার ছাড়তে আমাদের কতদিন লাগবে, সে ধারণা করাও যায় না। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পত্তনে, বিজ্ঞানের প্রসারে পাশ্চাত্য দেশে লোকের মধ্যেও কত সংস্কার আজও রয়ে গেছে।

গুজবের মনস্তত্ত্ব

(৫৯২ পৃষ্ঠার পর)

জার্মান সংঘর্ষ যাহাদের অভিপ্রেত নয় এই গুজবের উৎপত্তি তাহাদের মধ্যেই। জার্মান সমরনায়কদের মধ্যে ঘোরতর মতভেদের খবর বহুদিন যাবৎ শোনা যাইতেছে: ইহার মধ্যে কথঞ্চিৎ wishfulfilment নাই তাহা বলা চলে না। Hessএর ইংলণ্ডে আগমন সম্বন্ধে গবেষণার অন্ত নাই: রুজভেল্ট সেদিনও এক বৈঠকে অস্বীকার করিয়াছেন, তিনি Hessএর শান্তি প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু অবগত নহেন। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই গুজব উঠিল, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, দেশান্তরে আছেন। এই নির্ভীক দেশনায়কের রাজনীতিক জীবন অবসান না হোক, বহুজনের এই কামনা সুতরাং তিনি অন্যত্র আছেন এই গুজব সৃষ্টি ও প্রসার স্বাভাবিক। জওহরলাল শীঘ্রই কারামুক্ত হইবেন বলিয়া ইতিমধ্যে যে খবর পাওয়া গিয়াছে, কে বলিবে ইহা wishfulfilment নয়?

ইচ্ছার তাগিদে শুধু সংবাদ সৃষ্টিই হয় না অতিরঞ্জিতও হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করিব। একদা শোনা গেল দাঙ্গা-পীড়িত অঞ্চলে একটি গুণ্ডা নিহত হইয়াছে। দুই দিন পর এক স্থানে এই গুণ্ডা-মারার গল্প হইতেছিল। সেখানে পাওয়া গেল গুণ্ডাকে মারিয়া উহার চক্ষুদুটি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। গুণ্ডা দমনের অক্ষম ইচ্ছা শুধু গুণ্ডা বিশেষের হত্যার খবরে তৃপ্ত হয় না, চক্ষু উৎপাটনের প্রয়োজন, তাই এ সংযোজনা। পথে গুণ্ডা মারিয়া ফেলা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহার চক্ষু উৎপাটন সময় সাপেক্ষ, সুতরাং ততক্ষণ হত্যাকারিগণ বিলম্ব করিবেন ইহা সম্ভব নয়---এই প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ মন যাহা চায় তাহাই সম্ভব, বাস্তবিক অসম্ভাব্যতার যুক্তি এখানে অচল।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

একদিন বলিয়াছিলেন- মিত্রের দৃষ্টিতে আমরা জগৎকে দেখিতে চাই। কিন্তু দুর্বল এমন দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও প্রেমের বাণী, মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু মৈত্রীর নামে পরাভবকে কোন ক্ষেত্রেই তিনি জাতিকে স্বীকার করিয়া লইতে শিক্ষা দেন নাই। অন্যায়কে ন্যায়ের মর্যাদা দিবার যে প্রবৃত্তি তাহাকে তিনি দুর্বলতা বলিয়াই বুঝিয়াছেন এবং তাহা প্রতিরোধ করিবার শক্তিকেই তিনি অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। সকল প্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া বীর্যময় জীবনের প্রেরণা তিনি জাগাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনে গ্লানিকে স্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার সমগ্র সাধনায় প্ররোচিত করিয়াছেন দ্যুতিকে--প্রকাশকে। কুণ্ঠাকে মানেন নাই রবীন্দ্রনাথ, অকুণ্ঠ আত্মাভিব্যক্তিকে তিনি বরণীয় করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি ঋষি। তিনি ঋষিত্ব লাভ করিয়া জাতীয়তাবাদী এবং জাতীয়তাবাদী হইয়াও ভারতীয় সাধনার পরম সত্য উপলব্ধির প্রভাবে তিনি বিশ্বপ্রেমিক। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রাজনীতির কতকগুলি ধরাবাঁধা সূত্র আমাদের চিত্তকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে। সেই সূত্রমাফিক কয়েকটি কাজকে আমরা জাতীয়তাবাদের লক্ষণ বলিয়া বুঝি। এদেশের নব-জাতীয়তাবাদের বিকাশাত্মক সেই সব কর্মের মর্মমূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক ছিলেন না, কিন্তু মানব-মর্যাদাকে ভিত্তি করিয়া এ দেশের রাজনীতির মূলে প্রচণ্ড শক্তি তিনি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিক শাসকদের প্রভুত্ব-স্পর্ধাকে রবীন্দ্রনাথ মর্মান্তিক-ভাবে আঘাত করিয়াছেন। সে আঘাত মানবমর্যাদার ঔদার্যময় অনুভূতির ঊর্ধ্বস্তর হইতে আসিত। পশুবলের একান্ত দুর্বলতাকে সে আঘাত উন্মুক্ত করিয়া দিত। এজন্য রবীন্দ্র-নাথকে প্রতিঘাত করিবার মত সাহস পশুশক্তি কোন দিন লাভ করে নাই। ভারতের এই ঋষির কাছে পশুবলকে একান্ত লজ্জায় অবনত থাকিতে হইয়াছে।

আত্মপ্রত্যয় যে জাতির নাই, সে জাতির কিছুই নাই। দীর্ঘ পরাধীনতায় অবসন্ন জাতির অন্তরে আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধনের পথে রবীন্দ্রনাথ অসীম বল দিয়াছেন। ভয়ের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি জাগাইয়াছেন অভয়। অন্যায়ের প্রতিরোধে কবির কণ্ঠে যে বীর্যময় বাণী উদ্গীত হইয়াছে, তাহা জাতির প্রাণে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। অন্যায়ীকে আঘাত করিয়া মর্যাদাহীনতার মধ্যে তিনি আনিয়াছেন উদ্দীপ্ত আত্মমর্যাদা। এই মর্য [illegible] শক্তির প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করিবার শক্তি জাতিকে দি [illegible] তাঁহার মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে জাতি দুঃখের বাধা তুচ্ছ কা [illegible] সঙ্কটযাত্রায় বাহির হইতে সাহসী হইয়াছে। মহিমময় আত্মোৎসর্গে—জাতি আপনার পূর্ণ অধিকার লাভের জন্য দুর্যোগময়ী রজনীতেও করিয়াছে আনন্দময় অভিসার। ভৈরবের ডমরু ধ্বনির তালে তালে বাঙলার আঁধার আকাশতলে অমর-মরণ-রক্ত-চরণ অধীর রবে নাচিয়াছে। পরাধীনের রাজনীতিকে বিতর্কবহুলতা হইতে উদ্ধার করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরম বীর্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শুষ্ক রাজনীতির সূত্রে তিনি আত্মত্যাগের আনন্দময় রস সংযোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাধনা ভারতের ভাবধারায় এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যুগস্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ তিথি সমাগত। রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতির যে ঋণ তাহা পরিশোধ করিবার উপায় নাই। ঋষি তিনি। জাতির তিনি জীবনদাতা পিতা। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জাতির আচার্য। অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে তিনি জাতিকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়াছেন। একাধারে ঋষিঋণ, পিতৃঋণ এবং গুরুঋণে রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ তিথিতে আজ কি উপচারে আমরা তাঁহার স্মৃতি তর্পণ করিব?

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি অবিনশ্বর। ভারতের ব্যাস, ভারতের বাল্মিকী, কালিদাস ইঁহারা যেমন অমর হইয়া রহিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার দিক হইতে আমাদের তর্পণের অপেক্ষা তিনি রাখেন না। কবি হিসাবে তিনি অমর, কর্মী হিসাবে তিনি অমর, দেশপ্রেমিক এবং বিশ্ব প্রেমিকস্বরূপে তিনি অমর। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহার প্রতিভা অনন্তকাল মহিমা বিস্তার করিবে। কিন্তু আমাদের দিক হইতে তাঁহার স্মৃতিপূজার কর্তব্য আমাদের রহিয়াছে। বিশ্বমানবের মনোমন্দিরে যুগে যুগে রবীন্দ্রনাথের বন্দনা-গীতি উঠিবে, সেই সঙ্গে এ জাতির পূজাও তিনি পাইবেন; কিন্তু বিশ্বের সেই ব্যাপক পরিবেশের মধ্যেই কবির পূজা করিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। বিশ্বকবি হইয়াও তিনি আমাদের নিজের ছিলেন। আমাদের নিজেদের জন্য একটি বিশেষ পূজা বেদী চাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কাছে আমাদের গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পূজা বেদী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা বিশ্বের কাছে রবীন্দ্রনাথের জন্য গৌরব করিতে চাই। দেখাইতে চাই আমরা জগৎকে যে এ-জাতি, তুচ্ছ নহে, সামান্য নহে। ভারতের ভাব-ধারার বাণী মূর্তি দেখ এই রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের নহেন, তিনি তোমাদেরও। রবীন্দ্র সাধনার মধ্যে তোমাদেরও প্রাণ রস রহিয়াছে। ভারতের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া, যতই বড় হওনা কেন, তোমরাও বাঁচিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমুজ্জ্বল জীবনের সাধনায় ভারতের মর্যাদা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, আজ রবীন্দ্র-নাথের স্মৃতিপূজার ভিতর দিয়া আমাদিগকে সেই সাধনা উদ্দীপ্ত রাখিতে হইবে। ভারতের সভ্যতার প্রাণ ধারার সঙ্গে বিশ্বের সংযোগক্ষেত্র স্থাপনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। বিশ্বভারতী তাঁহার এই তপস্যার মূর্তি। রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার সেই তপঃ-হোম-শিখা

উদ্দীপ্ত রাখিবার সঙ্কল্প জাতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। কবির পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে এ কর্তব্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই একথা যে, বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতন—শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও কবির ইহাই ছিল ধ্যান জ্ঞান। বিশ্বভারতীকে যদি আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই কবির স্মৃতি পূজা আমাদের পক্ষে সার্থক হইবে। ঊর্ধ্বলোক হইতে কবি প্রাণপ্রদ মন্ত্রে আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন। আমাদের পাতিত্য ঘুচিবে।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত গান

১৩৪৬ সালে পূজার ছুটির পর শান্তিনিকেতনে 'ডাকঘর' অভিনয়ের আয়োজন হয় এবং কবি নিজে পরদেশী বা সন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য রিহার্সাল দিতেছিলেন। সেই সময়ে 'ডাকঘরে'র সংলাপের কিছু পরিবর্তন করেন ও ৬টি নূতন গান রচনা করেন; তন্মধ্যে ৪টি তাঁর নিজের গাহিবার কথা ছিল। এই চারিটি গানের মধ্যে 'সমুখে শান্তির পারাবার' গানটি অমলের মৃত্যুর পর কবির নিজের গাহিবার কথা ছিল। হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় অভিনয় আর হয় নাই। গানটি রচনাকালে একথা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন এ গানটি গাওয়া হয়। গানটি ১৩৪৬ সালের পূজার ছুটির পর রচিত।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শান্তিনিকেতন।

সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

তুমি হবে চির সাথী
লও লও হে ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতির ধ্রুবতারা॥

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি' লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥

রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশেষ রচিত গান

হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়
ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়।
উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনেরে দিল ডাক্
পঁচিশে বৈশাখ॥ *

* কবির একাশীতম জন্মোৎসবে গীত হইবার জন্য ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে গানটি রচিত হয়।

৮ম বর্ষ । ৩১শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল Saturday, 16th August, 1941. । ৪০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ
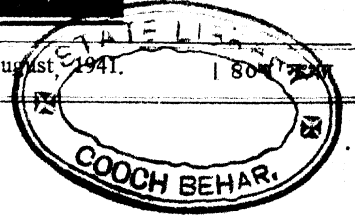
বিশ্বভারতী ও গভর্নমেণ্ট—

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় তাহা উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব করিয়া তিনি বলেন, "সমগ্র জগতের জ্ঞান ও কৃষ্টির প্রতীক বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই বিশ্বভারতীকে স্থায়ী এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান আমাদের অবশ্য কর্তব্য।" স্যার বিজয়প্রসাদ আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রী সুতরাং বাঙলা সরকারের মুখপাত্রস্বরূপেই কথাটা বলিয়াছেন, আমরা ইহা ধরিয়া লইতে পারি। দেশবাসীর দিক হইতে বিশ্বভারতীর জন্য এখনও অনেক কিছুই করিবার আছে, একথা আমরা স্বীকার করি। আমাদের আশা আছে, কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের পর দেশবাসী এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন না। কিন্তু বাঙলা গভর্নমেণ্ট এসম্বন্ধে তাঁহাদের যে কর্তব্য তাহা প্রতিপালন করিয়াছেন কি? অনেক সাধ্যসাধনার পর এক বৎসর তাঁহারা বিশ্বভারতীর জন্য ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাকাও কত কৃচ্ছ্রসাধনার পর বিশ্বভারতীর হাতে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা আমাদের জানা আছে। স্যার বিজয়প্রসাদ বিশ্বভারতীর প্রতি যে কর্তব্য প্রতিপালনের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করিতে বাঙলা সরকারের আন্তরিকতা কতখানি আছে আমরা দেখিতে চাই। কথা বলিতে গেলে অনেকই বলিতে হয়। বিশ্বভারতী শুধু বাঙলা দেশের ব্যাপার নয়। এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতের প্রতিষ্ঠান। ইহার আন্তর্জাতিক মর্যাদার সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের সংস্রব রহিয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণ কথায় কথায় আমাদের জাতীয় মর্যাদার দোহাই দেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় মর্যাদার সহিত সংশ্লিষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য এ পর্যন্ত তাঁহারা কিছুই করেন নাই। এখন এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

চার্চিল ও রুজভেল্ট—

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এবং মার্কিন-প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিরুদ্দেশ যাত্রা আন্তর্জাতিক জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মুসোলিনী এবং হিটলারে মিলনের জন্য আছে ব্রেনার গিরিবর্ত্ম; কিন্তু চার্চিল এবং রুজভেল্টের মিলন সে বড় কঠিন কথা। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর। সে সমুদ্রের তলেও জার্মানির ডুবোজাহাজগুলা দিনরাত ঘুরিতেছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে মন্ত্রগুপ্তি বেশী প্রয়োজন। ঝুঁকিও বড় সোজা নয়। এত বড় একটা ঝুঁকি উভয় রাষ্ট্রবীরকে লইতে হইল কিজন্য, ইহাই জল্পনা-কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, রাশিয়াকে সাহায্য করিবার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনাই এই মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, রাশিয়াকে সাহায্য কি অসাহায্য—সে কথা বিবেচ্য নয়। উভয়ের মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্যা লইয়া। জাপান থাইল্যাণ্ডের দরজায় আসিয়া হানা দিয়াছে। ইন্দো-চীনের ন্যায় সে যদি কৃপা করিয়া থাইল্যাণ্ডের নিরাপত্তার ভার নিজের হাতে লয়, তখন ইংরেজ কি করিবে? ইংরেজ যদি থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমেরিকা ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে কি না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এই পরম প্রয়োজনে পড়িয়াই রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন। উভয়ের পরামর্শের মূলে যে গুরুতর কারণ রহিয়াছে এবং সেই গুরুতর কারণের কার্য আকারে ফুটিয়া উঠিবারও সম্ভাবনা, যে আন্তর্জাতিক দিক হইতে রহিয়াছে, আমরা অন্তত এইটুকু আঁচ করিতে পারি।

মন্ত্রীদের খোলা মন—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এতদিন পরে এই দুইটি বিলের সম্বন্ধে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল খোলা মনে বিবেচনা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হইবে। এই সিলেক্ট কমিটিতে শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন, শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর, বর্ধমানের মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহাতাব এবং শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত—ইঁহাদিগকে লওয়া হইবে। শিক্ষা বিলটির সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আরও ১৪জন নূতন সদস্য লওয়া হইবে

স্থির হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বিরোধী দলের সদস্য হইতেছেন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ বর্মন—এই কয়েকজন। এই দুইটি বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেশবাসীর পক্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বিল দুইটি উত্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই। এতদিন পরে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের এগুলির সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবার সুবুদ্ধি উদয় হইল কেন, অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগিবে। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল এতদিন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকেই বড় করিয়া দেখিতেছিলেন। এই বিল দুইটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ্য কারণও রহিয়াছে সেই দিক হইতে। সাম্প্রদায়িক জোট বাঁধা দলের মনস্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি তাঁহারা অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শের সত্যই অনুসরণে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই বিল দুইটির সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তে সার্থকতা আছে। বিরোধী পক্ষ এই বিল দুইটির পুনর্বিবেচনায় গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন। নিজেদের মর্যাদা অব্যাহত রাখিতে হইলে বিলের বিরুদ্ধে আপত্তির যে সব কারণ আছে, সেই সব কারণগুলি তাঁহাদিগকে দূর করিতে হইবে। দায়িত্ব অতি গুরুতর, বিরোধী পক্ষ এই দায়িত্বের সম্বন্ধে যেন সতর্ক থাকেন।

হাকিমের হুকুম—

শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার একজন জাঁদরেল গোছের হাকিম। ইতিপূর্বে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন উপলক্ষে তিনি সভা করা বন্ধ করেন। কিন্তু এবার হাকিমী মেজাজ আরও উপরে চড়িয়াছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের শোক সভার অনুমতি নামঞ্জুর করিয়াছেন। এই হাকিমটির শিক্ষাদীক্ষার বিচার আমরা করিতে চাই না, তাঁহার আইন জ্ঞানও টনটনে দেখা যাইতেছে। লাট, বড়লাট, ভারতসচিব, ইঁহারা যাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছেন, দেশের লোকে তাঁহার জন্য শোকসভা করিলে তাহা হইবে দণ্ডনীয় অপরাধ! আইন ও শান্তিরক্ষার উৎকট বাতিক বিংশ শতাব্দীতে শুধু এই দেশেই দেখা যায়। ফুলারী আমল হইলে এমন হাকিমের পদোন্নতি সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিত। আসামে এখন স্যার সাদুল্লার মন্ত্রিমণ্ডল। আসামের মন্ত্রীরা এই ধনুর্ধর হাকিমটির জন্য কি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন, আমরা দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিলাম।

মহতের অপভাষণ—

শ্রীমাধব শ্রীহরি আণে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সেদিন আকোলার এক সভায় তাঁহার কার্যের সমর্থন করিতে গিয়া লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের নামের দোহাই দিয়াছেন। 'অধিকার ছাড়িও না, যেটুকু পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ কর এবং অধিক অধিকার লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম কর', আমরাও স্বীকার করি, লোকমান্য তিলকের ইহাই নীতি ছিল, কিন্তু অধিকার সেখানে কার্যত কিছুই দেওয়া হয় নাই সেখানে এই নীতির যুক্তি খাটে না। সম্প্রতি লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে একটি সভা হয়। এই সভায় পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ডব্লিউ ডোবী এবং মিঃ সোরেনসেন উভয়েই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবাসীদিগকে প্রকৃত কোন অধিকারই দেওয়া হয় নাই। এ দেশের লোককে অনুগ্রহ করিবার নামে কর্তাদের ধাপ্পাবাজীতে মডারেটরা ভুলিতে পারেন; কিন্তু লোকমান্য তিলক পিঠ-চাপড়ানীতে ভুলিবার বান্দা ছিলেন না। বড়লাটের আসরে বার দিবার ঝোঁক সামলাইবার মত শক্ত মেরুদণ্ড যাঁহাদের নাই, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে দিল্লী-সিমলার সভা সৌষ্ঠব করুন; কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য লোকমান্য তিলকের ন্যায় মর্যাদাবান পুরুষের দোহাই দেওয়া তাঁহাদের উচিত নয়; প্রকারান্তরে ইহাতে মহতের অপভাষণের অপরাধই করা হয়।

কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনা—

দীপালোক -সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। গত মে মাসে রাজপথে ৪৫১টি দুর্ঘটনা ঘটে, ইহার মধ্যে ২২টি হয় গুরুতর; জুন মাসে দুর্ঘটনার সংখ্যা কিছু কমিয়া ৪৩৮টিতে দাঁড়ায়; কিন্তু গুরুতর দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া ২৬টি হয়। জুলাই মাসে দুর্ঘটনার মাত্রা সকলের চেয়ে উপরে উঠিয়া উহার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭১টিতে, ইহার মধ্যে গুরুতর হয় ৪৬টি। লক্ষ্য রাখিবার বিষয় এই যে, দীপালোক সঙ্কোচের কড়াকড়ি কিছু শিথিল করা হইয়াছে যে জুলাই মাসে অথচ সেই জুলাই মাসেই দুর্ঘটনার সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে। কর্তৃপক্ষের ধারণা এই যে, দীপালোক সঙ্কোচের কড়াকড়ি শিথিল করাতে মোটরচালক এবং পথিকেরা গতিবিধিতে পূর্বাপেক্ষা অনেকটা অসতর্ক হইয়াছে; তাহার ফলেই দুর্ঘটনার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মোটর এবং বাস-চালকেরা যাহাতে অসতর্কভাবে মোটর না চালায় সেজন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মতে পুলিশ কমিশনারের সতর্কতাই এই সব দুর্ঘটনার প্রতীকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়, জনসাধারণকেও পৌরদায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট রকম অবহিত হইতে হইবে। কিছুদিন হইল, ভবানীপুরে এক ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর বাস চাপা পড়েন। বাসচালক আধা-অন্ধকারে আরামে গা-ঢাকা দেয়। ইহার পর সেই আঘাতের ফলে ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত বাসচালকের কোন সন্ধানই হয় নাই। বাসখানা অবশ্য খালি ছিল না। যাত্রী বোঝাই হইয়াই ছুটিতেছিল; কিন্তু যাত্রীরা কেহ পুলিশকে বাসের নম্বরটা দেওয়াও এক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

শহরবাসীদিগকেও এজন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। এদেশের পুলিশের পাল্লায় পড়িলে কি যে ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। পুলিশ কমিশনার শুধু বাসচালক এবং পথিকদিগকে সতর্ক না করিয়া পৌরকর্তব্যের এই সব ক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগকে যদি অধিকতর সৌজন্যপরায়ণ হইতে উপদেশ দেন এবং উপদেশানুযায়ী যাহাতে কাজ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখেন, তবেই ভাল হয়।

বাঙলায় দুঃখদুর্দশা—

বাঙলা জুড়িয়া অন্নকষ্টের হাহাকার উঠিতেছে। বরিশাল এবং নোয়াখালীর উপর যে দুর্বিপাক আপতিত হয়, সে কথা শহরবাসীরা অনেকে হয়ত ভুলিতে বসিয়াছেন। তাহার পর অবশ্য অনেকটা সময় কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু লোকের দুঃখকষ্ট কাটে নাই বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্ববর্তী দৈবদুর্বিপাকে দেশের লোকের নিকট হইতে যেরূপ অর্থ-সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, এবার সেরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও সর্বতোভাবে প্রচুর হইয়াছে। চাঁদপুরের প্রবীণ জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় সম্প্রতি চাঁদপুরের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ঝড়ে এবং বন্যায় এ অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছে। আগামী হৈমন্তিক ধান্যের ফসলও পাইবার কোন আশা নাই। নোয়াখালীর বিপন্ন নরনারীর দুঃখদুর্দশা অবর্ণনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। অধিকাংশ পরিবার একাদিক্রমে দুই তিনদিন করিয়া অন্নাভাবে কাটাইতেছে। লতাপাতা অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া বহু নরনারী জীবনধারণ করিতেছে। দেশের এই অবস্থা। আমরা অনেকেই বড় বড় রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকি দেশের লোকের এই সব দুঃখকষ্টের কথা ভাবিবার সময় হয়ত আমাদের হইয়া উঠে না, ইহার উপর যুদ্ধের উত্তেজনা আছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের দাবী যদি আমরা করিতে চাই, তাহা হইলে নিরন্ন ভাইবোনদের দিকে আমাদের তাকাইতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে এই কথা যে, মানুষেই রাজনীতিক অধিকার পায় এবং দেশের লোকের দুঃখ-বেদনার প্রতীকারে যদি আমাদের প্রাণ সাড়া দেয়, তবে তাহাই আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইবে।

ঢাকায় পিটুনী পুলিশ—

ঢাকা শহরের অধিবাসীদের উপর পিটুনী পুলিশের কর ধার্য হইয়াছে। ১০ই এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ মাসের জন্য এই বাবদ ঢাকাবাসীদিগকে দেড় লক্ষ টাকা কর দিতে হইবে। যাহারা উপদ্রবকারী তাহাদের উপর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা এরূপ ক্ষেত্রে আমরাও সমর্থন করি; কিন্তু এইভাবে কর ধার্য করার ফলে উপদ্রবকারীদের চেয়ে যাহারা উপদ্রুত হইয়াছে তাহাদেরই দুর্দশা বাড়িবে। শান্তি-রক্ষকদের পূর্ণ সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও যাহারা গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের অত্যাচারে ধনসম্পত্তি হারাইয়াছে, আত্মীয় স্বজন বিয়োগে ব্যথিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, এখন আবার শান্তিরক্ষার নূতন ব্যবস্থার ফলে ট্যাক্স যোগাইবার চিন্তায় তাহাদিগকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত ঢাকা শহরের অধিবাসীদের উপর ব্যাপক এই দণ্ডের ব্যবস্থার যৌক্তিকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে সাজা দাও। তাহাদের ঘাড়ে চাড়া দিয়া পিটুনী পুলিশের করভার আদায় করিবার উপায় যদি থাকিত এবং সরকার যদি তেমন উপায় অবলম্বন করিতেন আমাদের আপত্তির কোন কারণই ছিল না; কিন্তু গুণ্ডাদের উদ্দাম অত্যাচারে যাহারা অশেষ রকমে সাজা পাইয়াছে, তাহাদিগকে আর এক দফা সরকারী আইন রক্ষার অতিরিক্ত ব্যবস্থার জন্য সাজা ভোগ করিতে হইবে, এ ব্যবস্থা চমৎকার।

আজি হতে শত বর্ষ পরে।
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে॥

—রবীন্দ্রনাথ

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে॥

—রবীন্দ্রনাথ

বংশ তালিকা
দ্বারকানাথ ঠাকুর
(১৭৯৪—১৮৪৬)
দেবেন্দ্রনাথ
(১৮১৭—১৯০৫)
গিরীন্দ্রনাথ
(১৮২০—১৮৫৪)
নগেন্দ্রনাথ
(১৮২৯—১৮৫৮)
গণেন্দ্রনাথ
(১৮৪১—১৮৬৯)
গুণেন্দ্রনাথ
(১৮৪৭—১৮৮১)
গগনেন্দ্রনাথ
(১৮৬৭—১৯৩৮)
সমরেন্দ্রনাথ
(জন্ম ১৮৭০)
অবনীন্দ্রনাথ
(জন্ম ১৮৭১)
অতি শৈশবে মৃত একটি কন্যা
দ্বিজেন্দ্রনাথ
(১৮৪০—১৯২৬)
সত্যেন্দ্রনাথ
(১৮৪২—১৯২৩)
হেমেন্দ্রনাথ
(১৮৪৪—১৮৮৪)
বীরেন্দ্রনাথ
(১৮৪৫—১৯১৫)
সৌদামিনী
(১৮৪৭—১৯২০)
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
(১৮৪৮—১৯২৫)
সুকুমারী
(১৮৪৯—১৮৬৪)
পুণ্যেন্দ্রনাথ
(১৮৫০—১৮৫১)
শরৎকুমারী
(১৮৫৩—১৯২০)
স্বর্ণকুমারী
(১৮৫৬—১৯৩২)
বর্ণকুমারী
(জন্ম ১৮৫৮)
সোমেন্দ্রনাথ
(১৮৬০—১৯২৩)
রবীন্দ্রনাথ
(১৮৬১—১৯৪১)
বুধেন্দ্রনাথ
(১৮৬৩—১৮৬৪)
মাধুরীলতা
(১৮৮৬—১৯১৮)
রথীন্দ্রনাথ
(জন্ম ১৮৮৮)
রেণুকা
(১৮৯০—১৯০৪)
মীরা
(জন্ম ১৮৯২)
সমীন্দ্রনাথ
(১৮৯৪—১৯০৭)
নীতীন্দ্রনাথ
(১৯১১—১৯৩২)
নন্দিতা
(জন্ম ১৯১৭)

১২৯৩ সালের ৯ই কার্তিক (১৮৮৬, ২২শে অক্টোবর) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলার জন্ম হয়। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে তিনি "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গানটি রচনা করেন ও গান করেন। ১৮৮৬ সালে নবেম্বর মাসে তাঁহার "কড়ি ও কোমল" প্রকাশিত হয়। ১২৯৪ সালে মাঘোৎসবের পর তিনি স্ত্রী, কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ সহ কিছুদিন শিলাইদহে গিয়া বোটে বাস করেন। ১২৯৪ সালের শেষের দিকে তিনি গাজিপুরে যান। ১২৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবীর সংস্থাপিত "সখি সমিতি" নামক মহিলা সমিতির অভিনয়ের জন্য "মায়ার খেলা" নামক গীতিনাট্য রচনা করেন। ১২৯৫ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৮৮৮ সালের ২৭শে নবেম্বর) রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

১২৯৬ সালের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত খিরকিতে কয়েক মাস সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। ১২৯৬ সালের আষাঢ় মাসে (১৮৮৯, জুন) তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি "রাজা ও রাণী" নাটকখানি ছাপান।

১২৯৬ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে ছিলেন। এই সময় তিনি "রাজর্ষি" উপন্যাসের আখ্যান অবলম্বনে "বিসর্জন" নামক এক নাট্যকাব্য রচনা করেন।

এই সময় লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাট সভা আহূত হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ "মন্ত্রিঅভিষেক" নামক একটি বৃহৎ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ "ভারতী" ও "বালক" পত্রিকায় ১২৯৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উহা ১৩৪৬ সালের মাঘ সংখ্যার "শনিবারের চিঠিতে" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১২৯৭ সালের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। এইখানে তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা "মেঘদূত" (১২৯৭, ৮ই জ্যৈষ্ঠ) ও "অহল্যার প্রতি" (১২৯৭, ১২ই জ্যৈষ্ঠ) রচিত হয়।

১২৯৭ সালের ৭ই ভাদ্র (১৮৯০, ২২শে আগষ্ট) তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু বিলাতে তাঁহার মন টিকিল না। কাজেই তিনি সামান্য কিছুদিন পরেই দেশে যাত্রা করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর বোম্বাই পেঁছেন এবং তাহার দুইদিন পরে (১২৯৭, ১৯শে কার্তিক) কলিকাতায় পেঁছেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া "মানসী" কাব্য মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন, তাহা ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ (১৮৯০, ২৪শে ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ নিত্য ডায়েরী রাখিতেন। উহা পরে (১২৯৮) "সাধনা"য় "ইউরোপযাত্রীর ডায়ারী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৯৭ সালের পৌষ কি মাঘ মাসে জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পতিসর (রাজসাহী জেলা) যাইতে হয়। ১২৯৭ সালের ১১ই মাঘ (১৮৯১, ২৬শে জানুয়ারী) তাঁহার তৃতীয় সন্তান রেণুকা দেবীর জন্ম হয়।

১২৯৮ সালের প্রথম দিকে "হিতবাদী" প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রতি সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ একটি করিয়া ছোট গল্প লিখিতে থাকেন। ছয় সপ্তাহে—দেনা-পাওনা, গিন্নী, পোষ্ট মাষ্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, ব্যবধান ও রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা—এই ছয়টি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। তৎপর তিনি "হিতবাদী"র সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন।

১২৯৮ সালেই "চিত্রাঙ্গদা" নাটকও লিখিত হয়।

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৯১) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় "সাধনা" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পূর্বোল্লিখিত "ইউরোপযাত্রীর ডায়ারী" প্রথম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সংখ্যায় তাঁহার "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্প বাহির হয়। ঐ বৎসর ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের মন্দির প্রতিষ্ঠায় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি "সোনার তরী" কবিতাটি লিখেন।

"সাধনা"য় রবীন্দ্রনাথের বহু শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হয়।

১২৯৯ সালের ২৯শে পৌষ (১৮৯৩, ১২ই জানুয়ারী) তাঁহার চতুর্থ সন্তান মীরা দেবীর জন্ম হয়।

১২৯৯ সালের মাঘ মাস হইতে "সাধনা"তে "পঞ্চভূতের ডায়ারী" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

১৩০০ সালের মাঘ মাসে "সাধনা"তে তাঁহার "বিদায় অভিশাপ" নাটিকা প্রকাশিত হয়।

—মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,—
আমি তোমাদেরি লোক।—
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়॥

—রবীন্দ্রনাথ

১৩০০ সালের (১৮৯৩) চৈতন্য লাইব্রেরীর এক সভায় তিনি "ইংরেজ ও ভারতবাসী" শীর্ষক একটি রাজনীতিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। এই প্রবন্ধ "সাধনা"তে প্রকাশিত হয়। "সাধনা"র যুগ কবির জীবনে তীব্র স্বদেশ প্রেমের যুগ।

১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরীতে যে সভা হয় তাহাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ("সাধনা"র চতুর্থ বৎসর) রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "সাধনা"র সম্পাদক হন। ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৯৪, নবেম্বর) রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

তিনি "চিত্রা"র শেষ কবিতা লেখেন ১৩০২ সালের ২০শে ফাল্গুন এবং "চৈতালি"র প্রথম কবিতা লেখেন ১৩০২ সালের ১৩ই চৈত্র।

"সাধনা" ১৩০২ সালের কার্তিক মাস (১৮৯৫, নবেম্বর) পর্যন্ত চলে।

"মালিনী" নাট্যকাব্যখানি লিখিত হয় ১৩০৩ সালে।

১৩০৩ সালের শেষে (১৮৯৭) নাটোরে যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয় রবীন্দ্রনাথ তাহাতে যোগদান করেন। "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা", "গান্ধারীর আবেদন", "পতিতা", "দেবতার গ্রাস", "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" প্রভৃতি কবিতাগুলি ১৩০৪ সালের রচনা। ১৩০৪ সালে "পঞ্চভূত" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩০৪ সালের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ নিউরলজিয়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। এ সময় লেখা খুব কম।

১৩০৫ সালে তিনি "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রেস বিলের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি টাউন হলে এক জনসভায়

কণ্ঠরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসের "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়।

এই বৎসর ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তিনি তাহাতে যোগ দেন। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন রেঃ কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণের সারমর্ম বাঙলায় পাঠ করিয়াছিলেন।

তাঁহার "কথা" প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে, ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয় "কাহিনী", এই বৎসরের শেষাশেষি "কল্পনা" প্রকাশিত হয়।

১৩০৬ সালের ২৫শে আশ্বিন (১৮৯৯, ১১ই অক্টোবর) দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে অনেক কবিতা লেখেন। ঐ সকল কবিতা "বঙ্গদর্শন" ও পরে "নৈবেদ্যে" প্রকাশিত হয়।

১৩০৭ সালে (১৯০০) তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হয়।

১৩০৭ সালের বৈশাখ হইতে ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত "ভারতী"তে (শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সম্পাদিত) "চিরকুমার সভা" প্রহসন বাহির হয়। ইহার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ দুইখানি প্রহসন লিখিয়াছিলেন. "গোড়ায় গলদ" (১২৯৯) ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" (১৩০৩)। ১৩০৭ সালের গোড়াতে তিনি শিলাইদহে ছিলেন। "ক্ষণিকা" সেইখানে বসিয়াই লেখা। "ক্ষণিকা" ১৩০৭ সালের শীতকালে বা ১৯০০ সালের শেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস (১৯০১, এপ্রিল) হইতে "বঙ্গদর্শন" নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদক হন। "বঙ্গদর্শনে"র প্রথম সংখ্যা হইতে "চোখের বালি" বাহির হইতে থাকে।

১৩০৮ সালের পৌষ মাসে (১৯০১, ২২শে ডিসেম্বর) শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইঁহার আসল নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩০৮ সালের ৩রা ফাল্গুন (১৯০২, ১৫ই ফেব্রুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণী সভায় চ্যান্সলার লর্ড কার্জন সমগ্র প্রাচ্যদেশবাসীকে অত্যুক্তিবাদী ও অতিরঞ্জনপ্রিয় বলিয়া গালি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসে মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ হয় সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত।

১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ (১৯০২, ২৩শে নবেম্বর) রবীন্দ্রনাথের পত্নী বিয়োগ হয়। 'স্মরণ' নামক কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের পত্নীপ্রেমকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

১৩০৯ সালের শীতকালে সতীশচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনের কার্যে আসিয়া যোগদান করেন।

১৩১০ সাল হইতে 'বঙ্গদর্শনে' 'নৌকাডুবি' উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার মৃত্যু হয়। ১৩১০ সালের ১৮ই মাঘ (মাঘী পূর্ণিমা, ১৯০৪, ১লা ফেব্রুয়ারী) বসন্ত রোগে সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

এই সময় মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হন। তিনি এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন আরম্ভ করেন। ইহার পূর্বে ১৩০৩ সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩১১ সালের ৭ই শ্রাবণ (১৯০৪, ২২শে জুলাই) তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে 'স্বদেশী সমাজ' নামে বিখ্যাত অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সময়ই তিনি 'শিবাজী উৎসব' নামে অমর কবিতাটি রচনা করেন। ১৩১১ সালের ৬ই মাঘ (১৯০৫, ১৯শে জানুয়ারী) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

১৩১০-১১ সালে মজুমদার লাইব্রেরী ৯ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশ করেন।

১৩১২ সালের প্রথমভাগে কলিকাতা হইতে 'ভাণ্ডার' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদক ছিলেন।

ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আহূত হইয়া ত্রিপুরায় যান। সভার উদ্বোধনে (১৩১২, ১৭ই আষাঢ়) তিনি 'দেশীয় রাজ্য' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন (১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর) বঙ্গচ্ছেদ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঐ দিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। ঐ দিন 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' এই মন্ত্র বলিয়া পরস্পর পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণ সুতা বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব ও অরন্ধনের প্রস্তাব তিনি করেন। তিনি এই উপলক্ষে 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল' এই 'রাখি' সঙ্গীতটিও রচনা করেন। 'রাখি বন্ধনে'র দিন প্রাতে রবীন্দ্রনাথ নগ্নপদে 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের' সহিত গঙ্গা স্নান করিতে যান। সেই দিন বিকালে আনন্দমোহন বসু 'ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন। বসু মহাশয়ের তখন শয্যাগত অবস্থা। তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণ পাঠ করিলেন আশুতোষ চৌধুরী এবং বাঙলায় পাঠ করিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইহার পর 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' ও 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' এই দুইটি গান গাহিয়া বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া পশুপতি বসুর বাড়ির দিকে যাওয়া হয়। ইহার দুই দিন পর ১৩১২ সালের ২১শে কার্তিক (৭ই নবেম্বর, ১৯০৫) পশুপতিবাবুর গৃহে 'বিজয়া' সম্মিলনী উপলক্ষে বহু সহস্র লোক সমবেত হয়। এইখানে বাঙালীকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ওজস্বিনী ভাষায় আহ্বান করিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। ১৩১২ সালে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি 'বাউল' নামে প্রকাশিত হয়।

১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যা শিখিতে আমেরিকায় প্রেরণ করেন। এই বৎসর ১লা বৈশাখ বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনী হইবার আয়োজন হয়। সেই সঙ্গে এক সাহিত্য সম্মিলনীও আহূত হয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হন। কি ভাবে বরিশালের এই সম্মিলনী সভা বন্ধ হয় তাহা সর্বজনবিদিত।

১৩১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গ দর্শনে'র সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। 'ভাণ্ডার' তখনও চলিতেছিল। ১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসে (১৯০৬, জুলাই) 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্কুল বিভাগের গঠন-পত্রিকা রচনার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন ও ১৩১৩, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ওভারটুন হলে উহা পাঠ করেন।

১৩১৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ (১৯০৬, ১৫ই আগস্ট) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব দিন কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৩১৪ সালের গ্রীষ্মকালে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ হয়। ১৩১৪ সাল হইতেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গ-দর্শনে 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

১৩১৪ সালের পূজার ছুটির সময় (১৯০৭ সালের নবেম্বর মাসে) মুঙ্গেরে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ কলেরাতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ১৩১৪ সাল ভাদ্র হইতে ১৩১৬, চৈত্র পর্যন্ত প্রবাসীতে 'গোরা' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৩১৪ সালে পাবনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় সম্মিলনীতে অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৩১৫ সালে সিটি বুক সোসাইটি হইতে রবীন্দ্রনাথের 'গান' বলিয়া বই প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ চৈতন্য লাইব্রেরীতে 'পথ ও পাথেয়' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৩১৫ সালের ৭ই ভাদ্র 'শারদোৎসব' নাটিকা রচনা করেন। ১৩১৫ সালের ২৩শে কার্তিক তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়।

১৩১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ বৌঠাকুরাণীর হাটের আখ্যায়িকা অবলম্বনে প্রায়শ্চিত্ত নামক নাটক রচনা করেন। এই নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্য দিয়া সত্যাগ্রহের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

'গীতাঞ্জলির' প্রথম চৌদ্দটি গান ১৩১৬ সালের পূর্বে রচিত। অবশিষ্ট ১৪২টি গান ১৩১৬ আষাঢ় হইতে ১৩১৭ সালের শ্রাবণের মধ্যে রচিত। ১৩১৬ সালের কার্তিক মাসে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩১৬ সালের ১৪ই মাঘ রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

১৩১৭ সালের ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রথম জন্মোৎসব হয়। ১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। ১৩১৭ সালের কার্তিক মাসে 'রাজা' নাটক লিখেন ও পৌষ মাসে উহা প্রকাশিত হয়।

১৩১৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অজিতকুমার চক্রবর্তী সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনামূলক 'রবীন্দ্রনাথ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

'১৩১৮ সালের ১৫ই আষাঢ় 'অচলায়তন' নাটক রচনা করেন। ঐ বৎসর ভাদ্র মাস হইতে 'প্রবাসীতে' তাঁহার জীবন-স্মৃতি' প্রকাশ আরম্ভ হয়। ১৩১৮ সালের আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রবাসীতে নিয়মিতভাবে বাঙলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের পৌষ মাসে তাঁহার 'ডাকঘর' নাটক প্রকাশিত হয়।

১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ (১৯১২, ২৮শে জানুয়ারী) টাউন হলে এক সভার আয়োজন হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন পত্র দেন। এই সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

এই সম্বর্ধনার পর তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম এক সংকট অবস্থায় পতিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের গবর্ণমেণ্ট এক গোপন ইস্তাহার প্রচার করেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের সন্তানদের পক্ষে এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এই ইস্তাহারের ফলে বহু অভিভাবক তাঁহাদের পুত্র ও আত্মীয়গণকে আশ্রম হইতে লইয়া যান।

ব্রাহ্মরা হিন্দু কিনা—এই কথা লইয়াও এই সময় ব্রাহ্ম নেতাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মরা হিন্দু—এই মত প্রকাশ করেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে 'আত্মপরিচয়' নামক এক লিখিত বক্তৃতায় এই মত খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করেন। তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' রবীন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথও 'হিন্দুব্রাহ্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া উহার জবাব দেন।

১৩১৮ সালের ৪ঠা চৈত্র ওভারটুন হলে তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' পাঠ করেন।

এই বক্তৃতার পর তিনি শিলাইদহে চলিয়া যান। সেখানে ১৫ই চৈত্র হইতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ১৭টি গান ও কবিতা রচনা করেন। সেগুলি পরে 'গীতিমাল্যে'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইয়া পড়ে। তিনি অর্শ রোগে ভুগিতেছিলেন। সকলে তাঁহাকে বিলাত যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিলাতে যাওয়ার সম্ভাবনায় তিনি অবসর মত স্বরচিত কয়েকটি গান ও কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করিতেছিলেন। ভবিষ্যতে যে অনুবাদ তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়াছিল, এইখানেই তাহার সূত্রপাত।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

অনেক দিনে অনেক দিয়ে
ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে
ভাঙন হোলো চরম প্রিয়তম,
সাজাতে পূজা করিনি ত্রুটি
ব্যর্থ হোলে নিলেম ছুটি,
উদয়গিরি প্রণাম লহ মম॥

—রবীন্দ্রনাথ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

তিনি ১৩১৮ সালের চৈত্রসংক্রান্তির দিন শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্শের অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁহার বিলাত যাওয়া স্থির হয়। ১৩১৯ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৯১২, ২৪শে মে) তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী সহ কলিকাতা ত্যাগ করেন। বোম্বাইয়ে তাঁহারা ওয়াট্‌সন হোটেলে উঠেন এবং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সেখান হইতে বিলাত যাত্রা করেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

১৩১৯ সালের ২রা আষাঢ় (১৯১২, ১৬ই জুন) রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌঁছেন। লণ্ডনে পৌঁছিয়াই তিনি বিখ্যাত মনীষী ও চিত্রশিল্পী রোদেনস্টিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইংরেজী গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি তিনি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। রোদেন-স্টিনের বাসায়ই ইংলণ্ডের বহু মনীষীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে ইয়েট্‌স্‌, মেসফীল্ড, আরনেস্টরিস, মিস সিনক্লেয়ার, এভেলিন আণ্ডারহিল্‌, ট্রেভেলিন ফক্স—টাঙ্‌ওয়েস, এজরা পাউণ্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। মিন্যাল পরিবারের অনেকের সহিতও এই সময় তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহাদের সকলেই রবীন্দ্র প্রতিভায় মুগ্ধ হন। রোদেনষ্টিন তাঁহার বন্ধু কবি ইয়েটস্‌কে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডু-লিপি পাঠ করিতে দেন। ইংরেজী গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি ইয়েটস সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং পাঠ করিতেন।

১৯১২ খৃঃ অব্দে ১০ই জুলাই ইয়েটস-এর উদ্যোগে ট্রোকাডোরা হোটেলে কবিকে সম্বর্ধনা করিবার আয়োজন করা হয়। এই সভায় নেভিনসন, এইচ জি ওয়েলস, জে ডি অ্যাণ্ডারসন, ই বি

হ্যাভিল আর্নল্ড, স্যার কে জি গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহার দুইদিন পূর্বে এমার্সন ক্লাব কর্তৃক রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা হয়। এই সম্বর্ধনার উদ্যোক্তা ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। এই কেদারনাথ দাশগুপ্তই স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে 'ভাণ্ডার' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাহার সম্পাদক করেন।

বিলাতে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ যে সকল বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। মহামতি সি এফ এণ্ডরুজ তাঁহাদের অন্যতম। ওয়েলস, লোয়েস ডিকিন্সন, বার্ট্যাণ্ড রাসেল প্রভৃতির সহিতও তাঁহার পরিচয় হয়। এই সময় দেবব্রত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও রবীন্দ্রনাথ নিজে 'রাজা'র অনুবাদ করেন।

লণ্ডনে বাসকালে অক্টোবর মাসের শেষদিকে কবি সুরুলের কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন। উত্তরকালে এই স্থান বিশ্বভারতীর গ্রাম-সংস্কার বিভাগের কেন্দ্র হয়।

১৯১২ খৃঃ অব্দের ২৭শে অক্টোবর কবি লণ্ডন হইতে নিউ-ইয়র্ক পৌঁছিলেন। আর্বানায় সপ্তাহ দুই কাটাইবার পর তিনি Unitarianদের ক্লাবে উপনিষৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপকই কবির বক্তৃতায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। ফলে তাঁহাকে পুনরায় বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করা হইল। য়ুনিটেরিয়ানদের Unity Clubএ চারি সপ্তাহে চারিটি বক্তৃতা দিলেন।

১৩১৯ সালের কার্তিক মাসের মাঝামাঝি (১৯১২ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে) রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজি সংস্করণ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইল। গীতাঞ্জলি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ইংলণ্ডের সাহিত্য মহলে বিপুল সম্মান লাভ করিল। সমসাময়িক সকল পত্রিকা মুক্তকণ্ঠে গীতাঞ্জলির প্রশংসা করিল। বিদেশী ভাষা হইতে রূপান্তরিত হইয়া কোন গ্রন্থই এরূপ সম্মান লাভ করে নাই।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে শিকাগো গমন করেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে "Ideals of the Ancient Civilization of India" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি য়ুনিটেরিয়ানদের হলে The Problem of Evil সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উদার ধর্মমতীদের সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য কবি শিকাগো হইতে ২৯শে জানুয়ারী (১৯১৩) রচেষ্টারে গমন করেন। তথায় রবীন্দ্রনাথ Race Conflict সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি সেখানে প্রথম বক্তৃতা দেন। আমেরিকা হইতে এপ্রিল মাসে পুনরায় তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৯১৩, জুন মাসের (১৩২০, জ্যৈষ্ঠ) প্রথম হইতে তাঁহাকে ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা দিতে হয়। শিকাগো ও হার্ভার্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি মার্জিত ও পরিবর্ধিত করিয়া তিনি এইখানে পাঠ করেন। বক্তৃতাগুলি পরে সংকলিত হইয়া 'সাধনা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

জুন মাসের শেষে ডাচেস নার্সিং হোম হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথকে অর্শ রোগের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি প্রায় এক মাস হাসপাতালে ছিলেন।

১৯১৩ খৃঃ অব্দে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য কালীমোহন ঘোষের সহিত 'সিটি অব লাহোর' জাহাজে উঠেন। এই সময়ে বেংগলী পত্রিকায় বর্ধমানের বন্যার কথা জানিতে পারেন এবং বিলাতী কাগজে ইহার কোন সংবাদ না দেখিয়া তিনি তীব্র মন্তব্য করেন। এক বৎসর চার মাস বার দিন প্রবাস বাসের পর কবি বাঙলায় ফিরিয়া আসিলেন ১৩২০ সালের ২০শে আশ্বিন (১৯১৩, ৬ই অক্টোবর)।

এই সময় কবি আরও কয়েকখানি ইংরেজী অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'গার্ডনার', 'ক্রিসেণ্ট মুন' (শিশুর কতকগুলি কবিতার অনুবাদ), 'চিত্রা' ('চিত্রাঙ্গদা'র অনুবাদ), 'দি পোস্ট অফিস', 'কবিরস্ পোয়েমস্' এই সময় প্রকাশিত হয়।

১৯১৩ খৃঃ অব্দে, ১৩ই নভেম্বর (১৩২০, ২৭শে কার্তিক) সুইডিস একাডেমী রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দানের ঘোষণা করেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সম্মান-লাভ করেন।

১৩২০ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনে করিয়া ৫০০ নরনারী রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করার জন্য শান্তিনিকেতনে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জাস্টিস আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রেভারেণ্ড মিলবার্ন, মৌলবী আব্দুল কাসেম, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন, তাহাতে সকলেই মর্মাহত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনে তিনি চিরদিন দেশের নিকট হইতে বিরুদ্ধতা ও বিরূপতাই পাইয়া আসিয়াছেন। আজ পশ্চিম তাঁহার শক্তিকে স্বীকার করায় তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়াছেন। সেইজন্য যে সম্মানের পেয়ালা তাঁহারা আনিয়াছেন, তাহা তিনি ওষ্ঠের নিকট গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু পান করিতে অপারগ।

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে (১৯১৪, এপ্রিল) শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় মাসিক 'সবুজপত্র' বাহির হয়। প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ 'সবুজের অভিযান' নামক কবিতা ও *'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ লিখেন। 'সবুজপত্র'কে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক নূতন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে।*

বৈশাখ মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও কন্যা মীরা দেবী সহ রামগড় পাহাড়ে বেড়াইতে যান। আষাঢ় মাসের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩২১ সালের ৫ই ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষে যে অভিনন্দন সভা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন পাঠ করেন।

২৩শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া যাত্রা করেন। গয়া হইতে এলাহাবাদ হইয়া কার্তিক মাসের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে আসেন।

১৩২১ সালে 'ফাল্গুনী' রচিত হয়। ১৩২১ সালের ৫ই ফাল্গুন (১৯১৫, ১৭ই ফেব্রুয়ারী) গান্ধীজী সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। বাঁকুড়া জেলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করায় পৌষ উৎসবের পর কলিকাতায় ফাল্গুনী অভিনীত হয়। ফাল্গুনীতে কবি কবিশেখর ও অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৩২২ ফাল্গুন মাসে 'ঘরে বাইরে' রচনা শেষ হয়।

১৩২২ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ (১৯১৫, ৩রা জুন) রবীন্দ্রনাথ 'স্যার' উপাধি পান।

১৯১৬ সালের ৩রা মে (১৩২৩, ২০শে বৈশাখ) কবি, পিয়ার্সন, এণ্ডরুজ ও মুকুল দে জাপান যাত্রা করেন। জাপানে সর্বত্র তিনি বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। ১৯১৬ সালের ২৯শে মে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩) তিনি জাপানে পৌঁছেন। জাপান বাসকালে Stray Birds নামে তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। জাপান কর্তৃক চীনের লাঞ্ছনা দর্শনে কবিচিত্ত ব্যথিত হয়। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ও Keio Gijuku বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে Message of India to Japan and the spirit of Japan প্রবন্ধ পাঠ করেন। ফলে তিনি জাপ সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়েন।

১৯১৬ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কবি আমেরিকায় যাত্রা করিলেন। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কবি বক্তৃতা দিলেন। এবার

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল Cult of Nationalism. দশ মাস পরে কবি দেশে ফিরিলেন।

১৯১৭ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুন শ্রীযুক্তা বেশান্ত অন্তরীণে বন্দী হইলে, সংবাদপত্রে কবি তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সময় হইতে কবি নানা দিক দিয়া ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯১৭ সালে কলিকাতায় শ্রীযুক্তা বেশান্তের সভানেত্রীত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কবি 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের পর India's Prayer (ভারতের প্রার্থনা) আবৃত্তি করেন।

১৯১৭ খৃঃ অব্দে শ্রীমতী বেশান্তের National University-তে রবীন্দ্রনাথ চান্সেলার হইলেন।

১৩২৪, ১লা ফাল্গুনে অচলায়তন নাটকখানিকে সংক্ষিপ্তাকারে 'গুরু' নাম দিয়া লিখিলেন।

১৩২৪-২৫ সালের চৈত্র-বৈশাখের মধ্যে পলাতকার কবিতাগুলি লিখিত। ১৩২৫ সালে গীতপঞ্চাশিকা ও গীতবীথিকা প্রকাশিত হয়।

কবি এই সময়ে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য আমন্ত্রিত হন। কবি ঐ সকল স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। অকস্মাৎ একটা ব্যাপারে সব ওলটপালট হইয়া গেল। ১৩২৫ সনের ২৮শে বৈশাখ (১৯১৮, ৯ই মে) এণ্ড্রুজ গভর্নমেণ্ট হাউসে লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুরেলের সহিত কর্মোপলক্ষে দেখা করিতে যান। সেই সময় কথা প্রসঙ্গে গুরেলে বলেন যে, সানফ্রান্সিসকোতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যে ভারতীয় যুবকদের বিচার চলিতেছে, তাহাদের কাগজপত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট। গুরেলে আরও বলেন যে, কবির সম্বন্ধে গুজব যে, ১৯১৬ সালে তিনি যে জাপান হইয়া আমেরিকা যান, তাহা জার্মানদের অর্থসাহায্য পাইয়া। রবীন্দ্রনাথ এই সব অভিযোগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হন ও আমেরিকা যাওয়া স্থগিত করেন।

১৯১৮ সালের ১৬ই মে ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু হয়।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে, ২২শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ, ১৩২৫) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে কবি নানা স্থানে সম্বর্ধিত হন এবং তিনি বহু স্থানে বক্তৃতা দান করেন। মৈসুরে Message of the forest, সালেমে Centre of Indian Culture, কুম্ভকোণমে The Spirituality in the Popular Religion in India, মাদুরাতে The Spirit of Popular Religion in India ও Education in India, মৈসুর মিথিক সোসাইটিতে Folk Religion of India প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

রৌলট বিলের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিবার সংকল্প করিলে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে বাণী প্রেরণ করেন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে, ৩০শে মে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের অনাচারের প্রতিবাদে কবি স্যার উপাধি ত্যাগ করেন।

১৯১৯, ২৫শে সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব অভিনয়ে কবি স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই বৎসরই অরূপরতন লিখিত হয়।

১৯২০, ২রা এপ্রিল গান্ধীজীর আমন্ত্রণে গুজরাট সাহিত্য পরিষদে কবি অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৯২০, ১১ই মে (১৩২৭, ২৭শে বৈশাখ) তিনি পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন। লণ্ডনে তিনি বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। তিনি এখানে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯২০, ৬ই আগস্ট কবি প্যারী গমন করেন। প্যারীতে বহু মনীষী ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া মুগ্ধ হন। প্যারী হইতে কবি হল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি রটারডাম পেঁৗছেন। হল্যাণ্ডে কবিকে থিওজফিস্টরা ও Free religion Community বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিলেন। রটারডামে চার্চের কর্তৃপক্ষও কবিকে বেদী হইতে উপদেশ দান করিতে বলেন। অখৃষ্টানের পক্ষে এরূপ কার্য এই প্রথম। হল্যাণ্ডে কবি The Message of East প্রবন্ধ পাঠ করেন। হল্যাণ্ড হইতে তিনি বেলজিয়াম যান। বেলজিয়ামে এনটোয়ার্প ও ব্রুসেলসে কবি বক্তৃতা করেন।

১৯২০, ২৮শে অক্টোবরে তিনি আমেরিকায় গমন করেন। সেখানে নিউ ইয়র্ক, হার্ভার্ড, শিকাগো, টেকসাসের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দান করেন।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে পুনরায় ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন। ইউরোপের ফ্রান্স, স্ট্রাসবুর্গ, জেনেভা, জার্মানী, হামবুর্গ, সুইডেন, মুানিক, ভিয়েনা, প্রাগ প্রভৃতি স্থানে ও নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান করেন। জার্মানিতে অবস্থানকালে সেখানকার বিদ্বজ্জন সমাজ কবিকে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী উপহার দেন।

১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই কবি বোম্বাই পেঁৗছিলেন এবং সোজা শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন।

১৯২১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৩২৮, ১৯শে ভাদ্র) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবিকে সম্বর্ধনা করেন।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কবি বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সিংহলের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন।

১৯২৩ খৃঃ মার্চ মাসের প্রথমে তিনি কাশীতে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন এবং লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, আমেদাবাদ, করাচী, কাথিয়াবাড়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে Visva-Bharati Quarterly প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ খৃঃ অব্দে লিয়াং-চি-চাও-এর আমন্ত্রণে কবি চীন যাত্রা করেন। পথে ও চীনে তিনি নানা স্থানে বিশেষ সম্বর্ধনা লাভ করেন। চীনে তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চীন হইতে তিনি জাপান যাত্রা করেন। জাপানে International relation সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯২৪ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি আমন্ত্রিত হন। আর্জান্টাইনে কবি সম্বর্ধিত হন। কবি ১৯২৫-এ ইতালী গমন করেন। তিনি জেনোয়া, মিলানো, ভেনিস ব্রিণ্ডিসি প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করেন।

১৯২৫ খৃঃ অব্দে ১৯শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ Philosophical Congress-এর সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলনে বক্তৃতার জন্য আহুত হইয়া জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তথায় গমন করেন।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন।

১৯২৬ খৃঃ অব্দে ৩১শে মে মুসোলিনীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। রোমে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করা হয়। রোম হইতে কবি ফ্লোরেন্স, টুরিন, ভিলেনেভু, ৎসুরিক, লুসার্নে গমন করেন। প্রত্যেক স্থানেই তিনি সম্বর্ধনা লাভ করেন এবং বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯২৬, আগস্ট মাসে লর্ড সিংহের সহিত কবি নরওয়ে

যাত্রা করেন। অসলোতে নরওয়ের রাজার সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন। Nan Sen, Bjornson, Bojer প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া কবিকে সম্মান দেখান। এখান হইতে স্টকহলম, কোপেনহেগেন প্রভৃতি স্থানে কাটাইয়া কবি জার্মানীতে গমন করেন। জার্মানীতে বিভিন্ন স্থানে কবি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎকালীন জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ-এর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। বল্কান রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করিয়া তিনি মিশরের পথে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৬ (১৩৩৩, ৩রা পৌষ) তিনি শান্তিনিকেতনে পেঁছেন।

১৯২৭ সালের মার্চ মাসের শেষে কবি ভরতপুরের রাজার আমন্ত্রণে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ খৃঃ অব্দের ৪ঠা মে কবি প্রবর্তক সংঘের মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ওলন্দাজ ও জাভানীদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালের জুলাই—সেপ্টেম্বর জাভা, সুমাত্রা, বালি, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

১৯২৮ এ যোগাযোগ, শেষের কবিতা রচনা শেষ করেন। ঋতুরঙ্গ অভিনয় হয় ১৯২৮ খৃঃ। এই বৎসর কবি হিবার্ট লেকচারার মনোনীত হন এবং এই বৎসরই তাঁহার সহিত শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার হয়।

কানাডার National Council of Education-এর আহ্বানে কবি ১৯২৯ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে কানাডা যাত্রা করেন।

১৯২৯ খৃঃ অব্দে তপতী রচিত ও অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং বিক্রমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কবি বরোদার গায়কোবাড়ের আমন্ত্রণে বরোদায় বক্তৃতা দান করিতে যান। বক্তৃতার বিষয় ছিল Man the artist. এই বৎসরই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩০ খৃঃ অব্দে অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দান করেন। লণ্ডনে কবিকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল Religion of man. ইংলণ্ডে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া কবি জার্মানীতে যান। মুনিকে Principle of Art সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ফ্রাঙ্কফর্ট, মারবুর্গ, কোবলেনজ্-এ বক্তৃতা করেন। এই সময় ভানুসিংহের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়। এই বৎসর কবি প্যারীতে তাঁহার চিত্র প্রদর্শনী খুলেন। তাঁহার চিত্র বিদেশে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। এই সময়ে বিলাতে বসিয়া গান্ধীটুপী পরার অপরাধে সোলাপুরবাসীদিগের নির্যাতনের সংবাদ পাইয়া তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গমন করেন। মস্কোতে কবিকে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হয়।

১৯৩১-এ কবি "নবীন" নামে গীতিগুচ্ছ রচনা করেন। ইহার নাট্যাভিনয় হয় এই বৎসর। এই বৎসর ২৫শে বৈশাখ রাশিয়ার চিঠি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় দেশবাসী বিরাটভাবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করে। হিজলী জেলে হত্যাকাণ্ডে কবি অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করেন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি টাউনহল ও ময়দানে আহূত সভার সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩২ খৃঃ অব্দে কবি বিমানপথে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ করেন। এখানে বিভিন্ন স্থানে তিনি বিরাট অভিনন্দন লাভ করেন। বেদুইনগণ পর্যন্ত কবিকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে। ১৩৩৯ সালে কবি 'কালের যাত্রা' রচনা করেন। ১৯৩২ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সঙ্গে ১৯৩২-৩৩ সালের জন্য 'কমলা বক্তৃতা' দিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই বৎসর প্রফুল্ল জয়ন্তীতে কবি সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৩ খৃঃ অব্দে রামমোহন শতবার্ষিকীতে কবি পৌরোহিত্য করেন। এই সময়ে 'দুই বোন' প্রকাশিত হয়। 'দুই বোন' লিখিবার পর মালঞ্চ ও বাঁশরী রচনা করেন। ১৩৩৯ সালে পরিশেষ, ১৩৪০ সালে বিচিত্রা প্রকাশিত হয়। ১৩৪০ সালে চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ রচিত ও অভিনীত হয়।

১৯৩৫ খৃঃ মাদ্রাজে রবীন্দ্র সম্বর্ধনা হয়। মাদ্রাজ হইতে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়া তথায় যান। কাশী হইতে এলাহাবাদ যান। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বক্তৃতা করেন। এলাহাবাদ হইতে Lahore Students Conference-এ অভিভাষণ দান করিতে লাহোর গমন করেন। ১৩৪২ সালে শেষ সপ্তক বীথিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫, ১৫ই জুলাই কবি বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে টাউন হলে হিন্দুদের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৬ সালের ২৯শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের বাৎসরিক কনভোকেশনে কবিকে ডি লিট উপাধি দান করেন।

১৯৩৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণী সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাঙলায় অভিভাষণ প্রদান করেন।

১৯৩৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কবি রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশতিতম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কবি শান্তিনিকেতনে কঠিন বিসর্প রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হইয়াছিল। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার তাঁহার চিকিৎসা করেন। প্রায় ৯।১০ দিন রোগ ভোগের পর কবি আরোগ্য লাভ করেন।

১৯৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ভারতীয় কৃষ্টি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বাণী প্রেরণ করেন।

১৯৩৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বাঙলায় রাজবন্দিগণের মুক্তি দাবী করিয়া কবি এক বাণী দেন।

১৯৩৮ সালের ৯ই আগস্ট চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া এক বাণী দেন।

১৯৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের প্রসিদ্ধ কবি নোগুচির পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানের পররাজ্যলিপ্সার তীব্র নিন্দা করেন।

১৯৩৯ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে কবি কলিকাতা ১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে বঙ্গীয় কংগ্রেস ভবন "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৯৩৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা কলেজ স্ট্রীটস্থ কর্পোরেশন মিউজিয়ম হলে খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কবি মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

১৯৪০ সালের ২৮শে জানুয়ারী কবি বর্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে এক বাণী প্রদান করেন।

১৯৪০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতনে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার হয়।

১৯৪০ সালের ১৪ই এপ্রিল শান্তিনিকেতনে নববর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশ্বকবির ভাষণ—কবির শুভ জন্মোৎসবে চীনের রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেকের অভিনন্দন প্রেরণ।

১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গায়ার কবিকে ডি লিট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর কবি কালিম্পং রওনা হইয়া যান, কিন্তু ২৭শে সেপ্টেম্বর সেখানে গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়া পড়াতে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয় (২৯শে সেপ্টেম্বর)। কবি দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকেন, একটু সুস্থ হইলে ১৮ই নবেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান। চীন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রেসিডেণ্ট তাই চি-তাওকে কবি ৯ই ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে সম্বর্ধিত করেন। এ বৎসর **কবির শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির বিরাম** ছিল না। এ বৎসর তাঁহার "নবজাতক", "সানাই", (কাব্যগ্রন্থ), "ছেলেবেলা" (বাল্য জীবনস্মৃতি), "তিন সঙ্গী" (গল্পের বই), "রোগশয্যায়" ও "আরোগ্য" (কাব্যগ্রন্থ) প্রকাশিত হয়।

১৯৪১ সালের ১৪ই এপ্রিল (বাঙলা নববর্ষ) শান্তিনিকেতনে কবির অশীতিতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয়। সেই উপলক্ষে কবি "সভ্যতার সঙ্কট" শীর্ষক এক তেজোদ্দীপ্ত অভিভাষণ পাঠ করেন। ৮ই মে কবির বয়স অশীতিবর্ষ পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র তাঁহার জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠান হয়। ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহাকে "ভারত ভাস্কর" উপাধি দানে ভূষিত করেন। তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে "জন্মদিনে" ও "গল্প-সল্প" শীর্ষক দুইখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে শেষ দর্শনের জন্য সিনেট হলের সম্মুখে বিপুল জনতার সমাবেশ।

রবীন্দ্রনাথ ও মানব মাহাত্ম্য

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আমাদের দেশে সকলের উপরে সম্মান পাইবার অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের বলে যোগী। বাল্যকালে ভাবিতাম যোগীদের স্থান কেন এত উচ্চে? অগণিত ভেদ-বিভেদের দ্বারা যেই দেশ বিড়ম্বিত সেই দেশে তিনিই তো সর্বজনমান্য হওয়া উচিত যিনি ভেদের মধ্যে অভেদকে ও বিচ্ছেদের মধ্যে যোগকে স্থাপন করিতে পারেন। প্রাচীন ভারতে সমরবিজয়ী যোদ্ধা দেশজয়ী শূরবীরদের কথা লোকে স্মরণ করে না, স্মরণ করে সেই সব মহাপুরুষকে যাঁহারা তাঁদের প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারা পতিতকে উন্নত করিয়াছেন বিচ্ছেদের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছেন। লঙ্কাবিজয়ী বলিয়া রাম পূজিত নহেন। রাম সকলের হৃদয়ের ধন যেহেতু তিনি গুহকের মিতা, শবরীর বান্ধব, ঋক্ষকপিগণের সখা। কৃষ্ণ বুদ্ধ সবাই এই মৈত্রীর গুণেই বড়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা দেখাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এই কথা আমাদের কাছে অতিশয় সুন্দরভাবে স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতের যে সব দুর্গতি তার প্রধান কারণ তাহার মধ্যে এইরূপ অসংখ্য ভেদ বিভেদ। কিন্তু রাজনীতিগত দুর্গতি দূর করিবার জন্যই যে এই মৈত্রীবুদ্ধি প্রশংসিত তাহা নহে, এই ভেদ বিভেদ মানুষের অযোগ্য বলিয়াই তাহা পরিহার্য। ভগবানকে আমরা আজ মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমার মূর্তিতে পূজা করি বটে, তবু আমরা ভগবানকে হারাইয়াছি। কারণ আসলে ভগবান বাস করেন মানুষের অন্তরের মধ্যে। সেই মানব মন্দিরবাসী ভগবানকে অপমান করিয়া কোন্ মুখে বলিব আমরা ভগবানকে চাই? রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, ভগবান পাষাণ মন্দিরের মধ্যে বসিয়া নাই, তিনি আমাদের দীনদুঃখীর ঘরেই করেন বাস—

> **হেথায় তিনি কোল পেতেছেন**
> **আমাদের এই ঘরে।** (গীতাঞ্জলি, ৪৩ নম্বর)

তিনি জগতের সবারই সেবায় দিনরাত্রি লাগিয়া আছেন। সাধকের প্রার্থনীয় হওয়া উচিত সেই সেবায় যোগ দিয়া তাঁহার যথার্থ সেবক হওয়া, বৃথা জপতপ পূজারতি কি তাঁহার সত্য উপাসনা? উপাসনা অর্থ যদি নিকটস্থিতি হয়, তবে সর্বলোক সেবাই তাঁহার যথার্থ উপাসনা।

> **তুমি যে কাজ করচ, আমায়**
> **সেই কাজে কি লাগাবে না?**
> **কাজের দিনে আমায় তুমি**
> **আপন হাতে জাগাবে না?**

মুখে তো বলি আমরা "যত্র জীব তত্র শিব", কিন্তু কাজে করি তার বিপরীত। যিশু খ্রীষ্ট কহিলেন, "কেহ যদি তোমায় এক গালে চড় মারে, তবে আর এক গাল ফিরাইয়া দিও।" খ্রীষ্টানরা কয়জন তাহা পালন করেন? আমরা বরং দায়ে ঠেকিয়া তামসিকভাবে অন্য গাল পাতিতে বাধ্য হই। সেই হিসাবে আমরাই খ্রীষ্টান। আর গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের যে বীর্যগর্ভ উপদেশ, তার সাধক বরং মেলে পশ্চিম দেশে। যত্র জীব তত্র শিব যদি সত্য হয়, তবে সকল বিশ্বের সঙ্গে সেবাযোগে যুক্ত হইতে হইবে।

> **বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো**
> **সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।**
> **নয় ক বনে, নয় বিজনে**
> **নয় ক আমার আপন মনে**
> **সবার যেথা আপন তুমি, হে প্রিয়**
> **সেথায় আপন আমারো॥** (গীতাঞ্জলি, ৮৭)

এই বিশ্ব যোগসাধনায় দীক্ষিত হইতে হইলে আমাদিগকে নামিতে হইবে সকলের নীচে। তবে কি আর আমরা কাহাকেও নীচ বলিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে পারি? তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> **যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন**
> **সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে**
> **সবার পিছে, সবার নীচে,**
> **সবহারাদের মাঝে।**
> **যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,**
> **প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি,**
> **তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে**
> **সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে**
> **সবার পিছে, সবার নীচে,**
> **সব-হারাদের মাঝে॥** (গীতাঞ্জলি, ১০০)

এই পূজাই হইল সত্য পূজা। এই পূজা ছাড়িয়া আমরা যে মঠে মন্দিরে গুহার গহ্বরে চোখ বুজিয়া মালাজপ করি তাহা কি সত্য পূজা? সত্য পূজা হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া আজ আমাদের আর দুর্গতির অন্ত নাই। আজ আমরা ত দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ কষ্ট হইতে কষ্ট ভয় হইতে ভয়ের মধ্যে প্রতিদিন ডুবিয়া চলিয়াছি—

"দৌর্ভিক্ষাদ্ যাতি দৌর্ভিক্ষং কষ্টাৎ কষ্টং ভয়াদ্ ভয়ম"

এই দুর্গতির কথাই রবীন্দ্রনাথ অপূর্বভাবে তাঁহার গীতাঞ্জলিতে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—

> **ভজন পূজন সাধন আরাধনা**
> **সমস্ত থাক্ পড়ে'।**
> **রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে**
> **কেন আছিস ওরে?**
> **অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে**
> **কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,**
> **নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে**
> **দেবতা নাই ঘরে।**
> **তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে**
> **করচে চাষা চাষ,—**
> **পাথর ভেঙ্গে কাটচে যেথা পথ,**
> **খাটচে বারো মাস।**
> **রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,**
> **ধুলো তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;**
> **তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি'**
> **আয় রে ধুলোর পরে।**
> **মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,**
> **মুক্তি কোথায় আছে?**
> **আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে'**
> **বাঁধা সবার কাছে।**

আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই বলিষ্ঠদেহ তেজস্বী নেতার মনে যশ ও খ্যাতির কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বাঙলার প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল তাঁহারই গৃহে। স্বর্গীয় রামকান্ত রায় ছিলেন যুবকদলের নেতা।

কৃষ্ণবাবু একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে বিদেশীবর্জন আন্দোলন অসম্ভব। অতএব তুমি কলিকাতায় না থাকিয়া মফঃস্বলে ঘুরিয়া তাঁতী জোলাদের মধ্যে আবার তাঁত প্রবর্তনের চেষ্টা কর।" আমি তাঁহার আদেশে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। রণ বৃহৎ নগরীর আবহাওয়া কখনও আমার মনের সঙ্গে খাপ খায় নাই। বাঙলার নানা জেলা ঘুরিয়া আমি নোয়াখালী ও কুমিল্লায় আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র করিলাম। নোয়াখালীর যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ের পৈতৃক ব্যবসায় তাঁত। কিন্তু সেই ব্যবসায় তখন লুপ্তপ্রায়। ইহাদের সংখ্যা ৫৫ হাজারের উপর। যোগীদের অধিকাংশেরই জায়গা জমি নাই। অর্ধাশনে দিনাতিপাত করায় ইহাদের দেহ দুর্বল। দিন-মজুরীতেও মুসলমান মজুরীদের মত কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে না। ইহারা ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব। ইহাদের মুখে কীর্তন, ময়নামতী ও শূন্যপুরাণের গান শুনিয়া বুঝিলাম যে, ইহাদের হৃদয় সরস ও সৌন্দর্যানুভূতিসম্পন্ন। বাঙলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর সনাতনী-সমাজ গঠনের যুগে পৈতৃকধর্মাসক্ত, এই উন্নত জাতিকে সমাজপতিগণ অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বহুশতাব্দীর সাধনার সম্পদকে তদ্বারা একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। শহুরে শিক্ষিতাভিমানী আমি কলিকাতার রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতা লইয়া যখন গ্রামে আসিলাম তখন আমার মনে এই নিরক্ষর, নিরন্ন, অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা ছিল। এই সকল নির্বোধ জনগণকে কোন রকমে মাতাইয়া তুলিয়া যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করা যায় ইহাই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু কিছুদিন ইহাদিগের সহিত মিশিয়া অনুভব করিলাম যে ইহারা যতটা নিরক্ষর ততটা অজ্ঞ নহে। ইহারা একটি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। ইহাদের বোধশক্তি লুপ্ত হয় নাই। আমি যতই ইহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম ততই ইহাদের বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলাম। আমার দম্ভ দূর হইল। নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলাম। অনুভব করিলাম যে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারাই পরস্পরের হৃদয় জয় করা যায়। পতিতোদ্ধার-কারী পাদরীগিরী দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে।

পল্লীসভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আরও পরিস্ফুট হইল শিলাইদহে। শিলাইদহে কবি তখন পদ্মার উপর অবস্থান করিতে ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কুষ্টিয়ার নিকট লালন শা ফকিরের আখড়ায় গিয়া কয়েকটি সংগীত সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। আখড়ায় সেদিন ছিল উৎসব। ফকিরের বহুসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান শিষ্য ও শিষ্যা খঞ্জরী বাজাইয়া নৃত্যের সহিত গান করিতেছিল বাউলদের মত; সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে সহজ সরসভাবে অনুভব করাতেই এই সংগীতের বিশেষত্ব। শিক্ষিত সমাজের অগোচরে জনসাধারণের মধ্যে বিনা আড়ম্বরে এই সাধক তাঁহার জীবনের সাধনার দ্বারা মিলনের যে সেতু নির্মাণ করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিলাম।

পরদিন অপরাহ্নে কবি নৌকার উপর গভীর আনন্দের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর আমাকে বলিলেন, ইহারা লেখাপড়া জানে না, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী; বড় বড় কথা এমন সহজ ভাবে বুঝিতে পারে যে, এদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াও তাহা ক্বচিৎ পাওয়া যায়। এই শিলাইদহেই তিনি 'বৈষ্ণবী' নামক ছোট গল্প লিখেন। একটি বাস্তব ঘটনাই এই গল্পের উপাদান। আমাদের পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে যে সংস্কৃতি (culture) ইংরেজীশিক্ষিত ভদ্রসমাজের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার আঘাত সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি রহিয়াছে বলিয়াই এই সকল অশিক্ষিত সাধক তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া আত্মীয়তার অনুভূতি লাভ করিত এবং সেইজন্য প্রাণের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া নিজদিগকে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না।

আমরা যখন পল্লীসেবার কার্যে গ্রামে যাই তখন কি মনোভাব লইয়া উপস্থিত হইব তাহারই উপরে ভবিষ্যৎ ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে বলিয়া আমি পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

পল্লীসেবকের পক্ষে প্রধানত দরকার যাহাদিগকে লইয়া সমাজ গঠন করিতে হইবে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। যতই নগণ্য ও অজ্ঞ হউক না কেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কিছু সদ্‌গুণ থাকিতে পারে যাহার পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারি। যেমন বাহিরের একজন শিক্ষিত লোক অর্ধনগ্ন সাঁওতালকে দেখিলে প্রথমেই ধরিয়া লয় যে সে বুনো, বর্বর। তার প্রতি করুণা হয় কিন্তু শ্রদ্ধা হয় না। কিন্তু আপনারা দেখিয়াছেন যে সাঁওতাল দম্পতী সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর হাত ধরাধরি করিয়া বাঁশির সুরে আনন্দের লহরী তুলিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে তখন সেদিকে তাকাইয়া আমাদের কি মনে হয় না যে দিনাবসানের কর্মক্লিষ্ট দেহের ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া এমন সরলভাবে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি যদি আমাদের মধ্যে থাকিত! খাঁটি সাঁওতাল মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত নয়। সামাজিক সালিশীতে তাহার বিচার হয় জানিয়া উকিলের দালালের নিকট চতুরতার সহিত মিথ্যা বলিবার শিক্ষায় এখনও অনভ্যস্ত। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে তাহার আত্মসম্মান বোধ খুব জাগ্রত। সেই আত্মসম্মান বাঁচাইবা

জন্য সে হিন্দু-মুসলমানের সহিত এক গ্রামে বাস করে না। সে মধুরভাষী। তাহার আত্মসম্মানে বার বার আঘাত করিলে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তথাপি অবমাননার নিকট মস্তক অবনত করিবে না। পূর্ণিমা রজনীতে যখন সাঁওতাল নারীগণ আত্মবিহ্বল হইয়া নৃত্যে মাতিয়া উঠে তখনও তাহাদের মধ্যে সংযমের বন্ধন মাত্রও শিথিল হয় না। মদ্য পানে বিভোর হইয়া পুরুষগণ যখন মাদলের তালে তালে উন্দাম নৃত্য করিতে থাকে তখনও তাহাদের কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা নারীর মর্যাদাকে বিন্দুমাত্র আঘাত করে না। ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী সাঁওতালগণের মধ্যেও এমন অনেক সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের মধ্যে তাহার অভাব অনুভব করিয়া আমরা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারি। তাহাদের অজ্ঞতার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাহাদিগকে প্রতারণা করে। যদি সেই প্রতারণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করি—তাহাদের প্রাণ সায় দিবে না যদি তাহারা অনুভব না করে যে তাহাদের জাতির বিশেষত্ব যেখানে সেই সকল সদ্‌গুণের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন। তিনি জাতির ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। তাই তিনি বার বার দেশসেবক কর্মিদলকে আহ্বান করিলেন পল্লীসমাজ গঠনের জন্য। ১৩১৪ সালে নরম-পন্থী ও চরম-পন্থীদলের মিলন সংগঠনের জন্য পাবনাতে সম্মিলিত হন। দলাদলির বাহিরে থাকিয়া দেশের কল্যাণ চিন্তায় নিরত ছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথকেই সেই মিলন যজ্ঞের ঋত্বিক হইতে হইয়াছিল।

তখন বাঙলার ঘোরতর দুঃসময়। বঙ্গ বিভাগের বেদনায় বাঙালী ক্ষুব্ধ হইয়া বিলাতী বর্জন করিয়াছে। তাহার ফলে শাসকজাতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবর্তন করিলেন পুলিশ রাজকর্তা। জেল, নির্বাসন ও বেত্রদণ্ড দ্বারা বিলাতী বর্জন ত্যাগ করাইতে তাঁহারা দৃঢ় সংকল্প হইলেন। আঘাত ও প্রতি-ঘাতের তাড়নায় দেশে অশান্তি বাড়িয়াই চলিল। একদল যুবক অসহিষ্ণু হইয়া বিপ্লববাদ প্রচার করিতে লাগিল। পাবনা 'সম্মিলনী'তে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা বাঙলার রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। বিক্ষুব্ধ বাঙালী জাতির অন্তরের গভীর বেদনা জ্বলন্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার বক্তৃতায়। কবির দূর-দৃষ্টি সেই বিক্ষোভের মধ্যেও বিভ্রান্ত ছিল। সেদিন তিনি সকল দেশের সম্মিলিত চেষ্টায় পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন—

"প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইবে। সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে। প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে, কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

"দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কষ্টের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন তবেই স্বায়ত্ব শাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজেদের পাঠশালা, শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে। সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।"

যে দেশে শতকরা ৯৪জন লোক গ্রামে বাস করে সেই দেশের সমস্যা—পল্লীসমস্যা। সেইখানেই শক্তির উৎস দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র পল্লী প্রাণহীন, অন্নহীন ও আত্মকলহে শতধাবিচ্ছিন্ন। ভারতের ধন সম্পদের উৎপত্তি যেখানে, সেখানে বাঁধ দিতে না পারিলে ভারতের ধনরাশির অবাধ প্রবাহ অপর দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়া সেই অনুপাতে নিজেদের দারিদ্র্য বাড়াইয়া তুলিবে ইহা অনুভব করিয়া রবীন্দ্রনাথ পাবনায় বলিয়াছেন,—

"অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে তাহাতে একত্র মিলিয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।"

তরুণ তেজে উদ্দীপ্ত যুবক সম্প্রদায়ের ত্যাগে দেশ-সেবার জয় ঘোষণা করিয়া তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—

"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষি, শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয়, তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এই কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা, অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনও উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকুমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত

প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে উভয় দলের নেতৃবৃন্দের হৃদয় বিগলিত হইল। তখনকার মত সকলেই দলাদলি বিস্মৃত হইয়া এই সংগঠনমূলক কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহা আর কার্যে পরিণত হইল না।

পাবনা সম্মিলনীর সময় রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার পল্লী সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে সায় দেয়। তখন অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত তরুণ সম্প্রদায় ক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল ধ্বংসের ঘূর্ণিবায়ুতে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য। সংশয়ে দোদুল্যমান কর্মিদলের সমুখে রবীন্দ্রনাথ যে সুচিন্তিত গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করিলেন তাহাতে আমার মন সম্পূর্ণ সায় দিল এই জন্য যে, কয়েক বৎসর পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ক্রমাগত ঘুরিয়া আমার মনেও গণশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার আবশ্যকতা আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহারই আহ্বানে শিলাইদহে আগমন করি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তখন স্বাদেশিকতার যুগ চলিয়াছে। তিনি সর্বদাই দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় পদ্মার স্থির বক্ষ যখন লোহিতচ্ছটায় উদ্ভাসিত, তখন রবীন্দ্রনাথ গান করিয়াছেন,—

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বমায়ের
তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা।"

সে দৃশ্য কখনও ভুলিবার নহে—প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের উপর সূর্যাস্তের রক্তিম আভা। অশ্রু ছলছল আঁখির তন্ময়তা—সমুখের বালুচরের অপর প্রান্তে তরুচ্ছায়া মসীমাখা গ্রামের দিকে তাকাইয়া তিনি বিহ্বলচিত্তে বার বার সেই একই গানের আবৃত্তি করিতেছেন। অনুভব করিলাম যে, আমার স্বদেশ কেবল জ্ঞানমণ্ডলী অথবা মাটি-জলের সমষ্টি নহে। তাঁর একটি আত্মিক সত্ত্বা আছে। সেই সত্ত্বার নিকট জীবনের সমগ্র সাধনাকে উৎসর্গ করিতে হইবে। দেশসেবার ভিতর দিয়াই জীবনব্যাপী পূজা চলিবে বিশ্বমানবের ও বিশ্বমায়ের। প্রকৃত স্বাদেশিকতার হিত সার্বভৌমিকতায় কোন বিরোধ নাই। বাঙলার শ্যামলতার মধ্যে সেই বিশ্বময়ীর স্নেহস্পর্শের অনুভূতির সাধনাই এই সংগীতের উৎস।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার মধ্যে সর্বত্রই একটি সামঞ্জস্যের প্রয়াস লক্ষিত হয়। যাহা আপাতবিরোধ তাহার মধ্যে তিনি সহজেই মিলনের সুর খুঁজিয়া পান। এই জন্যই তাঁহার নিকট স্বাদেশিকতার সহিত বিশ্বমানবতার কোনও বিরোধ নাই। এদেশের অনেক লোকই এ বিষয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া থাকেন। কোনও একটি গ্রামে যে ব্যক্তি বাস করে তার পরিবারের প্রতি তার যে কর্তব্যবোধ ও অনুরাগ রহিয়াছে তাহার সহিত—সেই গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের সমষ্টি লইয়া যে পল্লীসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার প্রতি অনুরাগের কোনও বাধা হয় না—যদি আমরা আমাদের পারিবারিক স্বার্থকে সমগ্র পল্লীর সমষ্টিগত স্বার্থের বিরোধী করিয়া না তুলি। সেইরূপে আমাদের স্বাদেশিকতা তখনই নিন্দনীয় যখন তাহা জগতের কল্যাণকে আঘাত করে।

রবীন্দ্রনাথ ও মানবমাহাত্ম্য

(৬৬৭ পৃষ্ঠার পর)

যখন নিজেকে আমরা হীন মনে করি তখনই সব চেয়ে অন্যায় করি। সেই অন্যায়ের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমরা তোমাদের উদ্ধার করছি, বড় করছি, এই কথা বললে শুধু তোমাদের অপমান নয় আমাদেরও ছোট করা হয়।

এই যে তোমাদের নীচু করেছি তাতে আমরা নিজেদেরই বেশী পতিত করেছি। তোমাদের এই যে হীনতা তা আমাদেরই হীনতা। তোমরা যদি উঠতে পার, আত্মসম্মান লাভ করতে পার তবে তোমাদের চেয়ে আমরা ধন্য হব। তোমাদের উদ্ধারটা তোমাদের চেয়ে আমাদের দরকার বেশী। নয়তো তোমাদের হীনতার ও দীনতার ভরে দিন দিন আমরাই তলাতে থাক্‌ব।

তাই আমাদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে বলছি, তোমরা বড় হও, দাবি কর, সব মিথ্যা হীনতা দূর করে ফেলে দাও। তোমাদের নয়, আমাদের তোমরা উদ্ধার কর। সত্যদৃষ্টি যদি একবার তোমাদের খুলে যায় তবে তোমাদের বঞ্চিত করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা আপন মহত্ত্ব উপলব্ধি করে সকল বন্ধন ছিন্ন করে আমাদের মুক্তি দাও। দৈন্য তোমাদের নয়, সব দৈন্য সব হীনতা আমাদের। কবে তোমরা আমাদের মুক্তি দেবে? কবে তোমরা মুক্ত হয়ে আমাদের উদ্ধার করবে?"

আজ মহাকবির এই মহাবাণী স্মরণ করবার দিন।

রবীন্দ্রনাথের গান

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রনাথকে আমরা গানের দিক থেকে যখন আলোচনা করি, তখন একটা দিক আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তিনি আগে কবি পরে গায়ক বা সংগীত রচয়িতা। তাঁর ভিতরে কবি প্রকৃতিই গানে তাঁকে প্রেরণা জোগাচ্ছে। সুতরাং তাঁর কবি মনকে বাদ দিয়ে সংগীতে সুরকার হিসাবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁর রচিত গানে কথা ও সুরের মিলনের একটা সুন্দর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। আধুনিক বাঙলা গানের গতি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন।

কথা ও সুরের মিলনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার মূলে কি আছে, সে বিষয়ে ভাবা দরকার। আমার মনে হয় এ হ'ল বাঙালীর গানের চিরন্তন রীতি।

বাঙালী চিরকালই গীতকাব্যের কবি। কবি জয়দেব থেকে আজ এই ৮০০ বৎসর পর্যন্ত এ ধারার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। গীতকবিতায় সুর যোজনা করে গাইতে গেলে আপনা হতেই কবির অন্তর চাইবে, ভাব সুরের সাহায্যে পরিষ্কার হোক এবং সেখানে সুর যদি কথার ভাবকে অনুসরণ না করে, তবে কখনো গীতকাব্যের গানের মূল আদর্শটি বজায় থাকবে না। তাই গীত-কাব্যের দেশ,—বাঙলায় আমরা বরাবরই দেখে এলাম সুরের সংগে কথার একটি সুন্দর মিলনের রূপ। গানে বাঙালীর হাতে এ হতেই বাধ্য।

পশ্চিমের হিন্দি মার্গসংগীতের রচয়িতারা যদি গীতকাব্যের কবি হতেন, তাহ'লে হিন্দি মার্গসংগীতের রূপ কিসে দাঁড়াত তা বলতে পারি না। ঠুংরী বা গজল জাতীয় গানের বোধহয় উদ্ভব হয়েছিল এই কারণেই; কারণ, এর রচয়িতারা সাধারণত কবি। তাই এই দুই পদ্ধতির গানে কথার ও সুরের মিলনের প্রতি গায়কেরা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এ দুয়ের মিলন সে পদ্ধতিতে এই কারণেই এত আবশ্যকীয়। বাঙলার কীর্তন গানে মিশ্রণের ভিতর দিয়ে রাগসংগীতের যে পরিচয় পাই, সে মিশ্রণ কেউ জোড় করে করে নি। গীতকাব্যের সংগে সুর বসাতে গিয়ে রচয়িতারা আপনা থেকেই তা করে ফেলেছেন। তাই রাগরাগিণী এখানে আপন হতে শিথিল। বাঙলায় সংগীত যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি। সুতরাং তাঁদের গানে সুর ও কথার মিলনটাই যে বড় হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? রবীন্দ্রনাথের ভিতরে আমরা সেই প্রকার সংগীতজ্ঞকে দেখেছি, যিনি আগে কবি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছিল ভারতীয় সংগীতের আবহাওয়ায় পূর্ণ।

এ আবহাওয়ার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর "পরিবারের সমস্তকে ছাড়িয়ে উঠেছিল সংগীত। বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোন বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায়, উৎসবে আমোদে, উপাসনা মন্দিরে তাঁর গান শুনেছি। ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন। আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাঙলা ভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই, চিরাভ্যস্ত সেই সব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ায় থেকেও তাঁরা আপন মনে যেসব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ, তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

এই বিখ্যাত গায়ক বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে উচ্চ মার্গ-সংগীতে প্রথম হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে সংগীতে আরও একজন বিশেষ করে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদিয়া যদু ভট্ট। এই কারণে ধ্রুপদের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ায় তাঁর গানের ভিতর আমরা ধ্রুপদের ধরণ লক্ষ্য করি। ধ্রুপদের মত চারিটি ভাগ, যেমন অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ তাঁর গানে অনুসৃত হয়। প্রথম তিন ভাগে ধ্রুপদের মত সুরেও পার্থক্য আছে।

সংগীতের সৃষ্টির পথ ধরিয়েছিলেন প্রথম রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বয়সের পার্থক্য হেতু বাল্যকাল থেকেই জ্যোতিরীন্দ্রনাথ কখনও বালক বলে তাঁকে অবজ্ঞা করেন নি। সমবয়সীর মত ব্যবহার করেছেন প্রথম থেকেই। হয়ত সেই বয়সেই তাঁর প্রতিভার নিশ্চয়ই কোন সূচনা দেখেছিলেন যে কারণে নানাপ্রকারে রবীন্দ্রনাথকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরীন্দ্রনাথের সংগে দেখা যদি না হ'ত তবে হয়ত সংগীতে আমরা আজ রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে পেয়েছি সেভাবে নাও পেতে পারতাম।

১৫ বৎসর বয়স থেকে জ্যোতিরীন্দ্রনাথের সাহায্যে হি[illegible] ভেংগে গান রচনার সূত্রপাত হয়। নিজের প্রেরণায় গান র[illegible] সুরু হ'ল প্রথম আমেদাবাদে প্রবাসের সময়। কয়েক বৎসর [illegible] জ্যোতিরীন্দ্রনাথ কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে গান [illegible] সাহায্য করেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথের জীবনীর সংগে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলে নিশ্চয়ই খবর রাখেন। সে সময় জ্যোতিরী[illegible] হিন্দি রাগরাগিণীর নানা গৎ নিয়ে বাড়ির পিয়ানোতে ন[illegible] পরীক্ষামূলক কাজ চালাতেন এবং জ্যোতিরীন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল সেই সব সুরের সংগে কথা বসান। ঐ প্রথায় প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা' রচনার সময় পর্যন্ত অনেকগুলি গান রচিত হয়েছিল। তার অধিকাংশই তিনি পরে তাঁর নিজের গানের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে[illegible] কাব্যের দিক থেকে তার কোন মূল্য নেই বলে। ১৯ বৎসর [illegible] বাল্মিকী-প্রতিভা গীতিনাট্যটি রচনা করেন। এই নাটকের [illegible] ভাগ সুর সংগ্রহ করেছিলেন হিন্দুস্থানী নানা ঢং-এর গান থে[illegible] তারপর ছিল জ্যোতিরীন্দ্রনাথের রচিত সুর, বিদেশী সুর। নিজের রচনাও কিছু ছিল। এই নাটকটি রচনার সময় নিজের সুর যোজনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস তখন যে আসে নি এই কথাই বারবার মনে হয়। কিন্তু ঠিক মত চালনা করতে পারলে মার্গ সংগীতের ঢং ও সুরের সংগে ভাষাকে যে চালান যায়, এই গীতি নাটিকা তার একটি বড় উদাহরণ। তাঁর সব গানের ভিতর দিয়ে এই কথা প্রকাশ পেয়েছে।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রায় ১৯০টির মত গান রচনা করেছিলেন। আজ তাঁর বহু গান সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে গেছে।

সংগীতে আর একটি বড় প্রেরণা তাঁর জীবনে এসেছিল "মায়ার খেলা" গীতিনাটকটি রচনার সময়। তখন তাঁর অন্তর যে সুরের রসে রঞ্জিত ছিল একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। হিন্দি গানের প্রভাব থেকেও তাঁর মন অনেকখানি ছাড়া পেয়েছিল এই গান রচনার কালে। হিন্দি রাগরাগিণীর উপর ভর করে নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়েছেন রাগরাগিণীর মিশ্রণের ভিতর দিয়ে।

রবীন্দ্র কাব্য নিয়ে আলোচনা করে দেখা গেছে, ১৯০০ সালে "ক্ষণিকা কাব্যের" যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগতে একটা বিশেষ পরিবর্তন আনে। তখন তিনি মনে যে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করেন, কাব্য গানে অতি সহজে ও সহজ ভাষায় তা প্রকাশ করতে থাকেন। ব্রহ্মবাদীদের জ্ঞানমার্গ ও বৈষ্ণবের ভক্তিমার্গ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক হয়ে একটি নূতন ধারা গ্রহণ করে। সংগীতের জগতে এই সময় থেকে নানাপ্রকার নূতন ধারার প্রকাশ পায়। এর পূর্বে তাঁর গানে ভাবাবেগ ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই ছিল প্রবল এবং ধর্ম-সংগীতে বা ব্রহ্মসংগীতে তখনও প্রয়োজনের তাগাদার প্রকাশ ছিল বেশী। এখন গান আর হৃদয়াবেগের প্রকাশ নয়। মানুষের